সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

২৯শ—৩১শ ভাগ

ঊনত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৯

বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

সদস্যপক্ষে বিনামূল্যে।

দখিন হস্তর পরা বাম হস্তলৈ দশগুণ বৃদ্ধিরে এই সংখ্যানাম ক্রমে বুঝিবা।

গ্রন্থখানি এইরূপে অধিকাংশ গদ্যেই লিখিত। মধ্যে মধ্যে অনেক অঙ্ক পদ্যেও দেওয়া আছে। জ্যোতিষচূড়ামণি ও কিতাবত-মঞ্জুরির অনেক অঙ্ক ইহাতে রহিয়াছে।

ইহাতে পাটীগণিত ও পরিমিতির নানাবিধ অঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

চারি চারি চুয়ালিশ মাথে।
চুকা চৌত্রিশ দিয়া তাতে।
উপজে তাহাত যেহি জেহি অঙ্ক।
অষ্টকোটি করি জানিবা তাক

৪৪৪৪ এই পূর্ণা ৩৪।০ এই পূরণ হব আট কোটি। যথা,—

মুনি অম্বর পাখা পাখা।
বাণ চন্দ্র দিবা লেখা।
ঘোড়া ছিত দিবা রাম।

প্রথম অংশে অঙ্ক ও দ্বিতীয় অংশে উত্তর অঙ্কাকারে প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ—

৪৪৪৪ × ৩৪।০ = ১৫২২০৭

শেষ পংক্তিতে ১৫২২০৭ × ৭৩ অঙ্ক। ইহার উত্তর ১১১১১১১১

নবগ্রহ অষ্ট বসু সপ্ত সাগর সড় রস বাণ বেদ রাম বলৌ জানিতানি নবাঙ্কক অঙ্ক ইহাকে জান।

অষ্টাদশ পোনে হরি পূরি আন। কোঠার এহিসে নাম, অর্থাৎ—

১৫২২০৭ × ৭৩ = ৯৮৭৬৫৪৩২ × ১৮/০ = ১১১১১১১১১

৯৮৭৬৫৪৩২ ইহাকে নবাঙ্কক অঙ্ক বলা হইয়াছে।

গুণ বহ্নি ত্রি যৌটক জান
সড় রস চরমুক্ত মুণ্ড জান।
বসু বেদ চন্দ্রে পূরিবা।
নবাঙ্কক অঙ্ক তাকে পড়িবা।

অর্থাৎ—৬৬৬৩৩৪ × ১৪৮ = ৯৮৭৬৫৪৩২

সসি রাম বাণ অষ্ট বসু গুণ কর বেদ
সড় রস নবগ্রহ শনি কর জান।
কহয় গোকুলচান্দে জানিসা বিধান
এক পোন দশ বটে হরি পূরি জান।

অর্থাৎ—১৩৫৮০২৪৬৯১২ × /২।।০ = ১১১১১১১১১১১

দোগটা মনুষ্য গৈল বাণিজ্যক মনে।
কিছু কিছু ধন নিলে পরম যতনে।

ঊনত্রিংশ ভাগের সূচীপত্র

—:•:—

লেখিয়া চাহিলে দুয়ো জাহান্তে পথত।
তিনি গোটা বঢ়া ভৈল একর হাতত ॥
জত জত টকা নিয়া বাণিজ করিলা।
একৈকত্ তত লাভ দুই হস্তো লভিলা ॥
পথগৃহে আসি দুয়ো লেখিয়া চাহিল।
একাধিক সাত্ত কুড়ি (একর বাঢ়িল ?) ॥
কহিবো কায়স্থ সব পরম জতনে।
কোনে কত ধন নিলে বাণিজক মনে ॥

অনাক্রম। পূর্ব্বক বঢ়া ৩ রূপোর অন্তর বঢ়া ১৪১ রূপক হরি লব্ধ ৪৭ জি পাই তার হারক ৩ক কাটিব ৪৪ হব। এই আঙ্কে দুয়ে হরিব লব্ধ জি পাই, ২২ তাকর ভাগত রূপ সেই মান পূর্ব্বর। তাতে তিনি জুড়িব। অধিক ভাগত রূপ সেই মানে। এই ক্রমে অধিক তাহারত বুজিবা।

অঙ্কটি এই :—দুইজনে বাণিজ্য করিতে গেল। ১ জন অপেক্ষা অপর জনের ৩ টাকা অধিক মূলধন ছিল। প্রত্যেকে নিজ নিজ মূলধনের দ্বিগুণ লাভ করিল। বাণিজ্যের শেষে উভয়ের মোট টাকা ১৪১ হইল। প্রত্যেকের মূলধন কত ছিল ?

উপপত্তি :— $(\frac{১৪১}{৩} - ৩)\frac{১}{২} = ২২$ এক জনের মূলধন।

$২২ + ৩ = ২৫$ অপর জনের মূলধন।

৪টা দেউলে মানিয়ে পুষ্প দিব লাগে। ধুলে দুন হই। তুলিব কেতেটি পুষ্প দিব কেতুটি করি করনিতো থাকিব না লাগে।

অনাক্রম ৫ ভাগ দুন বঢ়াব শেষর ভাগ দুনার সঙ্গে পুষ্প দিব জি হয়ে পরা দুন বঢ়াই তাকে দিয়া পুষ্পক কাটিব জি সেস রহে সেই মান পুষ্প তুলিয়া আনিব লাগে। যদি বোলে দোল ৪টা দিব লাগে ৪টাকে ধুলে দুন হই করনিতো থাকিব ন লাগে।

অনাক্রম। চারির অর্দ্ধ লব ২ আরো অর্দ্ধ লব ১ আরো অর্দ্ধ লব ৷৹ আরো অর্দ্ধ লব ।৹ চারিয়ো ভাগক মুট করিব ৩৷৹ এই তিনি কাবোন তিনি চক পুষ্প তুলিব।

অঙ্ক :—চারিটি শিবমন্দির; প্রতি মন্দিরে শিবপূজার পূর্ব্বে পুষ্প ধুইলে, উহা দ্বিগুণ হয়। প্রতি মন্দিরে সমানসংখ্যক পুষ্প দিয়া শিবপূজা করিলে শেষে পুষ্পের অবশেষ কিছু থাকিবে না। কতটা পুষ্প চয়ন করা হইয়াছিল ?

গ্রন্থকারের উপপত্তি এইরূপ :—যদি চারি কাহন পুষ্প দিয়া প্রতি মন্দিরে পূজা করিতে হয়, তবে— $৪ \times \left\{\frac{১}{২} + \frac{১}{৪} + \frac{১}{৮} + \frac{১}{১৬}\right\} = \frac{১৫}{৪} = ৩৸৹$ কাহন পুষ্প চয়ন করিতে হইবে।

ধরা হউক, ক সংখ্যক পুষ্প তোলা হইয়াছিল ও খ সংখ্যক পুষ্প দ্বারা প্রতি মন্দিরে পূজা করা গিয়াছিল, তাহা হইলে—

$$[২\{২(২ক-খ)-খ\}-খ]-খ=০$$

$$ক=\cfrac{\cfrac{\cfrac{\cfrac{খ}{২}+খ}{২}+খ}{২}+খ}{২}=খ\times\left\{\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{১৬}\right\}$$

$$\therefore \frac{ক}{খ}=\frac{১৫}{১৬}$$

সুতরাং যদি ১৬টি পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে হয়, তবে ১৫টি ফুল তুলিতে হইবে।

এক মহারাজা এ(ক)স ব্রাহ্মণক একমাসলৈ প্রত্যেক প্রথম দিনর পরা একোটা রূপ দিলে। তার পরা এক বৃদ্ধি করি দিলে। কেতেক রূপ লাগে।

অনাক্রম। তৃশত এক বঢ়াব তৃশর অৰ্দ্ধেরে পুরিবলৈ জি হুই এ(ক)টা লৈ সেই মান লাগে তাকে এ(ক)সরে পুরিলে জি হুই এ(ক)স ব্রাহ্মণলৈ সেই মান রূপ লাগে।

অর্থাৎ এক মহারাজা ১০০ ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে ১ম দিন ১৲ টাকা হিসাবে, ২য় দিন ২৲ টাকা হিসাবে, ৩য় দিন ৩৲ টাকা হিসাবে এবং পরবর্ত্তী দিনসমূহে এইরূপে ক্রমবৰ্দ্ধিত করিয়া ৩০ দিন পর্য্যন্ত দক্ষিণা দান করেন। দক্ষিণা মোট কত টাকা হইয়াছিল? বলা বাহুল্য, গ্রন্থকারপ্রদত্ত উপপত্তি বিশুদ্ধ। উহা এই,—

$$দক্ষিণা=(৩০+১)\times\frac{৩০}{২}\times১০০৲ টাকা।$$

গ্রন্থকারপ্রদত্ত Arithmetical ও Geometrical Progression এই গ্রন্থে তেবেজিয়া অঙ্ক বলা হইয়াছে। নিম্নলিখিতভাবে উহাদের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে,—

আজি ১ কালি ২ কালি ৩ কালি ৪ অথবা আজি ২ কালি ৪ কালি ৬ কালি ৮ এই ক্রমে জেতিটিয় কৈকি বঢ়ালো হোক আনিব ক্রম।

আদির ভাগকে অন্তর ভাগকে মুট করিব। জেতিদিনর সংখ্যা কহে, তার অৰ্দ্ধেরে পুরিব। এতেকে তেরেজ হই। যৌলে জদি অধিক দিনর শেষ ভাগ কি কৈ পাব। প্রথম দিনত জি বোলে সেয়েরে সেস দিনক পুরিব জি হয়ি শেষ দিনর সেই সংখ্যা।

অঙ্ক :— $ক+২ক+৩ক+৪ক\cdots\cdots=কত?$

গ্রন্থকারপ্রদত্ত উপপত্তি :—যদি পদসংখ্যা (number of terms) ন ধরা হয়, তাহা হইলে শেষ পদ ন ক এবং পদসমূহের—

$$যোগফল=\frac{ক+নক}{২}\times ন$$

— দুনিয়া কৈ ধঢ়াধ আজি ২ কালি ৪ কালি ৮ কালি ১৬ অথবা আজি ৩ কালি ৬ কালি ১২ এই ক্রমে জিহরে পরা কি দুনা নোহোক আনিবার ক্রম।

শেষর ভাগকে দুয়ে পুরিব জিহরে পন্না দুনো বঢ়াই তাকে কাটিব এতেকে তেরেজ হই। যদি বোলে অধিক দিনর সেশ ভাগ কি কৈ-পাব তাক কহো। দুই দিনর সংখ্যাক বর্গ করিলে চারিদিনর চারিদিনর সংখ্যাক বর্গ করিলে, আট দিনর হই তিন দিনর সংখ্যাক বর্গ করিলে ছ দিনর হই।

অঙ্ক :— $৩+৬+ +১২+২৪ \cdots +৩\cdot২^{ন-১}$

পদসংখ্যা ন হইলে শেষভাগ বা শেষপদের অঙ্ক $৩\times২^{ন-১}$ হয়। ইহাকে শ বলা হউক

গ্রন্থকারপ্রদত্ত উপপত্তি $শ\times২-৩$

সাধারণ নিয়মানুসারেও ইহাই হয়, এতদনুসারে,—

$$\frac{৩(২^{ন}-১)}{২-১}=৩\times২^{ন}-৩$$

$$=\left(৩\times২^{ন-১}\right)\times২-\times৩$$

$$=শ\times২-৩$$

দুই কন্যা দোকানে গৈল।
বস্ত্র কিনিবাক ইচ্ছা ভৈল ॥
কাবোন কড়ি বস্ত্রক পাই।
পুর কাবোন এক জনিয়ো নাই ॥
এজনি মাত্তিলে এ জনিক।
তোমার দুভাগর এভাগ দিয়া বাই ॥
মোরে সহিতে এ কাবোন হব।
মহারঙ্গে আমি বস্ত্রক লব ॥
অপর জনিয়ে বুলিলে বাক।
ত্রিভাগর ভাগক দিয়ো আমাক ॥
আমার বিত্তেকে এ কাবোন কৈই।
পসারিক দিয়া বস্ত্র আবো লৈই ॥
কোন জনিত কত বিত্ত পাই।
গণি কহিবো কায়স্থ ভাই ॥

অঙ্ক :—একখানি কাপড়ের দাম ১ কাহন কড়ি। ক ও খ দুইজনে উহা কিনিতে চায়; কিন্তু কাহারও নিকট সম্পূর্ণ ১ কাহন কড়ি নাই। ক খকে বলিতেছে, তোমার কড়ির অর্দ্ধেক আমাকে দিলে আমার ১ কাহন হয়। ইহাতে খ ককে বলিল, তোমার কড়ির এক-তৃতীয়াংশ আমাকে দিলে আমার এক কাহন হয়—কাহার কত কড়ি ছিল?

বর্গমূল বাহির করিবার নিয়ম :—

সজাতির অঙ্ক সমূহক দখিন হাতর পরা বাম হস্তলৈ বিষম সমকৈ লেখিব অন্তর বিসম ভাগত হারককে লব্ধকে সমকৈলৈ হরিব। * * লব্ধক রাখিব সেই লব্ধক দুইয়ে পুরি দখিনর সমভাগর তলত হরেক করি রাখিব। তারে হরি দ্বিতীয় লব্ধ লব। সেই লব্ধর বর্গক দখিনর সমভাগ কাটি দ্বিতীয় লব্ধক দুয়ে পুরি বর্গকটা ভাগর তলত হারক করি রাখিব পুনু সেই হারকেরে হরি তৃতীয় লব্ধ লব। তৃতীর লব্ধরে বর্গ অপর ভাগত কাটি দুই পুরি হারকৈ 'কটা ভাগর তলত রাখিব, এই ক্রমে হরিলে জি লব্ধ পাই তাকে মূল বলি। পং ৩৭

নিয়মটি লীলাবতীর নিয়মের অনুরূপ। কিন্তু লীলাবতীর নিয়মের জটিলতাটুকু ইহাতে নাই। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা বর্ত্তমান গ্রন্থের নিয়মটি পরিস্ফুট হইবে। উদাহরণটি লীলাবতী হইতে প্রদত্ত হইল।

) ৮৮২০৯ (২৯৭
২² = ৪
৪৮২
৪ × ৯ = ৩৬
১২২
৯² × ৮১
৪১০৯
৫৮ × ৭ = ৪০৬
৪৯
৭² = ৪৯
০

বাঙ্গালায় ৪ হাতে এক কাঠা বা দণ্ড ধরা হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে মানদণ্ডের পরিমাণ ৬ হাত ধরা হইয়াছে। আসামে বর্ত্তমানে প্রচলিত মানদণ্ডের সহিতও ইহার সাদৃশ্য নাই। আসামের মানদণ্ডের পরিমাণ ৮ হাত; ইহাকে সাধারণতঃ ১ লেচা বলা হইয়া থাকে। ১ লেচা দীর্ঘ ও ১ লেচা প্রস্থ জমিকে ১ লোচা বলে। ২০ লেচা দীর্ঘ ও ২০ লেচা প্রস্থ অর্থাৎ ৪০০ বর্গলেচা ভূমিখণ্ডের নাম এদেশে ১ পুরা। বর্ত্তমান গ্রন্থে মানদণ্ডকে বেরো, কিন্তু বর্গবেরোকে লোচা এবং ৪০০ বর্গ বেরো জমির নামও এক পুরা বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আসামে প্রচলিত ১ পুরা বঙ্গদেশের ৪ বিঘার সমান; কিন্তু ধীরমোহিনীর পুরা ২ $\frac{১}{৪}$ বিঘার সমান।

ধীরমোহিনীর দৈর্ঘ্য পরিমাণ

১২ কেশে ১ তৃণ = ১/১৬″
২ তৃণে ১ ধান = ১/৮″
১২ তৃণে বা ৬ ধানে ১ অঙ্গুল = ৩/৪″
১২ অঙ্গুলে ১ বিঘত = ৯″
২ বিঘতে ১ হাত = ১৮″ = ১॥ ফুট
১২ বিঘতে বা ৬ হাতে ১ মানদণ্ড = ৩ গজ

চারি পাসে সমভূমি লখি।
মানদণ্ডেরে আনিব জুখি ॥
একছি পাসে যুতেক পাই।
আবর পাসে তাক পুরা চাই ॥
চতুর্থ সতে হরিবা ভাগ।
লব্ধক পাই ভূমিক লাগ ॥

অর্থাৎ সমচতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মানদণ্ড-সাহায্যে মাপিয়া উহাদের গুণফল লইয়া তাহাকে ৪০০ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে, তাহাই ঐ ভূমিখণ্ডের 'পুরা' অভিহিত বর্গফল বা পরিমাণ।

পথালিয়ে এ বেও দীর্ঘে ও ১ বেবো সেটো লোচা হই পথালিয়ে ১ বেবো দীর্ঘে ২০ বেবো তাকে কচা বোলে। প্রস্থে ১ বেবো দীর্ঘে ১০০ বেবো হলে তাকে পোবা বলে। প্রস্থে ১ বেবো দীর্ঘে ৪০০ বেবো তাকে পুরা বোলে।

অর্থাৎ ১ বেবো বা মানদণ্ড × ১ মানদণ্ড = ১ লোচা = ৯ বর্গগজ
১ „ × ২০ „ = ১ কচা = ১৮০ বর্গগজ
১ „ × ১০০ „ = ১ পোয়া = ৯০০ „
১ „ × ৪০০ „ = ১ পুরা = ৩৬০০ „

বাঙ্গালায় বিবিধ ক্ষেত্রের সংজ্ঞা রহিয়াছে। যথা, বিঘা, কাঠা ও ধূল।

১ বিঘা = ১৬০০ বর্গগজ
১ কাঠা = ৮০ বর্গগজ
১ ধূল = ৪ বর্গগজ।
১ গণ্ডা = ১৮″ × ১৮″ = ৩২৪ বর্গ ইঞ্চি
১ কাগ = ৪½″ × ৪½″ = ২০¼ বর্গ ইঞ্চি

এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রের কোন সংজ্ঞা আমরা ব্যবহার করি না; বর্ত্তমান গ্রন্থে ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেরও কয়েকটি সংজ্ঞা আছে—

"আর্য্যা :—হাতে হাতে পুরিলে ৪ আঙ্গুল
হাতে বেগতে ২ আঙ্গুল
বেগতে বেগতে ১ আঙ্গুল
বেগতে আঙ্গুলে ১ তৃণ
বেগতে ধানে ২ কেশ
আঙ্গুলে আঙ্গুলে ১ কেশ

আকে ছহতিয়া বেব্বর মুরত গ্রহে বুলি বুঝিবা।

অর্থাৎ ৪ আঙ্গুল (ক্ষেত্র) = ৩২৪ বর্গইঞ্চ = ১৮" × ১৮"

১ " " = ৮১ " " = ৯" × ৯"

১ তৃণ " = ৬৪ বর্গ ইঞ্চ = ৯" × ৯/৪"

১ কেশ " = ... বর্গ ইঞ্চ = ৯/৪" × ৯/৪"

গ্রন্থে সমচতুষ্কোণ ছাড়া আরও নানাবিধ জমির কালি করিবার নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে, যথা,—দুই প্রকার বিষম চতুর্ভুজ, সমত্রিকোণ, সমদ্বিকোণ, অসমত্রিকোণ, কুণ্ডলাকার, ডুম্বুরু আকার মৃদঙ্গাকার, সর্পাকার, ধনুর আকৃতিবিশিষ্ট ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ স্থলেই নিয়ম বিশুদ্ধ হয় নাই। নিম্নে দুই একটি উদাহরণ দেওয়া হইল,—

সম তিনি চুকিয়া ভূমির কথা। তিনি যে কালে একুড়ি একুড়ি। ক্রম। একলের অর্দ্ধেরে একালক পুরিব।

অঙ্ক :—সমবাহু ত্রিভুজের প্রতি বাহুর পরিমাণ কুড়ি, ক্ষেত্রফল কত? গ্রন্থকারের নিয়ম এক বাহু অর্দ্ধদ্বারা অপর এক বাহুকে পূরণ কর, ঐ পূরণফলই ক্ষেত্রফল। বলা বাহুল্য, ইহা শুদ্ধ নয়।

ডুম্বুরু আকৃতি ভূমি। দুয়োকপালক জুড়িব তাতে কঙ্কালকো জুড়িব ৩ রে হরিব দীর্ঘেরে পুরিব।

ডম্বুরুর উভয় মুখের নাম কপাল ও সংকীর্ণ মধ্যস্থলের নাম কঙ্কাল। নিয়ম :—দুই কপাল ও কঙ্কাল পরস্পর যোগ করিয়া ৩ দিয়া ভাগ কর। ভাগফলকে ডম্বুরের দৈর্ঘ্য (দুই কপালের পরস্পর দূরত্ব) দ্বারা গুণ করিলে গুণফল কালি পাওয়া যাইবে। ইহাও ঠিক বিশুদ্ধ নয়।
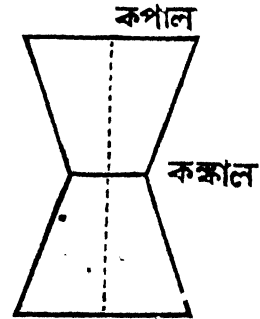
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

'সুন্দর', কেহ কেহ করেন 'স্যেন্দর'। প্রকৃত উচ্চারণ 'উ' এবং 'এ'র মধ্যবর্ত্তী। এইরূপ জর্ম্মান schön শব্দের ö বর্ণের উচ্চারণ না-'ও', না-'এ'। স্বাভাবিক হিসাবে যে উচ্চ-নিম্ন উচ্চারণ, তাহার আপেক্ষিকভাবে বিভিন্নতা আছে। যে ব্যক্তির স্বাভাবিক উচ্চারণ স্বরগ্রামের তৃতীয় পর্দায় আরম্ভ হয়, তাহার স্বরের উচ্চতা পঞ্চম পর্দা পর্য্যন্ত উঠে। সুতরাং তৃতীয় হইতে পঞ্চম পর্দা পর্য্যন্ত তাহার স্বরের মাত্রা বা standard. সুতরাং স্বাভাবিকভাবে উচ্চ-নিম্ন স্বর ও আপেক্ষিক ভাবের উচ্চ-নিম্ন স্বরে প্রভেদ আছে। সঙ্গীতের স্বরও সাধারণতঃ আপেক্ষিকভাবে উচ্চ। বেদে যে স্বরের উচ্চ-নিম্নতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও এই আপেক্ষিক উচ্চতা।

উচ্চ নিম্ন ক্রমে বেদে ত্রিবিধ স্বর—উচ্চৈর্ উদাত্তঃ, নীচৈর্ অনুদাত্তঃ, সমাহারঃ স্বরিতঃ। অর্থাৎ উচ্চ স্বর উদাত্ত, নিম্ন স্বর অনুদাত্ত এবং উচ্চ ও নিম্ন স্বর একত্র হইলে স্বরিত। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় স্বরিত স্বরের অনুরূপ এক প্রকার tonic accent ছিল; তাহাকে circumflex accent বলা হইত। আধুনিক গ্রীকভাষায় বা অন্য কোনও আর্য্য ভাষায় বেদের স্বরের ন্যায় সুর বা tone নাই। আমেরিকার আদিম নিবাসিগণের ভাষায় ও চীনদেশের ভাষায় এখনও এই সুর বা pitch-accent আছে। আধুনিক আর্য্য ভাষাসমূহে stress-accent বা অক্ষর-যতি আছে। যেমন ইংরাজী cònduct (noun) ও condùct (verb)। বাঙ্গালাতে এই অক্ষর-যতি আছে; যেমন,—আটা (ময়দা), আ'টা (গঁদ); কড়ি (shell), কড়ি (beam); ছোঁড়া (যুবক), ছোঁড়া (নিক্ষেপ করা); গান (গান করুন), গান (গীত); বিয়ে (বিবাহ), বিয়ে (B. A.); ইত্যাদি।

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রত্যেক ভাষায় পর্য্যায়ক্রমে স্বরের সুর ও অক্ষর-যতির অধিকার হয়। অর্থাৎ এককালে যে ভাষায় স্বরের সুরের প্রাধান্য থাকে, পরবর্ত্তিকালে সেই ভাষায় অক্ষর-যতির প্রাধান্য ঘটে। প্রাচীন গ্রীকভাষায় স্বরের সুর ছিল; তৎপরে তাহার স্থানে অক্ষর-যতি আসিয়াছে। ফরাসী ভাষায় অক্ষর-যতির পরিণামে কোনও কোনও সামান্য সুরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে, আদিম আর্য্যভাষায় (Primitive Indo-European) এককালে প্রবল অক্ষর-যতি ছিল; তৎপরে সুরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই সুর বৈদিক ভাষায় অক্ষতভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে।

যে ভাষায় সুরের ব্যবহার হয়, সে ভাষায় অক্ষরের লোপ সহজে হয় না; কিন্তু যতিপ্রধান ভাষায় যতি-বিশিষ্ট অক্ষর ব্যতীত অন্য অক্ষর বহু স্থলে লোপ পায়। এই জন্য প্রাচীন গ্রীক ভাষায় যেরূপ শব্দসমূহ অক্ষতদেহে সংরক্ষিত থাকিত, লাটিন ভাষায় তাহা হয় নাই।

এই স্থানে প্রাচীন ভাষায় স্বর আলোচনার ইতিহাসের একটু আভাস দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জেকব গ্রীম (Jacob Grimm) তদীয় বিখ্যাত জর্ম্মান ব্যাকরণে যে বর্ণপরিবর্ত্তন-বিধি প্রণয়ন করেন, তাহাতে বহু ব্যতিক্রম ছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়,—গ্রীমের বর্ণপরিবর্ত্তন-বিধি অনুসারে আদি আর্য্যভাষায় প্রথম বর্ণ স্থানে গথিক ও ইংরাজী ভাষায়

দ্বিতীয় বর্ণ হয়, যেমন—সংস্কৃত 'ত্রয়ঃ'=গথিক 'থ্রেইস্'=ইং three ; সংস্কৃত 'তৃণ'=গথিক 'থোউর্নুস্'=ইং thorn ; সংস্কৃত 'পিতর্'=গথিক 'ফাদর্'=ইং father ; ইত্যাদি। গ্রীমের এই ঐতিহাসিক বিধি আবিষ্কারের পর, ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা আলোচনা চলিতে থাকে। তাঁহার বিধির অনেক ব্যতিরেক ছিল। সর্ব্বত্র সমভাবে তাঁহার বিধির প্রভাব দেখা যায় নাই। নানা পণ্ডিতের আলোচনায় ক্রমে ক্রমে এই সকল ব্যতিরেকের কারণ নির্ণয় হইয়া যায়। তাহার মধ্যে স্বরপ্রভাব এক প্রকার ব্যতিরেকের কারণ বলিয়া আবিষ্কৃত হয়। এই বিধি বা উপবিধির আবিষ্কর্ত্তা বর্ণর (Verner)। ইনি দেখিলেন যে, মূল আর্য্যভাষার শব্দে যে সকল স্পর্শবর্ণের পূর্ব্বস্বর স্বরবান্ ছিল, সেই সকল স্পর্শবর্ণই (ক, ত, প) গ্রীমের বিধির প্রভাবের অধীন, অর্থাৎ সেই সকল স্থলেই গ্রীমের বিধি অনুসারে প্রথম বর্ণ স্থানে দ্বিতীয় বর্ণ ও দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ ও তৃতীয় বর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ হয়। এই জন্য সংস্কৃত 'পিতা'= গথিক fadar, কিন্তু সংস্কৃত 'ভ্রাতা'=(brother). প্রথম উদাহরণে স্বরপ্রভাবে 'ত' স্থানে 'দ' ও দ্বিতীয় উদাহরণে পূর্ব্বস্বর প্রভাবে 'ত' স্থানে 'থ' হইয়াছে।

স্বরিত স্বর

স্বরিত স্বরের প্রকৃতি লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। ঋক্-প্রাতিশাখ্যের মতে স্বরিতের আশ্রয়-স্বরূপ অক্ষরের প্রথমার্দ্ধ উদাত্ততর অর্থাৎ উদাত্তস্বর অপেক্ষাও উচ্চ, এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ অনুদাত্ত। অন্য প্রাতিশাখ্যের মতে প্রথমার্দ্ধ উদাত্ত ও দ্বিতীয়ার্দ্ধ অনুদাত্ত ; উভয়ের সমাহার বা একত্র মিলনে স্বরিত স্বর। অন্য কথায় বলিতে গেলে আশ্রয়াক্ষরের মাত্রা যদি এক হয়, তবে প্রথম অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত (বা ঋক্প্রাতিশাখ্যে উদাত্ততর), এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধমাত্রা অনুদাত্ত। অক্ষর দ্বিমাত্র বা ত্রিমাত্র হইলেও বিশ্লেষণে সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। সুতরাং স্বরিত স্বরকে স্বাধীন স্বর বলা যায় না। উদাত্ত ও অনুদাত্তের একত্র সমাবেশেই সাধারণতঃ স্বরিতের উৎপত্তি। উৎপত্তির ক্রম অনুসারে স্বরিত স্বর চতুর্ব্বিধ :—ক্ষৈপ্র, জাত্য বা নিত্য, প্রশ্লিষ্ট ও অভিনিহিত।

১। উদাত্ত স্বরবিশিষ্ট ই ঈ বা উ ঊ স্থানে সন্ধিতে য বা ব হইলে উদাত্ত ও অনুদাত্তের একত্র সমাবেশে **ক্ষৈপ্র স্বরিত** উৎপন্ন হয়। বি+আপ্ত=ব্যাপ্ত ; অপ্সু+অন্তর্=অপ্স্বন্তর্।

২। যদি ঐ প্রকার সন্ধিতে উৎপন্ন য বা ব কোনও শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়, অর্থাৎ সন্ধি যদি নিত্য সন্ধি হয়, তাহা হইলে উদাত্ত ও অনুদাত্তের একত্র সমাবেশে জাত স্বরিতকে **'জাত্য'** বা **'নিত্য'** স্বরিত বলা হয়। ক্ব (কুঅ), স্বর্ (সুঅর্), ন্যক্ (নিঅক্), বুধ্ন্য (বুধ্নিঅ), কন্যা (কনিআ), নদ্যঃ (নদীঅঃ), তন্বা (তনূআ)। এই সকল স্থলে সন্ধির বিচ্ছেদ হয় না। ছন্দোরক্ষার জন্য বেদের বহু স্থলে **ক্ষৈপ্র** ও **জাত্য** স্বরিতের উভয় অর্দ্ধেরই উচ্চারণ হয়।

৩। সন্ধিতে সবর্ণ পরে থাকিলে যখন পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তবান্ স্বরের দীর্ঘতা হয়, অথবা যখন সন্ধির ফল এ, ঐ, ও, ঔ হয়, তখন উদাত্ত ও অনুদাত্তের মিলনে জাত দীর্ঘস্বর বা সন্ধ্যক্ষরের স্বরিতকে '**প্রশ্লিষ্ট**' স্বরিত বলা হয়।

দিবি+ইব=দিবীব, সু+উদ্‌গাত্মা=সূদ্‌গাতা, ন+এব+অস্রীষাৎ=নৈবাস্রীষাৎ'।

৪। উদাত্তবান্ একার বা ওকারের পর যখন অনুদাত্ত অকারের লোপ হয়, তখন লোপের পর অবশিষ্ট একার বা ওকারের উদাত্তস্বর স্বরিতে পরিণত হয়। ইহাকে '**অভিনিহিত**' স্বরিত বলা হয়। তেঽব্রুবন্ (তে+অব্রুবন্), সোঽব্রবীৎ।

এই চতুর্বিধ স্বরিত '**স্বাধীন**' স্বরিত নামে বিদিত। আর এক প্রকার স্বরিত আছে; তাহাকে '**পরাধীন**' স্বরিত বলা যায়। উদাত্ত স্বরের পর উপর্যুপরি দুইটী অনুদাত্ত স্বর থাকিলে প্রথমটীর স্বরিত উচ্চারণ হয়। উদাত্ত স্বরের উচ্চারণের পর, অকস্মাৎ অনুদাত্ত স্বরে স্বর নামাইয়া ফেলা স্বভাবতঃ আয়াস-সাধ্য। তাই বোধ হয়, এই ব্যবস্থা। কিন্তু যদি উদাত্ত স্বরের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের পর পুনরায় উদাত্ত বা স্বাধীন স্বরিত থাকে, তবে মধ্যবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হয় না। আর যদি উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত স্বরের পর আর কোনও স্বরই না থাকে, তাহা হইলেও অনুদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হয়। তেন, তেচ। কিন্তু, তেন তে, তেন স্বর্।

স্বাধীন ও **অধীন** স্বরিতের প্রভেদ লক্ষ্য করা আবশ্যক। স্বাধীন স্বরিত শব্দস্থিত উদাত্ত স্বরের লোপ করিয়া তাহার স্থানে শব্দের প্রধান স্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ইহাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহার আভিজাত্য-মর্য্যাদা আছে। আর অধীন স্বরিত পদস্থিত উদাত্তের ছায়ামাত্র; সেই জন্য পরবর্ত্তী পদের আদিস্থিত অনুদাত্ত স্বরেও ইহার সত্তা পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন স্বরিতের বিনাশ নাই; কিন্তু অধীন স্বরিতের বিনাশ আছে। পরবর্ত্তী উদাত্ত স্বর বা স্বাধীন স্বরিতের প্রভাবে ইহার অস্তিত্ব মুছিয়া যায়। যেমন—তেন, কিন্তু তেন তে। অনেক বৈদিক গ্রন্থে স্বাধীন ও অধীন স্বরিত সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে চিহ্নিত হয়।

সন্ধি স্বর

সন্ধির নিয়ম অনুসারে যখন দুইটী স্বর একত্র হয়, তখন স্বরের প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হয়। (১) উদাত্তে উদাত্তে মিলিয়া উদাত্ত হয়। (২) অনুদাত্তে অনুদাত্তে মিলিয়া অনুদাত্ত হয়। (৩) স্বরিতে স্বরিতে মিলন অসম্ভব। (৪) স্বরিতের পর উদাত্ত থাকিলে উভয়ের মিলনে উদাত্ত হয়। এখানে স্বরিতের নিম্নাংশটী উড়িয়া যায়। (৫) অনুদাত্তের পর উদাত্ত থাকিলে উভয়ে মিলিয়া উদাত্ত হয়। এক অক্ষরের সীমানার মধ্যে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে আরোহণ রীতি-বিরুদ্ধ, ঊর্দ্ধ হইতে অবরোহণ স্বাভাবিক। (৬) উদাত্তের পর অনুদাত্ত থাকিলে হওয়া উচিত স্বরিত। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই উদাত্ত হয়। উদাহরণ—(১) ন+অভয়ঃ=নাভয়ঃ

(৪) ক্ব+ইৎ=ক্বেৎ। (৫) তব+ইৎ=তবেৎ। (৬) পিতা+ইব=পিতেব; দিবি+ইব=দিবীব।

(৭) ই বা উ স্থানে য বা ব হইলে উদাত্ত ও অনুদাত্তের মিলনে স্বরিত হয়। বি+আনট্=ব্যানট্; সু+ইষ্টঃ=স্বিষ্টঃ, বি+উষ্টিঃ=ব্যুষ্টিঃ, (তনু+অঃ=) তন্বঃ।

(৮) উদাত্তবান্ অকারের লোপ হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী এ বা ওকারে উদাত্ত স্বর অপসারিত হয়। সূনবে+অগ্নে=সূনবেঽগ্নে; যো+অবসঃ=যোঽবসঃ। (৯) অনুদাত্ত অকারের লোপে পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্ত স্বর স্বরিত হয়। সো+অধমঃ=সোঽধমঃ।

বাক্যস্বর বা SENTENCE ACCENT.

সাধারণ নিয়মে প্রত্যেক শব্দ বা পদে একটীমাত্র প্রধান স্বর। সাধারণতঃ সেটী উদাত্ত বা স্বাধীন স্বরিত। কিন্তু এই সকল পদ লইয়া যখন বাক্য গঠিত হয়, তখন ইহাদের স্বরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কোনও কোনও পদের স্বর লোপ পায়, আর কোনও কোনও পদের স্বর স্থানান্তরিত হয়। আবার কোনও কোনও স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তের প্রভাবে পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হয়। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থল উল্লেখযোগ্য।

১। সম্বোধন পদ বাক্যারম্ভে না থাকিলে তাহার সুর থাকে না।

২। প্রধান বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যারম্ভে না থাকিলে সুরবিহীন।

৩। কতকগুলি শব্দ স্বভাবতঃই স্বরবিহীন :—

(ক) চ, বা, উ, স্ম, ইব, চিদ্, স্বিদ্, হ, কম্, ঘ, ভল, সমহ, ঈম্, সীম্, পদান্তে যথা (ইবার্থে) প্রভৃতি কতিপয় অব্যয়ের সুর নাই।

(খ) মা, মে, ত্বা, তে, নৌ, নঃ, বাম্, বঃ, এন—, ত্ব—, সম প্রভৃতি কতিপয় সর্ব্বনাম।

(গ) 'ইদম্' শব্দ কখনও কখনও স্বরবান্, কখনও কখনও স্বরহীন। অস্য জন্মনি; কিন্তু অস্যা উষসঃ।

(ঘ) হি পরে পূর্ব্ববর্ত্তী 'ন' শব্দে স্বর থাকে না—উভয় শব্দ মিলিয়া এক শব্দ হয়। ন হি ত্বা ঈষতঃ (ঋ° ১।১০।৮)। এইরূপ 'নু' শব্দের সহযোগে—ননু। অন্য 'ন' শব্দ উদাত্তবান্।

৪। কতকগুলি শব্দে দুইটী করিয়া স্বর :—

(ক) কতকগুলি দ্বিবচন দ্বন্দ্ব সমাসের উভয় শব্দ দ্বিবচনান্ত ও স্বরবান্। মিত্রাবরুণা, দ্যাবাপৃথিবী। আরও কতিপয় বৈদিক সমাসে দুই স্বর—বৃহস্পতি, তনূনপাৎ। পুনরায় প্রত্যয়যোগে বা সমাসে এই সকল শব্দের কলেবর বর্দ্ধিত হইলেও দুই দুইটী স্বরই থাকে। দ্যাবাপৃথিবী বন্তু, বৃহস্পতিপ্রসূতঃ।

(খ) '—তবৈ' যুক্ত অসমাপিকা (নিমিত্তার্থক) ক্রিয়ার দুই স্বর। এতবৈ, অপভর্তবৈ।

(গ) অন্তা অনুদাত্ত স্বরের প্লুতত্ব প্রাপ্তি হইলে তাহা যখন উদাত্ত হয়, তখন একপদে দুই স্বর হয়। অ গ্নৈ ৩ পত্নী বাঃ ৩ সোমং পিব।

(ঘ) ব্রাহ্মণাদিতে প্রযুক্ত 'বা ব' এই অব্যয় দ্বি-স্বর-বিশিষ্ট।

(ঙ) কতিপয় সংখ্যাবাচক শব্দ একাধিক স্বর-বিশিষ্ট। একচত্বারিংশৎ।

এই স্থলে **সম্বোধন পদে** স্বরের প্রকৃতি লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

১। বাক্যাদিতে ব্যবহার না হইলে সম্বোধন পদের স্বর নাই। সম্বোধনের প্রথম অক্ষরে উদাত্ত স্বর।

২। য বা ব-কারের যখন বিশ্লেষিত উচ্চারণ হয়, তখন বিশ্লেষিত স্বরদ্বয়ের প্রথমটীতে উদাত্ত স্বর হয়; আর য বা ব-কারের সমগ্র উচ্চারণ হইলে স্বরিত স্বর হয়। দ্যৌঃ (দি ঔঃ) দ্ব্যক্ষর পদ; কিন্তু 'দ্যৌঃ' একাক্ষর পদ।

৩। বৈদিক স্বর-প্রক্রিয়ার জন্য ছন্দের 'পাদ' বা 'চরণ' বাক্য-স্থানীয়। পাদের আদিস্থিত সম্বোধন পদ, বাক্যাদিস্থিত সম্বোধন পদের ন্যায় প্রথম অক্ষরে স্বর প্রাপ্ত হয়। অগ্নে যং যজ্ঞং পরিভূর্ অসি ('হে অগ্নি! তুমি যে যজ্ঞকে রক্ষা করিতেছ' ঋ°); উপ ত্বাগ্ন এ মসি ('হে অগ্নি! আমরা তোমার নিকটে আসিলাম')।

৪। সম্বোধন পদের বিশেষণ, বা তাহার সহিত উদ্দেশ্য-বিধেয়-সম্পর্কে সম্পর্কবান্ বিশেষ্য শব্দ, বা ষষ্ঠ্যন্ত সম্বন্ধপদ, ঐ সম্বোধন পদের সহিত মিলিয়া (স্বর-প্রকরণের জন্য) এক পদের ন্যায় হইয়া যায়। অর্থাৎ ইহাদের প্রথম অক্ষরে স্বর থাকে। ইন্দ্র ভ্রাতঃ (হে ভ্রাতঃ ইন্দ্র!), রাজন্ সোম (হে সোম রাজা!), উর্জো নপাৎ সহস্বন্ (হে শক্তির শক্তিমান্ পুত্র!), তাবশ্বিনা ভদ্রহস্তা সুপাণী (তো শোভন ও মঙ্গলহস্তবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়!)।

৫। আবার বাক্যাদিতে পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধন পদ থাকিলে, তাহাদের প্রত্যেকেই স্বরবান্ হইবে। তাহাদের বিশেষণ পদ-সমূহে কোনও স্বর থাকিবে না। পিতর্ মাতঃ (হে পিতঃ! হে মাতঃ!), অগ্ন ইন্দ্র বরুণ মিত্র দেবাঃ (হে অগ্নি, হে ইন্দ্র, হে বরুণ, হে মিত্র, হে দেবগণ)।

৬। বাক্যাদি বা বাক্যমধ্যে সম্বোধন পদ থাকায় বাক্যস্থিত অন্যান্য পদের স্বরে কোনও প্রকার প্রভাব বর্ত্তে না। দেবা জীবত (অথ° ১৯।৭০।১)।

অতঃপর (ক) **অসমাপিকা ক্রিয়াস্থ** স্বরের কথা।

১। বাক্যাদিতে অবস্থিত না হইলে প্রধান বাক্যের (Principal Clause এর) সমাপিকা ক্রিয়ার কোনও স্বর নাই। এ ক্ষেত্রে পাদ বা চরণের আদিও বাক্যাদি বলিয়া গণ্য। স্বরহীন

সমাপিকা ক্রিয়া :—অগ্নিম্ ঈডে পুরোহিতম্ ; স ইদ্ দেবেষু গচ্ছতি ; অগ্নে সূপায়নো ভব ; ইন্দ্রমিত্র্ পৃথুহি সোমপ ; নমস্তে রুদ্র কৃণ্মঃ ; যজমানস্য পশূন্ পাহি।

২। এই কারণে দুইটী মাত্র স্থানে সমাপিকা ক্রিয়ার স্বর বজায় থাকে।

(ক) বাক্যাদি বা পাদাদিতে, এবং (খ) অধীন বাক্যে (in a subordinate clause.)

(ক) বাক্যাদি বা পাদাদিতে স-স্বর সমাপিকা ক্রিয়াপদ :—আপ্নোতীমং লোকম্ (তিনি ইহলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন) ; স্যামেদ্ ইন্দ্রস্য শর্মণি (যেন আমরা ইন্দ্রের রক্ষায় থাকি) ; দর্শয় মা যাতুধানান্ (আমাকে যাতুধানগুলোকে দেখাও)। গমদ্ বাজেভির্ আ স নঃ (তিনি যেন আমাদের নিকট অন্ন সহ আসেন)। এই সকল স্থানে পাদাদি ও বাক্যাদি অভিন্ন। কিন্তু নিম্নের উদাহরণে পাদ মধ্যে বাক্যারম্ভ :—তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্ (তাহা পান কর ও আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর) ; সস্তু মাতা সস্তু পিতা সস্তু শ্বা সস্তু বিশ্পতিঃ (মাতা সুপ্ত থাকুন, পিতা সুপ্ত থাকুন, কুকুর সুপ্ত থাকুক, বিশ্পতি সুপ্ত থাকুন) ; বিশ্বকর্মন্ নমস্তে পাহ্যস্মান্ (হে বিশ্বকর্মন্ ! তোমাকে নমস্কার ; আমাদিগকে রক্ষা কর)।

২। নিম্নের উদাহরণে বাক্যাদিতে ক্রিয়াপদ না থাকিলেও পাদাদিতে অবস্থিত হওয়ায়, স্বরবান্ হইয়াছে :—অধা তে অস্থমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্ (অতঃপর আমরা যেন তোমার ঘনিষ্ঠ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই) ; যাতুধানস্য সোমপ জহি প্রজাম্ (হে সোমপ ! তুমি যাতুধানের সন্তান নাশ কর)।

৩। বাক্যের স্বর সংস্থানের উপর সম্বোধন পদের কোনও প্রভাব না থাকায়, বাক্যাদি বা পাদাদিতে এক বা একাধিক সম্বোধন পদ থাকিলেও তৎপরবর্তী সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যাদি বা পাদাদিতে অবস্থিত বলিয়া গণ্য হয় এবং সেই জন্য স্বরবান্ হয়। আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবম্ (হে শ্রবণশীলকর্ণবিশিষ্ট ! আহ্বান শ্রবণ কর) ; সীতে বন্দামহে ত্বা (হে সীতে ! আমরা তোমায় বন্দনা করি) ; বিশ্বেদেবা বসবো রক্ষতেমম্ (হে বিশ্বেদেবগণ ! হে বসুগণ ! আপনারা ইহাকে রক্ষা করুন)।

৪। কোনও পদের পর তাহার সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট একাধিক ক্রিয়া থাকিলে, কেবলমাত্র প্রথম ক্রিয়াই স্বর-বিহীন হয় ; অন্য ক্রিয়া বা ক্রিয়াগুলিতে স্বর থাকে ; কারণ, সেরূপক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্রিয়াপদই পৃথক্ পৃথক্ অধীন বাক্যের (subordinate clause এর) আদি বলিয়া গণ্য হয়। তরণির্ ইজ্জয়তি ক্ষেতি পুষ্যতি (কৃতকার্য্য ব্যক্তিই জয়লাভ করে, শাসন করে ও উন্নতি লাভ করে) ; অস্মভ্যং জেষি যোৎসি চ (আমাদের জন্য জয়লাভ কর ও যুদ্ধ কর)।

৫। দুই ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট পদ উভয় ক্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত হইলে পরবর্তী ক্রিয়া অধীন বাক্যের আদি বলিয়া গণ্য হইয়া স্বরবান্ হয়।

জহি প্রজাম্ নয়স্ব চ (সন্তানকে বিনাশ কর ও এখানে আনয়ন কর); শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা (সুভগা যেন আমাদিগের (কথা) শ্রবণ করেন এবং মেহচক্ষে দেখেন)।

৬। এই প্রকারে সাধারণ নিয়ম হইয়া পড়িয়াছে যে, একটি সমাপিকা ক্রিয়ার পর যে সকল ক্রিয়া থাকিবে, তাহারা সকলেই স্বরবান্ হইবে।

স য এতম্ এবম্ উপাস্তে পূর্যতে প্রজয়া পশুভিঃ (যে ইঁহার এই প্রকারে উপাসনা করে, সে পশু ও প্রজায় পূর্ণ হয়)।

(খ) অধীন বাক্য বা অসমগ্র বাক্য

১। যৎ-শব্দ বা যৎ-শব্দের অর্থবিশিষ্ট কোনও শব্দ অথবা সেই প্রকার কোনও শব্দ হইতে নিষ্পন্ন শব্দ যে বাক্যে থাকে, তাহাই সাধারণতঃ অধীন বাক্য বলিয়া পরিগণিত। অধীন বাক্যের ক্রিয়াপদ যে স্থানেই অবস্থিত হউক-না-কেন, স্বরবান্ হইবে। যং যজ্ঞং পরিভূর্ অসি (যে যজ্ঞকে তুমি রক্ষা করিতেছ) সহ যন্ মে অস্তি তেন (যাহা আমার আছে, তাহার সহিত); যত্র নঃ পূর্বে পিতরঃ পরে যুঃ (যেখানে আমাদের পিতৃগণ গিয়াছেন); অদ্যা মুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি (যদি আমি যাতুধান হই, তাহা হইলে যেন এক্ষণেই মরি); যথাহান্য অনুপূর্বং ভবন্তি (যেমন একের পর এক দিন আসে); যাবদ্ ইদং ভুবনং বিশ্বম্ অস্তি (এই সমগ্র ভুবন যত বড়); যৎকামাস্ তে জুহুমস্ তন্ নো অস্তু (যাহা কামনা করিয়া তোমায় হোম করি, তাহা আমাদের হউক); যতমস্ তিতৃপ্সাৎ (যেটীতে কামনার তৃপ্তি হয়)।

২। যৎ শব্দের প্রয়োগ থাকিলেই ক্রিয়াপদ স্বরবান্ হয় না; কেবলমাত্র অধীন বাক্যে অন্বিত সমাপিকা ক্রিয়াই স্বরবান্। অপ ত্যে তায়বো যথা যন্তি (তাহারা চোরের ন্যায় পলাইতেছে); যথাকামং নি পদ্যতে (সে ইচ্ছাসুখে শুইয়া আছে)।

৩। 'যদি' অর্থ বুঝাইলে 'চ' ও 'চেৎ' এই দুই অব্যয়ের যোগে ক্রিয়াপদ স্বরবান্ হয়। ব্রহ্মা চেদ্ হস্তম্ অগ্রহীৎ (যদি একজন ব্রাহ্মণ (রমণীর) হস্ত ধারণ করিয়াছেন); ত্বং চ সোম নো বশো জীবাতুম্ ন মরামহে (হে সোম! তুমি যদি আমাদিগকে বাঁচাইতে চাও, তবে আমরা মরিব না); আ চ গচ্ছান্ মিত্রম্ এনা দধাম (যদি তাহারা আসে, তবে আমরা তাহাকে মিত্র করিব)।

৪। কোনও অব্যয় বা যৎ শব্দাদি না থাকিলেও স্বায়তঃ সম্পর্কবিশিষ্ট গদ্যাংশের অধীন বাক্যের ক্রিয়া স্বরবান্ হয়। সম্ অশ্ব পর্ণাশ্ চরন্তি নো নরোঽস্মাকম্ ইন্দ্র রথিনো জয়ন্তু (যখন অশ্বের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট আমাদের নরগণ (যুদ্ধে) যান, তখন, হে ইন্দ্র! আমাদের রথিগণ যেন জয়লাভ করেন); তূয়ম্ আ গহি কণ্বেষু সু সচা পিব (শীঘ্র আইস, কণ্বদিগের সহিত সোম পান কর)।

৫। 'যেহেতু' অর্থবাচক 'হি' 'নহি' প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় পদের যোগে সামান্য একটু অধীনতার ভাব বুঝাইতে ক্রিয়াপদ স্বরবান্ হয়। বি তে মুঞ্চন্তাং বিমুচো হি সন্তি (তাঁহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিউন, যেহেতু তাঁহারাই মুক্তিদাতা); নেৎ ত্বা তপাতি সূর্যো অর্চিষা (সূর্য্য যেন রশ্মি দ্বারা তোমায় তাপিত না করেন); বিরাজং নেদ্ বিচ্ছিনদানীতি ('আমি যেন বিরাজকে ছিন্ন না করি'—এই বলিয়া) উক্থেভিঃ কুবিদ্ আগমৎ? (আমাদের স্তবের জন্য কি তিনি আসিবেন?)।

(গ) বিরোধী বাক্য

১। পরস্পর বিরোধী বাক্যে অনেক সময় প্রথম ক্রিয়াই স্বরযুক্ত হয়। এই প্রকার বাক্যে 'অন্য—অন্য,' 'বা—বা,' 'এক—এক,' 'চ—চ' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ হয়। প্র প্রান্যে যন্তি পর্যন্য আসতে (কেহ কেহ যেমন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, অন্য কেহ কেহ তেমনই বসিয়া আছে); উদ্ বা সিঞ্চধ্বম্ উপ বা পৃণধ্বম্ (হয় সেচন করিয়া ফেলিয়া দাও, না হয় পূর্ণ করিয়া ফেল); সং চে ধ্যস্বাগ্নে প্র চ বর্দ্ধয়েমম্ (তুমি নিজেই প্রজ্বলিত হও, হে অগ্নি! এবং ইহাকে বর্দ্ধিত কর)। 'অন্য—অন্য,' 'বা—বা' প্রভৃতির প্রয়োগ ব্যতিরেকেও বিরোধিতা প্রকাশ পায়। প্রাজাতাঃ প্রজা জনয়তি পরি প্রজাতা গৃহ্ণাতি (তিনি অজাত প্রজার জন্মদান করেন, জাত প্রজাকে পরিগ্রহণ করেন, অর্থাৎ আলিঙ্গন করেন, বুকে করেন); অপ যূয়দ্ অক্রমীন্ নাস্মান্ উপাবর্ততে (যদিও সেই রমণী তোমাদের নিকট হইতে অপগত হইয়াছে, তথাপি সে আমাদের নিকটে আইসে নাই); নাধ্বর্যুর্ভবতি ন যজ্ঞং রক্ষাংসি ঘ্নন্তি (অধ্বর্যু অন্ধ হয়েন না, রক্ষোগণ যজ্ঞনাশ করে না); কেম সোমা গৃহ্যন্তে কেন হূয়ন্তে (কে সোম গ্রহণ করে, অর্থাৎ নিষ্পেষণ করে? আর কেই বা হবন করে?)।

২। দুই বিরোধী বাক্যের এক ক্রিয়া হইলে, প্রায় দ্বিতীয় ক্রিয়া উহ্য থাকে। অগ্নিরমুষ্মিন্ লোক আসীদ্ যমোঽস্মিন্ (অগ্নি ঐ লোকে ছিলেন এবং যম এই লোকে ছিলেন); অহ্না ইন্দ্রঃ

প্রজাঃ প্রতিতিষ্ঠন্তি মাংসেনান্যাঃ (কোনও কোনও জীব অস্থির সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়, আর কোনও কোনও জীব মাংসের সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়) ; দ্বিপাচ্চ সর্ব্বং নো রক্ষ চতুষ্পাদ্ যচ্চ নঃ স্বম্ (আমাদের দ্বিপদ যাহা আছে, তাহা রক্ষা কর, এবং চতুষ্পাদ যাহা আমাদের, তাহা রক্ষা কর)।

৩। কিল, অঙ্গ, এব, হন্ত, চন প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় যোগেও (সম্ভবতঃ মুখ্যার্থবোধে for the sake of emphasis) ক্রিয়াপদ স্বরযুক্ত হয়। হন্তে মাং পৃথিবীং বিভজামহৈ (এস, আমরা এই পৃথিবী ভাগ করিয়া লই)।

৪। বিরোধী বাক্যদ্বয়ের প্রথম ক্রিয়ার স্বর ব্রাহ্মণের যুগে অকাট্য বিধি ; কিন্তু মন্ত্রযুগে ইহার ব্যতিক্রমও হইত। অভি দ্যাম্ মহিনা ভুবম্ অভী মাং পৃথিবীং মহীম্ (আমি মহান্ দ্যুলোক বা আকাশ অপেক্ষা মহান্, এবং এই মহতী পৃথিবী অপেক্ষাও মহান্—ঋ°) ; ইন্দ্রো বিদুর অঙ্গিরসশ্চ ঘোরাঃ (ইন্দ্র জানেন এবং ঘোর অঙ্গিরোগণ জানেন—ঋ°)।

(ঘ) ক্রিয়াপদ ও উপসর্গ

১। বেদের ভাষায় উপসর্গসমূহ সাধারণতঃ স্বাধীনভাবে ও ক্রিয়াপদ হইতে দূরে প্রযুক্ত হইত ; ব্রাহ্মণের যুগে উপসর্গের স্বাধীনতা কিঞ্চিৎপরিমাণে খর্ব্ব হয়, এবং সর্ব্বশেষে অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে ক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত উপসর্গের ব্যবহার হয় না। সুতরাং বেদের ভাষায় যাবতীয় স্বাধীন উপসর্গই স্বরযুক্ত হইত।

২। ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল উপসর্গের প্রয়োগ হইত, সেইখানেই উপসর্গের স্বর থাকিবে কি না বিবেচ্য, নতুবা অন্যত্র উপসর্গ ও ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ পদ।

৩। যে সকল ক্রিয়ার স্বর থাকিত না, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উপসর্গের স্বর থাকিত। একাধিক উপসর্গ ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে কেবলমাত্র অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উপসর্গেরই স্বর বজায় থাকিত ; অন্যগুলির স্বর থাকিত না।

৪। ক্রিয়াপদ স্বরযুক্ত হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী উপসর্গসমূহের স্বর থাকে না।

পরে হি নারি পুনরেহি ক্ষিপ্রম্ (দূর হও নারি! আবার শীঘ্র ফিরিয়া আইস—অথ°) ; অথাস্তং বিপরেতন (অতঃপর তোমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গৃহে গমন কর—ঋ°) ; সমাচিনুষ্বানু সম্প্রযাহি (প্রথমে একত্র হও, পরে যাও—অথ°) ; যদ্ গৃহানুপোদৈতি (যেন সে গৃহ পর্য্যন্ত গমন করে—অথ°) ; এবা চ ত্বং সরম আজগন্থ (এইরূপে হে সরমে, তুমি এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছ—ঋ°) ; যে না বিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাপঃ (যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া তুমি জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে—ঋ°)।

৫। অধীন বাক্যে উপসর্গ সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের অঙ্গীভূত হয় ও আপনার স্বর হারায়।

৬। কৃদন্তের সহিত যোগ হইলে উপসর্গ তাহার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে এবং আপনার স্বর হারায়। ক্ত-প্রত্যয়ান্ত কৃদন্তের পূর্ব্বে কখনও কখনও উপসর্গের স্বর বজায় থাকে। পরেত (স্বর্গত), অন্তর্হিত অব-পন্ন, সম্-পূর্ণ, নি-চিত, নিষ্কৃত, প্রশস্ত, নিষত্ত, অপক্রীত,—'-তু'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন নিমিত্তার্থক বা অন্য অসমাপিকা ক্রিয়ার (infinitive) সর্ব্ববিভক্তিতেই উপসর্গে স্বর থাকে। সং হর্তুম্ অপি-ধাতবে, অব-গন্তোঃ। চতুর্থীর '-তবৈ' যোগে উভয়ত্র স্বর থাকে। অন্বেতবৈ, অপভর্তবৈ।

৭। নিম্নলিখিত অধীন বাক্যটীতে দুইটী উপসর্গ ক্রিয়াপদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বরবান্ হইয়াছে। এরূপ উদাহরণ বিরল। প্র যৎ স্তোতা···উপ গীর্ভি রীট্টে (ঋ° ৩।৫২ ৫) (স্তোতা যখন গানের দ্বারা স্তোত্র প্রেরণ করে)।

৮। নিম্নলিখিত বাক্যটীতে ছয়টীমাত্র পদ, তিনটী সম্বোধন, তিনটী সমাপিকা ক্রিয়া; সবগুলিই স্বরবান্। ইন্দ্র জীব, সূর্য জীব, দেবা জীবত (অথ° ১৯।৭০ ১)।

কোনও স্বরবিহীন পদ বাক্যাদিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। বেদের যুগে এইটী বাক্যবিন্যাসপ্রণালীর প্রবল বিধি ছিল। এই জন্য ইহার প্রভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অর্ব্বাচীন সংস্কৃতেও সংক্রমিত হইয়াছে। অবশ্য অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে স্বর নাই। সুতরাং সস্বর বা অস্বর পদও নাই। কিন্তু বেদে যে সকল শব্দ স্বরবিহীন ছিল, অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে তাহারা বাক্যাদিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সেই জন্য নিম্নলিখিত অব্যয় বা সর্ব্বনাম পদসমূহ বাক্যের প্রথম স্থানে প্রযুক্ত হয় না। চ, চেৎ *, মে, তে, মা, ত্বা, নঃ, বঃ, নৌ, বাম্, বা, ইব, চিৎ, হ, স্ম ইত্যাদি পদের বাক্যাদিতে স্থান নাই।

তিঙন্ত স্বর

তিঙন্ত স্বরের প্রথম লক্ষণ এই যে, বাক্যাদিতে অবস্থিত না হইলে প্রধান বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার স্বর থাকে না। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই ক্রিয়াপদে স্বর পাওয়া যায় না। যেখানে স্বর বজায় থাকিবে, সেখানে স্বরের যেরূপ প্রকৃতি হইবে, তাহাই এ স্থলে আলোচ্য।

সংস্কৃত ধাতুসমূহ দশগণে বিভক্ত। গণ অনুসারে স্বরস্থিতির বিভিন্নতা ঘটে বলিয়া, আমাদিগকে এস্থলে গণ অনুসারে স্বরের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তিঙন্ত পদ-সমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—প্রবল শ্রেণী (strong forms) ও অপ্রবল শ্রেণী (weak forms)। ধাতুর প্রবল রূপে ধাতু-স্বর বজায় থাকে এবং তাহার প্রভাবে সাধারণতঃ ধাতু-স্বরের গুণ হয়। ধাতুর অপ্রবল রূপে ধাতুর গুণ হয় না এবং প্রত্যয়-স্বর বজায় থাকে। চতুর্লকারে (লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙে)

---

* চ + ইৎ — চেৎ স্বরহীন ছিল না; তবে দুইটীর যোগে উৎপন্ন সন্ধিবদ্ধ।

নিম্নলিখিত প্রত্যয়-সমূহের পূর্ব্বে ধাতুর প্রবল রূপ হয়:—তি, সি, মি, তু, আনি, আব, আম, ঐ, আবহৈ, আমহৈ, দ্, স্, অম্,—এই তেরটী। পরোক্ষায় (লিট্) পরস্মৈপদের একবচনগুলি সমস্তই প্রবল। এই সকল বিভক্তিতে স্বর বা স্বর ধাতুতে অবস্থিত হয়, অন্যত্র প্রত্যয়ে স্বরের অবস্থিতি হয়। স্থানে স্থানে ইহার ব্যতিক্রমও হয়; ক্রমে ক্রমে তাহা লক্ষ্য করা যাইবে। লঙ্ ও লুঙ্ বিভক্তিতে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, আগমভূত অকারে স্বর অবস্থিত হয়; ইহার অন্যথা হয় না। কিন্তু যখন লঙ্ বা লুঙের আগম থাকে না, তখন স্বরের অবস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটে। প্রবল রূপ হইলে (দ্, স্, অম্) ধাতুতেই স্বর থাকে; অন্যত্র প্রত্যয়ে।

পাশ্চাত্য মত অনুসরণ করিয়া আমরা ধাতুর গণ-সমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিব। (১) যে সকল গণে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে (চতুর্থকারে) অকারের আগম হয় না; এবং (২) যে সকল গণে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে অকারের (বা যকারের) আগম হয়। এই বিভাগ-ক্রমে নিম্নে একটা তালিকা প্রস্তুত করিলাম। এই তালিকায় গণ অনুসারে স্বরের স্থান সূচিত হইল।

গণ অনুসারে স্বরপ্রকৃতি

ক। ১। ধাতু-গণ (২। অদাদিগণ)—ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগ—প্রবল রূপে ধাতু-স্বর ও তাহার গুণ; অপ্রবল রূপে প্রত্যয়-স্বর, ধাতু সংক্ষিপ্ত—লঙ্ বিভক্তিতে আগম-স্বর।

২। অভ্যস্ত-গণ (৩। জুহোত্যাদি)—ধাতু অভ্যস্ত—প্রবল রূপে ধাত্বংশে (ধাত্বক্ষরে বা অভ্যাসাক্ষরে) স্বর; তাহার প্রভাবে গুণ; অপ্রবল রূপে প্রত্যয় স্বর; স্বরাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর প্রথম অক্ষরে প্রত্যয়-স্বর প্রত্যাবর্ত্তন করে—লঙ্ বিভক্তিতে আগম-স্বর।

৩। অনুনাসিক-গণ (৭। রুধাদি)—ধাতুর মধ্যে অনুনাসিক বর্ণ, প্রবল রূপে অনুনাসিক বর্ণের প্রবলতা হয়, অর্থাৎ তাহার স্থানে অকারান্ত 'ন' হয় এবং সেই ন-কারে স্বর থাকে, অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর—লঙে আগম-স্বর।

৪। '-নু'-গণ (৫। স্বাদি)—নুকারের আগম, প্রবল রূপে নুকারের গুণ ও স্বরপ্রাপ্তি (নো), অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর—লঙে আগম-স্বর।

৫। '-উ'-গণ (৮। তনাদি)—নুগণের ন্যায়, উ-কারাগম এবং প্রবল রূপে উকারের গুণ ও স্বর প্রাপ্তি (ও), অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর—লঙে আগম-স্বর।

৬। '-না'-গণ (৯। ক্র্যাদি)—প্রবল রূপে স্বরবান্ 'না' আগম, অপ্রবল রূপে স্বরবিহীন 'নী' আগম ও প্রত্যয়-স্বর—লঙে আগম-স্বর।

খ। ১। অ-গণ (১। ভ্বাদি)—স্বরবিহীন অকার আগম, সর্ব্বত্র ধাতু-স্বর, সর্ব্বত্র ধাতুর গুণ—লঙে আগম-স্বর।

২। অ-গণ (৬। তুদাদি)—স্বরবান্ অকার আগম, সর্ব্বত্র অকারে স্বর—লঙে আগম-স্বর।

৩। য-গণ (৪। দিবাদি)—স্বরবিহীন য-কারের আগম, সর্ব্বত্র ধাতু স্বর, কিন্তু ধাতুর গুণ হয় না—লঙে আগম-স্বর।

৪। য-গণ (কর্ম ও ভাববাচ্য).—কর্ম ও ভাববাচ্যে স্বরবান্ য-কারের আগম হয়, অন্যত্র স্বরবিহীন য-গণের ন্যায় কার্য্য।

৫। কারণজ (causative) গণ বা ১০। চুরাদি-গণে '-অয়'-আগম হয়—লটে আগম স্বর।

লুঙ্—লুঙ্ বিভক্তিতে আগম-স্বর—আগমবিহীন হইলে প্রবল রূপে ধাতু-স্বর, অপ্রবল রূপে প্রত্যয়-স্বর—'স' (ষ) আগম হইলে, তাহাতেই স্বর বর্ত্তে।

লিট্—পরস্মৈপদের একবচন ভিন্ন সর্ব্বত্র প্রত্যয়-স্বর।

লৃট্—সর্ব্বত্র প্রত্যয়-স্বর, প্রত্যয়ের প্রথম অক্ষরে।

অতঃপর গণ অনুসারে এক একটী ধাতুর সমগ্র রূপ দিয়া স্বরস্থিতি লক্ষিত করিব।

ক। দুহ্ ধাতু, অদাদি বা ধাতুগণ

	পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
লট্	দোগ্ধি	ধোক্ষি	দোহ্মি	দুগ্ধে	ধুক্ষে	দুহে
	দুগ্ধঃ	দুগ্ধঃ	দুহ্বঃ	দুহাতে	দুহাথে	দুহ্বহে
	দুহন্তি	দুগ্ধ	দুহ্মঃ	দুহতে	ধুগ্ধ্বে	দুহ্মহে
লোট্	দোগ্ধু	দুগ্ধি	দোহানি	দুগ্ধাম্	ধুক্ষ্ব	দোহৈ
	দুগ্ধাম্	দুগ্ধম্	দোহাব	দুহাতাম্	দুহাথাম্	দোহাবহৈ
	দুহন্তু	দুগ্ধ	দোহাম	দুহতাম্	ধুগ্ধ্বম্	দোহামহৈ
লঙ্	অধোক্	অধোক্	অদোহম্	অদুগ্ধ	অদুগ্ধাঃ	অদুহি
	অদুগ্ধাম্	অদুগ্ধম্	অদুহ্ব	অদুহাতাম্	অদুহাথাম্	অদুহ্বহি
	অদুহন্	অদুগ্ধ	অদুহ্ম	অদুহত	অধুগ্ধ্বম্	অদুহ্মহি
লিঙ্	দুহ্যাৎ	দুহ্যাঃ	দুহ্যাম্	দুহীত	দুহীথাঃ	দুহীয়
	দুহ্যাতাম্	দুহ্যাতম্	দুহ্যাব	দুহীয়াতাম্	দুহীয়াথাম্	দুহীবহি
	দুহ্যুঃ	দুহ্যাত	দুহ্যাম	দুহীরন্	দুহীধ্বম্	দুহীমহি

শতৃ—দুহৎ, দ্বিষৎ, লিহৎ; স্ত্রীলিঙ্গে—দুহতী, দ্বিষতী, লিহতী
শানচ্—দুহান, দ্বিষাণ, লিহান; „ —দুহানা, দ্বিষাণা, লিহানা

হু ধাতু, অভ্যস্ত বা জুহোত্যাদিগণ

	পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
লট্	জুহোতি	জুহোষি	জুহোমি	জুহুতে	জুহুষে	জুহ্বে
	জুহুতঃ	জুহুথঃ	জুহুবঃ	জুহ্বাতে	জুহ্বাথে	জুহুবহে
	জুহ্বতি	জুহুথ	জুহুমঃ	জুহ্বতে	জুহুধ্বে	জুহুমহে
লোট্	জুহোতু	জুহুধি	জুহবানি	জুহুতাম্	জুহুষ	জুহবৈ
	জুহুতাম্	জুহুতম্	জুহবাব	জুহ্বাতাম্	জুহ্বাথাম্	জুহবাবহৈ
	জুহ্বতু	জুহুত	জুহবাম	জুহ্বতাম্	জুহুধ্বম্	জুহবামহৈ
লঙ্	অজুহোৎ	অজুহোঃ	অজুহবম্	অজুহুত	অজুহুথাঃ	অজুহ্বি
	অজুহুতাম্	অজুহুতম্	অজুহুব	অজুহ্বাতাম্	অজুহ্বাথাম্	অজুহুবহি
	অজুহবুঃ	অজুহুত	অজুহুম	অজুহ্বত	অজুহুধ্বম্	অজুহুমহি
লিঙ্	জুহুয়াৎ	জুহুয়াঃ	জুহুয়াম্	জুহ্বীত	জুহ্বীথাঃ	জুহ্বীয়
	জুহুয়াতাম্	জুহুয়াতম্	জুহুয়াব	জুহ্বীয়াতাম্	জুহ্বীয়াথাম্	জুহ্বীবহি
	জুহুয়ুঃ	জুহুয়াত	জুহুয়াম	জুহ্বীরন্	জুহ্বীধ্বম্	জুহ্বীমহি

হু, ভী, হ্রী, জন্, ধন, চি, যু ধাতুর ধাত্বক্ষরে স্বর; কিন্তু অন্যান্য ধাতুর অভ্যস্ত ভাগের প্রথমার্দ্ধে স্বর থাকে। স্বরাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে সর্ব্বত্র প্রথমাক্ষরে স্বর বর্ত্তে।

লট্	বিভর্ত্তি	বিভর্ষি	বিভর্মি	বিভৃতে	বিভৃষে	বিভ্রে
	বিভৃতঃ	বিভৃথঃ	বিভৃবঃ	বিভ্রাতে	বিভ্রাথে	বিভৃবহে
	বিভ্রতি	বিভৃথ	বিভৃমঃ	বিভ্রতে	বিভৃধ্বে	বিভৃমহে

শতৃ-শানচ্—জুহ্বৎ, জুহ্বতী; বিভ্রৎ, বিভ্রতী; জুহ্বান, বিভ্রাণ।

যুজ্ ধাতু, অনুনাসিক বা রুধাদিগণ

	পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
লট্	যুনক্তি	যুনক্ষি	যুনজ্মি	যুঙ্ক্তে	যুঙ্ক্ষে	যুঞ্জে
	যুঙ্ক্তঃ	যুঙ্ক্থঃ	যুঞ্জ্বঃ	যুঞ্জাতে	যুঞ্জাথে	যুঞ্জ্বহে
	যুঞ্জন্তি	যুঙ্ক্থ	যুঞ্জ্মঃ	যুঞ্জতে	যুঙ্গ্ধ্বে	যুঞ্জ্মহে
লোট্	যুনক্তু	যুঙ্গ্ধি	যুনজানি	যুঙ্ক্তাম্	যুঙ্ক্ষ্ব	যুনজৈ
	যুঙ্ক্তাম্	যুঙ্ক্তম্	যুনজাব	যুঞ্জাতাম্	যুঞ্জাথাম্	যুনজাবহৈ
	যুঞ্জন্তু	যুঙ্ক্ত	যুনজাম	যুঞ্জতাম্	যুঙ্গ্ধ্বম্	যুনজামহৈ
লঙ্	অযুনক্	অযুনক্	অযুনজম্	অযুঙ্ক্ত	অযুঙ্ক্থাঃ	অযুঞ্জি
	অযুঙ্ক্তাম্	অযুঙ্ক্তম্	অযুঞ্জ্ব	অযুঞ্জাতাম্	অযুঞ্জাথাম্	অযুঞ্জ্বহি
	অযুঞ্জন্	অযুঙ্ক্ত	অযুঞ্জ্ম	অযুঞ্জত	অযুঙ্গ্ধ্বম্	অযুঞ্জ্মহি
লিঙ্	যুঞ্জ্যাৎ	যুঞ্জ্যাঃ	যুঞ্জ্যাম্	যুঞ্জীত	যুঞ্জীথাঃ	যুঞ্জীয়
	যুঞ্জ্যাতাম্	যুঞ্জ্যাতম্	যুঞ্জ্যাব	যুঞ্জীয়াতাম্	যুঞ্জীয়াথাম্	যুঞ্জীবহি
	যুঞ্জ্যুঃ	যুঞ্জ্যাত	যুঞ্জ্যাম	যুঞ্জীরন্	যুঞ্জীধ্বম্	যুঞ্জীমহি

শতৃ শানচ্—যুঞ্জন্, যুঞ্জতী, যুঞ্জান্।

'সু' (স্বাদি) ও 'উ' (তনাদি) গণ

লট্	সুনোতি	সুনোষি	সুনোমি	সুনুতে	সুনুষে	সুন্বে
	সুনুতঃ	সুনুথঃ	সুনুবঃ, সুন্বঃ	সুন্বাতে	সুন্বাথে	সুনুবহে, সুন্বহে
	সুন্বন্তি	সুনুথ	সুনুমঃ, সুন্মঃ	সুন্বতে	সুনুধ্বে	সুনুমহে, সুন্মহে
লোট্	সুনোতু	সুনু [কৃণুহি]	সুনবানি	সুনুতাম্	সুনুষ্ব	সুনবৈ
	সুনুতাম্	সুনুতম্	সুনবাব	সুন্বাতাম্	সুন্বাথাম্	সুনবাবহৈ
	সুন্বন্তু	সুনুত	সুনবাম	সুন্বতাম্	সুনুধ্বম্	সুনবামহৈ

লঙ্ ও লিঙের রূপ দিলাম না ; কারণ, উভয় বিভক্তিতেই স্বরস্থিতি নির্দ্দিষ্ট। লঙে আগম-স্বর (অসুনোৎ) এবং লিঙে প্রত্যয়-স্বর (সুনুয়াৎ, সুন্বীত)। তনাদিগণ ও স্বাদিগণে স্বর-স্থিতির কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। সুতরাং তনাদি ধাতুর রূপ দিলাম না।

শতৃ-শানচ্—সুন্বৎ (সুন্বতী), তন্বৎ (তন্বতী), আপ্নুবৎ (আপ্নুবতী), সুন্বান, তন্বান, আপ্নুবান।

ক্রী ধাতু, ক্র্যাদি বা 'না'-গণ

	পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
লট্	ক্রীণাতি	ক্রীণাসি	ক্রীণামি	ক্রীণীতে	ক্রীণীষে	ক্রীণে
	ক্রীণীতঃ	ক্রীণীথঃ	ক্রীণীবঃ	ক্রীণাতে	ক্রীণাথে	ক্রীণীবহে
	ক্রীণন্তি	ক্রীণীথ	ক্রীণীমঃ	ক্রীণতে	ক্রীণীধ্বে	ক্রীণীমহে
লোট্	ক্রীণাতু	ক্রীণীহি [গৃহাণ]	ক্রীণানি	ক্রীণীতাম্	ক্রীণীষ্ব	ক্রীণৈ
	ক্রীণীতাম্	ক্রীণীতম্	ক্রীণাব	ক্রীণাতাম্	ক্রীণাথাম্	ক্রীণাবহৈ
	ক্রীণন্তু	ক্রীণীত	ক্রীণাম	ক্রীণতাম্	ক্রীণীধ্বম্	ক্রীণামহৈ

লঙ্ লিঙের রূপ দিলাম না ; কারণ, স্বরস্থিতির বৈচিত্র্য নাই।

শতৃ-শানচ্—ক্রীণৎ, ক্রীণতী, ক্রীণান।

খ। অকার বা য-কারাগ-বিশিষ্ট গণ-সমূহ। ভ্বাদি, তুদাদি, দিবাদি ও কর্ম্মবাচ্য গণ। এই সকল গণে স্বরস্থিতির বৈচিত্র্য নাই। স্বরস্থিতি এই সকল গণে নির্দ্দিষ্ট ; কোনও ব্যতিক্রম নাই। ভ্বাদি ও দিবাদি গণে ধাতু-স্বর ; বৈশিষ্ট্য এই যে, ভ্বাদি গণে সর্ব্বত্র ধাতুর গুণ হয়, দিবাদি গণে হয় না ; যেমন ভবতি, দীব্যতি। তুদাদি ও কর্ম্মবাচ্য গণে সর্ব্বত্র অ বা য আগমে স্বরস্থিতি ; ধাতুর গুণ নাই। তুদতি, ক্রিয়তে। এই সকল গণেও লঙে আগম স্বর ; অভবৎ, অদীব্যৎ, অতুদৎ, অক্রিয়ত।

শতৃ-শানচ্—ভবৎ (ভবন্তী), ভবমান ; দীব্যৎ (দীব্যন্তী), দীব্যমান ; তুদৎ (তুদন্তী, তুদতী), তুদমান, ক্রিয়মাণ, (ক্রিয়মাণা)।

গ। চুরাদিগণেরও নির্দ্দিষ্ট স্বরস্থিতি, যথা—চোরয়তি, চিন্তয়তি ; এবং লঙে আগম-স্বর, যথা—অচোরয়ৎ, অচিন্তয়ৎ।

স্বরাদি প্রত্যয় থাকিলে ধাতুর আদিতে স্বরস্থিতি হয়। লোটের উত্তম পুরুষে হু প্রভৃতি ধাতুর দ্বিতীয়াক্ষরে স্বরস্থিতি, কিন্তু অন্ত ধাতুসমূহে প্রথমাক্ষরে। স্তু ধাতু পাণিনির মতে হু প্রভৃতি ধাতুর সহিত গণিত হইলেও এটী ঋগ্বেদাদিতে অন্তরূপ ছিল, অর্থাৎ প্রথমাক্ষরে উদাত্ত স্বর বহন করিত। পরে অন্তরূপ হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে এই গণীয় ধাতুর স্বর নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, স্বরলিপিযুক্ত বেদগ্রন্থের যে সকল পুথি পাওয়া যায়, তাহাতে কোনও একটা শৃঙ্খলা পাওয়া যায় না। আর তাহার উপর অসুবিধা এই যে, অধিকাংশ স্থলেই ক্রিয়াপদে স্বর থাকে না।

৩। জোষি (√ জুষ্), ধক্ষি, পর্ষি (√ পৃ গতৌ), শেষি (√ শি শাসনে), জেষি, দর্ষি, নেষি, মৎসি, যক্ষি, যংসি, সোৎসি, বক্ষি (√ বহ্), বেষি, শ্রোষি প্রভৃতি কতকগুলি লঙ্ বা লুঙের মধ্যম পুরুষ এক বচনের রূপ পাওয়া যায়। অর্থের হিসাবে ইহারা লোটের স্থানীয়।

৪। অডাগম-বিহীন লঙের কয়েকটী রূপ। জুহোত্যাদিগণ—জিগাৎ, জিহীত, শিশীত। রুধাদিগণ—ভিনৎ, পৃণক্, রুণক্, পিণক্, যুনক্। স্বাদি—মিষন্, শৃণুত। ক্র্যাদি—গৃণন্, গৃভ্ণত, বৃণত, অশ্নন্। ভ্বাদি চাবম্, অবঃ দহঃ, বোধৎ, ভরৎ, চরন্, নশন্, বর্ধত, শোচন্ত। দিবাদি—পাষৎ, পশ্যৎ, পশ্যন্ জায়থাঃ।

লিট্—লিটের স্বরস্থিতি লইয়া বিশেষ কোনও গোলযোগ নাই। পরস্মৈপদের একবচন ভিন্ন সর্বত্রই প্রত্যয়-স্বর। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষের এক বচনে অভ্যস্ত স্বরের গুণ বা বৃদ্ধি হয় এবং গুণ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অক্ষরে স্বরস্থিতি হয়। যেমন, চকার, চকর্থ, চকার; বুবোধ, বুবোধিথ, বুবোধ। মধ্যম পুরুষের একবচনে একটু গোলযোগ আছে। '-থ' প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর গুণ বা বৃদ্ধি সর্বত্রই হয়, সুতরাং স্বরস্থিতি সেই গুণ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অক্ষরেই হয়। কিন্তু (ইডাগম) ইকারের আগম হইলে যদি ধাতুর রূপ নিতান্ত দুর্বল হয়, তাহা হইলে প্রত্যয়ে অর্থাৎ 'থ'কারে স্বরস্থিতি হয়। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, লিটে ধাতুর তিন প্রকার রূপ হয়, যেমন, বচ্ ধাতুর উবাচ্, উবচ্, উচ্। ইহাদের মধ্যে একটা প্রবল রূপ, একটা মধ্যম ও একটা নিতান্ত দুর্বল। ধাতু নিতান্ত দুর্বল না হইলে স্বরহানি হয় না। লিটের স্বরস্থিতি অতি নিয়মিত; সুতরাং একটি ধাতুর রূপ দিলেই পরিস্ফুট হইবে।

পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
ততান	ততন্থ, তেনিথ	ততান, ততন	তেনে	তেনিষে	তেনে
তেনতুঃ	তেনথুঃ	তেনিব	তেনাতে	তেনাথে	তেনিবহে
তেনুঃ	তেন	তেনিম	তেনিরে	তেনিধ্বে	তেনিমহে

আরও দুই একটি মধ্যম পুরুষের একবচনে রূপ :—বুধ্ ধাতু—'বুবোধিথ' প্রবল রূপ, ইহার দুর্ব্বল রূপ 'বুবুধে' পদে আছে। নী ধাতু—নিনেথ, নিনয়িথ, উভয়টাই প্রবল রূপ, দুর্ব্বল রূপ 'নিন্যুঃ', দহ ধাতু—দদাথ, দদিথ ; দ্বিতীয়টী দুর্ব্বল, 'দদে', 'দদুঃ'। বচ্ ধাতু—উবক্থ, উবচিথ মধ্যম রূপ ; প্রবল রূপ—'উবাচ', দুর্ব্বল—'উচুঃ'। অস্ ধাতুর পরোক্ষায় রূপ—আস, আসতুঃ, আসুঃ ; আসিথ, আসথুঃ, আস ; আস, আসিব, আসিম। এখানে সর্ব্বত্র অস্ ধাতুর সমান রূপ হইলেও মধ্যমপুরুষের বহুবচনে প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি।

কসু-কানচ্—ইহাদের প্রত্যয়-স্বর। বুবুধ্বাংস্, চক্রবাংস্, জক্ষিবাংস্, আদিবাংস্, দদিবাংস, উচিবাংস্, দাশ্বাংস্, জগ্মিবাংস্, জঘ্নিবাংস্। দদান, তেজান, বুবুধান, নিন্যান, জজ্ঞান, উচান, বাবৃধান, বাবসান, দাদৃহাণ, তুতুজান, শশয়ান, তিস্তিরাণ, সস্হমাণ। নিম্নলিখিত কয়েকটী শব্দে অনিয়মিত স্বরস্থিতি দেখা যায় :— তুতুজান (এবং তুতুজান), বাবুধান, শাশদান, শুশুজান, শূশুবান।

পরোক্ষার বিধি নিষেধ-সম্ভাবনাদি-বাচক ভাব বা mood। আমরা অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে কেবল লিটের সত্তা বাচক ভাব বা indicative mood পাই ; কিন্তু বেদে subjunctive, imperative ও optative সর্ব্ববিধ ভাব বা mood প্রকাশের রীতি ছিল। সম্ভাবনা-বাচক subjunctive moodএর কতিপয় পদ :— পপ্রথঃ, চাকনঃ, মামহঃ, পিপ্রয়ঃ, রারণঃ (মধ্যম পুং একব°) ; চাকনৎ, জভরৎ, রারণৎ, সাসহৎ, পিপ্রয়ৎ, (প্রথম পুং একব°) ; চাকনাম, ততনাম, শূশবাম (উত্তমপুং বহুব°) ; ততনন্, পপ্রথন্ (প্রথম পুং বহুবচন)। আত্মনেপদী— ততপতে, শশমতে, যুযোজতে, জুজোষতে (প্র° একবচন) ; চাকনন্ত, ততনন্ত (প্র° পুং বহু°)। স্বরস্থিতির স্থিরতা নাই— জুজোষতি, জুজোষসি, জুজোষথঃ, জুজোষথ, চক্রমন্ত, দধৃষন্ত, ররুচন্ত ; বাবৃধন্ত, চক্রপন্ত।

বিধি-বাচক বা Optative moodএর উদাহরণ :— শুশ্রূয়াঃ, তুতুজ্যাৎ, বভূয়াৎ, শুশ্রূয়াতম্, ববৃজ্যুঃ ; বাবৃধীথাঃ, শুশ্রূয়াঃ, শিশ্রীত।

অনুজ্ঞা-বাচক বা Imperative moodএর উদাহরণ :— মুমোচত, পিপ্রয়ন্ত। অন্যত্র স্বরলিপি লক্ষিত হয় নাই।

অভ্যাগমযুক্ত লিট্ বা Plu-perfectএর উদাহরণ :— অজগন্, অজগন্ত, অজুজোষীঃ,

অবক্রমীৎ, অপিপ্রত, অরাসুখেথাম্, অবৃহৎস্ । অভাগমবিহীন রূপ— ক্রাকন্, ক্রামম্, চিকেতম্, ভিক্ষিংসীঃ।

লুঙ্—লুঙ্ বিভক্তিতে অভাগম হইলে নিয়মিতভাবে অকারেই স্বরস্থিতি হয়। কিন্তু অভাগম না হইলেই স্বরস্থিতির বিষয়ে চিন্তা। আগমবিহীন লুঙেও সাধারণতঃ দ্, স্, অম্—এই তিনটী প্রবল রূপে ধাতু-স্বর এবং অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর বজায় থাকে৭ এই সাধারণ নিয়ম। লুঙ্ বিভক্তিতে ধাতুরূপের সাত প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। (১) যে সকল রূপে ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগ হয়। (২) যে সকল রূপে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে অকার আগম হয়। (৩) যে সকল রূপে ধাতু অভ্যস্ত হয়। (৪) যে সকল স্থলে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে 'স্' আগম হয়। (৫) যে সকল স্থলে 'ইষ্' আগম হয়। (৬) যে সকল স্থলে 'সিষ্' আগম হয়। (৭) যে সকল স্থলে স্+অ আগম হয়।

(১) অস্থাৎ, অগাৎ, অধাৎ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। আগমবিহীন স-স্বর পদ অতি অল্পই পাওয়া যায়ঃ— দভুঃ, মভুঃ, সীমহি, নংশি, গমহি, স্থাঃ। কর্ম্মবাচ্যে— ধায়ি, শ্রাবি, বেদি, জনি, পাদি, সাদি। কর্ম্মবাচ্যে সর্ব্বত্রই আগমবিহীন পদে ধাত্বক্ষরে স্বরস্থিতি। সামবেদে 'ধায়ি' সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদ।

(২) অসিচৎ, অসিচন্, অবিদম্, অগমৎ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপ। আগমবিহীন পদ— রুহম্, ভুবৎ, বিদৎ, ব্যত (প্রথম পু° একব°), বিদন্ত, বুধন্ত।

(৩) অভ্যস্ত লুঙ্। অজীজনৎ, অজীজনন্, অচিক্ষিপম্, অচুক্রুধম্, অতিত্রসম্, অপিস্পৃশম্। দীধরঃ, নীনশঃ, জীজনৎ, পীপরৎ, শিশ্রথৎ, চুক্রবৎ, তুষ্টবৎ।

(৪) 'স্' আগম। অনৈষীৎ, অনৈষুঃ, অচ্ছৈৎসীৎ, অকার্ষ্ম্, অভাংক্তম্, অস্রাষ্টম্, অবাৎসীৎ ইত্যাদি।

(৫) 'ইষ্' আগম। অপাবিষম্, অপাবিষুঃ (√পূ) অবোধিষম্, অরোচিষম্।

(৬) 'সিষ্' আগম। অযাসিষম্, অনংসিষম্, অয়াসিষুঃ যাসিষ্টম্।

(৭) 'স' আগম। অদিক্ষম্, অদিক্ষন্। ধুক্ষন্, দুক্ষন্, ধুক্ষত, ধুক্ষন্ত।

লুঙের ভাব বা mood। লুঙ দ্বারা চারি প্রকার ভাব প্রকাশই হইত। সত্তা—(Indicative) অভূৎ। সম্ভাবনা—(Subjunctive) করাণি, করসি, ভোকতে, বর্জন্তে, গমাবহৈ, পর্চ্চ, জোষৎ, শ্রবৎ, বিদাৎ, বিদাসি, শিষাতৈ, পর্ষথঃ, পর্ষথ, মৎসথ, জেষঃ, বক্ষঃ, নেষৎ, শংসিষম্, জনিষ্টাম্, মন্দিষ্ট, কানিষঃ, নির্দ্দিষৎ।

বিধি বা ইচ্ছা (Optative & Precative)—ভূয়াম, অত্তাম্, আশীয়, অশীমহি, ভূয়াঃ, গম্যাঃ, বিদেয়ম্, সনেয়ম্, শকেম, জগ্মীয়, ধুক্ষীমহি, মংসীমহি, এধিষীয়, এধিষীমহি, বর্ধিষীমহি।

অনুজ্ঞা (Imperative)—কৃধি, যুক্ষ্ব, শৃধি, শগ্ধি, বৃধি, শ্রোতু, সোতু, শ্রুতম্, স্তুতম্ বোঢ়াম্, পাত, ভূত, কর্ত, গংত, যংত, (গংত) সন, সর, বিদ, হতম্, বিদতম্, থাত, জিগৃতম জিগৃত, জজস্তম্, সুষূদত, অবিষ্টি, অবিষ্টম্, অবিত, চনিষ্টম্, তাঢ়িষ্টম্, রণিষ্টন, ধুক্ষ্ব।

আশীর্লিঙ্—একটী (ভূ) ধাতুর স্বরযুক্ত রূপ দিলাম।

পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
ভূয়াৎ	ভূয়াঃ	ভূয়াসম্	ভবিষীষ্ট	ভবিষীষ্ঠাঃ	ভবিষীয়
ভূয়াস্তাম্	ভূয়াস্তম্	ভূয়াস্ব	ভবিষীয়াস্তাম্	ভবিষীয়াস্থাম্	ভবিষীবহি
ভূয়াসুঃ	ভূয়াস্ত	ভূয়াস্ম	ভবিষীরন্	ভবিষীঢ্বম্	ভবিষীমহি

লৃট—একটী (দা) ধাতুর স্বরযুক্ত রূপ দিলাম।

দাস্যতি	দাস্যসি	দাস্যামি	দাস্যতে	দাস্যসে	দাস্যে
দাস্যতঃ	দাস্যথঃ	দাস্যাব	দাস্যেতে	দাস্যেথে	দাস্যাবহে
দাস্যন্তি	দাস্যথ	দাস্যাম	দাস্যন্তে	দাস্যধ্বে	দাস্যামহে

লৃঙ্—সম্ভাবনাবাচক (Conditional) ভবিষ্যৎ। অডাগমে স্বর।

অদাস্যৎ, অদাস্যতাম্ অদাস্যন্, অদাস্যঃ, অদাস্যতম্, অদাস্যত, অদাস্যম্, অদাস্যাব, অদাস্যাম; অদাস্যত, অদাস্যেতাম্, অদাস্যন্ত অদাস্যথাঃ, অদাস্যেথাম্, অদাস্যধ্বম্, অদাস্যে, অদাস্যাবহি, অদাস্যামহি।

লুট্—

পরস্মৈপদ		
দাতা	দাতাসি	দাতাস্মি
দাতারৌ	দাতাস্থঃ	দাতাস্বঃ
দাতারঃ	দাতাস্থ	দাতাস্মঃ

⊥	⊥	⊥
দাতা	দাতাসে	দাতাহে
⊥	⊥	⊥
দাতারৌ	দাতাসাথে	দাতাস্বহে
⊥	⊥	⊥
দাতারঃ	দাতাধ্বে	দাতাস্মহে

কৃদন্ত স্বর

যে সকল কৃদন্ত পদে কেবলমাত্র ধাত্বর্থপ্রকাশ্য ভাবটী নির্লিপ্তভাবে প্রকাশ পায়, তাহাতে ধাতু-স্বর, অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর। যে সকল পদ বিশেষণ বা বস্তু বা ব্যক্তিবাচক অথবা কোনও বস্তুর সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট, তাহাদের প্রত্যয়-স্বর। ফলতঃ প্রত্যয়-স্বর-বিশিষ্ট কৃদন্ত-পদের সংখ্যাই অধিক; কারণ, সম্পর্কবিহীন ভাবমাত্র ভাষায় স্থিতিশীল হয় না। এইটীকে সাধারণ নিয়ম বলা যায়। কিন্তু ব্যতিরেকও যথেষ্ট। বহু-অক্ষর-বিশিষ্ট (Pollysyllabic) কৃদন্ত-পদের আদ্যাক্ষর বা অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি; কোথাও কোথাও উপধা স্বরে, কোথাও কোথাও সামান্য একটু স্থানান্তরিত। * অভিন্ন পদে স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম দ্বারা অর্থ-বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। প্রথমাক্ষরে (ধাত্বক্ষরে) স্বরবিশিষ্ট পদ যদি অনন্বিত ভাব মাত্র প্রকাশ করে, সেই পদ প্রত্যয়-স্বরবিশিষ্ট হইলে বস্তু বা ব্যক্তির বাচক, অথবা বিশেষণ হয়। নপুংসক লিঙ্গের ভাব সম্ভবতঃ নির্লিপ্ত ভাব। তাই ধাতুস্বর দ্বারা সময়ে সময়ে নপুংসক লিঙ্গ শব্দ সাধিত হয়; আবার সেই শব্দই প্রত্যয়-স্বর পাইলে পুংলিঙ্গ হয়। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের স্বরও সাধারণতঃ প্রত্যয়ে অবস্থিত হয়। অতঃপর আমরা নানাবিধ কৃদন্ত পদের উল্লেখপূর্ব্বক তাহাদের স্বর প্রদর্শন করিব।

⊥ ⊥ ⊥

১। প্রত্যয়বিহীন কৃদন্ত পদ। ধাতু অত্যন্ত বা উপসর্গবিশিষ্ট। সন্তদ্, চিকিৎ, দদৃহ,

---

* No general laws governing the place of the accent are to be recognized: each suffix must in this respect be considered by itself.

In connection with a very few suffixes is to be recognised a certain degree of tendency to accent the root in case of a *nomen actionis* or infinitival derivative, and the ending in the case of a *nomen agentis* or participial derivative : * * *. Differences of accent in words made by the same suffix are also occasionally connected with differences of gender. * * * *

1145. As regards their signification, the primary derivatives fall in general into two great classes, the one indicating the action expressed by the verbal root, the other the person or thing in which the action appears, the agent or actor—the latter, either substantively or adjectively. The one class in more abstract, infinitival; the other is more concrete, participal. Other meanings may in the main be viewed as modifications or specializations of these two.

—Whitney, Sanskrit Grammar—1144-45.

বিহ্ব, বিদ্যুৎ, দুহ্, দেবী, যবীয়ুস্, জগৎ, ক্রুৎ (ক্রুৎকর্ণ), অবসা, উপভৃৎ, পরিস্রুৎ, উপস্থ, উপস্থিত।

২। অ প্রত্যয়। এই প্রত্যয় দ্বারা অসংখ্য কৃদন্ত (ও তদ্ধিত) শব্দ সাধিত হয় এবং নানারূপ অর্থ প্রকাশ করে। কখনও কখনও ধাতু-স্বরের গুণ (কচিৎ বৃদ্ধি) হয়।

নির্লিপ্ত ভাব-প্রকাশ—শ্রম, গ্রহ, অয় (গতি), বেদ, (জ্ঞান), হব, (আহ্বান), ক্রোধ, ভোগ, (উপভোগ), তর (পার হওয়া). সর্গ (সৃষ্টি)।

অবিকার্য প্রকাশ—ক্ষম (সহিষ্ণু), স্বজ (শত্রু), জীব (প্রাণী), মেষ, প্লব (নৌকা), সর (সরিৎ), সর্প (সরীসৃপ), ভোজ (বস্তুবাচক), খাদ (ভোজনকারী)।

স্বরস্থিতির ব্যতিক্রমে অর্থবিভিন্নতা—এব (ত্বরা), এব (ত্বরান্বিত); শাস (আদেশ), শাস (আদেশকর্ত্তা); শোক (দুঃখ), শোক (হতভাগ্য); শাক (শক্তি), শাক (শক্তিমান্)।

[করণ (কার্য্য), করণ (তৎপর); কৃপণ (কষ্ট), কৃপণ (হতভাগ্য); অপস্ (কর্ম্ম), অপস্ (পটু); যশস্ (সৌন্দর্য্য), যশস্ (শোভন); তরস্ (ত্বরা), তরস্ (সত্বর); তবস্ (শক্তি), তবস্ (শক্তিমান্); মহস্ (মহত্ত্ব) মহস্ (মহান্); রক্ষস্ (নপুংসক), রক্ষস্ (পুংলিঙ্গ); ভজস্ (ভাগ নপুং), ভজস্ (অপত্য পুং); ব্রহ্মন্ (নির্লিপ্ত ভাবমাত্র, নপুং), ব্রহ্মন্ (পুরোহিত, পুং); দামন্ (দান, নপুং), দামন্ (দাতা, পুং); ধর্মন্ (নিয়ম, নপুং), ধর্মন্ (আদেশকর্ত্তা, পুং); সদ্মন্ (আসন, নপুং), সদ্মন্ (উপবিষ্ট পুং)।]

জয়, জব, স্মর সম্ভবতঃ অন্বিত বস্তুবাচক *। স্রুব, মোষ, স্তব সম্ভবতঃ ভাবমাত্র বাচক।

ভাববাচক (আদিস্বরের বৃদ্ধি)। কাম (ইচ্ছা)। বস্তুবাচক—ভাগ (অংশ),† নাদ (গোলমাল),† দাব (অগ্নি),† ভার (তরণ),† গ্রাভ (আক্রমণকারী), বাহ (বহনকারী), নায় (নেতা), জার (প্রণয়ী)। এইরূপ, জেষ, নেষ, পর্ষ, পৃক্ষ।

---

* হুইটনি এইগুলিকে exception বলিয়াছেন। "But exceptions are numerous—* * *—and the subject calls for a much wider and deeper investigation than it has yet received, before the accentuation referred to can be set up as a law of the language in derivation.

† Whitneyর মতে ভাববাচক।

দংশন (গোভন কর্ম), বৃজন, (বেষ্টন, নগর), বেষণ (সেবা, দাস্ত), কিরণ (রজঃ, অংশু)। তুরণা, অর্হণা, জরণা, বর্হণা, ভন্দনা, মংহনা, মেহনা, বধনা, বমনা, বক্ষণা, উশনা, প্রভৃতি কয়েকটী শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম নাই। আদ্যক্ষরে স্বর। উরণ, ধুবন, পৃশন, ভুবন, বৃজন, বৃষণ, সুবন, যোষনা, যোষন্ (যোষা), পৃতনা।

অস্ প্রত্যয়। অধিকাংশই ক্লীবলিঙ্গ ও ভাবপ্রকাশক। অবস্ (অনুগ্রহ), তপস্ (উষ্মা), প্রয়স্ (আনন্দ), তেজস্, শ্রবস্ (সুনাম), দোহস্ (দোহন), করস্ (কর্ম্ম) প্রথস্ (স্থূলতা), চেতস্, মনস্, চক্ষস্ (নয়ন), সরস্ (পুষ্করিণী), বচস্ (বাক্য), যুবস্ (ত্বরা) জবস্ (ত্বরা), উরস্ (বক্ষঃ), মৃধস্ (অবজ্ঞা), শিরস্ ; রাচস্, বাসস্, বাহস্, পাজস্, পাথস্, হেষস্ (অস্ত্র), পীবস্, ধাযস্, গায়স্, ভাস্, জ্ঞাস্, মাস্। **বিশেষণ বা বস্তুবাচক।** তোশস্ (দানশীল), যজস্ (যাগশীল), বেধস্ (পুণ্যপ্রাণ), আহনস্ (অগ্রসর), বেশস্, ধ্বরস্, মৃগয়স্ (বন্যমৃগ), জরস্ (শেষজীবন), ভিয়স্ (ভীতি), হবস্ (আহ্বান), ত্বেষস্ (উত্তেজনা), উষস্ (উষা), দোষস্ (রাত্রি), উপস্ (উৎসঙ্গ), অপ্সরস্ (স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন)। **সহস্ (নপুং), জরস্ (স্ত্রী°)।**

তস্, নস্, সস্ প্রত্যয়। রেতস্ (বীজ), স্রোতস্, অপ্নস্ (প্রাপ্তি), অর্ণস্ (বীচি), অর্ণস্ (উপহার), রেক্নস্ (অর্থ, সম্পত্তি), দ্রবিণস্ (ধন), পরীণস্ (পূর্ণতা), দমূনস্ (গৃহের বন্ধু°), বপ্সস্ (সৌন্দর্য্য), তরুষস্।

ইস্ প্রত্যয়। জ্যোতিস্ (আলোক), ব্যথিস্, আমিস্ (মাংস), অর্চিস্, রোচিস্, শোচিস্ (দীপ্তি) ; ছদিস্, ছর্দিস্ (আচ্ছাদন) ; বর্হিস্ (কুশ), বর্তিস্ (পথ), হবিস্ (আজ্য), দ্যোতিস্, ক্রবিস্ (আমমাংস)। পাথিস্, মহিস্, তুবিস্।

উস্ প্রত্যয়। তপুস্ (তাপ, তপ্ত), অরুস্ (বেদনা, ক্ষত), আয়ুস্, তরুস্, পুরুস্, মুহুস্, মিথুস্, যজুস্, শায়ুস্। জনুস্ (জন্ম), মনুস্ (মানব), নহুস্ (নাম), জয়ুস্, বপুস্, দক্ষুস্ (দাহ)।

ই প্রত্যয়। ভাববাচক স্ত্রীলিঙ্গ। রুচি (দীপ্তি), ত্বিষি (দীপ্তি), কৃষি, নৃত্তি (নৃত্য), রোপি (যাতনা), শোচি (দীপ্তি), বনি ও সনি (প্রাপ্তি), গ্রাহি (আক্রমণ), ধ্রাজি (গতি), আজি (ধাবন), দূষি (দোষ), শুচি (উজ্জ্বল), ভূমি (চঞ্চল), গৃভি (আধার), অরি (শত্রু),

বর্হি (বৃহৎ), অর্চি (রশ্মি), গ্রন্থি (বন্ধন), ক্রীড়ি (খেলা), কার্ষি, জানি, শারি, সাচি, ত্রাণি (আবরণ), রাশি, পাণি। * অভ্যস্ত ধাতু। চক্রি, জত্রি (√ঘ্), পপ্রি, সস্রি, বব্রি, ববি। জগ্মি, জজ্ঞি (√জন্), জগ্নি, সস্নি, শুষি, দদ্রি, পপি, যযি, দধি, জগুরি, তত্তুরি, পপুরি, (পুপুরি) চিকিতি, যুযুধি, বিবিচি, তাতৃপি, দাধৃষি, বাবহি সাসহি, তুতুজি, (তূতুজি), যুযুবি, যুযুধি, জমৃভি, বভ্রুরি, কর্করি, (বীণা), দুন্দুভি, (ঢক্কা)। উপসর্গ সহিত। আবজি, ব্যানশি, রিজন্নি, পরাদদি, বৃষনভি, আজানি, আমুরি, বিবব্রি। অন্তর্ধি, উদধি, নিধি, পরিধি, [এই সকল স্থানে 'ধি' প্রত্যয়ের ন্যায় ব্যবহৃত] আদি (√দা) প্রতিষ্ঠি (√স্থা) †। অক্ষি, অস্থি, দধি প্রভৃতি নপুংসকলিঙ্গ। নপুংসকলিঙ্গের সংখ্যা অল্প।

ঈ প্রত্যয়। নদী, নন্দী, দেবী, বক্ষী, বেণী, শাকী, শচী, শমী, শিমী। অন্যান্য প্রত্যয়ের স্ত্রীলিঙ্গে এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। ঈ প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ—রথী, প্রাবী, স্তরী, অহী, অপথী। স্বরস্থিতির ব্যত্যয়ে লিঙ্গপরিবর্ত্তন। পুং কল্যাণ, স্ত্রী° কল্যাণী; পুং পুরুষ, স্ত্রী° পুরুষী। কিন্তু পুং যম, স্ত্রী° যমী। নদী, লক্ষ্মী, সূর্য্যী প্রভৃতির পুংলিঙ্গ নাই।

তি প্রত্যয়। স্ত্রীলিঙ্গ। [পুংলিঙ্গ ও বিশেষণ পদের উদাহরণ বিরল হইলেও আছে।] অধিকাংশ পদেই স্বরস্থিতি ধাতুতে; তবে কতকগুলি উদাহরণে প্রত্যয়-স্বরও দেখা যায়। হুইটনী 'ত' (ক্ত) প্রত্যয়ের ন্যায় এই প্রত্যয়েও স্বরস্থিতি স্বাভাবিক মনে করিয়াছিলেন। ৬০ পদে ধাতু-স্বর ও ৫০ পদে প্রত্যয়-স্বর পাইয়াছেন, এবং ১৪০ পদে স্বরস্থিতির নির্ণয় হয় নাই। ইতি, ঋতি, চিত্তি, তৃপ্তি, পক্তি, পুষ্টি, ভূতি, ভুক্তি, কৃষ্টি, শক্তি, শ্রুষ্টি, সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতি শব্দে উভয়বিধ স্বরস্থিতি তিনি পাইয়াছেন। সম্ভবতঃ সে সকল স্থলে অর্থবিভিন্নতা ছিল। তি প্রত্যয় ভাববাচক। ধাত্বংশে স্বরস্থিতিই স্বাভাবিক। তবে 'বৃষ্টি' শব্দে 'জল' বুঝাইলে ধাতু-স্বর থাকিবে কেন? এরূপ অর্থ বিরল নহে। ভাববাচক শব্দ প্রায়ই বস্তুবাচক হইয়া পড়ে। কিন্তু বস্তুবাচক শব্দ প্রায় ভাববাচক হয় না।

রাতি (দান), উতি (সাহায্য), রীতি (প্রবাহ), স্তুতি (স্তব), ভক্তি (বিভাগ), বিষ্টি (সেবা, দাসত্ব), কীর্ত্তি (যশঃ), পূর্ত্তি (দান), মতি (চিন্তা), পীতি (√পা, পান বা পেয়),

* "The variety of accent—reducible to no rule."—Whitney.

† "Opinions are at variance as to whether such forms are to be regarded as made with the suffix -i, displacing the radical syllable (আ) ā, or with weakening of ā to i".—Whitney.

যৌতি (সরিৎ √ধাব্),* গতি, শান্তি, দিতি (অংশ, ছেদ √দা), বৃষ্টি, ইষ্টি (√যজ্), উক্তি (√বচ্), বৃদ্ধি। শুপ্তি, রতি, তন্তি (√তন্), রন্তি (√রন্)। নঞর্থক অ পূর্ব্বে থাকিলে তাহাতেই স্বরস্থিতি হয়। অহতি, অকন্তি (√হন্)। দা (=দান বা ছেদন) ধাতুর উত্তর তি যোগে '-ত্তি' হয়, পূর্ব্বে অন্য শব্দের সমাস হইলে। সম্প্রত্তি, পরিত্তি, বসুত্তি, ভগত্তি, মঘত্তি (ক্ত যোগে '-ত্ত' হয়,—আত্ত, অনুত্ত, পরীত্ত, প্রত্ত, প্রতীত্ত, দেবত্ত†)। **অভ্যস্ত ধাতু হইতে।** চক্তি, দীধিতি, দীদিতি, জিগর্তি, যযাতি (নাম, পুংলিঙ্গ), জক্ষি (√জক্ষ্)। **উপসর্গ সহ।** অনুমতি, অভীতি, আহুতি, নিরৃথতি, ব্যাপ্তি, সংগতি [এই সকল শব্দে ক্ত প্রত্যয়ের অনুরূপ স্বরস্থিতি।] আসক্তি, আসুতি, অভিষ্টি, অভিষ্টি। **বিশেষণ বা বস্তুবাচক শব্দ।** পূতি (গলিত, পচা), বষ্টি (ব্যস্ত), ধৃতি (কম্পন), জ্ঞাতি (বান্ধব), পত্তি (পাদচারী সৈন্য), পতি। **ইকার প্রভৃতি স্বরাগম সহ।** সনিতি, ঋজীতি, সৌহিতী, মেহিতী, অংহতি, দৃশতি, পক্তি, মিথতি, বসতি, রমতি, ব্রততি, অমতি ও অমতি, অরতি, খলতি, বৃকতি, রমতি। কতি, তি, যতি প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ ও দশতি, বিংশতি, ষষ্টি, পঙক্তি (পঞ্চন্ হইতে) প্রভৃতি শব্দে তদ্ধিত প্রত্যয়।

নি প্রত্যয়। গ্লানি (ক্ষতি, জীর্ণতা), ভূর্ণি (তাপ), হানি, ঘৃণি, জীর্ণি, বহ্নি (বহন), জুর্ণি (গান), তূর্ণি (ত্বরা), ভুর্ণি (উত্তেজনা), ধর্ণি (ধারণ), প্রেণি (-প্রিয়), বৃষ্ণি ও বৃষ্ণি (পৌংস্য), পৃশ্নি (চিহ্নিত), যোনি, মেনি, শ্রেণি, শ্রোণি। হ্রাহুনি (হলাহলি)।

অনি প্রত্যয়। ইষণি (ইচ্ছা), শরণি (ক্ষতি), দ্যোতনি (দীপ্তি), ক্ষিপণি (আঘাত), অশনি (অস্ত্র), বর্তনি (পথ), অরণি (অগ্নিযষ্টি match stick), চরণি (গতি), চক্ষণি (দ্যোতক), তরণি (সত্বর), ধমনি (নল), ধ্বসনি (বিক্ষেপণ), বক্ষণি (তেজোবর্দ্ধন), সরণি (পথ), রুরুক্ষণি, সিষাসনি, আশুশুক্ষণি, পর্ষণি, সক্ষণি, চর্ষণি।

অন্ প্রত্যয়। মহন্ (মহত্ব), রাজন্ (প্রভুত্ব), [রাজন্, রাজা, স্বরস্থিতি বিপরীত অর্থের অনুকূল] গম্ভন্ (গভীরতা); উক্ষন্ (বৃষ), চক্ষন্ (চক্ষু), তক্ষন্ (সূত্রধর), ধ্বসন্

---

* হুইট্নী প্রথমগুলিকে স্বাভাবিক বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ এগুলির অধিকাংশই বস্তুবাচক।

† বাঙ্গালা 'দেবোত্তর,' 'ব্রহ্মোত্তর,' 'শিবোত্তর' প্রভৃতি শব্দের বোধ হয়, এই মূল।

(নাম), পূষন্ (নাম), মজ্জন্ (মজ্জা), বৃষন্ (বীর, বৃষ), সঘন্, ত্রীহন্, জ্মন্, ঘন্, যুবন্, যোষন্, অহন্, উধন্।

তু প্রত্যয়। এই প্রত্যয় যোগে বহু অসমাপিকা বা infinitive সাধিত হয়। দাতু (অংশ), জাতু (জন্ম), ধাতু (উপাদান), তন্তু (সূত্র), মন্তু (মন্ত্রণা), ওতু (বস্ত্রের বিস্তার অংশ), সেতু (বন্ধন), সোতু (চাপ), ক্রতু (শক্তি), সক্তু (দৃঢ়তা), এইগুলি **পুংলিঙ্গ।** **স্ত্রীলিঙ্গে**—বস্তু (প্রাতঃকাল)। **নপুংসকলিঙ্গে**—বাস্তু (গৃহ)। অক্তু (রশ্মি), জন্তু (জীব), গাতু (গান, পথ), যাতু (রাক্ষস), হেতু (কারণ), কেতু (পতাকা), **পুংলিঙ্গ।** ঋতু, পিতু (পানীয়, খাদ্য), সূতু (প্রসব)। এধতু, বহতু, তস্যতু, তপ্যতু, সিষাসতু, জীবাতু।

নু প্রত্যয়। ক্ষেপ্নু (কম্পন), ভানু (কিরণ, সূর্য্য), বগ্নু (শব্দ), সূনু (পুত্র), দানু (দানব, পুং ও স্ত্রী°; নপুংসক লিঙ্গে বিন্দু, শিশির), ধেনু, গৃধ্নু (সত্বর), তপ্নু (তাপন), ধৃষ্ণু, বিষ্ণু, স্থাণু (স্তম্ভ), ক্ষিপ্নু (অস্ত্র), ক্রন্দনু, নদনু (নাদনশীল), নভনু (-নূ, প্রস্রবণ), বিভঞ্জনু (ভঞ্জকর) কৃশানু।

থ প্রত্যয়। ভাববাচক বিশেষ্য পদ। অর্থ, গাথ (গান), ভৃথ (উপহার), যথ, রথ,—এই শব্দগুলি পুংলিঙ্গ। উক্থ (কথা), তীর্থ, নীথ (গান), রিক্থ (উত্তরাধিকার, সম্পত্তি), পৃষ্ঠ,—ক্লীবলিঙ্গ। গাথা, নীথা, (পথ),—স্ত্রীলিঙ্গ। নিঋথ (ধ্বংস), সংগথ (মিলন), বিজিগীথ (বিজয়ী)। অনথ (শ্বাস), অয়থ (চরণ), চরথ (বিচরণ), ত্বেষথ (তেজঃ), প্রোথথ, যজথ, রবথ, বক্ষথ, উচথ, বিদথ, শংসথ, শপথ, শয়থ, শ্বয়থ, শ্বসথ, সচথ, স্তনথ, স্তবথ, শ্রবথ, ক্রবথ, আবসথ, (বাস), প্রবসথ (প্রবাস, অনুপস্থিতি), প্রাণথ (শ্বাস), বরূথ (রক্ষা), জরূথ (ক্ষয়)।

থু বা অথু প্রত্যয়। এজথু (কম্পন), বেপথু, স্তনথু, (গর্জন), নন্দথু, নদথু।

যু প্রত্যয়। মন্যু (ক্রোধ), মৃত্যু, (স্পৃহা), ভুজ্যু (শুদ্ধ্যু) (পবিত্র), বন্দ্যু (পুণ্যপ্রাণ), সহ্যু (ক্ষম), দস্যু (শত্রু), জাযু (বিজয়ী)।

ম প্রত্যয়। অজ্ম (গতি), ঘর্ম (তাপ), শ্রম (অশ্রুস্রুতি), ভাম (উজ্জ্বলতা), সর্ম (প্রবাহ), স্তোম (স্তব), তিগ্ম (তীক্ষ্ণ), ভীম (ভয়ঙ্কর), শগ্ম, (শক্তিমান্), ইধ্ম (ইন্ধন), যুগ্ম (যোদ্ধা), তুতুম (ক্ষমতাবান্), সরমা। স্তোক্ম, দম, ধর্ম, নর্ম, যাম, সোম, হোম।

মি প্রত্যয়। ঊর্মি, সূর্মী (নল), জামি (বান্ধব), ভূমি, (-মী), লক্ষ্মি (চিহ্ন), রশ্মি (কিরণ, গুণ), ক্রুশ্মি।

মন্ প্রত্যয়। অধিকাংশই ভাববাচক নপুংসক, ধাতুস্বর-বিশিষ্ট। অন্য কতকগুলি পুংলিঙ্গ ও অন্ত্যস্বর-বিশিষ্ট। কর্মন্, জন্মন্, নামন্, বর্ত্মন্, বেশ্মন্ (গৃহ), হোমন্, দোহ্মন্।

পুংলিঙ্গ অথচ ভাববাচক—ওমন্ (অনুগ্রহ), ওজ্মন্ (শক্তি), জেমন্ (জয়), স্বাদ্মন্ (স্বাদুতা), হেমন্ (উত্তেজনা)। ব্রহ্মন্ (পূজা) ও ব্রহ্মন্ (পুরোহিত) ইত্যাদি স্বরস্থিতি অনুসারে অর্থ ও লিঙ্গ পরিবর্তনের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। অশ্মন্ (প্রস্তর)* নপুংসক। উদ্মন্, উম্মন্, উম্মন্, ভূমন্ (পৃথিবী), ভূমন্ (প্রাচুর্য্য), স্থামন্, সীমন্, ভুজ্মন্, বিদ্মন্ শিক্মন্, কার্ষ্মন্, ভার্মন্, শাক্মন্। **উপসর্গসহ**। প্রভর্মন্ (উৎপাদন), প্রযামন্ (প্রস্থান), অনুবর্ত্মন্ (অনুবর্তন)। ব্যতিক্রম ঃ— প্রতিবর্ত্মন্, বিসর্মন্, বিজামন্।

জনিমন্, বরিমন্ (বরিমন্), দরীমন্, ধরীমন্, পরীমন্ (পরেমন্), ভরীমন্, বরীমন্, সরীমন্, স্তরীমন্, সবীমন্, হবীমন্—**নপুংসক লিঙ্গ**। ঈমন্ প্রত্যয়ান্ত পদগুলি ঋগ্বেদে মাত্র পাওয়া যায়; উত্তরকালে ইমন্ প্রত্যয় প্রায় পুংলিঙ্গ। বেদে নপুংসক লিঙ্গেরই অধিক প্রয়োগ। তনিমন্, জরিমন্, প্রথিমন, মহিমন্, বরিমন্, (বরিমন্, বরীমন্), বর্ষিমন্ (বর্ষমন্, বর্ষ্মন্) হরিমন্, দ্রাঘিমন্ (দ্রাঘ্মন্)—**পুংলিঙ্গ**। এই ইমন্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দসমূহকে বিশেষণ হইতে সিদ্ধ ভাববাচক বিশেষ্য বলিয়া ধরা হয়। যথা.—'দীর্ঘ' হইতে 'দ্রাঘিমন্', 'উরু' হইতে 'বরিমন্' ইত্যাদি। ইষ্ঠ ও ঈয়স্ প্রত্যয়ও এই প্রকার বিশেষণের উত্তর বিহিত বলিয়া ধরা হয়। 'ক্ষিপ্' ধাতু হইতে 'ক্ষেপিষ্ঠ' না বলিয়া 'ক্ষিপ্র' হইতে 'ক্ষেপিষ্ঠ'। বৃ ধাতু হইতে 'বরিষ্ঠ', বা শ্রি ধাতু হইতে 'শ্রেষ্ঠ' বা কণ্ ধাতু হইতে 'কণিষ্ঠ' না হইয়া 'উরু', 'প্রশস্ত' ও 'অল্প' হইতে নিষ্পন্ন হয়। এই প্রকার 'দীর্ঘ' হইতে 'দ্রাঘিমন্'। কিন্তু বেদে ধাতু হইতেই এই প্রকার ইষ্ঠ, ইমন্ প্রভৃতি প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ গঠিত হইত। ব্রাহ্মণে ধূম্রীমন্, দ্রঢ়িমন্, অণিমন্, স্থেমন্ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আরম্ভ হয় এবং উত্তরকালে বিশেষণমাত্রে এই প্রত্যয় প্রয়োজ্য হইয়াছে। যথা, লোহিতিমন্, মধুরিমন্, পূর্ণিমন্, কৃষ্ণীমন্, শোণীমন্। এই সকল ক্ষেত্রে ইমন্ তদ্ধিত-প্রত্যয়।

---

* Whitney বলেন, পুংলিঙ্গ। "Though masculine, is accented on the radical syllable.

বন্ প্রত্যয়। যজ্বন্ (যাজ্ঞিক), দ্রুহ্বন্ (অনিষ্টকর), শকন্ (সমর্থ), রিক্বন্ (ত্যাগী), জিত্বন্ (জয়শীল), সুত্বন্ (সবনশীল), কৃত্বন্ (কর্ম্মঠ), গত্বন্ (গমনশীল), সত্বন্ (যোদ্ধা, √সন্)—পুংলিঙ্গ। পর্বন্ (গ্রন্থি), ধন্বন্ (ধনুক),—**নপুংসক।** অর্বন্ (দ্রুতগতিশীল অশ্ব)। **উপসর্গ সহ।** উপহ্বন্ (যুদ্ধ), সংভৃত্বন্ (সংগ্রহকারী), বিবস্বন্ (উজ্জ্বল)। মুষীবন্ (দস্যু), সনিত্বন্, ররাবন্, চিকিত্বন্। **বন, বনি, বনু প্রত্যয়।** বগ্বন (বাচাল), সত্বন (যোদ্ধা), শুশুক্বন (উজ্জ্বল)। তুর্বণি (অতিক্রমী), ভুর্বণি (চঞ্চল), শুশুক্বনি, দধৃষ্বণি (সাহসিক), তুতুর্বণি (সচেষ্ট), জুগুর্বণি (প্রশংসাকারী), অর্হরিষ্বণি। বগ্বনু (স্বর, কোলাহল)।

বর প্রত্যয়। **পুংলিঙ্গ বিশেষণ**—ইত্বর (গতিশীল), অদ্বর (ভোজনশীল), ঈশ্বর, কর্বর, তাবর, ভাস্বর, ব্যধ্বর, স্থাবর, বিদ্বল, যাযাবর। **স্ত্রীলিঙ্গ**—যজ্বরী, সৃত্বরী, জিত্বরী, শীবরী ; বন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গেও '-বরী' হয়। **ক্লীবলিঙ্গ**—কর্বর (কর্ম) গহ্বর (গুহা)। উর্বরা, উর্বরী (রজ্জু)—স্ত্রীলিঙ্গ।

অতঃপর কেবল বিশেষণ, বস্তুবাচক ও ব্যক্তিবাচক কৃদন্তের প্রত্যয়ঃ—

অৎ (অন্ত্) প্রত্যয়। বৃহন্ত্, মহন্ত্, পৃষন্ত্, (চিহ্নিত), রুশন্ত্ (উজ্জ্বল), জগৎ, খহন্ত্ (ক্ষুদ্র), দন্ত্ (দশন), জুহ্বৎ, চক্ষৎ, ভবন্ত্ [শতৃ।]

বস্ প্রত্যয়। শিকস্ (কৌশলী), বরিবস্ (বিস্তার, স্থান)।

মান, আন প্রত্যয়। অপ্নবান, পৃথবান, চ্যবান, চ্যবতান, পর্শান (গর্ত্ত)।

ত, ন প্রত্যয় (ক্ত)। সর্ব্বত্র প্রত্যয়-স্বর। ন প্রত্যয়ে ব্যতিক্রম। তৃষ্ট (অমসৃণ), শীত, দৃঢ়, দূত, সৃত (সারথি), ঋত, ঘৃত, জাত, দ্যূত (জুআ খেলা), নৃত্ত, জীবিত, চরিত, [অস্ত (গৃহ), মর্ত, বাত, গর্ত, নক্ত, হস্ত প্রভৃতি কতিপয় শব্দে ব্যতিক্রম], ব্রত। পচত, দর্শত ও পশ্যত (দৃষ্ট, দর্শনীয়), যজত, হর্ষত, ভরত, রজত, পলিত, অসিত (কৃষ্ণ), [রোহিত, লোহিত, হরিত], শ্বেত। **স্ত্রীলিঙ্গে** এনি, শ্যেনী, রোহিণী, লোহিনী, হরিণী, অসিক্নী, পলিক্নী, হরিক্নী। উক্ষ, শুন (ভাগ্যবান্), শ্বিত্র (শুভ্র)। **পুংলিঙ্গ**—প্রশ্ন, যজ্ঞ, ঘৃণ, বর্ণ, স্বপ্ন। **নপুংসক**—পর্ণ, রত্ন। স্ত্রীলিঙ্গে—তৃষ্ণা, যাচ্ঞা।

অজিন (ভয়ঙ্কর), বৃজিন (বক্র), দক্ষিণ, দ্রবিণ, হরিণ, কনীন। অর্জুন, করুণ, তরুণ, দারুণ, ধরুণ, নরুণ, পিশুন, মিথুন, বরুণ। যমুনা। ভ্রূণ।

উ প্রত্যয়। উরু, ঋজু, পৃথু, মৃদু, সাধু, স্বাদু, তপু, বসু, জায়ু (বিজয়ী), দারু, শয়ু (শয়নশীল), রেকু (শূন্য) ধায়ু (তৃষার্ত্ত), পায়ু (রক্ষক), আখু, মৃষ্ঠু, অমৃষ্ঠু। অংশু, রিপু (প্রতারক), বায়ু, অসু, মনু (মানব), ইষু। সিন্ধু, তনু (তনু), স্নু (ধান্য)। চিকিতু, জগ্মু, জিগ্যু, তিতউ, বভ্রু উপায়ু (নিকটবর্ত্তী), প্রময়ু (ধ্বংসোন্মুখ)। তন্যু (গর্জনশীল), ভিন্দু (ভেদকারী), বিন্দু (প্রাপ্তিশীল), দক্ষু, ধক্ষু। দিৎসু, দিপ্সু, চিকিৎসু, মুমুক্ষু, দিদৃক্ষু। [অদ্যায়ু, অরাতীয়ু, ঋজূয়ু, চরণ্যু, মনস্যু, সনিষ্যু, উরুষ্যু, সপর্যু প্রভৃতি নামধাতু-সিদ্ধ শব্দ বেদের প্রাচীন ভাগেই পাওয়া যায়। সর্ব্বনাম হইতে ত্বায়ু, যুবয়ু, যুবায়ু, অস্ময়ু, স্বয়ু, অহংয়ু ও কিংয়ু (?), যবয়ু (যবান্বেষী), বরাহয়ু, স্তনস্যু (স্তন্যপানেচ্ছু), ভীময়ু (ভয়ঙ্কর), ঊর্ণায়ু (পশমী), যুবন্যু (যুবক)।

উ প্রত্যয়। স্ত্রীলিঙ্গ। কর্ষূ (গহ্বর), [পুংশ-] চলূ, [প্র-] জনূ, শুভ্রূ।

উক প্রত্যয়। বেদে নাই বলিলেই হয়। ব্রাহ্মণে আরম্ভ। সম্ভবতঃ উ প্রত্যয়ান্ত শব্দে '-ক' যোগে উৎপন্ন। ব্রাহ্মণের ভাষায়—বাহুক, নাশুক, উপক্রামুক, প্রপাদুক, বেদুক, ভাবুক, ক্রোধুক, হারুক, বর্ষুক, সমর্ধুক দংশুক, প্রমায়ুক। নির্মার্গুক, ঘাতুক, বিকসুক, সংকসুক। জাগরূক, দন্দশূক, যাবজূক (সললূক)—এই গুলিতে উক।

অক প্রত্যয়। এখানেও বোধ হয়, অতিরিক্ত 'ক' যোগ। পাবক, সায়ক, পীয়ক, বধক, অভিক্রোশক। প্রাচীন ভাষায় এ প্রত্যয়টীও দুর্লভ।

তৃ বা তর্ প্রত্যয়। ভূরি প্রয়োগ। উষ্ট্র (উক্ষ্ +তৃ, হালের বলদ), গ্রহীতৃ, তরীতৃ, পবীতৃ, মরীতৃ, তরুতৃ, (তরুতৃ), ধমৃতৃ, সমৃতৃ, বরুতৃ, মনোতৃ (মনোতৃ)। জেতা ধনানি; যূয়ং মর্ত্তং শ্রোতারঃ; যন্তা বসূনি বিধতে (সাধুকে ধন দানকারী); জেতা জনানাম্। কর্ম্মে ষষ্ঠী ও দ্বিতীয়া দুই হয়। পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ, যাতৃ, দুহিতৃ, নপ্তৃ, জামাতৃ, উস্র, সব্যষ্টৃ, ননান্দৃ, দেবৃ।

ইন্ তদ্ধিত প্রত্যয় হইলেও স্থানে স্থানে কৃৎ স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছে। কেবলাদিন্, ক্রন্দবাদিন্, সক্থিন্, নিষধিন্।

ঈয়স্ ও ইষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ (জ্যেষ্ঠ), কনিষ্ঠ, পর্ষিষ্ঠ। স্থেয়স্, স্থেষ্ঠ, বেষ্ঠ। √ শ্রী—শ্রেষ্ঠ, শ্রেয়স্। √ শ্রী—শ্রেয়স্, শ্রেষ্ঠ। তবীয়স্, তবীয়স্।

ত্র প্রত্যয়। গাত্র, পত্র (পক্ষ), পাত্র (√ পা, যাহাতে পান করা যায়), বস্ত্র, যোক্ত্র (বন্ধন), শ্রোত্র, অস্ত্র, স্তোত্র, পোত্র (পাত্র), দত্র (দান), ক্ষেত্র, মূত্র, হোত্র (হোম), ক্ষত্র, রাষ্ট্র, শাস্ত্র, সত্র (যজ্ঞকাল), জ্ঞাত্র (জ্ঞান)। **নপুংসক।** দংষ্ট্র, মন্ত্র, অত্র (√ অদ্), উষ্ট্র (মহিষ, উট), মিত্র, পুত্র, বৃত্র—**পুংলিঙ্গ।** অষ্ট্রা (অঙ্কুশ, goad), মাত্রা, হোত্রা, দংষ্ট্রা, নাষ্ট্রা—**স্ত্রীলিঙ্গ।** অরিত্র, খনিত্র পবিত্র, জনিত্র, সনিত্র (দান), অশিত্র, চরিত্র, ধবিত্র, ভবিত্র, ভরিত্র। যজত্র (পূজ্য), গায়ত্র (স্ত্রী°—ত্রী, গান), পতত্র (পক্ষ), অমত্র (ভয়ঙ্কর), বধত্র (অস্ত্র), বরত্রা (স্ত্রী° রজ্জু), তরুত্র (পরাভবকারী), নক্ষত্র, [সংস্কৃতত্র], জোহুত্র (চীৎকার)। অত্রি (ভোজনকারী), অর্চত্রি (উজ্জ্বল), রাত্রি, রাত্রী, শত্রু (শৎত্রু), প্রভৃতি ত্র প্রত্যয়ের প্রতিপ্রসব।

ক প্রত্যয়। শুষ্ক, শ্লোক (√ শ্রু), স্তোক, (বিন্দু) রাকা, স্তুকা, (স্তর), বৃশ্চিক (√ ব্রশ্চ্), অনীক (মুখ), দৃশীক (দর্শন), দৃভীক (নাম), মৃচীক (লাবণ্য), বৃধীক (বর্দ্ধক)।

য প্রত্যয়। ভূরি প্রয়োগ। তদ্ধিতেই অধিক প্রয়োগ। সুতরাং একত্র আলোচ্য।

র প্রত্যয়। প্রত্যয়-স্বর। ক্ষিপ্র, ছিদ্র, তুর (শক্ত), উগ্র, শক্র, শুক্র, হিংস্র। গৃধ্র (লোভী), তুম্র (স্থূল), ধীর, বিপ্র, তুগ্র (নাম)। নিচির (মনোযোগী), মিমৃগ্র (সংযোগশীল)। অজ্র (ক্ষেত্র, English 'acre'), বীর (নর), বজ্র, শূর। অগ্র, ক্ষীর, রন্ধ্র, রিপ্র (অপবিত্রীকরণ)—**নপুংসক।** ধারা, শিপ্রা (চুয়াল), সুরা (মদ্য)—**স্ত্রীলিঙ্গ।** দ্রবর (দ্রুতগতিশীল), পতর (উৎপতনশীল), স্যোচর (যুক্ত)। গহ্বর (গভীরতা), তসর ও ত্রসর (মাকু), সনর (লাভ)। অজির (ত্বরাশীল), খদির, ধ্বসির (উত্তেজক), মদির (আনন্দদায়ক), বধির, ইষির, (ব্যগ্র), অশির (অস্ত্র), স্থবির (শক্ত), শিথির (স্থূল), সরির (সলিল), গভীর, শবীর (শক্তিমান্), শরীর। অসুর। অঙ্কুর—উর প্রত্যয়। স্থূর (স্থূল), খর্জুর, ময়ূর—উর প্রত্যয়।

ল প্রত্যয়। রলয়োরভেদঃ। শুক্ল, স্থূল, শিথিল, সলিল, পাল (রক্ষক), অনিল (অনিল), তৃপল (হর্ষযুক্ত)।

ব প্রত্যয়। ঋক্ব (প্রশংসাশীল, ঋচ্ হইতে), ঋষ্ব (উচ্চ), তুক্ব (সত্বর), ধ্রুব, পক্ব, হ্রস্ব, শিক্ব (কুশল), রণ্ব (হৃষ্ট) ঊর্ধ্ব, এব (সত্বর), অশ্ব।

রি প্রত্যয়। অঙ্ঘ্রি, অশ্রি (প্রান্ত), উস্রি (ঊষা) ভূরি, সূরি (patron), বধ্রি (নপুংসক নর), শুভ্রি (শোভন), জসুরি (ক্ষীণ), দাশুরি (পুণ্যাত্মা), সহুরি (ক্ষমতাবান্) অঙ্গুরি (-লি)।

রু প্রত্যয়। অশ্রু, চারু, ধারু (স্তন্যপায়ী), ভীরু, অররু (শত্রুতাশীল) পতরু (উৎপতনশীল), বন্দারু (বন্দনাশীল), মদেরু (উৎফুল্ল), সনেরু (লাভবান্)। পতয়ালু (উৎপতনশীল), স্পৃহয়ালু—এই পর্য্যায়ভুক্ত।

বি প্রত্যয়। জাগৃবি (জাগরিত), দাধৃবি (ধারণাশীল), দীদিবি (প্রোজ্জ্বল), ঘৃষ্বি (চঞ্চল), ধ্রুবি (দৃঢ়), জির্বি (জীর্ণ)।

স্নু প্রত্যয়। ক্ষেষ্ণু (ক্ষয়শীল), জিষ্ণু (জিগীষু, বিজয়ী), দঙ্ক্ষ্ণু (দংশনকারী), নিষৎস্নু (উপবিষ্ট), গমিষ্ণু, চরিষ্ণু, চ্যাবয়িষ্ণু, বিষ্ণু, পারয়িষ্ণু, যময়িষ্ণু, শোচয়িষ্ণু। নিষৎস্নু, প্রজনিষ্ণু, অভিশোচয়িষ্ণু। ক্রবিষ্ণু (মাংসাশী, ক্রবিস্ = মাংস), বধস্নু, বৃধস্নু।

স্ন প্রত্যয়। তীক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণ, রুক্ষ্ণ, দেষ্ণ (দান), বধস্ন (অস্ত্র), করস্ন (অগ্রবাহু)।

ত্নু প্রত্যয়। কৃত্নু (কর্ম্মঠ), গত্নু, হত্নু (মারণ), জিগত্নু (সত্বর), জিঘত্নু (বিনাশক), দত্নু (দানশীল), দ্রবিত্নু (ধাবিষ্ণু)। দ্রাবয়িত্নু (ত্বরায়মান), পোষয়িত্নু (পুষ্টিকারক), মাদয়িত্নু (মাদক), তনয়িত্নু ও স্তনয়িত্নু (বজ্রগর্জনশীল), সূদয়িত্নু (প্রবহমান), আময়িত্নু (রোগদায়ক)। মেহত্নু (নদীবিশেষ), অরুজত্নু (হঠপ্রবেশকারী), কবত্নু (কৃপণস্বভাব)।

স প্রত্যয়। জেষ (জিত্বর), রুক্ষ (উজ্জ্বল), উৎস (প্রস্রবণ), ভীষা (ভয়), তবিষ (প্রবল), মহিষ (স্ত্রী° মহিষী, প্রতাপযুক্ত), পুরীষ (জঞ্জাল), মনীষা, অরুষ (রক্তবর্ণ), অঙ্কুষ (রাক্ষসে), পুরুষ, মনুষ (মানব), পীয়ূষ (বৎস জন্মের পর প্রথম দুগ্ধ)।

অসি প্রত্যয়। অত্তসি (যাযাবর), ধর্ণবি (দৃঢ়), সানসি (লাভবান্), ধাসি (পান, স্থান), সরসি (সরোবর)।

অন্ত প্রত্যয়। বৃষন্ত, খবন্ত, শরন্ত, পর্দন্ত, যাবন্ত, স্থূলন্ত (স্থূল)।

আরও কতিপয় প্রত্যয়। পুষ্প, স্তুপ, স্তূপ—প প্রত্যয়; বৎসর, পুষ্কর, স্থমর, বরণ্ড প্রভৃতির প্রত্যয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সভাপতির অভিভাষণ *

রীতি আছে, বার্ষিক অধিবেশনের দিন সভাপতিকে একটা বক্তৃতা করিতে হয়। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদে কাজ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, সে দিন আর সভাপতির অভিভাষণ কিছুতেই হইতে পারে না। তাই গত বৎসর আমার বক্তৃতা হয় নাই। বৎসরের মধ্যে বক্তৃতার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল, কখন আপনারা সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কখন আমি পারি নাই। সুতরাং হয় নাই। আমার সে দেনাটা শোধ করা দরকার। তাই আজকার আয়োজন।

কিন্তু বলিব কি? গত বৎসরে ইচ্ছা ছিল, বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের কথা বলিব। আপনাদেরও তাই ইচ্ছা ছিল। শুধু সামাজিক ইতিহাসের কথা বলিতে গেলেই জাতির কথা বলিতে হয়। জাতির উপর এখন বড় রাগ। ওটা একটা পুরাণ জিনিস; কখন হয় ত উহাতে কিছু উপকার হইয়াছিল, এখন কেবল অপকার—কেবল অপকার; ভারতের সর্ব্বনাশের কারণই জাতি। জাত ভাঙ্গ—সব একত্রে খাও—পরস্পর বিয়ে কর—অনাচরণীয়দের আচরণীয় করে নাও, তাদের সঙ্গে খাও দাও, তাদের সঙ্গে বিয়ে-থা দাও—সব একাকার হয়ে যাক—সব ডিমক্রাসি হয়ে যাক। এ সব ত বেশ কথা—ভাল কথা, উন্নতির কথা। কিন্তু জাতির কথা উঠিলেই সবাই চটিয়া যায়। এমন চটা নয়—একেবারে চটিয়া লাল। সে বার বাঙ্গালার গৌরবের কথা বলিতে গিয়া, কায়স্থ ব্রাহ্মণের কিছু সুখ্যাতি করিয়াছিলাম। তাই বৈদ্য মহাশয়েরা আমার উপর চাবুকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাল একজন জাতি-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ লেখক আমায় লিখিয়াছেন, "আমি" অমুকের জাতিকে তাঁহার মনের মত করিয়া বড় করিতে পারি নাই, তাই তাঁহার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই আমি আর ও গোলযোগের ভিতরে যাইতে চাহি না। আর একটা কিছু বলিতে চাই। কি বলিব? এক বৎসর ধরিয়া ভাবিলাম। শেষ স্থির করিলাম, বাঙ্গালার গৌরবের আর একটা অধ্যায় বাড়াইয়া দিব। বাঙ্গালা সাহিত্যে আর একটা অতি প্রাচীন পাত উল্টাইয়া দিব। বাঙ্গালার একটা পুরাণ কাহিনী বলি।

নগেন বাবু ও দীনেশ বাবু দুজনেই মনে করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজি ১১ শতকে আরম্ভ। তাঁহাদের প্রমাণ শূন্যপুরাণ আর ধর্ম্মমঙ্গল। শূন্যপুরাণ রামাই পণ্ডিতের লেখা। নিরঞ্জনের উষ্মা নামে রামাই পণ্ডিতের একটি ছড়া আছে। সে ছড়ায় রামাই পণ্ডিতের ভণিতা দেওয়া আছে। সুতরাং সেটি যে রামাই পণ্ডিতের, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সে ছড়াটি কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কোন জায়গায় মুসলমান আক্রমণের ছড়া। সুতরাং মুসলমান আক্রমণের অনেক পরে লেখা। অনেক পরে বলি কেন? যেহেতু সে ত নবদ্বীপ অধিকারের কথা নয়, গৌড় অধিকারের কথা নয়। একটা কোন ছোট গ্রাম, নগর বা জায়গা অধিকারের কথা। এটা এখন স্থির যে, মুসলমানেরা একেবারে সারা বাঙ্গালাটা দখল করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে অধিকার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং এ "উষ্মা" গৌড় ও মালদহ অধিকারের বেশ

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৮শ বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বদিবস (১১।৩।২৯) পঠিত।

একটু পরে হইয়াছিল। শ খানেক বৎসর বলিলে বোধ হয়, বেশীও বলা হয় না, কমও বলা হয় না। কারণ, প্রথম এক শ বৎসরের ইতিহাসে দেখিতে পাই, মুসলমানরা আপনা আপনি লড়াই-ঝগড়া করিতেছেন। সুতরাং "উহাটা" ইংরাজী ১৪ শতকের লেখা বলিয়াই বোধ হয়। ১১ শতকের নহে। উহাকে ও শূন্যপুরাণকে ১১ শতকের লেখা বলিলে একটু বেশী পুরাণ বলা হয়।

ধর্মমঙ্গলের গল্পটা একটু পুরাণ বটে। ধর্ম্মপালের ছেলে—নাম দেওয়া নাই, গৌড়ের রাজা। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল বইখানা তত পুরাণ নহে। "হাকন্দপুরাণমতে ময়ূর ভট্টের পথে" উহা রচিত হইয়াছে। হাকন্দপুরাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ময়ূরভট্টের পুথি পাওয়া গিয়াছিল। ময়ূর-ভট্ট যে বেশী পুরাণ লোক, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার পুথিতে বর্দ্ধমান মঙ্গলকোট রাঢ়দেশের প্রধান জায়গা। সেটা ১৪ শতকের বেশী আগে হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং শূন্যপুরাণে ও ধর্ম্মমঙ্গলে প্রমাণ হয় না যে, বাঙ্গালা সাহিত্য ১১ শতকে আরম্ভ হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি কতকগুলি বৌদ্ধ গান ও দোহা ছাপাইয়াছিলাম। সেগুলি খৃষ্টের ১০ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ১১র শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল বোধ হয় সেগুলি সিদ্ধাচার্য্য-সম্প্রদায়ের গান। লুই আদি সিদ্ধাচার্য্য। লুই ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দুইজনে "লুই অভিসময়" নামে একখানি সংস্কৃত বই লিখিয়াছিলেন। হীনযানে যাহাকে "অভিধর্ম্ম" বলে, মহাযানে তাহাকে "অভিসময়" বলে—অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র। লুই যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, লুই ও শ্রীজ্ঞান দুজনে মিলিয়া তাহার দর্শনশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। লুইয়ের সময় জানা নাই। শ্রীজ্ঞানের সময় জানা আছে। তিনি ৯৮০ সালে জন্মান, ৫৮ বৎসর বয়সে ১০৩৮ সালে ভোটের রাজার অনুরোধে ভোটদেশে যান। সেখানে ১৪ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ১০৫২ সালে মরেন। সুতরাং লুই যখন একটা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা গান লেখা হইয়াছে, তখনই শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব। শ্রীজ্ঞান নাড় পণ্ডিতের শিষ্য এবং লুইএরও শিষ্য। কাজেই লুইএর যখন অনেক বয়স হইয়াছে, তখন শ্রীজ্ঞানের বয়স অল্প। "লুই অভিসময়" যদি ১১ শতকের প্রথম ভাগে লেখা হয়, তাহা হইলে লুইএর গানগুলি তার আগে লেখা হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, সিদ্ধাচার্য্যদের গানগুলি ১০ম শতকে আরম্ভ হইয়া ১১শ শতকে শেষ হইয়াছে।

অনেকে বলেন যে, সিদ্ধাচার্য্যদের গানগুলি বাঙ্গালা নয়। কেহ বলেন, উহা অপভ্রংশ ভাষা, কেহ বলেন, উহা প্রাকৃত, কেহ বলেন, উহা বৌদ্ধ-প্রাকৃত; আবার একজন আছেন; তিনি বলেন, উহা ভাষাই নয়; নানা ভাষা হইতে কথা সংগ্রহ করিয়া কোন রকমে সাজাইয়া দিয়াছে মাত্র। আরংজীবের সময় যেমন একটা তৈরী ভাষায় কোরান লেখা হইয়াছিল, সে ভাষাটাই তৈয়ারী; এও সেই রকম। আমি বলি, তাহাই হউক; আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু লুই বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাঁহার চেলাগণও অনেকে বাঙ্গালী ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই কালে বাঙ্গালা দেশে চলিত ভাষায় গান লেখা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে ভাষাকে বৌদ্ধ-প্রাকৃতই বল, প্রাকৃতই বল, অপভ্রংশই বল, আর যা-ই বল; ওটা ত নাম দেওয়া মাত্র। আমি না হয়, বাঙ্গালা দেশের ভাষাকে বাঙ্গালা নাম দিলাম, তাহাতেই বা দোষ কি?

কিন্তু এ বিষয়ে কাশীদাস আমার বড় সাহায্য করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের গোড়াতেই বলিয়াছেন,—

শ্লোকচ্ছন্দে সংস্কৃত রচিলেন ব্যাসে।
গীতচ্ছন্দে কহি তাহা শুন অনায়াসে॥

এখানে "গীতি" শব্দ বাঙ্গালা গান অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। তাহার উল্টা—সংস্কৃত কবিতা অর্থে "শ্লোক" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। শ্লোক ও গীতি যখন এক জায়গায়ই ব্যবহার হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, একটা সংস্কৃত ও একটা বাঙ্গালা ছন্দ। তাহা হইলে গীতি শব্দটার অর্থ—বাঙ্গালা ছন্দ। গীতি শব্দ কাশীরাম দাস এই অর্থে অনেক জায়গায় ব্যবহার করিয়াছেন। যে পুথিখানি হইতে আমরা এ কথা বলিতেছি, সে পুথিখানি বাঙ্গালা ৯৮৫ সালে লেখা, অর্থাৎ খৃঃ ১৫৭৯। তাহা হইলে আমাদের বুঝিতে হইবে, ১৬ শতে বাঙ্গালায় "গীতি" শব্দ বাঙ্গালা গান অর্থে ব্যবহার হইত। সিদ্ধাচার্য্যদের গানের বইএর নাম—গীতি। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের নাম চর্য্যাগীতি। অনেকগুলি সিদ্ধাচার্য্যের "গীতি" আছে। সুতরাং আমরা এই "গীতি"কে বাঙ্গালা গান বলিতে কুণ্ঠিত হইব কেন ?

যাহা হউক, এতক্ষণ যাহা বলিলাম, সবই পুরাণ কথা। পাঁচ বৎসর আগে বলিয়াছি, তাহাই আবার আপনাদের মনে করিয়া দিবার জন্য বলিলাম। বৌদ্ধ গান ও দোহায় ৫০টি গান আছে, ২টি দোহা-সংগ্রহ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বৌদ্ধদের মূল তন্ত্রের বই-ই হউক, তাহার টীকাই হউক বা তাহাদের তন্ত্রসংগ্রহই হউক, পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে এই ভাষায় এইরূপ গান, এইরূপ দোহা বা এইরূপ গাথা পাওয়া যায়। যেখানে পাইয়াছি, আমি টুকিয়া টুকিয়া রাখিয়াছি। এবার নেপালে গিয়া দেখিলাম ও শুনিলাম যে, প্রত্যেক বিহারেই ২।৪টি করিয়া এই ভাষায় এইরূপ গান হয়। একজন বলিলেন, ৩০০।৪০০ গান এখনও চলিত আছে। আমি যখন গানগুলি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, তাঁহারা বলিলেন, পাইবেন না। কারণ, 'ওগুলি গুহ্য আমরা' অর্থাৎ বৌদ্ধেরা অতি অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহাকেও শুনাই না যেখানে একটিও শিবমার্গী থাকে, সেখানে গাই না। কেবল তান্ত্রিক পূজায় এ সকল গানের ব্যবহার হয়। আমি বলিলাম—সে কথা ত সত্য। আমি ত ৫০টা গান ছাপাইয়া দিয়াছি। আর তোমাদের অতি গুহ্য যে হেবজ্রতন্ত্র, তাহাতে ২।৩টি গান পাইয়াছি। একটি যথা,—

রাগ ভৈরবী।

শুদ্ধ নিরঞ্জন পরম প্রভু শূন্যমায় সহাবে
ভাব চিন্ত সহাব উ।
সো জো ভাবই মন ভাবই সো পর সোহই কজ্জ॥
ন উভবউ নির্ব্বাণ অহি এহ সো মহাসুখবজ্জ।
জো ভাবই মন ভাবই সো পর সো হই কজ্জ॥

অকৃখরু মন্ত নিবন্ধ জো নো সোখিদু ন চিত্ত ॥
এহ সো পরম মহাসুহলো জো ভেদি ন চিত্ত ॥
জিম পদি বিন্দু সহাবউ তিমি ভাবই মন ভাবে।
শূন্ন নিরঞ্জন পরম প্রভু নো তই পুণ্য ন পাউ ॥
জিম জল মাঝে চন্দ্র সহি নো সোহ ন মিচ্ছ।
তিমি দো মণ্ডল চক্র উ তথর সহাবে সচ্ছ ॥

আরও একটি দিলাম।—

রাগ বলাড়ি।

কল্লই রে টিঠঅ বোলা মুম্মুনি রে কক্কোলা।
ঘণ কি পি দিহো কজ্জই কুরুণো কিঅনে রোলা ॥
এহি বপু খাজ্জই নাটেমঅ না পিজ্জই।
হলে একা লিঞ্জন পণি অহি ইন্দু রুতহি বজ্জিঅই ॥
চউ সম কপ্তুরি সিহ্লা কপূর লাই।
অই মা লেই ইন্ধন সালি অতহি মরু খাই ॥
অহি পেখনে খেটট করন্তে সুদ্ধাসুদ্ধ মুনি অই।
নিরংসুঅ অঙ্গ চউবিহই ভসরাব শনিআই ॥
মলয়াজ কুণ্ডুর বাটেটই ডিণ্ডিম তহি ন বজ্জিঅই ॥

এই দুইটি গান হেবজ্রতন্ত্রে আছে। হেবজ্রতন্ত্রখানি বুদ্ধবচন। বুদ্ধ ত নিজে কোন বই লেখেন নাই। সুতরাং বুদ্ধবচনের বইগুলি তাঁর কোন চেলায় লিখিয়াছে। এখন যেমন চেলারা গুরুর বই চুরি করিয়া নিজ নামে প্রকাশ করে, তখনকার চেলারা তত সেয়ানা ছিল না। তাই তারা বই লিখিতে হইলেই গুরুর দোহাই দিত ; বলিত,—"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম জেতবনে অনাথপিণ্ডদস্যারামে সার্দ্ধত্রয়োদশভিঃ ভিক্ষুশতৈঃ" ইত্যাদি। তারা গুরুর মুখ দিয়াই বলাইত। ইদানীং যখন তন্ত্র আরম্ভ হইল, ক্রমে মহাযান, তন্ত্রযান, সহজযান, বজ্রযান, কালচক্রযানে আসিয়া পড়িল, তখনও ঐ এক কথা—একটু বিশেষ আছে। তখন লিখিত,—"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ কায়বাক্‌চিত্তযোগযোগিনীভগেষু বিজহার।"

যে হেতু হেবজ্রতন্ত্র বুদ্ধ-বচনী, সেই পর্য্যন্ত ঐ দুইটি গানে কোন কবির ভণিতা নাই। দুটিই বাঙ্গালা। শূন্য নিরঞ্জন বেশ বোঝা যায়। "কল্লই রে টিঠঅ" মোটেই বোঝা যায় না। কিন্তু না বোঝা যাওয়ায় দোষ আমারও নয়, এখনকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও নয়, দোষ পুথি-লেখকের। পুথি-লেখকেরা বৌদ্ধ, তারা জানে না—এটা কি ভাষা। জিজ্ঞাসা করিলে বলে—ঐ এক রকম সংস্কৃত। তাহাদের যে গুরুপুস্তক, তাহাও অশুদ্ধ কৃষ্ণা। তালপাতার পুরাণ বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা

পুথি পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহার যে কোন কালে উদ্ধার হইবে, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু "কল্লই রে টিঠঅ" অনেক বিহারে প্রায়ই গায়। আমাদের সামগানের মতন হইয়া গিয়াছে,— মানে বোঝা যায় না, কিন্তু হাত নাড়াটি ঠিক আছে, সুর দেওয়া ঠিক আছে, স্তোভ দেওয়া ঠিক আছে।

আমি হেবজ্রতন্ত্রের এই দুইটি গান তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলে একজন ৫।৭টি গান আমায় লিখিয়া আনিয়া দিল কিন্তু বড় সাবধানি, অন্য কোন বৌদ্ধ যেন টের না পায়। কিন্তু অতি নির্জ্জনে একটি গান ঠিক রাগ-রাগিণী দিয়া, সকলরূপ মুদ্রা দেখাইয়া, গাইয়াও দিল। এবং আশা দিল যে, ডাকের চিঠিতে এক আধটি গান আমি ঢাকায় বসিয়া পাইব।

যে ৫০টি গান ছাপা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি একজন গান করিল। "তিঅড্ডা চাপি দে অহ্বাল্লি," কিন্তু তারা "তিঅড্ডা" বলিল না—"তিঅণ্ডা" বলিল। ভণিতায় আমাদেরই গানের ভণিতা দিল।

একজন বলিল,—প্রত্যেক বিহারেই একটা করিয়া বংশাবলী আছে এবং বংশাবলীর অনেকগুলি এক একজন সিদ্ধাচার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি কিন্তু কোন বংশাবলীই দেখিবার সময় পাই নাই। তাহারা বলে,—যে প্রসিদ্ধ ৮৪ জন সিদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের বংশ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিতর পাওয়া যায়। এখন ভিক্ষু বলিতে গেলে সন্ন্যাসী একেবারেই বুঝায় না—সকলেই "প্রজ্ঞা" লয় অর্থাৎ বিবাহ করে। তাহাদের ছেলেপিলেদের ৫ বছরে একটা দীক্ষা হয়, দীক্ষা হইলেই তাহারা ভিক্ষু হয়। ১৭ বছরে আর একটা দীক্ষা লয়, এ দীক্ষা লইলে তাহারা পূর্ণ-মাত্রায় পুরুতের কাজ করিতে পারে। তাহাদের বংশাবলীগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের অনেকে বাঙ্গালা দেশ হইতে নেপালের ললিতপত্তনে গিয়া বাস করিয়াছে। তাহারা এই ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য্য ছাড়া আরও কয়েকজন সিদ্ধাচার্য্যের নাম করে। তাহারা বলে,— ৮৪ সিদ্ধা ১০০০ বছরের লোক; বাকী সিদ্ধারা ৫০০ বছরের লোক। এই সব নূতন সিদ্ধাদের নামে বজ্র শব্দ প্রায়ই আছে;—বাগ্‌বজ্র, সুরত-বজ্র ইত্যাদি। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন বজ্রনাম-ধারী সিদ্ধ পুরুষ কাঠমুণ্ডা হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরে শাঁখু সহরের দুই মাইল দূরে একটু উঁচু পাহাড়ের উপর বজ্রযোগিনীর মন্দির স্থাপনা করেন।

৮৪ সিদ্ধা নাম লইয়া খুব গোলে পড়িয়াছি। ১৩২৫ সালে মিথিলার রাজা হরিসিংহের সভাপণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য তাঁহার বর্ণনরত্নাকর নামক গ্রন্থে ৮৪ সিদ্ধার নাম দিয়াছেন। গণিয়া ৮৪টি পাইলাম না – ৭৬টি পাইলাম। সংপ্রতি হল্যাণ্ড হইতে যাভা দ্বীপের ৮৪ সিদ্ধার নাম বাহির হইয়াছে। মিলাইয়া দেখিলাম, ১৬টি কি ১৭টি মিলিল। শ্রীযুক্ত ভন ম্যানন সাহেব এই হল্যাণ্ডের বইখানি এবং ইহা হইতে তিনি যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমি যে টেঙ্গুর হইতে ৩৩ জন গীতিকারের নাম দিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ২৩টি মিলিল, বাকী মিলে না।

যাভা দ্বীপের সিদ্ধগণের নাম

১। লুইপাদ, ইঁহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে।

২। লীলাপাদ – ইনি বিকল্পপরিহারগীতি লিখিয়াছেন।

৩। বিরূপা—ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার নাম বর্ণনরত্নাকরে আছে। নং ১০।

৪। ডোম্বী—ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে।

৫। শবরী—ইঁহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নাম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানে তাঁহার নাম শবর।

৬। সরহ—অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে। ১খানি দোহাকোষও পাওয়া গিয়াছে, অদ্বয়বজ্র তাহার টীকা করিয়াছেন।

৭। কঙ্করী।

৮। মীনপাদ—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ১।

৯। গোরক্ষ—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ২।

১০। চৌরঙ্গী—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৩।

১১। বীণাপাদ—ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে।

১২। শান্তিপাদ—ইঁহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার আর এক নাম রত্নাকর শান্তি। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৪৪। কিন্তু সে বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। শুধু শান্তি বলিলে শান্তিদেবও বুঝাইতে পারে।

১৩। তান্তীপাদ—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৫।

১৪। চামার—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৪। সেখানে তাঁর নাম চমরীপাদ।

১৫। খড়্গ।

১৬। নাগার্জ্জুন—ইঁহার নাগার্জ্জুনগীতিকা আছে। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ২২।

১৭। কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্ন—ইঁহার ১২টি গান পাওয়া গিয়াছে। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নং ১০। ইঁহার একখানি দোহাকোষ পাওয়া গিয়াছে। ইঁনিই যোগরত্নমালা নামে হেবজ্রতন্ত্রের একখানি টীকা লিখিয়াছেন।

১৮। কর্ণরি।

১৯। স্থগন—ইঁহার একখানি বই আছে—দোহাকোষতত্ত্বগীতিকা।

২০। নাড় পণ্ডিত—ইঁহার আরও নাম আছে—জ্ঞানসিদ্ধি, জ্ঞানসিংহ, যশোভদ্র। ইঁহার স্ত্রীর নাম নিগু ও জ্ঞানডাকিনী। ইঁহার একখানি বই আছে, বজ্রগীতিকা, আর একখানি নাড়পণ্ডিতগীতিকা।

২১। শালি।

২২। তিলোপা বা তেলিপো।

২৩। ছত্র—ইঁহার আর এক নাম কমল। কমল কঙ্গারি নামে বর্ণনরত্নাকরে ৬৯।

২৪। ভাদে অথবা ভদ্র—ভাদেপাদের ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ণনরত্নাকরে ভাদে ৩২, ভদ্র ৩৭, আবার ভদ্র ৭৪।

২৫। খণ্ডী অথবা ধোখণ্ডী।

২৬। অযোগী।

২৭। কাল।

২৮। ডোম্বী—৪ নম্বরে একবার গিয়াছে। ডোম্বী হেরুক নামে মগধ দেশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি কি?

২৯। কঙ্কণ—একটি গান পাওয়া গিয়াছে।

৩০। কম্বল—আমরা কম্বলাম্বরপাদের ১টি গান পাইয়াছি।

৩১। দিঙ্ক।

৩২। ভান্ধে অথবা ভাণ্ডারী।

৩৩। ভান্ধে বা তন্ত্রপাদ।

৩৪। কুকুরী—২টি গান পাইয়াছি।

৩৫। কুচী।

৩৬। ধাম—আর এক নাম গুণ্ডরী। ২টি গান পাইয়াছি।

৩৭। মহী—১টি গান পাইয়াছি।

৩৮। অচিন্ত্য—বর্ণনরত্নাকরে ৩৫এ আছে অচিন্তি, ১০তে আছে অচিত।

৩৯। ভবহি—বর্ণনরত্নাকরের ২১এ মবহ।

৪০। মলিন।

৪১। ভুসুকু—আর এক নাম শান্তিদেব ও আর এক নাম রাউতু। ৮টি গান পাইয়াছি। বর্ণনরত্নাকরে ৪৪ নম্বরের নামে একটু সন্দেহ আছে।

৪২। ইন্দ্রভূতি—ইনি উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিক্‌মহলে ইঁহার খুব খাতির।

৪৩। মেকু বা মেখ।

৪৪। কোটালি বা উদ্দালিপাদ।

৪৫। ক্রম্পরি।

৪৬। জালন্ধরী—বর্ণনরত্নাকরে ইনি ১৯।

৪৭। রাহুল।

৪৮। ধর্ম্ম—বর্ণনরত্নাকরে ইনি ধর্ম্মপা পতঙ্গ হইতে পারেন। আমাদের ধর্ম্মপা কি ইনি ?

৪৯। ধোকড়ি।

৫০। মেধিন বা মেদিনী।

৫১। শঙ্কজ বা পঙ্কজ।

৫২। ঘণ্টাপাদ।

৫৩। যোগী।

৫৪। চলুকি।

৫৫। গোরুড় বা বাগুরি।

৫৬। লুচিক বা লুঞ্চক।

৫৭। নগুণ।

৫৮। জয়ানন্দ। আমরা জয়নন্দীর ১টি গান পাইয়াছি।

৫৯। পচরি।

৬০। চম্পক।—ইনি বর্ণনরত্নাকরে ২৬।

৬১। ভিক্ষণ বা বিষাণ।—বর্ণনরত্নাকরে ২৪এ আছে ভিষাণ, ৪৬এ আছে ভীষণ।

৬২। তেলি।

৬৩। কুমারি বা কুম্ভকার। বর্ণনরত্নাকরে ১২ কমারি, ৫১ কুমারি।

৬৪। চপড়ি বা চর্পটি।

৬৫। মণিভদ্র।

৬৬। মেখলা। ইনি বর্ণনরত্নাকরে ১৫।

৬৭। কনখলা—ইনি বর্ণনরত্নাকরের ১৪।

৬৮। কল কল।

৬৯। কম্বলি, কন্দলি বা কম্বারি। ইনি বর্ণনরত্নাকরে ১৭।

৭০। ধহুতি।

৭১। উধিতি।

৭২। কপালী। ইনি বর্ণনরত্নাকরের ১১।

৭৩। কিরব (কিলপাদ)। ইঁহার এক পুস্তক আছে—মোহচর্য্যাগীতিকাবৃত্তি।

৭৪। সক্কর, সাগর, পুষ্কর বা সরোরুহ।

৭৫। সর্ব্বভক্ষ।

৭৬। নাগবোধি। ইনি কি বর্ণনরত্নাকরের ৫৬ নাগবলি ?

৭৭। দারিক—ইঁহার ১টি পদ আছে। বর্ণনরত্নাকরে ইনি দারিপা।

৭৮। পটলি বা পুত্তলি—ইনি বোধ হয়, বর্ণনরত্নাকরের ৩৮ পাত্তলি-ভদ্র।

৭৯। পনহ বা উপানহী।

৮০। কঙ্কিলী।

৮১। অনঙ্গ।

৮২। লক্ষ্মীঙ্করা শ্রীমতী। ইনি ইন্দ্রভূতির কন্যা। ইনি 'অদ্বয়সিদ্ধি' নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

৮৩। সমুদ, সমুদ্র বা সিংহল।

৮৪। ব্যালি।

বর্ণনরত্নাকরের বেশী নাম

৬। মুনিপা। ৭। কেদারিপা ৮। ধোঙ্গপা ১১। উন্মন। ১৮। গোবী। ২০। টোঙ্গী। ২৩। দৌলি। ২১। ঢেণ্ঢণ। ইহারই নাম ধেন্তন। ইহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। ২৮। ভুষরি। ২৯। বাকলি। ৩০। টুঙ্গী। ৩৩। চান্দন। ৩৪। কামরি। ৩৫। করবৎ। ৩৭। পলিহীহ। ৪০। ভাহু। ৪১। মীন। ৪২। নির্দ্দয়। ৪৫। ভর্ত্তৃহরি। ৪৭। ভটি। ৪৮। গগনপা। ৪৯। গমার। ৫০। মেন্দুরা। ৫২। জীবন। ৫৩। অঘোসাধব। ৫৪। গিরিবর। ৫৫। সিয়ারি। ৫৭। মিভবৎ। ৫৮। সারঙ্গ। ৫৯। বিবিকিবজ্র। ৬০। মগরধ্বজ। ৬২। বিচিত। ৬৩। নেচক। ৬৪। চাটল। ইনি চাটিলও হইতে পারেন। চাটিলের ১টি গান পাইয়াছি। ৬৫। নাচন। ৬৬। ভীলো। ৬৭। পাহিল। ৬৮। পাশল। ৭০। চিপিল। ৭১। গোবিন্দ। ৭২। ভীম। ৭৩। ভৈরব। ৭৫। ভমরি। ৭৬। ভুরুকুটি।

আমি যে সকল গীতিকারের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে এইগুলি ৮৪ সিদ্ধার নামের মধ্যে নাই।

৩। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ইহার পুস্তক বজ্রাসনবজ্রগীতি, চর্য্যাগীতি, ধর্ম্মগীতিকা।

১৬। আর্য্যদেব বা আয়দেব বা বৈরাগী নাথ। ইহার ১টি গান আমরা ছাপাইয়াছি।

১৯। তাড়ক পাদ।

২৪। অদ্বয়বজ্র—ইহার চতুরবজ্রগীতিকা নামে এক গীতিপুস্তক আছে। ইনি সরোরুহবজ্রের দোহাকোষের টীকা করিয়াছেন। ইহার ছোট ছোট ২১খানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

২৭। মৈত্রীপাদ—ইহার গীতিকার নাম—গুরুমৈত্রীগীতিকা।

২৮। ধৃষ্টিজ্ঞান—ইহার ১খানি গীতিকা আছে, ১খানি বজ্রগীতিকা আছে।

২৯। মাতৃচেট—ইহার গীতিকার নাম—মাতৃচেটগীতিকা।

৩০। বৈরোচন—ইহার গীতিকার নাম—বৈরোচনগীতিকা।

৩২। মহাসুখতাবজ্র।

আমার বোধ হয় অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়েই বহুসংখ্যক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। নাথপন্থ যোগীদিগের মধ্যে এইরূপ অনেকগুলি সিদ্ধ পুরুষের নাম পাইয়াছি। তাই মনে হয় যে, ৮৪ সিদ্ধা একটা পুরাণ কথা মাত্র। কোন সম্প্রদায়েই এত সিদ্ধ পুরুষ থাকা সম্ভব নয়, সকল সিদ্ধ পুরুষের তালিকায়ই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া জুটিয়াছে। তাই একটি তালিকা আর একটি

তালিকার সঙ্গে মেলে না। এই সব তালিকা সংশোধন অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। কখন হইয়া উঠিবে বলিয়া বোধ হয় না।

আমি নেপালে একটি ভুটিয়া ছবি দেখিয়াছিলাম। উহাতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি আছে এবং আরও কিছু বেশী আছে। ছবির ফটোগ্রাফ আনিয়াছি। বড় জিনিস ছোট করিতে গিয়া ফটোগ্রাফ বিশেষ স্পষ্ট হয় নাই। নামগুলি ভুটিয়া অক্ষরে ভুটিয়া ভাষায় লেখা, সংস্কৃত তর্জ্জমা এখন করিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রথমেই লুইপাদের চিত্র। লুইপাদের আর এক নাম মৎস্যান্ত্রাদপাদ। তিনি একটি বড় মাছের পেট চিরিয়া, তাহাতে একটা পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আবার তাঁহার নেওয়ারি ছবিও আনিয়াছি। তাঁহার পাশে অনেকগুলি বড় বড় রুই মাছ পড়িয়া আছে। উহার একটির পেট চিরিয়া তিনি কাঁচা নাড়ী খাইতেছেন। ছুটিই কল্পনায় চিত্র। নামের মানে হইতে চিত্র কল্পনা করা হইয়াছে। মৎস্যান্ত্রাদপাদ, সুতরাং মাছের পোটার পা দেওয়া হইয়াছে। অথবা পা দিয়া মাছের পোটা খাইতেছেন। নেওয়ারীরা মৎস্যান্ত্রাদ মানে করিয়াছে, মাছের আঁতরি কাঁচা খায়। ছুটি দেশই পাহাড়ের উপরে, মাছের সঙ্গে লোকের বড় সম্পর্ক নাই; মাছ কেমন করিয়া খাইত হয়, জানে না। নামের ব্যাখ্যায় এক অদ্ভুত চিত্র তৈয়ার করিয়াছে। আমরা মাছ খাই, আমাদের দেশে মাছ অনেক আছে। আমরা মৎস্যান্ত্রাদের অর্থ করিয়াছি—মাছের পোটা এবং মাছের পোটায় তৈরী তরকারী খাইতে ভালবাসিতেন।

কুক্কুরীপাদ—একটা কুকুর লইয়া বসিয়া আছেন। এটাও নামের মানে হইতে ছবির কল্পনা করা মাত্র। কিন্তু কুক্কুরীপাদের মুখের চেহারাটা ঠিক উড়েদের মত। টেঙ্গুরে বলে, তিনি উড়ে ছিলেন। তাঁহার গানের শব্দ দেখিয়া আমার ত বোধ হয়, তিনি উড়ে ছিলেন।

নেওয়ারীতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি পাইলাম না—অষ্টসিদ্ধার ছবি আনিয়া দিল। তাহার মধ্যে ৪ জন সিদ্ধ পুরুষ ঠিক। কিন্তু আর ৪ জন মহারাজিকগণের মহারাজা। বৈশ্রবণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিরূপাক্ষ, বিরূঢ়ক। সুতরাং এ সিদ্ধের ছবি আমরা পরিত্যাগ করিলাম। আবার আর এক সেট আনিয়া দিল। এবার সবগুলিই সিদ্ধ পুরুষ। আমরা সবগুলিরই ফটোগ্রাফ লইয়া আসিয়াছি। কিন্তু ছাপাইয়া উঠিতে পারি নাই। ছাপাইলেও তাহাতে চারিজনের নাম আছে, আর চারিজনের নাম নাই। এ সব ফটোগ্রাফ ছবি হইতে হইয়াছে। একখানি মাত্র ফটোগ্রাফ পাথর হইতে আনিয়াছি—সেখানি দারিক সিদ্ধার। ফটোগ্রাফ লইতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে দারিক বসিয়া আছেন। মূর্ত্তিও খুব পুরাণ। দারিকের একটি গান আমাদের ছাপা আছে। আর একটি দিতেছি,—

কোই রে বংশা বাজি রে বীণা।
অহুহুত সর্ব্বদেব তিহুঅন রিণা॥
অনুপম বুজি রে দারক লইআ।
তেহি রে রিদ্ধি সিদ্ধি রোহি প্রসাদা॥

গঙ্গা যমুনাএ মইয়ন্তি সখি রে
রবি শশি গগন দুআরে ।
উদি গের চন্দ্রা রবি অষ্টাজে
গগন শেখর মাঝে পবন হেণ্ডারে ॥
পবন পঞ্চাশত একুরে বন্ধা ।
বিপরীত করণে দারক সিদ্ধা ॥

আপনারা দেখিবেন, কোন কাজটাই পুরা হয় নাই। বহুসংখ্যক গানও সংগ্রহ হয় নাই। বংশাবলীও সংগ্রহ হয় নাই, ছবিও সংগ্রহ হয় নাই। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সংগ্রহ হইবার আশা আছে। তবে আমার এইমাত্র বলার কথা যে, খৃঃ ১০ম ১১শ শতে বাঙ্গালা সাহিত্যটা খুব বিস্তৃত ছিল। লেখকদের জীবনচরিত লেখার রীতি ছিল। তাঁহাদের চিত্র রক্ষার রীতি ছিল। কিন্তু আমরা সে সব ভুলিয়া গিয়াছি। নেপালে বৌদ্ধ নেওয়ারদিগের নিকট খুজিলে সবটাই মিলিতে পারে। খোজাটা বড় দরকার। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার সাহিত্যের ইতিহাস এখন নেওয়ারদিগের হাতেই বেশী আছে। নেওয়ারী ভাষায় কি আছে, জানি না। কারণ, নেওয়ারী শিখি নাই। সংস্কৃত ভাষাতেই অনেক আছে। কৃষ্ণাচার্য্য হেবজ্রতন্ত্রের টীকা করিয়াছেন, হেবজ্রতন্ত্রেই বাঙ্গালা গান অনেক রহিয়াছে। সুতরাং সেগুলি কৃষ্ণাচার্য্য এবং হেবজ্রতন্ত্র, দুইএরই আগে;—কত আগে, জানি না; অন্ততঃ ১০০ বছর আগে ত হবে। তাহা হইলেই সাহিত্যটা গিয়া খ্রীঃ নবম শতে পড়িল। এইরূপ অভয়াকর গুপ্ত বুদ্ধকপালতন্ত্রের টীকা করিয়াছেন। তিনি যখন টীকা লেখেন, তখন পালবংশের রামপালদের ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ২৫ বৎসরে পড়িয়াছেন। তিনি অনেকগুলি বাঙ্গালা গান তুলিয়াছেন। এক জায়গায় খানিকটা বাঙ্গালা তুলিয়া সংস্কৃতে তাহার টীকা করিয়াছেন। সুতরাং এটা বুদ্ধকপালতন্ত্রেরই বাঙ্গালা। তাহা হইলে বুদ্ধকপালতন্ত্র লেখার পূর্ব্বেই সেটা ছিল নহিলে যে তন্ত্রটা লিখিয়াছে সে বুদ্ধের মুখে সে কথা দিতে পারিত না।

আর একটা কথা। মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণয় নামে একখানি বই আছে। বইখানি মৎস্যেন্দ্র-পাদাবতারিত। শিব পার্ব্বতীকে অতি গোপনে সম্ভোগকালে যে সব গূঢ় কথা বলিয়াছিলেন, সে ত আর কেহ শুনিতে পায় নাই। কেবল উভয়ের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই শুনিয়াছিলেন। তাঁহারাই ইহা অবতারিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কৈলাস হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া আনিয়াছিলেন। মৎস্যেন্দ্র-নাথ তাঁদেরই একজন। মৎস্যেন্দ্রনাথের আর একটা নাম মচ্ছঘ্নপাদ। আমি ভাবিলাম—তবে কি তিনি কৈবর্ত্ত? শেষ পড়িতে পড়িতে দেখি, তিনি সত্য সত্যই কৈবর্ত্ত ছিলেন—তাঁহাকে অনেক জায়গায় কেবট পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, ধীবরও বলা হইয়াছে। পার্ব্বতী একবার মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কেওটের বাড়ী কেন গেলে? বইখানি পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল, কোনও ব্রাহ্মণের ছেলে কতই মূর্খ হউক, এরূপ সংস্কৃত লিখিবে না। শেষ দাঁড়াইল যে, উহা কেওটের লেখা। তার পর আবার দেখি, মৎস্যেন্দ্রের বাড়ী চন্দ্রদ্বীপে ছিল। চন্দ্রদ্বীপ হইতে সাগর বেশী দূর নয়। এ সব কথাই পুঁথিতে লেখা আছে। এ চন্দ্রদ্বীপ যে বরিশালের চেঁদো, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করিবার

কারণ নাই। ইঁহাদের গ্রন্থেও অনেক সময় বাঙ্গালা পাওয়া যায়। সে বাঙ্গালাও সিদ্ধাচার্য্যদের আগে, বৌদ্ধ তন্ত্রগুলিরও আগে; কত আগে, জানা যায় না। নাথদের তারিখ ওয়াশীলজু ৮০০ খৃঃ বলিয়া গিয়াছেন। আমি বলি, বরং আগে হইবে ত পরে নয়। কারণ, চন্দ্রদ্বীপ অনেক কাল হইতে তান্ত্রিকদের একটা বড় আড্ডা এবং উহারই নিকটে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার গ্রামকে গ্রাম লইয়া নাথপন্থী যোগীরা বাস করে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ভ্রম-সংশোধন

২৮শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকায় "শ্রীহট্ট-ভাটেরার তাম্রশাসন" প্রবন্ধের কয়েকটি স্থলে মুদ্রাঙ্কণের ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। বিশেষ প্রমাদগুলির শুদ্ধিপত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৮	১৭	নবপক্ষিণে	নবপক্ষকে
,,	২২|২৩	(Nava girvana) and Khatavana	(Nava girvana and Kharavana)
,,	৩১|৩২	"স্কন্দ" ও শিলিচটলোর	"স্কন্দ ও শিলিচটলো"
,,	৩৩	যেন	যে
১৭৯	২১	খাজি	খানী
,,	২৬	Irsilam	Irsilan
১৮০	৩০	even	ever
১৮২	১২	Sagare	Sagara
,,	২০	bouts'	boats'
,,	২৮	২,০২৬	১০২৬
,,	৫০	foot	boat
,,	৩৩	Account	Accounts

কঙ্করীপাদ

নাগার্জ্জুনপাদ

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৯শ ভাগ, ১ম সংখ্যা— ৪৮ পৃষ্ঠা)

Emerald Ptg. Works.

লুইপাদ

কুক্কুরীপাদ

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৯শ ভাগ, ১ম সংখ্যা—৫১ পৃষ্ঠা)

Emerald Ptg. Works, Calcutta

চিত্র-লক্ষণ *

সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে প্রাচীন ভারতের চিত্র ও ভাস্কর্য্য শিল্প লইয়া চতুর্দ্দিকে আলোচনা হইতেছে। এই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের শিল্পশাস্ত্রাদির দিকে পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে শিল্পশাস্ত্রের অনুসন্ধান এবং তল্লিখিত-তথ্যের সহিত মিলাইয়া চিত্র ও ভাস্কর্য্য শিল্পের অধুনাবশিষ্ট নিদর্শনগুলি বিচার করিবার দিকে একটা চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত শিল্পশাস্ত্র লইয়া এদেশে আলোচনা হইয়াছে, তাহার মধ্যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যশিল্পসম্বন্ধে যত তথ্য পাওয়া যায়, চিত্র-শিল্প-সম্বন্ধে তত পাওয়া যায় না। কিন্তু ৯ বৎসর পূর্ব্বে বের্টোল্ড লাউফের (Berthold Laufer) নামক এক জন জার্ম্মান পণ্ডিত তিব্বতীয় তাঞ্জুর-গ্রন্থমালা হইতে "রিমোর্জিশাস্তি" বা "চিত্র-লক্ষণ" নামক একখানি শিল্পশাস্ত্র জার্ম্মান অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। মূলগ্রন্থখানি তিব্বতী-ভাষায় এবং অনুবাদ জার্ম্মান ভাষায় আবদ্ধ হওয়াতে, আমাদের দেশে গ্রন্থখানি এখনও সেরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অথচ নানা দিক্ দিয়া ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান্। গ্রন্থখানির প্রতি বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গ্রন্থনিবিষ্ট বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এবং তৎসম্পর্কীয় কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দিয়াই আমি ক্ষান্ত থাকিব। ইহার ফলে যদি বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজে গ্রন্থখানির সম্যক্ আলোচনা হয় এবং গ্রন্থ-সম্পর্কীয় প্রশ্ন ও সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা হয়, তাহা হইলেই নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিব।

এ কথা সকলেই জানেন যে, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর, বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তকের তিব্বতী অনুবাদ প্রস্তুত হয় এবং এই সকল পুস্তক লইয়া কাঃ জুর এবং তাঞ্জুর নামক দুইটি বৃহৎ গ্রন্থমালা গ্রথিত হয়। আমাদের আলোচ্য "চিত্র-লক্ষণ" পুস্তকখানি তাঞ্জুর গ্রন্থমালা-ভুক্ত। উক্ত গ্রন্থমালার সূত্র-বিভাগের ১২৩ খণ্ডে চারিখানি শিল্প-শাস্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে,—

১। দশতালন্যগ্রোধপরিমণ্ডলবুদ্ধপ্রতিমালক্ষণনাম।

২। সম্বুদ্ধভাষিতপ্রতিমালক্ষণবিবরণনাম্।

৩। চিত্রলক্ষণম্।

৪। প্রতিমামানলক্ষণনাম।

চারিখানি গ্রন্থই সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ। মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। লাউফের সাহেব Dokumente der Indischen Kunst" অর্থাৎ "ভারত-শিল্পের লিপিপ্রমাণ" গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডে "চিত্র লক্ষণ" গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে অবশিষ্ট তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন।

---

* ১৩২৯ বৈশাখ মাসে মেদিনীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনের ইতিহাস শাখায় পঠিত।

"চিত্রলক্ষণ" তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মূল গ্রন্থে আরও অধ্যায় ছিল। তৃতীয় অধ্যায়ে নানা পরিমাণ ও নানা আকৃতির চক্ষু উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন, ৩৬ প্রকার নয়নভঙ্গী আছে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই নয়নভঙ্গী বিবৃত হইবে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সংস্করণে সেরূপ কোন অধ্যায় পাওয়া যায় না। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থ মূল গ্রন্থের অংশমাত্র ধরিয়া লইতে হইবে।

তিন অধ্যায়ের মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়েই চিত্রশিল্পের রীতি-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায় ভূমিকামাত্র। প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যা ও "চিত্র-লক্ষণ" গ্রন্থের পার্থিব উৎপত্তি আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার দৈব উৎপত্তির কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায়ের শেষে "নগ্নজিৎ-কৃত চিত্র-লক্ষণ" বলিয়া গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে নগ্নজিতের নাম নাই, কেবল "চিত্র-লক্ষণের তৃতীয় অধ্যায়" এই কয়টি কথা আছে।

প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার পার্থিব-উৎপত্তি-সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে, তাহার প্রধান পাত্র রাজা নগ্নজিৎ এবং তিনিই প্রথম পৃথিবীতে চিত্রবিদ্যার প্রবর্ত্তন করেন। চিত্রলক্ষণকার এই নগ্নজিৎ কে?—এ প্রশ্ন আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উপরোক্ত উপাখ্যানটি জানা আবশ্যক। পুরাকালে জয়জিৎ নামক একজন যশস্বী ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণ সুখ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা তপশ্চর্য্যা দ্বারা দেবগণ অপেক্ষা পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। একদা এক ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন,—"হে রাজন্! আপনার রাজত্বে অকালমৃত্যুর উদ্ভব হইল কিরূপে? নিশ্চয় আপনি অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়াছেন। নতুবা আমার বালকপুত্র আজ অকালে প্রাণত্যাগ করিবে কেন? আপনার যদি ব্রাহ্মণে অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে আমার প্রিয় পুত্রকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনুন।"

রাজা তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে যমকে সম্মুখে আনিলেন ও ব্রাহ্মণতনয়কে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। যম অস্বীকার করিলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। শেষে যম যখন পরাজিতপ্রায়, তখন ব্রহ্মা আসিয়া বিরোধ মিটাইয়া দিলেন। তিনি রাজাকে বুঝাইলেন যে, জীবন মৃত্যু কর্ম্মফল অনুসরণ করে; যম এ নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না। তবে রাজার তৃপ্ত্যর্থ তিনি বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ-তনয়ের আকৃতি অনুসারে বর্ণসংস্কারে একটি চিত্র অঙ্কিত কর। রাজা তাহাই করিলেন ও ব্রহ্মা সেই চিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মা তখন রাজাকে বলিলেন,—"তুমি অদ্য যেরূপ নগ্নপ্রেতদিগকে জয় করিলে, চিরকাল সেইরূপ নগ্নজিৎ হইয়া থাক। তোমার নাম আজ হইতে নগ্নজিৎ হইল। আজ হইতে যমলোকের কোন অধিবাসী সূর্য্যালোকে আসিতে পারিবে না।" লাউফের সাহেব এই স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিব্বত ও চীনদেশের চিত্রবিদ্যায় এটি একটি মূলতত্ব যে, চিত্রকর দেব-দৈত্যাদির চিত্রাঙ্কন করিয়া তাহাদিগকে বশ করিতে পারেন।

ব্রহ্মা আরও বলিলেন,—"আমার প্রভাবে তুমি ব্রাহ্মণতনয়ের চিত্র অঙ্কন করিতে পারিলে। জীবলোকে ইহাই প্রথম চিত্র। এই চিত্রবিদ্যার দ্বারা জগতের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে তদ্দ্বারা তুমি জগতে পূজার্হ হইলে।"

এই উপাখ্যান হইতে জানা গেল, নগ্নজিৎ একজন রাজা ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে একাধিক স্থলে নগ্নজিতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণে (৮ম কাণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ) এক গান্ধাররাজ নগ্নজিতের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণকার যজ্ঞবিধি সম্বন্ধে নগ্নজিতের একটি মত উদ্ধৃত করিয়া অবজ্ঞার সহিত বলিতেছেন,—"এ মত একজন রাজন্যবন্ধুর মত মাত্র।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৭ম কাণ্ডে আছে যে, গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ পর্ব্বত ও নারদ ঋষি কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। জৈনসূত্রে গান্ধাররাজ নগ্গতি বা নগ্নজিতের উল্লেখ আছে। যে সকল রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া শ্রমণ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। জৈনশাস্ত্রে তিনি চারি জন প্রত্যেকবুদ্ধের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। এ পর্য্যন্ত কিন্তু এই গান্ধাররাজ নগ্নজিতের সহিত চিত্রলক্ষণকার নগ্নজিতের কোন সম্পর্ক পাওয়া গেল না। মহাভারতেও দুই স্থলে নগ্নজিতের উল্লেখ আছে। আদিপর্ব্বের ৬৭ অধ্যায়ে আছে,—

ইষুপান্নাম যস্তেষামসুরাণাং বলাধিকঃ।
নগ্নজিন্নাম রাজাসীদ্ভুবি বিখ্যাতবিক্রমঃ।

অর্থাৎ মহাভারতবর্ণিত যুগে যে সমস্ত অসুররাজ পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়রাজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইষুপ নামক দানব বিখ্যাতবিক্রম রাজা নগ্নজিৎরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আদিপর্ব্বের ৬৩ অধ্যায়ে এই নগ্নজিতের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়,—

প্রহ্লাদশিষ্যো নগ্নজিৎ সুবলশ্চাভবত্ততঃ।
তস্য প্রজাধর্ম্মহন্ত্রী জজ্ঞে দেবপ্রকোপনাৎ॥
গান্ধাররাজপুত্রোঽভূচ্ছকুনিঃ সৌবলস্তথা।
দুর্য্যোধনস্য জননী জজ্ঞাতেঽর্থবিশারদৌ॥

অর্থাৎ গান্ধারী ও শকুনির পিতা গান্ধাররাজ সুবলই নগ্নজিৎ। তাঁহাকে "প্রহ্লাদশিষ্য" বলা হইয়াছে। চিত্রলক্ষণসঙ্কলয়িতা প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণের পরই বলিতেছেন যে, এই গ্রন্থে বিশ্বকর্ম্মা, প্রহ্লাদ ও নগ্নজিৎ—এই তিন জনের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ একত্র করিয়া সংক্ষেপে চিত্রলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। লাউফের সাহেব অনুমান করেন, এই তিন জন তিনটি বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। অন্ততঃ তিন জনের নামে তিনটি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতির ধারা চলিয়া আসিয়াছে। এ অনুমানের কোন যথার্থ ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে নগ্নজিৎ ও বিশ্বকর্ম্মা, উভয়েরই বিস্তৃত উল্লেখ আছে। কিন্তু উপরোক্ত স্থান ভিন্ন অন্য কোথাও প্রহ্লাদের নাম নাই। নগ্নজিতের সহিত বিশ্বকর্ম্মার সম্পর্ক যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দুইজনকে দুইটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির প্রবর্ত্তয়িতা মনে করিবার কোন হেতু নাই। চিত্রবিদ্যার যে উৎপত্তিকাহিনী উপরে প্রদত্ত হইল, তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও নগ্নজিৎই প্রধান পাত্র। নগ্নজিৎ ব্রহ্মার আদেশে ও

অনুপ্রেরণায় প্রথম চিত্র অঙ্কিত করিলেন। নগ্নজিৎ কিন্তু তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি কিয়ৎকাল পরে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপদেশপ্রার্থী হইলেন ও প্রশ্ন করিলেন,—"চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি কিরূপে হইল? বিভিন্ন চিত্রের লক্ষণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাপ কিরূপ?" ব্রহ্মা বলিলেন,—"সর্ব্বপ্রথমে বেদ ও যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়াছিল। চৈত্য নির্ম্মাণ করিতে হইলেই চিত্রাঙ্কন আবশ্যক হয়। এই জন্য চিত্রবিদ্যা বেদস্বরূপ পরিগণিত হয়। আমিই প্রথম মনুষ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি এবং আমিই মানুষকে প্রথম এই বিদ্যা শিখাইয়াছি।" ব্রহ্মার এই উক্তির সম্যক্ তাৎপর্য্য ও মূল্য পরে আলোচনা করিব, আপাততঃ বিশ্বকর্ম্মার সহিত চিত্রলক্ষণের কি সম্বন্ধ, দেখা যাউক। ব্রহ্মা চিত্রবিদ্যার নানারূপ স্তুতি করিয়া ও চিত্রশিল্পকে সকল শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া বলিলেন,—"তুমি এখন দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন কর। সেই দেবলোকের নগ্নজিৎ তোমাকে চিত্রের লক্ষণ, নিয়মাবলী ও পরিমাণ শিখাইয়া দিবেন।" এখানে দেখা যায়, "নগ্নজিৎ" শব্দ চিত্রশিল্পী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, নগ্নজিৎ তখন বিশ্বকর্ম্মার নিকট গিয়া উপদেশ লইলেন। চিত্রলক্ষণ-গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ মূলগ্রন্থ নগ্নজিতের প্রতি বিশ্বকর্ম্মার উপদেশরূপে রচিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের গ্রন্থানুসারে নগ্নজিৎ বিশ্বকর্ম্মার শিষ্যমাত্র, উভয়কে দুইটি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতির মুখপাত্র বলিয়া মনে করা যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থের সূচনা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে প্রহ্লাদের কোন উল্লেখ নাই। এখন মহাভারতের শ্লোকে পাইতেছি, গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ প্রহ্লাদের শিষ্য। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে, প্রাচীন ঐতিহ্যের গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ এবং চিত্রলক্ষণোক্ত নগ্নজিৎ একই ব্যক্তি। যদি এ অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে চিত্রলক্ষণোক্ত শিল্পধারা অতি প্রাচীনকালেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, মনে করা যাইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত কিন্তু গান্ধাররাজ নগ্নজিতের সম্পর্কে চিত্রবিদ্যার কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। চিত্রলক্ষণের নগ্নজিৎ একজন বিখ্যাত রাজা, গান্ধাররাজ নগ্নজিৎও একজন বিখ্যাত রাজা। চিত্রলক্ষণের নগ্নজিৎ প্রহ্লাদের সহিত একত্র উল্লিখিত, মহাভারতোক্ত গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ প্রহ্লাদশিষ্য বলিয়া অভিহিত। এই পর্য্যন্ত যোগসূত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু নগ্নজিতের চিত্রলক্ষণ যে অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতায় অন্ততঃ দুই স্থলে নগ্নজিতের শিল্পমতের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতার ৫৮ অধ্যায়ে এক স্থলে আছে,—

"নগ্নজিতা তু চতুর্দ্দশদৈর্ঘ্যেণ দ্রাবিড়ং কথিতম্।"

অন্য স্থলে আছে,—

"আস্যং সকেশনিচয়ং ষোড়শদৈর্ঘ্যেণ নগ্নজিৎপ্রোক্তম্।"

চিত্রলক্ষণ গ্রন্থে মুখমণ্ডলকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—চিবুক ৪ অঙ্গুলি, নাসিকা ৪ অঙ্গুলি, কপাল ৪ অঙ্গুলি—মোট ১২ অঙ্গুলি। ইহা ব্যতীত চক্রবর্ত্তীর মস্তকোপরি উষ্ণীষ বলিয়া যে

কেশগুচ্ছ থাকে, তাহার মাপ ৪ অঙ্গুলি। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ১৬ অঙ্গুলিই হইল। অতএব বরাহ-মিহিরধৃত নগ্নজিৎ এবং চিত্রলক্ষণকার নগ্নজিৎ এক ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব। বৃহৎসংহিতার উক্তি হইতে বুঝা যায় না—নগ্নজিৎ ভাস্কর্য্যবিৎ ছিলেন, কি চিত্রবিৎ ছিলেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তিনি চিত্রবিৎ ছিলেন।

এখন চিত্রলক্ষণ গ্রন্থের কয়েকটি বিশেষত্বের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। গ্রন্থখানি তিব্বতী বৌদ্ধদিগের ব্যবহারের জন্ত বৌদ্ধশাস্ত্রপিটক তাঞ্জুর গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট। উক্ত গ্রন্থমালাভুক্ত অন্ত তিনখানি শিল্পশাস্ত্র বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ, বুদ্ধপ্রতিমা-লক্ষণ নির্দ্দেশ করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। চিত্রলক্ষণ গ্রন্থে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। ইহা সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুগ্রন্থ। গ্রন্থের সূচনায় যে সমস্ত দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য দেবতা। প্রথমেই যথাক্রমে মহাদেব, ব্রহ্মা, নারায়ণ ও তাঁহাদের শক্তি পার্ব্বতী, সরস্বতী ও পদ্মাবতীকে নমস্কার করা হইয়াছে। পরে পুনরায় বিশেষভাবে সর্ব্ববিদ্যার আকর মহাদেবকে নমস্কার করা হইয়াছে। দশম হইতে উনত্রিংশ শ্লোকে চন্দ্র, মহাদেব, বিষ্ণু ও ইন্দ্র, সূর্য্য ও বরুণ, অগ্নি ও পবন, প্রজাপতি-বিশ্বকর্ম্মা, নগ্নজিৎ ও চিত্রবিদ্যার অন্তান্ত সমস্ত আচার্য্যগণকে নমস্কার করা হইয়াছে। মহাদেবকে বারংবার নমস্কার করায় অনুমান হয়, আলোচ্য গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা শৈব ছিলেন। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে মহাদেবের কোন উল্লেখ না থাকায় এবং ব্রহ্মারই প্রাধান্ত দেখিয়া মনে হয়, নগ্নজিৎ-শিল্পপদ্ধতির মূলে শৈব প্রভাব ছিল না। গ্রন্থমধ্যে চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আছে, তাহার কতক অংশ পূর্ব্বেই দিয়াছি। তাহাতে প্রধান পাত্র একজন হিন্দু রাজা, একজন ব্রাহ্মণ, যম, ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্ম্মা। ইহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেরই ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মার একটি উক্তি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন,—"সর্ব্বপ্রথমে বেদ ও যজ্ঞের সৃষ্টি হয়। চৈত্যনির্ম্মাণ করিতে হইলেই চিত্রাঙ্কন আবশ্যক হয়। অতএব চিত্রবিদ্যা বেদ বলিয়াই পরিগণিত।" এস্থলে বৈদিক যজ্ঞবিধির সহিত চিত্রবিদ্যার যোগস্থাপনের একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে অন্ত কোন ভারতীয় গ্রন্থে বৈদিক যজ্ঞ-বিধির সহিত চিত্রবিদ্যা বা ভাস্কর্য্যের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায় নাই। আমরা সকলেই জানি, বৈদিক যজ্ঞে বিগ্রহাদির স্থান নাই। কিরূপে ও ঠিক কোন্ সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দেবদেবীর মূর্ত্তি-গঠন বা প্রতিমা-চিত্রণ আরম্ভ হইল, তাহা জানা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই যে ইহার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, জাতক ও ললিতবিস্তরাদি বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাবেল সাহেব তাঁহার (Ideals of Indian Art) গ্রন্থে বৈদিক-যুগেই ভারত-শিল্পের মূলতত্ত্বের সন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলেন, বৈদিক মন্ত্রে ঋষিগণ যে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের কল্পনার অভাব ছিল না। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু এই কল্পনাকে তাঁহারা রূপদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তথাপি বৈদিক যজ্ঞবেদীর পরিকল্পনায় ও যূপস্তম্ভাদি নির্ম্মাণে তাঁহাদের শিল্পকল্পনা কতকপরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। চিত্র-

লক্ষণকার বৈদিক যজ্ঞের সম্পর্কে চৈত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে চৈত্য-শব্দের উল্লেখ বিরল। আমরা বৌদ্ধ চৈত্যের সহিতই বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞসম্পর্কে এক প্রকার চৈত্যের উল্লেখ চিত্রলক্ষণ ব্যতীত অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৯৪ অধ্যায়ে এক সুহোত্র রাজার বর্ণনা আছে,—

তেষাং জ্যেষ্ঠঃ সুহোত্রস্তু রাজ্যমাপ মহীক্ষিতাম্॥
রাজসূয়াশ্বমেধাদ্যৈঃ সোঽযজদ্বহুভিঃ সবৈঃ।

*   *   *   *

সুহোত্রে রাজনি তদা ধর্ম্মতঃ শাসতি প্রজাঃ॥
চৈত্য যূপাঙ্কিতা চাসীদ্ভূমিঃ শতসহস্রশঃ।
প্রবৃদ্ধজনশস্যা চ সর্ব্বথৈব ব্যরোচত॥

রাজা সুহোত্র রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি বহু যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পৃথিবী শত-সহস্র চৈত্য-যূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। এস্থলেও বৈদিক যজ্ঞের সম্পর্কে চৈত্য ও যূপের একত্র উল্লেখ দেখা যায়। হাবেল বলেন, বৈদিক কাষ্ঠযূপই ভবিষ্যৎকালের স্তম্ভাদির মূল। বৈদিক চৈত্য সেইরূপ ভবিষ্যৎকালের চৈত্যাদির মূল কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিত্রলক্ষণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবলোকে চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা নগ্নজিতের নিকট এই কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। বিশ্বসৃষ্টির পর ব্রহ্মা সৃষ্টির কল্যাণ-কামনায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। তাঁহার ধ্যানপ্রভাবে মহাদেব, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ দিব্য প্রভাবসম্পন্ন হইলেন। তাঁহারা তখন স্বীয় প্রভাববলে দিব্যশ্রীসম্পন্ন সুলক্ষণাক্রান্ত, সুবিভক্তাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপবান্ মূর্ত্তি বিকসিত করিলেন। তাঁহাদের মূর্ত্তি নানারূপ ধারণ করিল এবং বস্ত্রালঙ্কার-শোভিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন হস্তে ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন গুণ চিত্রমধ্যে প্রকটিত হইল, এবং এইরূপে দেবতারা নিজেই নিজেদের মূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন। দেবগণ স্ব স্ব চিত্র দেখিয়া আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত হইলেন এবং ব্রহ্মা বলিলেন, "সুন্দর হইয়াছে। এখন হইতে এই সকল মূর্ত্তির নিকটেই লোকে পূজোপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইবে।" দেবগণ "তথাস্তু" বলিয়া সানন্দে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপে পূজা ও বলিবিধি উৎপন্ন হইল। এই কাহিনীর মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ছাপ। এখানেও বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম্মের কোন চিহ্নমাত্র নাই। প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার পার্থিব উৎপত্তির কথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার দৈব উৎপত্তির কথা। প্রথম অধ্যায়ে মানুষ স্বাভাবিক স্নেহপ্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া কিরূপে মনুষ্যচিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইল, তাহার কথা; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্বের কল্যাণের জন্য জীবলোকের পক্ষে দেবোপাসনার পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মপ্রণোদিত হইয়া দেবগণ কিরূপে স্ব স্ব মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন, তাহার কথা। দুই কথাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দিক্ দিয়া আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-মান দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যেও বিশেষভাবে কোন বৌদ্ধ নিদর্শন নাই। সূচনায় বিশ্বকর্ম্মা বলিতেছেন, রাজা ও অন্যান্য নরগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

দেওয়া যাইতেছে। পরে আরও বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন,—"দেবতা, অসুর, নাগেন্দ্র, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, বামন, অরিভূ, পিশাচ, প্রেত, কবন্ধ, বিদ্যাধর—সকলের পক্ষেই নিমলিখিত মানগুলি খাটিবে।" বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু রাজা ও চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ ও মান লইয়াই গ্রন্থকার ব্যস্ত। কোন কোন স্থলে বিশেষ করিয়া দেবতা বা সাধারণ লোক বা যোগী বা নারীচিত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা আছে। গ্রন্থের শেষে বিশ্বকর্ম্মা বলিতেছেন,—"চক্রবর্ত্তিলক্ষণ ও রাজ-লক্ষণ বিশেষভাবে বলা হইল। অন্যান্য সমস্ত মানুষের চিত্রলক্ষণ সম্বলিত ১২০০০ শাস্ত্র আছে। ব্রহ্মা এই সমগ্র শাস্ত্রকে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সে সমস্ত পঞ্চশ্রেণীর চিত্র-শাস্ত্র বলিতে গেলে অসংখ্য গ্রন্থের প্রয়োজন। তবে তোমাকে চক্রবর্ত্তি-লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতেই মোটামুটিভাবে সর্ব্বপ্রকার মহাপুরুষের ও দেবনরের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। শিল্পী নিজ বিচারবুদ্ধি অনুসারে যথানুপাতে অন্যান্য চিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-মান স্থির করিয়া লইতে পারিবেন।"

অতএব বুঝা গেল, চক্রবর্ত্তি-চিত্রলক্ষণই চিত্রলক্ষণ গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য বিষয়। এখন বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ্যভাবপ্রণোদিত চিত্রলক্ষণ কিরূপে বৌদ্ধ তাঞ্জুর গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট হইল। বুদ্ধ একজন চক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং চিত্রলক্ষণে চক্রবর্ত্তি-চিত্র সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই বুদ্ধচিত্রপক্ষে প্রযোজ্য। শিল্প-রচনা-পদ্ধতি ও শিল্পের নিয়ম সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না। শিল্পিগণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডী দ্বারা বদ্ধ ছিলেন, এরূপ মনে হয় না; তাঁহারা পুরুষপরম্পরাগত শিল্পবিদ্যার সাহায্যে সকল সম্প্রদায়ের জন্যই স্থাপত্য ভাস্কর্য্য চিত্রশিল্পাদি রচনা করিতেন, এইরূপই অনুমান হয়। ব্রাহ্মণ্য সমাজের চিত্রলক্ষণ এই জন্যই বৌদ্ধ তাঞ্জুর গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট হইতে পারিয়াছে।

লাউফের সাহেব মনে করেন, গ্রন্থখানি অংশতঃ জৈনপ্রভাবান্বিত। এরূপ মনে করিবার প্রধান কারণ—নগ্নজিৎ নাম। নাম হইতে তিনি অনুমান করেন, নগ্নজিৎ-কৃত চিত্রলক্ষণ এমন কোন শিল্প-সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত, যাঁহারা নগ্নমূর্ত্তি চিত্রিত করিতেন। দিগম্বর জৈনেরা যে নগ্ন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। অন্য কোন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যে নগ্নমূর্ত্তি চিত্রিত হইত, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষে চিত্রবিদ্যার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন মধ্যপ্রদেশের রামগড়গিরিস্থ যোগিমারা গুহায় পাওয়া গিয়াছে। ঐ গুহায় একটি শিলালিপি আছে, যাহা হইতে জানা যায় যে, গুহাটি সুতনুকা নাম্নী একজন দেবদাসী কর্ত্তৃক নটীদিগের বিশ্রামাগার-স্বরূপে নির্ম্মিত ও প্রদত্ত হইয়াছিল। এই গুহার প্রাচীরগাত্রে কতকগুলি চিত্র আছে। চিত্রের বিষয়গুলি ভাল করিয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে চিত্রের প্রধান পাত্রগুলি নগ্নভাবে চিত্রিত হইয়াছে। নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন, চিত্রগুলি জৈনধর্ম্মসম্পৃক্ত হইতে পারে। চিত্রলক্ষণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন কতকগুলি লক্ষণ ও মান দেওয়া হইয়াছে, যাহা নগ্নচিত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহাও লাউফের সাহেবের মতের পরিপোষক বলিয়া গণিত হইতে পারে।

এই অনুমান সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলিতে চাই। প্রথম কথা, সমগ্র গ্রন্থমধ্যে কোথাও জৈনধর্ম্মের বা জৈনতীর্থঙ্করাদির উল্লেখ নাই। সমগ্র গ্রন্থখানি ব্রাহ্মণ্যভাবে অনুপ্রাণিত। যদিও গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ জৈনশাস্ত্রে একজন প্রত্যেকবুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তথাপি ইহাও দেখিতে হইবে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথব্রাহ্মণ ও মহাভারতভুক্ত ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে নগ্নজিৎ সুপরিচিত ছিলেন। চিত্রলক্ষণে যে নগ্নমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াই সমস্ত উপদেশাদি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে স্থলে দেবমূর্ত্তির উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে, সেখানে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, মূর্ত্তিগুলি শস্ত্রপ্রহরণধারী ও বস্ত্রালঙ্কার-শোভিত। তৃতীয় অধ্যায়ের যে অংশ দেখিয়া নগ্নচিত্রের কল্পনা মনে আসে, তাহার পার্শ্বেই বলা হইয়াছে— "যে সকল মূর্ত্তির অধোভাগ বস্ত্রাবৃত ও কটিবন্ধবেষ্টিত, তাহাদিগের নাভিনিম্নস্থ উদরাংশ চারি অঙ্গুলপরিমিত।" পুনরায় এক স্থলে বলিতেছেন, "চক্রবর্ত্তীর পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ ও শিথিল হইবে।" ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, চিত্রলক্ষণের যে দুই অধ্যায়ে নগ্নজিতের নাম আছে, সেই দুই অধ্যায়ই সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্যভাবপূর্ণ। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে নগ্নজিতের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

লাউফের সাহেব আর একটি কথা তুলিয়াছেন। সে কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ ও চিত্রলক্ষণ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাহা হইতে গান্ধাররাজ্যে একটা প্রাচীন চিত্রশিল্পের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। গান্ধার-রাজ্যে যে একটা প্রাচীন চিত্রশিল্প ছিল, এবং সেই শিল্পের ভিত্তির উপর গ্রীক শিল্পিগণের প্রভাবে যে গান্ধারের ভাস্কর্য্য শিল্পের অভ্যুত্থান, এইরূপ অনুমান পূর্ব্বেই গ্রীন্‌বেডেল্ সাহেব তাঁহার "ভারতে বৌদ্ধ-শিল্প" গ্রন্থের শেষভাগে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গান্ধারের ভাস্কর্য্য শিল্পের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই তিনি এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি এই,—

"In many sculptures of the *Gandhara* School, the pictorial element is so strongly in evidence that one might imagine that an early school of painting had existed in Gandhara whose extreme offshoot is represented to some extent in the Tibetan ecclesiastical painting; for examples, the nimbus, and the reliefs of "the flight of the Bodhisattva," "the birth of Gautama."

অর্থাৎ গান্ধারের অনেক ভাস্কর্য্য-নিদর্শনে চিত্রশিল্পসুলভ লক্ষণের এরূপ প্রাচুর্য্য যে, এ কথা কল্পনা করা যাইতে পারে যে, গান্ধারে একটা প্রাচীন চিত্রকলা ছিল। তিব্বতীয় ধর্ম্মচিত্রগুলি সেই চিত্রকলার একটা প্রত্যন্তশাখা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

খোটান ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য স্থানে যে সমস্ত চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কতক-পরিমাণে গান্ধার ভাস্কর্য্য-শিল্পের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশে একটি ঐতিহ্য আছে

যে, বাঙ্-সা ও ওয়াই-চি-ই-সোঙ নামক দুই জন খোটানী চিত্রকর ভারতীয় চিত্রশিল্পের আদর্শ কোরিয়া ও চীনদেশে প্রবর্ত্তিত করেন। এ কথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমাদের কল্পিত গান্ধার চিত্রকলাই খোটানী চিত্রকর কর্তৃক কোরিয়া ও চীনে নীত হইয়াছিল—এ কল্পনা অমূলক না হইতে পারে। অবশ্য এ সকল কথা কল্পনা ও অনুমান মাত্র। এ কল্পনা সিদ্ধান্তে পরিণত নাও হইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানের পক্ষে এরূপ কল্পনার মূল্য আছে বলিয়াই, এস্থলে ইহার উল্লেখ করিলাম।

এখন চিত্রলক্ষণের মূল বিষয়ের কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। তৃতীয় অধ্যায়ে মানবচিত্রের বিশেষতঃ চক্রবর্ত্তি-চিত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা ও পরিমাপ দেওয়া হইয়াছে।

পরিমাপগুলি বরাবর অঙ্গুল-হিসাবে পরিমিত। যাহার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, তাহারই অঙ্গুলি দ্বারা মাপ লইতে হইবে। ইহার উদ্দেশ্য বিভিন্ন চিত্রে বিভিন্ন পরিমাপ হইতে পারে, কিন্তু একটি চিত্রমধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর অনুপাত ঠিক থাকা চাই। এই মানগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাই না। শিল্পতত্ত্বালোচনার পক্ষে সে গুলি অতি মূল্যবান্ তথ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কেবল গ্রন্থখানির সামান্য পরিচয় দিয়া তৎপ্রতি পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

প্রথমে চক্রবর্ত্তী পুরুষের সমগ্র শরীরের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ন্যগ্রোধবৃক্ষের ন্যায় সুবিন্যস্ত। গ্রন্থের শেষভাগে চক্রবর্ত্তী পুরুষের একটি সুদীর্ঘ রূপবর্ণনা আছে। তাহার কতকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র অতি সুন্দর। যদি তাহার সেই প্রভামণ্ডলপরিবৃত রূপের সহিত কোন বস্তুর তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী ভূপতির সহিতই তাহার তুলনা হয়। সেই জন্যই তাঁহার শরীর বেষ্টন করিয়া প্রভামণ্ডল চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার মুখমণ্ডল চন্দ্রপ্রভার ন্যায় শুভ্র। সেই জন্য চক্রবর্ত্তি-শাসিত নরসমাজ বিচন্দ্রবিশিষ্ট শুক্লসন্ধ্যার ন্যায় শোভা পায়। তাঁহার ভ্রূযুগল সুন্দর, তাঁহার গ্রীবা সুন্দর, তাঁহার কপাল সুন্দর। তাঁহার কেশের বর্ণ সুন্দর, উজ্জ্বল ও কোমল, তাঁহার কেশাগ্র কুঞ্চিত। তাঁহার নাসিকা উন্নত ও ঋজু, তাঁহার ওষ্ঠাধর রক্তিম। তাঁহার দন্তরাজি মুক্তাধবল, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আকাশের ন্যায় নীলাভ, সুদীর্ঘবিশ্রান্ত। তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে তেজঃপুঞ্জ ঊর্ণা শোভমান। তাঁহার শুভ্রকায় অতি সুন্দররূপেই চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার কর্ণদ্বয় সমভাবে চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায়। তাঁহার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান পরিপুষ্ট। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় সুসংযুক্ত। হস্তপদ সুপুষ্ট ও সুগোল এবং শরীর মাংসল। নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত ও গভীর। তাঁহার শরীর সকলদিকেই সুগোল, সুতরাং সন্ধিস্থলগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার উরুযুগল হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুগোল। তাঁহার জানু বা গুল্ফগ্রন্থি দৃষ্টিগোচর হইবে না। তাঁহার নখর অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়। তাঁহার পদতল চক্র-চিহ্নিত। তাঁহার অঙ্গুলি দীর্ঘ ও সুগোল। তাঁহার বর্ণ চম্পকপুষ্পের ন্যায়।"

গ্রন্থমধ্যে নানাস্থানে যে সমস্ত উপদেশ ও নিয়ম আছে, তাহার মধ্যে এই কয়টি কথার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। আদর্শ পুরুষের শরীর মাংসল হইবে বটে, কিন্তু চিত্রমধ্যে কোথাও বন্ধুর মাংসপেশী, শিরা বা গ্রন্থি দেখান হইবে না। বক্ষঃস্থল সুপুষ্ট হইবে, অথচ সমতলভাবে চিত্রিত হইবে। চক্রবর্ত্তী বা দেবতার মূর্ত্তিতে গুম্ফ-শ্মশ্রু আদৌ থাকিবে না। তাঁহাদিগকে যোড়শবর্ষীয় যুবকের ন্যায় চিত্রিত করিতে হইবে। তাঁহাদের শরীর সিংহোদরের ন্যায় দীর্ঘবিস্তৃত। এই সকল লক্ষণ অজন্টীয় ও তিব্বতীয় চিত্রে সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

চিত্রলক্ষণকার নয়ন-চিত্রণ সম্বন্ধে যত বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন, সেরূপ আর কোন অঙ্গ সম্বন্ধে দেন নাই। কারণ, চক্ষুই ভাব-ব্যঞ্জনার প্রধান সহায়। তিনি আকারভেদে পঞ্চ প্রকার চক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন;—(১) ধনুরাকৃতি; (২) উৎপলপত্রাকৃতি; (৩) মৎস্যোদরাকৃতি; (৪) পদ্মপত্রাকৃতি; (৫) কড়ি-সদৃশাকৃতি। প্রত্যেক আকারের চক্ষুর দৈর্ঘ্য-বিস্তারের পরিমাণ দেওয়া হইল। ধনুরাকৃতি চক্ষু নিমীলিতপ্রায়, ইহার বিস্তার ৩ যব মাত্র। ধনু হইতে উৎপলাদিক্রমে বিস্তার ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। কড়িচক্ষুই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ফারিত। ইহার বিস্তার ১০ যব। ধ্যানস্থ যোগীদিগের চক্ষু ধনুরাকৃতি। সাধারণ লোকের চক্ষু উৎপলাকৃতি। রাজা, রমণী ও প্রেমিকের চক্ষু মৎস্যোদরাকৃতি। ভয় বা ক্রন্দনসূচক চক্ষু পদ্মপত্রাকৃতি। যাতনা ও ক্রোধব্যঞ্জক চক্ষু কড়ির ন্যায় বিস্ফারিত। দেবতাদিগের চক্ষু চিত্রিত করিলে রাজা প্রজার কল্যাণ বৃদ্ধি হয়। দেবনেত্র দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র ও স্নিগ্ধ, নয়নপল্লবে কোন কর্কশতা নাই, আভা পদ্মপত্রের ন্যায় এবং নীলবর্ণ মণির মধ্যে নানা বর্ণলীলায় সুচঞ্চল, চক্ষুতারকা কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ। এই স্থলে গ্রন্থকার ৩৬ প্রকার নয়নভঙ্গীর উল্লেখমাত্র করিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করিবেন, বলিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ কোন অধ্যায় পাওয়া যায় নাই।

চক্ষুর ন্যায় ভ্রূরও প্রকারভেদ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা প্রশান্ত ব্যক্তির ভ্রূ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, নর্ত্তনশীল; ক্রোধাবিষ্ট ও ক্রন্দনশীল ব্যক্তির ভ্রূ ধনুরাকৃতি; ভীতিগ্রস্ত ও বিলাপকারী ব্যক্তির ভ্রূ নাসাসন্ধি হইতে উত্থিত হইয়া অর্দ্ধকপাল জুড়িয়া থাকে।

চিত্রলক্ষণে শুধু যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নহে। অনেক স্থলে বর্ণসম্বন্ধেও উপদেশ আছে। যে কয় প্রকার বর্ণের উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল। চিত্র-শিল্পবিদ্‌গণ ইহার সহিত ভারতীয় চিত্র-শিল্পের অধুনাবশিষ্ট নিদর্শনগুলি মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

১। লাল—উৎপলাকৃতি চক্ষুর ধারবর্ত্তীভাগে; ওষ্ঠাধরপ্রান্ত (বিম্বফলের ন্যায়); নখর (লালাভ); নখের ভিতর দিক্ (উৎপলবৎ, নাগরাজ-কণাবৎ); করতল (রক্তপদ্মবৎ, শশাস্থলবৎ); জিহ্বা (রক্তবৎ); পদপ্রান্তে অলক্তরাগ।

২। শুক্ল—দেবতাদিগের চক্ষু (দুগ্ধবৎ); দন্ত (মুক্তাবৎ) দুগ্ধবৎ, পদ্মবীজবৎ, তুষারবৎ, কুসুম (জাতি)-পুষ্পবৎ; চক্রবর্ত্তীর পরিচ্ছদ।

* বুদ্ধভট্টের রত্নপরীক্ষায় পদ্মরাগমণির সহিত শশরক্তের তুলনা করা হইয়াছে।

৩। নীল—চক্ষুতারকা (আকাশবৎ); কেশ (ইন্দ্রনীলমণিবৎ, ভ্রমরবৎ, অঞ্জনবৎ, ময়ূর-কণ্ঠবৎ, কোকিলকায়বৎ, আকাশবৎ)।

৪। কৃষ্ণ—চক্ষুর মণি।

৫। লাক্ষারাগ—করনখপ্রসাধনে ব্যবহৃত।

৬। সুবর্ণ—চক্রবর্তীর গাত্রবর্ণ (জাম্বুনদসুবর্ণবৎ, প্রস্ফুটিত পদ্মবীজবৎ, চম্পকবৎ)।

এই ছয়টি বর্ণের মধ্যে লাল, শুক্ল, নীল ও সুবর্ণ, এই কয়টি বর্ণেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন আপনাদের সম্মুখে চিত্রলক্ষণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত করিলাম। গ্রন্থখানির সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন মনে উদয় হয়। তন্মধ্যে প্রবন্ধমধ্যে কয়েকটি নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। আশা করি, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সকল প্রশ্নের যথাযথ বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

সমতটের পূর্ব্বে

(প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য)

গত ১৩২৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-লিখিত "সমতটের পূর্ব্বে"-শীর্ষক প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিবাদী পূর্ণ বাবু যদি প্রতিবাদের পূর্ব্বে ঐ প্রবন্ধটি মনোযোগসহকারে পাঠ করিতেন এবং তন্মোল্লেখিত * বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অন্যান্য প্রবন্ধগুলির প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করিতেন, তবে তাঁহাকে এমন অনেক কথা বলিতে হইত না, যে গুলির উত্তরে ঐ সকল প্রবন্ধে লিখিত বহু কথার এস্থলে পুনরুল্লেখ করিতে হইতেছে। সে যাহা হউক, পূর্ণ বাবু প্রথমেই বলিয়াছেন যে, "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধলেখক (বিদ্যাবিনোদ মহাশয়) দেশবৎসলতা-প্রণোদিত হইয়াই 'শিহলিচটলো'কে শ্রীহট্ট বলিয়াছেন। উত্তরে বক্তব্য যে, এ কথা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ই যে বলিয়াছেন, এমন নহে। তাঁহার বহু পূর্ব্বে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহোদয় ইহা বলিয়া গিয়াছেন। [রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩১৯, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮০ পৃ° দ্রষ্টব্য]। "বিজয়া" (আষাঢ়, ১৩২০) পত্রিকায়ও ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন আলোচনা-প্রসঙ্গে ৺রাজকৃষ্ণ বাবু ও ৺কৈলাস বাবুর কথা আছে এবং তাহাতে শ্রীহট্টের ৭ম শতাব্দীতে স্ব-নামে ও স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ ঐ সময়কার এক প্রাচীন লিপিতে "শ্রীহট্টাধিশ্বরেভ্যঃ" এই শব্দটি যে রহিয়াছে, এ কথাও উল্লেখিত হইয়াছে। [ঐ সংখ্যার "বিজয়া", ৬৩১ পৃ° অথবা এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ১নং ভলিউম—১ম ভাগ, ১০ পৃ°.দ্রষ্টব্য।] অতএব শিহলিচটল "শ্রীহট্ট" না হইলেও শ্রীহট্টের কোনও ক্ষতির কারণ যখন দেখা যায় না এবং যখন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বহুপূর্ব্বেই বঙ্গের বিখ্যাত দুই জন প্রত্নতত্ত্বিক শ্রীহট্টকেই শিহলিচটল দ্বারা সূচিত মনে করিয়া গিয়াছেন, তখন প্রতিবাদী পূর্ণ বাবুর এরূপ উক্তি সমীচীন কি না, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন।

পূর্ণ বাবু সাহসিকতা-সহকারে বলিতেছেন, "আমরা বলিতেছি, সিলেট শব্দই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময় হইতে বৈষ্ণব পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া "শ্রীহট্ট" হইয়াছে।" তিনি "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধেই (৪র্থ পৃ°—২৪ পঙ্‌ক্তি হইতে) দেখিতে পাইবেন, ভাটেরার তাম্রশাসনে (যাহা ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক ১৮৮০ অব্দে এসিয়াটিক জর্ণেলে আলোচিত হইয়াছে) "শ্রীহট্টনাথ" শিবের উল্লেখ আছে এবং এই শাসন ত্রয়োদশ শতাব্দীর (অন্ততঃ) বলিয়া অনুমিত হইয়াছে (৫ পৃ°, ৩—৪ পঙ্‌ক্তি)।

---

* "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধের ৪র্থ পৃষ্ঠা ফুটনোট দ্রষ্টব্য (১৩২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১ম সংখ্যা); তাহাতে আছে, "এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীহট্ট এত প্রাচীন কি না? তদুত্তরে যাহা বক্তব্য, তাহা ইতঃপূর্ব্বে ভাস্কর-বর্ম্মার তাম্রশাসন সমালোচনা স্থলে বলিয়াছি" ইত্যাদি।

প্রতিবাদী আরও সাহসিকতা-প্রণোদিত হইয়া বলিয়াছেন, "শ্রীহট্ট শব্দ কোন্ পুরাণে বা প্রাচীন তন্ত্রে আছে, তাহা পদ্মনাথ বাবু দেখাইয়া দিতে পারেন কি ?" "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধের ৩য় পৃষ্ঠায় ফুটনোটে "শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ" এই একটি তন্ত্রোক্ত বচন রহিয়াছে। তন্ত্রান্তরে (অর্থাৎ অপর এক তন্ত্রে) যে উহার পাঠান্তর আছে, তাহাও বলা হইয়াছে ; কিন্তু ঐ স্থলে তন্ত্রের নাম নাই। "চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য" (যাহা হয় ত প্রতিবাদী পড়িয়া থাকিবেন) তৃতীয় সংস্করণ, ১০০ পৃষ্ঠায় ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে ঐ বাক্যটি আছে এবং তাহা মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রের বচন চট্টলের প্রাচীনত্ব-খ্যাপনে যে "যোগিনী-তন্ত্রের" নাম সর্ব্বাদৌ প্রতিবাদী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও বহুশঃ শ্রীহট্টের নাম আছে ["বিজয়া"র ঐ প্রবন্ধ. দ্রষ্টব্য। ১৩২০, আষাঢ়—৬২৯পৃঃ ; অথবা যোগিনীতন্ত্র দ্বিতীয়ার্দ্ধ, প্রথম পটল—১৪।১৫ শ্লোক ; ঐ ২য় ভাগ, দ্বিতীয় পটল—৪২।৪৩ শ্লোক—ঐ ঐ ; ৬ষ্ঠ পটল, ১৪৬ শ্লোক ; ঐ ঐ—৯ম পটল, ৯০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।]

এ ছাড়া চট্টলের প্রাচীনত্ব দেখাইতে গিয়া তিনি আবার দুই একটি পুরাণ ও তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল পুরাণ, "উপপুরাণ"—এ গুলি অত্যন্ত আধুনিক ; তন্ত্রের তো কথাই নাই। যে যোগিনীতন্ত্রের কথা সর্ব্বাদৌ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কোচবিহার রাজবংশের বীজী পুরুষ বিশ্বসিংহের নাম আছে। বিশ্বসিংহ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। অপিচ যে "চৈত্র-মাহাত্ম্য" পুরাণের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্যে তাহা দেবীপুরাণের অন্তর্গত বলা হইয়াছে, অথচ বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত দেবীপুরাণে ঐ চৈত্র-মাহাত্ম্যের নামগন্ধও নাই। *

মহাপীঠ এবং অনাদিলিঙ্গগুলি অবশ্যই শাস্ত্রবিশ্বাসীর নিকটে সত্যযুগ হইতেই ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রকাশ এই কলিযুগের দুর্ব্বলাধিকারীদের হিতার্থে এ যুগেই হইয়াছে এবং হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় তন্ত্র ও উপপুরাণের বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া কোনও ফল নাই। ইহার উপর আবার প্রক্ষিপ্তাংশও বহু আছে। পদ্মপুরাণ মহাপুরাণের মধ্যে পরিগণিত—ইহাতে শকুন্তলোপাখ্যান (কালিদাসের লেখাস্বরূপ) প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। †

প্রতিবাদী মহাশয় তন্ত্রাদি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কুত্রাপি চট্টলের পূর্ব্বে "শ্রী" নাই। অবশ্য চট্টলবাসী পণ্ডিত বা লেখকগণ স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বীয় জন্মভূমির পূর্ব্বে 'শ্রী' বসাইতে পারেন। প্রাচীন তাম্রশাসনাদিতেও দেখা যায়, রাজধানীগুলির নামের পূর্ব্বে কখন কখন

* চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্যের লেখক চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী মহাশয় বলেন যে, তাঁহার নিকট হস্তলিখিত দেবীপুরাণের অংশ "চৈত্র-মাহাত্ম্য" আছে। হস্তলিখিত কোন কিছু যদি অন্যত্র মুদ্রিত বা উদ্ধৃত না হয়, তবে উহার প্রামাণিকতা কতদূর, ভাবিয়া দেখা উচিত।

† বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত পদ্মপুরাণে শকুন্তলার উপাখ্যানটি পাই, নাই, অথচ বঙ্গবাসি-সম্পাদক রায় সাহেব ৺বিহারিলাল সরকার মহাশয় অন্যত্র প্রকাশিত পদ্মপুরাণ দেখিয়াই বোধ হয়, শকুন্তলা-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণকেই শকুন্তলা নাটকের পদ্যাংশের মূল বলিয়াছেন। প্রক্ষিপ্ততা এইরূপ বিভিন্ন পাঠ হইতেই ধরা পড়ে।

শ্রী বলিত, যেমন, "শ্রীবিক্রমপুর", "শ্রীদুর্জ্জয়া" ইত্যাদি। তবে বৌদ্ধ পরিব্রাজক য়ুয়ন-চোয়াং কেন যে 'চট্টল'কে এমন সম্মান দেখাইবেন, তাহার উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না। প্রতিবাদী বলেন, উহা বৌদ্ধ তীর্থ বলিয়াই "শ্রী"পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে। যদি তাহা হয়, তবে য়ুয়নচোয়াং তো বহুবহু বৌদ্ধ তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, অন্যত্র কুত্রাপি 'শ্রী' প্রয়োগ করিলেন না, এখানে—যে জায়গায় তিনি পদার্পণও করেন নাই *,—তাহা করিতে গেলেন কেন? ভাল কথা, "শ্রীচট্টল" তো পূর্ণ বাবুর মতে বৌদ্ধ-জগতে খ্যাতিপন্নই ছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে উহার নাম পাওয়া গিয়াছে কি? তিনি তো বৌদ্ধশাস্ত্র-পারদর্শী রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরকে আমোলেই আনেন নাই † স্বয়ং এদিকে একটু গবেষণা প্রয়োগ করুন না?

'শ্রীহট্ট' নামটির ব্যাখ্যা বিষয়েও তাঁহার আপত্তি এই যে, যদি ইহা 'লক্ষ্মীর' (বা মহালক্ষ্মীর) হট্টই হইত, তবে 'লক্ষ্মীহট্ট' হইল না কেন? 'লক্ষ্মী' ও 'শ্রী' উভয় শব্দই একার্থবাচক, তাই লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহারে দোষ কি? বিল্ববৃক্ষকে 'শ্রীবৃক্ষ' বলে—কেন না, "তত্রাসৌ বসতে লক্ষ্মীঃ শ্রীবৃক্ষস্তেন উচ্যতে।"—(শব্দকল্পদ্রুমধৃতবহ্নিপুরাণবচনম্।) এ স্থলেও তো "লক্ষ্মীবৃক্ষ" হইতে পারিত?

শ্রীহট্টে কোন বৌদ্ধ চৈত্যের পরিচিহ্ন নাই—চট্টলে আছে। ইহাও শ্রীহট্টের বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ দাঁড় করান হইয়াছে। দুর্ভাগ্য (বা সৌভাগ্য)-বশতঃ শ্রীহট্টে সম্প্রতি বহুশতাব্দী যাবৎ কোনও বৌদ্ধ নাই, তাই চৈত্যও নাই। বৌদ্ধ মগেরা যে যে স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়া বসিয়াছিল, তথায়ই অধুনা বৌদ্ধ চৈত্যাদি দেখার সম্ভাবনা। শ্রীহট্ট কোনও দিন যে "মগরাজ্যের অন্তর্গত" ছিল এ কথা (প্রতিবাদী মহাশয় কুক সাহেবের বার্ম্মিজ্ হিস্টরীর পত্রাঙ্ক প্রদর্শন করিলেও) আমাদের জানা নাই—আমরা মাত্র জানি যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিকে মণিপুর ও কাছাড় রাজ্য এবং ব্রহ্মপুত্রোপকণ্ঠে আসাম রাজ্য মগদের দ্বারা উপদ্রুত হইয়াছিল। এই উপদ্রবের ফলেই ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়াই বাধে, পরিশেষে আসাম ও কাছাড় ইংরেজের অধীন হইয়া পড়ে।

এখন বাকী রহিল শ্রীহট্টের কাছে সমুদ্রের কথা। এ সম্বন্ধেও বিস্তারিতভাবে "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধে (৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আলোচিত হইয়াছে। শ্রীহট্টবাসীর 'সমুদ্র' দেখার সৌভাগ্য না হইতে পারে, কিন্তু একজন ইংরেজ—যিনি সাত সমুদ্র ডিঙাইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন—

---

* পূর্ণ বাবুর প্রবন্ধে যেন বোধ হয়, তিনি মনে করেন, য়ুয়নচোয়াং চট্টলে গিয়াছিলেন এবং ঐ দিক্ দিয়াই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন!!

† রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্তও চট্টগ্রাম চাটিগাঁ বলিয়াই বৌদ্ধজগতে খ্যাত ছিল। বিশ্বকোষেও আছে, চট্টগ্রাম পূর্ব্বে বঙ্গ ও ত্রিপুরার হিন্দুরাজার ও আরাকানের বৌদ্ধ রাজগণের অধীন ছিল। প্রবাদ আছে, খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে শেষোক্ত বৌদ্ধরাজ বঙ্গ আক্রমণ করিয়া বর্ত্তমান চট্টগ্রামে এক জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন; (Anderson's Archaelogical Catalogue of Indian Museum, Vol. II, p. 162) সেই 'চিৎ তৌ গৌং' হইতে দেশীয়েরা চট্টগ্রাম বা চট্টল নাম দিয়াছেন।

তিনি মাত্র পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা হইতে শ্রীহট্টে আগমনকালে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই পুনশ্চ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"I shall not be disbelieved when I say that in pointing my boat towards Sylhet I had recourse to my compass—the same as at sea, and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent.'—(Extracts from the Lives of Lindsays). এক শত মাইল বিস্তৃত হ্রদ—যাহাতে কোম্পাস্ দ্বারা নৌচালনের প্রয়োজন হইয়াছিল—তাহা প্রতিবাদী মহাশয় "চেবা, ডোবা বা হাওর" বলিয়া উল্লেখিত করিলেন! তাম্রশাসনে যে "সাগর পশ্চিমে" বলিয়া সীমা-নির্দ্দেশ আছে, "নৌবাটক" শব্দেই বা কি বুঝায়, এ সকল তো পূর্ণ বাবু গ্রাহ্য বলিয়াই মনে করিলেন না!

'শিহলিচটল'কে 'চট্টল' ধরিয়া যুয়নচোয়াং কর্ত্তৃক উল্লেখিত অপরাপর রাজ্যের সংস্থান করা উচিত ছিল; প্রতিবাদী মহাশয় ততটা মাথা ঘামাইতে চান নাই। তিনি 'কমোলংক' প্রভৃতি অপর পাঁচটি রাজ্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধে নির্দ্দেশিত স্থানেই রাখিতে চান এবং তজ্জন্য যুয়নচোয়াঙের আর একটি ভুল আবিস্কৃত করিয়াছেন—যাহা এ যাবৎ ইউরোপীয় বা এসিয়ার অধিবাসী কোনও প্রাত্নতত্ত্বিক ধরিতে পারেন নাই। এ যাবৎ চীনীয় পর্য্যটকের একটি মাত্র ভুল প্রদর্শিত হইত—অর্থাৎ শিহলিচটল সমতটের 'উত্তর-পূর্ব্বে, না হইয়া 'দক্ষিণ-পূর্ব্বে' হইবে—এইটুকু মাত্র। পূর্ণ বাবু সেই ভুলটি ছাড়া আর একটি ভুল বাহির করিয়াছেন, তাহা এই,—'কমোলাংক' শিহলিচটলের 'দক্ষিণ-পূর্ব্বে' না হইয়া 'উত্তর-পূর্ব্বে' হইবে। তাহা হইলেই 'কমোলংক' 'কোমিল্লা' হইবে (এবং অন্যান্যগুলি ঠিক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-প্রদর্শিতানুরূপই হইবে—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় বোধ হয়)। কিন্তু তিনি সংশোধনেও একটু ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। কোমিল্লা (ত্রিপুরা অর্থাৎ বর্ত্তমান হিল্ টিপারা নহে—ইহা তখন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল) চট্টলের উত্তর-পূর্ব্বে নহে, উত্তরে—বরং উত্তর-পশ্চিমে বলিলেও পারিতেন। 'কলকথ', বেচারা যুয়নচোয়াঙের উপর অবিচারের মাত্রাটা প্রতিবাদী মহাশয় বাড়াইয়াছেন মাত্র। সংস্কৃতজ (রাজ্যাদির নামসূচক) শব্দ চীনদেশীয় অক্ষর (letter নহে, syllable) দ্বারা প্রকাশ করিতে গিয়া অবশ্যই যুয়নচোয়াং (বা অন্যান্য চীনীয় পরিব্রাজক) নানা বিড়ম্বনা ঘটাইয়াছেন, তাহাতে সংস্কার বা সংশোধনের অবসর আছে; কিন্তু দিক্‌সূচক শব্দ তদানীং অতি সভ্য চীনদেশীয়দের অভিধানে অবশ্যই সুস্পষ্ট ছিল; ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি প্রাত্নতত্ত্বিকগণ দিগ্বাচক শব্দের তরজমায় সকলেই একমত। এ অবস্থায় যুয়নচোয়াঙের-বিবরণীতে উল্লেখিত দিগ্বাচক শব্দগুলিকে উলট-পালট করা নিতান্তই অসমীচীন। চীনদেশের প্রত্নতত্ত্বালোচনায় ওয়াটার্স সাহেবের স্থান অতি উচ্চে—তিনি 'উত্তর পূর্ব্ব'কে (সমতটের 'উত্তর-পূর্ব্বে' শিহলিচটল—এই স্থলে) 'দক্ষিণ-পূর্ব্ব' করা সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন—"which (i. e. North-east) is the reading of all the texts of the Life and of the Fangchi." (Watters' Yuan Chwang, Vol. II, pp. 188-9)

অর্থাৎ বিভিন্ন দুইখানি গ্রন্থের নানা প্রতিলিপিতে একই পাঠ "উত্তর-পূর্ব্ব" পাওয়া যাইতেছে। এই পাঠ অব্যাহত রাখিয়া হুয়েনচোয়াং যে সকল রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সে গুলির সংস্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—বাঙ্গালা প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩২৬ সালের প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধরূপে এবং ইংরেজী প্রবন্ধ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণেলের ১৯২০ সালের প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে একটু সাবধান হইয়া করাই আবশ্যক ছিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে ঈদৃশ একটা প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সমালোচনা, প্রতিবাদ ইত্যাদি হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কেন না বাদ বিতর্ক দ্বারাই সত্যের আবিষ্ক্রিয়া হয়—এবং আবিষ্কৃত সত্যেরও ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে প্রকাশিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধেরও একটা প্রতিবাদ ফরাসী প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ মুসো ফিনো ঐ জর্ণেলেই প্রকাশিত করিয়াছেন—তবে উহাও সারবান্ বলিয়া প্রতীত হইল না। ইনিও কিন্তু শিহলি-চটলকে 'শ্রীচট্টল' বলেন না—পূর্ব্বেকার মত শ্রীক্ষেত্র বা প্রোমই বলেন, পরন্তু তৎপক্ষে যুক্তির মূল বড়ই শিথিল।

শ্রীসাতকড়ি মিত্র

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব *

বুদ্ধদেব তপস্যা-বলে সম্বোধি লাভ করিয়া অর্হৎত্ব বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন ও স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালপ্রচলিত ছয়টি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ছয় জন প্রধান গুরু—পূরণ কস্সপ, মক্খলি গোসাল, অজিত কেসকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত ও সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত—আপনাদের শিষ্যবর্গ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে দেখিয়া বুদ্ধদেবের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। এই ছয় জন বৌদ্ধধর্ম্মবিরোধী ধর্ম্মগুরু তীর্থিক বা তীর্থ্য নামে পরিচিত; পালি ভাষায় তাঁহাদের তিত্থিয় বলা হইত।

এই তীর্থিকদিগের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। বোধ হয়, আচার্য্য ম্যাক্‌স্‌মূলার ষড়্‌দর্শনের ইতিহাসে এই তীর্থিকদিগের স্থান নির্ণয় করিবার প্রথম চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ষড়্‌দর্শনে তীর্থিকদিগের স্থান ও জৈন বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর তাঁহাদের প্রভুত্ব সম্বন্ধে কোন সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; কারণ, তখন প্রমাণ ও উপকরণগুলি অধিকপরিমাণে সংগৃহীত হয় নাই।

মহাবীর (নিগণ্ঠ নাথপুত্ত)-প্রমুখ ছয় তিত্থিয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত রক্‌হিল সাহেব-প্রণীত বুদ্ধজীবনীতে আছে; এখানি সামঞ্ঞফলসুত্ত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। রক্‌হিল তাঁহার পুস্তকের পরিশিষ্টে জৈন ভগবতী গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া মহাবীর (নিগণ্ঠ নাথপুত্ত) ও গোসাল মক্খলিপুত্ত মধ্যে আলাপের এবং সামঞ্ঞফলসুত্তের দুইটি চীন সংস্করণ অনুসারে ছয় তীর্থিকের মতবাদের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনিও কিন্তু প্রকৃত সমস্যার মীমাংসা করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

স্পেন্স হার্ডি, আচার্য্য ওল্‌ডেন্‌বার্গ এবং অন্যান্য লেখকেরা, যাঁহারা বৌদ্ধ সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তীর্থিকদের সম্বন্ধে কিংবদন্তীমূলক বিবরণমাত্র দিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন।

অধ্যাপক য়াকবি সর্ব্বপ্রথমে জৈনসূত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় ২৭ পৃষ্ঠায় এই ছয় জন ধর্ম্মপ্রচারক তীর্থিকদের বিবরণের গুরুত্ব সম্বন্ধে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন,—

"বুদ্ধদেব ও মহাবীরের সময়ে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন ইতিবৃত্ত যথেষ্ট ও পর্য্যাপ্ত না হইলেও যতটুকু আমরা পাইয়া থাকি, তাহাই অমূল্য; কারণ, এই সকল বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি, ঐ দুই প্রধান ধর্ম্ম-সংস্কারক তাঁহাদের ধর্ম্মমত কোন্ ভিত্তির উপর কোন্ উপকরণে গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন। জৈন-বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-বিরোধী ছয় তীর্থিকের ধর্ম্মমত ও জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম্মমত কোন কোন অংশে এমন সুসদৃশ যে, আমরা অনুমান

---

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

করিতে পারি যে, বুদ্ধদেব ও মহাবীর তাঁহাদের ধর্ম্মবিরোধী ছয় ধর্ম্মগুরুর নিকট নিজেদের মতবাদের জন্য কতকাংশে ঋণী ছিলেন। আর এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নয়।"

অধ্যাপক য়াকবির এই উক্তির উল্লেখ করিয়া আচার্য্য রীস্ ডেভিড্‌স্ বলিয়াছেন,—"বৌদ্ধ ও জৈন ইতিবৃত্তে যে দার্শনিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত মতবাদের আলোচনা ও মীমাংসা আছে, তাহাতে বেদান্ত বা বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় মৌলিকতা বা মূলগত মূল্য না থাকিতে পারে, তথাপি সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্টই আছে; কারণ, তাহারা সমাজের এমন একটি আদিম অবস্থার পরিচয় দেয়, যখন সমাজ ছিল অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও ধর্ম্ম ছিল উদার, উন্নত—সর্ব্বদেববাদ। আর যতটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে প্রাচীন কালের ভৌগোলিক সংস্থান, রাষ্ট্রবিভাগ ও ব্যবস্থা, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ভারতের অনেক অপরিজ্ঞাত বিষয়ের আবশ্যক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।"

অধ্যাপক য়াকবি ছাড়া শ্রীমতী রীস্ ডেভিড্‌স্ বিশেষ যত্নের সহিত আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ঐ সব তীর্থিক তাঁহাদের কুতর্ক ও কুযুক্তি দ্বারাও কেমন করিয়া বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পথ সুগম করিয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সকল প্রকার বৌদ্ধ-ইতিবৃত্তে প্রসঙ্গক্রমে কতকগুলি ধর্ম্মোপদেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়; তাঁহাদের সকলকেই ছয় তীর্থিক বা তিত্থিয় নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। এই সব ইতিবৃত্তের সকলগুলিই নির্ভরযোগ্য ও বিচারসহ নহে; যেহেতু কোন কোন ইতিবৃত্ত নানা প্রকারে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে যে, ঐ সব ধর্ম্মগুরুর যশ বুদ্ধদেবের আচরণের মহিমায় ও প্রভাবে একেবারে আচ্ছন্ন ও ম্লান হইয়া গিয়াছিল। জাতকের মধ্যে এই সব ধর্ম্মগুরুকে বুদ্ধের তুলনায়—ময়ূরের তুলনায় কাকের ন্যায়—অপকৃষ্ট বলা হইয়াছে।

মিলিন্দ-প্রশ্ন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের রচনা। এই পুস্তকে ছয় তিত্থিয়ের একটি কৃত্রিম বৃত্তান্ত আছে। এই বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই সামঞ্‌ঞফলসুত্তের বিবরণ স্মরণপথে উদিত হয়। সামঞ্‌ঞফলসুত্তের বিবরণ অনেকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাতে তীর্থিকদের বিবরণ যৎসামান্যই আছে। বৌদ্ধ লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতবাদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিরুদ্ধ ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া, আমরা কেবলমাত্র সামঞ্‌ঞফলসুত্ত অবলম্বনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করি না। যেখানে ইহার সাক্ষ্য অপর সাক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গত হইবে, কেবল সেইটুকু বিবরণ সত্য অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। জৈন অঙ্গ ছয় তীর্থিকের মধ্যে কেবলমাত্র মক্‌খলি গোসালপুত্ত ও নিগণ্ঠ নাথপুত্তের উল্লেখ করিয়াছে; নিগণ্ঠ নাথপুত্ত যে মহাবীরের নামান্তর, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য তীর্থিকের নামোল্লেখ না থাকিলেও মাঝে মাঝে তাঁহাদের মতবাদের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সামঞ্‌ঞফলসুত্ত ও অন্যান্য পুরাতন বৌদ্ধসুত্তে এই ছয় তীর্থিককে ধর্ম্মগুরু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; তাঁহাদের বহু শিষ্য ছিল; তাঁহারা সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; তাঁহাদের তার্কিক বলিয়া খ্যাতি ও যশ ছিল। তাঁহারা লোকমান্য প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

মজ্‌ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত মহাসকুলদায়ীসূত্তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সব তিত্থিয়ের তর্কালোচনায় মগধ পরিপূর্ণ থাকিত; ইহাদের শিষ্যেরাও অদম্য উৎসাহ ও সাহস-সহকারে দার্শনিক তর্ক করিতেন। জৈন গ্রন্থগুলিতে গোসাল তীর্থিককে সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণে চিত্র করিবার প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও, জৈন ভগবতী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, গোসাল, জিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মহাবীরের দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রাবস্তীতে শিক্ষকগুরু বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন।' সুত্তনিপাতের অন্তর্গত সভিয়-সুত্ত পাঠে জানা যায় যে, সভিয় নামে একজন পরিব্রাজক বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি ছয় তীর্থিকের চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ ও সন্ন্যাসে অর্ব্বাচীন কি না। সমণ গোতম এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কেবল বলিয়াছিলেন যে, বয়সে কেহ বড় হয় না—বড় হয় জ্ঞানে। কিন্তু অন্যত্র স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, সমণ গোতম এই ছয় তীর্থিকের সমসাময়িক হইলেও, বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন।

মজ্‌ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত সামগামসুত্ত ও দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত পাটিকসুত্ত হইতে পাওয়া যায় যে, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত অর্থাৎ মহাবীর বুদ্ধদেবের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। আচার্য্য হর্ণ্‌লে অনুমান করেন যে, বুদ্ধদেবের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর দেহত্যাগ করেন। মজ্‌ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত অভয়রাজকুমার-সুত্তে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধদেব ও দেবদত্তের মধ্যে যে বিবাদ ছিল, তাহার সংবাদ মহাবীর অবগত ছিলেন। অধ্যাপক কার্ণের মতে বুদ্ধদেবের ৭২ বৎসর বয়সে রাজা বিম্বিসারের মৃত্যু হয় এবং বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে বুদ্ধদত্তের আন্দোলন বিম্বিসারের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে আরম্ভ হইয়াছিল। এই প্রমাণ-সমর্থিত অনুমানগুলি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই মনে হয়। মহাবীর ৭২ বৎসর ও বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। সুতরাং মহাবীরের জীবনের অধিকাংশই বুদ্ধদেবের জীবনের সমসাময়িক ছিল। ডাক্তার হর্ণ্‌লে জৈন ইতিবৃত্তের প্রমাণগুলি বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মহাবীরের দুই বৎসর পূর্ব্বেই গোসাল মখলিপুত্ত বহুযশস্বী শিক্ষাগুরু হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং গোসাল, মখলিপুত্তের মৃত্যুর পরও মহাবীর ষোল বৎসর জীবিত ছিলেন।

গোসাল যে মহাবীরের শিষ্য ছিলেন ও তিনি গুরুর সহিত বিবাদ করিয়া স্বতন্ত্র হন, এ কথা বৌদ্ধ-সাহিত্যে বহুবার উল্লিখিত হইলেও, গোসাল যে মহাবীরের শিষ্যত্ব কখনও স্বীকার করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হয়। জৈন ইতিবৃত্ত এই দুই ধর্ম্মশিক্ষকের সম্পর্ক রহস্যাবৃত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মীমাংসার জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য বৌদ্ধ ইতিবৃত্তের শরণাপন্ন হইতে হয়। বৌদ্ধ খণ্ড রচনা যত পাওয়া যায়, সকলগুলিতেই ঐ দুইজনকে তৎকালের অতি প্রসিদ্ধ তার্কিক, মীমাংসক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। গোসাল-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম আজীবক বা মস্করী এবং মহাবীর-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম নিগণ্ঠ বা জৈন।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে এইটুকু আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, মখলি গোসাল ছিলেন মহাবীরের চেয়ে বয়সে জ্যেষ্ঠ ও সমসাময়িক। অপর তীর্থিকদের সময় নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়। বৌদ্ধ সূত্তগুলির সাক্ষ্য অনুসারে এইটুকু বলা যায় যে, তাঁহারা সকলেই গোতম বুদ্ধ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন ও তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধ শীলশাস্ত্রে এমন কিছু কিছু বিবরণ আছে, যাহা হইতে বেলট্‌ঠি বংশের সঞ্জয়ের সময়ের একটু সূত্র পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সূত্তগুলিতে সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত ও একজন পরিব্রাজক সঞ্জয়ের নাম উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছয় তীর্থিকদের অন্যতম অঞ্‌ঞতিত্থিয় পরিব্বাজক অর্থাৎ অন্যতীর্থিক পরিব্রাজক অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ের পরিব্রাজক ধর্ম্মোপদেশক; এবং শেষোক্ত পরিব্রাজক সঞ্জয় প্রথমে সারিপুত্ত ও মগ্‌গল্লানের শিক্ষক ছিলেন; সারিপুত্ত ও মগ্‌গল্লান পরে বুদ্ধ গোতমের প্রধান শিষ্যমধ্যে পরিগণিত হন। অঙ্গুত্তর-নিকায়ের কোন কোন অংশ বিচার করিয়া দেখিলে সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত ও সঞ্জয় পরিব্রাজক একই ব্যক্তি। কার্ণ্‌ ও রাকহি এই সম্বন্ধে একমত হইয়া এই অনুমান সমর্থন করিয়াছেন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে ইহাও সত্য যে, বুদ্ধদেবের ৩৭ বৎসর বয়সে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের দ্বিতীয় বর্ষে যখন সঞ্জয়ের অন্যান্য বহু শিষ্যের সহিত সারিপুত্ত ও মগ্‌গল্লান বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহার অল্প দিন পরেই সঞ্জয়ের মৃত্যু হয়। যদিও বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে সঞ্জয়ের মৃত্যু হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় রাজা অশোকের কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। অতএব ইহা দেখা গেল যে, সঞ্জয় যে কেবল বুদ্ধদেবের চেয়ে বয়সে বড় সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নয়; তিনি মহাবীর ও মখলি গোসাল অপেক্ষাও জ্যেষ্ঠ অথচ সমসাময়িক ছিলেন।

প্রশ্নোপনিষদে এক কবন্ধী কাত্যায়নের উল্লেখ আছে। তিনি সাংখ্য-দর্শনের প্রবর্ত্তক পিপ্পলাদ অপেক্ষা কনিষ্ঠ ও সমসাময়িক ছিলেন। কাত্যায়নের উপনাম কবন্ধী বা কুকুদ কাত্যায়ন নামের অন্যান্য ধর্ম্মোপদেষ্টাদের হইতে তাঁহাকে পৃথক্‌ করিয়া বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। যদি অনুমান করা যায় যে, কুকুদ কাত্যায়ন বা কবন্ধী কাত্যায়ন পিপ্পলাদের সমসাময়িক ও বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন এবং বুদ্ধদেব কাত্যায়নের বয়ঃকনিষ্ঠ ও সমসাময়িক ছিলেন, তবে ইহাও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, কাত্যায়ন ও সঞ্জয় সমবয়স্ক ও সমসাময়িক ছিলেন। অধ্যাপক কার্ণ্‌ একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন যে, পূরণ কস্‌সপ বুদ্ধদেবের ৪২ বৎসর বয়সে গলায় একটি বড় কলসী বাঁধিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, কুকুদ কাত্যায়ন ও অজিত কেশকম্বলী সমবয়স্ক ছিলেন। এই যে কাল-নির্দ্দেশ—এগুলি সবই আপাতত-গ্রাহ্য ও বিরুদ্ধ প্রমাণে পরিত্যাজ্য। ছয় তীর্থিকের মতবাদের পরম্পর সংযোগক্রমের সমর্থক প্রমাণ দ্বারা ঐ কালনির্দ্দেশের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। একজন অপরের চেয়ে কয়েক বৎসর আগে বা পরে জন্মিয়াছেন বা মরিয়াছেন প্রমাণ হইলেও, সেই সামান্য পৌর্ব্বাপর্য্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ছয় তীর্থিকের পরম্পরের

মতবাদে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা একই কালে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতের চিন্তাধারার পুষ্টি ও বুদ্ধদেবের মতবাদ প্রবর্ত্তনের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মহাবীরের পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থিকদের মতবাদের সঙ্গে বৌদ্ধদিগের যত বিরোধ ও বিরাগ, মহাবীরের প্রতি ও তাঁহার মতবাদের প্রতি বৌদ্ধদের সেরূপ বিরাগ ও বিরুদ্ধতা ছিল না। এমন কি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে, চাতুর্যাম-সম্বর অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ সংযম সম্বন্ধে মহাবীরের মতবাদের মধ্যে কিছু উৎকৃষ্ট উপাদেয়তা আছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন যে, ডাক্তার এফ্, ডব্লিউ টমাস মহাবীর ও অপর পঞ্চ পরিব্রাজকের সম্পর্কের সঙ্গে গ্রীক সোফিষ্টদের সহিত সক্রেটিসের সম্পর্ক-তুলনা করিতে চাহেন। মহাবীরকে পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য তীর্থিকদের হইতে পৃথক্ করা যায় কি না, এই প্রশ্ন-মীমাংসা না করিয়াও বলা যায় যে, বৌদ্ধরা ছয় তীর্থিককেই অপরাপর সমসাময়িক পরিব্রাজক হইতে পৃথক্ করিতেন, যথা—ব্রাহ্মণ পরিব্বাজক ও অঞ্ঞতিত্থিয় পরিব্বাজক।

বৌদ্ধ শব্দ পরুসবাচা দ্বারা দুই শ্রেণীর পরিব্রাজকদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব ও তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা ছয় তীর্থিক সম্প্রদায়কে পরুসবাচা বলিয়া এই বুঝাইতে চাহিতেন যে, দার্শনিক তর্কের সময় তাঁহারা পরুষ বাক্য ব্যবহার করিয়া বিতণ্ডা করিতেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,—"তোমরা এই মতবাদ ও সংযম বুঝিতে পারিবে না। আমি পারি। কেমন করিয়া তোমরা উহা বুঝিবে ? তোমরা ভ্রমে পতিত। আমিই সত্যে প্রতিষ্ঠিত।" এই ছয় তীর্থিকের জীবনকথার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলা চলে। এই মাত্র জানি যে, তাঁহারা সকলেই ছিলেন—সমণ (শ্রমণ, সন্ন্যাসী), মুণ্ডক (নেড়া মাথা) ও পরিব্বাজক (পরিব্রাজক, অটনশীল)। তাঁহারা নিজেদের একদিকে সন্ন্যাসী ও অপর দিকে ব্রাহ্মণ গৃহী হইতে পৃথক্ মনে করিতেন। এইরূপে তাঁহারা অরণ্যবাসী কৃচ্ছ্রব্রতাবলম্বী তপস্বী সন্ন্যাসী ও সংসারাসক্ত ব্রাহ্মণ গৃহীদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের সংযোগ-শৃঙ্খলের মতন কাজ করিতেন। তীর্থিকগণ সকলেই অনার ও অনাগারিক ছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদের ন্যায় একেবারে সংসারত্যাগী লোকসংস্রবশূন্য ছিলেন না; তাঁহারা পৌর কর্ত্তব্য জনহিত হইতে বিরত থাকিতেন না। প্রায়ই তাঁহারা রাজধানীর প্রাচীর-বহির্ভাগে আপনাদের আশ্রম স্থাপন করিতেন। তাঁহাদের বুদ্ধি, প্রকৃতি, চরিত্র ও জীবনের উদ্দেশ্য সাধারণের হইতে স্বতন্ত্র ছিল। এক দিকে সন্ন্যাসী ও অপর দিকে গৃহী এবং মধ্যস্থলে তীর্থিকদের স্থান ছিল উচ্চে বা নীচে, দুই বলা চলে; তাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সংযমে গৃহী হইতে উচ্চ ছিলেন এবং তপঃকৃচ্ছ্রতার শিথিলতায় সন্ন্যাসী হইতে নিম্নে ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মহাবীরের জৈন সম্প্রদায় তপঃকৃচ্ছ্রতায় বৌদ্ধদের অপেক্ষা এক কাঠি বাড়া ছিল এবং আজিবক বা মস্করীরা জৈনদিগের অপেক্ষা আরও কঠিনব্রতী ছিল। অন্য দিকে আবার ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকেরা সাংসারিক আসক্তিতে ও ইন্দ্রিয়সুখবিলাসিতায় বৌদ্ধদিগের এক ধাপ নিম্নে ছিলেন; ব্রাহ্মণ মহাশালগণ ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক অপেক্ষা আরও এক ধাপ নীচে; অর্থ-কারগণ (অর্থশাস্ত্র-রচয়িতারা) ধর্ম্মকারগণ হইতে এক পৈঠা নীচে ছিলেন, এই সমস্ত ঘটনা হইতে

বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উপর তীর্থিকদের ও মহাবীরের সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার পূর্ব্বগামী অর্হৎ জিনদের প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে আমরা বুদ্ধদেবের একটি উক্তির অর্থ আবিষ্কার করিতে পারি যে, কেন বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,—তিনি দুই চরমের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, পৌর জীবনের আদর্শ ও ত্যাগী সন্ন্যাসি-জীবনের আদর্শ।

সামঞ্ঞফলসুত্তে একটি বিবরণ আছে যে, মহাবীর আত্মসংযমের চতুর্ব্বিধ উপায় চাতুর্যাম সংবর সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব চতুর্যাম-সংবর বাক্যের সংজ্ঞা দুই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এক, মহাবীর-সম্পর্কে, অন্য, স্ব-সম্পর্কে। মহাবীর-সম্পর্কে সংজ্ঞা এই,—নিগণ্ঠ জল হইতে সংবৃত থাকে, পাপ হইতে সংবৃত থাকে; সমস্ত পাপ ক্ষালন করিয়া পাপপ্রতিরোধের বোধে পরিপূর্ণ থাকে—ইহাই তাহার চাতুর্যাম সংবর; সে এই চতুর্ব্বিধিতে বদ্ধ থাকে বলিয়া সে নিগণ্ঠো (নির্গ্রন্থি, বন্ধনবিহীন), গততত্তো (অভিলষিত-উদ্দেশ্য-সিদ্ধ), যততত্তো (বশী, সংযমী, দমী), ঠিততত্তো (স্থিরচিত্ত)। বুদ্ধদেব স্ব-সম্পর্কে চাতুর্যাম সংবর অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—চাতুর্যাম সংবর মানে শীল পালনের চারিটি নীতি, প্রত্যেককে চতুর্দ্দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখা।

মজ্‌ঝিম নিকায়ের চুলসকুলদায়ীসুত্ত পাঠে জানা যায় যে, মহাবীরের মতে চাতুর্যাম সংবর ও আত্মবঞ্চনা আত্মার শান্তিলাভের পথ। চাতুর্যাম সংবরের প্রথম সংবর সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে, জৈনরা শীতল জল পান করিত না, এই ভয়ে যে, জলে প্রাণ ও আত্মা আছে। জৈনদের জীবহিংসা সম্বন্ধে সতর্কতা মক্খলি গোসালের প্রভাবের ফল; তিনি বহু ধর্ম্মমূলক সমস্যা উত্থাপন করিয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যে একটি এই—প্রাণধারণের জন্যও প্রাণিহিংসা করা সঙ্গত কি না? সূত্রকৃতাঙ্গ পাঠে জানা যায় যে, হত্থিতাপস-সম্প্রদায় বৎসরে এক দিন একটি হস্তী বধ করিয়া সম্বৎসর তাহার মাংস আহার করিতেন এবং এইরূপে প্রাণিবধের সংখ্যা বৎসরে মাত্র একটির বেশী করিতে না হওয়ায় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেন। ব্রাহ্মণ-সংহিতাকার-ব্যবস্থাপকেরা স্মৃতিতে কোন কোন পশু ও মৎস্যের মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু যতী সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্মভাবে সর্ব্ববিধ অহিংসার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। মজ্‌ঝিম নিকায়ের উপালিসুত্তে এই বিষয়ে একটি মনোরম আলোচনা আছে। জৈন গৃহী উপালি বলিলেন,—তাঁহার ধর্ম্মগুরু মহাবীরের মতে প্রাণিহিংসামাত্রই পাপ—সেই হিংসা ইচ্ছাকৃতই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক। বুদ্ধদেব বলিলেন,—অনিচ্ছাকৃত কোন কর্ম্মে মানুষ পাপভাগী হইতে পারে না; প্রাণিবধ নিবারণ করা অসাধ্য; কারণ, চলিতে ফিরিতেও মানুষ বহু প্রাণ নষ্ট করিতে বাধ্য হয়। জৈনগণ এই বৌদ্ধ মতবাদের বিরোধী। সূত্রকৃতাঙ্গ পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে মনোরম বৃত্তান্ত জানা যায়।

দীঘনিকায়ের অন্তর্গত কস্সপসীহনাদসুত্তে বুদ্ধদেব অচেলক (বিবস্ত্র, দিগম্বর) সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, সেই বিবরণ অপরিবর্ত্তিতভাবে অঙ্গুত্তরনিকায়; পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি ও অন্যান্য পুস্তকে আছে। এই বিবরণ মধ্যে সেই সময়কার বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অবলম্বিত নিয়ম ও আচার প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই ব্রহ্ম-

পরিধায়ী। এই বিবরণের সহিত অধুনা লুপ্ত ও প্রাচীনতর ধর্ম্মসূত্রগুলিতে উল্লিখিত বৈখানস-ধর্ম্মসূত্রে বা শ্রামণক সূত্রের তুলনা করা যাইতে পারে। এই বৌদ্ধ বিবরণ হইতে যে সমস্ত আচারের কথা জানিতে পারা যায়, তাহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মসূত্রে বানপ্রস্থী ও যতীদের পালনীয় নিয়ম ও আচারের মত। বৌদ্ধ বিবরণের বিশেষ মূল্য এই যে, তাহার মধ্যে তীর্থিক-সম্প্রদায়ের বহু উল্লেখ আছে। কেশকম্বলি-সম্প্রদায় কেশ দ্বারা প্রস্তুত কম্বল পরিধান করিত। আজীবিক সম্প্রদায় নন্দবচ্ছ, কিসস সংকিচ্চ, মক্খলি গোসাল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; বুদ্ধদেব ইহাদের বিবরণ মজ্ঝিম নিকায়ের মহাসচ্চকসুত্তে পৃথগ্‌ভাবে দিয়াছেন; এই বিবরণ বস্তুতপক্ষে অচেলক সম্প্রদায়ের বিবরণেরই একাংশ। সেই বিবরণের প্রধান বিষয় এই,—আজীবিকেরা বস্ত্র পরিধান করিত না। তাহারা প্রাণিমাত্রেরই প্রতি সদয় আচরণ করিত। তাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বিবেচনা করিত ও কাহারও আদেশ মান্য করিত না। তাহারা বহুদিন বা বহু সপ্তাহ একাদিক্রমে উপবাস করা অভ্যাস করিয়াছিল। মজ্ঝিম নিকায়ের মহা-সচ্চকসুত্তে আছে যে, সচ্চক নামে এক জৈন বুদ্ধদেবকে জানাইয়াছিলেন যে, আজীবিকেরা নৈতিক জীবন যাপন না করিয়া উত্তম খাদ্য ও পানীয় দ্বারা দৈহিক বল ও মেদ বৃদ্ধির চেষ্টা করিত। সূত্রকৃতাঙ্গ পাঠে জানা যায় যে, একজন জৈন মক্খলি গোসালকে কুচরিত্রতার জন্য নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব আজীবিকদিগের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগকে কুচরিত্র বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিয়া মনে হয় না। যদিও জৈনদের কাছে আজীবিক শব্দ সংসারাসুরক্তির প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, তাহারা আধ্যাত্মিক জীবনের অনুকূল নীতি সম্মা আজীবো (সম্যক্ জীবন) পালন করিত। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধশাস্ত্র আজীবিকদের যে সামান্য বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট জানা যায় যে, আজীবিকেরা জৈন ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পালনীয় প্রায় সকল প্রকার নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিত। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, আজীবিকদের নিকট হইতেই জৈন ও বৌদ্ধদের 'সম্মা আজীবো' নীতি পাওয়া গিয়াছে। তীর্থিকদের প্রভাব যে কেবল জৈন ও বৌদ্ধদের আচরণেই পড়িয়াছিল, তাহা নয়, তাহাদের ধর্ম্মমতও উহাদের মতবাদে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

আমাদের এই আনুমানিক উক্তির সমর্থক প্রমাণ তীর্থিকদের মতবাদ পর্য্যালোচনা করিলে পাওয়া যাইবে। পকুধ কচ্চায়ন (কুকুধ কাত্যায়ন) যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে—সস্সতবাদ (শাশ্বতবাদ।—ব্রহ্মজালসুত্ত, দীঘ-নিকায়, Vol. I, P. 1); অঞ্ঞজীবো (অন্যজীব—দ্বৈতবাদ), অঞ্ঞংশরীরোবাদো, সত্তকায়বাদো, আত্মষষ্ঠবাদো, অনিচ্চবাদো, অকিরিয়াবাদো (অক্রিয়াবাদ)। কবন্ধী কাত্যায়নের দার্শনিক তত্ত্ব নাস্ত্যস্তিবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়—নোয় উপজ্জএ অসম্—অসৎ বা অনস্তিত্ব হইতে কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে না; সতো নত্থি বিনাসো—যাহা সৎ বা অস্তি, তাহার বিনাশ বা নাস্তি নাই; অসতো নত্থি সম্ভবো—অসৎ বা নাস্তি হইতে কিছুর সম্ভব বা উদ্ভব হইতে পারে না। (সূত্রকৃতাঙ্গ, ২, ১, ২২)। এই সকল বৌদ্ধ খণ্ডিত রচনাগুলির মধ্যে, দার্শনিক তত্ত্বের

বা তর্কভাবের উল্লেখ দেখা যায় না। ইহা সুবিদিত যে, এই সৎকার্য্যবাদ ভারতীয় প্রধান দার্শনিক মতগুলির মধ্যে ভগবদ্‌গীতায় সাংখ্যে, বৈশেষিক দর্শনে, বেদান্তে অনুসৃত হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মের মধ্যেও এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়,—জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে এবং উপনিষদের ধর্ম্মে; বিশেষ করিয়া কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে এই তত্ত্ব আলোচিত হইতে দেখা যায়। এই কারণে জৈন টীকাকার শিলাঙ্ক প্রভৃতি এই তত্ত্বকে ভগবদ্‌গীতা, সাংখ্য ও শৈব দর্শনের তত্ত্বের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। বস্তুর শাশ্বত অস্তিত্ব মহাবীর ও বুদ্ধদেব এই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, আত্মা ও জগৎ (অত্তা চ লোকো চ)—উভয়ই শাশ্বত—চিরন্তন, উহা হইতে পূর্ব্বে ছিল না, এমনতর নূতন কিছু উৎপন্ন বা সৃষ্টি হইতে পারে না; উহারা শৈলশিখরের ন্যায় অবিচল ও স্থিরপ্রোথিত স্তম্ভের ন্যায় সুস্থির। এই তত্ত্ব চিরন্তনকালে এক ও সত্য।

কচ্চায়ন জ্ঞানকে সাত বা ছয় উপায়ে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে এই সাত উপায়—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, আনন্দ, বেদনা ও আত্মা। জৈন মতে এই ছয় উপায়—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা। জৈন ও বৌদ্ধ বিবরণে পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে ঐক্যও আছে। কাত্যায়নের মতে বস্তুর স্থূল-অস্তিত্ব ছয় বা সাত তত্ত্বের ক্রমান্বয় সংযোগ বিয়োগ ছাড়া আর কিছু নহে; বস্তু-তত্ত্ব আনন্দে সংযুক্ত হয়, বেদনায় বিচ্ছিন্ন হয়। এইরূপে কতকটা নচিকেতার মতানুসরণ করিয়া ও ভগবদ্‌গীতা অনুসরণ করিয়া কাত্যায়ন জন্মমৃত্যুকে বিজ্ঞান-জগতের সাধারণ ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কচ্চায়নের বহুত্ববাদ প্রশ্নোপনিষদে অর্থাৎ সাংখ্যে পিপ্পলাদের দ্বৈতবাদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পিপ্পলাদ বলিয়াছেন যে, প্রাণ ও রয়ি (পুরুষ ও প্রকৃতি) সমস্ত বস্তুর উৎপত্তির নিদান। পিপ্পলাদের মতবাদ আধুনিক দার্শনিক তত্ত্বের বিরোধী। যদি বস্তু অসৃষ্ট, অকারণ ও চিরন্তন হয়, তবে সৎ অসৎ ও ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে নৈতিক পার্থক্য করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অকিরিয়াবাদ শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। কাত্যায়ন চিন্তা ও প্রাণকে এক বলিয়াছেন। ফলে তিনি সামান্য জ্ঞান দিয়া বিশেষকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাবীর ও বুদ্ধদেব—উভয়েই কাত্যায়নের মত মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহার এই মত প্রত্যাখ্যানই করিয়াছেন। কারণ, উভয়েরই মতে বিজ্ঞানতত্ত্ব সম্পূর্ণ অনধিগম্য ও কোন প্রতীক দ্বারা উহার প্রকাশ অসম্ভব। এইরূপে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর কাত্যায়নের প্রভাব বিরুদ্ধতামূলক বলিয়া বোধ হয়।

অজিতকেশকম্বলীও তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়া মহাবীর ও বুদ্ধের আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতবাদ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের বিরোধী। ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক ব্যাপারমাত্রেরই সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট তাচ্ছিল্য দেখা যায়। তিনি জন্মান্তরবাদ ও পাপ-পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগৎ চতুর্ভূতের সমষ্টি—আকাশ ইন্দ্রিয়ানুভূতির আধারমাত্র এবং আত্মা বস্তুর বিকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তিনি কচ্চায়নের বহুত্ববাদ বা দ্বৈতবাদের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন,—তং জীবো তং শরীরং—যাহা জীবন, তাহাই শরীর।

মহাবীর ও বুদ্ধ অজিতের এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, এই বলিয়া যে, অজিত আত্মা ও শরীরকে—মূর্ত্ত অমূর্ত্তকে বাস্তবিক এক বলেন নাই, তিনি এই বলিতে চাহিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের বস্তুকে বাস্তবিক এক অখণ্ডরূপে দেখা ছাড়া আর উপায় নাই।

পায়াসি তাঁহার পূর্ব্বজ অজিতের মতবাদ স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (পায়াসিসুত্তন্ত, দীঘনিকায়, Vol. II.)। স্থানঙ্গ এই মতবাদকে বলিয়াছেন—ন, সন্তি পরলোকবাদা। মহাবীর ও বুদ্ধ অজিতের মতবাদকে বলিয়াছেন, অকিরিয়াবাদো; কারণ, এই মত অনুসরণ করিলে ক্রিয়াতে অপ্রবৃত্তি ও জীবনে অবসাদ জন্মে। যাহাই হউক, মহাবীর ও বুদ্ধ তাহার নিকটে যথেষ্ট উপকৃত—(১) তিনি বস্তুকে অখণ্ডরূপে দেখিতে শিখাইয়াছেন, ও (২) ক্রিয়ার ন্যায়ান্যায় বিচারে ইচ্ছার প্রবর্ত্তনা সন্ধান করিতে হইবে—ইহাও তাঁহারই শিক্ষা।

বৌদ্ধ সামঞ্ঞফলসুত্ত হইতে পূরণ কস্সপের দার্শনিক মতবাদের বিকৃত ও খণ্ডিত বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ কেবল কস্সপের দার্শনিক তত্ত্বের নৈতিক দিকের বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কস্সপ নৈতিক জীবনে ইচ্ছার অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন। জৈন ও বৌদ্ধগণ কস্সপের মতকেও অকিরিয়াবাদা বলিয়াছেন। বৌদ্ধগণ অজিতের দর্শন-তত্ত্বকে প্রাধান্য দেন নাই। জৈন সূত্রকৃতাঙ্গ স্পষ্ট বলিয়াছে যে, অজিতের মতে আত্মার উদাসীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। যখন ব্যক্তি কর্ম্ম করে বা অপরকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, তখন সেই কর্ম্মকর্ত্তা তাহার আত্মা নহে (এবম্ অকারয়ু অপ্পা)। জৈন টীকাকারেরাও এই মতকে সাংখ্যমতের সহিত এক বলিয়াছেন। কারণ, সাংখ্যমতেও আত্মা উদাসীন। কস্সপ-লিখিত কোন প্রমাণ না পাওয়াতে আমরা জানিতে পারি না—তিনি ব্যক্তির সজ্ঞান অভিজ্ঞতায় আত্মার কার্য্য সম্বন্ধে কি ধারণা করিয়াছিলেন। সাংখ্যমতে আত্মা বা পুরুষ নিষ্ক্রিয় উদাসীন দ্রষ্টামাত্র এবং প্রকৃতিই শরীর-মনের সকল কর্ম্মচেষ্টা সম্পাদন করিয়া থাকে। কস্সপের মতে নিষ্ক্রিয় উদাসীন দ্রষ্টা পুরুষ বা আত্মাই প্রকৃতিকে কর্ম্ম প্রবর্ত্তনা দান করে। শরীর-মনকে উপাধি আত্মার সহিত যোগযুক্ত করে। এইরূপে কস্সপের মত পিপ্পলাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অপুষ্ট সাংখ্যমতকে পরিপুষ্টি দানে সাহায্য করিয়াছিল এবং কস্সপের মতের প্রভাব জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপরও বিপরীতভাবে পড়িয়াছিল—তাহারা কস্সপের আত্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদ অসম্ভাব্য বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিল।

ইহা বোধ হয় অসম্ভব নয় যে, বুদ্ধদেব শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের অকারণবাদ যদৃচ্ছাবাদ হইতে খেদ-উপনিষদের দার্শনিকতত্ত্বের, সহিত পূরণ কস্সপের অধীচ্ছাসমুৎপাদ ও অহেতুঅপ্পচ্চয়বাদো এক ধরিয়া বুঝিয়াছিলেন—অহত্বা অহোসি—না থাকিয়াও কিছু হইতে পারা, নাস্তি হইতে অস্তি হওয়া—পূরণ কস্সপের মূল মত বলিয়া বুদ্ধদেব বুঝিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের পটিচ্চসমুপ্পাদ—কারণ হইতে কর্ম্মের উৎপত্তির তত্ত্ব—কস্সপের অধিচ্চসমুপ্পাদ তত্ত্বের বিপরীত। পূরণ কস্সপের মতবাদ বুদ্ধদেব নীতির দিক্ দিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বুঝিয়াছিলেন—নাস্তি হইতে অস্তি মানে অ-কারণ আত্মা হইতেই আনন্দ ও বেদনা, ন্যায় অন্যায়, শুভ অশুভ ইত্যাদির ধারণা জন্মে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সামঞ্ঞফলসুত্তের মতে, মক্খলি গোসাল কর্ত্তৃক অহেতুকবাদ বা অকারণবাদ প্রবর্ত্তিত

হইয়াছিল ; কিন্তু গোসালের চিন্তাধারার সঙ্গে এই মতবাদের মিল পাওয়া যায় না। অঙ্গুত্তর-নিকায়ের একটি পদে আনন্দ কস্‌সপ ও গোসালের মতবাদ মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন এবং আনন্দ অকারণবাদের প্রচারক বলিয়া কস্‌সপের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোধ হয়, এই সব গোলমালের জন্যই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, গোসালের মতবাদ সর্ব্বাপেক্ষা হীন। শ্রীমতী রীস্ ডেভিড্‌স্ দেখাইয়াছেন যে, এই উক্তি করিবার সময় বুদ্ধদেব গোসালকে অজিতকেশকম্বলী মনে করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি উপহাস করিয়া বলিয়াছেন—কেশকম্বল গ্রীষ্মকালে গরম ও শীতকালে শীতল থাকে, অতএব উহা অহেতুক। মোক্‌খলি গোসালের চিন্তার ধারা অনুসরণ করিলে তাঁহাকে অদৃষ্টবাদী বলিয়াই বোধ হয় ; তিনি কিছুতেই অকারণবাদী ছিলেন না। জৈন ভগবতীতে দেখিতে পাই, মোক্‌খলি গোসালের মতে সমস্ত বস্তুই অপরিবর্ত্তনীয় স্থির। বুদ্ধঘোষও বলিয়াছেন যে, গোসালের মতে যাহা হইবার, তাহাই হয় ; যাহা হইবার নয়, তাহা কিছুতেই হয় না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গোসালের মতে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মেই সমস্ত ঘটে, অর্থাৎ তিনি ঘটনার ক্ষেত্র হইতে অহেতুকত্ব একেবারে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন,—(১) নিয়তি, (২) জাতি, (৩) প্রকৃতি। গোসালের মতে জীব যে আনন্দ ও বেদনা বোধ করে, তাহার কারণ—নিয়তি-সঙ্গতি-ভাবপরিণতা, অর্থাৎ স্বকৃত কর্ম্ম, জন্মপরিবেষ্টন ও স্বভাব (সামঞ্ঞফলসুত্ত, সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র)। গোসালের মতে পদার্থ স্বভাবে পরিবর্ত্তিত হয়—পরিণত পরিণামের সূচনা করে। ইহা এক রকম বিবর্ত্তনবাদ। সামঞ্ঞফলসুত্ত গোসালের মূল মত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে—মূর্খ পণ্ডিত সকলেই জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া দুঃখ ক্ষয় করে (সন্ধাবিত্বা সংসরিত্বা দুক্‌খস্সন্তং করিস্সন্তি)। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু এই তত্ত্বকে গোসালের মূল মত বলিলে তাঁহার মূল মতকে খর্ব্ব করা হয়। তাঁহার মত এই যে, সর্ব্বপ্রকার জীব ও জীবিতবস্তু সম্পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট জন্ম হইতে জন্মান্তরের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে এবং প্রত্যেক জন্মের বিশেষ প্রকারের সুখ দুঃখ ও আনন্দ বেদনা ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে। এইরূপ করিতে করিতে চরম অবস্থায় জীব, জিনি (সর্ব্বজয়ী সম্পূর্ণ জীব) হইয়া থাকে। গোসালের এই বিবর্ত্তনবাদ ও ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে—গোসালের মতে ব্যক্তি ক্রমোন্নত হইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, উপজাতি হয় না ; নিম্নস্তরের উপজাতির ব্যক্তি উচ্চস্তরের উপজাতিতে উন্নীত হয়। এইরূপ জন্মান্তর পরিগ্রহে বিবর্ত্তনবাদ বুঝাইবার জন্য গোসাল জীব-সমূহকে ক্রমোন্নত শ্রেণীতে বিভক্ত ও সজ্জিত করিয়াছেন এবং মোটামুটি তাহার ভিতর হইতে দুইটি শ্রেণী পাওয়া যায়—মনস্তত্ত্বমূলক ও শরীরতত্ত্বমূলক। কিন্তু তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝা যায় যে, শরীরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই মনেরও পরিপুষ্টি হইতে থাকে। তিনি কাল অনন্ত বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন এবং অনন্ত কালকে কল্প, অন্তরকল্প প্রভৃতি বিভাগ ও উপ-বিভাগ দ্বারা সমশৃঙ্খলা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তির কাছে কাল সীমাবদ্ধ। যেমন, একগুলি সূতার প্রসারের শেষ সীমায় পৌঁছিলে গুলি আর ঘুরাইয়া খোলা যায় না। জীবের অস্তিত্ব বিভিন্ন-

স্তর সম্বন্ধ ; মানুষের জীবনের পরিণতিতে আটটি স্তর আছে এবং প্রত্যেক স্তরে তাহার শারীরিক গঠনের পরিপুষ্টির অনুপাতে মানসিক গঠন পরিপুষ্টি লাভ করে এবং আবার মানসিক গঠনের অনুপাতে তাহার শরীর পরিপুষ্টি লাভ করে। আত্মার ক্রমোন্নতিবাদের দ্বারা গোসাল পূর্ব্বজ আরণ্যকদের (ঐতরেয় আরণ্যক) এবং পরবর্ত্তী ধর্ম্মদর্শন-প্রবর্ত্তক মহাবীর ও বুদ্ধদেবের মধ্যে সংযোগ-শৃঙ্খলের মধ্যবলয় হইয়া আছেন। গোসালের জীবতত্ত্ব তাঁহার পরগামীদিগকে চিন্তার প্রচুর সুযোগ দান করিয়াছে এবং তাঁহারই যুক্তি লইয়া তাঁহারা নৈতিক, সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। সুত্তনিপাতের অন্তর্গত বাসেট্ঠ সুত্ত জীবতত্ত্ববিষয়ক যুক্তি দেখাইয়া জাতিভেদপ্রথা খণ্ডন করিয়াছে, জাতিভেদ অচল, এই কারণে যে তাহাতে প্রথমতঃ অনেক উপজাতি আছে—আবার মানুষের ভিতরও অনেক উপজাতি বিভাগ করিতে হয়। বুদ্ধদেব বহুবিধ জীব, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ প্রভৃতির উপজাতি নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন,—মানুষের মধ্যে এত রকম উপজাতি দেখা যায় না (১১৫ পৃষ্ঠা, ১৪ শ্লোক), অতএব মানুষের জাতিবিভাগ কৃত্রিম, সুতরাং অসঙ্গত। জাতিভেদের মিথ্যা বিভাগ তখনই জানা যায়, যখনই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল উভয়ের শরীরগত পার্থক্য কিছু নাই এবং একে অপর জাতীয় কন্যা হইতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারে।

সামঞ্ঞফলসুত্তের এক অংশে আছে যে, গোসাল কর্ম্মকে তিন স্তরে ভাগ করিয়াছেন—চিন্তা, বাক্য, ক্রিয়া ; চিন্তা অর্দ্ধকর্ম্ম। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কর্ম্মের এই ত্রিভাগ জেন্দ-আবেস্তা হইতে গৃহীত। কিন্তু এ অনুমান যথার্থ নহে ; ইহা ভারতেরই চিন্তার ফল এবং জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে ইহার বিশেষ আলোচনা আছে। জীবতত্ত্ববিদ্ বলিয়া গোসাল কর্ম্মের অঙ্গের মধ্যে বাক্য ও ক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়াছেন ; বুদ্ধদেব মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিয়া চিন্তা বা চেতনার উপর জোর দিয়াছেন ; মহাবীর উভয়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া মন ও শরীরের পরস্পরাপেক্ষিতা স্বীকার করিয়া মনোকম্ম ও কায়কম্ম, উভয়কেই তুল্য মূল্য মনে করিয়াছেন—চিত্তংবয়ো কায়ো হোন্তি, কায়ংবয়ম চিত্তম্ হোতি। মোক্খলি গোসালের নির্দ্দিষ্ট নিয়তিবাদ মানিতে গেলে নৈতিক বিপত্তি উপস্থিত হয়। যদি জীব নিয়তির দ্বারাই পরিচালিত হয়, তবে তাহাদিগকে তাহাদিগের কর্ম্মের জন্য দায়ী করা অন্যায়। মহাবীর ও বুদ্ধদেব উভয়েই বলিয়াছেন যে, গোসালের নিয়তিবাদ মানিলে জীবের স্বেচ্ছার স্বাধীনতার অবকাশ থাকে না। অতএব তাঁহার মতবাদকে অকিরিয়া-বাদো বা অক্রিয়াবাদ বলা যায়—তাহাতে কর্ম্মপ্রেরণার কোন প্রবর্ত্তক পাওয়া যায় না কিন্তু বস্তুতঃ গোসালের নির্দ্দিষ্টবাদ মানবের নৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী নহে ; গোসাল তাঁহার মতবাদে এই দার্শনিক তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন যে, জাগতিক ব্যাপারে জড় ও মানস সমস্ত ক্ষেত্রেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুগতাই প্রবল। এইরূপে তিনি লোককে সাবধান করিতে চাহিয়াছেন যে, নৈতিক ও চারিত্রিক স্বাধীনতা যদি থাকে, তবে তাহা নিয়মানুগত স্বাধীনতাতেই প্রকাশ পায় ; যদি স্বেচ্ছা কার্য্যকরী হইতে চায়, তবে তাহাকে সাধারণ বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা মানিয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্তো ও বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্তের শিক্ষক পরিব্রাজক সঞ্জয় এক কি না, তাহা এখনও নিশ্চিত জানা যায় নাই। অধ্যাপক যাকবি দুইজনকে অভিন্ন বলিয়াছেন। বেলট্ঠিপুত্তো তাঁহার কালের একজন প্রথিতযশা পরিব্রাজক শিক্ষক ছিলেন। জৈন উত্তর অধ্যায়নকল্পিসূত্রে এক সঞ্জয়ের উল্লেখ আছে; তাঁহার মতে নাস্তিক্যবাদের আভাস পাওয়া যায়; তিনি গর্দ্দবালি কর্ত্তৃক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বেলট্ঠিপুত্তোই ঐ পরিব্রাজক সঞ্জয় এবং তাঁহার পূর্ব্বতন ছাত্র সারিপুত্ত পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়া উভয় শিক্ষকের মিলনের মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, তবে ইহা বুঝা যায় যে, কেমন করিয়া নাস্তিক্যবাদ ক্রমে যুক্তি-তর্কসঙ্গত বিশ্বাসের স্থান করিয়া দিয়াছিল। এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ ঘটে নাই। ভারতীয় দর্শনে সঞ্জয়ের দান গ্রীক ঐতিহ্যে পিরহো'র দানের তুল্য বলা যাইতে পারে; ঐ পিরহো খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতকে ভারতে আসিয়া ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করেন। তিনি অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসের মূলচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, জীবন ও বস্তুর নিশ্চয়তা ও বাস্তব সত্তা সম্বন্ধে মানবীয় জ্ঞান কখনও স্থিরনিশ্চয় হইতে পারে না।' তিনি প্রথম বৃথা তত্ত্বালোচনা ছাড়িয়া সমাহিত শান্ত মানসিক অবস্থা লাভকেই শান্তির পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এইরূপে তিনি চরিত্র ও নীতির দ্বারা শাসিত যুক্তিমার্গ প্রবর্ত্তন করিয়া মিথ্যা জল্পনার পথ রুদ্ধ করেন। সঞ্জয় দার্শনিক হিসাবে তার্কিক পর্য্যায়ভুক্ত, এবং তাঁহার শিক্ষা পকুধ কচ্চায়ন ও অজিত কেশকম্বলীর শিক্ষার সিহিত মিলাইয়া না বুঝিলে দুর্ব্বোধ মনে হয়। *

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

---

* এই প্রবন্ধপ্রণয়ন কালে আমি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি,—

১। Life of the Buddha ... ... Rockhill
২। Buddhist India ... ... Rhys Davids
৩। Jātaka ... ... Fausboll
৪। Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics—Ajivikas.
৫। Majjhima Nikāya. ... ... P. T. S. Edition
৬। Indian Buddhism ... ... Kern
৭। Uvāsagadasāo. ... ... Hoernle
৮। Jaina Sutras. ... ... S. B. E.
৯। Sutrakritānga ... ... S. B. E.
১০। Buddhah ... ... Oldenberg.
১১। Anguttara Nikāya (Siamese Edition)
১২। Sumangala Vilāsint ... ... P. T. S. Edition.
১৩। 'A short account of the wandering teachers at the time of the Buddha.'—B. C. Law. (J. A. S. B. Vol. XIV, 1918, No. 7.)
১৪। প্রশ্নোপনিষৎ।

—লেখক

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা *

গত বৎসর যখন আমি জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় পদার্থবিদ্যা পড়াইতে আরম্ভ করি, তখন বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অভাবে বড়ই বিব্রত হইয়াছিলাম। আমাকে গোড়ায় ইংরেজি বাঙ্গালায় মিশাইয়া একটা খিচুড়ি ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। যদিও বাঙ্গালা ভাষায় তখনও বহু বৈজ্ঞানিক শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি বহুপুস্তকে ও প্রবন্ধে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। এই অভাব দূরীকরণের জন্ত আমি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। আমার সঙ্কলিত পরিভাষার কিয়দংশমাত্র এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়-প্রণীত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলি, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের 'পদার্থবিদ্যা' রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের 'রসায়নসূত্র,' শ্রীযুক্ত জগদিন্দুনাথ রায়ের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, স্বর্গীয় ব্রজমোহন মল্লিক-লিখিত জ্যামিতি ও নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে প্রচারিত 'গণিত কী পরিভাষা' হইতে অধিকাংশ শব্দই সংগৃহীত হইয়াছে। যে পরিভাষাগুলি আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ রচনা করিয়াছি। আবার যেখানে পরিভাষা লইয়া মতদ্বৈধ আছে, সেখানে যে শব্দটি আমার নিকট ঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। পরিভাষা সঙ্কলন-বিষয়ে স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩০১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় যে মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"জ্ঞানের ভাষা বা বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠনের সময় এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে। যে শব্দটি উচ্চারণ করিবে, তাহার যেন একটি নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট, হেঁয়ালিবিহীন অর্থ থাকে। একটি নির্দ্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে, সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করিবে না এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি করিবে না, এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূলসূত্র।" চলিত ভাষায় যে সকল পরিভাষা সাধারণ লোকের মধ্যে বিকৃতভাবে চলিয়া আসিতেছে, সেগুলিকেও কিছু মার্জ্জিত করিয়া লইতে হইবে। যদি আমরা সেই সকল শব্দ সাধুভাষানুমোদিত নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ রচনা করি, তবে সেগুলি পুথিগতই থাকিয়া যাইবে, তাহার প্রচলন হইবে না। যে সকল ইংরেজি শব্দের পরিভাষা বাঙ্গালায় নাই, সেগুলির পরিভাষা প্রথমে সংস্কৃত ভাষা হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা উচিত। সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া না যাইলে, সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে নূতন সুখপাঠ্য পরিভাষা গঠন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষার সহায়তায়ও সুন্দর পরিভাষা সংগঠন দুঃসাধ্য হইতেছে, তখন ইংরেজি পারিভাষিক শব্দগুলিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে হইবে।

---

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এইরূপে এবং এবম্বিধপ্রকারে আমাদিগকে পরিভাষা-সঙ্কলন-কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। পরিভাষা-সঙ্কলনের সময় যথেষ্ট সাবধানতার আবশ্যক। পরিভাষা-সঙ্কলন কিরূপভাবে করিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম। এই দৃষ্টান্তগুলির অনুশীলন করিলে বিষয়টির গুরুত্ব বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

ধরুন 'cone' শব্দটির বাঙ্গালা পরিভাষা করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই, ইহার পরিভাষায় কোন কোন পুস্তকে 'সূচী' লিখিত হইয়াছে। 'cone'এর পরিভাষা 'সূচী' হইলে pyramidএর পরিভাষা কি হইবে? 'হিন্দী গণিত কী পরিভাষা' পুস্তিকায় pyramidএর পরিভাষা 'সূচী' শব্দটি গৃহীত হইয়াছে। ইহাই খুব যুক্তিসঙ্গত। pyramid এক শ্রেণীর solidএর সাধারণ নাম বই আর কিছুই নহে। Octagonal বা অষ্টকোণ pyramid hexagonal বা ষট্‌কোণ pyramid প্রভৃতি solidগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যখন এই অষ্টকোণ বা ষট্‌কোণ pyramid অনন্তকোণবিশিষ্ট হয়, তখন pyramid 'cone'এ পরিণত হয় ক্ষিতিজতলস্থ অষ্টকোণ বা ষট্‌কোণ pyramidকে ক্ষিতিজতলের দ্বারা ছিন্ন করিলে, ছেদক্ষেত্রটি একটি অষ্টকোণ বা ষট্‌কোণ হয়। সেইরূপ ক্ষিতিজতলস্থ coneকেও ক্ষিতিজতলের দ্বারা ছিন্ন করিলে ছেদক্ষেত্রটি একটি বৃত্ত হয়। অতএব pyramidএর পরিভাষা 'সূচী' করিয়া, cone, octagonal pyramid, hexagonal pyramid প্রভৃতির পরিভাষা যথাক্রমে 'বৃত্তসূচী', 'অষ্টকোণ সূচী', 'ষট্‌কোণ সূচী' ইত্যাদি করিলে বড়ই সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয়।

Conjugate :—হিন্দী 'গণিত কী পরিভাষায়' 'সম্বন্ধ' conjugateএর পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাঙ্গালায় 'সম্বন্ধ' শব্দটি খুবই সাধারণ। সেই জন্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের মূলসূত্রানুসারে এই শব্দটি conjugateএর পরিভাষারূপে গ্রহণ করা চলে না। আমি ইহার পরিবর্ত্তে 'যুতক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি; 'যুতক' শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত শব্দ নহে এবং 'conjugate' ও 'যুতক' শব্দদ্বয়ের ধাত্বর্থ একই।

Convergent ও divergent :—'অন্তর্মুখী' ও 'বহির্মুখী' convergent ও divergentএর পরিভাষারূপে ব্যবহার করিয়াছি। 'কেন্দ্রাভিমুখী' ও 'কেন্দ্রাপসারী' করিলে আরও ভাল হইত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু শেষোল্লিখিত শব্দদ্বয়কে convergent ও divergentএর পরিভাষারূপে গ্রহণ করিলে centripetal ও centrifugalএর পরিভাষা কি হইবে? এইজন্য আমাকে 'অন্তর্মুখী' ও 'বহির্মুখী' শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

Corpuscle :—আমরা শারীর-বিজ্ঞানে ও পদার্থ-বিজ্ঞানে 'corpuscle' শব্দটি পাই। শারীর-বিজ্ঞানে রক্তকণার ইংরেজী নাম 'blood corpuscle'। পদার্থ-বিজ্ঞানে Newtonএর 'corpuscular theory'তে 'corpuscle' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'blood corpuscle'কে অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়। কিন্তু Newtonএর 'corpuscle' অতীন্দ্রিয় পদার্থ; ইহাকে অণুবীক্ষণের সহায়তায় দেখা যায় না। সেই জন্য শারীর-বিজ্ঞানের 'corpuscle'

এর পরিভাষা 'কণা' করিয়া, Newtonএর 'corpuscle' এর পারিভাষিক প্রতিশব্দ 'কণিকা' করিয়াছি।

Focus :—স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় 'নাভি' (umbilicus=নাভি) focusএর পরিভাষা করিয়াছেন। স্বর্গীয় পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় 'অধিশ্রয়ণী' focusএর (focus=অগ্নিকুণ্ড) পরিভাষা করিয়াছেন। 'অধিশ্রয়ণী' শব্দ গ্রহণ করা উচিত কি 'নাভি' শব্দ গ্রহণ করা উচিত, এই লইয়া শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত ও স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মধ্যে কিছুদিন ধরিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিচার চলিয়াছিল। অপূর্ব্ব বাবু 'নাভি'র পক্ষপাতী ও রামেন্দ্র বাবু "অধিশ্রয়ণী" বা "অধিশ্রয়"এর পক্ষপাতী ছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাঁহারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আমরা 'focus' শব্দটি গণিত-শাস্ত্রে ও পদার্থবিজ্ঞানে (বিশেষভাবে আলোক-বিজ্ঞানে) ব্যবহৃত হইতে দেখি। গাণিতিক-focus ও পদার্থ-বিজ্ঞানের focusএর ধর্ম্ম একজাতীয় নহে। আলোক-বিজ্ঞানের focusএর একটি ধর্ম্ম এই যে, এখানে রশ্মিপুঞ্জ কেন্দ্রীভূত হইয়া আলোকের প্রাখর্য্য বৃদ্ধি করে বা করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সেইজন্যই ইংরেজিতে focus শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমিও এই জন্য 'অধিশ্রয়' শব্দটি পদার্থ-বিজ্ঞানের focus শব্দের পরিভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছি। গণিতশাস্ত্রের focusএর পরিভাষা 'নাভি'ই রাখিয়াছি। আমরা যদি focusএর এই দুইটি পরিভাষা দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি, তাহা হইলে সব গোলমাল চুকিয়া যায় এবং পরিভাষাও সম্পূর্ণরূপে হেঁয়ালিত্ববিহীন হয়। *

Iris ও pupil :—অগ্নিপুরাণে 'তারা' ও 'দৃক্‌তারা' শব্দ দুইটি Iris ও pupil অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। † আমি 'দৃক্‌তারা' শব্দটি শ্রুতিকটুবোধে পরিবর্ত্তন করিয়া 'তারা' ও Irisএর পরিভাষা 'তারামণ্ডল' করিয়াছি। 'মুখ' ও 'মুখমণ্ডল' শব্দদ্বয়ের সাদৃশ্যে পরিভাষা দুইটি রচিত হইয়াছে। 'মুখ' যেমন 'মুখমণ্ডলের' ছিদ্রবিশেষ, pupilও সেইরূপ Iris-মধ্যস্থ ছিদ্রবিশেষ।

Parabola :—বাঙ্গালায় 'ক্ষেপণী' শব্দ parabolaর পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিরূপে 'ক্ষেপণী' শব্দ 'parabola'র পরিভাষা করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, 'ক্ষেপণীপথ'কে কাটিয়া ছাঁটিয়া 'ক্ষেপণী' করা হইয়া থাকিবে। ক্ষিপ্ ধাতু হইতে 'ক্ষেপণী' শব্দ হইয়াছে। ক্ষিপ্ ধাতুর অর্থ 'নিক্ষেপ করা'; তাহা হইলে 'projectile'এর পরিভাষা 'ক্ষেপণী' করা উচিত। আর 'path of a projectile'এর প্রতিশব্দ 'ক্ষেপণীপথ' করা যাইতে পারে। Parabolaর জন্য নূতন শব্দ সৃষ্টি করা উচিত। হিন্দী 'গণিত কী পরিভাষা'র 'পরবলয়' শব্দ parabolaর পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। এখানে ইংরেজি

---

* শুক্রনীতিতে চক্রের কেন্দ্রস্থানকে নাভি বলা হইয়াছে।

† বাহুলকাদ্দিকোণক বাহুলকাস্তরং তয়োঃ।
তারা নেত্রত্রিভাগেন দৃক্‌তারা পঞ্চমাংশিকা।—অগ্নিপুরাণ, ৪৪।২০।

parabolaকে সামান্য পরিবর্ত্তিত করিয়া সুখপাঠ্য সংস্কৃত শব্দে পরিণত করা হইয়াছে। আমিও সমীচীনবোধে "পরবলয়" শব্দটি parabolaর পরিভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছি।

Sphere :—সংস্কৃত জ্যোতিষে 'গোল' sphere অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বাঙ্গালায় 'গোল' 'sphere' ও 'circular' এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সেই জন্য sphereএর পরিভাষা 'বর্ত্তুল' এবং spherometerএর পরিভাষা 'বর্ত্তুলমান' করিয়াছি।

Truncated pyramid :—হিন্দী 'গণিত কী পরিভাষা'য় 'সূচীখণ্ড' truncated pyramidএর পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। যদি একটি সূচীকে এমনভাবে দ্বিখণ্ড করা যায় যে, একখণ্ড শীর্ষবিশিষ্ট ও অপর খণ্ড শীর্ষবিহীন হয়, তাহা হইলে খণ্ড দুইটিকেই কি 'সূচীখণ্ড' বলা যায় না? কিন্তু আমরা শীর্ষবিহীন খণ্ডকেই truncated pyramid বলি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'সূচীখণ্ড' নির্দ্দোষ পরিভাষা নহে। আমি truncated pyramid এর পরিভাষা 'কবন্ধ-সূচী' করিয়াছি। ঠিক এই যুক্তি বলেই frustrum of a cone এর পরিভাষা 'কবন্ধ বৃত্ত-সূচী' করিয়াছি।

Vitreous humour :—'সান্দ্ররস' vitreous humourএর পরিভাষা করিয়াছি। 'সান্দ্র' শব্দের অর্থ 'গাঢ়', কিন্তু এই শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণতঃ প্রচলিত নহে। এই জন্যই এইটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে geometrical optics বা জ্যামিতিক দৃষ্টি-বিজ্ঞানের পরিভাষাই বিশেষভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। Physical optics বা আলোক-মীমাংসার কতিপয় পরিভাষা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে মাত্র। আলোক-মীমাংসার সম্পূর্ণ পরিভাষা সঙ্কলন গণিতশাস্ত্রের পরিভাষার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সেই জন্য গণিতের পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া পরে আলোক-মীমাংসার পরিভাষা সঙ্কলন করিবার ইচ্ছা রহিল।

নিম্নে সঙ্কলিত পরিভাষার তালিকা দেওয়া গেল। যে পরিভাষাগুলি আমি গঠন করিয়াছি, সেগুলির পার্শ্বে তারকাচিহ্ন দিয়াছি।

A

Aberration—চ্যুতি *
————, chromatic—বর্ণচ্যুতি *
————, spherical—বর্ত্তুলচ্যুতি *
Accommodation—আধান *
Achromatic—বর্ণাপসারী
Achromatism—বর্ণাপসারিত্ব
Angle—কোণ
——, acute—সূক্ষ্মকোণ
Angle, critical—সঙ্কট-কোণ *
—— of deviation—বিচলন-কোণ *
—— of emergence—বহির্গমন-কোণ *
—— of incidence—আপাত-কোণ
—— of minimum deviation—ন্যূনতম বিচলন-কোণ *
——, obtuse—স্থূলকোণ
—— of reflection—পরাবর্ত্তিক কোণ
——, refracting—বর্ত্তক কোণ *

Angle of refraction—বর্ত্তন-কোণ
——, solid—ঘন-কোণ
Angular distance—কৌণিক দূরত্ব *
Aperture of a mirror—দর্পণ-রন্ধ্র *
——of a lens—পরকলারন্ধ্র *
Aplanatic—চ্যুতিহীন *
Aphakia—আফাকিয়া *
Arrowhead—তীরফলা
Astigmatism—আস্তিগ্‌মতিজম্ বা অসমদৃষ্টি
Axis—অক্ষ

B

Blind spot—অন্ধস্থান *

C

Camera—কেমেরা
Centre—কেন্দ্র
——of curvature—অনুবৃত্ত-কেন্দ্র *
——, optical—দৃষ্টিকেন্দ্র *
Chromosphere—বর্ণমণ্ডল
Circle—বৃত্ত
——of curvature—অনুবৃত্ত *
Circular measure—চাপীয়মান
Concave meniscus—কনকেভ্‌ মেনিস্কস্ *
Cone—বৃত্ত-সূচী *
——, frustrum of—কবন্ধ বৃত্তসূচী *
Constant—স্থির
—— quantity—স্থির পরিমাণ
Convex meniscus—কনভেক্স মেনিস্কস্ *
Co-ordinates—ভুজ-যুগ্ম

Cornea—শ্বেতমণ্ডল[১] *
Choroid—করয়েড *
Corona—ছটামুকুট
Corpuscle (physiological)—কণা
Corpuscle (Newton's)—কণীকা *
Corpuscular theory—কণীকাবাদ *
Cosine—কোটিজ্যা (কোজ্যা)
Crystal—স্ফটিক, দানা
——, biaxial—দ্ব্যক্ষ-স্ফটিক
——, negative uniaxial—ঋণাত্মক একাক্ষ-স্ফটিক
——, positive uniaxial—ধনাত্মক একাক্ষ-স্ফটিক
——, uniaxial—একাক্ষ স্ফটিক
Crystalline lens—অক্ষি-পরকলা *
Crystallise—দানা বাঁধা
Cubic system—ঘন-সম্প্রদায়
Concentric—এককেন্দ্রিক *
Curvature—বক্রতা
Curve—বক্র
——, caustic—কস্টিক বক্র *

D

Dark line—কৃষ্ণরেখা, কালদাগ
Decomposition—বিশ্লেষণ
Deviation—বিচলন *
Diameter—ব্যাস
Diffraction—ব্যাবর্ত্তন
Diffraction grating—ব্যাবর্ত্তন জাল *

১। অগ্নিপুরাণের ৩৭০ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে "শুক্লমণ্ডল" শব্দটি cornea অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—
"তেষাং ভূতানুমানাচ্চ ভবতীন্দ্রিয়সম্ভবঃ।
নেত্রয়োর্মণ্ডলং শুক্লং কফাদ্ভবতি পৈতৃকম্।"

Diffusion—বিক্ষেপণ *
Dispersion—প্রক্ষেপণ *
Dotted line—বিন্দুরেখা *
Double refraction—দ্বৈধবর্ত্তন *

E

Ellipse—বৃত্তাভাস
Envelope—আবরণ
Equation—সমীকরণ
Eye piece—উপনেত্র
Ether—ঈথর
——, luminiferous—তেজোবাহী ঈথর

F

Far point (punctum remotum)—অনন্তিক বিন্দু *
Finite—সান্ত, সসীম
Focal length—আধিশ্রয়িক দূরত্ব *
Focus (optical)—অধিশ্রয়
——(mathematical)—নাভি
——, conjugate(optical)—যুতকাধিশ্রয়
——, principal ,, —মুখ্যাধিশ্রয়
——, conjugate (mathematical)—যুতক-নাভি
——, principal (mathematical)—মুখ্য নাভি
Formula—সূত্র, সঙ্কেত, আর্য্যা

G

Gnomon—শঙ্কু
Goniometer—কোণমান *
Globe—গোলক

H

Harmonic motion—হরাত্মক গতি
Heliograph—হেলিগ্রাফ *
Heterogeneous—বিষমধর্ম্মী *
Homogeneous—সমধর্ম্মী *
Humour—রস *
——, aqueous—জলীয় রস *
——, vitreous—সান্দ্ররস *
Hyperbola—অতিপরবলয়

I

Image—প্রতিরূপ, প্রতিবিম্ব
Image, real—বাস্তব প্রতিবিম্ব *
——, virtual—অবাস্তব প্রতিবিম্ব *
Index arm—পট্টিকা
Infinite—অনন্ত
Infinity—অনন্ততা
Intensity—প্রাখর্য্য *
Inverted—বিপরীত-মুখ *
Iris—তারামণ্ডল

K

Kaleidoscope—কালিদোস্কোপ বা বহুবীক্ষণ*

L

Laryngoscope—লেরিঙ্গোস্কোপ বা কণ্ঠনালী-বীক্ষণ*
Lateral inversion—পার্শ্বিক বিপর্য্যয় *
Law—নিয়ম
Lens—পরকলা
——, concave—নতমধ্য, নতোদর, ক্ষীণমধ্য
——, convex—স্থূলমধ্য, উন্নতোদর
——, double concave, bi-concave—ডবল কনকেভ পরকলা *
——, double convex, biconvex—ডবল কনভেক্স পরকলা

Lens, plano concave, concavo plane—প্লেনো কনকেভ পরকলা, ক্ষীণমধ্য সমতল পরকলা *

——plano convex, convexo plane—প্লেনো কনভেক্স পরকলা, স্থূলমধ্যসমতল পরকলা *

Long sight (hypermetropia)—চালশা

Luminous—তেজোময় *

M

Magnification—বর্দ্ধন

Maximum—মহত্তম

Medium—বাহক

———, optical—আলোক-বাহক

Micrometer screw—সূক্ষ্মতামান স্ক্রু *

Microscope—অনুবীক্ষণ

————, simple—সরল অনুবীক্ষণ *

———, compound—জটিল অনুবীক্ষণ *

Minimum—ন্যূনতম

Mirage—মরীচিকা

Mirror—দর্পণ

———, plane—সমতল দর্পণ

———, concave—নতমধ্য বা নতোদর দর্পণ

———, convex স্ফীতমধ্য বা উন্নতোদর দর্পণ

Muscle—পেশী

———, ciliary—সিলিয়ারী পেশী

N

Near point (punctum proximum)—অভিকবিন্দু *

Nerve—নাড়ী

———, optic—দৃষ্টি নাড়ী

Non-luminous—তেজোহীন *

Normal—লম্ব

O

Objective—দৃশ্যাভিমুখী *

Opaque—অনচ্ছ

Opthalmoscope—অপ্থাল্‌মোস্কোপ বা অক্ষিবীক্ষণ *

Optical axis—দৃষ্ট্যক্ষ *

Optical centre of a lens—পরকলার দৃষ্টিকেন্দ্র *

Optical illusion—দৃষ্টিবিভ্রম *

Optical instrument—বীক্ষণযন্ত্র *

Optics—দৃষ্টিবিজ্ঞান *

———, geometrical—জ্যামিতিক দৃষ্টিবিজ্ঞান *

———, physical—আলোক-মীমাংসা *

P

Parabola—পরবলয়

Parabolic—পরবলয়িক

Paraboloidal—পরবলয়াভাসিক

Parallel—সমান্তরাল

Parallax—লম্বন

Penumbra—উপচ্ছায়া

Phakoscope—ফেকস্কোপ *

Phosphorescence—দীপকালোক

Photograph—ফটোগ্রাফ

Photometry—ভামিতি

Photometer—ফটোমিটার বা ভামান *

Photosphere—আলোক মণ্ডল

Plate—ফলক

Point—বিন্দু

Point of intersection—সম্পাতবিন্দু, ছেদবিন্দু
——, nodal—নোদাল বিন্দু
——, principal—মুখ্য বিন্দু
——, cardinal—প্রধান বিন্দু
Polarisation—বিকৃতি *
Polarised—বিকৃত *
Pole—মেরু
—— of a mirror—দর্পণমেরু *
—— of lens—পরকলামেরু *
Polygon—বহুভুজ
Polyprism—বহুকলম *
Prism—কলম
Pupil—তারা
Pyramid—সূচী
——, truncated—কবন্ধ সূচী *
Principle—সিদ্ধান্ত

R

Radius—ব্যাসার্দ্ধ
Ray—রশ্মি
——, emergent—বহির্গামী রশ্মি *
——, incident—পতিত রশ্মি.
——, reflected—পরাবর্ত্তিত রশ্মি
——, refracted—বর্ত্তিত রশ্মি
Rays, pencil of—রশ্মিপুঞ্জ
——, convergent pencil of—অন্তর্মুখী রশ্মিপুঞ্জ *
——, divergent pencil of—বহির্মুখী রশ্মিপুঞ্জ *
Reflecting surface—পরাবর্ত্তক তল *
Reflection—পরাবর্ত্তন
——, total—সমগ্র পরাবর্ত্তন *
Reflection, irregular—অনিয়ত পরাবর্ত্তন *
Refracting surface—বর্ত্তক তল *
Refraction—বর্ত্তন
Refractive index—বর্ত্তনাঙ্ক *
Refrangibility—বর্ত্তনীয়তা *
Retina—অক্ষি-যবনিকা
Right angle—সমকোণ
Ring—বলয় *

S

Stage (microscopic)—মঞ্চ *
Section—ছেদ
——, principal—মুখ্যচ্ছেদ *
Sextant—সেক্সটাণ্ট
——, pocket—পকেট সেক্সটাণ্ট
Shadow—ছায়া
Short sight (myopia)—মায়োপিয়া বা দৃষ্টিক্ষীণতা *
Sight, line of—বীক্ষণ-রেখা *
Sine—ভুজজ্যা (ভুজ্যা)
Slit—আয়ত-ছিদ্র *
Space—আকাশ
Spectrometer—বর্ণচ্ছত্রমান *
Spectroscope—বর্ণচ্ছত্রবীক্ষণ *
Spectrum—বর্ণচ্ছত্র
Spherometer—বর্ত্তুলতামান *
Square—সমচতুর্ভুজ*
Surface of contact or separation—সন্ধিতল*

T

Tangent—স্পর্শরেখা, স্পর্শিনী
Tangent plane—স্পর্শসমতল *

Telescope—দূরবীক্ষণ
Term—পদ
Translucent—স্বচ্ছপ্রায় *
Transparent—স্বচ্ছ
Triangle—ত্রিভুজ
———, equilateral—সমবাহু ত্রিভুজ
———, isosceles—সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ
———, Right-angled—সমকোণী ত্রিভুজ
———, similar—সমজাতীয় ত্রিভুজ

U
Umbra—নিবিড়চ্ছায়া *

V
Velocity—বেগ
Vision, line of—দৃষ্টিরেখা[১] *

W
Wave theory—তরঙ্গবাদ

Y
Yellow spot—পীতস্থান *

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

—o—

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা-সম্বন্ধে মন্তব্য

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় বলিলেন,—"প্রবন্ধলেখক পরিভাষা সংকলন-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত একমত। প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যে কি পরিভাষা পাওয়া যায়, তাহা দেখা উচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে পারিভাষিক শব্দ পাওয়া না যাইলে, ইংরাজি শব্দটিকে অক্ষরান্তরিত করিয়া লইবার আমি পক্ষপাতী। ইহাতে বাঙ্গালার শব্দ-সম্ভার বাড়িবে ও শিক্ষার্থীদিগকে ইংরেজি পড়িবার সময় আবার নূতন করিয়া ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ কণ্ঠস্থ করিতে হইবে না। নামবাচক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না। বর্ণনামূলক শব্দগুলির জন্যই বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ রচনা করা উচিত। আমি আমার রসায়ন-গ্রন্থে clorineএর বাঙ্গালা ক্লোরিন করিয়াছি। ইহার জন্য নূতন নাম রচনা করিবার চেষ্টা করি নাই।"

১। সংস্কৃত জ্যোতিষে 'দৃক্‌সূত্র' আছে। শ্রুতিকটু বলিয়া এই শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর *

(২)

সুবন্ত-স্বর

স্বরস্থিতি অনুসারে সুবন্ত-প্রত্যয়-সমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—প্রবল, মধ্যম ও দুর্ব্বল। ভাষাবিজ্ঞান-শাস্ত্রে প্রবল ও দুর্ব্বল (Strong and Weak)-ভেদে কারক দ্বিবিধ। যে সকল কারক অতি মৌলিক, অর্থাৎ যাহা না হইলে কোনও ভাষারই কাজ চলে না, তাহাদিগকে প্রবল কারক বলা হয়। সে হিসাবে কর্ত্তৃকারক ও কর্ম্মকারক প্রবল বলিয়া গণ্য। অন্য সকল কারকই দুর্ব্বল। প্রবল কারকে প্রাতিপদিকের কোনও অংশের ধ্বংস হয় না; কিন্তু দুর্ব্বল কারকে প্রাতিপদিকের আকার ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। ইহার একমাত্র কারণ, স্বরস্থিতির চলাচল। প্রবল কারকের প্রত্যয় দুর্ব্বল, অর্থাৎ প্রত্যয়ে স্বর থাকে না। দুর্ব্বল কারকে প্রত্যয় প্রবল ও স্বরবান্। সংস্কৃত (বৈদিক ও লৌকিক) ভাষায় প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচন ও দ্বিবচন এবং প্রথমার বহুবচন প্রবল কারক; অর্থাৎ এই সকল স্থানে প্রাতিপদিকে স্বরস্থিতি এবং প্রত্যয় স্বর-বিহীন। কিন্তু যে সকল স্থানে প্রাতিপদিকের অন্ত্য স্বরে সুর থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে প্রাতি-পদিকের অন্ত্য স্বর ও প্রত্যয়ের স্বর একত্র হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি হইলে যাহা হইত, প্রাতিপদিকে স্বর থাকাতেও তাহাই হয়, কোনও প্রভেদ থাকে না। ব্যঞ্জনাদি সুবন্ত প্রত্যয়-সমূহকে মধ্যম কারক ও স্বরাদি প্রত্যয়সমূহকে দুর্ব্বল কারকের প্রত্যয় বলা হয়। সাধারণতঃ দুর্ব্বল কারকের স্বর প্রত্যয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে অনেক স্থলেই প্রাতিপদিকের কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি হয়। ভাষাবিজ্ঞানে এইরূপ হ্রাস-বৃদ্ধিকে ablaut বা স্বরক্রম (vowel gradation) বলে। এই ablaut বা স্বরক্রম-প্রণালীর সংহারশীলতার অধিক উদাহরণ গ্রীক ভাষাতেই পাওয়া যায়। তবে আমাদের সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার প্রভাব অল্প নহে। তিঙন্ত স্বরেও এই প্রকারের হ্রাস-বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে[১]। ধাতুস্বরের গুণ-বৃদ্ধি ও লোপ-প্রাপ্তির হেতুও এই স্বর-স্থিতি। লৌকিক সংস্কৃতে স্বরের সুর না থাকিলেও পদ-গঠনে স্বরপ্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে, অর্থাৎ বৈদিক ভাষায় স্বর-প্রভাব-জন্য হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে যে পদের যেরূপ হইয়াছিল, লৌকিক ভাষায়ও তাহাই ছিল। সুবন্ত স্বরের স্থিতি-বিষয়ে দুই-চারিটী সাধারণ কথা ছাড়া আর বেশী কোনও বিধি প্রণয়ন করা যায় না। কারণ, এখানে স্বরস্থিতির বহু ব্যতিক্রম। সুতরাং সাধারণভাবে স্বরস্থিতির বিষয়ে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী কথাই বলিতে পারি। তার পর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য কথা বলিব।

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। সা° প° পত্রিকা, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা—১৪ পৃ°।

ক। একাক্ষর (monosyllabic) প্রাতিপদিকের দুর্ব্বল ও মধ্যম কারকে (in middle and weak cases) প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি। নাবা, নৌষু, বাচি, বাচাম্, নৌভ্যাম্, ইত্যাদি।[১]

খ। কতিপয় একাক্ষর প্রাতিপদিকে সকল কারকেই প্রাতিপদিক স্বর। গোভিঃ, গবাম্, গোষু। দ্বিতীয়ার বহুবচনে কোথাও কোথাও (প্রাতিপদিক ও প্রত্যয়) উভয়ত্র স্বরস্থিতি।

গ। অনেকাক্ষর ব্যঞ্জনান্ত প্রাতিপদিকের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকেরই দুর্ব্বলতম কারকে প্রত্যয়-স্বর। অন্যত্র প্রাতিপদিক স্বর। তুদতা, তুদতাম্, তুদতোঃ, তুদতে, মহতা, দান্নঃ, মূর্দ্ধে ; কিন্তু তুদদ্ভ্যাম্, তুদৎসু, মহৎসু, তুদদ্ভিঃ।

ঘ। অন্ত্যাক্ষরে স্বরবান্ অনেকাক্ষর প্রাতিপদিকের অন্ত্যাক্ষর বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে, প্রাতিপদিকের স্বর স্বরাদি-প্রত্যয়ের প্রথম স্বরে অপসৃত হয়। মহিমন্ হইতে মহিম্না ; অগ্নি—অগ্ন্যোঃ ; ধেনু—ধেন্বা ; পিতৃ—পিত্রা ইত্যাদি।

ঙ। ই, উ এবং ঋকারান্ত (এবং ঋগ্‌বেদে ঈকারান্ত) অনেকাক্ষর প্রাতিপদিকের ষষ্ঠীর বহুবচনে (আম্ বা নাম্) প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি হয়। অগ্নীনাম্, ধেনূনাম্, দাতৄণাম্, বহ্বীনাম্। সংখ্যাবাচক শব্দ অকারান্ত হইলেও এই নিয়ম। পঞ্চানাম্ দশানাম্। সপ্তানাম্। অষ্ট(ন্) শব্দের সর্ব্ববিভক্তিতেই প্রত্যয় স্বর। অষ্টৌ, অষ্টাভিঃ, অষ্টাভ্যঃ ; অষ্টানাম্। কিন্তু অষ্ট শব্দের দ্বিতীয় স্বরের বৃদ্ধি না হইলে, সেই স্বরেই স্বরস্থিতি হয়। অষ্ট, অষ্টভিঃ, অষ্টভ্যঃ, অষ্টসু।

চ। সম্বোধন পদের স্বরের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে[২]

ছ। অকারান্ত শব্দে স্বরস্থিতি সু-ব্যবস্থিত, অর্থাৎ সকল বিভক্তিতেই একস্থানে স্বর।

একবচন :—

	পুংলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	নপুংসকলিঙ্গ
প্রথমা	কামঃ	দেবঃ	আজ্যম্
দ্বিতীয়া	কামম্	দেবম্	আজ্যম্
তৃতীয়া	কামেন	দেবেন	আজ্যেন
চতুর্থী	কামায়	দেবায়	আজ্যায়

১। গ্না (নারী), দ্যৌ (আকাশ), নৃ (নর), ক্ষম্ (পৃথিবী), জ্মন্ (বিস্তার) মদ্ (আনন্দ), বন্ (ভজন) ভাস্ (আলোক), স্তৃ (তারকা), ক্রু (অরণ্য), স্নু (পর্ব্বত-শিখর), যুন্ (যুবা) ইত্যাদি শব্দে এই নিয়ম।

২। সা° প° পত্রিকা, ১৩২১, ১ম সংখ্যা—১৪ পৃ°।

	পুংলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	নপুংসকলিঙ্গ
পঞ্চমী	কামাৎ	দেবাৎ	আস্তাৎ
ষষ্ঠী	কামস্য	দেবস্য	আস্তস্য
সপ্তমী	কামে	দেবে	আস্তে
সম্বোধন	কাম	দেব	আস্ত

দ্বিবচন :—

কর্তৃ-কর্ম-সম্বোধন	কামৌ	দেবৌ	আস্তে
করণ-সম্প্রদান-অপাদান	কামাভ্যাম্	দেবাভ্যাম্	আস্তাভ্যাম্
ষষ্ঠী-সপ্তমী	কাময়োঃ	দেবয়োঃ	আস্তয়োঃ

বহুবচন :—

প্রথমা	কামাঃ	দেবাঃ	আস্তানি
দ্বিতীয়া	কামান্	দেবান্	আস্তানি
তৃতীয়া	কামৈঃ	দেবৈঃ	আস্তৈঃ
চতুর্থী-পঞ্চমী	কামেভ্যঃ	দেবেভ্যঃ	আস্তেভ্যঃ
ষষ্ঠী	কামানাম্	দেবানাম্	আস্তানাম্
সপ্তমী	কামেষু	দেবেষু	আস্তেষু

অকারান্ত প্রাতিপদিকের কয়েকটী প্রাচীন (বৈদিক) সুবন্ত রূপ ;—

একবচন :—তৃতীয়া রথেনা, যজ্ঞা। ষষ্ঠী—অশ্বসিআ।

দ্বিবচন :—কর্তৃ-কর্ম—দেবা। ষষ্ঠী-সপ্তমী—পস্ত্যোঃ (পস্ত্যা হইতে)।

বহুবচন :—প্রথমা ও সম্বোধন (পুং)—দেবাসঃ ; (নপুং) যুগা। তৃতীয়া—দেবেভিঃ। ষষ্ঠী—চরথাম্, দেবানম্।

স্ত্রীলিঙ্গে স্বরস্থিতির বৈশিষ্ট্য নাই,—অমিত্র—অমিত্রী ; মানুষ—মানুষী ; নবদশ—নবদশী। ত্রিংশত্তম—মী। কেবলা—কেবলী ; উগ্রা—উগ্রী ; পাপা—পাপী।

খ। ইকারান্ত ও উকারান্ত প্রাতিপদিক :—(স্বরস্থিতি বাবস্থিত)।

একবচন :—

অগ্নিঃ শত্রুঃ গতিঃ ধেনুঃ বারি মধু

অগ্নিম্	শত্রুম্	গতিম	ধেনুম্	বারি	মধু
অগ্নিনা	শত্রুণা	গত্যা	ধেন্বা	বারিণা	মধুনা
অগ্নয়ে	শত্রবে	গতয়ে, গত্যৈ	ধেনবে, ধেন্বৈ	বারিণে	মধুনে
অগ্নেঃ	শত্রোঃ	গতেঃ, গত্যাঃ	ধেনোঃ, ধেন্বাঃ	বারিণঃ	মধুনঃ
অগ্নৌ	শত্রৌ	গতৌ, গত্যাম্	ধেনৌ, ধেন্বাম্	বারিণি	মধুনি
অগ্নে	শত্রো	গতে	ধেনো	বারি, বারে	মধো মধু

দ্বিবচন :—

প্র-দ্বি-সং	অগ্নী	শত্রূ	গতী	ধেনূ	বারিণী	মধুনী
তৃ চ-প	অগ্নিভ্যাম্	শত্রুভ্যাম্	গতিভ্যাম্	ধেনুভ্যাম্	বারিভ্যাম্	মধুভ্যাম্
ষ—স	অগ্ন্যোঃ	শত্র্বোঃ	গত্যোঃ	ধেন্বোঃ	বারিণোঃ	মধুনোঃ

বহুবচন :—

অগ্নয়ঃ	শত্রবঃ	গতয়ঃ	ধেনবঃ	বারীণি	মধূনি
অগ্নীন্	শত্রূন্	গতীঃ	ধেনূঃ		
অগ্নিভিঃ	শত্রুভিঃ	গতিভিঃ	ধেনুভিঃ	বারিভিঃ	মধুভিঃ
অগ্নিভ্যঃ	শত্রুভ্যঃ	গতিভ্যঃ	ধেনুভ্যঃ	বারিভ্যঃ	মধুভ্যঃ
অগ্নীনাম্[1]	শত্রূণাম্	গতীনাম্	ধেনূনাম্[1]	বারীণাম্[1]	মধূনাম্
অগ্নিষু	শত্রুষু	গতিষু	ধেনুষু	বারিষু	মধুষু

কয়েকটী বিশিষ্ট রূপ :—**ইকারান্ত, একবচন** তৃ (পুং) রয্যা (রয়ি হইতে), ঊর্মিআ। তৃ (স্ত্রী)—অচিত্তী, ঊতিআ, সুবৃক্তি। চ (স্ত্রী)—ঊতী ; (নপুং) শুচয়ে। প-ষ (পুং) অরিঅঃ। প-ষ (স্ত্রী) ভূমিআঃ। প-ষ (নপুং) ভূরেঃ। স (পুং) অগ্না। (স্ত্রী) উদিতা, বেদী, ধনসাতরি, (নপুং) অপ্রতা। **দ্বিবচন :**—ষ-স (পুং)—হরিওঃ। (স্ত্রী) জামিওঃ। **বহুবচন :**—প্র (স্ত্রী) ভূমিঃ। (নপুং) শুচী, ভূরি, ভূরীণি। **উকারান্ত একবচন**—প্র (নপুং) উরু, উরূ। দ্বি (পুং) অভীরুঅম্, সুচেতুনম্। তৃ (পুং) পশ্বা,

১। ষষ্ঠীর বহুবচনে অন্ত্যাক্ষরে স্বরবান্ প্রাতিপদিকের স্বর প্রত্যয়ে চালিত হয়।

ক্রতুআ। (স্ত্রী) অধেম্বুআ, আশুয়া, পত্ব্যা। (নপুং) মধ্বা। চ (পুং) শিশ্বে। (স্ত্রী) ইষৈ। (নপুং) পশ্বে, উরবে। প-ষ (পুং) পিত্বঃ, চারুণঃ। (স্ত্রী) ইষাঃ। (নপুং) মধ্বঃ, মধুঅঃ, মধোঃ। স (পুং) সূনবি। (নপুং) সানবি, সানৌ, সান্বো, সানুনি। **দ্বিবচন**—প্র (নপুং) উর্বী। **বহুবচন**—প্র (পুং) মধুঅঃ, মধ্বঃ। (স্ত্রী) শতক্রত্বঃ। (নপুং) পুরু পুরূ, পুরূণি। দ্বি (পুং) পশ্বঃ। (স্ত্রী) মধ্বঃ। সখায়া (প্র-দ্বি, দ্বিবচন, পুং) জন্ম্যাঃ (জনি হইতে ষষ্ঠী, একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ)। অর্যঃ (প্র-দ্বি, বহুবচন, পুং স্ত্রী)। অর্যম্ (দ্বিতীয়া একবচন)। বেঃ (ঋ°, পক্ষী, প্র° ১ব ; অন্যথা বিঃ)। ষ (বহু) বীনাম্।

ঝ। (১) আ, ঈ ও উকারান্ত একাক্ষর প্রাতিপদিকের দুর্ব্বল কারকে প্রত্যয়-স্বর। কিন্তু দ্বিতীয়ার বহুবচনে নহে।

একবচনঃ—

জাঃ (সন্ততি)	ধীঃ (বুদ্ধি)	ভূঃ (পৃথিবী)
জাম্	ধিয়ম্	ভুবম্
জা	ধিয়া	ভুবা
জে	ধিয়ে, ধিয়ৈ	ভুবে, ভুবৈ
জঃ	ধিয়ঃ, ধিয়াঃ	ভুবঃ, ভুবাঃ
জি	ধিয়ি, ধিয়াম্	ভুবি, ভুবাম্
জাঃ	ধীঃ	ভূঃ

দ্বিবচনঃ—

জৌ	ধিয়ৌ	ভুবৌ
জাভ্যাম্	ধীভ্যাম্	ভূভ্যাম্
জোঃ	ধিয়োঃ	ভুবোঃ

বহুবচনঃ—

জাঃ	ধিয়ঃ	ভুবঃ
জাঃ, (জঃ)	ধিয়ঃ	ভুবঃ

জাভিঃ	ধীভিঃ	ভূভিঃ
জাভ্যঃ	ধীভ্যঃ	ভূভ্যঃ
জানাম্, (জাম্)	ধিয়াম্, ধীনাম্	ভুবাম্, ভূনাম্
জাসু[1]	ধীষু	ভূষু

(২) অন্য কোনও শব্দের শেষে সমাসে যুক্ত হইলে এই সকল শব্দের স্বরস্থিতি ব্যবস্থিত হয়, অর্থাৎ কোনও বিভক্তিতেই প্রত্যয়ে স্বর অপসৃত হয় না।

স্থিতধীঃ ; -ধিয়ম্, -ধ্যম্ (স্ত্রী) ; -ধিয়া, -ধ্যা ; -ধিয়ে -ধ্যে ; -ধিয়ঃ -ধ্যঃ ; -ধিয়ি, -ধ্যি ; -ধিয়ৌ, -ধ্যৌ ; -ধীভ্যাম্ ; -ধিয়োঃ -ধ্যোঃ ; -ধিয়ঃ, -ধ্যঃ ; -ধীভিঃ ; -ধীভ্যঃ ; -ধিয়াম্, -ধীনাম্, -ধ্যাম্ ; -ধীষু।

কয়েকটী অনেকাক্ষর সমস্ত পদ—অব্জা-ভিয়া (ঋ°), আধিয়া (অথ°), শুভপান্, বয়োধৈঃ, যজ্ঞধেভিঃ ধনসৈঃ (সব ঋগ্বেদে) ; বেষশ্রিঃ (তৈ° স°) অহ্রয়ঃ (ঋ°), পদ-শ্রিভিঃ (ঋ°), কর্মণি (শত°ব্রা°), ঋতনি-ভ্যঃ (ঋ°), সেনানিভ্যঃ (বাজ°) গ্রামণিভিঃ (তৈ° ব্রা°) সুপূনা (অথ°) শিতিভ্রবে (তৈ° স°)। প্রজা, স্বধা, শ্রদ্ধা, প্রতিমা। আকারান্ত পুংলিঙ্গ—পন্থা, মহা, ঋভুক্ষা, উশনা (উশনা ১মা ১ব° উশনে ৭।১) মহা আতা (কাঠামো), [আতাসু পাওয়া গিয়াছে।]

স্ত্রীলিঙ্গে অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি[2] কল্যাণ—কল্যাণী ; পুরুষ—পুরুষী ; যমী, নদী, লক্ষ্মী, সূর্যা, চরণ্যূ, চরিষ্ণু, জিষ্যানু, মধু, অগ্রূ (অগ্রূ), পৃদাকূ (পৃদাকু), শ্বশ্রূ (শ্বশুর), নৃতূ, তনূ, বধূ, চমূ, প্রাশূ, কৃকদাশূ, মক্ষূ।

ঈকারান্ত পুংলিঙ্গ রথী, প্রাবী, তন্ত্রী, অহী, আপথী। রথী, রথিআ, রথিঅঃ। রথিঅম্। রথিআ (রথীভ্যাম্), (রথীভিঃ), (রথীভ্যঃ)। রথিএ। রথিঅঃ (রথিওঃ) রথীনাম্। রথীষু রথী।

পন্থা প্রভৃতি ব্যঞ্জনান্ত বলিয়া পরিগণিত। প্রবলরূপ **পন্থন্**, মধ্যম—**পথি**—দুর্বল—**পথ**—। পন্থাঃ পন্থানম্ পন্থানৌ পন্থানঃ। পথিভ্যাম্ পথিভিঃ পথিভ্যঃ পথিষু। পথা

১। জা শব্দের সপ্তমীর একবচন ও ষষ্ঠী-সপ্তমীর দ্বিবচন ভিন্ন অন্য প্রয়োগ পাওয়া যায় নাই। ইহা ছাড়া আকারান্ত একাক্ষর শব্দ বেদে পাওয়া যায় নাই।

২। ব্যতিরেক—তবিষী, পরুষ্ণী, পলিক্নী, রোহিণী।

পথে পথঃ পথি, পথঃ (পথঃ) (২য়া বহু°) পথাম্ ॥ ঋগ্বেদে পন্থাম্ (২য়া ১ব°) পন্থাঃ (১মা বহু°)। পথি হইতে পথয়ঃ (১মা বহু°) পথীনাম্ (৬ষ্ঠী বহু°); পাথঃ (২য়া বহু°—একবার মাত্র ঋগ্বেদে)॥ এইরূপ মথীনাম্, মন্থাম্ (২।১); ঋভুক্ষণম্ (২।১) ঋভুক্ষণঃ (১। বহু°)।

দ্বিতীয়া প্রভৃতিতে নদী প্রভৃতি শব্দের বিবিধ রূপ ও স্বরস্থিতি—নদিঅম্, নদিআ, নদিএ, নদিঅঃ; তনুঅম্ তনুআ, তনুএ, তনুঅঃ, তনুই; কিন্তু নদ্যম্, তন্বম্ ইত্যাদি। চমূ প্রভৃতির অন্ত্য ঊ প্রগৃহ্য বলিয়া গণ্য।

ঞ। বিশেষণে সাধারণতঃ অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি পাপ, পাপী, পাপা।

ট। ঋকারান্ত শব্দে ই-কারান্ত ও উকারান্ত শব্দের ন্যায় স্বরস্থিতি। অন্ত্য স্বরে সুর থাকিলে তাহা কেবলমাত্র ষষ্ঠীর বহুবচনে প্রত্যয়ে অপসৃত হয় (বা হইতে পারে)। স্বর প্রত্যয়ে অপসৃত হইলে কখনও কখনও (বৈদিক ভাষায় বহু স্থলেই) ঋ স্থানে র্ হয়। নৃ ও স্তৃ শব্দে একাক্ষর-ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দেখা যায়— নৃভিঃ, নৃষু, নরি, নরে; স্তৃভিঃ। ষষ্ঠীর বহুবচনে নরাম্, নৃণাম্, স্বস্রাম্ (ঋ°), স্বসৃণাম্, ধাতৃণাম্। কতিপয় ঋকারান্ত শব্দঃ—দেবৃ (পুং), স্বসৃ (স্ত্রী), ননান্দৃ (স্ত্রী), নৃ (পুং), স্তৃ (পুং) (১মা বহু° তারঃ), উস্‌্রৃ (স্ত্রী) (৬।১ উস্রঃ), মাতৃ, দুহিতৃ, ধাতৃ, কর্তৃ (৭মী কর্তরি ও কর্ত্রী), ক্রোষ্টৃ (শৃগাল)। কর্তৃ-কর্ম্ম-দ্বিবচনে দাতারা স্বসারা, পিতরা; ২য়া-বহু-বচনে পিতরঃ, মাতরঃ; ২য়া-বহুবচনে মাতৄন্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বৈদিক প্রয়োগ। নপুংসক-লিঙ্গ ঋকারান্ত শব্দের বহুল প্রয়োগ ব্রাহ্মণের যুগে। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাবে নপুংসক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ধাতৃ, ভ্রাতৃ, (পুং ভ্রাতৃ), জনয়িতৃ (অন্তরিক্ষম্ পদের বিশেষণরূপে এই দুইটী পদ তৈ° ব্রাহ্মণে প্রযুক্ত হইয়াছে; সেইরূপ নক্ষত্রাণি পদের বিশেষণ ভ্রাতৃণি ও জনয়িতৃণি)।

ঠ। ব্যঞ্জনান্ত শব্দেই ত্রিবিধ (প্রবল, মধ্যম ও দুর্ব্বল) রূপের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট।

(অ) ধাতু প্রাতিপদিক—বাচ্, স্রজ্, মুধ্, ত্রিশ্, উষ্, গির্ আ-শির্, স্তির্ জুর্ তুর্ ধুর্ পুর্ মুর্ স্তর্ স্ফুর্ স্পৃর্; চিকিৎ, যবীযুধ্, বনীবন্ সত্বন্, অধ্বগৎ, দ্যুগৎ নবগৎ সংহৎ জগৎ ত্বচ্, পথ্, হৃদ্ অপ্, বার্ দ্বার্ আস্ ককুভ্, ককুদ্। আবৎ উদ্বৎ সংবৎ। উপরতাৎ দেবতাৎ সত্যতাৎ সর্বতাৎ। স্রবৎ দ্রবৎ বহৎ সশ্চৎ বাঘৎ। যকৃৎ শকৃৎ। ত্রিংশৎ। দৃষদ্ ভসদ্ বনদ্ শরদ্।

তৃষ্ণজ্, ঋত্বিজ্, সনজ্, ভিষজ্, উশিজ্, বণিজ্, অসৃজ্। ভাস্ ভাস্ মাস্ ভীব্। বিষ্টপ্, বিপাশ্। এই সকল শব্দে পুংলিঙ্গ অপেক্ষা স্ত্রীলিঙ্গের সংখ্যা বেশী এবং নপুংসকলিঙ্গ সাধারণতঃ বিরল। কতিপয় নপুংসক শব্দ :—হৃদ্ দম্ বার্ স্বর্ মাস্ (মাংস) আস্ (মুখ) ভাস্ দোস্ শম্ যোস শকৃৎ যকৃৎ অসৃজ্।

প্রবল রূপ :—বাক্ পাৎ বাচম্ পাদম্ বাচঃ পাদঃ বাচৌ পাদৌ।

মধ্যম ও দুর্ব্বল রূপ :—বাচা বাচে বাচঃ বাচি বাচাম্ বাক্ষু। পদা পদে পদঃ পদোঃ পদি পৎসু ইত্যাদি।

কতিপয় বিচিত্র রূপ :—দন্ (১।১, দন্ত্ শব্দ, √দন্শ্ ধাতু হইতে), নাসা (১।২ নাসিকা পৃৎসু (৭।১), পৃৎসুষু (প্রত্যয়ের দুইবার প্রয়োগ ঋ° একবার)। প্রাঞ্চ্, প্রত্যঞ্চ্, বিষ্বঞ্চ্ প্রভৃতি কতিপয় শব্দে স্বরস্থিতি অনিয়মিত।

(আ) -অস্,-ইস্,-উস্ ভাগান্ত-হ্রস্বান্ত শব্দ। অধিকাংশই নপুংসকলিঙ্গ। স্বরস্থিতি ধাত্বক্ষরে। মনস্ চক্ষুস্। -হবিস্ -উষস্ তোশস্ প্রভৃতিতে ভাব-পরিবর্ত্তনের সহিত স্বরস্থিতির পরিবর্ত্তন। অপস্—অপস্, তবস্—তবস্, যশস্—যশস্, তরস্—তরস্, প্রভৃতিতে বিশেষণ-অর্থে স্বরস্থিতির ব্যতিক্রমের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে[১]।

(ই) -অন্, -মন্, -বন্ ভাগান্ত শব্দ। প্রায় সকল শব্দই পুংলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নাই। এই সকল শব্দের ত্রিবিধ রূপ। প্রবল রূপে পুংলিঙ্গে অন্ত্য স্বরের বৃদ্ধি আ-কার হয়, দুর্ব্বল রূপে এ স্বর বিলুপ্ত হয় এবং মধ্যম রূপে কেবল অন্ত্য নকারের লোপ হয়। দুর্ব্বল রূপে প্রাতিপদিকের শেষস্থিত স্বরবান্ অ-কারের লোপ হইলে স্বর প্রত্যয়ে সরিয়া যায়। ইহা ছাড়া অন্যত্র স্বরস্থিতির কোনও গোলযোগ নাই। সর্ব্বত্র সুনিয়মিত অর্থাৎ এক স্থানেই স্বরস্থিতি। রাজা রাজানঃ রাজানম্ রাজ্ঞা রাজ্ঞঃ রাজসু। আত্মানম্ আত্মনি আত্মভিঃ আত্মসু। 'মূর্ধন্' শব্দের দুর্ব্বল রূপে স্বরস্থিতি—মূর্ধ্না, মূর্ধ্নে, মূর্ধ্নোঃ, মূর্ধ্নঃ, মূর্ধ্নি (বিকল্পে মূর্ধনি—এখানে অ-লোপ হয় নাই)। বেদে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের রূপে '-ঔ'কারের পরিবর্ত্তে অধিক স্থানেই আ-কার ছিল। যূনা; যুবানা (পুং)। ব্রহ্মা (বিকল্পে ব্রহ্মাণি) নপুংসক প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ।

১। সা° প° পত্রিকা, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা—১৪ পৃ°।

-অন্ ভাগান্ত ভিন্ন অন্ত প্রকৃতির বহু শব্দও অন্ ভাগান্ত শব্দের ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হয়। অহর্ অহন্; উধর্—উধস্—উধন্; অস্থি—অস্থন্; অক্ষি—অক্ষন্; দধি—দধন্; যকৃৎ—যকন্, শকৃৎ—শকন্; ইত্যাদি।

(ঙ) ইন্, মিন্ ও বিন্ ভাগান্ত তদ্ধিত শব্দ। এই সকল শব্দও অ-স্ত্রীলিঙ্গ। এই সকল শব্দে ইন্ মিন্ ও বিন্ প্রত্যয়ের ই-কারে স্বরস্থিতি।

(চ) (১) অৎ ও অন্ত্ ভাগান্ত কৃদন্ত শব্দ। এই সকল শব্দে ধাতুর গণ অনুসারে স্বরস্থিতি। অনিয়মের উদাহরণ বেশী নাই। তিঙন্ত প্রকরণে এ বিষয় বলা হইয়াছে[১]। শেষ স্বরে স্বরবান্ কতিপয় শব্দের স্বর দুর্ব্বল রূপে প্রত্যয়-স্থ হইয়া যায়। অদন্ অদতে, অদতঃ, অদতি।

(২) মন্ত্ ও বন্ত্ ভাগান্ত তদ্ধিত শব্দ। ইহারা বিশেষণ। পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচনে অকারের বৃদ্ধি (-মান্ -বান্) ভিন্ন পূর্ব্বশ্রেণীর সহিত ইহাদের কোনও বিশেষ নাই। ইহাদের স্বর কোনও অবস্থাতেই পরে সরিয়া যায় না। পশুমান্, পশুমতা, পশুমতী, পশুমতঃ পশুমৎসু, ইত্যাদি।

(ছ) -বাংস্ ভাগান্ত কৃদন্ত শব্দ। ইহাদের কৃৎ-প্রত্যয়ে (বাংস্, বৎ, বস্, উষ্) সুব্যবস্থিত স্বরস্থিতি। বিদ্বান্, রিরিহুষে, তস্থুষি, বিদ্বদ্ভিঃ।

(জ) ঈয়স্ (য়াংস্ ও য়স্) প্রত্যয়ান্ত আতিশয্য-বাচক (comparative) বিশেষণ শব্দ। পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুতে সু-ব্যবস্থিত স্বরস্থিতি। শ্রেয়ান্, শ্রেয়সা, গরীয়ান্, গরীয়সি, ভূয়াংসি।

ঙ। সর্ব্বনাম শব্দ।

(অ) উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনাম। লিঙ্গ অনুসারে ইহাদের রূপের বিভিন্নতা নাই। স্বরস্থিতি সুব্যবস্থিতভাবে শব্দের মূল উপাদানে বর্ত্তমান।

একবচন :—		দ্বিবচন :—	
অহম্	ত্বম্	আবাম্	যুবাম্
মাম্, মা	ত্বাম্, ত্বা	আবাভ্যাম্	যুবাভ্যাম্
ময়া	ত্বয়া	আবয়োঃ	যুবয়োঃ
মহ্যম্, মে	তুভ্যম্, তে	নৌ	বাম্
মৎ	ত্বৎ		
মম, মে	তব, তে		
ময়ি	ত্বয়ি		

১। সা° প° পত্রিকা, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা—২০-২৯ পৃ°।

বহুবচন :—

বয়ম্ অস্মান্ অস্মাভিঃ অস্মভ্যম্ অস্মৎ অস্মাকম্ অস্মাসু নঃ
যূয়ম্ যুষ্মান্ যুষ্মাভি যুষ্মভ্যম্ যুষ্মৎ যুষ্মাকম্ যুষ্মাসু বঃ

একবচনে মা, মে, ত্বা, তে, দ্বিবচনে নৌ, বাম্, বহুবচনে নঃ, বঃ, এই কয়টী পদে স্বর নাই। বাক্যাদিতে ইহাদের প্রয়োগ নাই। এগুলি অপ্রধান পদ। তে জয়তঃ (জয়শীল তোমার), বো বৃতাভ্যঃ (আবদ্ধ তোমাদিগের জন্ম) এবং নস্ ত্রিভ্যঃ (আমাদের তিন জনকে) প্রভৃতি স্থলে ঋগ্বেদে বিশেষণের ন্যায় ইহাদের প্রয়োগ দেখা যায়। অথর্ববেদে 'মৎ' পদেও স্বরের অভাব দুই এক স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

কয়েকটী প্রাচীন রূপ :—ত্বা (ঋ° তৃতীয়া একবচন); মে (ব্রা° সং চতুর্থী একবচন) ও মে; চতুর্থী বা ৭মীর বহুবচনে অস্মে ও যুষ্মে; ইহাদের শেষ স্বর প্রগৃহ্য। যুষ্মান্ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গে যুষ্মাঃ পদ দুইবার বাজসনেয়ি সংহিতায় আছে। '-ভ্যম্' (৪র্থী বহুবচন) স্থানে কয়েক স্থলে '-ভ্য' প্রত্যয় আছে ষষ্ঠীতে অস্মাক ও যুষ্মাক আছে। ত্বম্ স্থানে তুভম্ আছে। দ্বিবচনে প্রথমার আবম্ ও যুবম্ পদের প্রয়োগই প্রাচীন ভাষায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ার হইত আবাম্ ও যুবাম্। তৃতীয়ার যুবভ্যাম্ ও যুবাভ্যাম্ (ঋ°), পঞ্চমীতে যুবৎ (ঋ°) ও আবৎ (তৈ° স°), ষষ্ঠী-সপ্তমীতে যুবোঃ (ঋ°) আছে।

এই পদগুলির গঠনে নানা (অন্ততঃ ৫টী শব্দ ও অবশিষ্ট প্রত্যয়) উপাদানের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। একবচনের মকারাদি পদগুলির পূর্বে 'অস্-' জুড়িয়াই বহুবচন হইয়াছে : অস্-মৎ, অস্-মভ্যম্। দ্বিবচনের পদগুলির সহিত একবচন বা বহুবচনের কোনও মিল নাই। প্রথমার সহিত অন্ত বিভক্তি বিচ্ছিন্ন। ভাষার বিকাশ বিষয়ে চিন্তা করিবার বহু উপাদান এখানে আছে। অস্মাক ও যুষ্মাক শব্দের নপুংসক একবচন যেন অস্মাকম্ ও যুষ্মাকম্।

(আ) প্রথম পুরুষের সর্ব্বনামেও স্বরস্থিতি ব্যবস্থিত। এখানে তিন লিঙ্গের ভেদ আছে।

একবচন	পুং°	সঃ	তম্
			তেন তস্মৈ তস্মাৎ তস্য তস্মিন্
	নপুং°	তৎ	তৎ
	স্ত্রী°	সা	তাম্ তয়া তস্যৈ তস্যাঃ তস্যাঃ তস্যাম্

দ্বিবচন { পুং° তৌ; নপুং° তে তাভ্যাম্ তয়োঃ; স্ত্রী° তে }　বহুবচন { তে তান্ তৈঃ তেভ্যঃ তেষাম্ তেষু; তানি তানি; তাঃ তাঃ তাভিঃ তাভ্যঃ তাসাম্ তাসু }

কয়েকটী প্রাচীন রূপ :—তেনা (তৃ° ১ ব°), তা (পুং—১মা ও ২য়া দ্বিবচন), তা (নপুং ১মা বহু°) তেভিঃ (তৃ° বহুবচন), সস্মিন্ (=তস্মিন্ ; ঋগ্বেদে বহু স্থলে প্রয়োগ আছে), ছান্দোগ্য উপনিষদে সস্মাৎ একবার আছে।

ত্যদ্ শব্দের ভূরি প্রয়োগ বেদে। ক্রমশঃ ইহার প্রয়োগ কমিয়াছে। অথর্ববেদে ইহার প্রয়োগ অতি অল্প এবং লৌকিক সংস্কৃতে ইহার প্রয়োগ নাই। স্যঃ (পুং), স্যা (স্ত্রী°) ত্যৎ (নপুং); ত্যম্, ত্যাম্, ত্যৎ ; ত্যা (=ত্যয়া, তৃ°) ; ১মা ১ বচনে ত্যা (স্ত্রীং) পাওয়া যায়।

এষঃ, এষা, এতৎ। 'এন' শব্দের স্বর নাই, প্রসঙ্গারম্ভে বা প্রধানভাবে ইহার প্রয়োগ নাই। কর্ম্মকারক (১ব° দ্বিব° বহুব°), করণ (১ব°) ও ষষ্ঠী-সপ্তমীর দ্বিবচন ভিন্ন ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এটী অসম্পূর্ণ বা 'পঙ্গু' শব্দ। এনম্ এনৎ এনাম্ এনেন এনয়া ; এনৌ এনে এনয়োঃ ; এনান্ এনানি এনাঃ। ঋগ্বেদে এনোঃ (=এনয়োঃ) এবং কচিৎ এনাম্ ও এনাঃ (স্বরবান্) আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রথমায় এনৎ আছে। 'এন' শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয় না। ইহা অপ্রধান প্রথম পুরুষের সর্ব্বনাম।

(ই) অদস্ শব্দ ও ইদম্ শব্দের সর্ব্বত্র দ্বিতীয় স্বরে সুর।

একবচন :—

অদস্ { পুং অসৌ অমুম্ / অমুনা অমুষ্মৈ অমুষ্মাৎ অমুষ্য অমুষ্মিন্; নপুং অদঃ অদঃ; স্ত্রী° অসৌ অমুম্ অমুয়া অমুষ্যৈ অমুষ্যাঃ অমুষ্যাঃ অমুষ্যাম্ }

ইদম্ { পুং অয়ম্ ইমম্ / অনেন অস্মৈ অস্মাৎ অস্য অস্মিন্; নপুং ইদম্ ইদম্; স্ত্রী° ইয়ম্ ইমাম্ অনয়া অস্যৈ অস্যাঃ অস্যাঃ অস্যাম্ }

দ্বিবচন :—অমূ অমূভ্যাম্ অমুয়োঃ। ইমৌ ইমে ইমে আভ্যাম্ অনয়োঃ।

বহুবচন :—অমী অমূনি অমূঃ অমূন্ অমীভিঃ অমূভিঃ অমীভ্যঃ অমূভ্যঃ অমীষাম্ অমূষাম অমীষু অমূষু

ইমে ইমানি ইমাঃ ইমান্ এভিঃ আভিঃ এভ্যঃ আভ্যঃ এষাম্ আসাম্ এষু আসু

এখানেও নানা উপাদানের (বহু পঙ্গু শব্দের) একত্র সমাবেশ। অয়ম্, অস্য প্রভৃতিতে 'অ-' শব্দ। ইহার সহিত একবচনে -স্ম (স্ত্রী° -স্য) শব্দের যোগ দেখা যায়। ইহারা বিকল্পে স্বরবান্ অর্থাৎ ইহাদের স্বর না থাকিলে ক্ষতি নাই। অবশিষ্ট রূপগুলিতে স্বর অপরিহার্য্য। অনেন অনয়া অনয়োঃ প্রভৃতিতে 'অন-' শব্দ ('এন' শব্দের ন্যায়)। ইমৌ, ইমে ইমানি প্রভৃতিতে 'ইম-' শব্দ। অয়ম্ ইয়ম্ ইদম্ প্রভৃতিতে 'ই' শব্দ। তদ্ শব্দের ন্যায় ইদ্ শব্দ (নপুং) আছে। সুতরাং ইদম্ (ইদ্+অম্) পদে দুইটী প্রত্যয়ের একত্র প্রয়োগ। 'অ' শব্দ হইতে এনা, অস্মা, অয়োঃ পদ আছে। 'ইম' শব্দ হইতে ইমস্য, ইমস্মৈ, ইমৈঃ, ইমেষু আছে। ঋগ্বেদে কয়েক স্থানে অস্মৈ, অস্য, আভিঃ (স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম) আছে। 'অ' শব্দ হইতে অতঃ, অত্র, অথ, অদ্ধা পদ হইয়াছে। 'ই' শব্দ হইতে ইতঃ, ইদ্, ইদা, ইহ, ইতর, ঈম্ হইয়াছে। ঈদৃশ, এব, এবম্ প্রভৃতিও সম্ভবতঃ 'ই' হইতে। 'অমী' প্রগৃহ্য। অদস্, অদোময় প্রভৃতিতে অদ্ শব্দ আছে বটে, কিন্তু অমুম্ অমুষ্মিন্ প্রভৃতিতে 'অমু' শব্দ। অন্যত্র 'অমুত্র' অমুক, অমুতঃ, অমুথ, অমুর্হি, অমুবৎ, অমুদা প্রভৃতিতে 'অমু' শব্দ আছে। 'ত্যদ' শব্দের ন্যায় স্বরবিহীন 'ত্ব' শব্দ বেদে ছিল। অমঃ (১মা ১ব°) অবোঃ (৬।৭ দ্বিব°) ইমা (=ইমৌ এবং ইমানি), অমূ (=অমূনি), অমুয়া (ক্রিয়াবিশেষণ), অসৌ (স্বরবিহীন, সম্বোধন), অমী (স্বরবিহীন, সম্বোধন)—এইগুলি প্রাচীন রূপ।

(ঔ) জিজ্ঞাসাবাচক কিম্ শব্দের প্রথম অক্ষরে নিয়মিত স্বর। নকিঃ, মাকিঃ বৈদিক অব্যয়।

(ক) যদ্ শব্দেও প্রথমাক্ষরে নিয়মিত স্বর।

(খ) ত্বম (স্বরহীন), সম (স্বরহীন), সিম (সর্ব্ব), আত্মনা, তনূ, ভবৎ ও ভবতী সর্ব্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) সর্ব্ব, বিশ্ব, এক, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, পর, নেম, উভয়, স্ব প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ সর্ব্বনামের ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হয়।

(চ) সংখ্যাবাচক শব্দে স্বরস্থিতি অব্যবস্থিত। কারকবিভক্তি বা তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে সংখ্যা-স্বর পরে যাইতে পারে।

এক দ্ব ত্রি চতুর্ পঞ্চ ষষ্ সপ্ত অষ্ট নব দশ বিংশতি ষষ্টি অশীতি শত একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ সপ্তদশ অষ্টাত্রিংশৎ নবাশীতি একাশতম্ চতুঃসহস্রম্ ত্রয়ঃ ত্রীণি তিস্রঃ ত্রিভিঃ ত্রিভ্যঃ তিসৃভিঃ চত্বারঃ চতস্রঃ চতসৃভিঃ চতুর্ষু চতসৃষু পঞ্চ—পঞ্চভিঃ, নব—নবভ্যঃ, একাদশ—একাদশভ্যঃ পঞ্চদশানাম্ ষট্সু পঞ্চসু দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, একাদশ, একষষ্ট, শততম সহস্রতম।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র*

ব্রিটিশ-মিউজিয়মের পুস্তকাগারে যে বাঙ্গালা পুথি ও কাগজ-পত্র আছে, ১৯০৫ সালে শ্রীযুক্ত জে, এফ, ব্লুমহার্ট মহাশয় তাহার এক বিবরণী † প্রকাশিত করেন। এই বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, এই সংগ্রহে প্রাচীন বা উল্লেখযোগ্য পুথি তেমন কিছুই নাই। সংখ্যাতেও এই সংগ্রহ নগণ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বৃন্দাবন দাসের ভক্তিচিন্তামণি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য, কাশীরামের মহাভারত, অন্নদামঙ্গল—এই প্রধান বইগুলি এই সংগ্রহে আছে; কিন্তু কোনও পুথি অষ্টাদশ শতকের পূর্ব্বের নহে। অধিকাংশ পুথি ও অন্য বাঙ্গালা কাগজ-পত্র বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-রচয়িতা হাল্‌হেডের সংগৃহীত। বাঙ্গালা সাহিত্যের পুথি ভিন্ন অন্য কতকগুলি বাঙ্গালা নথী-পত্র চিঠি প্রভৃতিও আছে। বিবরণীতে ব্লুমহার্ট সাহেব তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী মনে করিয়া এই সকল নথী-পত্র হইতে কতকগুলি নকল করিয়া আনিয়াছি। এই পত্রাদির সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার মত জ্ঞান ও অবসর আমার নাই, কিন্তু যাঁহারা অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালার ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে ইহার মূল্য থাকিতে পারে। (মূল কাগজে যেখানে পংক্তি শেষ হইয়াছে, সেই স্থল নির্দ্দেশের জন্য এই প্রবন্ধে মুদ্রিত পত্রাদিতে [/] চিহ্ন দেওয়া হইল।)

[১]

Sloane 3201. G. একখানি পত্র।

/৭শ্রীশ্রীহরিঃ

মহামহিম শ্রীযুত কাপতান / মেস্ত্রী ইস্টবিনসেন সাহেব জীউ / মহোগ্রপ্রতাপেষু—

বন্দে খেদমতগার পরওয়রদে নমক শ্রীকৃষ্ণকান্ত / সর্ব্বণঃ কোরনিষ বন্দগি নিবেদনঞ্চ আগে সাহে/বের উমর দৌলত জেআদা হামেসা ৺স্থানে/চাহি তাঁহাতে এখানকার কুসল বিসেষ শ্রীযুত/সিবি ফতাজাঁ কলিকাতা জাইতেছেন জে বিসঞে/ সাহেবজী কহেন যুনেন গৌর করিবেন আর/ শ্রীযুত সিবি সাহেব জেমন সাহেবেরদিগের/কর্ম্মে তাহা জানিতে-ছেন অতএব জে বিহিত তাহা/ করিবেন নিবেদন ইতী—৪ শ্রাবণ।

---

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† Catalogue of the Marathi, Gujarati, Bengali, Assamese, Oriya, Pushtu & Sindhi Manuscripts in the Library of the British Museum by J. F. Blumhardt, M. A.

পত্রের শিরোদেশে পৃষ্ঠলিখন—

এ পত্রে শ্রীযুত রসিকলাল/জী সেলাম লিখিতে কহিলেন / সেলাম জাহির হবেক—

চিঠিখানি ঈস্‌ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনও কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক লিখিত। 'শ্রীযুত কাপতান মেস্তী ইস্টবিলসেন সাহেব' (=কাপ্তেন মিস্‌টার স্টিভেন্‌সন?—ব্লুমহার্ট সাহেব এই নামটী কিন্তু Captain Wilson ধরিয়াছেন) কবে কোথায় ছিলেন, আর 'গিরি কত্তাজী' বা কে ছিলেন ও সাহেবদের কোন্ কর্ম্মে বা সহায়ক ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালায় কোম্পানীর দেশী ও ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের স্থিতি ও গতিবিধি আলোচনা করিলে, পত্রোল্লিখিত ব্যক্তিত্রয়ের পরিচয় মিলিতে পারে। দ্বিতীয় পত্রে এক স্টিভেন্‌সন্ সাহেবের কথা রহিয়াছে। এই দুই চিঠিতে উল্লিখিত ব্যক্তি একজন হইতে পারেন।

পত্রের মধ্যে এই ফারসী শব্দ কয়টী উল্লেখযোগ্য। বন্দে=বান্দা=বন্দহ্=দাস; খেদমতগার=আজ্ঞাকারী, সেবক; এখনকার বাঙ্গালায় 'খানসামা'; পরওরদে নমক=লবণ (অর্থাৎ অন্ন)-পুষ্ট; কোরনিষ=কুরনিশ্; গৌর করা=প্রণিধান করা।

[২]

Sloane 4090. Fol. 19. একখানি পত্র। ১১৩৩ সাল=১৭২৭ খ্রীঃ

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ—

স্মরন°—

নকলপত্র মোকাম ভাগলপুরের—

শ্রীগুরুবক্স রোডার লিখন—

স্বস্তী সকলমঙ্গলালয় /

শ্রীযুত মে° হেমটেম সাহেব শ্রীযুত মে বরাডিন সাহেব / শ্রীযুত মে° কেটরেট সাহেব শ্রীযুত কা°রবলেষ:সাহেব / আজ্ঞাকারী সদাশোষ্য শ্রীগুরুবক্স রোডা ৺ সেলাম বহুত ২ / লিখন° নিবেদনঞ্চ। আগে সাহেবের দৌলত কী খেয়াদা হামেসা / ৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষ:—/ এখানকার কোতদারের সমাচার পুর্ব্বে নিবেদন পত্রে লিখি / রাছী পরে ২২ বাদ রবিবারে মুরসীদাবাদ হইতে

শ্রীযুত নবাব / সাহেবের তরফ এক সওয়ার ও দস্তক এখানে আসীয়াছে কহে—/ মাল ইঙ্গরেজের নহে ইঙ্গরেজ মুরসীদাবাদে মুচলকা / দিয়াছেন তোমরা আপন মাল লইয়া ইঙ্গরেজের সঙ্গে বেবকাওতে / মহষুল মারিয়া আসীয়াছ। আমারদিগের সহিত রদবদল / অনেক জাইতেছে। পুনশ্চ করার হইল আমরা ইঙ্গরেজ সাহেবের / লিখন এবং শ্রীযুত নবাব সাহেবের লিখন আনাইয়া দিব / ইহা নিবেদন লিখি মাল সাহেবলোকের আমী চাকর / ইঙ্গরেজের। কাসীমবাজারে সাহেবের লিখন জায় মেং / ইষ্টীবিনশেন সাহেবেকে জতোউচীত লিখন করিয়া পাঠাইতে / আজ্ঞা হইবেক সেখান হইতে শ্রীযুত নবাব সাহেবের এক লিখন / আইযে জে ভাগলপুরে ইঙ্গরেজের নমক উতরিয়াছে গমাস্তা / লোক খাতিরজমাতে খরিদ ফোরক্ত করহ আমরা সওয়ার / চোপদারের আমদানীতে ভয় করি নাই আমল তেমত দি নাই / মাল ইঙ্গরেজের আমরা চাকর খামীন্দের বলেই সক্তি করিতেছী / খামীন্দের নামদরম্যান থাকীতে কোন পরয়া নাই মাল ইঙ্গরেজের / নহে এই ধোকাতে খরিদার বন্ধ করিয়াছে ইহ ধমকে আমী / ডরাই না সাহেবেলোকের ছায়া আমার সিরপর থাকীতে / কোন চীন্তা নাই মুরসীদাবাদের লিখন আইলে মাল খালাষ / হইবেক ইহা নিবেদন। করিলাম ইতি—

তারিখ /২৫ মাঘ রোজ বুধবার সনে ১১৩৩ সাল—

পত্রের মধ্যে এই ফারসী শব্দগুলি প্রণিধানযোগ্য :— দস্তক = আজ্ঞাপত্র ; বেবকাওতে = বে-বক্কারতহ্ = নিশ্চিন্তভাবে, কিছু গ্রাহ্য না করিয়া ; খাতির জমাতে = নিঃশঙ্কচিত্তে ; খরিদ্ ফোরক্ত = খরীদ্-ও-ফরোখ্ৎ = ক্রয়-বিক্রয় ; খামীন্দ = খাবিন্দ্ = স্বামী, প্রভু। দরম্যান = মধ্যে : ব্লুম্হার্ট্ সাহেব বিবরণীতে পত্রোল্লিখিত ইংরেজ কর্ম্মচারী চারিজনের নাম দিয়াছেন—Mr. C. Hampton, Mr. Braddon, Mr. E. Carteret ও Captain O. Borlace.

অন্তর্বাণিজ্য ও শুল্ক আদায় লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাজালায় সুবাদার ও ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে যে গোলযোগ চলিতেছিল, ও নবাব-নাজিমের সরকার হইতে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নামে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইতেছিল, যাহার পরিণামে মীর-কাসিমের পতন, এই পত্র হইতে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

[৩]

Sloane 4090. Fol. 20. একখানি প্রাচীন চুক্তিপত্র।

১১০৩ সাল=১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীকৃষ্ণ

সাখি শ্রীধর্ম্ম

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল / মহাসহেবু

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও / নরসিংহ দাস আগে আমারা দুই লুকে / করার করিলাম জে কিছু বারে (=কারে ?) সুনা/রগায় ও গর খ (?) রিকরি সকরাত ২ দ্ব (=দু)/.ই রূপাইয়া করিআ আরত দলালি লইব / আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নি/অ মে করা[র] পত্র দিলাম স ১১০৩ তেং ১৪ আ/গ্রান—

পত্রের দক্ষিণ ভাগে উপরে আড়াআড়ি নাম-স্বাক্ষর—

শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস

খ্রীঃ ১৬৯৬ সালের এই চুক্তিপত্রখানি বিশেষভাবে বিচারযোগ্য। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া একরার-পত্র দেওয়া হইতেছে। 'শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল', ব্লুমহার্ট্ সাহেবের মতে Mr. Gay ও Mr. Garbell. করার-পত্রের স্থান হইতেছে সোনারগাঁ; স্থানীয় উচ্চারণে 'সুনারগা' (তদ্রূপ, 'লুক'=লোক, 'কুন'=কোন, 'খুরাক'=খোরাক)। এই পত্রের মধ্যে কয়টা অক্ষরের সমাধান করিতে পারিলাম না; 'সুনারগায়'=সোণারগাঁয়ে—প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'সু' অনেক স্থলে 'খ'র মত লেখা দেখা যায়; কিন্তু তাহার পরের কথা কয়টী কি ? 'গর' শব্দের পরের অক্ষরটী (='খ' ?) কাটা বলিয়া মনে হয়। তাহার পরে 'রিকরি', না 'বিকরি' ? 'সকরাত'=শ'করাতে, শতকরাতে ?='গড় বিক্রী শতকরা' ? পুরাতন লেখা যাঁহারা পড়িতে পারেন, তাঁহারা যে অক্ষর কয়টী আমি ঠিক করিতে পারিলাম না, তাহার যথার্থ পাঠোদ্ধার করিবেন, এই আশায় দলিলখানির এক প্রতিলিপি দিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ অনুসারে 'আড়ত' শব্দ সোনারগাঁয়ের এই মহাজনদের লেখায় 'আরত' রূপ ধরিয়াছে। 'দায়া'=দাওয়া, দাবী। 'এই নিঅমে করা[র] পত্র দিলাম'—এই অংশটুকুর পাঠ মান্যবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

পত্রখানির পিছনে অতি পুরাতন ছাঁদের ইংরেজী হাতে লেখা আছে—The Bramanies Caratkter / from Dacca the Metropolis of / Bengall in the East Indies. ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভের দিকে কোনও কৌতূহলী ইংরেজ প্রাচ্য লিপি-বিশেষের ('ব্রাহ্মণী' অর্থাৎ হিন্দু লিপির) নিদর্শন হিসাবে এটী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।
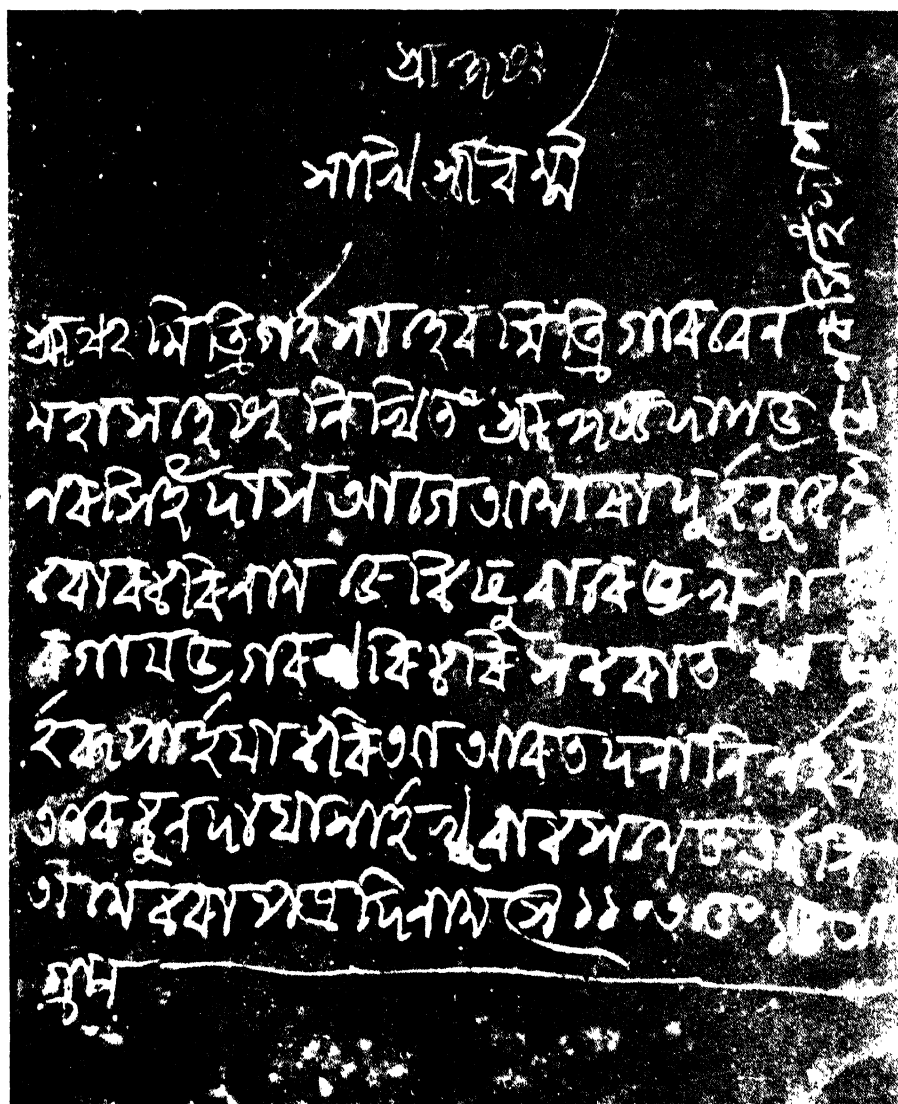
১১০৩ সালের একখানি বাঙ্গালা চুক্তিপত্র

(ব্রিটিশ-মিউজিয়মে রক্ষিত)

Kohinoor Printing Works, Calcutta.

এই পত্রখণ্ড, ফারসী, কাষথী, আরমানী, তেলুগু, চীনা ও সংস্কৃতে (দেবনাগরীতে) লেখা অন্য কতকগুলি কাগজের সঙ্গে একত্র একখানি বহিতে বাঁধান আছে।

ইহা প্রায় ২৩০ বৎসর পূর্ব্বেকার অঙ্গীকার-পত্র। বাঙ্গালায় এত পুরাতন চিঠি বা দলিল সহজে মিলে না।

[৪]

5660 . F. Various Papers in Bengali, Persian etc.

Instructions to the Aumeen & Gomasteh / at Hurrypaul (a true translation.—N. B. H.)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।—

শরণং—

মো° হরিপাল আমিন ও গোমাস্তা———

সে আড়ঙ্গের দালাল সকল কএক সন হইতে মোকরর/আছে ইহারা কুম্পানির কাজ অনেক খতরা করিয়াছে/তাতিরদিগের উপর একান্ত এক্তিয়ার পাইয়া তাহা/দিগের উপর জোর ও জবরদস্তিতে ও গোমাস্তা ও/কোটীর দোসরা আমলাহায়ের সঙ্গে এক এতফাক হইয়া/মবলগ বাকি পড়িয়াছে তাহার কিছুই আদায়/করিতে পারে না। এ কারন আমি যুন্দর তজবিজ করিয়া/তাহারদিগেরে কাজ হইতে তগির করিলাম আমার/মনস্ত দালাল রাখিয়া হরগিজ কাজ করিতাম না/কিন্তু দালাল ছাড়াইলে কুম্পানির দাদনির দফার /জামিন কেহ থাকে না একারন এই কএক জন কলানা ২/সেখানকার নিকটাবর্ত্তি ও মাতবরিও আছে ইহা/দিগের দালালিতে মোকরর করিলাম।———

নয়া দালালেরদিগের কর্ত্তব্য কাজ এই মধ্যে ২ তাঁত/নজর করিবেক ও কাপড়ের রকম বুনিবার সময়/তজবিজ করিয়া দেখিবেক খবরদারি করিবেক/জেন নমুনাসহি সরস রকম হয় ও জে কিছু দাদনি/তাঁতিদিগকে তুমি করিবা তাহার জামিন/ওই নয়া দালালরা হইবেক ওই জামিনির জন্যে /দালালি খরচ বদস্তুর সাবেক ধানকরা জেমত ২ /মোকরর আছে তাহা পাইবেক নয়া দালালদিগকে/আপন এক্তারিতে দাদনি কএক টাকা

হরগিজ/দিবা না কারন এই এমত ধারায় বেআন্দাজ বাকী/কদাচ হইতে পাইত না জদি মপশ্বল কুটীর আমলা/লোক করার কিস্তিবন্দিমাফিক কাপড় বুঝিয়া/লইত ও মপশ্বল তজবিজ করিয়া দাদনি করিত অতএব/এ হুকুম ও নাপচন্দ কাজের মহকুম হামেসগির জন্যে/লিখিতেছি।———

অদ্যাপি কারবারের আনওাল বদলির জন্যে /তোমার কাজ্য কথক তকাত পড়িবেক জে ধারার /কাজ করিতে হবেক ভাল বুঝিয়া তাহার আনওাল/নসিয়ত মত লিখি ইহাতে মালুম করিবা ও বেহতর/জানিবা যে তোমার কাজ মুবিতামত ও খোলাসারূপে/ জাহাতে চলিবেক তাহা লিখিতেছি।———

তোমাকে বেগর হেম্মত ও এরাদতে ও নেহাইয়ত/চালাকিতে একাজ করিবা ইহা বেগর তোমাকে মোকরর/করি নাই আমি একান্ত মোস্তজর থাকীলাম তুমি/কাজ ভাল করিবা বিশেষত তোমাকে জেয়াদা মেহনত/আপন হাতে দাদনির কারণ করিতে হবেক একারণ সাবেক বরাওর্দ্দ হইতে দুই মুহরির জেয়াদা মোকরর/করিলাম।———

সদর আড়ঙ্গ বারহাটায় তুমি আপন দস্তে/দালাল কিম্বা দালালের গোমাস্তার মোকাবিলাতে/তাতিকে দাদনি করিবা ও জখন তাতি কুটীতে কাপড়/দাখিল করিবেক তখন দালাল কিম্বা দালালের/তরফ গোমাস্তা হাজির থাকীবেক এবং থান/[২] চুক্তির সময় তাতিসাক্ষাতে থাকিয়া চুক্তি করিবেক/জখন থান খামসোজ ধোলাই হইবেক সাবেক/দস্তুরমত সেই সময় চুক্তি হইবেক।———

যে কাপড় ফেরত হবেক সে কাপড় তাবত কুটীতে কোরক/রাখিবা জাবত তাহার এওজ কাপড় সরকারি গোছ/মত দাখিল না করে জদি নমুনাসই কাপড় দাখিল/করিতে না পারে তাবত ঐ ফেরত কাপড় কুম্পানির / তরফ হইতে বিক্রি হইয়া তাতির নামে টাকা জমা হইবেক/ এ হুকুম হাজত আছে জদি সরবরাহ মুন্দরূমত হয়/তবে বাকী হরগিজ পড়িবেক না জদি তাতি খবরদার / না হয় ও কাপড় সরস না করে ও সরবরাহে খতরা/করে গোমাস্তার নসিয়ত না মুনে ও এতো জেয়াদা/

কিম্বতেও বেথাকিম না হয় তবে তাহারদিগকে আনওাল/মত কথক সাজাই করিয়া কিন্তু তুমি বেহুদা সাজাই জদি/ করহ তবে তাতি তোমার নামে মোক্তারের নিকট/নালিস করিতে পারিবেক এ হুকুম খুব তহকিক জানিয়া/কখনো বদল করিবা না পহিলা তাতি জে রকম কাপড় দিবার করার করিবেক তাহার হাতে হরগীজ/তাহার দুই থানের জেয়াদা দাদনি দিবে না তাঁতি/ এক থান দাখিল করিবার পুর্ব্বে আর এক থানের/দাদনি করিবে না থান দাখিল হইলে পর দাদনি করিবা/ মালুম হইল তাতি কি তাঁত দুই থানের জেয়াদা কাপড়/দাখিল করিতে পারে না এই কারণ কি মাহা একবার/সেওয়ায় দাদনি হইতে পারিবেক না।———

সংপ্রতি খাজনা পৌছিলে পর এই মত দাদনির/দস্তুরমাফিক করার বমৌজিব তুমি দিবা/ও নায়েবগোমাস্তাকে হুকুম করিয়া তাহার হাতে/ দেয়াবা এবং দাদনির দফায় তুমি ও তোমার /নাএব কিছু গৌন করিবা না অনেক লোক পুর্ব্বে/আপন মুনফার জন্যে তাতির খতরা করিয়া/ তাহাদিগকে আজিজ করিয়াছে জদি তুমি / সে ধারা কাজ করহ তবে জে তাগাদি কুর্দ্দ তোমার উপর বেজার হইব।———

একথা খুব এয়াদ রাখিবা তুমি ও নাএব ও আমলা/হায় জে কেহ সরকারে মাহিনা পায় হরগিজ কেহ/ আগামি মাহিনা খরচ করিবে না এবং খরিদের/ কারন দাদনি হইবে না।———

পেটার আড়ঙ্গের মধ্যে হরিপাল ও মোড়া দ্বার/হাটার নিকটে কারন সেখানকার আলাদা/কোটী ছাড়াইয়া দ্বারহাটার সামিল করিবা সেখান/কার তাতিলোক সদর কোটীতে সরবরাহ করিবেক/কিন্তু দোসরা পেটার আড়ঙ্গ ধন্যাখালি মায়াপুর রাজবলহাট কৈকালা কলি জয়নগর ও সকল/জায়গার তাতিলোক সদর কোটীতে কাপড় দাখিল/ [৩] করিতে লাগিলে তাহারদিগের অনেক তছদিয়া হয়/একারন সে সকল আড়ঙ্গ মোকরর থাকীবেক নাএব/গোমাস্তা ও আমলাহায় দোসরা মাফিক তফসিল /মনকুর এই সকল নাএবগোমাস্তা আপন/কাজে জায়গায় ২ মোকরর হইয়া মাফিক হুকুম/কী তোমাকে লিখিলাম এই মাফিক কাজ করিবেক—

তোমাকে উচিত জেহানেসা পেটায় আড়ঙ্গের কাজ/ নজর করহ মোকামি গোমাস্তা ও দালালরা/ কি ধারায় কাজ করে এবং তাতি ও পেটার আমলা/ দালালের সহিত কোন মোকদ্দমা রোয়দাদ হয়/ কিম্বা তাতি তাতিতে মোকর্দ্দমা হয় তাহাও ফয়সল/ করিবা ফয়সল করিবার দফায় খুব সেতাবি ও আদালত করিবা।———

বেগর তোমার নিতান্ত খবরদারি ও মোকামি গোমাস্তা/ দিগের স্থানে সেলামি ও রেসয়ত কিছু লইবে না/আর অবস্ত কুম্পানির কাজে ভালমতে সরবরাহ/ হইবেক জদি তুমি এ দফার সাচা হইতে পারহ/ তবে তোমার নেকনামি হইবেক এবং জে উপযুক্ত তোমার দেনবরি করিব কিন্তু জদি তুমি কিম্বা/ আমলহায় দোসরা হুকুম ছাড়া কোন কাজ করহ/ তবে উপযুক্ত সাজাইতে পৌছিবা।———

হুকুম জানিবা মাষকাবার কাগজ সদরকুটীর ও/ পেটার কুটীর মাষ ২ কলিকাতায় মোক্তারকারের/ নিকট পাঠাইবা সে কাগজের এই বেওরা লিখিবা/ মাষ ২ কতো দাদনি করহ তাহার আসামিওার/ নামনবিসি ও মজুত তহবিল এবং যে কাপড় দাখিল/তাহার আলাদা হিসাব পাঠাইবা কোন রকম/ কার কতো জাচাইসই কতো ফেরত তাহা লিখিবা করারের/ বাকি কাহার কতো তাহা লিখিবা কি কারন/ করারের বাকি পড়ে তাহারো বেওরা লিখিবা এ কাগজ/ হরেক মাষের ত্রিষা তইয়ার করিয়া দস্তখতি-মুদে/ আগামি মাষের ৭ রোজের মধ্যে চালান করিতে/ চাহ জখন খাজানা তহবিল জেয়াদা হবেক তখন/ কতো টাকার দরকার তাহা দরজ দিয়া লিখিবা/ আইন্দায় জমাখরচী কাজ দুর করিবার কারন যে কিছু / বাকি দালালির জিম্মে আখেরি মৌষুমে হইবেক তাহা / আদায় করিয়া লইবা তাতিদিগের করার সাল /তমামি করারি কাপড় আখরি কিবরিল নাগাদি / দাখিল করিবেক তবেই তজবিজ ও ফয়সল কারন / ত্রিষা আবরিল মুর্দ্দা তোমাকে আইয়ামের ফোরসত / খুব মিলিবেক জদি একাজে কোন বখেড়া রোয়দাদ / হয় সিত্র মোক্তারকারকে খবর লিখিবা।

তাহার খোলাসা হইয়া আইলে কয়সল হইবেক ও ওজর / ওহিনা (ওছিলা ?) জারি হইবেক না আর তাতিলোক জে মাফিক / করার করিয়াছে তাহার করারনামার নকল মনফুক/ [৪] করিয়া পাঠাই তাহাতেই হরেক পেটার আড়ঙ্গের / করার মালুম হইবেক তোমার কাজ এই খবরদার / হইয়া করার মাহফিক কাপড় / আদায় করিয়া লইবা।

জদি নয়ারকম কাপড় পেটার আড়ঙ্গে পয়দা হয় / তাহার নমুনা মোকতারকারের নিকট পাঠাইবা মোক্তার তজবিজ করিয়া দেখিবেক কুম্পানির / কাজের উপযুক্ত হয় কিনা ও বেওরা লিখিবা / কতো কাপড় ঐ নয়ারকমের সরবরাহ সালিয়ানা / হবেক তাহার মাফিক জবাব লিখিবে।—

ছোট ২ মোকদ্দমা জে রোদাদ হইবেক তাহা স্থন জন্যে তাহাদিগকে সমঝাহ / সালিস তুরায় রফা করিয়া দিবেক জদি তাতিলোক / ইজারদারের নামে নালিষ করে কিম্বা ইজারদার তাতির / নামে নালিষ করে তবে ঐমত তাহাদিগকে সমঝাইয়া /১ সালিষ তুমি মোকরর করিয়া দিবা এক সালিষ সদর / ইজারদার করিয়া দিবেক জদি ইহাতে মোকদ্দমা রফা / না হয় তবে মোকদ্দমার তামাম হকিকত আরজি লিখিয়া / মোক্তারকারকে খবর জানাইবা তাতিলোক সকলে / গোল করিয়া নালিষ কারণ জদি কলিকাতা জাইতে / উদ্যতো হয় তবে খুব মোজাহেম হইবা কারন এই / তাহাদিগের জায়নে খরিদের কাজের খতরা এবং / মালগুজরিতে ও খতরা হয় অতএব জদি তাহাদিগের কোন ফরিয়াদী দফা সালিসিতে রফা / না হয় তবে কলিকাতায় তাহারা গোল করিয়া / না গিয়া আপন তরফ জনেক উকিল পাঠাইবেক / সেই উকিল সকল তাতির হইয়া মালিকের কাছে ফরিয়াদ করিবেক।—

দালালের মারফতের বাকী তিন সনের টানা (টাকা ?) হিসাবে / আন্দাজী ৯০০০ হাজার টাকা তাতিলোকের জিম্মে/ আছে এ বাকি উস্থল করিবার জন্যে তুমি খুব / মুকেদী করিবা জে উস্থল হইবেক তাহা সাবেক দালা/লেরদিগের বাকীর আন্দরে জমা করিয়া লইবা।—

সফেদ কাপড় একসী সুত না হওয়াতে অনেক কথা জন্মিয়াছে / ও একসী না হওন কেবল গোমাস্তার কম তরদ্দুদি সংপ্রতি / হুকুম লিখি তুমি কিম্বা তোমার খাতির্জ্জমা মত জনেক / মাতবর লোক হণ্ডা ২ তাত সকল ও তানা ভরনির সুত নজরা করিবা/তানা হাটাবার সময় বারিক ও একসী সুত তজবিজ / করিয়া দিবা জেনো ভারি সুত ও কড্যা তানার মধ্যে / না থাকিতে পায় আর বুনিবার সময় ভরনির যুতে ও / কোন কড্যা দিগর আএব না থাকে ভরনির যুতা / বারিক হয় খবরদারি করিবা তাতি জেন আপন / কেফাইতের জন্য ভারি যুত পড়্যানের মধ্যে আমেজ/ না করে সকল পাত একসী হয় এই / সকল জন্যে কাপড় বেআন্দাজ হয় ও সরবরাহে খতরা / হয় তুমি খুব খবরদারিতে হরেক থান কাপড় / তজবিজ করিয়া লইবা গজ ও বর ও গোছে হরগিজ..............................

[অসমাপ্ত—মূল কাগজ এইখানেই সাঙ্গ হইয়াছে।]

উপরে মুদ্রিত কাগজখানির ইংরেজী শিরোলিখন হইতে বুঝা যায় যে ইহা ইংরেজীতে খসড়া-করা একখানি হুকুম-নামার বাঙ্গালা অনুবাদ। N. B. H. এই অক্ষরত্রয় নাথানিএল ব্রাসি হাল্‌হেডের নামের আদ্যক্ষর, ইহা নিঃসন্দেহ; হাল্‌হেড্‌ ইংরেজী-ভাষায় সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ লেখেন, খ্রীষ্টীয় ১৭৭৮ সালে হুগলীতে এই বই মুদ্রিত হয়; হাল্‌হেড্‌ বাঙ্গালা তর্জ্জমাটী দেখিয়া 'ঠিক অনুবাদ' বলিয়া দস্তখত করিয়া দিতেছেন। হাল্‌হেডের নামের আদ্যক্ষর হইতে বুঝা যায় যে কাগজখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বাঙ্গালা দেশে বয়ন-শিল্প ও বস্ত্র-ব্যবসায়ের সহিত ঈস্ট্‌-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কি সম্বন্ধ ছিল, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি তথ্য এই কাগজ হইতে পাওয়া যায়।

হরিপাল হুগলীজেলায়, তারকেশ্বরের নিকটস্থ বিখ্যাত গ্রাম। এখনও ঐ অঞ্চলের তাঁতের কাপড় সুপরিচিত।

মূল কাগজখানি বড় ফুল্‌স্কাপ্‌ চারি পৃষ্ঠায়, লম্বে আধাআধি 'ভাঁজ' করিয়া প্রতি পৃষ্ঠার অর্দ্ধ অংশ ধরিয়া লেখা। [২] [৩] ও [৪] পৃষ্ঠার আরম্ভ, উপরের মুদ্রিত পাঠে বন্ধনীদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কচিৎ দাঁড়ির ব্যবহার ভিন্ন মূলে আর কোনও বাক্য-চ্ছেদ-চিহ্ন নাই; একটানা পড়িয়া যাইলে প্রথমটায় দুই এক জায়গায় সহজে অর্থগ্রহণ হইবে না, কিন্তু তথাপিও মুদ্রিত পাঠে কমা দাঁড়ি প্রভৃতি দিবার বিশেষ কোনও আবশ্যকতা বিবেচনা করি নাই, মূলের রীতিই বজায় রাখিয়াছি।

কাগজখানির ভাষা দেখিয়া মনে হয়, অনুবাদ-কারী বাঙ্গালা গদ্যে এতটা একটানা রচনা করিয়া যাইতে অনভ্যস্ত; ইহার বাক্য-রীতিতে স্থলে স্থলে অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়িয়াছে; যেমন

১১৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অংশে প্রথম প্যারার প্রথম বাক্যটী ; ও দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের গোড়ার প্রথম পুরুষ হইতে বাক্যকে মধ্যম পুরুষে আনয়ন ; ১১৪ পৃষ্ঠায় ১০ ও ১১ র ছত্রে 'তোমাকে এ কাজ করিতে হইবে' স্থলে 'তোমাকে ··এ কাজ করিবা ;' ১২ ও ১৩ র ছত্রে 'তোমাকে জেয়াদা মেহনত আপন হাতে দাদনির কারণ করিতে হবেক' ; ১১৫ পৃষ্ঠায় ১৯ ও ২০ র ছত্রে 'নিকটে কারণ' = নিকটে বলিয়া ; ইত্যাদি। তাঁতি পৌছ প্রভৃতি শব্দে লেখক বা অনুলেখক চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ সর্ব্বত্র করেন নাই।

কাগজখানিতে ফারসী শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য উল্লেখযোগ্য। পুরাতন বাঙ্গালায় গদ্য রচনা নিতান্ত বিরল, অল্প স্বল্প গদ্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা বেশীর ভাগ চিঠি পত্রে ও দলিল দস্তাবেজে, প্রায় সমস্তই বিষয় কর্ম্ম লইয়া ; এতৎসম্পৃক্ত শব্দ বাঙ্গালায় ভূরি পরিমাণে ফারসী হইতে গৃহীত ; তদ্ভিন্ন মুসলমান শাসকদের প্রভাবে বহু সাধারণ শব্দও ফারসী বাঙ্গালার মৌখিক ভাষার সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। এই সকল শব্দের অনেকগুলি আজকালকার সাধারণ বাঙ্গালায় অপ্রচল হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নে এইরূপ কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দেওয়া গেল। ইহা ভিন্ন দুই চারিটি দেশী শব্দের ও টিপ্পনী আবশ্যক হইবে মনে করিয়া নীচে [বন্ধনীর মধ্যে] দেওয়া গেল।

১১২—১৩ পৃষ্ঠা :—[খতরা = হানি ; ক্ষতি-শব্দ হইতে] ; [কোটী = কুঠি]; আমলাহায় (= আমলাহ (?) = আরবী ∠ অমলহ্, ∠অমল৽) = কর্ম্মচারিবৃন্দ ; এত্তফাক (= আ° ইত্তিফাক্) = একমত ; মবলগ (= আ° মুব্লগ্) = আগমস্থান, পূর্ণতা, মোট টাকা, অনেক ; তজবিজ (= আ তব্‌রীজ্ = অনুসন্ধান, বিচার ; তগির = (উর্দু ও ফারসী তবীর্, আ° তঘ্‌য়ীর হইতে) = পরিবর্ত্তন, কর্ম্মচ্যুতি ; হরগিজ (= ফা° হরগিজ, হরগজ) = কখনও, সদা ; রকম (= আ রক্‌ম্) = প্রকার, কাজকরা বস্ত্র ;

১১৪ পৃষ্ঠা :—মহকুম (= আ° মুহ্‌কম) = পরিষ্কার, স্পষ্টীকৃত (নিয়ম) ; হামেসগি (= ফা° হমেশগী) = চিরকাল ; আনওয়াল (= আ° অন্‌বাল) রীতি, পদ্ধতিসমূহ ; নসিয়ত (= আ° নস্‌ীহৎ) পরামর্শ, উপদেশ, বিধান, শাসন ; মালুম (= আ° ম∠ল্‌ম্) = জ্ঞাত ; বেহতর (= ফা° বিহ্‌তর্) = শ্রেয়, অপেক্ষাকৃত ভাল ; [সুবিতা (= হিন্দী সুভীতা) = সুবিধা] ; বেগর (ফা° ব + ঘয়্‌র্) = ব্যতিরেকে ; হেম্মত (আ° হিম্মৎ) = চিন্তা, দুশ্চিন্তা ; এরাদত (= আ° ইরাদৎ) = ইচ্ছা, চেষ্টা, অভিসন্ধি ; নেহাইয়ত (= আ° নিহায়ৎ) = বৃদ্ধি, সীমা, বিশেষ ; মোস্তজ্জির (= আ° মুস্তজির্) = প্রার্থী অপেক্ষী ; বরাওর্দ (= ফা° বর্-আবরদ্) = বরাদ্দ, পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারণ ; মুহুরির (= আ° মুহররর্) = মুহুরী, কেরাণী ; দস্ত (= ফা° দস্‌ৎ) = হাত ; খামসোজ (= ফা° খাম্ শোব্ ?) = অর্দ্ধধৌত, কচলান ; এওজ (= আ° ∠ইবয্) = বদল ; হাজত (= আ° হাযৎ) = আবশ্যক ;

১১৫ পৃষ্ঠা :—কিম্মত (= আ° কীমৎ) = মূল্য ; বেগাফিল (= ফা° বে + আ° গাফিল) = সাবধান ; তহকিক (= আ° তহ্‌কীক) = সত্য, সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত ; সেওয়ায় (= ফা° সিবা-ই, আ° সিবা) = অধিক ; বমৌজিব (= ফা বহ্ + আ° মুখিব) = হেতু অনুসারে ; আজিজ (= আ° ∠আযিজ) = অক্ষম, বলহীন, নিপীড়িত ; তাগাদি কুর্দ্দ (= আ° তকা∠উদ্ + ফা°

কয়্দহ্)=অমনোযোগিতা রুতে ; এয়াদ (=ফা° য়াদ)=স্মরণ ; [পেটা (দক্ষিণী শব্দ)=দুর্গযুক্ত স্থান, সুদৃঢ় পল্লী, সুদৃঢ় স্থানের নিকটবর্ত্তী পল্লী, দেশীলোক কর্ত্তৃক অধ্যুষিত স্থান ; পল্লী অঞ্চল ;] তছদিয়া (=আ° তস্‌দ্রী∠)=ঝঞ্ঝাট, আপদ, শিরঃপীড়া, ক্লেশ ; মাফিক (=আ° মুয়াফিক্)=অনুসারে ; তফসিল (আ° তফ্‌সীল)=বর্ণনা ; মনফুক (=আ° মুফ্‌রুক্)=আলাদা আলাদা ;

১১৬ পৃষ্ঠা :—রোয়দাদ (১১৭ পৃষ্ঠায় রোদাদ) (=ফা° রু-দাদ)=উপস্থাপিত, আদালতে আনীত ; ফয়সল (=আ° ফয়্‌সলহ্)=বিচার ; সেতাবি (=ফা° শিতাবী)=তাড়াতাড়ী, ত্বরিত, অগৌন ; আদালত (=আ° ∠অদালৎ)=ন্যায়বিচার ; খরদারী=খবর, খবরদারী ; তুলনীয়, পৃষ্ঠা ১১৮র শেষছত্রে, বর=বঅর, বহর ; রেসয়ৎ (=আ° রিশ্‌ৱৎ)=ঘুষ ; নেকনামি (=ফা° -নামী)=সুনাম ; দেনবরি (=? হিন্দী দেনা—তুলনীয় দেন-দার, দেনবার্=দেনেওয়ালা)=পুরস্কার ; সাজাই (উর্দু সজাঈ, ফা° সজা হইতে)=শাস্তি ; মোক্তার-কার (=আ° মুখ্‌তার+ফা° কার)=কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী ; আসামীওয়ার (=আ° অসামী+হিন্দী ৱার)=নাম ধরিয়া, লোকের নামানুক্রমিক ; নামনবিশি (=ফা° নাম্-নবীসী)=নামলিখন ; [বেওরা=ব্যাপার, বিবরণী] ; দস্তখতি যুদে (=ফা° দস্ত-খত্তী (আ° খত্ত্)+শুদহ্)=সহী হইলে পর ; দরজ (আ° দর্য্)=খাতায় লিখন ; আইন্দা (=ফা° -ন্দহ্)=আগামী ; মৌসুম (=আর মৱ্‌সিম্)=সময় ; [ফিব্রিল=ইংরেজী ফেব্রুয়ারী ; আবরিল=ইংরেজী এপ্রিল] ; যুর্দা=শুদ্ধ ? পর্য্যন্ত ? আইয়াম (=আ° অয়্যাম)=দিনসমূহ ;

১১৭ পৃষ্ঠা :—মাহফিক=মাফিক ; সুন (=অ° স্বু ন∠)=প্রস্তুত করণ, করণ=নিষ্পত্তি ; [সালিস দুরায়=দ্বারায়, দ্বারায়] ; হকিকৎ (=আ° হকীকৎ)=সারসত্য ; মোজাহেম (=আ° মুজাহিম্)=বিরোধী, বাধাদায়ক ; ফরিয়াদী দফা (=ফা°+আ° দফ্∠অ)=নালিস আনয়ন, পেশ করণ ; মুকেদী (=আ° মুকয়্যদ্)= সচেষ্টভাব, আগ্রহপূর্ণতা ;

১১৮ পৃষ্ঠা :—তরদ্দুদি (=আ° তরদ্দুদ্)=পরিশ্রম, চেষ্টা, যত্ন ; খাতির্জমা (=আ° খাত্বির্ যম∠)=নিঃসন্দেহ বিশ্বাস, দৃঢ় ধারণা, সন্তোষ ; বারিক (=ফা° বারীক্)=সরু, সূক্ষ্ম ; [কড্যা=কড়িয়া, ফোড়ে='নালফোড়', পড়িয়ানের সুতা তানার সুঁতার সহিত জড়াইয়া যাওয়া] ; আএব (=আ° ∠অয়্‌ব্)=অসম্পূর্ণতা, দোষ ; কেফাইত (=আ° কিফায়ৎ)=প্রাচুর্য্য, সুবিধা ; আমেজ (ফা°)=মিশাল।

উপরের আরবী [ও ফারসী] ; শব্দে নিম্নলিখিত রীতি অনুসারে আরবী [ও ফারসী] অক্ষরের বাঙ্গালা প্রত্যক্ষর স্থির করা হইয়াছে :—অলিফ্ হম্‌জহ্=' ; বা=ব ; [পে=প] তা=ত ; থা=থ ; ষীম=য ; [চেহ্=চ] ; হ্বা=হ্ব ; খা=খ ; দাল্=দ ; ধাল্=ধ ; রা=র ; জা=জ ; [ঝে=ঝ] ; সীন্=স ; শীন্=শ ; স্বাদ্=স্ব ; দ্বাদ্=দ্ব ; ত্বা=ত্ব ; দ্ধা=দ্ধ ; ∠অয়ন্=∠ ; ঘয়্‌ন্=ঘ ; ফা=ফ ; কাফ্=ক ; কাফ্=ক ; [গাফ্=গ] ; লাম্=ল ; মীম্=ম ; নূন্=ন ; ৱাৱ=ৱ ; হা=হ ; য়া=য় , [ফারসীর ৱাৱ-ই-ম∠দূলহ্ যুক্ত খে=খ্ব ।]

[১৫]

5660. F.　　পদ্য গল্প

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা:—

শ্বহায়—

৺ মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র ।—

সাং অবন্তিকে—

মোং ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম / শ্রীমতি মৌনাবতি সোডষ বরিস্যা বড় যুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য / কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ন পয্যন্ত যুঙ্গ্য ভ্রূর ধনুকেঃ / নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ন হস্ত পদ্মের মৃনাল স্তন দাড়িম্ব/ফল রুপলাবন্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন যুন্দরি / সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী । কন্যা পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব । একথা / ভোজরাজা স্থনে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক / এক ২ রাজার পুত্রকে এক ২ দীন রাত্রের মধ্যে এক ২ জোন কে সয়ন / ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো থাকে না কেবল / কন্যাঃ আর রাজপুত্র এক খাটে কন্যা সোযে ঃ এক খাটে রাজপুত্র / সোযে । জে রাজপুত্র জেমন গ্গানবান্ হয় । সেঃ সেইরূপ কথা / সারারাত্র কহে । কন্যাকে কথা কহাইতে পারে না ঃ সকালে উঠে ঃ / রাজপুত্র ঃ ঘরে জায় । এইরূপ প্রকারে কত ২ রাজপুত্র আইল / কেহো কথা কহাইতে পারিলেক না ঃ কতমৎ প্রকার করিলেক / তবু ঃ কন্যাকে ঃ কথা কহাইতে পারিলেক না । এইরূপে অনেক / দীন গেল ঃ পরে রাজা বিক্রমাদিত্য ঃ কন্যার ঃ রুপগুন যুনে / বড়ই তুষ্ট ঃ হইলেন ঃ কাহাকেও ঃ কহিলেন না ঃ সঙ্গে এক জোন / মনস্য ঃ লইলেন না ঃ কেবল আপুনি একা ঃ বড় ঘোড়ায় আরোহন / হইয়া ঃ সিকারের ঃ নাম করিয়া ঃ দুই চারি ঃ রোজের পরে ঃ মোকাম ঃ ভোজপুর ঃ শ্রীযুত ভোজরাজার ঃ বাটীতে ঃ উবিস্থীত /

হইলেন ঃ রাজার লোক জিঙ্গাষা ঃ করিলেক ঃ কে তুমি ঃ কোথা ঃ/
হইতে ঃ আইলে ঃ রাজা বিক্রমাদীত্য ঃ আপনার ঃ পরিচয় ঃ /দীলেন না ঃ
কহিলেন ঃ আমি ঃ আতিত ঃ একথা স্থনে ঃ / শ্রীযুত ভোজরাজার ঃ
লোক ঃ অপূর্ব্ব ঃ আষন ঃ বশীতে ঃ / দীলেন ঃ রাজা বসিলেন ঃ
খাওানের ঃ অপূর্ব্ব ২ ঃ সামিগ্র ঃ /আনিয়া দীলেন ঃ রাজা বিক্রমাদীত্য ঃ
খাইলেন ঃ পরে ঃ / সয়ন ঃ করিলেন ঃ / বৈকালে ঃ শ্রীযুত. ভোজরাজা ঃ
স্থনিলেন ঃ / এক ঃ আতিত ঃ আসিয়াছে ঃ লোক ঃ পাঠাইয়া ঃ
ডাকাইগা ঃ / আনিলেন ঃ রাজা বিক্রমাদীত্যকে ঃ জীঙ্গাষা ঃ করিলেন ঃ/
কী জন্যা ঃ আগমোন ঃ হইয়াছে ঃ এখানে ঃ কী নাম ঃ। / তোমার ঃ
প্রকত কহিবে ঃ তাহাতে ঃ রাজা আপনার /ঃ নাম ঃ ভাঁড়াইয়া ঃ
আর এক ঃ নাম ঃ কহিলেন ঃ শ্রীযুত / ভোজরাজা ঃ পুনুর্ব্বার ঃ জিঙ্গাসা ঃ
করিলেক ঃ তোমাকে ঃ / এমন সুন্দর ঃ এমন গুণবান ঃ দেখিতেছী ঃ
বুঝি ঃ তুমি ঃ / কোন ঃ রাজা হইবেক। পরে ঃ রাজা বিক্রমাদীত্য ঃ
কহিলেন ঃ / আমি ঃ জে হই ঃ তোমার পরিচয়ে ঃ কায্য কী আছে ঃ
তোমার ঃ/ কন্যার পন স্থনিঞা ঃ আসিয়াছী ঃ আমি ঃ তাঁহাকে ঃ/
কথা কহাইব ঃ রাজা ঃ কহিলেন ঃ ভালোই ঃ থাকোহ ঃ / পরে ঃ রাত্রে ঃ
এক ঘরে ঃ দুই খাট ঃ বিছাইলেক ঃ / দুই জনে ঃ দুই খাটে ঃ সয়ন ঃ
করিলেন ঃ ক্ষেনেক ঃ কাল / পরে ঃ রাজা বিক্রমাদীত্য ঃ জিঙ্গাষা ঃ
করিলেন ঃ এ ঘরে / কেহ আছহ ঃ আমার সঙ্গে ঃ কথা কহো ঃ কন্যা
উত্তর ঃ / দীলেক না ঃ পরে ঃ রাজা ঃ কী করিলেন ঃ তাঁহার সঙ্গে ঃ/
পোসা ঃ দুই ভূত ছীল ঃ তাহার ঃ নাম তাল ঃ বিতাল ঃ তাহাকে /
স্মরণ ঃ করিলেন ঃ তখনি তাহারা ঃ দুই জনে ঃ আইলেন ঃ / ৭ কী
আঙ্গা মহাঁরাজ ঃ কী করিব কহ ঃ রাজা কহিলেন ঃ / তুমি ঃ কন্যার খাটে
গিয়া ঃ বইসহ ঃ আমি ঃ জীঙ্গাসা ঃ / করিলে ঃ কথা কহিও ঃ তাল ঃ
বিতাল গিয়া ঃ কন্যার খাটে /. বসিল ঃ পরে ঃ রাজা ঃ ডাকীয়া ঃ
কহিলেন ঃ এ ঘরে কে জাগ্রত / আছহ ঃ তাল বিতাল ঃ উত্তর ঃ দীলেকঃ
কী জন্যা ঃ ডাক / মহাঁরাজ ঃ রাজা কহেন একা আশ্চয্য ঃ কন্যার ঃ

কথা নাঞী / তুমি : কে : তাল ব্রিতাল : কহিলেক : মহাঁরাজ : আমি : / কন্যার খাট : রাজা কহিলেন তবে তুমি : সুনহ : এক দেসে / এক : সওদাগর ছীল : সে বানির্য্যতে গিয়াছীল : পরে / তাহার : জাহাজ ও নৌকা সকল : ডুবিয়া গেল : এক / খান তক্তা ধরিয়া : সওদাগর : কীনারায় : উঠিল : / সেই : দেসে এক মায়ে মানুষ : জল : আনিতে আসিয়াছীল /.সে : সওদাগরকে : লইয়া : আপনার বাটীতে গেল : । / বিস্তর : সেবা করিয়া সওদাগরকে বাঁচাইলেক। কতক দীন / তাকাদী সেই খানে থাকীল। পরে এক দীন এক মালির : / মায়ে : স বড় জাদুগীর : তার সঙ্গে। আর সওদাগরের / সঙ্গে সাক্ষ্যাত হইল : সে মালিনি এক ঔসধ : সওদাগরের : গায়ে ফোলিয়া ফেলিয়া মারিলেক। সে ঔসধ তার গায়ে / লাগিতে : ভেড়া হইল : সওদাগরকে এক দড়ি দীয়া : বাঁদীয়া / আপনার : ঘরে লইয়া গেল। রাত্রে এক ঔসধ গায়ে ছোঁয়াইয়া / মানুষ করে : দীনে আরবার ভেড়া করে। এইমত করিয়া / প্রত্তহ বেহার করে। এক দীন : সে ভেড়া দড়ি ছঁীড়িয়া : / পালিয়া : এক রাজার : বাটীর ভিতর : গেল : রাজার / লোক : সে ভেড়া ধরিয়া : কাটীয়া। তাহার মাংষ। / খাইলেক। বল সুনি : রাজকন্যার : খাট : অপরাধ / কার হইল। তাল বিতাল কহিলেক। জে মেয়ে জলের ঘাটে / হইতে। লইয়া গিয়া : বাঁচাইয়াছিল : সকল দোষ তাহার / হইল। মালিনির : কিছু দোষে নাঞী। কন্যা একথা / সুনিয়া : আপনার খাট দুর করিয়া। ফেলিয়া দীলেক। / মাটীতে সয়ন : করিয়া : রহিল : পরে রাজা বিক্রমাদীত্য / কহিতে লাগিল্ল : কন্যার খাটের সঙ্গে কথা কহিতেছীলাম / কন্যা তাহা গোষা করিয়া ফিরিয়া দীলেন : এ ঘরে / আর কেহো আছহ : তাল বিতাল : উত্তর দীলেক : / কেনো মহাঁরাজ : পরে রাজা কহিলেন : কে তুমি : তাল বিতাল / কহিলেক : আমি রাজকন্যার পরিধিয় বস্ত্র : বড়ই ভালো / হইল : কথা সুন। এক দেসে : এক সওদাগরের : কন্যার : / সঙ্গে : বিভাহের কথা চারি জোনের সঙ্গে হইয়াছে : / বিভাহের দীনে চারি জোন : আসীয়া :

উবিস্থীত হইল / কেহ বলে আমি বিভাহ ঃ করিব ঃ আর কেহ কহে তুমি কে / আমি ঃ করিব ঃ এই কথায় ঃ বড়ই ঝকড়া হইল ঃ সে কন্যা / এ কথা স্থনেঃ রাত্রের মধ্যে জহর করিয়া মরিলেক / প্রাতঃকালে সে কন্যাকে ঃ বাহিরে ঃ আনিলেক। / চারি জোনে সে কন্যাকে দেখিয়া বিস্তর খেদ করিলেক / এক জোন কন্যার সোঁকে জহর খাইয়া মরিল ঃ এক জোন/ফিরে ঘরে গেল এক জোন বসিয়া থাকীল। এক জোন/এক ঔসধ খাওইয়া ঃ দুই জোনকে ঃ বাঁচাইলেক ঃ বল স্থনি / কন্যার কাপড় সে কন্যা কে পাইবে তাল বিতাল কহিলেক ঃ জে ফিরা / ঘরে গিয়াছে সেই পাইবেক ঃ কন্যা একথা বুনিঞা কাপড় / ফেলিতে ঃ পারেন। না ঃ হাসিয়া ঃ উঠিলেন। কথা কহিলেন / রাজা কন্যার হাত ধরিয়া ঃ আপনার খাটে লইলেন ঃ সারা / রাত্র হাসাখুসি করিলেন। তার পর দীন ভোজ রাজা কন্যার / বিভাহ দীলেন। রাজা বিক্রমাদীত্যের সঙ্গে ॥।॥।

পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যের বিশেষ অভাব। এই গল্পটী অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা হিসাবে খুবই উপযোগী। যথাযথ মূলানুযায়ী মুদ্রিত হইল।

[৬]

5660 F. একটী গান।—লালচন্দ্র ও নন্দলাল দুই জনের ভনিতা দেওয়া।

ওকি অপরূপ দেখি ধনি ঃ পিষ্টেতে লম্বিত ধরনি সম্বিত কিম্বা ফনি কিম্বা বেনী ঃ অলকা বেষ্টীত / কনকে রচিত শিতি কিম্বা সৌদামিনি ঃ তার অধ / দেসে অন্ধকারো নাসেঃ সিন্দুর কি দিনমনি ঃ / খঞ্জন যুগল নয়ান চঞ্চল কি সফরি অনুমানী / কিবা বিধুবর কি মুখ সুন্দর কিছুই না জানি ॥২॥ কিবা কামকুঞ্জ কি তড়িতপুঞ্জ কিবা হয় তনুখানি ঃ / কি কুচ কি গিরি কিঁ বুঝিতে না পারি কি কোক /বিহিন পানি ॥৩॥ কি মৃনালদণ্ড কিবা করিশুণ্ড / কিবা বাহুর সুবলনি ত্রিবলি ত্রিগুন কি কাম / সোপানো কিবা নাভি তরঙ্গনি কিবা কোটী / দেস কিবা পিয়ুইষ মধ্যে সোভিছে কিঙ্কনি / কিবা রম্বা তরু কিবা যুগ্য উরু কিবা মরাল / চলনি ॥৫॥ লালচন্দ্র কহে এ বেসে কোথায় / চল্যাছ লো বিনোদিনি নন্দলাল ভনে চায়্যা / আমাপানে হাস্যা কথা কহ স্থনি ॥৬॥ঃ—

[৭.]

5660 F. লাল কালিতে লেখা কতকগুলি মন্ত্র।—উপরে লাটিন ভাষায় পুরাতন ছাঁদের ইংরেজি হাতে লেখা Carmen Shanskrit cujus Ope Morsus Serpentis admodum Lethalis innoxius reddatur atque cito Moribundus convalescat / Inefficax foret nisi littera rubida scriptum অর্থাৎ "সংস্কৃত ছড়া, যাহার সাহায্যে অতি বিষাক্ত সাপের কামড় বিষমুক্ত করা যায়, ও মরণোন্মুখ শীঘ্র আরাম হয়। লাল অক্ষরে লিখিত না হইলে কার্য্যকর হয় না।"

[লাল রঙ্গে সাপের মন্ত্র লেখা সম্বন্ধে একটী কথা পরিষদের অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন যে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "বিয়ে-পাগলা বুড়ো" নাটকে কতকগুলি সাপের মন্ত্র নাটকের একটী পাত্রের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে এবং যখন ঐ বইয়ের প্রথম মুদ্রণ করা হয়, তখন মন্ত্রগুলি লাল অক্ষরেই ছাপান হইয়াছিল।]

হাতচালা। উচল চালম সুচল চালম অরে হাত তোরে চা(ল)ম থাকে চৌসাপার বিস ছামু ধর না থাকে চৌসাপার বিস ডাইনে বাঁয় চল কার আঙ্গা বিসহরির/ আঙ্গা ।১। উচ উচ ভামুহে রক্তবরনে বিস নাই গুরু হে গামছা-মোড়নে রথে চাপিয়া হনুমন্ত জায় তুল তুল বিষ তুই গামছার বায় শ্রীমনসার আঙ্গা ১॥/ গামছা পাড়িয়া মারিবে ॥ তাগাবান্ধা॥ মুই বান্ধি তাগা ব্রহ্মা বিষ্ণু তিনজনে গেলগা তাগা তাগনের সাত ভার বিষ পিচকর আকুল সমুদ্র উবুকরি / তুই পা তোর স্বামি সাপে খালে তাগা বান্ধ্যা ঘরে জা ১॥ ভাগান্যার মামা সমুর বিস ভাগিন্যা বৌ হেটয়েড্যা উপর ধাইস খাইস গুরনৌ উড়্যাবান্ধী/ উড়নি ভিড়া বান্ধে ডোর কোথা আইস করঙ্গ (কু ?) র বেটা সিন্দমুযান্যা-চোর ইন্দ্রপুরের মাটি ব্রহ্মপুরের ফুল মহাদেব বাঁধেন তাগা বাঁধ্যা চাঁপার/ ফুল ইহাঁর উদ্দিস করিস বল ধর্ম্ম ইসাদ পার তল ১॥/ আবেস দুর করা ॥ আদবার বছরের পদনকুমার(রি ?) পার মগরমুট খাড়ু ডাইন হাতে ধোধবল/ ছাতা বাঁহাতে বিসের নাড়ু বিস খায় খলবলায় মনে মনে হাসে তিন্দিনির জায়া। না (লা ?) ধান সেহয়নে ভাসে ছাওাল কাঁদানি বাড়ুন ভাঙ্গানি আলাক/ দিয়া বাতি অন্ধ কার গার বিস ঝাড়াই সাক্ষি ব্রহ্মানি নাই বিস বিস-হরির আঙ্গা ১॥/ ঝাড়ান ॥ স্বর্গের পায়রা/ সাগরপারি অমতভুবনে তোর

বাসা/ বিস উপজিল কোথা বিস উপজিল পদ্মা/র স্মরনে নাই বিস জগতে গৌরিহুংকার ১॥ মস্তকামহিল (যাইল ?) বিস পবন খরসান বাহড় বাহড় বিস / সিব পর / মান বাহড় রে বিষ তোরে ডাকেন পাঁও আপনার দর্পে বিস রক্তে দিলা ঝাপ বাহড়ে রে বিস তোরে অনাদিকৃষ্ণের স্মাপ ১॥ গড়ুর নাচে নপুর বাজে/ ঘুঙ্গুর বাজে পায় পথ ছাড়্যা দেয় তাহে গোসাঁই গড়ুর জায় ।১॥/ পিলাকাটা ॥ উকং কালীয়ং রং লং বং সং ষং শং হুং ক্ষ ডাকিনী ঝম্পে পিলা কম্পে/ পিলার বুকে মারম আগুনবান অমুকার আঙ্গের পিলা কাটা করম খান খান কার আজ্ঞা উগ্রচণ্ডার আজ্ঞা ১॥

এই মন্ত্রের সর্ব্বত্র বুঝিতে পারিলাম না ; মিলাইবার জন্ম অন্য কোনও সাপের মন্ত্রেরও পাঠ পাই নাই, ভবিষ্যতে আলোচনার জন্ম কেবলমাত্র মূল কাগজে যেমন পাইয়াছি, তেমনি মুদ্রিত করিয়া দিলাম।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

চণ্ডীদাস

এতক্ষণ আমরা বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধেরা যে গান লিখিয়াছেন, সেই কথাই বলিতেছিলাম। এখন হিন্দুদিগের বাঙ্গালা গানের কথা বলিব। এই সকল গানের প্রধান কবি, 'কবি চণ্ডীদাস'। তিনি যেমনি প্রধান, তেমনি প্রাচীন। তাঁহার গানের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা আগে বুঝিতে হয়। তাই আমরা এখন বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

বিষ্ণু বেদের দেবতা। তিনি মধ্যাহ্নকালের সূর্য্য। তিনি তিন পা দিয়া জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার এক পা উদয়াচলে, এক পা অস্তাচলে, আর এক পা ঠিক মাথার উপরে। আমরা এখনও যে বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকি তাঁহাকে সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়াই উপাসনা করিয়া থাকি। পুরাণ-কর্ত্তারা বিষ্ণুকে ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে স্থান দিয়াছেন। সে ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহাদের মধ্যে বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, সুতরাং পৃথিবী পালনের জন্য তাঁহাকে অনেক বার অবতার হইতে হইয়াছে। যখনই যখনই প্রজা উৎপীড়িত হইয়াছে, তখনই তিনি অবতার হইয়াছেন। তাঁর অবতার অসংখ্য। তাহার মধ্যে দশটী প্রধান। এই দশের মধ্যেও আবার বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ—ইঁহাদেরই অধিক উপাসনা হয়। কৃষ্ণের উপাসনা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণ লইয়াই মহাভারত, কৃষ্ণ লইয়াই হরিবংশ; কৃষ্ণ লইয়াই ভাগবত। কিন্তু এ সকল গ্রন্থে রাধার কথা নাই। কতদিনে যে কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। ইংরেজী প্রথম শতকে অন্ধ্র বংশে হালা বা শালিবাহন নামে একজন রাজা হন। তিনি মহারাষ্ট্রী ভাষায় সাতশত আদিরসের গান সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণের নাম এক জায়গায় পাওয়া যায়। তাহার পর বহু দিন ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ প্রাচীন হইলেও, তাঁহাদের উপাসনা যে বেশী পরিমাণে প্রচলিত ছিল, বোধ হয় না।

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ নামে একখানি আধুনিক পুরাণ আছে, এখানিতে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের কথা আছে। সুতরাং উহা শঙ্করাচার্য্যের পরের লেখা, অর্থাৎ ইংরেজী আটশত সালের পরের লেখা। এখানি আধুনিক বলিবার আর একটী কারণ আছে। আমাদের অষ্টাদশ মহাপুরাণ বেশ প্রাচীন, উহার মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ একখানি। নারদপুরাণে এই প্রাচীন অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া আছে, সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেরও বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু সে পুরাণের সঙ্গে এখন যেখানি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিয়া চলিত আছে, তাহার সঙ্গে একেবারে মিল নাই। এখানি পাঁচটী খণ্ডে ভাগ করা। শেষটী শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড। উহাতে প্রথম হইতেই রাধার কথা। রাধা বৈকুণ্ঠেও বৈকুণ্ঠেশ্বরী। সেখান হইতে শ্রীদামের শাপে তাঁহাকে মানুষী হইয়া বৃন্দাবনে জন্মাইতে হয়। কৃষ্ণও তখন কংসাসুর বধের জন্য অবতার হইতেছিলেন। তাঁহাকেও যে কারণে বহুকাল বৃন্দাবনে বাস করিতে হইয়াছিল, তাহা সকলে

জানেন। এইখানে রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। সে মিলনও একরূপ অদ্ভুত। নন্দরাজা এক দিন কৃষ্ণকে কোলে করিয়া গরু বাছুর চরাইতে মাঠে গিয়াছিলেন, হঠাৎ দেবতারা সন্ধ্যার সময় ঝড় বৃষ্টি তুলিয়া দিলেন। নন্দ মহাফাঁফরে পড়িলেন। ছেলে লইয়া বাড়ী ছুটিয়া যাইবেন, সে যো নাই। সব গরু বাছুর মাঠে, এদিকে ছেলেও কাঁদিয়া উঠিল। এ সময়ে নন্দ দেখিলেন, রাধা সেখানে উপস্থিত। তিনি ছোট ছেলেটীকে রাধার কোলে দিয়া বলিলেন, তুমি একে বাড়ী পৌঁছিয়া দাও। রাধা কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বাড়ী যাইতেছেন, পথে কৃষ্ণ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মনোহর যুবাপুরুষের মূর্ত্তি ধরিয়া রাধার কাছে প্রেমভিক্ষা করিলেন। ঠিক সেই সময় ব্রহ্মা আসিয়া দু'জনের বিবাহ দিয়া গেলেন। তাহার পর যা হইবার, তাহাই হইল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই গল্পটী লইয়া মহাকবি জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন,—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

সুতরাং জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বেশ জানিতেন। কারণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণই রাধাকে প্রচার করিয়াছে এবং এ গল্পটী আর কোথাও পাওয়া যায় না।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানি (অথবা যে বইখানি বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া ছাপাইয়াছেন) মোটামুটি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। ইহারও পালাগুলির নাম "খণ্ড"। প্রথম পালাটীর নাম "জন্মখণ্ড"। এখানেও প্রথমেই আকাশে দেবসভা হইয়াছে। কংসের জন্য সৃষ্টি-নাশ হইতেছে, সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মার কথায় দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গেলেন, বিষ্ণু তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া কংস বধ করিবেন, স্বীকার করিলেন এবং একগাছি কালো এবং একগাছি সাদা চুল দিয়া বলিয়া দিলেন,—বসুদেবের ঘরে দৈবকীর উদরে বলরাম ও কৃষ্ণের জন্ম হইবে, তাঁহারাই কংসকে নাশ করিবেন। নারদ আসিয়া কংসকে সে কথা বলিয়া দিয়া গেলেন। কংস প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার ভগিনী দৈবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই, তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন। ছ'টী শিশু মারা যাওয়ার পর, সাদা চুল দৈবকীকে দেওয়া হইল। তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইলে, বলরাম বিমাতা রোহিণীর গর্ভে গিয়া রহিলেন, প্রকাশ করিয়া দিলেন, দৈবকীর গর্ভপাত হইয়াছে। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, কেমন করিয়া বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া যশোদার সদ্যোজাত মেয়েটীকে লইয়া দৈবকীর আঁতুড়ে রাখেন, সে কথা সকলেই জানেন। কংস যখন সেই মেয়েটিকে পাথরের উপর আছড়াইয়া মারিয়া ফেলে, তখন সে কন্যা আকাশে উঠিয়া কংসকে বলিয়া গেল,—

তোমারে মারিবে যে।
গোকুলে বাড়িছে সে॥

এই যে মহামায়ার কথা, ইহা কিন্তু কোন পুরাণে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় কেবল অতি প্রাচীন ভাস কবির 'বালচরিত্র' নামে নাটকে। চণ্ডীদাস এ কথা কোথায় পাইলেন, জানি না।

কৃষ্ণ যখন গোকুলে বাড়িতে লাগিলেন, তখন দেবতারা পরামর্শ করিয়া লক্ষ্মীকে বৃষভানুর কন্যা করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন এবং অভিমন্যু নামে একটা নপুংসকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই অভিমন্যুই আয়ান ঘোষ বা আইহান। একে লক্ষ্মী আসিয়াছেন, তাহাতে নপুংসকের স্ত্রী হইয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতে তাঁহার ধর্ম্মমত আর কোন বাধা রহিল না। রাধার শাশুড়ী রাধার মায়ের কাছে গিয়া তাহার পিসীকে লইয়া আসিল। সেই রাধার অভিভাবক হইল, তাহার নাম বড়াই বুড়ী। সেই রাধার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। বড়াইয়ের রূপ বর্ণনা,—

শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে॥
ভ্রূহি চুন রেখ যেহু দেখি।
কোটর বাটুল দুই আঁখি॥
মাহা পুট নাশাদণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী॥
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভি মূলে দুই কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

কাশ্মীরের কবি দামোদর ইংরেজী অষ্টম শতকে 'কুট্টিনীমত' নামে একখানি বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে কুট্টিনীর যে বর্ণনা আছে, এই বর্ণনা ঠিক সেইরূপ। মিথিলার কবি জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর বর্ণনরত্নাকরেও কুট্টিনীর ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধিকার বয়স এগার বৎসর হইলে, রাধিকার শাশুড়ী দই, দুধ, ঘি ও ঘোলেতে পসরা সাজাইয়া বড়াইয়ের সাথে রাধিকাকে মথুরার হাটে বিক্রয় করিতে পাঠান। একদিন বড়াই পথে যাইতে যাইতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। রাধিকাকে দেখিতে না পাইয়া বুড়ী বড়ই ফাঁফরে পড়িল। সে বনের মধ্যে দেখিল, কাহারা গরু চরাইতেছে। বুড়ী রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার নাতিনী রাধাকে দেখিয়াছ? কৃষ্ণই গরু চরাইতেছিলেন, তিনি বড়াইয়ের কাছে রাধার পরিচয় লইলেন। তাহার রূপবর্ণনা শুনিলেন। তার পর বলিলেন, তুমি যদি রাধার সঙ্গে আমার ভাব করাইয়া দিতে পার, তবে তোমাকে আমি রাধার কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারি। কৃষ্ণ বড়াইয়ের হাতে পান সাজিয়া দিলেন এবং রাধিকার জন্য অনেক ফুল ও ফল ভেট পাঠাইলেন এবং দূর হইতে দেখাইয়া

দিলেন, ঐ বকুলতলাতে রাধা বসিয়া আছেন। বুড়ী সেখানে গিয়া খানিক কথাবার্ত্তার পর কৃষ্ণের কথা তাহাকে শুনাইয়া দিলেন এবং কৃষ্ণের ভেট তাহাকে দিলেন।

এ বোল সুণিআঁ নাগরী রাধা
হাণএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাএ॥

* * *

ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের নন্দন গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা॥

বড়াই অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই রাধাকে রাজী করিতে পারিল না, তখন কৃষ্ণ বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, রাধাকে লইয়া বড়াই মথুরার হাটে দই দুধ বিক্রয় করিতে যাইবে এবং দান লইবার ছলে তিনি রাধিকার নিকট অনেক টাকা কড়ি চাহিবেন এবং না দিতে পারিলে একটু জোর জবরদস্তি করিবেন। ইহার নাম 'দানখণ্ড'। এ বইয়ের দানখণ্ড খুব লম্বা। এই দানখণ্ডেই কৃষ্ণ ও রাধার কথাবার্ত্তায় কবি বেশ বাহাদুরী করিয়াছেন। রাধিকা কৃষ্ণকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলেন,—আমি তোর মামী, তোর গুরু লঘু জ্ঞান নাই। আমার বয়স অল্প, আমি তোর অত খোসামুদে কথা বুঝি না—আমার স্বামী আছে, শাশুড়ী আছে, শ্বশুর আছে; আমি বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বউ, আমি ইচ্ছা করিলে কংস রাজাকে বলিয়া দিয়া তোকে খুব জব্দ করিতে পারি। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি তার দই দুধ সব ছড়াইয়া দিলেন এবং তার যত সখী ছিল, তাহাদের সকলের জন্য অনেক টাকা দান চাহিয়া বসিলেন। দান না দাও, আমি যা বলি, তাই কর। রাধিকা বড়াইয়ের কাছে নালিশ করিল। বড়াই কৃষ্ণের দিকে টানিয়াই কথা কহিল,—

সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে॥
এভোকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ।
লোক সুণিলে তোকে হৈব উপহাস॥ ১॥
পথ ছাড়ি দেহ কাহাঞি বিরোধ না কর।
তোর পুণ্যে জাওঁ বিকে মথুরা নগর॥ ধ্রু॥
নাগর শেখর তোহ্মে নামে বনমালী।
তোর যোগ নহোঁ মোএঁ আতিশয় বালী।

আধিক পীড় এ ষর্বে ভুখিল ভষলে ।
তভোঁ নাহি পাএ মধু কমল মুকুলে ॥২॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী ।
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী ॥
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে ।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে ॥৩॥
রতি কথা সখি মুখে না শুনীলোঁ কানে ।
বারেক রাখহ কাহ্নাঞি আহ্মার সমানে ॥
চরণে ধরোঁ তোর দেব নারায়ণ ।
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥৪॥

কৃষ্ণ কোন কথার উত্তর না দিয়া কেবল রাধিকার রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন ও তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কখনও কখনও পুরাণ হইতে পরস্ত্রীগমনের কথা বলিতে লাগিলেন এবং কখনও কখনও 'আমি যে ত্রিদশের নাথ, আমি কত বড় বড় কর্ম্ম করিয়াছি ; আমি তোমার কংস রাজাকে ভয় করি না'—ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন।

একবার রাধা বলিলেন,—

সুণহ (মোর বচন)   নটক টেণ্ডন কাহ্ন
কেহ্নে কর অপমানকে বাটে ।
তোর কি বাড়িতে আছোঁ   তোর কিবা ভাত খাওঁ
ন মানসি কংস রাঅ পাটে ॥

কৃষ্ণ জবাব দিতেছেন,—

হইএ আহ্মে দামোদর   মারিলোঁ অসুর বল
কত দাপ দেখাসসি মোরে ।
মারিবোঁ কংস অসুর   তোর দাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কে বা পরিখাএ তোরে ॥

রাধার জবাব,—

হঅ গরু রাখোআল   বোল আকাশ পাতাল
তা সুণি কে বা পাতিআএ ।
তোহ্মে বাটে মাহাদানী   মোহোঁ আইহন রাণী
বল কৈলেঁ জণাবিবোঁ রাজাএ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

রাধা হে তোর   বলে ভাণ্ড ভাঁগিআঁ
সকল দধি খাইবোঁ আপণ ইছাএ ।

দানখণ্ডে জোর জবরদস্তি করিয়া কৃষ্ণ আপনার অভিলাষ পূরণ করিলেন। আর এক দিন রাধিকাকে নৌকায় চড়াইয়া নদীর মাঝখানে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেন। রাধিকা যখন বুঝিলেন, কৃষ্ণের দশা এইরূপ, তখন তিনি এক দিন রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি আর এ পসরা বহিতে পারি না, বড়াই আমার জন্য একটা মজুর আনিয়া দে। বড়াই কৃষ্ণকে আনিয়া দিল। আবার কৃষ্ণ ও রাধিকার কিছু গালাগালি হইল, কিন্তু রাধিকা কৃষ্ণকে দিয়া ভার বহাইয়া লইলেন। আর এক দিন রাধিকা ভয়ানক রৌদ্রে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গাছতলায় বসিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ কি করেন, তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিয়া তাঁহাকে বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া দিলেন। পুস্তকের যে খণ্ডে এই সকল ব্যাপার আছে, তাহার নাম 'ভারখণ্ড' ও 'ছত্রখণ্ড'। তাহার পর 'বৃন্দাবনখণ্ড'।

এ বার রাধা বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, কেমন করিয়া কৃষ্ণের কাছে যাওয়া যায়। বড়াই বলিল, মথুরাতে পসরা লইয়া চল। শাশুড়ী অমনি আর যাইতে দিবে না; তুমি এক কাজ কর, আমার সখীদের শাশুড়ীদের কাছে যাও। আমার শাশুড়ীর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ক্ষেপাইয়া দাও; বল, আইহনের মা রাধাকে মথুরায় যাইতে দেয় না, তাই কোন গোয়ালিনীর মথুরায় যাওয়া হয় না। তারা বড়লোক, সব করিতে পারে; দই দুধ না বেচিলে তোমাদের সংসার কিসে চলিবে ?—এই কথা শুনিয়া সব বুড়ী গোয়ালিনী রাগিয়া রাধার শাশুড়ীর কাছে বলিল,—

তোহ্মে এবেঁ গোআলত ভৈলা বড় জাতী।
আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ এক মতী॥
আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব।
তোহ্মার ঘরত অন্ন পাণি না খাইব॥
এ বোল সুণিআঁ। ডরে আইহনের মাএ।
প্রণাম করিআঁ বুইল তা সভার পাএ॥
কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর॥

পরদিন সকাল বেলা সব সখীরা একত্র হইয়া বিচিত্র সাজগোজ করিয়া—

দধি দুধ ঘৃত ঘোল সাজিআঁ পসার।
রাধা সঙ্গে চলি জাই হাট মথুরা॥

* * * *

ডাক দিআঁ আনায়িল বড়ায়ি করি সঙ্গে।
তখনে হাসিআঁ বুয়িল সভাক বড়ায়ি।
এবেঁসি নাতিনী সব মনেঁ সুখ পাই॥
নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে।
তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে॥

রাস্তায় যাইতে যাইতে বড়াই বলিতে লাগিল, কানাই এখন বড় ভাল ছেলে হইয়াছে। সে আর বাটদান, হাটদান, ঘাটদান কিছুই চাহে না। কেবল লোকের উপকার করে। যে সব লোক হাটে যায়, তাহাদের ফুল ফল দিয়া সন্তুষ্ট করে এবং সঙ্গে করিয়া যমুনার ধারে পৌছিয়া দেয়। অতএব তোমরা তাহাকে আর ভয় করিও না। সে এখন বড় ভাল লোক হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সব গোয়ালিনীর ইচ্ছা হইল, বৃন্দাবনের ফুল ফল কিছু ভোগ করে—

বৃন্দাবনের ফুলে সন্ধার হইল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥

সময়টা বসন্তকাল। মলয় পবন বহিতেছে, কিন্তু বৃন্দাবনে সব ঋতুই বিরাজ করিতেছেন, সকল ঋতুর ফুলই সেখানে আছে। সম্বৎসরের যত ফল ফুল—সবই বৃন্দাবনে পাওয়া যায়। গোয়ালিনীরা সেই ফুলের লোভে সব বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া গেল। কৃষ্ণ রাধাকে দেখিয়াই বলিলেন,—

শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে।
তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে॥
এক ঠাঁয়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।
ফুল পত্র ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার॥

রাধা বলিলেন,—আমি ত আসিয়াছি, আমার সঙ্গে অনেক সখী আসিয়াছে। তুমি ইহাদিগকে সন্তুষ্ট কর। ইহারা যেন আমার নিন্দা করিতে না পারে।

সামী সাসু দুইহো খরতর।
আর খল সকল নগর॥
সব তোর মোর দোষ চাহে।
তেঁসি মোর মন থীর নহে॥
তোর মনে হেন পড়িহাসে।
ফুল ফলের দিআঁ আশে।
সখিগণ নেহ চারি পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমার মনের কথা টানিয়া বলিয়াছ।

ষোল সহস্র তোর সখিগণ॥
সন্ধার তোষিব আহ্মে মন॥
করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে।
বিলসিবোঁ গোপী সমাজে॥

এই বলিয়া কৃষ্ণ সকল সখীদের কাছে বলিলেন,—এই তোমাদের অভয় দিলাম, তোমরা যত পার ফুল ছেঁড়, ফল খাও। যখন দেখিলেন, ফুল উঁচায় রহিয়াছে, একজন পাড়িবার চেষ্টা করিতেছে—পারিতেছে না, তখন তিনি তাহাকে কোলে লইয়া উঁচু করিয়া ধরিলেন, সে আপন হাতে ফুল

পাড়িয়া ভারী খুসী হইল। গোপীরা যে যেথায় বেড়াইতেছে, কৃষ্ণ তাহাদের কাছে গিয়া তাহাদের সহিত নানা রসরঙ্গ করিতে লাগিলেন।

খণেক গুণিল কাহ্নে
ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে।
আনেক হয়িআঁ তখনে।
বিলসিল গোপীগণে।
যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহ্নে॥

ইহারই নাম রাস। চণ্ডীদাস রাস শব্দটী ব্যবহার করেন নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সে শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন এবং জাঁকালো রাসমণ্ডপ করিয়া সেখানে কৃষ্ণকে কেলি করাইয়াছেন। কৃষ্ণ কায়ব্যূহ রচনা করিয়া গোপীগণের সহিত কেলি করিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ হঠাৎ দেখিলেন, রাধিকা নিকটে নাই। তখন তিনি সব দেহ সংহার করিয়া আবার এক কানাই হইয়া গোপীগণকে ছাড়িয়া রাধিকার কাছে গেলেন। রাধিকা গোপীগণের প্রতি স্নেহ দেখিয়া মান করিয়া বসিয়াছেন। কৃষ্ণ যাইবামাত্র তিনি বলিলেন,—

ভাল উপদেশ দিলোঁ মো তোরে
আপণার মতিদোষে।
এখণে তাহার ফল ভুঞ্জোঁ মোএঁ
আপণে আপণ দোষে॥

* * *

যে পর পুরুষ সমে নেহ করে
তার হএ হেন গতী।
দৈব দোষে কাহ্ন তোহ্মার্ত্ত ভজিলোঁ
বঞ্চিলোঁ আপণ পতী॥
যেহেন বাহির তেহেন ভিতর
সরূপে জাণিলোঁ তোরে॥

* * *

শপথ করিআঁ বুইলোঁ মো তোরে
না জায়িবোঁ তোহোর পাশে।
তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহাঞিঁ
কে নাহিঁ উপহাসে॥

এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণের বড় ভয় হইল। তিনি রাধিকার মান ভঞ্জনের জন্ত বলিতে লাগিলেন,—

যদি কিছু বোল বোলসি তবে
দশন রুচি তোহ্মারে।
হরে ছুরুবার ভয় আহ্মকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিঅঁা লোভে।
পরতেথ তোর নয়ন চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে॥
মদন বাণে দগধ ভৈলোঁ
তোর অকারণ মাণে।
বদন কমল মধুপান দিআঁ
রাখহ মোর পরাণে॥
যবেঁ সর্ত্তো কোপ কয়িলে
তবেঁ মোরে হান নয়ন বাণে।
দৃঢ় ভুজযুগে বন্ধন করিআঁ
অধর দংশ দশনে॥
তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষণ
তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।
এহো বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তেঁ আতি যতনে॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
আধরে কোকনদ রূপে।
মদন বাণে কৃষ্ণক রঙ্গিলেঁ
হএ তোর আনুরূপে॥
এ তোর কুচ শোভে মণি (মাল)
জঘনে নাদ করউ রসনে।
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর
থল কমল চরণে॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণ পল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে॥
পালাউ আহ্মার মদন বিকার
সত্বরে করহ আদেশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড় চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণ পায়ে ধরিলেন, কিন্তু তাহাতেও রাধার মান ভাঙ্গিল না। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন, তোমার সখীরা আমার বৃন্দাবনের সব গাছ ভাঙ্গিয়াছে, ডালপালা ভাঙ্গিয়াছে; আমি তোমার কাছ হইতে ইহার দাম তুলিয়া লইব।

রাধা বলিলেন,—বাঃ, তুমি খোসামদ করিয়া আমাকে এখানে আনিলে, সখীদের বন দেখাইলে; তাহাদের অভয় দিলে—এখন তুমি আমার কাছে দাম চাও? এ তোমার বড় কুচরিত্র!

কৃষ্ণ বলিলেন,—আমি তোমায় আনি নাই। তুমি রাজপথে মথুরায় যাইতেছিলে, অস্তব্যস্ত হইয়া আমার বৃন্দাবনে কেন আসিলে? আর আমার এই ক্ষতি করিলে? আমি অনেক যত্নে বৃন্দাবন তৈরী করিয়াছি, সব নষ্ট করিয়া দিলে! এইরূপ কচাল করিতে করিতে অনেকক্ষণে রাধার মান ভাঙ্গিয়া গেল, রাধাকৃষ্ণের আবার মিলন হইল। দুইজনে নানারূপ কেলি করিতে লাগিলেন।

ইহার পর কালিয়দমনখণ্ড। এ খণ্ডে রাধার কথা নাই। তাহার পর, যমুনাখণ্ডে জলকেলি, তার পর হারখণ্ড, কৃষ্ণ রাধিকার হার ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন, রাধিকা যশোদার কাছে গিয়া নালিশ করিলেন। তাহার পর বাণখণ্ড। মায়ের কাছে নালিশ করায় কৃষ্ণের রাগ হইয়াছে, তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, রাধাকে পায়ে ধরাইব, তবে ছাড়িব। শেষে হইলও তাই। তাহার পর বংশীখণ্ড। কৃষ্ণের বাঁশী রাধা চুরি করিলেন এবং অনেকক্ষণ 'চুরি করি নাই' বলিলেন, তার পর বাঁশী দিয়া

তাঁহার সহিত ভাব করিলেন। তার পর, রাধার বিরহ। কৃষ্ণ এখন বেশ যুৎ পাইয়াছেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর রাধাকে চাই না। রাধিকার বড় অনুতাপ হইল, তিনি বলিলেন,—

শিশুকালে আহ্মে মতি :ভালে।
বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের তাম্বুলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে॥
তোহ্মে য্রাত্রা কর শুভক্ষণে।
বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞির থানে॥
বিনয় বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞি আন মোর থানে॥
দুতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করি মোরে দেউ দরশনে॥

দুতী বলিলেন,—

গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী।
পাছু না গুণিলী আছিদরী॥
বড় রোষ তার মনে জাগে।
এহা শুনী না মারে মোকে বড় ভাগে॥

বড়াইর অনুরোধে অনেক কষ্টে কৃষ্ণ একবার দেখা করিতে রাজী হইলেন। তিনি রাধাকে আসিতে বলিলেন। রাধা আসিলে দুই জনে কেলি করিলেন। তার পর, কৃষ্ণের উরুর উপর মাথা রাখিয়া রাধা ঘুমাইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ এই সুযোগে রাধার মাথাটী নামাইয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া রাধা দেখিলেন, কৃষ্ণ নাই। তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন; বার বার বড়াইকে পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন শেষ হইয়া গেল।

এই বইখানি যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ছাঁচে ঢালা, কিন্তু কৃষ্ণের জীবনসম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সঙ্গে ইহার অনেক তফাৎ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধা বৈকুণ্ঠেই ছিলেন, বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীদামের শাপে তিনি পৃথিবীতে আসেন। কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইলে, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের বিবাহ দিলেন আয়ান ঘোষের নাম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নাই, পুরাণকারেরা এই সকল কথা লিখিয়া কৃষ্ণরাধার প্রেমটা দম্পতী-প্রেমরূপেই দেখাইয়া গিয়াছেন। সর্ব্ব অংশেই বামনাইটা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের বইয়েও সব দিক্ রক্ষা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে বামনাই করিয়া নয়। নারায়ণ যেমন দুইগাছি চুল দিয়া বলিলেন, আমি যখন কৃষ্ণ ও বলরামরূপে অবতার হইব, অমনি দেবতারা সাধ্যসাধনা করিয়া লক্ষ্মীকেও পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন, সেই লক্ষ্মীই রাধা। কবি তাঁহাকে আইহনের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। আইহন নপুংসক। সুতরাং—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

পতি ক্লীব, সুতরাং রাধা অনায়াসেই অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারেন। কবি তাঁহাকে কৃষ্ণের হাতে অর্পণ করিয়া ধর্ম্মটা কোনরূপে বজায় রাখিলেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন পুরাণের মতে নন্দ রাজা করাইয়া দেন। কিন্তু বড়ু বড়াইয়ের হাতে পান ও ফুলের ডালি দিয়া কৃষ্ণই যে মিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহা দেখাইয়াছেন। রাধিকা প্রথম সে পানডালা ফেলিয়া দিলেন, বড়াইকে এক চড়ও মারিলেন। কিন্তু বড়াই তাঁর মায়ের পিসী, সুতরাং বড়াইকে তাড়াইতে পারিলেন না। ক্রমে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পুরাণের মতে কৃষ্ণরাধিকা দেবতা। তাঁহাদের সব কার্য্যই শাস্ত্রসঙ্গত ও দেবতাদের মতই জাঁকালো। বড়ু চণ্ডীদাসের মতে একজন গোয়াল, আর একজন গোয়ালিনী। গোয়ালিনী মথুরার হাটে দই দুধ বিক্রয় করিতে যায়, আর কৃষ্ণ তাহা কাড়িয়া খান আর রাধিকার উপর নানারূপ অবৈধ উৎপীড়ন করেন। দু'জনেরই কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, মতিগতি গোয়ালাদেরই মত। তাঁহারা যে ঝগড়া করেন, সেও গোয়ালাদের মত।

পুরাণের রাস খুব জাঁকালো। কিন্তু রাসের আগেই বস্ত্রহরণ। বড়ু চণ্ডীদাসে রাসের পর কালিয়দমন, যমুনাখণ্ড বা জলকেলী ও বস্ত্রহরণ। পুরাণের রাস এইরূপে আরম্ভ হয়,—গোপীরা সকলে মিলিয়া কৃষ্ণকে পতি পাইবার আশায় পার্ব্বতীর পূজা করে। পার্ব্বতী বর দেন, তিন মাস পরে মধুমাসে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করিবেন। কৃষ্ণ এই তিন মাস ধরিয়া রাসমণ্ডপ খুব করিয়া সাজাইলেন। গোপীরা কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, নিঃশঙ্ক ও কামমোহিত হইয়া রাসমঞ্চে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া রাসমঞ্চ ত্যাগ করিলেন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ রাধিকাকে লইয়া ভ্রমণ করিলেন ও সেখানে বিহার করিলেন। সকলের শেষে মলয়পর্ব্বতের উপরে গিয়া রাধাকে নানারূপ আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাস—রাসই নয়। তিনি রাস শব্দই ব্যবহার করেন নাই। সেটা একটা গয়লা-গয়লানীর ব্যাপার। তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। পুরাণে রাসের মধ্যে মান নাই, কিন্তু চণ্ডীদাসে মান কিছু চড়া। রাধিকা নিজেই বলিলেন, আমার শাশুড়ী দুরন্ত; আমার স্বামী দুরন্ত; তোমার আমার কুৎসা পাইলে লোকে আর কিছু চায় না। সুতরাং তুমি আমার সখীদের আগে ঠাণ্ডা কর, সন্তুষ্ট কর; তাহাদের অভিলাষ পূরণ কর। কৃষ্ণ যখন তাহা করিলেন, তখন রাধিকা ভাবিলেন, ভালরে ভাল, আমি স্বামী ছাড়িয়া কৃষ্ণের কাছে আসিলাম, আর তাহার এই ব্যবহার। সে আমার সাম্‌নে আর পাঁচ জনকে লইয়া কেলি করিতে লাগিল। থাক্, আমি কৃষ্ণকে চাই না। কৃষ্ণ অনেক স্তব স্তুতি করিলেন, পায় ধরিলেন; তাহাতে হইল না। কিন্তু যখন বলিলেন, তোর সখীরা বৃন্দাবন ভাঙ্গিয়াছে, তোকে দাম দিতে হইবে, নহিলে তোকে বাঁধিয়া রাখিব, তখন রাধিকা ঝগড়ায় হারিয়া কৃষ্ণের কথায় রাজী হইলেন।

জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" আরম্ভ হইয়াছে বসন্তবর্ণন লইয়া। তাহার পর গোপীদের সহিত রাস। তাহা দেখিয়া রাধিকার মান। উভয় পক্ষে দূতী পাঠান। কৃষ্ণ রাধিকাকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। রাধিকা অত্যন্ত দুর্ব্বল, আসিতে পারিলেন না। কৃষ্ণই আসিলেন এবং তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়া পায় ধরিয়া, তাঁহার মান ভঞ্জন করিলেন।

জয়দেবের যতগুলি গীত আছে, এই পায়েধরার গীতটীই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী,—

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরং।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানং ॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতং।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতং ॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নং ॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপং।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং ॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশং।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশং ॥
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গপরভাগং।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগং ॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারং ॥

ইহার পর সখীরা আসিয়া রাধিকার মান ভঞ্জন করিয়া দিল ও তাঁহাদের মিলন হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কথা জানিতেন। তাঁহার মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ভাব তিনি ঐ পুরাণ হইতেই লইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মান নাই। মানভঞ্জনও নাই। জয়দেব এ মানভঞ্জনের কথা পাইলেন কোথায়? বলিবে তাঁহার নিজের রচনা। কিন্তু নিজের রচনা হইলেও ইহার মূল ত কোথাও আছে। বোধ হয়, বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ডই তাহার মূল। বড়ু চণ্ডীদাসের বইখানি কৃষ্ণের ইতিহাস। তাহার জন্ম হইতে রাধিকার বিরহ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে; বাকী কতদূর ছিল, জানি না। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাস, মান ও মানভঞ্জন, বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ড মাত্র। দুইএরই আরম্ভ বসন্ত-বর্ণন লইয়া। তাহা হইলে কি মনে হয় না যে, জয়দেব এই মানের কথা বড়ু চণ্ডীদাসের বই হইতে লইয়াছেন? তিনি উচ্চ অঙ্গের কবি, সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; বড়ু একজন ভাষা-কবি। বলিতে গেলে একরকম মেঠো কবি। জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নের এক রত্ন। তিনি রাজকবি। বড়ু চণ্ডীদাস সাধারণ

লোকের জন্য পাঁচালী ও গীত লিখিয়াছেন।" জয়দেব চণ্ডীদাসের গোয়াল-গোয়ালীদের যে সমস্ত ব্যাপার আছে, সব নিঃশব্দে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি একজন বড় কবি, পরের জিনিস ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কেমন করিয়া কাব্য লিখিতে হয়, ঠিক জানেন। তাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও বড়ু চণ্ডীদাস, এই দুইজনকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া গীতগোবিন্দ লিখিয়াছেন। জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী" এই গানটীর সহিত বৃন্দাবনখণ্ডের "যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ দশনরুচি তোহ্মারে" এই গানটী মন দিয়া তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, চণ্ডীদাসের গানটী জয়দেব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কেন না, জয়দেবের অমন অলোকসামান্য গানের পর চণ্ডীদাস ওরূপ গান লিখিতে কখনই সাহস করিবেন না। জয়দেব আরও অনেক জায়গায় চণ্ডীদাসের গানের পাপড়িগুলি লইয়া অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সৃষ্টির পর ওরূপ পাপড়িগুলি কোন কবিই সাহস করিয়া লিখিতে পারেন না।

বসন্ত বাবু বড়ু চণ্ডীদাসের পুথি ছাপাইয়াছেন এবং ছাপাইবার জন্য বেশ খাটিয়াছেন। নিজের মত কোন জায়গায় জাহির করিবার চেষ্টা করেন নাই; অন্ততঃ তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি কিছু করেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের পুথিখানির হাতের লেখা ১৩০০ হইতে ১৪০০ ইংরেজী সনের। এবিষয়ে দুই মত নাই। রাখাল বাবুও স্বীকার করিয়াছেন, ১৪ শতকের লেখা; আরও সকলে স্বীকার করিয়াছেন। ১৪ শতকের শেষার্দ্ধে বাঙ্গালায় কতকটা শান্তি থাকিলেও ১২০০ হইতে ১৩৫০ পর্য্যন্ত এখানে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। আমরা এ পর্য্যন্ত এই ১৫০ বছরের হাতে লেখা সংস্কৃতই হউক বা বাঙ্গালাই হউক, কোন পুথিই আজও পাই নাই। এই ঘোর অরাজকের সময় যে বড়ু চণ্ডীদাস বসিয়া এত বড় একখানা বই লিখিবেন, এ কথা আমি ত বিশ্বাস করিতে পারি না। তাই আমার মনে হয়, বইখানা হিন্দু আমলের রচনা। বোধ হয়, লক্ষ্মণ সেনের সময়েই এই বইখানি রচিত হইয়াছিল। সে সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়া বাঙ্গালায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাই শৈব বল্লাল সেনের ছেলে লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণব হইয়া গেলেন এবং বৈষ্ণব কবি জয়দেবকে খুব আদর করিলেন। কাশ্মীর দেশের একখানি জয়দেবের পুঁথিতে লেখা আছে—লক্ষ্মণ সেনই জয়দেবকে 'কবিরাজ' এই আখ্যা দিয়াছিলেন। জয়দেব যখন গীতগোবিন্দ লেখেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবের বই সকল পড়িতে এবং আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল—সে পুথি বাঙ্গালাতে হউক বা সংস্কৃতেই হউক। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, তিনি কতক লইয়াছেন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে, আর কতক লইয়াছেন, বড়ু চণ্ডীদাসের পুস্তক হইতে। বলিবে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যে সব কথা নাই, বড়ু চণ্ডীদাস সে সব কথা পাইলেন কোথায়? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সে কালে বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণরাধা সম্বন্ধে নানারূপ কথা প্রচলিত ছিল। চণ্ডীদাস সেগুলি সব লইয়াছেন। কারণ, তাঁহার শ্রোতা সাধারণ বাঙ্গালী। সংস্কৃতে বিশেষ বিজ্ঞ নহেন। পুরাণ বামনাই এর দিক্ হইতে তার অনেক ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন, জয়দেবও সংস্কৃতকবির দিক্ হইতে তাহার অনেক ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি পূর্ণমাত্রায় আছে—বড়ু চণ্ডীদাসের পুথিতে।

এ দেশের লোকের সংস্কার যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের পূর্ব্বে রাধার নাম কোথাও পাওয়া যায় না। সে সংস্কারটী ভুল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হালা সপ্তশতীতে রাধার নাম আছে এবং সেখানে কৃষ্ণের নামও আছে। উহার ৮৯ শ্লোকে আছে ;—

"মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।

এতাণং বল্লবীণং অগ্নাণং বি গোরঅং হরসি॥"—গাথাসপ্তশতী ১।৮৯

ইহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা।— মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজং (-চক্ষুরাগঃ) রাধিকায়া অপনয়ন্। এতাসাং বল্লবীনামন্যাসামপি গৌরবং হরসি। সৌভাগ্যগর্ব্বখণ্ডনাৎ।

রাধার চক্ষে গরুর পায়ের ধূলা লাগিয়াছে। কৃষ্ণ ফুঁ দিয়া সেই ধূলা বাহির করিয়া দিলেন। তাহাতে এই সমস্ত গোপী এবং অন্য যে সকল আছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য-গর্ব্ব নষ্ট হইল।

সুতরাং এখানে কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের কথাই বলা হইল ; কতকটা রাসের কথাও বলা হইল। "এই সকল গোপীর" অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণ-রাধার সম্মুখে ছিল ; ইহা হইতে বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ অনেকগুলি গোপী লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় সেখান দিয়া কতকগুলি গরু চলিয়া যায় তাহাতে রাধার চোখে ধূলা পড়ে। কৃষ্ণ আদর করিয়া নিজের মুখে ফুঁ দিয়া সে ধূলা ঝাড়িয়া দেন। তাহাতে 'অন্য গোপীদের' আমি কৃষ্ণের বড় প্রিয়া বলিয়া যে অভিমান ছিল, সে অভিমানটা কাটিয়া যায়। সুতরাং বলিতে হইবে, সেখানে অনেকগুলি গোপী ছিল এবং কৃষ্ণ সকলকে লইয়াই কেলি করিতেছিলেন।

পণ্ডিতেরা বলেন, এ বইখানি ইংরেজী ৬৯ সালের লেখা। সে সময় হইতেই তাহা হইলে কৃষ্ণরাধার প্রেমের কথা চলিয়া আসিতেছিল এবং বোধ হয়, রাসের কথাও চলিয়া আসিতেছিল। এই সকল কথা ক্রমে ১২ শতক পর্য্যন্ত খুব বিস্তার হইয়া পড়ে। বড় চণ্ডীদাস সেগুলিকে জড় করিয়া তাঁহার বই লেখেন এবং বড় চণ্ডীদাসের বই হইতে জয়দেব রাস এবং মানের কথা পান।

এতদিন পর্য্যন্ত আমরা জানিতাম, চণ্ডীদাস নামে একজন কবি ছিলেন। তাঁহার বাড়ী নান্নুরে। নান্নুর বীরভূম জেলায়। তিনি কবি ; বামুনের ছেলে। তিনি বাসুলী দেবীর পূজারী। বাসুলী তাঁহাকে বলিয়া যান, তুমি রামী রজকিনীর সহিত প্রেম কর, নহিলে তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। রজকিনী মন্দিরের পেটিলী ছিল, অর্থাৎ মন্দির ঝাঁট ঝুঁট দিত।

বিদ্যাপতির সাথে চণ্ডীদাসের দেখা হইয়াছিল। দু'জনেই দু'জনার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যখন তাঁহাদের দেখা হয়,তখন চণ্ডীদাসের বয়স বেশী ; বিদ্যাপতির বয়স অল্প। চৌদ্দ শতকের মাঝখান হইতে পনর শতকের মাঝখান পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের সময়। যাঁহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়াছেন, তাঁহারা ইহার মধ্যে অনেক কথাই মিছা বলিয়াছিলেন। নীলরতন বাবু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরস্পরের দেখাশুনার কথা উড়াইয়াই দিয়াছেন। তাঁহার মনের ভাব এই—চণ্ডীদাস ত এ কথা বলেন না, বিদ্যাপতিও এ কথা বলেন না ; বলেন, তাঁহাদের চারি শত বৎসর পরের নরহরি দাস ও বৈষ্ণব দাস। সুতরাং উহাতে বিশেষ আস্থা করিবার কোন কারণ নাই। ভুল বলিবার আরও এক বিশেষ কারণ আছে। চণ্ডীদাস যদি বিদ্যাপতির সহিত দেখা করিতে যান,

তিনি পশ্চিম মুখে যাইবেন এবং বিদ্যাপতি পূর্ব্ব-মুখে আসিবেন। তাহা হইলে গঙ্গাতীরে দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, গঙ্গা নান্নুর হইতে পূবে। সুতরাং ও কথাটা অগ্রাহ্য। নান্নুরে যে চণ্ডীদাসের বাড়ী, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলার বইয়ে সে কথা নাই। নীলরতন বাবু যে চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়াছেন, তাহাতেও সে কথা নাই; আছে, নীলরতনবাবুর "রাগাত্মিক" পদাবলীর মধ্যে। নীলরতন বাবু সেগুলিকে "রাগাত্মিক" বলিয়াছেন, কিন্তু সেগুলিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই।" সেগুলিকে কতদূর প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, আমি জানি না। সেগুলির ভাষা, ভাব-ভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, বড়ই একেলে। সেগুলিকে যদি অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে এদেশে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচলিত আছে, তাহার একটীও টিঁকে না। নান্নুরও টিকে না, রামী রজকিনীও টিঁকে না। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিখানার বয়স ১৩০০ হইতে ১৪০০। না হয় এই ১০০ বছরের শেষা-শেষি হইবে। চণ্ডীদাস ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ পর্য্যন্ত যদি বাঁচিয়া থাকেন, তবে এই পুথি কি তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল; না, ওখানি তিনি নিজে লিখিয়াছিলেন? পূর্ব্বে লেখা ত সম্ভবই নয়, তাঁহার নিজের হাতের লেখা বলিয়াও ত বোধ হয় না। তার পর আর এক কথা, এক চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলার জন্য দু'খানা পুস্তক লিখিবেন কেন? একখানা ছাপিয়াছেন বসন্ত বাবু, আর একখানা ছাপিয়াছেন নীলরতন বাবু। একই বিষয়ের বই, অথচ কোথাও কিছু মেলে না কেন? একখানার ভাষা বড়ই পুরাণ, আর একখানার বড়ই নূতন। একখানাতে চণ্ডীদাস আপনাকে বড়ু চণ্ডীদাস বা শুধু চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, আর একখানায় তিনি নিজেকে দ্বিজ চণ্ডীদাসই বলিয়াছেন—কখনও কখনও শুধু চণ্ডীদাসও আছে। এক জায়গায় কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, দশ বার জায়গায় বড়ু চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন। কিন্তু আসল বড়ু চণ্ডীদাসের বইএর গানের সঙ্গে একটী গানও মেলে না। ইহার অর্থ কি? চণ্ডীদাস দু'জন না হইলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাগিণীগুলি সব পুরাণ, তাহার অনেকগুলি "বৌদ্ধগান ও দোহায়" আছে। আবার অনেকগুলি জয়দেবেও আছে। দ্বিজ-চণ্ডীদাসের রাগরাগিণীগুলি প্রায়ই নূতন। দু'চারটী যে পুরাণ নাই, তাহা নহে; কতকগুলি আবার বড়ই বেশী নূতন। ইহারই বা অর্থ কি? দুই জন চণ্ডীদাস স্বীকার না করিলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। ভাবার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলেও দু'জন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এক চণ্ডীদাসকে ভাঙ্গিয়া দুই করিতে বাঙ্গালী কি রাজী হইবেন? বড়ু চণ্ডীদাস বলিতেছেন, আমার নাম অনন্ত, দ্বিজ চণ্ডীদাস তাঁহার ৭৬৩ কৃষ্ণলীলার পদে এক জায়গায়ও অনন্তের নাম করেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাস আবার কোথাও রামী রজকিনীর নাম করেন নাই। পদ দু'জনারই; দু'জনেই গান লিখিয়াছেন। একজন কৃষ্ণলীলার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কতদূর লিখিয়াছেন, বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার জন্মখণ্ডে ও কালিয়দমনখণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কথা নাই। কিন্তু সে প্রেম ছাড়া নীলরতন বাবুর একটী পদও নাই। বড়ু চণ্ডীদাস গানে গানে কৃষ্ণের সব কথাই লিখিয়াছেন। গানের মধ্যে তিনি যে পূতনাবধ করিয়াছিলেন, যমলার্জ্জুন বধ করিয়াছিলেন, শকটাসুর বধ করিয়াছিলেন—সে সব কথা আছে। তিনি যেন গান

সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণের একটী ইতিহাস লিখিয়াছেন। নীলরতন বাবুর বইখানি কতকটা কীর্ত্তনের ছাঁচে ঢালা। তাঁহার চণ্ডীদাস ইতিহাসের কথা বলেন না। কেবল প্রেম, আর কেবল রাধা। এ ভেদ হইবার কারণও বোধ হয়, চণ্ডীদাস দুই জন। একজনের সময় এধরণের কীর্ত্তন আরম্ভ হয় নাই। আর একজনের সময় কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কিছুদিন পরে জীব গোস্বামী "উজ্জ্বল-নীলমণি" নামে একখানি অলঙ্কারের বই লেখেন, সেই সময় হইতেই রাগ, রস ভাব লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। বড়ু চণ্ডীদাস ইহার অনেক আগে। তাঁহার পুঁথিতে রাগ, রস, ভাব লইয়া গান বা পদ সাজাইবার কোন চেষ্টা নাই। যে সব চণ্ডীদাসের পদ নীলরতন বাবু ছাপাইয়াছেন, তাহাতে কতক কতক সে ভাবে সাজাইবার ব্যবস্থা ছিল। নীলরতন বাবু কিন্তু নূতন কীর্ত্তনের ধরণে সেগুলি সাজাইয়াছেন। রসাস্বাদনের পক্ষে বেশ হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের পক্ষে তাহাতে, একটু মন্দ হইয়াছে। এ চণ্ডীদাসের সময়টা উজ্জ্বল-নীলমণির আগে হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে একটু কষ্ট পাইতে হয়। তিনি যে ভাবে পুথিগুলি পাইয়াছিলেন, সে ভাবে ছাপাইলে বোধ হয়, ইতিহাসকারের পক্ষে একটু সুবিধা হইত।

যদি চণ্ডীদাস দুই হন, তাহা হইলে দু'জনের এক জায়গায় মিল আছে। দু'জনেই বাসুলী দেবীর ভক্ত। বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীকে আয়ী বলিয়াছেন। আয়ী শব্দে তিনি কি বুঝিতেন, জানি না, উহা বোধ হয়, "আর্য্যা" শব্দের অপভ্রংশ। অনেক জায়গায়, মাকে আয়ী বলে। রাজপুতনায় আয়ীপন্থ বলিয়া এক ধর্ম্ম আছে। মালবের স্বাধীন মুসলমান রাজারা যখন মাণ্ডুতে রাজধানী করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভিখাডাবির ঘরে একটী ছোট সুন্দর মেয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহাকে সকলে আয়ী বলিয়া ডাকিত। আয়ী মানে মা। তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহার নাম আয়ীপন্থ। বাঙ্গলায় আয়ী বলিতে দিদিমা বুঝায়। অনেক জায়গায় প্রপিতামহীও বুঝায়। চণ্ডীদাস বাসুলীকে কি বলিতেন, জানি না। তিনি আপনাকে বাসুলীর গণ বলিয়াছেন, বাসুলীর গতি বলিয়াছেন, গতি শব্দের অর্থ চেলা। বৌদ্ধদের মধ্যে একথাটা খুব চলিত এবং এখনও চলে। তিনি আরও বলিয়াছেন, তিনি বাসুলীর বরে এই বই লিখিতেছেন। তাঁহার ভণিতার পর গানে আর কৃষ্ণরাধার কথা শুনা যায় না। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে ভণিতার পরও চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে উপদেশ দেন। তিনি আয়ী, গতি বা গণ, এই সব শব্দ ব্যবহার করেন না। কিন্তু বাসুলীর নাম স্থানে স্থানে করিয়া থাকেন, কিন্তু বড় বেশী নয়। এক বাসুলীর চেলা হইলেও দুইজনের মধ্যে বেশ একটু তফাৎ আছে।

এখন দেখিতে হইবে বাসুলী কে? এতদিন লোকের সংস্কার ছিল, বাসুলী ও বিশালাক্ষী এক। তিনি নিত্যাদেবীর সহচরী। নিত্যাষোড়শী নামে এক দেবী আছেন বৌদ্ধদের। তাঁহার ষোলজন সহচরী ছিল। ষোল জন সহচরী-সুদ্ধ নিত্যার মন্দির বাঁকুড়া বা বীরভূম জেলায় আছে। বাসুলী তাঁহার এক সহচরী। কিন্তু তিনি মানুষী, কি দেবী, বুঝা গেল না। তিনি যদি নিত্যার আদেশে চণ্ডীদাসকে একটী চড় মারিয়া থাকেন, তবে তিনি মানুষী। সে কালে বড় বড় মন্দিরে দেবদাসী থাকিত। বাসুলী তাহাও হইতে পারেন। তিনি বিশালাক্ষী নহেন। ধর্ম্মপূজার

বিধিতে ধর্ম্ম ঠাকুরের যত আবরণ-দেবতা আছেন, তাহার মধ্যে একজন আছেন, বিশ্বালাক্ষী। একজন আছেন, বাসুলী। সুতরাং দু'জনে এক হইতে পারেন না। বাসুলীর নমস্কারে তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী বলা হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী আমাদের একজন পুরাণ দেবতা। তিনি ব্রাহ্মণের দেবতা নন। বৌদ্ধদের অঞ্চল হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে সকল জাতিই পূজা করিতে পারে। প্রতিমায়, পটে, খোলায় থাবরায় তাঁহার পূজা হয়। তিনি কিন্তু খুব প্রাচীন দেবতা। ঢাকায় টাউন হলের পাশে এক চণ্ডী দেবীর মূর্ত্তি আছে। উহা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের তৃতীয় বৎসরে খোদাই করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধিকা চণ্ডীর পূজা করিয়াছেন। বড়ু অনন্ত এই চণ্ডীর চেলা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চণ্ডীদাস হইয়াছে, মনে হয়। এক একবার মনে হয়, যেন এই চণ্ডীর দাসেরা সকলেই গান করিয়া বেড়াইতেন এবং সকলেই চণ্ডীদাস বলিত। তাহা না বলিলে বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডিদাস, আদি চণ্ডীদাস—এ সকলের অর্থ হয় না। তাই এক একবার মনে হয়, চণ্ডীর সেবক যাঁরা গান করিয়া বেড়াইতেন, তাঁরাই চণ্ডীদাস হইতেন। সুতরাং অনেক চণ্ডীদাস থাকিতে পারেন। তাহা হইলে কিন্তু সব দিক্ সামঞ্জস্য হয়। বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের আগে, দ্বিজ চণ্ডীদাস ১৪।১৫ শতকে; তার পরও হয় ত কেহ চণ্ডীদাস ছিলেন। একজন আবার আদি চণ্ডীদাস ছিলেন, অর্থাৎ তিনিই প্রথম চণ্ডীর দাস হইয়া গান করিতে বাহির হন। কিন্তু এক চণ্ডীদাসেই রক্ষা নাই, মেলা চণ্ডীদাস হইলে না জানি কি হইবে! এইরূপ নানা চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে আর একটী বিষয়েরও সামঞ্জস্য হয়। ঐ যে গৌড়ের বাদশাহের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া একজন চণ্ডীদাস মারা যান, তাঁহারও একটা কিনারা হইতে পারে।

সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা পাতা পাওয়া যায়। তাহাতে লেখা আছে, চণ্ডীদাস একদিন গৌড়ের বাদশাহের বাড়ী কীর্ত্তন করিতে যান। তাঁহার কীর্ত্তনে সকলেই মুগ্ধ হয়। বাদশাহের এক বেগম এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি গান শুনিবার জন্য চণ্ডীদাসের বাসায় উপস্থিত হন এবং তাঁহার হাবভাবে বোধ হয়, যেন তিনি চণ্ডীদাসের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। বাদশাহ তাঁহাকে বারম্বার নিষেধ করেন, তুমি ওখানে যাইও না। কিন্তু বেগম সাহেব তাহা না শুনিয়া পুনরায় চণ্ডীদাসের কাছে গেলেন। বাদশাহ ইহাতে অত্যন্ত রাগিয়া হুকুম দিলেন, চণ্ডীদাসকে হাতীর পিঠে বাঁধিয়া, হাতী খুব জোরে চালাইয়া দাও। এইরূপে তাহার চিত্র-বধ হউক। ঠিক সেইরূপই করা হইল। হাতীকে খুব জোরে চালান লইল। হাতীর পিঠে কাছি দিয়া চণ্ডীদাস খুব শক্তরূপে বাঁধা ছিলেন। হাতী চলায় কাছির ঘেঁষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল ও রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইল। তিনি মরিয়া গেলেন। হাতীকে অনেক দূর জোরে দৌড় করাইয়া ফিরিয়া আসিয়া মৃত দেহ বাদশাহের সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইল। রামী রজকিনী নিকটে দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছিল। এমন সময় বাদশাহের বেগম আসিয়া হঠাৎ চণ্ডীদাসের বুকের উপর পড়িলেন এবং দেহত্যাগ করিলেন। রামী রজকিনী বেগম সাহেবকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী মনে করিয়া আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিল।

এ কথা সত্য কি না, জানা যায় না। সত্য হইলে এক জন চণ্ডীদাস যে বাঙ্গালার স্বাধীন

মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালে খুব বড় কীর্ত্তনীয়া ছিলেন, সে কথা বিশ্বাস করিতে হয় এবং এ বাদশাহ কে ছিলেন, তাহারও সন্ধান করিতে হয়। প্রথম ইলিয়াশসাহী বাদশাহেরা খাঁটী মুসলমান ছিলেন। তাঁহারা যে কীর্ত্তন শুনিবেন, এ কথা মনে হয় না। রাজা গণেশের বংশধরেরা মুসলমান হইলেও তাঁহাদের কীর্ত্তন শুনার প্রবৃত্তি থাকিতে পারে। রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান হইয়া জেলাল উদ্দিন নাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পৌত্র মহম্মদ শা কয়েক বৎসর বাজালায় বাদসাহী করেন। ইহাদের কাহারও রাণী বা বেগম কীর্ত্তন শুনিয়া ভুলিতে পারেন। তাহা হইলে চৌদ্দ শতকের শেষ অর্দ্ধেক হইতে ১৫ শতকের প্রথম অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত একজন কীর্ত্তনীয়া চণ্ডীদাস ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে দ্বিজ চণ্ডীদাস এই সময়ের লোক বলিয়া মনে করিতে হয়। তিনি রামী রজকিনীকে আপনার নির্ব্বাণ লাভের সঙ্গিনী করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি নীচ সংসর্গে মিশিয়াছি।

তাহা হইলে মোট মীমাংসা হইল, বড়ু চণ্ডীদাস লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তাঁহার বই লেখেন এবং জয়দেব তাঁহারই বই হইতে অনেক ভাব ও কথা লইয়াছিলেন। আর দ্বিজ চণ্ডীদাস কেবল গান করিয়া বেড়াইতেন, খেয়ালমত গান বাঁধিতেন—রীতিমত কোন বই লিখিয়া যান নাই।

এখন ভাষা দেখিতে হইবে। কবি কৃত্তিবাস ১৪০০ হইতে ১৫৫০ এর মাঝখানে রামায়ণ লেখেন। জয়গোপালের হস্ত হইতে সে রামায়ণখানি রক্ষা করিয়া প্রাচীন হাতে লেখা পুথি দেখিয়া হীরেন্দ্রবাবু তাহার অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ছাপাইয়াছেন। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতও এই সময়ের লেখা। এই মহাভারত, রামায়ণ ও চণ্ডীদাসের গানের ভাষা আপাতদৃষ্টিতে এক বলিয়াই বোধ হয়। যা ভেদ দেশভেদে। চণ্ডীদাসের বাড়ী পশ্চিমবঙ্গে, কৃত্তিবাসের বাড়ী শান্তিপুরের নিকট, বিজয় পণ্ডিতের বাড়ী ফরিদপুর বা বরিশালে। দেশভেদে যেটুকু ভেদ হয়, ততটুকু ভেদই আছে। 'আপাতদৃষ্টিতে' শব্দ ব্যবহার করিলাম, কারণ, এই সকল পুস্তকের দুরূহ পদসমূহের সূচি নির্ম্মাণ করিয়া বা ইহাদের ব্যাকরণ-ঘটিত ব্যাপারের তুলনা করিয়া দেখি নাই, দেখিবার সময়ও নাই। যদি কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন, অত্যন্ত বাধিত হইব এবং তাহার ফল যদি চণ্ডীদাসকে অধিক প্রাচীন বা অধিক নবীন করিয়া তুলে, তাহতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না।

বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষা কিন্তু বৌদ্ধগান ও দোহায় ভাষার মতই। তবে দেশভেদে ও কালভেদে যতটুকু তফাৎ হইবার, তাহা হইয়াছে। তিনি ঐ সকল দোহা ও গান হইতে যে কেবল অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে, অনেক কথাও লইয়াছেন।' তাহা ধরিয়া দেওয়া বিশেষ কঠিন নহে। বৌদ্ধগানের মধ্যে চাটিলের নামটী সকলের চেয়ে নূতন। কারণ, চাটিলের নাম আমরা আর কোথাও পাই নাই। সিদ্ধপুরুষদের নামের ফর্দ্দেও পাই নাই। তেঙ্গুরের ক্যাটেলগেও পাই নাই। বর্ণনরত্নাকরেও পাই নাই। তাঁহার গানের সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষার বেশ মিল আছে। কাহ্নুপাদের ভাষার সঙ্গেও অনেকটা মিল আছে। তবে কাহ্নুপাদের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, চাটিলের বাড়ী বোধ হয়, পশ্চিমবঙ্গেই হইবে। সুতরাং বড়ু ও দ্বিজ চণ্ডীদাস দু'জন হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিতেছিলাম, তাহাতে সহজিয়া ভাবের একেবারেই উল্লেখ করি নাই—

কেবল কৃষ্ণলীলার কথাই বলিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণলীলাটী যে হিন্দুর সহজিয়া ভাব, সে কথাটী আমি অনেক জায়গায় বলিয়াছি। সহজিয়ারা যে জিনিষটী নিজের দেহের উপর লইয়া আসে, হিন্দুরা সেটা কৃষ্ণের উপর অর্পণ করেন। হিন্দুরা দেবতা মানেন। বৌদ্ধেরা মানেন না। তাঁহারা গুরু মানেন এবং গুরু হইবার চেষ্টা করেন। হিন্দুরা দেবতার সালোক্য ও সাযুজ্য পাইতে চান। দেবতা হইতে চানও না, পারেনও না। সুতরাং সহজিয়ারা যে মহাসুখ আপনি উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, হিন্দুরা সেই মহাসুখে কৃষ্ণরাধাকে মগ্ন দেখিয়াই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। আপনাকে সে সুখের অধিকারী বলিয়াই মনে করেন না শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা সিংহাসনে নিত্য বিহার করিতেছেন। আট জন নিত্যসখী তাঁহাদের বিহারের উপকরণ জোগাইতেছে। আমরা সেই সখীদের সখী হইয়া কৃষ্ণরাধার মহাসুখের প্রতিভাস দেখিতে পাইব এবং তাঁহাদের সেবায় রত থাকিব অর্থাৎ নিত্যসখীদের নিকট উপকরণ যোগাইয়া দিব, এই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়াদিগের উদ্দেশ্য আর একরূপ। তাঁহারা নিজেই নিরাত্মা দেবীর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন এবং অনন্তকাল তাঁহার সহিত মিশিয়া এক হইয়া থাকিবেন; দুই একেবারেই থাকিবে না। বৌদ্ধদিগের অধিকাংশ চর্য্যাপদেরই উদ্দেশ্য এই। বড় চণ্ডীদাস ও জয়দেব কৃষ্ণ রাধিকার উপর সেই জিনিষটী অর্পণ করিয়া হিন্দুদিগকে সহজিয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। বড় চণ্ডীদাসের বাড়ী কোথায় ছিল, জানা যায় না, কিন্তু জয়দেবের বাড়ী কেন্দুলী ছিল। কেন্দুলী অজয় নদীর ধারে। সেনপাহাড়ী অর্থাৎ সেন রাজাদিগের প্রাচীন রাজধানী হইতে বেশী দূরে নয়। সহজিয়ারা আজিও দলে দলে পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে জয়দেবের ঘাটে স্নান করিতে আসে এবং প্রতি বৎসর ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, উনিও ত আমাদের গুরু। আগে বোধ হয়, শুদ্ধ হিন্দু সহজিয়ারাই কেন্দুলীতে আসিত। বৌদ্ধেরা আসিত না। কিন্তু বৌদ্ধেরা এখন আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; মনে করে, আমরাও হিন্দু এবং কেন্দুলীতে বছর বছর আসা তাহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু একটু বেশী পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেই তাহারা বলে, আমরা দেবতা মানি না? আমরা চৈতন্যকে মহাপুরুষ বলিয়া মানি, কৃষ্ণকেও মহাপুরুষ বলিয়া মানি। আমাদের দেবতা, আমাদের সাধন ভজন এই দেহে। তাহারা কেন্দুলীতেই যায়, চৈতন্যসম্প্রদায়ের আর কোন তীর্থস্থানে বড় একটা যায় না। কিন্তু হিন্দু সহজিয়ারা সকলেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করে। অনেকে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে শেষে খাঁটি সহজিয়া হইয়া যায়। দ্বিজ চণ্ডীদাস বোধ হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন ছাড়িয়া শেষে পাকা সহজিয়া হইয়া গিয়াছিলেন। কারণ, নীলরতন বাবু কৃষ্ণলীলার ৭৬৩ পদের পর রাগরাগিণীশূন্য যে কতকগুলি "রাগাত্মিক" পদ দিয়াছেন, তাহা পুরা সহজিয়া। সেই জন্যই বোধ হয়, গৌড়ের বাদশাহের বেগম সাহেব—হয় ত তিনি কোন সহজিয়া ঘরেরই মেয়ে হইবেন—দ্বিজ চণ্ডীদাসের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহাকাল

নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি—১৪৭ পৃষ্ঠা।

নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ-মূর্ত্তি *

কয়েক মাস পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে যে তিনটি পিত্তল-মূর্ত্তি আনিয়া পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষা করিবার জন্য উপহার দিয়াছেন, তন্মধ্যে অদ্যকার আলোচ্য মূর্ত্তিটিই উল্লেখযোগ্য। এ তিনটির এইটিকেই প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়; মূর্ত্তিবিদ্যা হিসাবে ইহার মূল্যও যথেষ্ট। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোনটিই তেমন প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। এগুলি আধুনিক।

মূর্ত্তিটির স্বরূপ-নির্ণয় সম্বন্ধে,কেহ কেহ নাকি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি মূর্ত্তি-

মূর্ত্তিটির স্বরূপ-নির্ণয়

বিদ্যা-সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে ইহাকে মহাকাল ভিন্ন অন্য কোন মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিতে পারি নাই। এই মূর্ত্তিটি এত সাধারণ শ্রেণীর মহাকাল যে, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার তিব্বতীয় অভিধানে মহাকাল বুঝাইতে,এই শ্রেণীর মহাকালের বর্ণনাযুক্ত সংজ্ঞাটি ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ—

গোন্‌পো ছক্ ঠুক্ পা (Mgon-po phyag-drug-pa)

Mgon-po = নাথ; phyag-drugpa = ছয় হাতযুক্ত।

জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, শাস্ত্রী মহাশয় আগামী এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে তাঁহার প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন না। ততদিন অপেক্ষা না করিয়া, এ সম্বন্ধে একটু-আধটু আলোচনা করা অবৈধ নহে বিবেচনা করিয়া এবং আপনাদের চিত্রশালাধ্যক্ষ-হিসাবে আমার মন্তব্যটি পূর্ব্বেই প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিলাম। আমিও তাঁহার মতামত জানিবার জন্য সোৎসুক অপেক্ষা করিব।

মূর্ত্তিটির স্বরূপ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহার লক্ষণ-গুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক।

মূর্ত্তিটির লক্ষণ

ইহা ষড়্‌ভুজ, দ্বিপদ এবং একশীর্ষ; গণেশমূর্ত্তির উপর দণ্ডায়মান, ত্রিনয়ন, বৃত্তোগ্রলোচন, ঊর্দ্ধকেশ, সর্পভূষণ, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত, আগামগুলাবৃত, দংষ্ট্রাকরাল, শ্মশ্রু-গুম্ফ-শোভিত। ছয়টি হস্তে যে প্রহরণ বা লাঞ্ছনগুলি বিদ্যমান, তাহাদের যথাক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।—

দক্ষিণহস্ত—ডমরু, অঙ্কুশ, কর্ত্তরী; বামহস্ত—নরকপালযুক্ত ত্রিশূল, পাশ, নরকপাল।

মূর্ত্তিটির গলদেশে হৃদয়াকৃতি নরমুণ্ডমালা লম্বমান, দক্ষিণ জানুর উপর ব্যাঘ্রমস্তক বিদ্যমান; এই ব্যাঘ্রের চর্ম্মই মহাকাল পরিধান করিয়া আছেন; আগামগুলের নিম্নে ৫০টি মুণ্ডে গঠিত মাল্য শোভমান। মস্তকে পঞ্চ-কপাল ও 'পঞ্চশীর্ষ' মুকুট রহিয়াছে। শেষোক্ত দুইটি লাঞ্ছন

---

* ১৩২১।৩০শে পৌষ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

মূর্ত্তিটির স্বরূপ-দ্যোতক হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার কথা ক্রমশঃ বলিব। পদগ্রন্থি ও মণিবন্ধে সর্প, নূপুর ও সর্পবলয়, গলদেশে সর্পহার। পদদেশে বিরাজমান গণেশমূর্ত্তির দুই হস্ত— দক্ষিণ হস্ত অভয়মুদ্রাযুক্ত, বামহস্তে লড্ডুক রহিয়াছে; এ মূর্ত্তির মুকুটও পঞ্চশীর্ষযুক্ত।

একখানি আধুনিক নেপালী পুথিতে মহাকালের এক বর্ণনা পাইয়াছি; ইহার সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটির বিশেষ মিল আছে। পুথিটির নাম ধর্ম্মকোষসংগ্রহ। ইহার কথা ক্রমশঃ বলিব। বর্ণনাটি অতি সরল সংস্কৃতে লিখিত; ইহা এই—"এক-বক্ত্র-নীলাঞ্জনবর্ণ-ভৃকুটিকরালঃ বর্ত্তুলস্ত্রিনয়নঃ। পিঙ্গলনয়নয়োর্দ্ধকেশঃ ললৎজিহ্ব দংষ্ট্রাকরালঃ ব্যাত্তাননঃ রক্তশ্মশ্রুল নবনাগালঙ্কৃতসর্ব্বাঙ্গঃ মুণ্ডমালাবিভূষিতঃ চতুর্ভুজঃ প্রথমসব্যহস্তে ন্যস্তাধঃপ্রদেশঃ করতিং দ্বিতীয়েনাকুঞ্চিতেন ডমরুং বাদয়ন্ মারান্ ত্রাসয়ন্। প্রথমবামে করোটকং পঞ্চামিষপূর্ণং। দ্বিতীয়েন ত্রিমুণ্ডযুক্তখট্টাঙ্গং দধানঃ বেত্তালোপরিপ্রত্যালীঢ়ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরঃ তস্য নামো মহাকাল মহাবীরঃ। মহাস্তং কলয়তি ইতি মহাকালঃ। মহাংশ্চাসৌ কালো বা। কারণং মারদর্পসংহরণার্থং নীলবর্ণেনাক্ষোভ্যেন সৃষ্টো যো মহাকালঃ॥ মহান্ কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ যস্য সঃ মহাকালঃ। মহাস্তং কালং কলয়তি চ চতুর্যুগাদি কালসময়ং ব্র ——— সময়ং কলয়তি বিচারয়তি ইতি মহাকালঃ। মারাদিদুষ্টজনত্রাসনার্থং বুদ্ধশাসনরক্ষণে ভয়ঙ্করমূর্ত্তিঃ ত্রিভুবনস্থান্ বুদ্ধদ্রোহিণঃ ত্রাসয়িতুম্ বর্ত্তুলভীমত্রিনয়নঃ এবং সর্ব্বাঙ্গাবয়বানি ভীমানি যস্য ত্রাসনার্থং পালনার্থং যৌসৌ অক্ষোভ্যঃ যস্য মহাকারুণিকঃ। অথচ যে যে বুদ্ধ-নিন্দকাস্তান্ অনেন ছেৎস্যামি ইতি করতিং আদধানঃ।" ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধনিন্দকদের রক্তপান করিবার জন্য হস্তে করোটক; শব্দদ্বারা বুদ্ধ-নিন্দকদের বধির করেন বলিয়া হস্তে ডমরু।*

ধর্ম্মকোষসংগ্রহ ও মহাকাল বর্ণনা

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাটি স্বয়ম্ভুপুরাণ হইতে গৃহীত। নেপালী পুথিতে যেমন মহাকালকে বুদ্ধধর্ম্ম বা বুদ্ধশাসনরক্ষয়িতা অভিহিত করা হইয়াছে, তিব্বতীয় সাধনা-গ্রন্থেও এইরূপ বলা হইয়াছে। সে কথা ক্রমশঃ বলিব।

নেপালী পুথি ও তিব্বতীয় সাধনা-গ্রন্থ

শিল্পের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে মূর্ত্তিটির মধ্যে বিশেষ কিছুই নাই; ইহাতে বিভিন্ন মুদ্রাও তেমন দৃষ্ট হয় না। যে যে হস্তে ডমরু, অঙ্কুশ, ত্রিশূল ও পাশ রহিয়াছে, তাহার সকলগুলিই "কর্ত্তরীহস্তমুদ্রা"-জ্ঞাপক। যে হস্তে অঙ্কুশ রহিয়াছে, তাহার তর্জ্জনীটি আর একটু বক্র হইলে সিংহকর্ণ মুদ্রা হইয়া যাইত। যে হস্তে কর্ত্তরী, তাহা "কটকহস্তমুদ্রা"-দ্যোতক; যে হস্তে কপাল রহিয়াছে, তাহা দেখিতে বিপর্য্যস্ত কর্ত্তরী-মুদ্রার ন্যায়; ইহার নাম "গ্রহণহস্ত"। দাক্ষিণাত্যে পুরোহিতদিগকে এই সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি, ইহার পরিভাষা জ্ঞাত নহি। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার South-Indian Bronzes পুস্তকের L চিত্রে এইরূপ

শিল্পের দিক্ হইতে মূর্ত্তিটির পরিচয়

* আদর্শ পুথির বানান ও পাঠের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।—লেখক।

হস্তকে "গলীন হস্ত" বলিয়াছেন, তিনি স্বয়ং এই পরিভাষায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; ইহা "গলীন হস্ত" নামের পার্শ্বস্থিত জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয়। কোন শিল্প-শাস্ত্রে যে এ নাম পাইয়াছেন, তাহারও তিনি উল্লেখ করেন নাই।

মহাকালের পদস্থিত গণেশমূর্ত্তির দক্ষিণহস্ত অভয়মুদ্রা-জ্ঞাপক। এই হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় যে সম্মুখে হেলিয়া আসিয়াছে, তাহা ভারতীয় শিল্পরীত্যনুসারে; বামহস্তটি কোন মুদ্রাজ্ঞাপক নহে; শিল্পশাস্ত্রীয় গ্রহণমুদ্রাজ্ঞাপক যে চিরন্তন রীতি রহিয়াছে, ইহা তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র; হস্তটি স্বাভাবিক ধরিবার রীতিতে গঠিত।

মহাকালের পদস্থিত গণেশমূর্ত্তি

মূর্ত্তিটির দাঁড়াইবার ভঙ্গিটি উল্লেখযোগ্য; দুইটি পদদেশের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। এ মুদ্রার নাম প্রত্যালীঢ় মুদ্রা। দক্ষিণ পদ বাম পদ অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত, দক্ষিণ জানুও এই কারণে বাম জানু অপেক্ষা উন্নীত। কিন্তু তাহা বলিয়া দেহযষ্টিতে কোন "ভঙ্গ" ভাব দেখা যায় না। মুখটি বামে ঈষৎ হেলিয়াছে।

মূর্ত্তিটির দাঁড়াইবার ভঙ্গি

মূর্ত্তিটি তেমন অলঙ্কার-ভূষিত নহে; অলঙ্কারের মধ্যে সর্প, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হৃদয়াকৃতি মুণ্ডমালা, পঞ্চনরকপাল ও পঞ্চরত্নযুক্ত শিরোবন্ধ। সর্পই কর্ণকুণ্ডলরূপে বিরাজমান, সাধারণতঃ দৃষ্ট কটিবন্ধও নাই। পঞ্চমুণ্ড পঞ্চধ্যানী বুদ্ধনির্দ্দেশক ও পঞ্চশীর্ষ বা পঞ্চরত্নযুক্ত মুকুটটি অক্ষোভ্যের মুদ্রাজ্ঞাপক। প্রায়শঃ এইরূপ মূর্ত্তির মস্তকে অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এ হিসাবে ইহার একটু বিশিষ্টতা আছে। মূর্ত্তিটির ঊর্দ্ধকেশাবলি বেশ মনোজ্ঞ; ইহারা জ্বালাদ্যোতক। হস্তে ধৃত প্রহরণগুলির মধ্যে অল্পবিস্তর বৈচিত্র্য আছে। দক্ষিণ হস্তে ধৃত কর্ত্তরী তিব্বতীয় আদর্শে কল্পিত। ডমরুটির ধরিবার দণ্ড দুইটি। কোন কোন ডমরু সর্পজড়িত থাকে। ইহাতে তাহা নাই। ত্রিশূলের দণ্ডে সর্প জড়াইয়া আছে।

মূর্ত্তিটির অলঙ্কার ও প্রহরণ

এ মূর্ত্তিটির আর একটি বৈচিত্র্য এই যে, গণেশমূর্ত্তিটি শয়ান নহে। তিব্বতীয় অনেক মূর্ত্তিতেই শয়ান অবস্থায় গণেশ দৃষ্ট হয়। শুদ্ধ গণেশ নহে, তাঁহার শক্তিও তাঁহার সহিত শয়ানা থাকেন। তেঞ্জুর তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ড হইতে শবরিকৃত গুহ্যসাধনা হইতে মহাকালের চক্র বা সাধনা বর্ণনা করিবার সময় ইহার উল্লেখ করিব।

গণেশমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিশিষ্টতা

আরও একটি কথা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি এবং এ হিসাবে মূর্ত্তিটিকে বৈচিত্র্য-যুক্ত বলিতে হইবে। সাধারণতঃ মহাকালমূর্ত্তি সশক্তি দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তিটির সম্মুখদেশে মুখোমুখী আলিঙ্গনবদ্ধা শক্তির মূর্ত্তি মহাকালের সহিত দৃষ্ট হয়; এ স্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সশক্তি মহাকাল, শক্তিহীন মহাকাল অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর। সশক্তি মহাকালের যে সাধন করিতে হয়, তাহা 'গুহ্যসাধনা' বর্ণনা করিবার সময় বলিব। মহাকালের শক্তির নাম গুহ্যজ্ঞানা।

শক্তি হিসাবে বিশিষ্টতা

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন মূর্ত্তিভেদের নিয়মানুসারে আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটি দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ রাজসিক শ্রেণীর অন্তর্গত। আমি সাত্ত্বিক শ্রেণীর মহাকাল-মূর্ত্তি দেখি নাই, কিন্তু থাকা অসম্ভব নহে। ইহার রাজসী ও তামসী মূর্ত্তিরই প্রচলন অধিক। ঠিক শিল্পশাস্ত্রের নিয়মানুসারে ইহাকে রাজসিক মূর্ত্তিও বলা চলে না। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই; কেন না, শিল্পী কোন কালেই শিল্পশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া আপন মূর্ত্তি কল্পনা করেন নাই। ইহা আমি পেশোয়ার, কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধরামেশ্বর পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি। ইহাতে এক প্রকার ভালই হইয়াছে; কেন না, শাস্ত্রের এই নিগড়বদ্ধ নিয়ম ব্যত্যয় শিল্পে সজীবতা ও প্রাণস্পন্দনের সূচনা করিয়া শুদ্ধ যে দেশের শিল্পধারাকে রক্ষা করে, এমন নহে, জাতিটিকেও বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হিসাবে মূর্ত্তিভেদ

প্রকৃত প্রস্তাবে মহাকালের রাজসিক মূর্ত্তিই হইতে পারে না। কেন না, রাজসিক মূর্ত্তির বর্ণ লোহিত এবং তামসিক মূর্ত্তির বর্ণ কৃষ্ণ। আমরা দেখিয়াছি যে, মহাকালের বর্ণ নীলাঞ্জনের ন্যায়। স্বয়ম্ভূপুরাণধৃত ধর্ম্মকোষসংগ্রহ নামক আধুনিক নেপালী পুথিতে মহাকালের বর্ণনায় আছে,—'একবক্ত্র, নীলাঞ্জনবর্ণ ভ্রূকুটিকরাল. বর্ত্তুলন্ত্রিনয়নঃ'।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও তৎসংক্রান্ত মূর্ত্তি-বিদ্যা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, মহাকাল বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব নহেন। তবে ইনি কি? ইনি ধর্ম্মপালদিগের অন্যতম। কথাটা এখনও পরিস্ফুট হইল না। ধর্ম্মপাল অর্থ লইয়া অনেক কথা আছে। ধর্ম্মপালের অর্থ, যিনি ধর্ম্ম রক্ষা বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষা করেন। ধর্ম্মপাল পূজা দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ হয় না; ইহার দ্বারা ধর্ম্মের রক্ষাই হয়। মহাযানশাখান্তর্গত বৌদ্ধ তান্ত্রিক শাস্ত্র-মতে বা বজ্রযান বা অতিমহাযান শাস্ত্রানুসারে আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি এই ধর্ম্মপাল-শ্রেণীর অন্তর্গত। এই ভাবটি হীনযানপন্থীরাও গ্রহণ করিয়াছেন, দেখা যায়। কলিকাতাস্থ মহাধর্ম্মরাজশ্রী বিহারে বিষ্ণুর চিত্র বিহারের রক্ষাকর্ত্তা হিসাবে রক্ষিত আছে। হীনযান-সম্প্রদায়ে এ ভাবটি গৃহীত হইলেও, তাঁহাদের কোন সূত্র বা পিটক গ্রন্থে এ শব্দের ব্যবহার দেখি নাই। Childers' Pali Dictionary গ্রন্থেও এ ভাবাত্মক কোন শব্দ নয়নগোচর হয় নাই।

মহাকাল বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব নহেন, ইনি ধর্ম্মপালবিশেষ

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি শ্রীজ্ঞানানন্দ পরমহংস-বিরচিত কৌলাবলীতন্ত্রের বীরসাধন-বিষয়ক চতুর্দ্দশ উল্লাসে ধর্ম্মপাল শব্দের উল্লেখ পাইয়াছি। আরও কয়েকটি তন্ত্রে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কোথাও এ শব্দের উল্লেখ পাই নাই। ব্রাহ্মণ্য মূর্ত্তিবিদ্যা-বিষয়ক কোন স্বদেশী বা বিদেশী পণ্ডিতের গ্রন্থেও এ শব্দের প্রয়োগ দেখি নাই। কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত মহাকালবিষয়ক পদটি এই:—'শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তু তে।' শ্রীগর্ভ কোন্ দেবতা, জ্ঞাত নহি, বিজয় একাদশ রুদ্রের অন্যতম। মৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত এই তন্ত্রোক্ত পদটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও মূর্ত্তিবিদ্যার তুলনামূলক আলোচনার পথ অনেকটা সুগম করিবে, আশা করি।

ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে ধর্ম্মপালের উল্লেখ

তিব্বতীয় ভাষায় ধর্ম্মপাল দ্রাগ্‌সে (Dragshed) নামে অভিহিত। ইঁহারা ভূত পিশাচ-দিগকে দূর করিবার জন্য পূজিত হয়েন। অন্যান্য দেবতারা যে ভূত পিশাচ দমনে অসমর্থ, তাহা নহে; ইঁহাদের কার্য্যই ইঁহাদিগকে দূর করা। বজ্রধর, বজ্রসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী, পদ্মপাণি প্রভৃতির পূজায় যে আপৎ-শান্তি হয় না, এমন নহে; ইঁহাদিগকে পিশাচ-দমনরূপ সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করা—ইঁহাদের শক্তির অপব্যবহার করা মাত্র। ইঁহাদের পূজায় সাধকের সিদ্ধি-লাভ হয়, নির্ব্বাণ লাভ হয়, কিন্তু ধর্ম্মপালদিগের পূজায় নির্ব্বাণ-লাভ হয় না।

তিব্বতে ধর্ম্মপালের পূজা

ধর্ম্মপালেরা অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত; সে কথা বলিতেছি। মহাকাল প্রভৃতি যে ধর্ম্মপালেরা সশক্তি বিরাজমান, তাঁহারাই ভূত পিশাচ-শান্তি ভিন্ন সাধকের পাপ শান্তিও করিতে পারেন; কিন্তু তাহা বলিয়া ইঁহাদের পূজায় সাধকের নির্ব্বাণ লাভ ঘটিবে না।

শ্রীমহাকালজ্ঞানসর্ব্বদুষ্টনকর্ম্মনামা তেঞ্জুরান্তর্গত সাধনা-পুস্তকে দেখিয়াছি যে, মহাকালকে দেহরক্ষা ও তৎসহ অন্তঃ বহিঃশুদ্ধি সিদ্ধি সম্পন্ন করাইবার জন্য আবাহন করা হইতেছে। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রেও ঠিক এই প্রকারের আবাহন-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। কৌলাবলী তন্ত্রে বিহিত আছে যে, বীরসাধনেচ্ছু সাধক চিতার পশ্চিম পার্শ্বে সংযত ও স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া গণেশ, বটুক, যোগিনী ও মাতৃকার পূজা করিয়া পুটাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত স্তবটি পাঠ করিবেন,—

বৌদ্ধ-তন্ত্র-শাস্ত্রে মহাকালের আবাহন

যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ।
পিশাচ-যক্ষ-সিদ্ধাশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাঙ্গণাঃ ॥
যোগিন্যো মাতরো ভূতাঃ সর্ব্বাশ্চ খেচরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সিদ্ধিদাতা ভবন্ত্বত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ ॥

মহাকালের মূর্ত্তি প্রায়শঃ মুখোমুখি আলিঙ্গনবদ্ধ শক্তির সাহচর্য্যে দৃষ্ট হয়। আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটি এ হিসাবে একটু অসাধারণ বলিতে হইবে।

তিব্বতের ভিন্ন ভিন্ন মঠে মহাকালের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পূজিত হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সাধনাও বিভিন্ন। ছয় হস্তযুক্ত, চারি হস্তযুক্ত বা ত্রিশীর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মহাকালমূর্ত্তি এক এক মঠের উপাস্য দেবতা। অশ্বপৃষ্ঠে তিন চারি দিনের পথে ব্রহ্মপুত্রনদের কূলে অবস্থিত ও লাসার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকস্থ দোর্জেঠাক্ নামক গ্রামস্থিত মঠে প্রাপ্ত একখানি মহাকালসাধনা পুথি দেখিয়াছি। এখানির নাম শ্রীমহাকালজ্ঞান-সর্ব্ব-দুষ্টনকর্ম্ম বা এক কথায় "মহাকালকর্ম্ম"। মহাকাল-বিশেষের পূজার পর যে মন্ত্রপাঠ-বিধি আছে, তাহার ভাবগত অনুবাদ দিয়া এই দেবতার স্বরূপ ও বিশেষত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মহাকাল আবাহনে অন্যান্য দেব-দেবীরও স্তব নির্দ্দিষ্ট আছে।

তিব্বতীয় ভিন্ন ভিন্ন মঠে বিভিন্ন ধর্ম্মপালমূর্ত্তির পূজা

"হে মহাবজ্রকাল, সর্ব্বধর্ম্মপালদিগের পিতা, মাতা ও পুত্র, হে পঞ্চনাথ, হে পঞ্চদেবী, হে কাকমুখ কর্ম্মনাথ, হে সিংহমুখ, হে যমরাজ, হে শোকরাজ, হে লোহিত ও কৃষ্ণঘাতক, হে পঞ্চাধিক সপ্ততি শুদ্ধশ্রেণীর শ্রীনাথ, হে ত্রিংসৎসংখ্যক সেনানী, হে এক সহস্র কৃষ্ণ, হে একলক্ষ পিশাচী, হে এক কোটি মাতৃ অর্থাৎ কালী প্রভৃতি, সহস্র মহাশঙ্খ (1000 Billions) দেবসেনা, তোমরা সপরিবারে বুদ্ধশাসন রক্ষা কর। ত্রিরত্নের জয় কর। শাসনধর অর্থাৎ আচার্য্যদিগের আয়ু বৃদ্ধি কর, সঙ্ঘস্থ সকলকে পালন কর। প্রাণীদিগের সুখবর্দ্ধন জন্য কর্ম্ম কর এবং নিশ্চিত আমার ধর্ম্ম-সিদ্ধির জন্য আমার অন্তঃ, বহিঃ ও মধ্য—এই তিনের দোষ এবং গ্রহ, রোগ ও বিঘ্ন—এই সমস্ত শান্তি কর। আমার মনে যে চিন্তা উপস্থিত হয়, তাহা যেন ধর্ম্মে পরিণত হয়। শান্তি (রোগশান্তি), বৃত (আয়ুঃ বৃদ্ধি), ঈশ ও রুদ্রাত্মক চারি কর্ম্ম আমার মনোমত সিদ্ধ কর; হে মহাকালসমূহ, শ্রবণ কর—হে মহাকালদিগের ভৃত্যগণ, শ্রবণ কর। আদিকালে মহাশ্রীর (বুদ্ধের) নিকট শাসন পালন জন্য তোমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, ঐ প্রতিজ্ঞা আমি এক্ষণে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমি বিদ্যাধর, অর্থাৎ তন্ত্রধর, সিদ্ধিক; আমি যোগী, প্রতিজ্ঞা-রক্ষাকারী ও প্রতিজ্ঞাস্থিত। আমি দেবতাদিগের প্রিয়। হে মহাকাল, তুমিও প্রতিজ্ঞাধর, ধর্ম্মপাল, তুমি মহাতেজাঃ, ঋদ্ধিধারক, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি এস, তুমি এস। হে জ্ঞাননাথ, এখানে এস। হে জ্ঞানমহামাতৃ (অর্থাৎ কালী) এখানে এস, ইত্যাদি। হে ধর্ম্মপালগণ, বুদ্ধের বাক্যকে সম্মান করে না, এমন কেহ নাই, ইহাকে গম্ভীরভাবে বিচার করে না, এমন কেহ নাই ······· ······· হে মহাকাল, তুমি ধর্ম্ম-ধাতুগৃহ হইতে ভগবান্ মহাশ্রী হেরুক হইতে সৃষ্ট ও নির্ব্বাণ আয়ত্ত করিবার জন্য আসিয়াছ। তুমি সর্ব্ব-ধর্ম্মপালগণের রাজা। ধর্ম্মপালেরা তোমার দূত। দুষ্ট লোক তোমার ভৃত্য। আমি প্রীতির সহিত তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি প্রতিজ্ঞাধর। প্রাণ যাইলেও আমি সুমেরুশীর্ষ হইতে সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানেই তোমার সেবা করি। তোমারও প্রাণ যাইলেও আমার জন্য কর্ম্ম করা উচিত। আমার ধর্ম্মের অর্থাৎ তান্ত্রিক ধর্ম্মের যে অনিষ্ট করে, আমার আপন ভ্রাতাকেও নাশ কর।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাকাল-জ্ঞান-সর্ব্বদুষ্টনকর্ম্ম-নামক তিব্বতীয় পুস্তকোক্ত মহাকালের স্তব

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মহাকাল ধর্ম্মপালদিগের নেতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার কার্য্য বৌদ্ধ-শাসন ও তৎস্থিত সঙ্ঘ প্রভৃতি রক্ষা করা। ইনি বৌদ্ধাচার্য্য বা শাসনধরদিগের আয়ুঃ বৃদ্ধি সম্পাদন করেন, তাঁহাদের রক্ষা করেন। ইনি মহাতেজাঃ ও ঋদ্ধিকর। ইনি দুষ্টলোকের দমনকর্ত্তা ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনিষ্টকারীর নাশকর্ত্তা। ইত্যাদি।

মহাকালের কার্য্য

ধর্ম্মপালেরা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীবিভাগ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। ফরাসী পণ্ডিত ডাঃ ডেনিকার (Dr. Deniker) যে বিভাগ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক।

তিনি যম ও কুবেরকে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্ম্মপাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাহনবিশেষের

ধর্ম্মপালের শ্রেণীবিভাগ

উপর এ বিভাগ স্থাপিত। প্রকৃতপক্ষে এ দুইজন একই শ্রেণীর ধর্ম্মপাল। ইঁহারা উভয়েই লোকপালবিশেষ। অভিমহাযান বা বজ্রযান-শাখার বৌদ্ধেরা ধর্ম্মপালের নিম্নবর্ণিত শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন,—
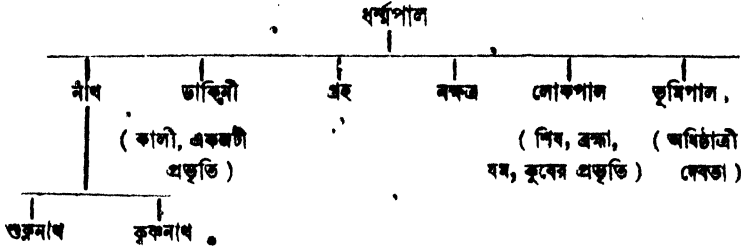
শুক্লনাথের আর এক নাম চিন্তামণি। আমাদের আলোচ্য মহাকাল কৃষ্ণনাথ-

মহাকাল নাথ-বিশেষ

শ্রেণীর নাথদিগের অন্যতম। এক্ষণে নাথ কি, তাহা বুঝা যাউক।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার ইঙ্গ-তিব্বতীয় অভিধানে নাথের অর্থ Protector বা পালক করিয়াছেন। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ গোন্‌পো (Mgon-po). Dr. Eitelর

নাথ শব্দের অর্থ

Handbook of Chinese Buddhism বা Sanskrit-Chinese কোষগ্রন্থে "নাথ" শব্দের উল্লেখ দেখি নাই। The Gods of Northern Buddhism গ্রন্থেও এ শব্দের প্রয়োগ নাই। বিস্ময়ের বিষয়, Dr. Schlagintweit তাঁহার Buddhism in Tibet গ্রন্থে নাথদিগের কথা কিছুই বলেন নাই, বা নাথ বা Mgon-po শব্দটিও ব্যবহার করেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, পণ্ডিত ফুসে তাঁহার Iconographie Bouddhique de l' Inde গ্রন্থের কোন খণ্ডেই নাথ শব্দের উল্লেখ করেন নাই; ব্যবহার দেখি, শুদ্ধ Col. Waddell র Lamaism গ্রন্থে। ইনি ইহার প্রতিশব্দ দিয়াছেন Lord-demoh; এ প্রতিশব্দ যে অশুদ্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য। ডাঃ আইটেল বরং মহাকালকে Great Spirit King অর্থে অনুবাদ করিয়া ধাত্বর্থ অনেকটা রক্ষা করিয়াছেন।

নাথেরা অসংখ্য; ইঁহাদেরও শ্রেণী আছে। পূর্ব্বে যে শ্রীমহাকালজ্ঞান-সর্ব্বদুষ্টনকর্ম্মনামক তিব্বতীয় সাধনা-পুস্তকের কথা বলিয়াছি, তাহাতে ৭৫ জন শুদ্ধ শ্রেণীর শ্রীনাথের আবাহন করা হইয়াছে। ইহাতে মহাকালকে জ্ঞাননাথ বলা হইয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি।

ডাঃ ওয়াডেল তাঁহার পূর্ব্বোক্ত Lamaism গ্রন্থে নাথদিগের কথা বলিতে গিয়া পাদটীকায় সংক্ষেপে ইহার সহিত বর্ম্মন্‌দিগের নাটের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইঙ্গিতে আভাস দিয়াছেন।

তিব্বতীয় নাথ ও বর্ম্মন্‌দিগের নাট

Encyolopædia of Ethics & Religion গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় সন্দেহ করেন যে, বোধ হয়, নাথ শব্দ ও নাট শব্দের মধ্যে

ধাতুগত কোন সম্বন্ধ নাই। নাট শব্দটি সংস্কৃত নাথ শব্দ হইতে উদ্ভূত কি না, ভাষাতত্ত্ববিৎ বলিতে পারেন। আমি ভাষাবিৎ নহি, অতএব আমার এ অনধিকার-চর্চ্চার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভাষাগত সম্বন্ধ না থাকিলেও ভাবগত সম্বন্ধ যে বিশেষভাবে বর্ত্তমান, তাহা যাঁহারা এ বিষয়ে সামান্য চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারাও অবগত আছেন। বর্ম্মিদিগের মধ্যে কি দরিদ্র, কি ধনী, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি বৌদ্ধ যতি, কি বৌদ্ধ গৃহী, কি অসভ্য আদিমজাতি, কি আলোকপ্রাপ্ত ঈশোপাসক—সকলেই আপনার শান্তির জন্য নাটের পূজা করিয়া থাকেন। ইহারা অতি-প্রাকৃতিক বা অলৌকিক জীববিশেষ। নাট বৌদ্ধদিগের রক্ষয়িতা বলিয়া, বৌদ্ধ-বিহারের পার্শ্বে নাট্‌সিন্ (Natsin) বা নাট্‌কুন্ (Natkun) নামে তাঁহার মন্দির অবস্থিত। গ্রামান্তে পালক ও রক্ষয়িতা হিসাবে নাটদিগের মন্দির বর্ত্তমান।

নাটধর্ম্মটি বিশেষ জটিল। ইহার সহিত গ্রহশান্তি, ভূতপূজা প্রভৃতি বিশেষভাবে জড়িত। Encyclopoedia of Ethics & Religion এর সম্পাদক মহাশয় নাট পূজাকে Animism বলিয়া এক কথায় বুঝাইয়াছেন। Animism শব্দটীর যে কি অর্থ, তাহা আমি ত' ভাল করিয়া বুঝি না এবং ইহার ভিত্তিও আমার নিকট তত সুদৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। দার্শনিকচূড়ামণি হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার Sociology পুস্তকে ইহার ভিত্তিকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া সারবান্ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাঁহার Gifford Lecturesর Physical Religion নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ বক্তৃতায় এই Animism রূপ Volkerspsychologie বা ethnological mythology কে একেবারে অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নাটপূজা ও Animism

স্থূলতঃ বলিতে গেলে নাটেরা এখনও যে ভাবে পূজিত হয়েন, তাহাতে নিম্নলিখিত তিনটি ভাব বর্ত্তমান,—জীবের রক্ষয়িতা, গতায়ুদিগের প্রেত বা আত্মা এবং বৌদ্ধদিগের অতিপ্রাকৃত প্রেতাত্মা বা ভূত।

চীনদেশে মহাকাল বা গোন্‌পোর অনুরূপ কোন দেবতার পূজা হয় কি না, ঠিক জানি না। তবে মিষ্টার জনষ্টন্ (Mr. R.F. Johnston) তাঁহার Buddhist China গ্রন্থে যে তুতির (T'uti) উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যেন অনেকটা মহাকালের অনুরূপ। চীনের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক শ্মশানক্ষেত্র, প্রত্যেক মন্দিরে এক একজন গৃহদেবতা আছেন। তাঁহারা রক্ষয়িতা হিসাবে পূজিত হয়েন। ইহাদের কোন বিশেষ নাম নাই, এবং যে দেবতার ইঁহারা অভিব্যক্তি বলিয়া কথিত, তাঁহার নাম Han Yü.

তিব্বতীয় মহাকাল বা গোন্‌পো এবং চীনদেশীয় তুতি (T'uti)

মহাকাল যে নাথদিগের অন্যতম, তাহা "নাথসময়-স্তোত্র" পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। এ পুস্তিকাখানি তেঙ্গুরের তান্ত্রিক অংশের ৮৩শ খণ্ডের অন্তর্গত ও গুরুরাহুল-বিরচিত। এ পুস্তকে মহাকালের যে বর্ণনা আছে, তাহা অদ্যকার আলোচ্য মূর্ত্তিতে প্রযোজ্য। ইহা হইতে ভাবগত অনুবাদ দিয়া মহাকালের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যাউক।

"কালাগ্নির মধ্যে মহাকাল অবস্থিত। ইঁহার প্রকৃতি অপরিবর্ত্তনীয়। এই কারণ ইঁহার বর্ণ কৃষ্ণনীল। ইঁহার জ্ঞানবৃদ্ধি প্রদর্শন করিবার জন্য ইনি ঊর্দ্ধকেশ ও ইঁহার কেশ জ্বালাময়। ইনি ধাতু বা স্বর্গে বাস করেন বলিয়া ইঁহার মস্তকে অক্ষোভ্য মুদ্রা অর্থাৎ পঞ্চশীর্ষ মুকুট রহিয়াছে। ডাকিনীদের আপন অধীনে রাখিবার জন্ত কপালে সিন্দুর রহিয়াছে। মহাকালের প্রকৃতি পঞ্চবুদ্ধাত্মিকা বলিয়া (বুদ্ধ অক্ষোভ্য, বুদ্ধ বজ্রসত্ব, বুদ্ধ রত্নসম্ভব, বুদ্ধ অমিতাভ, বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি) মস্তকে পঞ্চকপাল রহিয়াছে। ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া ত্রিনেত্র। দুর্জ্জনকে দমন করেন বলিয়া মুখ ব্যাদান করিয়া আছেন; ছয়টি প্রজ্ঞাপারমিতা সিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া ছয়টি হস্ত বিদ্যমান; নাগদিগকে আপন অধীনে রাখিয়াছেন বলিয়া সর্পাবৃত। সর্ব্বক্লেশের মূল কর্ত্তন করেন বলিয়া প্রথম দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তরী বিদ্যমান। সর্ব্বপ্রাণীকে কখনও বিস্মৃত হয়েন না ও তাহাদের স্বর্গে লইয়া যান বলিয়া দক্ষিণ মধ্যম হস্তে তেজস্বর কপালের মালা রহিয়াছে। সর্ব্বধর্ম্মশূন্ত বলিতেছেন বলিয়া দক্ষিণ তৃতীয় হস্তে প্রজ্ঞা ডমরু বর্ত্তমান। বিজ্ঞান মূল হইতে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রথম বাম হস্তে রক্তপূর্ণ কপাল হৃদয়ের নিকট ধরিয়া আছেন। তিন বিষ বা ক্লেশ মূল হইতে কর্ত্তন করেন বলিয়া মধ্যম বাম হস্তে ত্রিশূল বিদ্যমান। তিন লোকের দুর্জ্জনদিগকে বাঁধিবার জন্ত তৃতীয় বাম হস্তে কালপাশ ধরিয়া আছেন। সর্ব্বজীবের ভয় দূর করিয়া অভয় দিবার জন্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া আছেন। ক্লেশ শুষ্ক করিবার জন্ত সূর্য্যতেজ আপন শরীর হইতে বিকীরণ করিতেছেন। মহাকাল নির্দ্দোষ, এই জন্ত পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দুর্জ্জন লোককে নাশ করিবার জন্ত গণেশ পদতলে অবস্থিত। সর্ব্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্ত চন্দ্রমণ্ডলে আসীন। শ্রীমহাকাল, তোমাকে নমস্কার। পূর্ব্বকালে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর। মাংস ও রক্তের বলি আহার কর। যোগী অর্থাৎ সাধক স্বয়ং তোমাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ কর"।

"নাথসমন্তস্তোত্র" পুস্তক হইতে মহাকাল যে নাথবিশেষ, তাহার প্রমাণ

এই স্তোত্রটীর রচয়িতা যে গুরু রাহুল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইঁহার সম্বন্ধে আমি চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। আমি যে লামার নিকট বজ্রযান সম্বন্ধে জানিবার সুবিধা পাইয়াছি, তিনি বলেন যে, রাহুল ৮৪ জন বৌদ্ধাচার্য্যের অন্তর্গত এবং নাগার্জ্জুন ইঁহাদের অন্তত্তম। কিন্তু শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তৎকর্তৃক সম্পাদিত ও Sampa Khan-po বিরচিত Pag Sam Jon zang গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলিয়াছেন যে, এই ৮৪ জন আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির পরে ও রাজা চনকের (Tsanak) পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। মহামহোপাধ্যায় ৺ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার History of the Mediåeval School of Indian Logic গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দিঙ্‌নাগ-বিরচিত প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থের ভাষ্যকার ও প্রমাণবার্ত্তিককারিকা ও প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তি-রচয়িতা ধর্ম্মকীর্ত্তি কুমারিল ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন, এবং সপ্তম খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এই মতানুসারে নাগার্জ্জুন আচার্য্য হইতে পারেন না। কেন না, ইনি

নাথসমন্তস্তোত্র গ্রন্থের রচয়িতা গুরু রাহুল

বহু পূর্ব্বে তৃতীয় শতকে জীবিত ছিলেন। যাহা হউক, নাগার্জ্জুন আচার্য্য হউন আর নাই হউন, আমরা ইহা বুঝিলাম যে, গুরু রাহুল সপ্তম শতকের পরে প্রাদুর্ভূত হন। এ মত অবশ্য Pag Sam Jon Zangর ভিত্তির উপর স্থাপিত। এ যুক্তির দ্বারা মহাকাল পূজা দশম শতকের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, প্রমাণ করিতে পারা যায়।

ডাঃ ওয়াডেল তাঁহার Lamaism গ্রন্থে রাহুল ও রাহুলভদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে ভারতবর্ষ হইতে আগত ষোড়শ বৌদ্ধ স্থবিরের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ মতটি তারানাথ হইতে গৃহীত।

রাহুল ও রাহুলভদ্র

Dr. Eitel ও তাঁহার Handbook of Chinese Buddhism নামক কোষগ্রন্থে রাহুল ও রাহুলভদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাহুল ও রাহুলভদ্র একই ব্যক্তি, এবং গৌতম বুদ্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শিষ্য এবং দীক্ষার্থীর গুরুরূপে পূজিত হন। লামা-পদে দীক্ষা লইবার পূর্ব্বে শিক্ষার্থীর উপর মহাকালের ভর হয়। সে কথা ক্রমশঃ বলিব। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে, রাহুল ও মহাকালে বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইনি যেন মহাকাল পূজার গুরুস্বরূপ।

গুরু রাহুল ও মহাকালে সম্বন্ধ

তিব্বতের ভিন্ন ভিন্ন মঠে বিভিন্ন প্রকারের মহাকাল পূজার কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহাদের অনেকগুলি শ্রেণী আছে, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। ইঁহাদের প্রত্যেকের তিব্বতীয় ও সংস্কৃত নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

১। মহাকাল গণপতি (পাল্ গোন্-ল্যাগ্—দেন্—ছোক্-কি-দাক্‌পো—Dplmgon—lags-ldn—tshogs—ky—Bdgpo) পাল্‌গোন্=শ্রীনাথ, ল্যাগ্‌দেন=শ্রী, ছোক্=গণ, কি=র [of], দাক্‌পো=পতি।

মহাকাল গণপতি

পরিচয়:—একমুখ। নীল-কৃষ্ণবর্ণ, দুই হাত, রাক্ষসের মত আকৃতি। তিন চক্ষু, মুখ ব্যাদান করিয়া দন্ত দেখাইতেছেন। মুখ হইতে রক্ত বাহির হইতেছে। জিহ্বা মুখ-বিবরে গোল করিয়া রাখিয়াছেন। ঊর্দ্ধ ও পিঙ্গল কেশ; দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তরী; কপালযুক্ত বাম হস্ত হৃদয়োপরি জপমুদ্রায় রক্ষিত। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে চন্দন কাষ্ঠের দণ্ড; কৃষ্ণবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত। মস্তকে নরকপালযুক্ত মুকুট। ৫০টি নরকপাল-হার পরিহিত। পদদেশ ও হস্ত সর্পভূষণে অলঙ্কৃত। মনুষ্যচর্ম্ম সম্মুখদেশে পরিহিত, তন্নিম্নে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; পৃষ্ঠে হস্তিচর্ম্ম; পদে উপানৎ।

এই প্রকার মহাকালমূর্ত্তি লাসা হইতে অশ্বপৃষ্ঠে চারি দিনের পথে অবস্থিত মিণ্ডোলিং গ্রামস্থ মঠে পূজিত হন, শুনিয়াছি।

২। চতুর্ভুজ মহাকাল—গোন্‌পো—ছক্—শিপা—Mgonpo—phyag—bzhi—pa]

গোন্‌পো=মহাকাল

ছক=হস্ত

শি=চারি

পরিচয়:—ঘনকৃষ্ণবর্ণ; এক মুখ, চারি হাত; অতিশয় প্রকাণ্ড উদর; মুখব্যাদান করিয়া দন্ত

বাহির করিয়া আছেন; রক্তবর্ণ ত্রিনয়ন। দক্ষিণ হস্তে—মনুষ্য-হৃদয় সহ কর্ত্তরী, খড়্গ। বাম হস্তে—কপাল, ত্রিশূল।

ইঁহার মস্তকে ৫টি শুষ্ক কপালের মালা, বক্ষে ৫০টি নরমুণ্ডগ্রথিত হার দোদুল্যমান; নানাবর্ণ চিত্রিত কৌষেয় বস্ত্রপরিহিত। আর আর সমস্ত ভূষণ প্রথম-সংখ্যক মূর্ত্তিটির ন্যায়। ইনি স্বীয় শক্তির সহিত মহারাজলীলাশ্রী আসনে উপবিষ্ট।

চতুর্ভুজ মহাকাল

৩। মহাকালপণ্ডক—(পণ্ডক=নপুংসক)—(মনিং নাক্‌পো—Manin-nagpo) মনিং=নপুংসক, নাক্‌পো=কৃষ্ণবর্ণ। পরিচয়:—কৃষ্ণবর্ণ, একমুখ, দুই হাত, দক্ষিণ হস্তে ধ্বজা, বাম হস্তে পাশ সহিত মনুষ্য-হৃদয়; ত্রিনয়ন; কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও সর্পনির্ম্মিত মস্তকে ৫টি শুষ্ক কপালের মালা; গলে মনুষ্যহৃদয়ের মালা (আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিতে হৃদয়াকৃতি মুণ্ডমালা আছে); কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত; কটিবন্ধে চন্দন কাষ্ঠের দণ্ড রক্ষিত।

৪। মহাকাল ব্রাহ্মণরূপ (গোন্‌পো-ঠ্রামসুক—Mgonpo-Bramgzugs, ঠ্রাম=ব্রাহ্মণ, সুক্‌=রূপ)। পরিচয়:—একমুখ, শ্বেত শ্মশ্রুযুক্ত; দক্ষিণ হস্তে মনুষ্যাস্থিনির্ম্মিত শিঙ্গা, বাম হস্তে রক্তপূর্ণ নরকপাল। কথিত আছে যে, চীনসম্রাট্ কুবলাই খাঁ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন দীক্ষিত হইবার জন্য লামা পাগো-পাকে

ব্রাহ্মণরূপী মহাকাল

তিব্বত হইতে চীনদেশে লইয়া গিয়া বিচার আরম্ভ করেন, তখন পাগো-পা চীনসম্রাট্‌কে তর্কে কিছুতেই পরাজিত করিতে পারিতেছিলেন না, নিজেই প্রায় পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেই দিন রাত্রে মহাকাল শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে লামার নিকট আবির্ভূত হইয়া হেবজ্র তন্ত্রোক্ত সূত্রটী তাঁহাকে শিখাইয়া দেন। সূত্রটির সাহায্যে চীনসম্রাটের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন ও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এ প্রবাদের মূলে যাহাই থাকুক না, ডাঃ ওয়াডেল বলেন যে, সম্রাট্ কুবলাই খাঁর সময় হইতে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতক হইতে লামাদিগের বিশেষ প্রাধান্য আরম্ভ হয়, এবং তিব্বতে লামা-শাসনতন্ত্র-পদ্ধতিরও আরম্ভ হয়।

"মহাকাল ব্রাহ্মণরূপ" বা গোন্‌পো ঠ্রামসুক সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। ইঁহার আসন একটু বিচিত্র। ইনি সচরাচর মহারাজলীলাশ্রী আসনে সমাসীন। সাধারণতঃ এ আসন দৃষ্ট হয় না। মঞ্জুশ্রীও এই আসনে দৃষ্ট হন, তাহা মঞ্জুশ্রী প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

৫। কর্ত্তরীধর জ্ঞাননাথ মহাকাল (ইসে-গোন্‌পো-ঠিথুক্‌চেন্—Yeshes-Mgonpo-grigug chan)

ইসে=জ্ঞান; গোন্ পো=নাথ; ঠিথুক্=কর্ত্তরী; চেন্=যুক্ত। মহাকালের এই রূপটীর বর্ণনা আমি তেঞ্জুরের তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডে পাইয়াছি; পত্রাঙ্ক ১৬ এ লাইন ১ হইতে পত্রাঙ্ক ১৭ এ লাইন ৩। এ পত্রাঙ্ক

কর্ত্তরীনাথ জ্ঞাননাথ মহাকাল

আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ পুস্তকালয়ে রক্ষিত এবং প্যারি হইতে প্রকাশিত Cordier

সম্পাদিত Index Du Bstan-Hgyur, Troisieme Partie Tibetain 180-332) হইতে গ্রহণ করিয়াছি। পরিচয় :—ইনি পদ্ম ও সূর্য্যের আসনস্থিত মনুষ্য-মূর্ত্তির উপর দণ্ডায়মান। ইহার এক মুখ ও দুই হাত। দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তরী, বামহস্তে রক্তবর্ণ কপাল। এক দন্ত, ত্রিনেত্র, রক্তবর্ণ জ্বালাময় কেশ; মস্তকে পঞ্চকপালযুক্ত হার; গলদেশে ৫০টি নরমুণ্ডমালা; ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত। ইনি বাম পদের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান আছেন, দক্ষিণ পদ উত্থিত ও অনুপ্রস্থ ভাবে স্থাপিত। তিব্বতীয় ভাষায় এ মুদ্রার পরিভাষিক নাম খরতব্ (Garstabs) এবং সচরাচর চলিত নাম এক্কুম্ ইয়ন্ ক্যাং (Gyas-Bskum-Gyon-Brkyng).।

এ (Gyas)=দক্ষিণ; কুম্ (Bskum) উত্থিত; (ইয়ন) Gyon=বাম; ক্যাং (Brkyng) দণ্ডায়মান। তিব্বতীয় খরতব্ মুদ্রার সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'তাণ্ডব'; কিন্তু আমরা তাণ্ডব বলিলে যাহা বুঝি, এ মুদ্রা ঠিক সে ভাবের জ্ঞাপক নহে। তাণ্ডবের মধ্যে যে সজীবতা ও অঙ্গাদি পরিচালনের ভাব বিদ্যমান, ইহাতে তাহা নাই। এ মুদ্রা দণ্ডায়মানভাবজ্ঞাপক। এ প্রসঙ্গে আর একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। তাণ্ডব মুদ্রায় সচরাচর দক্ষিণ পদ ভূমির উপর অবস্থিত থাকে, এবং বাম পদ অনুপ্রস্থভাবে রক্ষিত। তিব্বতীয় মুদ্রায় বাম পদটি ভূমিতলে রক্ষিত এবং দক্ষিণ পদ উত্থিত।

এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, তাণ্ডব সম্বন্ধীয় মন্তব্যটি শিব-তাণ্ডবে প্রযোজ্য। কৃষ্ণ-তাণ্ডবে সাধারণতঃ তিব্বতীয় মুদ্রার ন্যায় বাম পদটি ভূমিতে রক্ষিত থাকে।

৬। নাথরুদ্রান্তক—(Mgonpo-Tragshad—গোন্‌পো ট্রাক্‌সাদ্)

তেঙ্গুরের তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডে একটি অধ্যায় পাইয়াছি, ইহার নাম "নাথরুদ্রান্তক সংক্ষিপ্তাভিষেকপ্রক্রিয়া"; কিন্তু ইহাতে মহাকালের এ মূর্ত্তির কোন বর্ণনা দেওয়া নাই।

৭। যক্ষ মহাকাল (নোৎ জিন-নাক্‌পো-ছেন্‌পো Gnod-Sbyin-Nagpo)

নোৎ জিন=যক্ষ; নাক্‌পো=কাল।

যক্ষ মহাকাল.

ছেন্ পো=মহা।

৫১এ পৃষ্ঠা ৩ পঙ্‌ক্তি হইতে ৫৩ বি পৃষ্ঠা ৭ পঙ্‌ক্তি তেঙ্গুর তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডে এই মহাকালের সাধনা দেওয়া হইয়াছে। ইহার নাম "যক্ষমহাকালসাধনা"। লামারা "যক্ষমহাকাল কথ্যনাম"ও বলিয়া থাকেন।

পরিচয়:—ইহার তিন মুখ, ছয় হাত, তিনটি পদ। দক্ষিণ, মধ্য ও বাম মুখ যথাক্রমে ব্যাঘ্র, রুদ্র ও সিংহের ন্যায়। দক্ষিণ পদ অনুপ্রস্থভাবে উত্থিত, বাম পদ লম্বমান, আর একপদ কিলের ন্যায়। হস্তে প্রহরণগুলি নিম্নলিখিতক্রমে রহিয়াছে :—

দক্ষিণ হস্ত :—(১) বজ্র।
(২) ত্রিশূল।
(৩) কিল্।

দেখি। ইহার মধ্যে একটি শ্লোক ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে। ইহা ধর্ম্মপূজান্তর্গত ছাগবলির সময় উচ্চারিত হয়।

আশীবিষসম খড়্গাভীক্ষধারো মুণ্ডমঙ্কঃ।
শ্রীগর্ব্বো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তু তে॥

এই ধর্ম্মপূজাবিধানের খড়্গাভিমন্ত্রণ মন্ত্র এবং কৌলাবলী তন্ত্রের চতুর্দ্দশ উল্লাসে দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মমঙ্গল পুঁথিতে আছে,—

ওঁ অস(শি) বিশসঃ (?) খড়্গতীক্ষধারো দুরাসদঃ।

বৌদ্ধ মহাকাল যে বঙ্গদেশে বিশেষভাবে পূজিত হইতেন, তাহা ধর্ম্মপূজাবিধানের আর একটি শ্লোক হইতে বেশ সপ্রমাণ হয়, এবং এ প্রমাণটির সহিত তিব্বতীয় পরিভাষার বেশ সংস্রব আছে, বুঝা যায়।

ধর্ম্মপূজাবিধানে পণ্ডাসুরপূজার বিধান আছে,—ইহার পূজা করিলে ইক্ষুযন্ত্র হইতে অধিক ইক্ষুরস বহির্গত হয় ও অধিক গুড় প্রস্তুত হয়।

ওঁ পণ্ডাসুর ইহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ।
পাহি মামিক্ষুযন্ত্রেঃ ত্বং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ॥
ওঁ পণ্ডাসুরায় নমঃ।

ওঁ পণ্ডাসুর নমস্তুভ্যমিক্ষুবাটিনিবাসিনে।
যজমানহিতার্থায় গুড়বৃদ্ধিপ্রদায়িনে॥
ওঁ পণ্ডাসুরায় নমঃ॥

মন্ত্রে পণ্ডাসুর ইক্ষুর বাটী বা ইক্ষুর গোলায় বাস করেন বলিয়া কথিত, অর্থাৎ ইনি একজন গৃহস্থ কৃষকের দেবতা। মহাকালও গৃহী, কৃষক, শক্তি—সকলেরই সুখবৃদ্ধি ও আপৎ শান্তির জন্য পূজিত হন। এক্ষণে দেখা যাউক, পণ্ডাসুর কি? অমরসিংহ পণ্ড শব্দের অর্থ করিয়াছেন, নপুংসক। পণ্ডক বা পণ্ডগ, এই দুই শব্দেরও অর্থ নপুংসক। আমি যে সাতটি মহাকাল-ভেদের পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি, তাহাদের তৃতীয়টির নাম মহাকালপণ্ডক। ইহার তিব্বতীয় নাম মনিং নাক্‌পো (Maṇin-nagpo)। মনিং শব্দের অর্থ নপুংসক। ইহার কটিবন্ধে চন্দনকাষ্ঠের দণ্ড রহিয়াছে। কাষ্ঠ বা বংশদণ্ড যে কৃষক বা পশুপালকের নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্য, ইহা বলিতে হইবে না। ইহা ভিন্ন ধর্ম্মপূজাবিধানে মহাকাল পূজার বিধিও নির্দ্দিষ্ট আছে। আর একটি কথাও এ প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। ধর্ম্মপূজাবিধানের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্ম শিব নহেন, হিন্দুর কোন দেবতা নহেন, সাক্ষাৎ বুদ্ধদেব। অন্যান্য তন্ত্রের সহিত মিলাইয়া পড়িলে এ কথাটিতে ততটা আস্থা স্থাপন করা যায় না। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়েরও নাকি এই মত। আমি অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে বলিতেছি যে, এ ধর্ম্ম শিবও বটে, হিন্দুর দেবতাও বটে,

ধর্ম্মপূজাবিধানোক্ত পণ্ডাসুর ও তিব্বতীয় মনিং নাক্‌পো

সাক্ষাৎ বুদ্ধদেবও বটে এবং এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ মহাকালও বটে—এ সকলেরই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। বহু স্থলে ধর্ম্মরাজকে বিঘ্ন বিনাশনের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। বিঘ্নবিনাশ করা ধর্ম্মপাল মহাকালের বিশেষ কর্ম্ম? শুদ্ধ শূন্যতাবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ধর্ম্মরাজকে ত্রিরত্নের বুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। তন্ত্রসারান্তর্গত "নাথসমরস্তোত্র" হইতে দেখাইয়াছি যে, মহাকালও শূন্যধর্ম্মপ্রচারক ও প্রজ্ঞাপারমিতাসিদ্ধ। যাহা হউক, আমার এ মতটি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। সামান্য আভাস দেওয়া গেল মাত্র।

ধর্ম্মপূজাবিধানোক্ত ধর্ম্মের স্বরূপ

এবার মন্দিরে মহাকালের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কিছু বলিব। বৌদ্ধ মন্দিরে কিংবা বিহারে মহাকালের স্থান নির্দ্দেশ লইয়া একটু সামান্য মতভেদ দৃষ্ট হয়। ডাঃ আইটেল তাঁহার Handbook of Chinese Buddhism গ্রন্থে মহাকাল শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইঁহাকে বিহার বা মঠের রক্ষয়িতা বলিয়াছেন এবং বিহারস্থ ভোজনশালায় ইঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নেপালে অন্য ব্যবস্থা। এদেশে প্রায়শঃ বিহারের দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে মহাকালের স্থান। ইঁহার সহচর মহাবল; মহাবলের কথা বলিতেছি।

মন্দিরে মহাকালের স্থান-নির্দ্দেশ

নেপাল রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেন্ট হজসন্ সাহেব কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত অনেকগুলি পুথির মধ্যে ৮৫ খানি পুথির পরিচয়জ্ঞাপক Napalese Buddhist Literature নামে যে পুস্তক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রণয়ন করেন, তাহার দুইখানি পুথির মধ্যে মহাকালের পরিচয় পাওয়া যায়। একখানির নাম ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা, আর একখানির নাম মহাকালতন্ত্র। প্রথমোক্তখানি মহাপণ্ডিত নিঃসঙ্গাচার্য্য শ্রীকুলদত্ত-বিরচিত ও দশকর্ম্মান্বিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াপদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিত। ইহাতে বিহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে বিধি-ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে বিহারের দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে মহাবল ও মহাকালের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হইবে। দুই মূর্ত্তিই দেখিতে একরূপ, কেবলমাত্র প্রভেদ এই যে, মহাকালের গলদেশে নরকপালমালা লম্বমান। এই দুই মূর্ত্তিই কৃষ্ণবর্ণ, একশীর্ষ, ত্রিনেত্র, নেত্রগুলি বৃত্তাকার ও রক্তবর্ণ; পিঙ্গলবর্ণ ঊর্দ্ধকেশ, দংষ্ট্রাভীষণ মুখ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত ও সর্পভূষণ। এ বর্ণনার সহিত কৃষ্ণানন্দ-বিরচিত তন্ত্রসারোক্ত মহাকালের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা ও মহাকাল তন্ত্র

আমরা পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা হইতে দেখিলাম যে, মহাবল মহাকালের সহচর। এ মহাবল কে? শব্দকল্পদ্রুমে ত্রিকাণ্ডশেষানুসারে মহাবল শব্দের বুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, আর এক অর্থে বায়ুকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। হেমচন্দ্র মহাবল অর্থে বলবান্ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ও অন্য কোন অর্থ দেন নাই। বিশ্বকোষে বুদ্ধ, পিতৃগণবিশেষ, বায়ু, বলীয়ান্, ইন্দ্রবিশেষ, শিবানুচর-ভেদ ও নাগভেদ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। এ মহাবল কখনই ইন্দ্র, নাগ বা শিবানুচর নহেন, এ মহাবল যম ভিন্ন আর কেহ নহেন। অগ্নিপুরাণান্তর্গত দিক্পতিযাগ নামক ষট্পঞ্চাশত্তম

বামহস্ত :— (১) ঘণ্টা।

(২) অঙ্কুশ।

(৩) মুখের নিকট আনীত রক্তপূর্ণ কপাল।

অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় যে, Schlagintweit, Waddell, Deniker প্রভৃতি কেহই দুই একটির অধিক মহাকালবিশেষের কথা বলেন নাই, এই জন্যই আমি সাতটি মহাকালের বর্ণনা দিলাম। ডাঃ স্লাগিনটোয়েট কেবল মাত্র একটি মহাকালবিশেষের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মহাকালগুলির মধ্যে সপ্তমটির (Nagpo-chanpo) অর্থাৎ বজ্রমহাকাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছেন। তিনি লামাসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর উপর মহাকাল Nagpo-chanpoর ভর বা আবেশের একটি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন।

মহাকালের ভর

সেই ভরের সহিত চোর ধরিবার কিংবা ভূত ছাড়াইবার জন্য "বাণচালা"ও প্রচলিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আম[illegible] বাণচালার ক্রিয়াও অনেকটা এইরূপ। সকল দেশেই বাণচালা অল্প-বিস্তর বিদ্যমান।

কিন্তু এইখানে আমার মনে একটি সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, সেটি বলিতেছি। আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত শান্তিসাধক ঝাড়াপড়া, কিরাণি, দমন প্রভৃতি মন্ত্রের মধ্যে "ধর্ম্মের আজ্ঞা" বচনটি পাওয়া যায়। এ ধর্ম্ম কে? বঙ্গদেশ যে এককালে বৌদ্ধ প্রভাবাপন্ন ছিল, সে বিষয় এখন সন্দেহের অতীত। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে অনেক প্রমাণ বাহির করিয়াছেন; কিন্তু এখনও বিশেষ আলোচনা কিছুই হয় নাই, স্বীকার করিতে হইবে। এই ঝাড়াপড়ার মন্ত্রগুলির ও ধর্ম্মপূজা-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির বিশেষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমি যে দুই একটি অযত্নবিন্যস্ত মন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছি, তাহার সংবাদ দিব।

বলিতেছিলাম—"ঝাড়াপড়ার" ধর্ম্ম কে? দুই একটি মন্ত্রের উল্লেখ বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৌদ্ধ মহাকালের ভর বা আবেশ দ্বারা যেমন বাণ চালাইয়া তিব্বতে চোর ধরা হয়, তেমনি বঙ্গদেশে ধর্ম্মের আজ্ঞায় ক্ষুর চালার সহিত চোর ধরিবার নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ-রীতি প্রচলিত আছে,—

"ঝাড়াপড়ার" ধর্ম্ম

ভুজঙ্গ পিঞ্জর লোহার শিকল।
ক্ষুরে চোরা আনোম পাগল॥
চোরা চোরা ভাঙ্গিয়া আন।
চোরের মাথা মুড়াইয়া আন॥
অমুকের বস্তু যে করিয়াছে চুরি।
ধর্ম্মের আজ্ঞায় তাহারে ধরি॥

বঙ্গদেশে কাঁটা বিদ্ধ হইলে তাহার মন্ত্র :—

গঙ্গা যমুনা ত্রিবেণী স্মরণে।
ধর্ম্মের আজ্ঞায় গলার কাঁটা নামে॥

আমরক্ত রোগের জলপড়া :—

সাগরের কূলে উপজিল শূল।
আরে পিও পিও পাখী ॥
অমুকের ঘুচিলাম রক্তশূল ছাড়াবী।
ধর্ম্মের আজ্ঞা।

কিক্ বেদনা ঝাড়ন :—

ওপার থেকে আস্‌ছে বুড়ী।
কাঁধে তার শরের ঝুড়ি।
কোন্ কোন্ শর ?
ওশর, কুশর কুগোঁটে শর।
অমুকের অঙ্গে যে বেদনা আছে,
লেউটে তার বুকে পড়।
কার আজ্ঞে ?
বড় বাপ ধর্ম্মের আজ্ঞে।
শীঘ্রি ছাড়, শীঘ্রি ছাড় ॥

এ বড় বাপ ধর্ম্মটি কে ? ইনি কি ত্রিরত্নের ধর্ম্ম, না বৌদ্ধ ধর্ম্মপালদিগের নেতা ও পিতৃস্বরূপ মহাকাল ? সমস্ত বিপৎ আপৎ শান্তি করিবার জন্ত বজ্রযানপন্থীরা মহাকাল পূজা করিয়া থাকেন। ইনি ইঁহাদের গৃহদেবতাস্বরূপ। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, মহাকালের ভর বা আবেশ দ্বারা এবং চালা ফেরা প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা চোর ধরা ও আপৎ বিপৎ প্রভৃতি দূর করা হয়। মহাকাল স্বয়ং ধর্ম্মপালবিশেষ এবং ধর্ম্মপালদিগের পিতৃমাতৃস্বরূপ। দোর্জ্জেঠাক্ মঠে প্রাপ্ত বজ্রযানপন্থীদের "শ্রীমহাকালজ্ঞানসর্ব্বদুষ্টনকর্ম্ম" নামক যে পুঁথিখানির কথা বলিয়াছি, তাহাতে মহাকালকে ধর্ম্মপালদের পিতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এই জন্ত আমার মনে হয় যে, ভুকৃতাক্, ঝাড়াপড়া প্রভৃতির ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্মপাল মহাকালেরই রূপান্তরমাত্র, ইহা ত্রিরত্নান্তর্গত ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মপাল মহাকালও সামান্ত নহেন। তেঙ্গুরান্তর্গত "নাথসমরস্তোত্রে" সাধনায় মহাকালকে বুদ্ধস্বভাব, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বক্লেশনাশক, প্রজ্ঞাপারমিতাসিদ্ধ, ও শূন্তবাদপ্রচারক প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং ইঁহাকে ত্রিরত্নের বুদ্ধ করিবার প্রয়োজনও নাই।

ত্রিরত্নের ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মপাল

ধর্ম্মপাল তথা মহাকালপূজা যে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী পূজার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহা ধর্ম্মপূজাবিধান গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। এ পুঁথিখানি যে বিশেষ আধুনিক ও অনেকগুলি তন্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া রচিত হইয়াছে, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বেশ বুঝা যায়। জ্ঞানানন্দ পরমহংস-বিরচিত কৌলাবলী তন্ত্র হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে

ধর্ম্মপূজাবিধান গ্রন্থ, ধর্ম্মপাল-পূজা এবং কৌলাবলী তন্ত্র

তিনিও ইহার কারণ বলিতে পারিলেন না। তবে তিনি সহসা রাজকার্য্যে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায়, এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবকাশ পান নাই।

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মকোষসংগ্রহ নামক আধুনিক নেপালি পুথিখানি অন্বেষণ করিতে করিতে গণেশবাহন বিঘ্নান্তকের উল্লেখ পাইয়াছি; এটি স্বয়ম্ভূপুরাণ হইতে গৃহীত। যে গল্পটিতে গণেশবাহন বিঘ্নান্তকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই:—পূর্ব্বকালে অভ্রিয়াচার্য্য বা ওড়িয়াচার্য্য নেপালস্থ বাগ্‌মতীতীরে ছত্র, ধ্বজ, পুষ্পমালালঙ্কৃত যোগমণ্ডপে যোগ সাধনা করিতেছিলেন। সে স্থলে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এবং লোকপালদের অর্চ্চনা হইতেছিল। সেই সময় গণেশ ক্রীড়নার্থ বাগ্‌মতীতীরে আসিয়া দেখেন যে, যোগমণ্ডপে তাঁহার মূর্ত্তি নাই; তিনি ক্রোধভরে গণদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে, গজচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট অভ্রিয়াচার্য্যকে ধ্বংস কর, চূর্ণ কর (গজচর্ম্মস্থমভ্রিয়াচার্য্যং অস্মৎপূজাপ্রতিবন্ধকং বিধ্বংসয়, চূর্ণয় ইতি)। ইহাতে যুদ্ধ বাধে; অভ্রিয়াচার্য্যের ষড়ক্ষরী মন্ত্রের প্রভাবে যে ক্রোধসমূহ বিনিঃসৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গণেশবাহন বিঘ্নান্তককে দেখিয়া গণেশ পলায়ন করিল। বিঘ্নান্তকও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার এক দন্ত উন্মূলিত করিল। পরাজিত গণেশ এইবার অভ্রিয়াচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া বলিল, হে গুরো, হে আচার্য্য, আমি বুদ্ধ হইয়াছি। এই সময় হইতেই বৌদ্ধপূজামণ্ডপে গণেশের স্থান হইল। এই বর্ণনার পরেই মহাকালের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্বয়ম্ভূপুরাণোক্ত ও ধর্ম্মকোষ-সংগ্রহ-বর্ণিত বিঘ্নান্তক ও মহাকাল

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহাকাল যে গণেশবাহন বিঘ্নান্তক, তাহা কে বলিল? উভয়ের বর্ণনা সাহচর্য্য কখনই গ্রাহ্য প্রমাণ হইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ মহাকালের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেও গণেশবাহনের উল্লেখ নাই। বাহন ভিন্ন তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তির বিশেষ সামঞ্জস্য আছে; কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাকালের বাহন নানা প্রকারের হইতে পারে; আর ইহাও দেখাইয়াছি যে, তিব্বতীয় বজ্রযানান্তর্গত যে শ্রেণীর মহাকালের নাম "মহাকাল গণপতি" বা পাল্‌গোন্ ল্যাগ্‌দেন্—ছোক্‌-কি-দাক্‌পো, তাঁহার বাহন গণপতি। তিব্বতীয় বজ্রযানপন্থীরা মহাকালের বিঘ্নান্তক নাম ব্যবহার করেন না; এ নাম গণেশেই প্রযোজ্য। আর এক কথা এই যে, ধর্ম্মকোষসংগ্রহের বর্ণনা হইতে গণেশবাহন বিঘ্নান্তককে বিনিঃসৃত ক্রোধমূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হয়। মূলটি এইরূপ—"তথেতি তত্রৈব জাতো মহান্ যুদ্ধঃ। ততঃ ষড়ক্ষরী প্রভাবাৎ দশক্রোধেষু বিনিঃসৃতেষু গণেশবাহন-বিঘ্নান্তকং আলোক্য গণেশোঽসৌ পলায়িতঃ। পলায়িতস্য অপি একদন্তঃ বিঘ্নান্তকেন উন্মূলিতঃ। ততো নির্ম্মদঃ গণেশোঽসৌ ওড়িয়াচার্য্যমাগমঃ।" এই গ্রন্থ হইতে ঠিক বুঝা গেল না যে, মহাকালের নাম বিঘ্নান্তক কি না। ডাঃ ফুসে তাঁহার Etude Sur L'iconographie Bouddhique De L'inde গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় হেরুক, সম্বর প্রভৃতি দেবতার নামোল্লেখ করিবার সময় বিঘ্নান্তক ও মহাকালের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে আমার সন্দেহ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। কেননা, তাঁহার উক্তি সাধনমালার উপর স্থাপিত। তবে একটি কথা বলিয়া রাখি;

ডাঃ ফুসে অনেকগুলি দেবতার মধ্যে "বিঘ্নান্তক, মহাকাল এবং এমন কি গণপতি" এইরূপ-ভাবে লিখিয়াছেন। ন'যসাহচর্য্য মধ্যেও গুণনামাত্র বর্ত্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু অদ্যাবধি আছে কি না সন্দেহ। আমি নেপালী সাধনামূলক পুঁথিগুলি দেখিবার অবকাশ পাই নাই; সেগুলি দেখিয়া দ্বিতীয় প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিব। পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানটি হইতে বুঝা গেল যে, বিঘ্নান্তক ক্রোধসংজ্ঞক ভৈরব বিশেষ। আমাকে বোধ হয়, বলিতে হইবে না যে, নিম্নলিখিত অষ্ট শ্রেণীঃ ভৈরব বিদ্যমান—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত ভৈরব, কাপাল, ভীষণ, ও সংহার।

কথা কহিতে কহিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এত দূর হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে মহাকালের প্রভাবের কথা চিন্তা করিলে পুরাতনের অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠগুলিতে বর্ত্তমানের যে আলোকলহরী খেলিতে থাকে, তাহা স্নিগ্ধোজ্জ্বল, তাহাতে অতীতের অন্ধকার-যবনিকা অপসৃত হইয়া যায় এবং হৃদয় এক আনন্দ, বেদনা, বিস্ময় ও ব্যাকুলতায় পূর্ণ হয়। সংস্কৃত সাহিত্য যাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট মহাকালের নাম করিলেই বাণভট্ট বর্ণিত ঐশ্বর্য্যশালিনী উজ্জয়িনীর কথা স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হয়—"যস্যাঞ্চ কৈলাসবাসপ্রীতির্মহাকালাভিধানঃ স্বয়ং প্রতিবসতি"। আর মনে পড়ে, মহাকবি কালিদাসবর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে মহাকাল-নিকেতন—

"অসৌ মহাকালনিকেতনস্য
বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভিঃ
জ্যোৎস্নাবতো নির্বিশতি প্রদোষান্॥"—রঘুঃ ৬। ৩৪॥

আর প্রিয়াবিরহবিধুর যক্ষকে মনে পড়ে না কি? "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" কান্তাবিরহ-কাতর যক্ষ যখন রামগিরির স্নিগ্ধচ্ছায়তরুশীতল আশ্রমে বপ্রক্রীড়া প্রবৃত্ত তির্য্যগদন্ত মাতঙ্গের ন্যায় অপূর্ব্বদর্শন নবীন জলধর দর্শনান্তর

মেঘদূতে মহাকালের উল্লেখ

দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তাকুলচিত্তে প্রণয়িনীর নিকট কুশলসংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া মেঘকে দৌত্যকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, তখন উজ্জয়িনীর মহাকাল বিগ্রহের কথা বিস্মৃত হন নাই; এত উদ্বেগের সময়ও প্রিয়াবিরহকাতর যক্ষ মেঘকে বক্রপথে গমনপূর্ব্বক কেবলমাত্র উজ্জয়িনীর সৌধশিখরপ্রণয়ী হইয়া পৌরাঙ্গনাদিগের বিদ্যুদ্দামস্ফুরণচকিত-চঞ্চল কটাক্ষ উপভোগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; বলিয়াছিলেন,—

ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ।
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডেশ্বরস্য।

কেন না,—

কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্॥

অধ্যায়ে অগ্নি যমের যে বর্ণনা পাইয়াছি, তাহাতে যমকে মহাবল আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে— "মহিষস্থ সমাগচ্ছ দণ্ডহস্ত মহাবল।" মহাবল বিশেষণরূপে অগ্নি, লোকেশ প্রভৃতি দুই একটি দেবতায় প্রযুক্ত হইলেও বোধ হয়, কেবলমাত্র যমের নামবিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। মহাবল অর্থে যম মনে করিবার আর একটি কারণ আছে। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও তাঁহার Elements of Hindu Iconography গ্রন্থের ২য় খণ্ডের প্রথম অংশে ললিতোপাখ্যান হইতে মহাকালীর সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ মহাকালের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মহাকালের পার্শ্বে কাল ও মৃত্যুর অবস্থিতির উল্লেখ আছে। নেপালে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিচিত্র সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয় বলিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে দুইটি প্রমাণ দিলাম। তৃতীয় প্রমাণটি মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহাকাল ধর্ম্মপালদিগের অন্যতম; যমও একজন ধর্ম্মপাল; এ হিসাবে যম ও মহাকালের সাহচর্য্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

মহাবল শব্দের অর্থ

নেপালে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংমিশ্রণ

ধর্ম্মকোষসংগ্রহ নামক একখানি আধুনিক পুঁথি অন্বেষণ করিতে করিতে মহাকালের বাসস্থান নির্দ্দেশক সামান্য উল্লেখ পাইয়াছি; পুস্তকখানি নেপাল দরবারের পণ্ডিত বজ্রাচার্য্য অমৃতানন্দ কর্ত্তৃক নেপালের রেসিডেন্ট হজসন্ সাহেবের অনুরোধে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বের লিখা; স্বয়ম্ভুপুরাণ হইতে সঙ্কলন করিয়া পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে কথিত আছে, বুদ্ধশাসন রক্ষার জন্য মহাকালমূর্ত্তি বিহারাদি বুদ্ধক্ষেত্রে স্থাপিত হয়। মহাকাল স্থানের তোরণাকার দ্বারোপরি বুদ্ধনামাদি অঙ্কিত হয় বা বুদ্ধমূর্ত্তি চিত্রিত হয়। মূলটি এই:— "অতো বুদ্ধশাসনরক্ষণার্থং সঃ মহাকালঃ বিহারাদিষু বুদ্ধক্ষেত্রেষু স্থাপিতঃ স্থাপনীয়শ্চ। তত্তোরণাকার দ্বারস্যোপরি বুদ্ধস্য নামাদি।" মহাকালের সাধনা সাধকের পক্ষে রহস্য ও গূঢ়ার্থপূর্ণ হইলেও ঐতিহাসিকের চক্ষে চিন্তার দ্বার খুলিয়া দিবে, আশা করা যায়। এই জন্যই এ দেবতার সাধনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইল। তেঙ্গুর তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডে শবরি কর্ত্তৃক "গুহ্যসাধনা" নামে যে সাধনা দৃষ্ট হয়, তাহা মহাকাল সম্বন্ধে। সাধনামূলক চক্রটির একটি চিত্র আমি অঙ্কিত করিয়াছি। ইঁহা দ্বারা অনায়াসে বুঝা যাইবে যে, সাধনার মূলে কিরূপ বিরাট্ কল্পনা রহিয়াছে।

নেপালের ধর্ম্মকোষসংগ্রহ নামক আধুনিক পুঁথিবর্ণিত মহাকাল-সাধনা

সাধক ধ্যান করিতে করিতে দেখিবেন যে, বায়ুর উপর অগ্নি প্রতিষ্ঠিত, অগ্নির উপর জল, জলের উপর মৃত্তিকা, মৃত্তিকার উপর সুমেরু এবং সুমেরুর উপর ক্রম্ অক্ষর; দেখিবেন যে, এই "ক্রম্" অক্ষর হইতে একটি প্রকোষ্ঠ প্রকাশিত; ইহার মধ্যে বিশ্ববজ্র, বিশ্ববজ্রের উপর পদ্ম, পদ্মের উপর সূর্য্য, সূর্য্যের উপর চন্দ্র, চন্দ্রের উপর পুরুষ ও স্ত্রীগণপতিমূর্ত্তি শয়ান। এই দুই মূর্ত্তির উপর শ্রীমহাকৃতি হেরুক অর্থাৎ মহাকাল বিরাজমান, ইঁহার এক মুখ, ছয় হাত ও ভয়ঙ্কর রূপ, হস্তে কর্ত্তরী, কপাল, ডমরু, রক্তপূর্ণ কপাল, ডমরু ও পাশ; বামপদ লম্বমান ও দক্ষিণ পদ অর্দ্ধপ্রসৃতভাবে উত্থিত, সর্প ও অস্থির আভরণ পরিহিত, ইনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া

তেঙ্গুরান্তর্গত গুহ্যসাধনান্তর্গত মহাকাল-সাধনা

আছেন। ইঁহার স্ত্রী বা শক্তি শুক্লজ্ঞানা স্বামীর মুখোমুখী হইয়া দৃঢ়ালিঙ্গনবদ্ধনে দণ্ডায়মান। শুক্লজ্ঞানার বর্ণ পদ্মরাগের ন্যায়। ইঁহার এক মুখ, দুই বাহু, তিন নেত্র, হস্তে ডমরু এবং কপাল। স্বামীর মুখোমুখী দণ্ডায়মান বলিয়া ইঁহার দক্ষিণ পদ প্রসারিত ও বাম পদ উত্থিত।

পূর্ব্বোক্ত মহাকালকে কেন্দ্রে রাখিয়া সাধক চারি পার্শ্বে চারিটি নাথ কল্পনা করিবেন। এই সকল নাথেরাও শক্তি সহিত বিরাজমান ও গণপতির উপর দণ্ডায়মান। পূর্ব্বদিকের নাথের এক হস্তে চক্রের হাতলযুক্ত কর্ত্তরী ও অন্য হস্তে কপাল; দক্ষিণ দিকস্থ নাথের এক হস্তে রত্ন-নির্ম্মিত হাতলযুক্ত কর্ত্তরী ও অপর হস্তে কপাল; পশ্চিম দিকস্থ নাথের হস্তে পদ্মের হাতলযুক্ত কর্ত্তরী ও কপাল; উত্তর দিকের নাথের হস্তে বিশ্ববজ্রের হাতলযুক্ত কর্ত্তরী ও কপাল। ইঁহাদের বর্ণ যথাক্রমে শ্বেত, পীত, লোহিত ও হরিৎ। সাধক কল্পনা করিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত চারিজন নাথের চতুর্দ্দিকে ১৬ জন ভক্ত রহিয়াছেন; ইঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে উত্তর, পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম—এই চারিদিকে ব্রহ্মসদ্ বা নাথরক্ষক, ক্ষেত্রপাল, জিনমিত্র ও টাকীরাজা রহিয়াছেন। ব্রহ্মসদের হস্তে শূল ও পাশ; ক্ষেত্রপালের হস্তে কর্ত্তরী ও কপাল, জিনমিত্রের হস্তে দণ্ড ও কপাল এবং টাকীরাজার হস্তে অঙ্কুশ ও কপাল বর্ত্তমান। ইঁহাদের চতুর্দ্দিকে দশজন দিক্‌পাল। আট জন দিক্‌পাল এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে যথাক্রমে ব্রহ্মা ও নাগ। ইঁহাদের চারিপার্শ্বে বৈশ্রবণ প্রভৃতি চারি জন রাজা; ইঁহাদের বাহিরে আট জন দেবতা। ইঁহাদের চতুর্দ্দিকে নয় জন বীর বা ভৈরব। তিব্বতী ভাষায় ইঁহাদের নাম জিগ্‌ছেৎ (Hjigs-Byed); এই নয় জন ভৈরব বা বীরের চতুঃপার্শ্বে ৮ জন নাগ; ইঁহাদের বাহিরে ২৮ নক্ষত্র এবং সর্ব্ব বাহিরে ৭৫ জন নাথ।

মহাকাল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা গেল, কিন্তু এখনও একটি অতি প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করি নাই। সেটি তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে; এটি না জানিলে তাঁহার স্বরূপ বুঝা যাইবে না। তেঙ্গুর তান্ত্রিক অংশের ৭৩ খণ্ডে ১৪ বি পৃষ্ঠার ৫ম পঙ্‌ক্তিতে আমাদের আলোচ্য মহাকালকে "দশভূমি ঈশ্বর নাথ অবলোকিতেশ্বর" বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে বিষ্ণু, শিব, বৈশ্রবণ অষ্ট ভূমিতে অবস্থিত, অবলোকিতেশ্বর দশভূমি, বুদ্ধ বজ্রধর ত্রয়োদশ ভূমি। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, মহাকাল অবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণকায়া। অবলোকিতেশ্বরের অনেক নির্ম্মাণকায়া আছে। যে গণপতির উপর মহাকাল দণ্ডায়মান, ইনিও অবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণ-কায়া।

মহাকাল নির্দ্দিষ্ট ভূমি

তেঙ্গুর তান্ত্রিকাংশের ৮৩ খণ্ডে পণ্ডিত অমোঘবজ্র-বিরচিত গণেশ-স্তোত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গণপতি স্বর্গলোকে দেবতাদিগের স্বার্থবহ ছিলেন, ও আপন পুণ্যে চ্যুত হইয়া স্বর্গ হইতে আসিয়া মহাদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন; এবং ইনি আর্য্যাবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণ-কায়া। অতএব গণপতি ও মহাকাল এক ভূমিরই দেবতা। মহাকাল গণপতির উপর দণ্ডায়মান বলিয়া, ইহা মনে করা অসঙ্গত যে, মহাকাল গণপতি অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর দেবতা। তবে কেন যে ইনি গণপতির উপর দণ্ডায়মান, তাহা অবগত নহি। আমি যে লামার নিকট অধ্যয়ন করিতেছি,

গণপতি ও মহাকাল একই ভূমির দেবতা

মহাকবি কালিদাসের সময় উজ্জয়িনীর প্রধান দর্শনীয় বস্তুগুলির মধ্যে মহাকালমন্দির অন্যতম এবং ইহার যশঃ ভারতের চারিধারে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। উজ্জয়িনীর মহাকাল অতি প্রাচীন; ইহা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে ৬৮টি স্বয়ম্ভূলিঙ্গ আছে, তাহাদের একটি। স্কন্দপুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে। মহাকালের সহিত জৈনদিগের ইতিহাসেরও অল্প-বিস্তর সংযোগ আছে। প্রবাদ আছে যে, জৈন ন্যায়শাস্ত্রপ্রবর্ত্তয়িতা সিদ্ধসেন দিবাকর বা কুমুদচন্দ্র কল্যাণ-মন্দিরস্তবে উজ্জয়িনীস্থ মহাকাল মূর্ত্তি হইতে পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি আবির্ভাব করাইয়াছিলেন।

উজ্জয়িনীর মহাকাল স্বয়ম্ভূলিঙ্গবিশেষ

এইবার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখিব, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মান্তর্গত মহাকাল ও বৌদ্ধ মহাকালের মধ্যে কিরূপ প্রভেদ বিদ্যমান।

যাঁহারা কালীপূজা-পদ্ধতির সহিত পরিচিত, তাঁহারা অবগত আছেন যে, কালীপূজার প্রথম পর্য্যায়ান্তে যথাক্রমে পঞ্চদশশক্তি, অষ্টশক্তি, অষ্টভৈরব, বটুকগণ, ডাকিনী, যোগিনী, ক্ষেত্রপাল, গণপতি, লোকপাল প্রভৃতির পূজা করিয়া দেবীর দক্ষিণে মহাকালের পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসারোক্ত পূজাপদ্ধতি একটু সংক্ষিপ্ত হইলেও মহাকালের পূজা হিসাবে বিশেষ বিরোধ দৃষ্ট হয় না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় তৎসঙ্কলিত তন্ত্রসারে কুমারীকল্পতন্ত্র হইতে মহাকালের যে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহাতে মহাকালভৈরবকে সর্ব্ববিঘ্ননাশ করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

কালীপূজা ও মহাকাল পূজা

হুঁ ক্ষ্রৌং যাং রাং লাং বাং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় হ্রীং শ্রীঁ ফট্ স্বাহা।

তন্ত্রোক্ত এই মন্ত্র হইতে বুঝিলাম যে, মহাকাল ভৈরবস্বরূপ, তবে অষ্টভৈরবের অন্তর্গত নহে।

কালীপূজার মহাকাল শিববিশেষ,* ইনি শিবানুচর নহেন; ভৈরব শিব ও শিবানুচর—দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রের প্রথম পটলে দেখিয়াছি যে, পার্ব্বতী মহাদেবকে ভৈরব নামে সম্বোধন করিতেছেন, যথা—

"অন্যচ্চ বিবিধং কার্য্যং প্রসাদাদ্ ব্রূহি ভৈরব।"

কালীপূজাবিধানোক্ত মহাকাল শিবের নামভেদ

এইবার তন্ত্রসারোক্ত মহাকালবর্ণনাটির সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটি মিলাইয়া লওয়া যাউক। আমরা দেখিব যে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য বর্ত্তমান।

মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতং।
জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্॥

উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রের তৃতীয় পটলে গ্রামের উচ্চাটন সম্পাদন মন্ত্রে মহাকালকে রুদ্ররূপে আহ্বান করা হইয়াছে। ওঁ নমো ভগবতে মহাকালরুদ্রায় ত্রিপুরবিনাশনকারণায় দহ দহ ধম ধম পচ পচ মথ মথ মোহয় মোহয় উন্মাদয় উন্মাদয় উচ্ছাদয় উচ্ছাদয় শ্রীমহারুদ্র আজ্ঞাপয়তি শঙ্করী, মোহিনী, ভগবতী খেং খেং হুঁ ফট্ স্বাহা।

উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রোক্ত মহাকাল।

ইহাতেও দেখিলাম, মহাকাল শিববিশেষ, শিবানুচর নহেন; কিন্তু কার্য্য বৌদ্ধ মহাকালের ন্যায়।

কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত মহাকাল

শ্রীজ্ঞানানন্দ পরমহংস-বিরচিত কৌলাবলীতন্ত্র পাঠ করিবার সময় অনেক স্থলে মহাকালের উল্লেখ পাইয়াছি। এখানেও মহাকাল শিবের নামভেদ। উদাহরণস্বরূপ বিংশ উল্লাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে মহাকাল কেবলমাত্র শিব নহেন, শিবানুচরও বটে। কৌলাবলী তন্ত্রের বীরসাধনা-বিষয়ক চতুর্দ্দশ উল্লাসে ইহাকে শিবানুচররূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

শ্মশানাধিপতিং পশ্চাৎ ভৈরবং কালভৈরবং।
মহাকালং যজেদ্‌যত্নাৎ পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ম্॥

ইহাদের বিঘ্নবিনাশনের জন্য পূজা করা হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে মণিনাগেশ্বর শিবমন্দিরের দ্বারদেশে যে ভৈরবমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকে স্থানীয় লোকে মহাকাল বলিয়া অভিহিত করে।

ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত মহাকালমূর্ত্তি

কয়েকখানি তন্ত্র পাঠ করিয়া দেখিয়াছি যে, বিভিন্নশ্রেণীর ভৈরবদিগের বর্ণনা প্রায় একই প্রকারের। ইহা হইতে যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। অঘোর, বটুকভৈরব, বা ক্ষেত্রপাল—প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর একই প্রকারের; কার্য্যও অনেকটা এক ধরণের।

(১) সারদা-তিলক তন্ত্রোক্ত অঘোরের ধ্যান :—

সজলঘনসমাভং ভীমদংষ্ট্রং ত্রিনেত্রং
ভুজগধরমঘোরং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্।
পরশু-ডমরু-খড়্গান্ খেটকং বাণচাপৌ
ত্রিশিখনরকপালে বিভ্রতং ভাবয়ামি॥

(২) কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত বটুকনাথের ধ্যান :—

করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণি-
স্তরুণতিমিরনীলো ব্যালযজ্ঞোপবীতী।
ক্রমসময়সপর্য্যাবিঘ্নবিচ্ছেদহেতু-
র্জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্॥

(৩) কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত ক্ষেত্রপালের ধ্যান :—

নির্ব্বাণং নির্ব্বিকল্পং নিরুপমসকলং নির্ব্বিকারং ক্ষকারং
হুঁকারং বজ্রদংষ্ট্রং হুতবহনয়নং রৌদ্রমুন্মত্তভাবং।

কট্‌কারং বদ্ধনাগং ভ্রুকুটিতমুখং ভৈরবং শূলপাণিং
খট্টাঙ্গং ব্যোমনীলং ডমরুসহিতং ক্ষেত্রপালং নমামি ॥

(৪) সারদাতিলকে ক্ষেত্রপালের ধ্যান :—

নীলাঞ্জনাদ্রিনিভমূর্দ্ধপিশঙ্গকেশং
বৃত্তোগ্রলোচনমুপাত্তগদাকপালং।
আশাম্বরং ভুজগভূষণমুগ্রদংষ্ট্রং
ক্ষেত্রেশমদ্ভুততনুং প্রণমামি দেবম্ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অসংখ্য বর্ণনা উদ্ধার করা যাইতে পারে। এগুলিতে প্রায় একরূপই বর্ণনা। সৌভাগ্য বশতঃ ধর্ম্মপূজাবিধানোক্ত দুইটি শ্লোক হইতে আমরা মহাকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত মন্তব্যে পঁহুছিতে পারিব। বাগেশ্বর ও লোহজঙ্ঘের পূজার পর ও দশ দিক্‌-পালের পূজার পূর্ব্বে পণ্ডাসুর-পূজার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। আমি পূর্ব্বে তিব্বতীয় বজ্রযানোক্ত সাধনা-গ্রন্থ হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পণ্ডাসুর ও মহাকাল পণ্ডক বা মনিং নাক্‌ পো (Manin-Nagpo) একই; ধর্ম্মপূজাবিধানে পণ্ডাসুরকে ক্ষেত্রপালরূপে নমস্কার করা হইয়াছে। যথা,—

ধর্ম্মপূজাবিধান পুস্তক হইতে মহাকাল সম্বন্ধে যাথার্থ্য নির্ণয়

ওঁ পণ্ডাসুর ইহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ।
পাহি মামিক্ষুষন্ত্রে (:) ত্বং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ ॥
ওঁ পণ্ডাসুরায় নমঃ ॥
ওঁ পণ্ডাসুর নমস্তভ্যমিক্ষুবাটিনিবাসিনে।
যজমানহিতার্থায় গুড়বৃদ্ধিপ্রদায়িনে ॥
ও পণ্ডাসুরায় নমঃ ॥

তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, বৌদ্ধ মহাকাল ক্ষেত্রপাল বিশেষ। শিব হইতে ভাব লইয়া এ মূর্ত্তি কল্পিত হয় নাই। শৈবাগম মতে ক্ষেত্রপালে শিবের একাদশ-সহস্র অংশ বর্ত্তমান। ডাঃ আইটেল তাঁহার Handbook of Chinese Buddhism গ্রন্থে মহাকালের মহাদেব অর্থ দিয়া যথার্থই বলিয়াছেন যে, ইনি মহাদেবের শিব্য বিশেষ এবং, বিহারের রক্ষয়িতা। শেষোক্ত অর্থই বৌদ্ধ মহাকালে প্রযোজ্য।

মহাকাল ক্ষেত্রপাল বিশেষ

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে; প্রশ্নটি এই যে, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে ক্ষেত্রপাল আশাম্বর বা নগ্ন বলিয়া বর্ণিত। আমাদের আলোচ্য মহাকালটি ত নগ্ন নহে, পরন্তু ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত। এইরূপ কেন?

ধর্ম্মকোষসংগ্রহে বর্ণিত আছে,—

"ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরঃ তস্য নাম মহাকাল মহাবীরঃ।" ভৈরব শিবের অনুচর ও অংশ বলিয়া কোন কোন ভৈরবে শিবের অনেকগুলি গুণ বর্ত্তমান; এই হিসাবে অঘোর ভৈরবকে "রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্"

বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হিসাবে শিবের ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর ভাবটি মহাকালে সংক্রামিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আর এক কথা আছে।

নেপাল হইতে আনীত এ মূর্ত্তিটিতে তিব্বতীয় প্রভাব বিশেষভাবে বর্ত্তমান; তিব্বতীয় ভঙ্গী, রীতি বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান। তিব্বতীয় মূর্ত্তিগুলিতে বন্-পোদিগের প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। তিব্বতস্থ বন্-পোদের ধর্ম্ম বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অপেক্ষাও প্রাচীনতর। তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের সভ্যতা, তাহাদের শিল্প গুরুপদ্মসম্ভব-প্রবর্ত্তিত বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম্ম,সভ্যতাও শিল্প অপেক্ষা অনেক পুরাতন; উভয়ের মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য বর্ত্তমান; বিশেষতঃ শিল্পে। অনেক বন্-পোমূর্ত্তি ভ্রমক্রমে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নেপালী ও তিব্বতীয় শিল্প

এই সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটির সভাতে Mr. Van Manen একটি বন্ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন; অনেক বিষয়ে, মস্তকের পঞ্চ কপালটি—এমন কি, দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত অদ্যকার আলোচ্য মহাকাল মূর্ত্তিটির মত। আমার বোধ হয়, নেপালী শিল্পে তিব্বতীয় বৌদ্ধ ও বন্-পো—উভয় প্রভাবই বর্ত্তমান। অদ্য এ কথার আভাস দিলাম মাত্র; আপনারা যদি অনুমতি করেন, বারান্তরে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিব।

তিব্বতীয় বন্ মূর্ত্তি

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উনত্রিংশ খণ্ডের

নাম-সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রিংশ ভাগ

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

—:০:—

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩৩০

বার্ষিক মূল্য ৩৸০
ডাকমাশুল সমেত]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
সদস্যগণপক্ষে বিনামূল্যে]

ত্রিংশ ভাগের সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

যোগেন্দ্র বাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ*

১৩২৩ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে যোগেন্দ্র বাবু জ্যামিতিতে ব্যবহৃত স্বতঃসিদ্ধগুলিকে দুই প্রকার দেখাইয়াছেন। যথা,—ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ও নবগঠিত স্বতঃসিদ্ধ। ব্যবহৃত স্বতঃসিদ্ধের তালিকার মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য়, ৮ম ও ৯ম এই-গুলিকে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ নামে অভিহিত করিয়াছেন, আর অবশিষ্টগুলিকে নব-গঠিত স্বতঃ-সিদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেন না, অবশিষ্ট স্বতঃসিদ্ধগুলি ইউক্লিড্-কৃত জ্যামিতিতে স্থান পায় নাই, ঐ সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ পরবর্ত্তী জ্যামিতিকারগণ সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে ব্যবহৃত স্বতঃসিদ্ধের তালিকাটী দেওয়া হইল। যথা,—

১। যাহারা কোন একটীর সমান, তাহারা পরস্পর সমান।

২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমান যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।

৩। সমান সমান হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান।

৪। অসমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি অসমান এবং বৃহত্তরের সঙ্গে যোগ করিয়া যে সমষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বৃহত্তর।

৫। অসমান বস্তু হইতে সমান সমান বস্তু বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট অসমান এবং বৃহত্তর হইতে বিয়োগ করিয়া যে অবশিষ্ট পাওয়া যায়, তাহা বৃহত্তর।

৬। সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ পরস্পর সমান।

৭। সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান।

৮। যাহারা পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহারা পরস্পর সমান।

৯। অংশ অপেক্ষা সমুদায় বৃহত্তর।

১০। দুই সরল রেখার দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।

১১। সকল সমকোণ পরস্পর সমান।

১২। যদি একটি সরল রেখা অপর দুইটী সরল রেখার উপর পতিত হওয়ায়, এক পার্শ্বস্থ

* ১৩২৯।২৬এ কার্ত্তিক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

অন্তরস্থ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হয়, তবে উক্ত পার্শ্বে সরল রেখাদ্বয় অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি করিলে, পরস্পর মিলিত হইবে।

এই নবগঠিত স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে নিম্নলিখিত স্বতঃসিদ্ধগুলিকে স্বতঃসিদ্ধধর্মাক্রান্ত নহে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, কেন না উহারা ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ কয়েকটীর সাহায্যেই প্রমাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইউক্লিডের তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধটীও প্রমাণ করিয়াছেন।

১। অসমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি অসমান এবং বৃহত্তরের সঙ্গে যোগ করিয়া যে সমষ্টি হইয়াছে, তাহা বৃহত্তর। (৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ)

২। অসমান বস্তু হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট অসমান এবং বৃহত্তর হইতে বিয়োগ করিয়া যে অবশিষ্ট পাওয়া যায়, তাহা বৃহত্তর। (৫ম স্বতঃসিদ্ধ)

৩। সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ পরস্পর সমান। (৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধ)

৪। সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান। (৭ম স্বতঃসিদ্ধ)

৫। সমান সমান বস্তু হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান। (৩য় স্বতঃসিদ্ধ)

এক্ষণে আপত্তি এই যে, উহারা কোনক্রমেই ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ কয়েকটীর সাহায্যে প্রমাণিত হইতে পারে না। লেখক কর্তৃক প্রদত্ত (১) "দুইটী বস্তু পরস্পর সমান হইবে অথবা তাহাদের একটী বৃহত্তর অপরটী লঘুতর হইবে। (২) বৃহত্তর লঘুতরের সমান হইতে পারে না।" এই দুইটী সত্য ব্যতীতও আর কতকগুলি সত্যের প্রয়োজন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে। যে সমস্ত সত্য আবশ্যক বোধে পরে বিবৃত করা হইয়াছে, যদি সেই সমস্ত সত্য উক্ত সত্য দুইটীর মত পূর্ব্বেই যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ হইত, তাহা হইলে স্বীকার করিতে পারিতাম যে, তাঁহার প্রমাণগুলি deductive reasoning অনুসারে নির্দ্দোষ হইয়াছে।

যোগেন্দ্র বাবুর প্রদত্ত উক্ত সত্য দুইটী জ্যামিতিক প্রমাণে প্রায়ই দরকার হয়, কিন্তু তাহার উল্লেখ না থাকায়, প্রতিজ্ঞার প্রমাণগুলি deductive reasoning অনুসারে নির্দ্দোষ বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা চলে না, কেন না Geometrical reasoning is said to be deductive, because by a connected chain of argument it deduces new truths from truths already proved or admitted. সুতরাং কোন সত্যের সাহায্য লইতে হইলে, তাহাকে সাহায্যের পূর্ব্বেই সত্য বলিয়া স্বীকার কিংবা প্রমাণিত করিতে হইবে। এস্থলে যোগেন্দ্র বাবু উক্ত সত্য দুইটীর সাহায্য লইবার পূর্ব্বেই যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ করায়, অন্যান্য জ্যামিতিকারগণের প্রমাণ অপেক্ষা তাঁহার প্রমাণ অনেক নির্দ্দোষ হইয়াছে।

৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধটীর প্রমাণের নিমিত্ত বলিয়াছেন, "কএর এরূপ একটী ভগ্নাংশ আছে, যাহা খএর সমান। মনে কর, উক্ত ভগ্নাংশ চ।" এক্ষণে আপত্তি এই যে, এই প্রকার অনুমান কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে মনে করিতে পারি? নিম্নলিখিতরূপ statementটী যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে এ প্রকার অনুমান করিতে পারি। সুতরাং এস্থলে

একটী নূতন সত্যের আবশ্যক হইতেছে। statementটী এই যে,—From the greater a part can be taken equal to the less. কিন্তু এই সত্যটী ইউক্লিডের সতঃসিদ্ধের তালিকার বহির্ভূত।

"ক; চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটী বস্তুর সমষ্টি। অতএব ক ও গএর সমষ্টি চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটী বস্তু ও গএর সমষ্টি।" অর্থাৎ গ বস্তুতে একবার, ক বস্তু, আর একবার ক বস্তুর সমান চ, ছ প্রভৃতি যোগ হইতেছে, সুতরাং যোগফল পরস্পর সমান। ইহা কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে নিষ্পন্ন হইল? যোগফল সমান স্বীকার করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ statementটীর আবশ্যক হইতেছে,—If equals be added to the same thing, then the sums are equal. অথচ ইহা ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে স্থান পায় নাই। এই statementটী কেহ যেন ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধের অনুরূপ বলিয়া মনে না করেন, কেন না, উক্ত স্বতঃসিদ্ধে আর এই statementএ পার্থক্য রহিয়াছে—ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ বলিতেছে, **সমান সমান বস্তুতে** সমান সমান বস্তুর যোগ ইত্যাদি, (অর্থাৎ একাধিক বস্তুতে যোগ) আর এস্থলে আবশ্যক হইতেছে, **একই বস্তুতে** সমান সমান বস্তুর যোগ ইত্যাদি, (অর্থাৎ একাধিক বস্তুতে যোগ নহে)। সমান সমান বস্তু যে একই বস্তু হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

খ, চএর এবং ঘ, গএর সমান বলিয়া প্রথম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে খ ও ঘএর সমষ্টি গ ও চএর সমষ্টির সঙ্গে সমান—অর্থাৎ সমান সমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান হইবে—ইহা প্রথম স্বতঃসিদ্ধ নহে, পরন্তু ইহা দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ। এই ত্রুটি বোধ হয়, মুদ্রাকরের অনবধানতা বশতঃ ঘটিয়াছে।

গ ও চএর সমষ্টি গ, চ, ছ প্রভৃতির সমষ্টির ভগ্নাংশ। আবার গ ও চএর সমষ্টি খ ও ঘএর সমষ্টির সমান ও গ, চ, ছ প্রভৃতির সমষ্টি ক ও গএর সমষ্টির সমান। সুতরাং খ ও ঘএর সমষ্টি অপেক্ষা ক ও গএর সমষ্টি বৃহত্তর। ইহা কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে নিষ্পন্ন হইল? ইহা যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত সত্যটীর আবশ্যক হইতেছে। যথা,—কোন বস্তু কোন বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে, প্রথমোক্ত বস্তুর সমান বস্তু দ্বিতীয়োক্ত বস্তুর সমান বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে। অথচ এই সত্যটীও ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের তালিকার বহির্ভূত।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, এই স্বতঃসিদ্ধটীর প্রমাণ ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ব্যতীত নিম্নলিখিত সত্যগুলিরও সাহায্য লইতেছে। যথা,—

১। বৃহত্তর হইতে ক্ষুদ্রতরের সমান করিয়া অংশ লওয়া যাইতে পারে।

২। একটী বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান হইবে।

৩। কোন বস্তু কোন বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে প্রথমোক্ত বস্তুর সমান বস্তু দ্বিতীয়োক্ত বস্তুর সমান বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

উল্লিখিত সত্যগুলি যদি প্রমাণের পূর্ব্বে যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রমাণটী বিশুদ্ধ জ্যামিতিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে।

৫ম স্বতঃসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণের ন্যায় বলিয়া উহার প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই।

এই স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণের ন্যায়, অর্থাৎ যে সকল সত্যের দ্বারা ও যে opperation দ্বারা চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত হইয়াছে, ঠিক সেই সকল সত্য ও সেই opperation দ্বারা এই স্বতঃসিদ্ধও প্রমাণিত হইবে, যদি ইহাই বুঝায়, তাহা হইলে কখনই এই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত হইতে পারে না। কেন না, যখন প্রমাণিত হইবে—ক ও গএর অবশিষ্ট চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটী বস্তু ও গএর অবশিষ্ট, তখন আর একটী নূতন সত্যের * দরকার হইবে, যে সত্যের দরকার, চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণে কোনক্রমে দরকার হইতে পারে না, আর opperation হইবে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অর্থাৎ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধে opperation হইয়াছে addition আর এই স্বতঃসিদ্ধের opperation হইবে subtraction। পার্থক্য যখন এত, তখন কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারি যে, পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় ?

৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধ। "মনে কর, কএর সমান ঘ ও ঙ এই দুইটী বস্তুর সমষ্টি খ এবং উক্ত কএর সমান চ ও ছ এই দুইটী বস্তুর সমষ্টি গ।" এক্ষণে ঘ ও ঙএর সমষ্টি খ এবং চ ও ছএর সমষ্টি গ মনে করিলে তবেই প্রমাণিত হয় যে, খ ও গ পরস্পর সমান। কিন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, এমন কোন সুসঙ্গত কারণ (either admitted or proved) দেখিতে পাইতেছি না যে, যাহাতে আমরা ঘ ও ঙএর সমষ্টি খ এবং চ ও ছএর সমষ্টি গ মনে করিতে বাধ্য হই।

আর একটী কথা—এই স্বতঃসিদ্ধের সাধারণ সূত্রে (General Enunciation) রহিয়াছে—"সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ পরস্পর সমান", আর ইহার বিবরণ সূত্রে (Particular Enunciation) রহিয়াছে "খ ও গএর প্রত্যেকে কএর দ্বিগুণ ; খ ও গ পরস্পর সমান হইবে।" অর্থাৎ বলা হইল, একই বস্তুর দ্বিগুণ সকল পরস্পর সমান। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সাধারণ সূত্রে ও বিবরণ সূত্রে সামঞ্জস্য নাই।

৭ম স্বতঃসিদ্ধ। "যদি খ ও গ পরস্পর সমান না হয়, তবে ইহাদের দ্বিগুণও অসমান। কিন্তু তাহা অসম্ভব।" অসম্ভব যে কেন, তাহা বুঝিলাম না। খ ও গ সমান না হইলে উহাদের দ্বিগুণ অসমান হওয়াই সম্ভব। ইহাতে অসম্ভবের স্থান কোথায় ? আর উক্ত রাশিদ্বয়ের দ্বিগুণ অসমান স্বীকার করায়, যদি কোন সত্যের (admitted or proved) ব্যতিক্রম কিংবা অপলাপ ঘটে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয় যে, উহাদের দ্বিগুণ অসমান হওয়া

* সমান সমান বস্তু হইতে একই বস্তু বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান হয়।

অসম্ভব। এ স্থলে উক্ত রাশিদ্বয়ের দ্বিগুণ অসমান স্বীকার করায় কোন সত্যের যে ব্যতিক্রম কিংবা অপলাপ ঘটিতেছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন না, অথচ বলিতেছেন, ঐ প্রকার হওয়া অসম্ভব। উক্ত প্রকার অসমান স্বীকার করায় যদি কোন সত্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, অসমান রাশি খ ও গএর দ্বিগুণ অসমান হওয়া অসম্ভব।

ইহার সাধারণ-সূত্রে রহিয়াছে, "সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান", আর বিবরণ-সূত্রে রহিয়াছে, "খ ও গ প্রত্যেকে কএর অর্দ্ধ, খ ও গ সমান হইবে", অর্থাৎ খ ও গ দুই সমান বস্তুর অর্দ্ধ না হইয়া একই বস্তুর অর্দ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এস্থলেও সাধারণ-সূত্রে ও বিবরণ-সূত্রে সামঞ্জস্য নাই।

৬ষ্ঠ ও ৭ম স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ না করিয়া উহাদের পরিবর্ত্তে ঐ স্থলে অন্য কিছু প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন।

তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধ—"ক হইতে গ বিয়োগ করিলে ঙ অবশিষ্ট থাকে। অতএব ক ; গ ও ঙএর সমষ্টি।" ইহা কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে নিষ্পন্ন হইল? এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি—কেক আমরা **সমস্ত** বলিব আর গ ও ঙকে যথাক্রমে **গৃহীত** ও **অবশিষ্ট** বলিয়া উল্লেখ করিব। এখানে আপত্তি এই যে, গৃহীত ও অবশিষ্টের সমষ্টি সমস্তের সঙ্গে সমান, ইহা সত্য বলিয়া ইতিপূর্ব্বে গৃহীত না হওয়ায়, স্বীকার করিতে পারি না যে, ক ; গ ও ঙএর সমষ্টির সমান। যদি এই সিদ্ধান্তটী স্বীকার করিতে হয়, তবে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ব্যতীত এস্থলে আরও একটী স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োজন হইতেছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, স্বতঃসিদ্ধগুলির প্রমাণ কোনটীই deductive science অনুসারে নির্দ্দোষ নহে।

শ্রীকৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা

১৩২৯ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মল্লিখিত 'আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা' প্রবন্ধে আমি 'aberration'এর পরিভাষা 'চ্যুতি' করিয়া, 'chromatic aberration', 'spherical aberration' ও 'aplanatic এর পরিভাষা যথাক্রমে 'বর্ণচ্যুতি', 'বর্ত্তুলচ্যুতি' ও 'চ্যুতিহীন' করিয়াছি। যখন আমি উল্লিখিত প্রবন্ধ লিখি, তখন আমার 'নাগরী-সাহিত্য-প্রচারিণী' সভা হইতে প্রকাশিত 'ভৌতিক পরিভাষা' দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। সম্প্রতি একখানি 'ভৌতিক পরিভাষা' আমি পাইয়াছি। উক্ত পুস্তিকায় 'aberration', 'chromatic aberration', 'spherical aberration', 'aplanatic'এর পরিভাষা যথাক্রমে 'রঙ্গাপেরণ', 'গোলাপেরণ' ও 'অনপেরক' করা হইয়াছে। মদ্রচিত পরিভাষাগুলি অপেক্ষা 'ভৌতিক পরিভাষার' পারিভাষিক শব্দগুলি অধিকতর সুন্দর। যদি আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে পুস্তকটি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমাকে নূতন শব্দরচনায় শ্রম-স্বীকার করিতে হইত না। কেবলমাত্র 'chromatic aberration' ও 'spherical aberration'এর পরিভাষা রঙ্গাপেরণ ও "গোলাপেরণ" না করিয়া যথাক্রমে বর্ণাপেরণ ও 'বর্ত্তুলাপেরণ' করিবার আমি পক্ষপাতী। Long sight (Hypermetropia)—এর পরিভাষা ভ্রমক্রমে 'চালিশা' ছাপা হইয়াছে, ইহার পরিভাষা 'হাইপার মেট্রোপিয়া' হইবে। আমরা বাঙ্গালায় "চালিশা" অর্থে যাহা বুঝি, ঠিক সেই অর্থেই ইংরাজী Presbyopia শব্দ ব্যবহৃত হয়।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র*

(মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস)

(২)

অতঃপর তৎকালের লোকের অবস্থান (e. g. distribution of population) সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বর্ত্তমানের ন্যায় তৎকালের ভারতের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করিত। গ্রামগুলির অধিকাংশই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং গ্রামবাসীরা প্রায়ই ভূমিকর্ষণ বা চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ফলে গ্রামগুলির অবস্থান এবং ব্যবস্থাও সেইরূপ ছিল। গ্রামের মধ্যভাগেই বাস্তু বা বাসের স্থান ছিল। এই খণ্ডে লোকের বাসগৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। সাধারণতঃ সমান্তরাল দুই তিনটি রাস্তা থাকিত ও উহার উভয় পার্শ্বে গৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। গণ্ডগ্রামগুলিতে অধিক লোকের বাস ছিল এবং উহার আয়তন ও নির্ম্মাণপ্রণালী বিভিন্ন হইত। এই বাস্তুখণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে চাষের জমি ও উহার পর বিস্তীর্ণ গোচারণভূমি বা গোপ্রচার থাকিত। এই গোচারণ ভূমি সাধারণের সম্পত্তি ছিল এবং উহাতে সকলেরই অধিকার ছিল। সকলেই প্রয়োজন মত নিজ নিজ গো-মহিষাদি চরাইতে পারিতেন, তবে অকারণ গো-মহিষাদি ছাড়িয়া রাখিলে দণ্ডনীয় হইতেন। অর্থশাস্ত্রে গোচারণভূমির রক্ষার জন্য বিশেষ বিধির উল্লেখ দেখা যায়। (কেহ অযথা উক্ত ভূমির অন্যায়রূপে অধিকার করিলে (encroachment) বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হইতেন। অর্থশাস্ত্রের নির্দেশমত উক্ত গোচারণভূমির বিস্তার একশত ধনুর কম হইবার ব্যবস্থা ছিল না। (১৭২ পৃষ্ঠা।)

মৌর্য্যযুগের অবসানের অব্যবহিত পরে রচিত মনু ও অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে গণ্ডগ্রামে আরও অধিক পরিমাণে গোচারণভূমি রাখিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

গোচারণ-ভূমির পর কোন কোন গ্রামে প্রাচীর বা বেড়া দিবার ব্যবস্থা ছিল—"স্তম্ভৈঃ সমন্ততো গ্রামাদূর্দ্ধং শতাপকৃষ্টমুপশালং কারয়েৎ।" আবার অনেক গ্রাম খোলা বা উন্মুক্ত ও প্রাচীরাদি বিহীন ছিল।

সাধারণতঃ গ্রামগুলি কর্ষক-বহুল ও শূদ্রপ্রায় হইত। অর্থাৎ শূদ্রাদির সংখ্যাই অধিক ছিল এবং উচ্চবর্ণের লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইত। কতকগুলি গ্রামে আবার মাত্র একবর্ণের বা একজাতীয় লোকের বা একবৃত্তির লোকের বাস ছিল। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে অর্থাৎ বিনয়পিটক ও সূত্তপিটকে এইরূপ একবর্ণবহুল গ্রামের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। ঐ সকল গ্রন্থের নানাস্থানে আমরা ব্রাহ্মণগ্রাম বা ব্রাহ্মণনিগম ক্ষত্রিয়গ্রাম ও বৈশ্যগ্রামের উল্লেখ পাইয়া থাকি।

---

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উপরি উক্ত একবর্ণবহুল গ্রামের স্থায় কতকগুলি গ্রামে কেবল এক ব্যবসায়ে নিযুক্ত বা এক-জীবিকার লোকের বাস ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ও পরবর্ত্তী যুগে রচিত জাতকাদিতে ও মহাভারতের বহুস্থানে কুম্ভকারগ্রাম, সূত্রধরগ্রাম, তন্তুবায়গ্রাম ও কর্ম্মকার-গ্রামাদির বহু উল্লেখ আছে। বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ দিলাম না। এই শিল্পিরা নিজ নিজ ব্যবসায়ের সুবিধার জন্ত বা গ্রামবাসী উচ্চ বর্ণের লোকের হস্তে উৎপীড়িত হইবার ভয়ে এক গ্রামে সকলে সম্মিলিত হইয়া বাস করিত। ইহাতে তাহাদের আত্মরক্ষা ও ব্যবসায়ে উন্নতি—উভয় দিকই বজায় থাকিত।

প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে বিশ্রামাগার, মিলনাগার (শালা), সাধারণের ব্যবহারার্থ জলাশয়, শিক্ষাস্থান প্রভৃতি থাকিত। গ্রামের মধ্যে গ্রামদেবতার মন্দিরাদি এবং চৈত্য-বৃক্ষাদিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল মন্দিরাদি সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। গ্রাম্য দেবতাদিগের নামে উৎসর্গীকৃত ধেনু বা বৃষগুলিও গ্রামের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহাদিগকে মারিলে বা বধ করিলে অপরাধী বিশেষ দণ্ডিত হইত।

গ্রামগুলির লোকসংখ্যার অবধারণ করিবার কোন উপায় নাই; তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, অধিবাসীর সংখ্যা মন্দ ছিল না। অর্থশাস্ত্রের জনপদনিবেশাধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নূতন গ্রাম স্থাপিত হইতে হইলে, সাধারণতঃ উহাতে অনূন্ ১০০ হইতে ৫০০ শূদ্র কৃষক-পরিবারের স্থান রাখা হইত। এতদ্ভিন্ন উচ্চ বর্ণের লোক—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি, কারুবর্গ, শিল্পী, চিকিৎসক, পশু-চিকিৎসক, গ্রামাধ্যক্ষ, গ্রাম্য কর্ম্মচারিবর্গকে ভূমি দিয়া বাস করান হইত। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, শ্রোত্রিয় বা ঋত্বিক্ প্রভৃতি নিষ্কর ব্রহ্মদেয় ভূমি ভোগ করিতেন এবং তাঁহাদের দান-বিক্রয়ের স্বত্ব থাকিত। অন্ত গ্রামকর্ম্মচারিদিগকে যে জমি দেওয়া হইত, তাহাতে তাঁহাদের দানবিক্রয়ের স্বত্ব থাকিত না। তাঁহারা উহা যাবজ্জীবন ভোগ করিতে পারিতেন, (বিক্রয়াধানবর্জ্জম্")। গ্রামবাসীরা গ্রামের কার্য্য নিজেরাই দেখিতেন। বাস্তু বা সীমা লইয়া বিবাদ হইলে, গ্রামবৃদ্ধেরা উহার বিচার করিতেন। ("ক্ষেত্রবিবাদং সামন্তগ্রামবৃদ্ধাঃ কুর্য্যুঃ।") মন্দির, দেবালয়, বা সাধারণের পূজাস্থান ও চৈত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারাদি গ্রামবাসীদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। (স্বাম্যভাবে গ্রামাঃ পুণ্যশীলা বা প্রতিকুর্য্যুঃ —১৭১ পৃষ্ঠা।) ঐরূপ নাবালক দিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদের সম্পত্তির রক্ষণের ভারও গ্রামবৃদ্ধদিগের হাতে ছিল। ("বালদ্রব্যং গ্রামবৃদ্ধা বর্দ্ধয়েয়ুঃ আব্যবহার-প্রাপণাৎ দেবদ্রব্যং চ।"—৪৮ পৃষ্ঠা।) তাঁহারা গ্রামের কৃষিকার্য্য বা অন্ত কার্য্যের জন্ত নিযুক্ত গ্রামভৃতকদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। গ্রামভৃত-কেরা গ্রামেরই কর্ম্মচারী ছিল। তাঁহারা স্বাধীন কর্ম্মকর, কি দাসরূপে পরিগণিত হইত, তাহা জানা যায় না। বোধ হয়, তাহারা অস্বাধীন ও গ্রামের জনসাধারণের ভৃত্য বলিয়া গণিত হইত।

সামান্ত সামান্ত অপরাধের বিচারভারও গ্রামবৃদ্ধদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। গ্রামের কৃষক বা কারুবর্গ চুক্তিমত কার্য্য না করিলে, উহারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইত এবং উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা গ্রামের হিসাবে জমা হইত।

সাধারণের হিতার্থে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, উহাতে গ্রামবাসিমাত্রকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইত। গ্রামে কোন পুণ্যস্থান, দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে, কোন নূতন জলাশয় খনন করিতে হইলে বা কোন সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণকল্পে গ্রামবাসিমাত্রকেই উহাতে সাহায্য করিতে হইত। ঐরূপ গ্রামে কোন উৎসব-সমাজাদি হইলে বা নাটকাদির অভিনয় হইলেও গ্রামবাসীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইত। কেহ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য দানে অনিচ্ছুক হইলে, তাঁহার প্রতি দণ্ড বিধান করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সাহায্যাংশ দানে বাধ্য করা হইত এবং তাঁহার ব্যবহারের শাস্তিস্বরূপ উক্ত কার্য্যের লাভ হইতে বঞ্চিত করা হইত। এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারি। জনপদনিবেশাধ্যায়ে কৌটিল্য বলেন,—

"পুণ্যস্থানারামাণাং চ। সম্ভূয় সেতুবন্ধাদপ্রকামতঃ কর্ম্মকরবলীবর্দ্দাঃ কর্ম্ম কুর্য্যুঃ। ব্যয়-কর্ম্মণি চ ভাগী স্যাৎ। ন চাংশং লভেত।"—৪৭ পৃঃ।

অর্থাৎ গ্রামের সাধারণের হিতকর কোন কার্য্যে যোগদান না করিলে, তাঁহাকে তাঁহার ভৃত্য-বলীবর্দ্দাদি প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হইবে। ব্যয়ের ভাগ তাঁহাকে বহন করিতে হইবে, কিন্তু লাভের অংশ তিনি পাইবেন না। আর এক স্থলে কৌটিল্য বলেন,—

"প্রেক্ষায়ামনংশদঃ স্বস্বজনো ন প্রেক্ষেত। প্রচ্ছন্নশ্রবণেক্ষণে চ সর্ব্বহিতে চ কর্ম্মণি নিগ্রহেণ দ্বিগুণমংশং দদ্যাৎ।"

অর্থাৎ গ্রামে সাধারণের আমোদের জন্য কোন যাত্রা-থিয়েটারাদি হইলে বা কোন হিতকর কার্য্য হইলে, যদি কেহ উহাতে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে উঁহাকে উহা দেখিতে, বা শুনিতে দেওয়া হইবে না। যদি তিনি সাহায্য না করিয়া গোপনে উহাতে যোগদান করেন, তবে তাঁহাকে তাঁহার দেয়ের দ্বিগুণ দিতে বাধ্য করা হইবে।

বোধ হয়, এই সকল সাধারণের হিতকর বা প্রীতি-কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে গ্রামের কোন সম্রান্ত ব্যক্তিকে উহার কর্তৃত্বে নিযুক্ত করা হইত। রাজাদেশে সকলেই তাঁহার আদেশ শুনিতে বাধ্য ছিলেন। না শুনিলে দণ্ডিত হইতেন। কৌটিল্য বলেন,—

'সর্ব্বহিতমেকস্য ব্রুবতঃ কুর্য্যুঃ আজ্ঞাম্। অকরণে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।"—১৭৩ পৃঃ।

অর্থাৎ সাধারণের হিতকর কার্য্যে নেতার আদেশ শুনিতে সকলেই বাধ্য। না করিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে।

গ্রামের শাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য গ্রামের কোন এক ব্যক্তি-প্রজাসাধারণের মনোনীত বা রাজকর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। অর্থশাস্ত্রের সময় এই কর্ম্মচারী 'গ্রামিক' নামে অভিহিত হইতেন। বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী যুগে এই নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীর নাম ছিল—'গ্রামণী'। গ্রামিককে গ্রামের অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য বা তদন্ত করিবার জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তাঁহার সাহায্যার্থ ও তাঁহার কার্য্যের অনুমোদনার্থ কতিপয় গ্রামবাসীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য গ্রামবাসীদিগের মধ্য হইতে এইরূপ সমভিব্যাহারী সহায়কদিগকে

বাহিরে লওয়া হইত। কেহ গ্রামিকের সমভিব্যাহারে তদর্থে যাইতে অস্বীকৃত হইলে বা অপারগ হইলে, তাহাকে তদ্বিনিময়ে যোজন প্রতি ১½ পণ করিয়া অর্থদণ্ড দিতে হইত। কৌটিল্য বলেন,—

"গ্রামার্থেন গ্রামিকং ব্রজন্তং উপবাসাঃ পর্য্যায়েন অনুগচ্ছেয়ুঃ অননুগচ্ছন্তঃ পণার্দ্ধপণিকং যোজনং দদ্যুঃ।"

এই সকল গ্রামবাসীকে Elected Commissioners বলা যাইতে পারে। গ্রামশাসনকল্পে গ্রামিককে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হইত। এগুলি বর্ত্তমানের Lower Magisterial powers বলা যাইতে পারে। প্রমাণ পাইলে গ্রামিক চোর বা পারদারিককে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন। বিদ্বেষবশতঃ নিরপরাধ ব্যক্তিকে এইরূপে বহিষ্কৃত করিলে তিনি নিজেই দণ্ডিত হইতেন (গ্রামিকস্য গ্রামাদস্তেনপারদারং নিরস্যতঃ চতুর্বিংশতিপণো দণ্ডঃ"—১৭২ পৃ°)।

গ্রামিক ভিন্ন অন্য কোন গ্রামকর্ম্মচারীর নাম অর্থশাস্ত্রে নাই। তবে মহাভারতের সভাপর্ব্বের ৫ম অধ্যায় হইতে আমরা এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পারি। সভাপর্ব্বের উক্ত পঞ্চম অধ্যায়টি অতি প্রাচীন এবং অর্থশাস্ত্রের সমসাময়িক বা তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। উক্ত অধ্যায়ের ৮০র শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের প্রশ্নস্থলে গ্রাম-সমূহের পঞ্চ কর্ম্মচারীর কথা উল্লিখিত আছে[১]। তদ্ব্যতীত আর কিছু নাই। তবে টীকাকার এস্থলে কোন প্রাচীন গ্রন্থবিশেষ হইতে উক্ত পাঁচ জন কর্ম্মচারীর নামোদ্ধার করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতি গ্রামে নিযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পাঁচটি কর্ম্মচারীর নাম টীকাকারের মতে প্রশাস্তা, সমাহর্ত্তা, সংবিধাতা, লেখক ও সাক্ষী। উঁহাদের কার্য্য সম্বন্ধে টীকাকারের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। তাঁহার মতে সমাহর্ত্তা গ্রাম হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। সংবিধাতা উহার হিসাব-রক্ষণাদি তত্ত্বাবধান করিতেন। লেখকেরও ঐরূপ কার্য্য ছিল। প্রশাস্তা বোধ হয়, গ্রামের শান্তিরক্ষার কার্য্য ও রক্ষীদিগের নেতা ছিলেন।

শান্তিরক্ষার জন্য গ্রামে শান্তিরক্ষক ও গুপ্তচরাদির ব্যবস্থা ছিল। তাহারা গ্রামের নানাস্থানে থাকিয়া লোকের চরিত্র বা কার্য্যাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিত। চোর ধরিবার জন্য চোর-রজ্জুক নামে এক স্বতন্ত্র কর্ম্মচারীর কথা অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই সকল কর্ম্মচারীরা গ্রামে চুরি হইলে চোর ধরিবার জন্য বা তদভাবে গ্রামবাসীর ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী ছিলেন। গ্রামে চুরি হইলে গ্রামাধ্যক্ষ দায়ী হইতেন। গ্রামের বাহিরে হইলে বিবীতাধ্যক্ষকে উহার জন্য দায়ী হইতে হইত।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা গ্রাম সম্বন্ধে বলিব। অর্থশাস্ত্রের সময় গ্রামকর্ম্মচারীরা গ্রামের

১। মূল শ্লোকটি এই,—

কচ্চিচ্ছূরাঃ কৃতপ্রজ্ঞাঃ পঞ্চ পঞ্চস্বনুষ্ঠিতাঃ।
ক্ষেমং কুর্ব্বন্তি সংহত্য রাজন্ জনপদে তব ॥৮০॥

টীকাকার বলেন,—কচ্চিচ্ছূরা ইতি প্রতিগ্রামং পঞ্চপঞ্চেতি। তে চ প্রশাস্তা সমাহর্ত্তা সংবিধাতা, লেখকঃ সাক্ষী-চেতি। সমাহর্ত্তা প্রজাভ্যো দ্রব্যমুদ্গ্রাহ্যৈকীকৃত্য রাজ্ঞে অর্পয়িতা। সংবিধাতা প্রজাসমাহর্ত্রোরেকধাকারয়িতা;

লোকের, তাহাদের জীবিকার, আয়-ব্যয়ের ও গো-মহিষাদি পশুরও সংখ্যার হিসাব রাখিতেন। সমসাময়িক যুগের গ্রীক্-পর্য্যটকেরাও ভারতীয় Census-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, তৎকালে ভারতের গ্রামগুলিতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রথা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল। গ্রামবাসীদিগের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্যাপেক্ষা এই শাসননীতির মূলমন্ত্র ছিল এবং ইহারই ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই স্বাতন্ত্র্যের ফলে তাঁহাদের সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষ যথেষ্টই ছিল। নিজের দেশে—নিজের হাতে ক্ষমতা রাখিয়া, নিজের কল্যাণার্থ কার্য্য করিতে সকলেই বদ্ধপরিকর ছিলেন। ফলে, গ্রামবাসিমাত্রেরই উন্নতি ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। রাজা করগ্রহণ করিয়া শান্তিরক্ষার-ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে সকলেই সুখ-শান্তিতে থাকিয়া পরস্পরের অবিরোধে জীবনযাপন করিতে পারেন, তাহার জন্য যত্নবান্ থাকিতেন; দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা বিপদের সময় প্রজাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন; বিদেশী শত্রুর হাত হইতে দেশ রক্ষা করিতেন। যতদূর সম্ভব স্থানীয় শাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। লোকদিগকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে এবং পরস্পরকে সাহায্য করিতে শিক্ষা দিতেন। অর্থশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ইহার যাথার্থ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। ইহার ফলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া, দেশের লোকে দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া দেশহিতকর কার্য্যে উদ্যত হইতেন।

বলা বাহুল্য, এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণভাবে দেশে প্রবর্ত্তিত ছিল এবং এখনও ভারতের নানাদেশে উহার যথেষ্ট প্রভাব আছে। মুসলমান রাজা এ দেশে আসিয়া ঐ শাসননীতির উচ্ছেদের চেষ্টা করেন নাই। তবে ইংরাজদিগের রাজ্য-স্থাপনের পর প্রথম প্রথম উহা ধ্বংশ করিবার চেষ্টা হয়। তখন আবার এদিকেও ঐ স্বায়ত্তশাসনের ফলে হিংসাদ্বেষ, দলাদলি মারামারির পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল কারণে দেশের প্রকৃত অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। ইংরাজেরা অজ্ঞতা ও স্বার্থান্ধতার বশীভূত হইয়া গ্রামের স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করেন। বর্ত্তমানে আবার গ্রামে স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

নগরজীবন

অতঃপর নগরের কথা। বর্ত্তমানে নগর বলিতে বহুজনপূর্ণ বাণিজ্য-ব্যবসায়াদির কেন্দ্রীভূত বিশাল জনাবাসস্থান বুঝায়। লোকসংখ্যার আধিক্য, ঘনবসতি বা শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধাবশতঃ নানা শ্রেণীর লোকের বাস প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষত্বই গ্রাম ও নগরের পার্থক্যসূচক। প্রাচীন যুগের নগরের আরও কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। নগরবর্ণনাপ্রসঙ্গে তাহা বলা হইবে।

বৈদিক যুগে কৃষি ও পশুপালনবৃত্তি জনসাধারণের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল। গ্রাম্যজীবনই সুখকর ও সুবিধাজনক ছিল। তখন বড় বড় নগরের স্থাপনও হয় নাই এবং বৈদিক সাহিত্যে কোন বড় নগরের নামও দুষ্প্রাপ্য। এই যুগের পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে নানা

প্রকার প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি হইতে লাগিল এবং কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া বহু লোক জীবিকার জন্য ঐগুলির অবলম্বন করিল। সঙ্গে সঙ্গে ধনী লোকেরাও গ্রাম ছাড়িয়া, ব্যবসারের সুবিধাজনক স্থানের সন্ধান করিয়া নূতন বসতি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রমিকের সমবায়ে রাজা বা রাজকর্ম্মচারীর সহায়তায় সঞ্চিত ধনাদি রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার ফলে নদীতটে বা বাণিজ্যাদির সুবিধাজনক স্থানে নগরের স্থাপন হইতে লাগিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেই ভারতে অসংখ্য নগর স্থাপিত হইল। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে আমরা বুদ্ধের সময়ের তক্ষশিলা, বারাণসী, শ্রাবস্তী, উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী, বৈশালী, রাজগৃহ, গয়া প্রভৃতি অনেকগুলি বিশাল নগরীর উল্লেখ পাইয়া থাকি।

এই নগরগুলি প্রায়শঃই পরিখা, উচ্চ প্রাচীর ও প্রাকারবেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের স্থলে স্থলে আবার শত্রুর গতি পর্য্যবেক্ষণ বা শত্রুসেনার গতিরোধের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র tower বা দুর্গ থাকিত। প্রাচীর সাধারণতঃ পাষাণনির্ম্মিতই হইত। স্থলে স্থলে প্রস্তরের অভাব হইলে, কাঠেরও প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইত। টাওয়ারগুলি গোল বা চতুষ্কোণাকৃতি হইত ও উচ্চতায় প্রাচীর ছাড়াইয়া অনেক দূর উঠিত। মেগাস্থিনিশের বর্ণনায় তিনি পাটলিপুত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, পাটলিপুত্র সহরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ১।০ মাইল (৯০ × ১৫ ষ্টাডিয়া, ষ্টা = $\frac{1}{8}$ মাইল) সহরটির চারিধারে প্রাকার ও প্রাকারের পর উচ্চ কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীর ছিল। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অন্তরে একটি করিয়া মোটের উপর ৫৭০ টি ক্ষুদ্র টাউয়ার বা দুর্গ ও ৬৪টি দ্বার ছিল। এই সকল দুর্গমধ্যে সদাসর্ব্বদা সুসজ্জিত সৈন্য প্রস্তুত থাকিত।

অর্থশাস্ত্রের দুর্গবিধান ও দুর্গনিবেশাধ্যায় হইতেও তৎকালের নগরীর নির্ম্মাণপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যায়।

উপরে উল্লিখিত দুইটি অধ্যায় হইতে বুঝা যায় যে, কোন নগরী নির্ম্মাণ করিতে হইলে, উহার ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইত। ভূমিনির্ব্বাচনের পর, উহার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও গভীর পরিখা খনন করিয়া উহা হইতে ৪ (২৪ ফুট) দণ্ডপায়, ১২ দণ্ড বিস্তৃত ও ৬ দণ্ড উচ্চ বপ্র (rampart) নির্ম্মাণ করা হইত। ইহার উপরে আবার উচ্চ ইষ্টক বা পাষাণনির্ম্মিত প্রাচীর নির্ম্মিত হইত।

প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে লোকের প্রবেশ ও নির্গমের জন্য কয়েকটি দ্বার রাখিয়া দেওয়া হইত। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায়ে নগর বা দুর্গের দ্বাদশটি দ্বারের উল্লেখ আছে। এগুলির উভয় পার্শ্বও বিশেষরূপ সুরক্ষিত থাকিত। এই দ্বারগুলির মধ্যে একটিকে মহাদ্বার বা main gate বলা হইত। এই দ্বারের পার্শ্বেই আবার একদিকে মহদ্বারাধিপের বা নগরপালের কর্ম্মচারী ও রক্ষিগণের আবাস ছিল এবং অপর দিকে শুল্কাধ্যক্ষের আফিস—শুল্কশালা থাকিত (শুল্কাধ্যক্ষঃ শুল্কশালাধ্বজং চ প্রাঙ্মুখং উদঙ্মুখং বা মহাদ্বারাভ্যাশে নিবেশয়েৎ)।

কেহ নগরে প্রবেশ করিলে বা নগর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় দৌবারিক বা নগর-পালের কর্ম্মচারীরা উহাদের সম্বন্ধে সম্যক্ সন্ধান লইয়া তবে প্রবেশ করিতে দিত। অবশ্য

দিনমানে বা পূর্ব্বরাত্রেও ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। তবে নূতন আগন্তুক-মাত্রকেই মুদ্রা বা passport দেখাইতে হইত। অসময়ে কেহ নগর হইতে বাহির হইলে বা নগরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহাদিগকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত এবং কোনরূপ সন্দেহের কারণ থাকিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইত। (প্রাপ্তস্থিতাগতৌ চ নিবেদয়েৎ। অন্যথা রাত্রিদোষং ভজেৎ। * * * পথিকোৎপথিকাশ্চ বহিরন্তশ্চ নগরস্য দেবগৃহপুণ্যস্থানবন-শ্মশানেষু সব্রণমনিষ্টোপকরণমুদ্ভাণ্ডীকৃতমাবিগ্নমতিস্বপ্নমধ্বক্লান্তপূর্ব্বং বা গৃহ্ণীয়ুঃ—অ° শা°, ১৪৪ পৃ°। অর্থাৎ নূতন আগন্তুক, আহত, ক্লিষ্ট বা ব্যাধিত, পীড়িত ব্যক্তিমাত্রকেই নগরপালের লোকেরা গ্রহণ করিবে। ঐরূপ যদি কেহ লুক্কায়িত ধন লইয়া বা অনিষ্টের উপকরণাদি লইয়া আসে, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। মোটের উপর, সন্দেহের কারণ থাকিলেই পুলিশের হস্তে পড়িতে হইত।

সন্ধ্যার কিছু পরে বোধ হয়, নগরদ্বার রোধের ব্যবস্থা ছিল। এই সময়ের পরে কেহ নগর-প্রবেশ করিতে চাহিলে বা নগর ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে বিশেষ কারণ দর্শাইয়া নগরাধ্যক্ষের অনুমতি লইতে হইত। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ দীর্ঘচারায়ণ নামক মন্ত্রীর চক্রান্তে নগরের বাহিরে আসিলে, ষড়যন্ত্রানুযায়ী নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং এই কৌশলের ফলে তৎপুত্র বিরূঢ়কের রাজা হইবার সুবিধা হয়।

নগরপালের কর্ম্মচারীদের ন্যায় শুল্কাধ্যক্ষের লোকেরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকের গতিবিধি পর্য্য-বেক্ষণ ও তাহাদের সঙ্গের পণ্যাদি (মোট-ঘাট) পরীক্ষা করিত। যদি কাহারও সহিত যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র বর্ম্ম-কবচাদি বা অন্য কোনরূপ নিষিদ্ধ বস্তু পাওয়া যাইত, তবে উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইত। অন্য সকলপ্রকার পণ্যের উৎপত্তিস্থল ও মূল্য প্রভৃতি নিরূপণ করিয়া উহার উপর আমদানী ও রপ্তানীভেদে শুল্ক লওয়া হইত। কেহ শুল্ক না দিয়া মাল লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে বা কম শুল্ক দিবার চেষ্টা করিলে উহাদিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত।

পণ্যের উপর শুল্ক ছাড়া ভারবাহী পশু ও ভারবাহীদিগের উপরও শুল্ক ছিল। বিবাহ, দেবপূজা যজ্ঞ, বা চূড়াকর্ম্ম-উপনয়নাদি সংস্কারের জন্য কেহ মাল লইয়া আসিলে, তাহার উপর শুল্ক লওয়া হইত না। শ্রোত্রিয়াদির দ্রব্যাদির উপরও কোন শুল্ক ছিল না।

এই ত গেল নগরপ্রাচীর ও নগরদ্বারের কথা। অতঃপর নগরের ভিতরের কথা কিছু বলিব। নগরের ভিতরের ব্যবস্থা ত এখনকার হইতে অনেক বিভিন্ন ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না, তবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতে কিছু বলিবার চেষ্টা করা যাইবে। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায় হইতে জানা যায় যে, নগর বা দুর্গের তিনটি পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে ও তিনটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা রাজপথ থাকিত। রাজপথগুলি যেখানে নগরপ্রাচীরের সহিত মিলিত, সেই স্থানেই একটি করিয়া দ্বার থাকিত।

এই কয়টি বড় বড় রাজপথ ছাড়া আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথও থাকিত। নগরের ভিতরে এক এক খণ্ডে (sectorএ) এক এক জাতীয় লোক বা এক ব্যবসায়ের লোকদিগের

স্থান দেওয়া হইত। ভিন্ন ভিন্ন অংশে গন্ধমাল্যব্যবসায়ী, প্রধান প্রধান শিল্পব্যবসায়ী, সুরাব্যবসায়ী, খাদ্য-ব্যবসায়িগণ, ঊর্ণা বা সূত্রব্যবসায়ী তন্তুবায়গণ, চর্ম্মকারবর্গ, অস্ত্রশস্ত্রাদিনির্ম্মাতৃবর্গ, স্বর্ণকার, লৌহকার প্রভৃতিদিগকে স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির বসতি ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিল। কুম্ভকার প্রভৃতি যাহাদের অগ্নি লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাদের স্থান স্বতন্ত্র ছিল। ভিন্ন ভিন্ন শূদ্র, কর্ম্মকর ভৃত্যাদিও স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিত। বেশ্যাদিগের পল্লী ভিন্ন ছিল। তাহাদের পল্লীর নিকটেই মদ্যব্যবসায়ী, পক্বমাংস ও পক্বৌদনব্যবসায়ীদিগের বাস ছিল। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ও জাতীয় লোকের আবাসস্থানের যথাযথ নির্দ্দেশ করা আছে। এখানে উহার সারাংশমাত্র উদ্ধৃত করা হইল।

নগরের মধ্যে গৃহস্থদিগের বাসস্থান ও দোকান-পসার ভিন্ন উহার অংশবিশেষে রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের অধিকরণ অর্থাৎ আফিস ও বাসস্থান ছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক নগরেই একটি করিয়া ধর্ম্মাধিকরণ বা বিচারালয়, নগরপাল বা নগররক্ষকের অধিকরণ বা আফিস; প্রত্যেক পল্লীমধ্যে বা উপযুক্ত স্থানে একটি করিয়া শুল্ক বা ফাঁড়ী, শুল্কাধ্যক্ষের আফিস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থান ছিল। এতদ্ভিন্ন নগরের স্থানে স্থানে হাট-বাজার থাকিত। উক্ত হাট বাজারের সম্বন্ধেও কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল।

শুল্কগ্রহণের ব্যবস্থার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শুল্কগ্রহণ ভিন্ন রাজকর্ম্মচারিগণ পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন এবং কেহ অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করিলে উহার যথাযথ দণ্ড বিধান করিতেন। অতিরিক্ত লাভে ক্রয়-বিক্রয় একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। রাজকর্ম্মচারীদিগের ও রাজব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল, যাহাতে পণ্য সুলভে বিক্রীত হয় (উভয়ং চ প্রজানামনুগ্রহেণ বিক্রাপয়েৎ। স্থূলমপি চ লাভং প্রজানাম্ ঔপঘাতিকং বারয়েৎ)। সাধারণতঃ স্বদেশীয় পণ্যে বণিকেরা শতকরা পাঁচ টাকা ও বিদেশের আমদানী পণ্যের উপর শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে লাভগ্রহণ করিতে পারিতেন।

দোকান বাজার সম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ বলিবার কথা আছে। এখনকার দিনের মত তৎকালে যে কেহ ইচ্ছা করিলেই কোন ব্যবসায় করিতে বা দোকান করিতে পারিতেন না। পণ্যাধ্যক্ষের অনুমতি পাইবার পর, দোকান করিয়া মাল খরিদ ও সঞ্চয় করিতে হইত। নচেৎ সমস্ত মাল সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইত। (তেন ধান্যপণ্যনিচয়াংশ্চানুজ্ঞাতাঃ কুর্য্যুঃ; অন্যথা নিচিতমেষাং পণ্যাধ্যক্ষো গৃহ্ণীয়াৎ)। বণিক্‌দিগের পক্ষে একযোটে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করা বা নিজেদের সুবিধার জন্য কোন জিনিষের দর কমান একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। যাহা হউক, এসকল কথা অন্য প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব। তবে কয়েকটি মাত্র কথা বিশেষ প্রয়োজনীয়-হিসাবে এস্থলে উল্লেখ করিব। বাণিজ্য-দ্রব্যাদির ক্রয়মূল্যাদির নিরূপণের জন্য শুল্কাধ্যক্ষ ও পণ্যাধ্যক্ষ ভিন্ন পৌতবাধ্যক্ষ ও সংস্থাধ্যক্ষ নামে আরও দুইজন কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহারা দ্রব্যাদির বিক্রয়মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন; ক্রয়বিক্রয়, জুয়াচুরি নিবারণ ও ওজন বাটখারা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। আবার কারুশিল্পিদিগের কার্য্যতত্ত্বাবধারণের জন্য ও পারিশ্রমিক নিরূপণের জন্য ভিন্নজন

মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী লইয়া একটি বোর্ড ছিল। কারুশিল্পীরা যথেচ্ছ পারিশ্রমিক লইতে পারিতেন না; তাঁহারা ইঁহাদের বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। প্রভু ও শিল্পী বা কর্ম্মকরদিগের মধ্যে বেতন লইয়া মতভেদ হইলে সাধারণতঃ ঐ বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদিগের (মূলে কুশলাঃ —Experts) হস্তে উহার বিচারভার দেওয়া হইত। অথবা কারুশিল্পীদিগের বেতন হ্রাসের জন্য কোন দল পাকাইলে দলের লোকেরা দণ্ডিত হইতেন। (কারুশিল্পিনাং কর্ম্মগুণাপকর্ষম্ আজীবং বিক্রয়ং ক্রয়োপঘাতং বা সম্ভূয় সমুত্থাপয়তাং সহস্রং দণ্ডঃ।—অ° শা°, ২০৫ পৃষ্ঠা)

অর্থশাস্ত্র ভিন্ন অন্য গ্রন্থে আমরা এই সকল কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ উল্লেখ পাই না। তবে সমসাময়িক গ্রীক ঐতিহাসিক ও পর্য্যটকগণ দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ, ক্রয়বিক্রয়, শুল্কগ্রহণ, ওজনাদির তত্ত্বাবধান প্রভৃতির জন্য ৬টি বোর্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে বোর্ডের কথা উল্লেখ নাই, তবে অনুমান করা যায় যে, একএকটি বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন করিয়া উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী না থাকিয়া, উক্ত বিভাগের পরিচালনের জন্য ৫।৬ জন সমানপদস্থ লোক রাখা হইত। কৌটিল্যের নিজের অভিপ্রায়ও এইরূপ। তিনি একজনের উপর কোন এক বিভাগের সম্পূর্ণ ভার দিতে একেবারেই নারাজ বলিয়া বোধ হয়। কারণ, তিনি রাজাকে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, কোন এক ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করা একেবারেই উচিত নহে। এ বিষয়ে তাঁহার মতের সারাংশস্বরূপ একটি উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম; সেইটি এই,—

বহুমুখ্যং অনিত্যং চাধিকরণং স্থাপয়েৎ।

অর্থাৎ প্রত্যেক অধিকরণের ভার বহু লোকের হস্তে অর্পিত হইবে এবং চিরস্থায়িভাবে কাহাকেও এক বিভাগে রাখা হইবে না। মতটি আমাদের নিকটও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, যদি গ্রীকদিগের উল্লিখিত বোর্ডগুলির সহিত এই অর্থশাস্ত্রোল্লিখিত অধ্যক্ষ কয়টির কার্য্যের সমতা থাকে, তাহা হইলে গ্রীকবিবরণী ও অর্থশাস্ত্র—উভয়েরই মূল্য আমাদের নিকট বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে।

নগরের শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যের এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও শান্তিরক্ষার ভার ছিল নাগর বা নগরপালের হস্তে। নগররক্ষক একাধারে পুলিশ কোতোয়াল, পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহার কর্ম্মচারীরা নগরের লোকসংখ্যা, লোকের আয়-ব্যয়, জীবিকা প্রভৃতির হিসাব রাখিতেন; পাষণ্ড অর্থাৎ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি, ভিক্ষুক, নবাগত প্রভৃতির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন; বেশ্যা, মদ্যব্যবসায়ী (শৌণ্ডিক), পক্কমাংস বা ভাতবিক্রেতা হোটেলওয়ালাদের আড্ডার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন; মদ খাইবার আড্ডা (পানাগার) জুয়াখেলার আড্ডা প্রভৃতির দিকে বিশেষ নজর রাখিতেন এবং কোন সন্দেহের কারণ থাকিলেই অপরাধীদিগকে ধরিয়া উহাদিগকে হয় কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করিতেন বা বরাবর হাজতে প্রেরণ করিতেন।

নগরের রাস্তা-ঘাটের সমস্ত ব্যবস্থাও নগররক্ষকের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ছিল। কেহ পথে ময়লা ফেলিলে, মলমূত্র ত্যাগ করিলে বা মৃতদেহ ফেলিলে বা কোন প্রকার সাধারণের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটাইলে দণ্ডিত হইতেন। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশান বা দূষিত দ্রব্য বিক্রয় করিলে বা

পচা মাংস বিক্রয় করিলে বিক্রেতাকে দণ্ড দেওয়া হইত। তৎকালে মাংস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত বলিয়া উহার বিক্রয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য সূনাধ্যক্ষ নামে একজন বিশেষ কর্ম্মচারী ছিলেন। অন্যপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিলে নাগরক বা অন্য কোন ব্যক্তি উচিত দণ্ড বিধান করিতেন। ঐরূপ অগ্নিনির্ব্বাণে সাহায্য না করিলে বা অগ্নিনির্ব্বাণের উপকরণাদি না রাখিলে লোকে দণ্ডিত হইত।

নগরের প্রত্যেক প্রান্তে, চৌমাথায় ও অন্যান্য স্থানে রাজপ্রহরীরা দিনে ও রাত্রে পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। এতদ্ভিন্ন নানা ছদ্মবেশে বহু প্রকার চরেরাও লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে বোধ হয়, দ্বার বন্ধ করা হইত (একথা স্পষ্টভাবে অর্থশাস্ত্রে নাই) ও মধ্যে মধ্যে তূর্য্যধ্বনি করা হইত। সন্ধ্যার পর বা অসময়ে নগরপ্রবেশ বা নগর হইতে বহির্গমন নিষিদ্ধ ছিল। তবে বিশেষ কার্য্যবশতঃ বাহির হইতে হইলে অনুমতি লইয়া যাইতে হইত। সন্দেহস্থলে বা উপযুক্ত কারণ না দর্শাইতে পারিলে দণ্ডিত হইতে হইত। রাত্রিকালে বিনা-কারণে ঘুরিয়া বেড়াইলে বিশেষ দোষের বলিয়া গণ্য ছিল। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন হইলে, গৃহে প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে বা রোগীর জন্য চিকিৎসক আনিতে হইলে, বা আগুন লাগার জন্য নগরপালের তূর্য্যধ্বনি হইলে তন্নির্ব্বাণার্থ বা কোন যাত্রা-থিয়েটারাদি হইলে নগরপালের অনুমতি-পত্র লইয়া লোক গমনাগমন করিতে পারিত। (সূতিকাচিকিৎসকপ্রেতপ্রদীপযাননাগরক-তূর্য্যপ্রেক্ষাগ্নিনিমিত্তমুদ্রাভিশ্চাগ্রাহ্যাঃ—অ° শা°, ১৪৬ পৃ°।) রাত্রিতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বা ছদ্মবেশে বিকটবেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান বিশেষ দোষের ছিল (প্রচ্ছন্নবিপরীতবেশাঃ প্রব্রজিতা দণ্ডশস্ত্রহস্তাশ্চ মনুষ্যা দোষতো দণ্ড্যাঃ)। এতদ্ভিন্ন রাজান্তঃপুরের নিকট বেড়ান বা প্রবেশ করা বা নগরপ্রাচীর আরোহণ করিলে গুরুতর মধ্যম সাহস দণ্ড দেওয়া হইত (রাজপরিগ্রহোপগমনে নগররক্ষারোহণে চ মধ্যমঃ সাহসদণ্ডঃ।)

বেশ্যা, পানাগারে ও দ্যূতক্রীড়ার স্থানের বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। ঐ যুগে বেশ্যারা রাজার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত এবং তাহাদের শাসন ও রক্ষণের জন্য নগরগণিকাধ্যক্ষ নামে একজন বিশেষ কর্ম্মচারী থাকিতেন। পানাগারগুলিও সুরাধ্যক্ষ নামে এক বিশেষ কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। জুয়াখেলা, পাশাখেলার আড্ডাগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য একজন অন্য কর্ম্মচারী ছিলেন। বেশ্যা, মদ্য ও জুয়া প্রভৃতি হইতে রাজ্যের কিছু আয় হইত। পরে ঐগুলির বিশেষ বর্ণনা করা হইবে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পবনদূতের বিজয়পুর কোথায় ?*

সেন-বংশীয়গণের রাজত্বকালে বিশেষতঃ মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময় বঙ্গদেশে সংস্কৃত-চর্চ্চার সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের সময় যাঁহারা কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উমাপতিধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও কবিরাজচক্রবর্ত্তী ধোয়ী বিশেষরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দে লিখিয়াছেন,—

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতেঃ।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী-কবিক্ষ্মাপতিঃ।"

ইঁহাদের সম্বন্ধে আর একটি শ্লোকও দেখিতে পাওয়া যায়,—

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥" †

এই শ্লোকের কবিরাজ গীতগোবিন্দের কবিক্ষ্মাপতি ধোয়ী। ধোয়ী কবির বিরচিত পবনদূতের শেষে "ইতি শ্রীধোয়ীকবিরাজবিরচিতং পবনদূতাখ্যং সমাপ্তং"—এইরূপ লিখিতও আছে। ধোয়ী কবিরাজ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে অনেক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পবনদূতে তিনি তাহা এইরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"দন্তিব্যূহং কনকলতিকাং চামরং হৈমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী।
শ্রীধোয়ীকঃ সকলরসিকপ্রীতিহেতোর্ম্মনস্বী
কাব্যং সারস্বতমিব (সতনু) মন্ত্রমেতজ্জগাদ॥" ১০১॥

শ্রীধরদাসের সুক্তিকর্ণামৃতে এই শ্লোকটি অন্যভাবে লিখিত আছে,—

"দন্তিব্যূহং কনককলিতং চামরং হেমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী।
খ্যাতো যশ্চ শ্রুতিধরতয়া বিক্রমাদিত্যগোষ্ঠী
বিদ্যাভর্ত্তুঃ খলু বররুচেরাসসাদ প্রতিষ্ঠাম্॥
ধোয়ীকস্য।"

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনত্রিংশ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

† শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "সমিতৌ"এর স্থলে "পঙ্‌ক্তৌ" কবিরাজপ্রতিষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড—৩৫৪ পৃঃ)

তাঁহার কবিরাজচক্রবর্ত্তী উপাধিও গৌড়েশ্বর হইতে লব্ধ বলিয়াই বোধ হয়। ধোয়ী প্রভৃতিধর বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন, জয়দেবও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই কবিরাজচক্রবর্ত্তী পবনদূতের রচনা করিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

কবির কিছু পরিচয় প্রদান করা হইল, এক্ষণে কাব্যের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। কালিদাস যেমন রামগিরি পর্ব্বত হইতে বিরহী যক্ষের দ্বারা মেঘকে দূত করিয়া অলকায় যক্ষপত্নীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, কবিরাজচক্রবর্ত্তী ধোয়ীও সেইরূপ চন্দনাদ্রি বা মলয়পর্ব্বত হইতে কুবলয়বতীনাম্নী গন্ধর্ব্বকন্যার দ্বারা মলয়পবনকে দূত করিয়া, বিজয়পুরে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নিকট পাঠাইয়া দেন। লক্ষ্মণসেন যখন দিগ্বিজয়ে গমন করেন, কুবলয়বতী তখন তাঁহাকে দেখিয়া মদনপীড়িতা হইয়াছিলেন। গ্রন্থারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে,—

"অস্তি শ্রীমত্যখিলবসুধাসুন্দরে চন্দনাদ্রৌ
গন্ধর্ব্বানাং কনকনগরী নাম রম্যো নিবাসঃ।
হৈমৈর্লীলাভবনশিখরৈরম্বরং ব্যালিখন্তি-
র্যন্তে শাখানগরগণনাং যঃ সুরাণাং পুরস্য ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেকা কুবলয়বতী নাম গন্ধর্ব্বকন্যা
মন্ত্রে জৈত্রং মৃদুকুসুমতোঽপ্যায়ুধং যা স্মরস্য।
দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং
বালা সদ্যঃ কুসুমধনুষঃ সংবিধেয়ী বভূব ॥ ২ ॥

বাল্যাদালীষ্বপি মনসিজং স্থানভিব্যঞ্জয়ন্তী
পাণ্ডুক্ষামা কতিচিদনয়ৎ কাতরা বাসরাণি।
গন্তুং দেশান্তরমথ মধাবন্যতৈব প্রবৃত্তং
গাঢ়োৎকণ্ঠা মলয়পবনং সপ্রণামং যযাচে ॥ ৩ ॥"

কুবলয়বতী মলয়-পবনকে গৌড়দেশে যাইতেই অনুরোধ করিতেছেন। প্রথমে তিনি পবনকে শ্রীখণ্ডপর্ব্বত (চন্দন বা মলয়পর্ব্বত) হইতে পাণ্ড্যদেশে যাইতে বলেন। পাণ্ড্য দেশের রাজধানী তাম্রপর্ণীনদীতীরস্থ উরগপুরী হইতে সেতুবন্ধরামেশ্বর যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। তাহার পর কাঞ্চীপুর, কাঞ্চীপুর ত্যাগ করিয়া কাবেরী নদী ধরিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, পরে মাল্যবান্ ও পম্পাসর সরোবরে পঁহুছিবার কথা। তাহার পর গোদাবরীসিক্ত অন্ধ্রদেশ, সেখান হইতে কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী কলিঙ্গনগরী যাইতে হইবে। তথা হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশে রেবা নদী দেখিয়া যাইবার কথা। তাহার পর যযাতিনগরী, অবশেষে সুহ্মদেশে উপস্থিত হইতে হইবে। এই সুহ্মদেশেই গৌড় রাজ্যের রাজধানী বিজয়পুর। ধোয়ী কবি প্রথমে—

"তত্রাতস্যাপ্রতিহতগতের্যাস্যতস্তে মদর্থং
গৌড়ীক্ষৌণী কতি নু মলয়স্মাধরাদ্‌যোজনানি।"

এবং

"তত্রাবশ্যং কুসুমসময়ে স ত্বয়া শীলনীয়ঃ।
সান্দ্রোদ্যানস্থগিতগগনপ্রাঙ্গণে গৌড়দেশঃ।"

বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত 'সুহ্মদেশ' ও বিজয়পুরের বর্ণনা মিলাইয়া লইলে, বিজয়পুর যে গৌড়রাজ্যের রাজধানী ও সুহ্মদেশে অবস্থিত, তাহা বুঝা যায়। তাঁহার বর্ণনায় সুহ্মদেশ গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই বোধ হয়, গৌড় দেশের কথা প্রথমে বলিয়া শেষে তিনি সুহ্মদেশের বর্ণনায় শেষ করিয়াছেন, তাহার পর রাজধানীর বর্ণনা, গৌড়দেশের আর স্বতন্ত্র বর্ণনা করেন নাই।

কবি কি ভাবে সুহ্মদেশ ও রাজধানী বিজয়পুরের বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি,—

"গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
বাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি॥ ২৭॥

তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সাক্ষাদ্বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ।
পাণৌ লীলাকমলমসকৃদ্‌যৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্ব্বতে বাররামাঃ॥ ২৮॥

যাতশ্চোর্দ্ধং ধনপতিনগেনৈব সৌধৈরগারৈঃ
পশ্যেস্তস্মিন্নগরমনঘং চারুচন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ।
যত্রানেকপ্রিয়নখপদব্যাজতো বাররামাঃ
ভর্ত্তুর্ভূষাশশধরকলাচিহ্নমঙ্কে বহন্তি॥ ২৯॥

তত্রানর্ঘ্যং রঘুকুলগুরুং স্বর্ণদীতীরদেশে
নত্বা দেবং ব্রজ গিরিসুতাসংবিভক্তাঙ্গরম্যং।
যাতে যস্মিন্নয়নপদবীং সুন্দরভ্রূলতানাং
প্রৌঢ়স্ত্রীণাং গলতি রমণপ্রেমজন্মাভিমানঃ॥ ৩০॥

তৎক্ষেত্রঞ্চ ত্রিদিবসরিতঃ কান্তয়া সেবনীয়ঃ
শ্রীবল্লালক্ষিতিপতিযশোবান্ধবঃ সেতুবন্ধঃ।
আরূঢ়ানাং ত্রিদিবতটিনীস্নানহেতোর্জনানাং
যত্র যেষাপ্যমরনগরী সন্নিকৃষ্টা বিভাতি॥ ৩১॥

গঙ্গাং ফেনস্তবকমুকুরং বীচিহস্তে বহন্তীং
সেবেথাস্তামথ পরিসরপ্রৌঢ়হংসাবতংসাং।
প্রত্যাবৃত্ত্যা ব্রজতি জলধৌ প্রেয়সি প্রেমলোলা
কর্ত্তুং কেশগ্রহমিব কিমপ্যুদ্ধতা যা বিভাতি ॥ ৩২ ॥

তোয়ক্রীড়াসরসনিপতদ্ব্রহ্মদীমস্তিনীনাং
বীচিধৌতৈঃ স্তনমৃগমদৈঃ শ্যামলীভূয় ভূয়ঃ।
ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্য্যাতি দেবী
দেশং যায়াস্তমথ জগতীপাবনং ভক্তিনম্রঃ ॥ ৩৩ ॥

সংসর্পন্তীং প্রকৃতিকুটিলাং দর্শিতাবর্ত্তচক্রাং
তামালোক্য ত্রিদশসরিতো নির্গতামম্বুগর্ভাৎ।
মা নির্ম্মুক্তাসিতফণিবধূশঙ্কয়া কাতরো ভূ-
ভীতঃ সর্ব্বো ভবতি ভুজগাৎ কিং পুনস্তাদৃশো যঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্রীড়ন্তীনাং পয়সি রভসাত্তত্র লীলাবতীনাং
বীচিহস্তৈ রচয় কুচয়োরংশুকস্রংসনানি।
সদ্যস্তাসামপি চ রমণালোকনব্যাকুলানাং
যাস্ত ক্রীড়ামসৃণহসিতান্যুত্তরীয়াঞ্চলত্বং ॥ ৩৫ ॥

স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানীং
দৃষ্ট্বা অবদ্‌ভুবনজয়িনস্তস্য রাজ্ঞোঽধিগচ্ছেঃ।
গঙ্গাবাতত্বমিব চতুরো যত্র পৌরাঙ্গনানাং
সম্ভোগান্তে সপদি বিতনোত্যঙ্গসংবাহনানি ॥ ৩৬ ॥

বৎস সৌধানামুপরি বড়ভীশালভঞ্জীষু লোলাঃ
স্বাঙ্গিন্যাসু প্রকৃতিমধুরাঃ কেলিকৌতূহলেন।
উন্নীয়ন্তে কথমপি রহঃ পার্ষ্ণিপঙ্কেরুহাগ্র-
স্পর্শোদ্‌গচ্ছৎপুলকমুকুলাঃ সুভ্রুবো বল্লভেন ॥ ৩৭ ॥

স্নিগ্ধশ্যামা রমণমণিভির্বদ্ধমুগ্ধালবালাঃ
পৌরস্ত্রীভিঃ ক্রমুকতরবো রোপিতাঃ প্রাঙ্গণেষু।
যত্নাযত্নোপগতসলিলৈর্ব্বিক্রমাসিক্তমূলা
যাপেক্ষ্যন্তে পরিজনবধূপাণিবিশ্রোণিতাস্তঃ ॥ ৩৮ ॥

গঙ্গাম্ভোভিঃপ্রকৃতিবিমলে পালিতে তেন রাজ্ঞা
জাতা লোকদ্বিতয়বিগলদ্ভীতয়ো যত্র পৌরাঃ।
বালাভ্যোঽথ প্রণয়কলহে রূঢ়কোপাঙ্কুরাভ্যো
বিভ্রশ্যন্তি ভ্রুকুটিরচনাচারুভীমাননাভ্যঃ ॥ ৩৯ ॥

ইহার পর নগরের আরও বর্ণনা আছে, তাহার পর রাজপ্রাসাদের কথা,—

"পুঞ্জীভূতং জগদিব ততঃ সপ্তকক্ষানিবেশৈঃ
রম্যং যায়া ভবনমবনীমণ্ডলাখণ্ডলস্য।
যৎ সৌধানাং শিখরিসুহৃদাং মূর্দ্ধ্নি বিশ্রান্তমেঘে
বিদ্যুল্লেখা বিতরতি মুহুর্বৈজয়ন্তীবিলাসং ॥" ৫৩ ॥

স্নিগ্ধশ্যামৈরিব বিরচিতা দ্রাবিতৈরিন্দ্রনীলৈ-
র্বাপী তস্মিন্নবনিবনিতারম্যরোমাবলীব।
যস্যাস্তীরে বিহরদনতিপ্রৌঢ়সীমন্তিনীনাং
মন্যে লীলাগতিষু গুরবো রাজহংসা ভবন্তি ॥ ৫৪ ॥

দেবং সাক্ষান্মনসিজমিব প্রাপ্তরাজ্যাভিষেকং
সেবেথাস্তং ব্যথিতসময়ে চামরগ্রাহিণীভিঃ।
যস্য স্নিগ্ধস্ফুরদসিলতাধারগত্যা জনানাং
লব্ধঃ সংখ্যে রিপুকুলবধূলোচনে সংবিভাগঃ ॥ ৫৫ ॥"

ইহার পর আরও কয়েকটি শ্লোকে রাজার প্রবল প্রতাপ বর্ণনা করিয়া, কুবলয়বতী মলয়-পবনকে আপনার মনের কথা জানাইতে অনুরোধ করিতেছেন।

আমরা যে পবনদূত হইতে উপরোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা প্রথমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরের পণ্ডিত রঘুরাম তর্করত্নের নিকট উহা পাওয়া গিয়াছিল। ইহার পর পবনদূতের আর কোন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি, বিশ্বকোষ-পুস্তকাগারে একাধিক পবনদূতের পুঁথি আছে, তাহার একখানি নাকি সটীক। ৫ম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩০৫ সালে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের "ধোয়ী কবির পবনদূত" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় পবনদূতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দের এসিয়াটিক সোসাইটী পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত পবনদূতখানি সম্পূর্ণই প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাতে যে-সকল লিপিকরপ্রমাদ ছিল, তিনি তাহার সংশোধিত পাঠও দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহারই প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি,

তবে তাঁহারও সম্পাদিত পবনদূতের দুই এক স্থানে যে সুস্পষ্ট মুদ্রাকরপ্রমাদ ছিল, আমরা তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছি।

আমরা উপরে যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে এরূপ জানা যাইতেছে যে, সুহ্মদেশের পরিসরভাগ গঙ্গাতরঙ্গে বিধৌত ও তাহা সৌধরাজিতে বিভূষিত। সেখানে সেন-রাজের ইষ্টদেবতা মুরারি দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, মহাদেবের নগরও কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় শ্বেত অট্টালিকাবলীতে শোভিত। তথায় গঙ্গাতীরে প্রণম্য রঘুকুলগুরু (রামচন্দ্র ?) এবং অর্দ্ধগৌরীশ্বরও আছেন। গঙ্গার স্রোতোদ্বয়ের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ আছে, জনগণের গঙ্গাস্নানের জন্য শ্রীবল্লালনরপতি তাহা করিয়া দিয়াছেন। গঙ্গা ফেনরাশিতে ও হংসশ্রেণীতে শোভা পাইতেছেন, ঐ প্রদেশে গঙ্গা হইতে কালভুজঙ্গীর ন্যায় আবর্ত্তচক্রা যমুনা বাহির হইয়াছেন। দিগ্বিজয়ী রাজার রাজধানীর নাম বিজয়পুর, তাহা একটি স্কন্ধাবারও বটে, সেখানে গঙ্গাবাত পৌরাঙ্গনাগণের শরীর শীতল করিয়া তুলে। তথাকার সৌধাবলীর উপরে চিলেঘর কাষ্ঠপুত্তলিকাশোভিত, সেগুলি পুরসুন্দরীগণের গুপ্তক্রীড়াগার। সেখানে পৌরস্ত্রীরা প্রাঙ্গণে সুপারিবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন, তাহা অযত্নে বাড়িয়া উঠে। গঙ্গার অবস্থান ও নগরের প্রকৃতি নির্ম্মল, তাহাতে আবার লক্ষ্মণসেন রাজা, সে জন্য সেখানকার লোকদিগের ইহলোক পরলোক—কোথায়ও ভয় নাই।

তাহার পর রাজপ্রাসাদের কথা, প্রাসাদটি সাতমহল, তাহার মস্তকে মেঘ বিশ্রাম করে, তাহাতে বিদ্যুৎ ঝলসিলে, পতাকা উড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার নিকট নীলজলে শোভিত এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। নূতন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, লক্ষ্মণসেন সেই প্রাসাদেই অবস্থিতি করিতেছেন।

এক্ষণে রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুর কোথায় ? এ সম্বন্ধে যাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, আমরা প্রথমেই তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—

"কালিদাস যেমন মেঘকে বিরহী যক্ষের দূত করিয়াছেন, সেইরূপ ধোয়ী কবি মলয়-পবনকে বিরহিণী কুবলয়বতীর দূত করিয়া চন্দনাদ্রি (মলয়পর্ব্বত) হইতে লক্ষ্মণসেনের নিকট নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছেন।"

মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে লিখিয়াছেন,—

"*Suhma* is the old name of a division of Bengal comprising northern Midnapure district, Hughly west of the Sarasvati river and the eastern part of District Burdwan. *Tamralipti* was its port, and *Vijayapura* its capital. *Vijayapura* is apparently to be identified with Nudiah (Nadia or Navadvip), which was the capital of Lakhmaneya at the time of the inroad of Muhammad-i-Bakhtyar. Is this name

connected in any way with Vijayasena, grandfather of Laksmanasena ?"

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় গৌড়রাজমালায় লিখিয়াছেন,—"তাহার পর জিজ্ঞাস্য—'সহর নোদিয়হ' কোন্‌খানে ছিল ? আবুল ফজল্ মিন্‌হাজের 'নোদিয়হ'কে 'নদীয়া' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বাঙ্গলায় সংস্কৃতচর্চ্চায় গুরুস্থান নবদ্বীপই যে লখ্‌মনিয়ার 'নদীয়া', তাহার আভাস দিয়াছেন। আবুল ফজলের মতই এখন সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু আবুল ফজলের সময়েও সকলে 'নোদিয়হ'কে নদীয়া বলিয়া মনে করিত না। মুন্তখাব্ উৎ-তওয়ারিখ গ্রন্থে আবুল কাদির বেদৌনি মিন্‌হাজের 'নোদিয়হ'কে 'নোদীয়া' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে লক্ষ্মণসেনের দুইটি স্বতন্ত্র রাজধানী 'বিজয়পুর' এবং 'লক্ষ্মণাবতীর' উল্লেখ পাওয়া যায়। পবনদূতে ধোয়ী কবি সুহ্ম বা রাঢ়দেশের বর্ণনা করিয়া এবং "ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্য্যাতি দেবী" (৩৩ শ্লোক) সেই মুক্তবেণীর (ত্রিবেণীর) উল্লেখ করিয়া, 'স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানীং' বর্ণন করিয়াছেন। প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে মেরুতুঙ্গ আচার্য্য লিখিয়াছেন, গৌড়দেশে লক্ষ্মণাবতী নগরে লক্ষ্মণসেন নামক রাজা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন,—'মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ঐ (রায় লখমনিয়ার) মুলুক-সকল (মমল্‌কৎ) দখল (জব্‌ত) করিয়া, সহর নোদিয়হকে 'খরাব' করিলেন, এবং যে মৌজা (এখন) লখ্‌ণাবতী, তাহার উপর রাজধানী (দার-উল-মুল্‌ক) স্থাপন করিলেন। এখানে দেখা যায়, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার যেন লক্ষ্মণাবতী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লখ্‌ণাবতী লক্ষ্মণাবতীর অপভ্রংশ। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার যে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানের নাম 'লক্ষ্মণাবতী' রাখিয়াছিলেন, এমন সম্ভব নহে। ঐ স্থানের নাম আগেই লক্ষ্মণাবতী ছিল, এবং উহাই লক্ষ্মণসেনের অন্যতম রাজধানী ছিল। সেনরাজগণের কীর্ত্তিচিহ্ন সেখান হইতে এখনও লুপ্ত হয় নাই। কিম্বদন্তী অনুসারে লখ্‌ণাবতী বা গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের সমীপবর্ত্তী বিশাল সাগরদীঘী লক্ষ্মণসেন খোদাইয়াছিলেন এবং সাগরদীঘীর অনতিদূরস্থিত একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বল্লাল-গড় নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণসেনের অপর রাজধানী 'বিজয়পুর' মিন্‌হাজুদ্দীন কর্ত্তৃক 'নোদিয়াহ' নামে অভিহিত হইয়া থাকিতে পারে। পবনদূতের প্রকাশক প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "নোদিয়াহ' এবং 'নদীয়া' অভিন্ন মনে করিয়া নদীয়াই বিজয়পুর, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রাজসাহী জেলার রামপুর-বোয়ালিয়া সহরের ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত (জনশ্রুতি অনুসারে) কুমার রাজার রাজধানী 'কুমারপুরের' নিকটবর্ত্তী বিজয় রাজার রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষপূর্ণ 'বিজয়নগর'ই পবনদূতের 'বিজয়পুর' বলিয়া বোধ হয়। বিজয়সেনের নামানুসারে যে বিজয়পুরের নামকরণ হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং বিজয়নগরেও জনশ্রুতি অনুসারে এক বিজয় রাজা ছিলেন। দানসাগর-মতে বিজয়সেনের প্রাদুর্ভাব-স্থানে (বরেন্দ্রেই) 'বিজয়নগর' অবস্থিত, এবং ইহার ৭ মাইল ব্যবধানে বিজয়সেনের শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান 'দেবপাড়া' অবস্থিত। দেবপাড়ায় 'পদ্মম-সহর' নামক স্থলে বিজয়সেনের প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের স্মৃতি

এখনও জাগ্রত রাখিয়াছে এবং 'পদ্মসহরে'র তীরে একটি বৃহৎ দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষও এখনও বিদ্যমান আছে। সুতরাং বিজয়নগরকে বিজয়পুর বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ হয়। বিজয়নগর লক্ষ্মণাবতীর ভগ্নাবশেষ হইতে ৪৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত; নদীয়া ১১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। মিন্‌হাজের বর্ণনানুসারে 'লখ্‌ণাবতী' হইতে 'নোদিয়া' খুব বেশী দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না,' এবং এই নিমিত্ত বিজয়নগরকে 'নোদিয়াহ' বলিতে প্রবৃত্তি হয়।"

গৌড়রাজমালার উপক্রমণিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিতেছেন,—

"ধোয়ী কবির পবনদূত আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইবার পর জানিতে পারা গিয়াছিল, বিজয়পুর নামক রাজধানীতে লক্ষ্মণসেনদেবের অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বল্লালসেন তাঁহার 'দানসাগর'গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়সেনদেব 'বরেন্দ্রে' প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট 'প্রাধ্যে বরেন্দ্রীতলে' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল সমাচার অবগত হইয়াও অনেকে নবদ্বীপকেই 'বিজয়পুর' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—বরেন্দ্রের কোন্ নিভৃত প্রদেশে বিজয়সেনদেবের প্রাদুর্ভাবক্ষেত্র অগৌরবে লুকাইয়া রহিয়াছে, কেহ তাহার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন নাই। রাজসাহী জেলার (গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত) দেবপাড়া গ্রামে সেন-রাজবংশের প্রথম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পরেও কেহ কখন তাহার প্রাপ্তিস্থান পরিদর্শন করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। অনুসন্ধান-সমিতি এই স্থান হইতেই অনুসন্ধান কার্য্যের সূত্রপাত করিতে গিয়া বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নানা পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ চিত্রাদিসহ 'বিবরণ-মালায়' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

তাহার পর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ডে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিতেছেন,—

"বিজয়সেনের প্রকৃত রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। কাহারও মতে নবদ্বীপে, কাহারও মতে রাজসাহী জেলার দেওপাড়ার নিকট বিজয়নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দক্ষিণ বারেন্দ্রের অন্তর্গত নিদ্রাবলী নামক সামন্ত-রাজ্যে রামপুর-বোয়ালিয়া হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে যেখানে বিজয়সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই স্থান অধুনা বিজয়নগর নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার অভ্যুদয়-কালে তাঁহার পিতা হেমন্তসেন জীবিত ছিলেন, এজন্য তিনি তৎকালে 'কুমার'-বলিয়াই অভিহিত হইতেন। বিজয়নগরের পার্শ্ববর্ত্তী কুমারপুর জন-প্রবাদ অনুসারে অদ্যাপি 'কুমার রাজার রাজধানী' বলিয়া পরিচিত। ইহারই ৭ মাইল দূরে বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বর-প্রশস্তির প্রাপ্তিস্থান দেওপাড়া। দেওপাড়ার একাংশ 'পদ্মসহর' শিলালিপি-বর্ণিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের স্মৃতিই রক্ষা করিতেছে। যাহা হউক, বিজয়নগর ও দেওপাড়ার মধ্যে কুমার বিজয়সেনের প্রথম রাজধানী ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার পিতা হেমন্তসেন রাঢ় দেশেই গঙ্গাপ্রবাহিত স্থানে রাজত্ব করিতেন। সেই গঙ্গা-সলিল-বাহিত স্থানই হেমন্তপুর

আমরা একটা কথা বলি, যে শ্লোক হইতে 'স্কন্ধাবারং বিজয়পুরম্', ইত্যাদি তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই শ্লোকের শেষভাগেই যে,

> গঙ্গাবাতধ্বনিত চঞ্চলা যত্র গৌড়াঙ্গনানাং
> সম্ভোগান্তে সপদি বিতনোত্যঙ্গসংবাহনানি ॥

এবং ৩৬ শ্লোকে—

> গঙ্গাবেণী-প্রবর্ত্তিবিরলে পালিতে যেন যাস্যা
> ত্বাং লোকবিত্তামবিকলতীতরো যত্র গৌড়ঃ ।

লিখিত আছে, ইহা কি লক্ষ্য করেন নাই? শ্লোকসংখ্যা যখন গৌড়রাজকলার দেখা যাইতেছে, তখন তাঁহারা পবনদূতে যে ভাল করিয়া আলোচনা করেন নাই, ইহাই বা কেমন করিয়া বলিব? সে যাহা হউক, উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, 'বিজয়পুর' গঙ্গাতীরেই অবস্থিত। অবশ্য গঙ্গা যে ধোয়ী কবির গঙ্গা নহে, ইহা বোধ হয়, কেহ অস্বীকার করিবেন না, আর গৌড়বাসার নির্দিষ্ট বিজয়নগরও যে গঙ্গাতীরে নহে, ইহাও বটে। তাহা হইলে বিজয়নগরকে কিরূপে পবনদূতের বিজয়পুর বলা যায়?

এক্ষণে আমরা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতসম্বন্ধে কিছু বলিবার অভিপ্রায় করিতেছি। নগেন্দ্রবাবু অবশ্য বিজয়পুরকে গঙ্গাতীরেই স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে তাহাকে নির্দেশ করিতেছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না, আমরা তাহাই দেখাইতেছি। নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, "কবিরাজ ধোয়ী তাঁহার সময়ের একটি প্রধান স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারি যে, অগ্রে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ত্রিবেণী, তাহার পর আবর্ত্তচক্রা বা চাকদহ, তাহা ছাড়াইয়া বরাবর উত্তরে গিয়া এক দিকে গঙ্গা, অপর দিকে রমণা (সরোবর), তন্মধ্যে মহাসমৃদ্ধিশালী 'বিজয়পুর'।" অবশ্য ৩৩ শ্লোকে কবি ত্রিবেণীরই কথা বলিতেছেন, কিন্তু ৩৪ শ্লোকে তিনি যে 'দর্শিতাবর্ত্তচক্রাং' বলিয়া যমুনার বিশেষণ দিয়াছেন, তাহার আবর্ত্তচক্রার অর্থ কি চাকদহ? যদি উক্ত শব্দটিকে স্থানবোধক ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে চাকদহকে কি যমুনাতীরে বুঝিতে হইবে না? কারণ, কবির বর্ণনায় দেখা যায়, আবর্ত্তচক্রার সহিত যমুনার সম্বন্ধ, গঙ্গার নহে। কিন্তু চাকদহ ত যমুনাতীরে নহে, তাহা গঙ্গাতীরেই অবস্থিত। যমুনাকে কামসুন্দরীর সহিত তুলনা করিয়া, কবি আবার আবর্ত্তগুলিকে সুন্দরীর চক্রের সহিত তুলনাই করিয়াছেন। সুতরাং আবর্ত্তচক্রা কখনও চাকদহ নহে। এ কথাগুলি বলায় আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, কবি ত্রিবেণীর পর আর কোন স্থানের কথা বলেন নাই, একেবারেই বিজয়পুরের কথা আরম্ভ করিয়াছেন। বিজয়পুরেই তাঁহার কল্পপবনকে প্রেরণ করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই রাজধানীর নিকটে যাহা যাহা বিশেষরূপে বর্ণনীয়, তিনি কেবল তাহাই বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। যে দেশে বিজয়পুর অবস্থিত, সেই দেশেরই কিছু পরিচয়চ্ছলে কবি ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর নগেন্দ্রবাবু যে রমণা সরোবরের কথা বলিতেছেন, এ রমণা সরোবরের কথা কবি কোন্ শ্লোকে উল্লেখ

অনুমানের কারণ কি, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি। ধোয়ী কবির বর্ণিত বিজয়পুর গঙ্গাতীরে অবস্থিত, সেখানে প্রাচুর্যে রোপিত ক্রমুক তরুসকল (সুপারিগাছগুলি) অযত্নে বাড়িয়া উঠে। বাঙ্গালা দেশে নিম্নবঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও সুপারিগাছ অযত্নে বাড়িয়া উঠে না। কাজেই বিজয়পুর নিম্নবঙ্গের মধ্যে স্থাপিত ছিল বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। যদি কেহ গৌড় বা লক্ষণাবতী তৎকালে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া, তাহাকে বিজয়পুর বলিতে ইচ্ছা করেন, অযত্নে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রমুকতরু তাহার বিরুদ্ধপ্রমাণে দাঁড়াইবে। যদিও কেহ গৌড়ের সহিত বিজয়পুরের অভিন্নতা-স্থাপনে প্রয়াসী হন নাই, কিন্তু এরূপ একটা কথা উঠিতে পারে বলিয়া আমরা তাহারও আলোচনা করিয়া রাখিলাম। নগেন্দ্রবাবুর বিজয়পুরেও অযত্নে ক্রমুকতরুর বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। রমাপ্রসাদ বাবুর বিজয়নগর সম্বন্ধেও যে তাহা একেবারে বলা যায় না, এমন নহে। কিন্তু তাঁহার বিজয়নগর যখন গঙ্গাতীরেই নহে, তখন বিজয়নগরের প্রসঙ্গে একথা না বলিলেও চলে। ইহার পর মিন্হাজ সিরাজের কথা। বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ-বিজয়-প্রসঙ্গে মিন্হাজ বলিতেছেন,—"It is related by credible authorities that mention of the brave deeds and conquests of Malik Muhammad Bakhtyar was made before Raī Lakhmaniya, whose capital was the city of Nudiya." (Elliot's History of India, Vol. II., p. 307, Tabakat-i-Nasiri)। এই Nudiyaকেই পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নদীয়াই বলিয়া আসিয়াছেন। রমাপ্রসাদবাবু নোদিয়হ ও নদীয়ার উচ্চারণ-বৈষম্য লইয়া যতই কেন আপত্তি করুন না, তাহাতে নোদিয়হ ও নদীয়ার অভিন্নতা খণ্ডন হয় নাই। পবনদূত ও তবকতি নাসিরি পরস্পর পরস্পরের কথা সমর্থন করিতেছে। উচ্চারণ-বৈষম্য যদি অভিন্নতা প্রতিপাদনের বিরুদ্ধ প্রমাণ হয়, তাহা হইলে পাটলীপুত্র ও পালিবোথরা কখনও এক হইতে পারে না। বরঞ্চ পালিবোথরা ও পাটলীপুত্রের অপেক্ষা নোদিয়হ ও নদীয়ার উচ্চারণসাদৃশ্য অনেকটা কাছাকাছি।

তাহার পর পবনদূতের লিখিত বিষয়গুলির নিদর্শন বর্ত্তমান নবদ্বীপে ও তাহার নিকট হইতে জানিতে পারা যায় কিনা, আমরা তাহারও আলোচনা করিতেছি। পবনদূতের ৫৩ শ্লোকে বিজয়পুরের যে সপ্তভূমক প্রাসাদের কথা এবং ৫৪ শ্লোকে যে বাপীর কথা লিখিত আছে, প্রথমে আমরা তাহারই নিদর্শনের কথা জানাইতেছি। ৫৫ শ্লোকে লিখিত আছে যে, উক্ত প্রাসাদে নূতনরাজ্যে অভিষিক্ত লক্ষ্মণসেন অবস্থিতি করিতেছেন। তাহা হইলে প্রাসাদ ও বাপী যে বল্লালসেনের সময় বিদ্যমান ছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমান নবদ্বীপ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে 'বামনপুকুর' নামে একখানি গ্রাম আছে, সেখানে একটি দীঘী 'বল্লালদীঘী' নামে আজিও কথিত হইয়া আসিতেছে, ইহারই সংলগ্ন প্রাসাদের চিহ্ন 'বল্লালঢিবি' নামে প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে Bengal District Gazetteers, Nadiaয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"Bamanpukur.—A village in the Katwali Thana on the east bank of the Bhagirathi opposite Nabadwip. There seems no doubt that a portion of the old Nabadwip of the Hindu kings of Bengal lay within this village : the remainder of the site now lies under the waters of the Bhagirathi. In the village there is a large mound which is called Ballaldhibi and is believed to be all that is left of the palace of Ballal Sena ; and near by is a tank which is called Ballaldighi."

Statistical Account of Nadiyaরও লিখিত হইয়াছিল,—

"On the other side of the river there is a large mound still called after Ballal Sen. It was recently dug up by one Mulla Sahib, who discovered some *barkoses* or wooden trays, and a box containing remnants of shawls and silken dresses, and also some small silver coins. There is also a *dighi* or lake called *Ballalidighi*. It is on the east of the Bhagirathi, and on the west of the Jalangi. The founder Lakshman Sen, built a palace of which the ruins are still extant. It was situated on the south of a tank called *Bilpukur* on the east of the Bhagirathi, on the west of the Jalangi, and on the north of Samudra-garia."

পবনদূতের বর্ণিত প্রাসাদ ও বাপী 'বল্লালঢিবি' ও 'বল্লালদীঘী', 'বেলপুকুর' বা তাহার দক্ষিণস্থ লক্ষ্মণসেনের নির্ম্মিত প্রাসাদ নহে। কারণ, নূতন রাজ্যাভিষিক্ত লক্ষ্মণসেনের কথাই কবি বর্ণনা করিয়াছেন, কাজেই যাহার সহিত বল্লালসেনের সম্বন্ধ, তাহাকেই কবির বর্ণিত প্রাসাদ ও বাপী বলিতে হয়।

'নদীয়া-কাহিনী'-প্রণেতা তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"সম্ভবতঃ এই বিজয়পুর বর্ত্তমান 'বল্লালঢিবী'।"

কিন্তু তিনি পবনদূতের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি কাহারও নিকট হইতে উক্ত কাব্যের গল্প শুনিয়া লিখিয়াছেন, গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখেন নাই।

দুর্লো পঞ্চাননের কারিকাতেও বল্লালনগরের উল্লেখ আছে,—

"মুক্তিহেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান।
বহু নগর উত্তরে করয়ে বাসস্থান॥
নিজের প্রিয় নিবাস বল্লালনগর।
দেখ যার পূর্ব্বতট নবদ্বীপ উত্তর॥

* * *

কহিলেন রাজা কাহার কোথা অবস্থান।
সব নবদ্বীপপুঞ্জ নবদ্বীপ সংস্থান॥
সদাচার আখিবারে কর তাঁহা বাস।
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের হউক আদর্শ নিবাস॥"

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে গ্রামে, 'বল্লালঢিবি' ও বল্লালদীঘী আছে, তাহার নাম বামনপুকুর। এই বামনপুকুর যে প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত ছিল, তাহা নরহরি চক্রবর্ত্তীর 'ভক্তি-রত্নাকর' হইতেও জানা যায়। ভক্তি-রত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে নবদ্বীপ-পরিক্রমায় নরহরি লিখিতেছেন,—

"ঐছে কত কহি শ্রীঈশান হর্ষ অতি।
বামনপোখেরা গ্রামে যান মন্দগতি॥
চতুর্দ্দিকে চাহি নেত্রে ঝরে প্রেমজল।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে হইয়া বিহ্বল॥
দেখ রমণীয় ভূমি ওহে শ্রীনিবাস।
এই সব স্থানে প্রভুর অদ্ভুত বিলাস॥
বামনপোখেরা এই গ্রাম নাম হয়।
পূর্ব্ব নাম ব্রাহ্মণ পুষ্কর বিজ্ঞে কয়॥

* * *

পুষ্কর কহেন দূর হইতে না আসিয়ে।
নবদ্বীপে রহি সদা নদীয়া সেবিয়ে॥"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বাবিংশ ভাগের প্রথম সংখ্যায় (১৩২২) 'বর্দ্ধমানের কথা ও স্থানপরিচয়'নামক প্রবন্ধে দেবগ্রামের যে বল্লালের ঢিবি ও বল্লাল-দীঘীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে দেবগ্রাম বিজয়পুর কি না, এরূপ প্রশ্নও উঠিতে পারে। কিন্তু দেবগ্রামের প্রান্ত দিয়া কোন কালে গঙ্গা প্রবাহিত হইলেও সেনরাজগণের সময়ে সেখানে যে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। আবার দেবগ্রামে উক্ত ঢিবি ও দীঘীসম্বন্ধে মতভেদও আছে। নগেন্দ্রবাবুও দেবগ্রামকে বিজয়পুর বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার সে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সেনরাজগণের বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারের স্থাননির্ণয়, তিনি দেবগ্রামের বিক্রমপুরকে তাহা স্থির করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উক্ত পত্রিকার উক্ত সংখ্যাতেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের 'শ্রীবিক্রমপুর' প্রবন্ধের উত্তরে যদিও তিনি বলিয়াছেন,—

"কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেনরাজধানী বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে; আমার নবপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ডে আমার সেই পূর্ব্ব বিশ্বাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসন ও ধোয়ী কবির

পবনদূত পাঠ করিয়া, আমার সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তৎপরে নদীয়া জেলার দেবগ্রাম বিজয়পুর পরিদর্শন করিয়া আমার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়”। রাজন্যকাণ্ডে আমরা পীতাহাটী-তাম্রশাসন ও পবনদূতের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি, তাহা হইলে রাজন্যকাণ্ড লেখার পর পীতাহাটী তাম্রশাসন ও পবনদূত পাঠ করার কথা নগেন্দ্রবাবু কেন বলিতেছেন, বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি পরে উহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, তিনি কিন্তু বিক্রমপুর প্রবন্ধে রাজন্যকাণ্ডে উল্লিখিত তাঁহার বিজয়পুরের কোনরূপ খণ্ডন করেন নাই, কাজেই রাজন্যকাণ্ডের বিজয়পুরকেই আমরা তাঁহার প্রকৃত মত বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছি। তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখিত বিক্রমপুরের স্থাননির্ণয়সম্বন্ধে অন্য মত প্রকাশ করিতেছেন, বিজয়পুর-সম্বন্ধে নহে।

সে যাহা হউক, ‘বল্লালচিবি’ বা ‘বল্লালদীঘী’ আমাদের বিজয়পুর ও নবদ্বীপের অভিন্নতা সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ নহে। উহার আর একটি প্রধান প্রমাণ যে মিন্‌হাজের কথা, আমরা পূর্ব্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি।

পবনদূতের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কবি সুহ্মদেশের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া, রাজধানীর নিকটস্থ দর্শনীয় বিষয়গুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং গঙ্গার সহিত তাহাদের অধিকাংশেরই সম্বন্ধ। ২৭ শ্লোকে তিনি গঙ্গা-সন্নিহিত, সুহ্মদেশের কথা বলিয়াছেন। ২৮ শ্লোকে তিনি যে সেন-রাজগণের ইষ্টদেবতা মুরারির উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিলেন, বলিতে পারা যায় না। মুরারিকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করার কথা হইতে লক্ষ্মণসেনের বিষ্ণুর প্রতি প্রবল অনুরাগেরও পরিচয় পাওয়া যায়। সেখান হইতে তিনি উত্তর দিকে গিয়া কৈলাস-শিখরতুল্য সৌধরাজিপরিপূর্ণ যে মহাদেবের নগরের কথা বলিতেছেন, তাহাও স্থির করা কঠিন। তবে ইহার সহিত ও ৩০ শ্লোকে বর্ণিত রঘুকুলগুরুর (রামচন্দ্রের) সহিত ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রেশ্বর ও মেঃটারীর রাম-সীতার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। ৩০ শ্লোকের অর্দ্ধগৌরীশ্বর কোথায় ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ৩১ শ্লোকে ‘শ্রীবল্লানক্ষিতিপতির্যশোবান্ধবঃ সেতুবন্ধঃ,’ বলিয়া যাহা উল্লেখ করিতেছেন, তাহার কথা আমরা কিছু বলিতে পারি। ‘শ্রীবল্লানক্ষিতিপতি’কে শাস্ত্রী-মহাশয় ‘বল্লালক্ষিতিপতি’ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আমরাও তাহাই মনে করি। ‘বল্লাল’ স্থলে লিপিকরপ্রমাদে ‘বল্লান’ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নবদ্বীপের নিকট বল্লালসেনের জাঙ্গাল ধুলিয়া একটা জাঙ্গালের চিহ্ন দেখা যায়। এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন,—

“এই পাঁতড়া হইতে দুইটি প্রাচীন জাঙ্গাল-বা রাস্তা বাহির হইয়া একটি পশ্চিম দিক্ দিয়া বামনপাড়া, চাঁদপুর, বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের বিলের মাঠ দিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর, স্বরূপপুর, রামীপুর হইয়া বিল্বগ্রামের দক্ষিণদিকে নবদ্বীপ অভিমুখে গিয়াছে, অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পূর্ব্ব দিক্ দিয়া চাঁদপুর, কালীনগর, ধুবী ও সোণাপুর হইয়া ধুবীর দক্ষিণ ও মামুদপাড়ার পার্শ্ব দিয়া গবীপুর পর্য্যন্ত গিয়া লুপ্ত হইয়াছে। গবীপুরের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ জাঙ্গাল পূর্ব্বে মদপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এক্ষণে কৃষকগণের কৃপায় সে অংশই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত উভয়

আজাওই 'রাজার জাঙ্গাল' বা 'বল্লালসেনের জাঙ্গাল' নামে স্থানীয় অধিবাসিগণের পরিচিত।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নবদ্বীপের নিকট পর্য্যন্ত বল্লালসেনের জাঙ্গাল ছিল, পবনদূতে বিজয়পুরের মধ্যে সেতুবন্ধের কথা বর্ণিত হয় নাই, তাহার বাহিরেই উহা উল্লিখিত হইয়াছে। ৩২ শ্লোকে গঙ্গায় যেখানে জোয়ার আসিয়া পঁহুছিত, তাহার উল্লেখ বুঝা যায়। এক্ষণে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত জোয়ার না আসিলেও পূর্ব্বে যে তাহার নিকট পর্য্যন্ত জোয়ার আসিত, তাহার প্রমাণ আছে। ভক্তি-রত্নাকর হইতে বুঝা যায় যে, সমুদ্রগড় পর্য্যন্ত জোয়ার আসিত। সমুদ্রগড় পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপের মধ্যেই ছিল। ভক্তি-রত্নাকরে এইরূপ লিখিত আছে,—

"সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকটে গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস এ সমুদ্রগড়ি হয়॥
বিজ্ঞগণ শ্রীসমুদ্রগড়ি নাম কয়।
এথা গঙ্গসমুদ্রপ্রসঙ্গ সুখময়॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্রগতি এথা।
লোকে যে প্রসিদ্ধ শুন কহিয়ে সে কথা॥

* * *

ওহে শ্রীনিবাস গঙ্গা-সিন্ধু এইখানে।
সদাই অধৈর্য্য গৌরচন্দ্রের ধিয়ানে॥

* * *

প্রভু প্রকটাদি লীলা দেখিবার তরে।
চিত্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কহিল গঙ্গারে॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতি নিতি।
দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি॥

* * *

গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার।
নিতি গতাগতিমাত্র আশ্রয় গঙ্গার॥
গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্রগতি নাম।
তবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি গ্রাম॥"

তাহার পর ৩৩, ৩৪, ৩৫, শ্লোকে ত্রিবেণী ও যমুনার কথা বলিয়াছেন। ৩৬ শ্লোক হইতে বিজয়পুরের কথা আরম্ভ হইয়াছে। কবির বর্ণনা দেখিয়া বোধ হয়, তিনি প্রথমে রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল স্থান যে নবদ্বীপের অনতিদূর নিকটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি সুহ্মদেশের কথা বলিয়া প্রথমেই রাজধানীর উত্তরদিকের স্থানগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন, পরে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আবার দক্ষিণদিকে আসিয়াছেন। কারণ, বল্লালসেতুপ্রভৃতি বিজয়পুর বা নবদ্বীপের উত্তরদিকেই অবস্থিত, আর সমুদ্রগড় ও ত্রিবেণীর

অবস্থান তাহার দক্ষিণদিকেই। কবি ২৭ শ্লোক হইতে সুহ্মদেশের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া, ক্রমে উত্তরদিকে গিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত পঁহুছেন নাই। কারণ, তাঁহার ২৯ শ্লোকোক্ত কৈলাসগিরি-সদৃশ সৌধশ্রেণীবিভূষিত মহাদেবের নগর প্রভৃতি তৎকালীন ত্রিবেণীর দক্ষিণে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সেনরাজগণের সময় ত্রিবেণীর দক্ষিণে অট্টালিকারাজিসমন্বিত কোন প্রসিদ্ধ নগরের অস্তিত্ব থাকার প্রমাণাভাব। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, সপ্তগ্রামের পর গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত আর কোন প্রসিদ্ধ নগর থাকার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুন্দরবনের মধ্যে প্রাচীন নগরাদির নিদর্শন থাকিলেও, গঙ্গাতীরে যে কোন প্রসিদ্ধ নগর থাকার প্রমাণ নাই, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে, ধোয়ী কবি গঙ্গাতীরস্থ স্থানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সেইজন্য আমরা তাঁহার উল্লিখিত সৌধরাজিমণ্ডিত স্থানগুলি নবদ্বীপের উত্তরদিকেই মনে করি। কবি প্রথমে নবদ্বীপের উত্তরদিকের কথা বলিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে কেন আসিলেন, এরূপ একটা কথা উঠিতে পারে। তাহার উত্তরে আমরা বলিতে চাহি যে, কবি রাজধানী বিজয়পুরে গিয়াই তাঁহার বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। সেইখানে লক্ষ্মণসেনের নিকট কুবলয়বতীর বক্তব্য শেষ হয়। কুবলয়বতীর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর, আর কোন স্থানে মলয়-পবনকে পাঠাইবার প্রয়োজন ঘটে না। সেইজন্য রাজধানীর নিকট যে যে স্থান বিশেষভাবে দর্শনীয়, তিনি অগ্রে তাহাই বলিয়া লইয়াছেন। প্রথমে উত্তরদিকের কথা বলিয়া, শেষে দক্ষিণদিকের কথা বলিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেও মলয়পবনকে উত্তরদিকে আনিতে আনিতে পশ্চিম দিকে বাঁকাইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত, নর্ম্মদানদী দেখাইয়াও আনিয়াছেন। এখানেও সেইরূপ প্রথমে তাহাকে উত্তরে লইয়া গিয়া, আবার দক্ষিণে আনিয়া, আবার ত্রিবেণী হইতে উত্তরদিকে বিজয়পুর লইয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে অবস্থান, তাহাতে অযত্নে সুপারি-গাছগুলির বৃদ্ধি এবং মিন্‌হাজের উক্তি অনুসারে নদীয়াই লক্ষ্মণসেনের রাজধানী, নবদ্বীপ ও তাহার নিকটস্থ স্থানগুলির প্রাচীন নিদর্শন এবং তাহাদের অবস্থানের সহিত পবনদূতের বর্ণনার ঐক্য দেখিয়া, সুচারুরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, নবদ্বীপই পবনদূতের বর্ণিত বিজয়পুর রাজধানী। পবনদূতের কথা ও মিন্‌হাজের উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, বিজয়-পুর বা নদীয়াই লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী লক্ষ্মণসেনের সময় তাঁহার রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ নগরমাত্র ছিল। যদি তাহাকে তাঁহার অন্যতম রাজধানীও বলা যায়, কারণ, কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে লক্ষ্মণাবতীকেও তাঁহার রাজধানী বলা হইয়াছে, তথাপি বিজয়পুর বা নদীয়াই যে তাঁহার প্রধান রাজধানী ছিল, ধোয়ী কবির ও মিন্‌হাজের কথা হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে এবং নবদ্বীপের সহিত যে লক্ষ্মণসেনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর সহিত তাঁহার সেরূপ সম্বন্ধ ছিল না, সেইজন্য বক্তিয়ার খিলজী লক্ষ্মণসেনের প্রকৃত বা প্রধান রাজধানী নদীয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বলেন, লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিয়া, বক্তিয়ার নদীয়ায় প্রথমে কেন আসিয়াছিলেন, উত্তরে তাঁহাদিগকে আমরা বলিব, নদীয়াই লক্ষ্মণসেনের প্রকৃত বা প্রধান রাজধানী থাকায়, বক্তিয়ার প্রথমে সেইখানেই আসিয়া-ছিলেন। তাহার পর লক্ষ্মণাবতীতে গিয়া নিজে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নবদ্বীপ যে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। পবনদূতের লিখিত বিজয়পুর বা নবদ্বীপকে তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু নবদ্বীপকে রাজধানী কেবল ধোয়ী কবি বলেন নাই, মিন্‌হাজউদ্দীনও বলিয়াছেন। রাখালবাবু মিন্‌হাজের কোন কোন কথা স্বীকারও করিয়াছেন, অবশ্য তাই বলিয়া তাঁহার সমস্ত কথা যে তিনি বা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, তাহা বলিতেছি না। তবে কোন বিষয়ের সমর্থক অন্য পক্ষের কোন প্রমাণ থাকিলে, তাহাকে মানিয়া লওয়া অযুক্তিকর নহে। ধোয়ী কবি রাজা লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি, আর মিন্‌হাজও তাঁহার প্রায় সমসাময়িক। ভিন্ন ভিন্ন পক্ষীয় দুই জন সমসাময়িক ব্যক্তির উক্তি যদি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে কেবলই ভূগর্ভে প্রোথিত তাম্রশাসন বা মুদ্রাই যে একমাত্র ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এরূপ যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পবনদূতের বর্ণনার সহিত তাম্রশাসনেরও ঐক্য দেখা যায়। লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত মাধাইনগরের তাম্রশাসনের লিখিত 'যস্ত কৌমারকেলিঃ কলিঙ্গেনাঙ্গনাভিঃ' (?) এবং বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধরগদা-পাণিসংবাসবেদ্যাং' প্রভৃতিতে 'যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহসমরজয়স্তম্ভমালাগুধায়ি' ইত্যাদি বর্ণনার সহিত পবনদূতের 'দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং' ইত্যাদির ঐক্য দেখা যাইতেছে। পবনদূত কাব্য হইলেও, তাহাতে যে ঐতিহাসিক তথ্যটুকু আছে, তাহা অপ্রামাণ্য মনে করার কোনই কারণ দেখা যায় না। সে যাহা হউক, ঐতিহাসিকেরা ইহার মীমাংসা করিবেন। আমরা পবনদূতের কলিঙ্গনগরী, যযাতিনগরী প্রভৃতির ন্যায় বিজয়পুরকেও ঐতিহাসিক স্থান মনে করিয়াই, তাহার স্থাননির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিয়াছি।

এক্ষণে বক্তিয়ারের নদীয়াবিজয় কতদূর সত্য, আমরা সে সম্বন্ধেও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। দক্ষিণসমুদ্রের তীর হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত যে লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ অশ্বারোহী আসিয়া, তাঁহার রাজধানীটা জয় করিয়া লইল, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত হইতে জানা যাইতেছে যে, ১১২১ শাক বা ১২০৬ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণসেনের ৩১ বৎসর রাজত্বকাল চলিতেছিল। অথচ ১২০০ খৃঃ অব্দে অথবা তাহার পূর্ব্বে বা কিছু পরে বক্তিয়ার নদীয়া জয় করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়া থাকেন। আবার বক্তিয়ারের অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান মুগীসউদ্দিন যুজবক নদীয়াবিজয়ের স্মরণের জন্য নূতন মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, বক্তিয়ার নদীয়া জয় করেন নাই, আক্রমণমাত্র করিয়াছিলেন। হয় লক্ষ্মণসেন তথায় অনুপস্থিত ছিলেন, নতুবা তাঁহার সৈন্যগণ তখন অন্য কোন স্কন্ধাবারে অবস্থিতি করিতেছিল। বক্তিয়ার সহসা নগর আক্রমণ করিয়া, লুণ্ঠনাদির পর প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, নদীয়া লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধরগণেরই অধিকারে ছিল। পরে সুলতান মুগীসউদ্দীন যুজবক তাহা অধিকার করিয়া তাহার স্মরণার্থ মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

একটা এরূপ কথা উঠিতে পারে যে, লক্ষ্মণসেনের সময় নদীয়া আক্রমণ হইয়াছিল, না, তাঁহার পরবর্ত্তী লাক্ষ্মণেয়ের সময় তাহা ঘটিয়াছিল ? কারণ, কেহ কেহ মিন্‌হাজের লখমনিয়াকে লক্ষ্মণসেন

না বলিয়া, লাক্ষণেয় বলিতে চাহেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লক্ষ্মণসেনের সময় বখ্তিয়ারের নদীয়া আক্রমণের কথা বলেন না। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কাহারও সময়ে তাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া তিনি অনুমান করেন। কিন্তু রমাপ্রসাদবাবু ও নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতির মতে লক্ষ্মণসেনের সময়েই বখ্তিয়ারকর্তৃক নবদ্বীপ লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইঁহারা সাধারণতঃ বল্লালসেনের সঙ্কলিত দানসাগর এবং বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের সঙ্কলিত অদ্ভুতসাগরে উল্লিখিত সময়ের উপর নির্ভর করিয়া, বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। রাখালবাবু ঐ সকল শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। অবশ্য দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের শ্লোক যে অপ্রামাণ্য নহে, আমরা তাহা স্বীকার করি। দানসাগরে লিখিত আছে,—

"পূর্ণেশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ।"

১০৯১ শাকে বা ১১৬৯ খৃঃ অব্দে দানসাগর রচিত হইয়াছিল। অদ্ভুতসাগরে লিখিত আছে,—

"শাকে খনবখেন্দ্বব্দে আরেভেঽদ্ভুতসাগরম্।"

১০৯০ শাক বা ১১৬৮ খৃঃ অব্দে অদ্ভুতসাগর আরম্ভ করা হয়। বল্লালসেন ইহা আরম্ভ করিয়া যান, এবং লক্ষ্মণসেন তাহা সম্পূর্ণ করেন। উক্ত অদ্ভুতসাগরে 'ভুজবসুদশমিতে শকে শ্রীমদ্বল্লালসেনরাজ্যাদৌ' অর্থাৎ ১০৮২ শকে বা ১১৬০ খৃঃ অব্দে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভ বলিয়া লিখিত আছে। রাখালবাবুর মতে বল্লালসেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সিংহাসনে আরোহণ এবং ১১১৮ অথবা ১১১৯ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। ১১১৯ খৃঃ অব্দ হইতে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ, উহাই লক্ষ্মণ-সংবতের আরম্ভকাল। কিলহর্ণ সাহেবের মতানুসরণ করিয়া, রাখালবাবু ১১১৮—১৯ খৃঃ অব্দ হইতে লক্ষ্মণ-সংবতের আরম্ভ-কাল স্থির করিয়া, ঐ সময়েই লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ বলিতেছেন। ১১৭০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন পুত্রের সময়ে বক্তিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন বলিয়া রাখালবাবু মত প্রকাশ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ-সংবতই রাখালবাবুর এই সকল সময়-নির্দ্ধারণের প্রধান প্রমাণ। তিনি লক্ষ্মণ-সংবৎ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ হইতেই গণিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণানুসারে তাহা সম্ভব কি না, আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছি। প্রথমে দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের কথাই নাই ধরিলাম। রাখালবাবু বিজয়সেনের সময়-নির্ণয়-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "বার্লিনের প্রাচ্যবিদ্যানুশীলন-সমিতির গ্রন্থাগারে ১০১৯ শকাব্দে (১০৯৭ খৃষ্টাব্দে) নান্যদেবের রাজত্বকালে লিখিত একখানি গ্রন্থ রক্ষিত আছে। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় যে, মিথিলার রাজা নান্যদেব বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি।" এই নান্যদেবের পরাজয়ের কথা উমাপতিধরের লিখিত প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের বিজয়সেনের প্রশস্তিতে লিখিত আছে। রাখালবাবু পূর্ব্বে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু সিমরাওগড় হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে লিখিত 'নন্দেন্দুবিন্দুবিধুসম্মিত-শাকবর্ষে......শ্রীনান্যদেবনৃপতির্বিদধীত বাস্তুম্' বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও ১০১৯ শাকে বা ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে নান্যদেবের সময়ই বলিয়া জানা যাইতেছে। রাখালবাবুর আবিষ্কৃত বিজয়সেনের তাম্রশাসন, যাহা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন,

তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বিজয়সেন তাঁহার রাজত্বের ৬২ বর্ষে উক্ত তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা হইলে নান্যদেবের রাজত্বকাল ১০১৯ শাকে ৬২ বৎসর যোগ করিলে, আমরা ১০৮১ শাক পাইতেছি এবং বিজয়সেন তখনও রাজত্ব করিতেছেন, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে বলিয়া আমরা মনে করি। এক্ষণে এই সকল প্রমাণের সহিত অদ্ভুতসাগরে লিখিত ১০৮২ শাকে বল্লালসেনের রাজত্বারম্ভের কি ঐক্য হইতেছে না? তাহা হইলে উহার শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিব কেন? বিজয়সেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায়, রাখালবাবু যে সময় তাঁহার রাজত্বের শেষভাগ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহা আর স্থির থাকিতেছে না। কাজেই ১০৮১ শাক বা ১১৫৯ খৃঃ অব্দ বা তাহার নিকটবর্ত্তী সময়ে বিজয়সেনের রাজত্বকাল বিদ্যমান থাকিলে, ১১১৯ খৃঃ অব্দ হইতে কিরূপে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ হয়? কাজেই ১১১৯ খৃঃ অব্দ হইতে যদি লক্ষ্মণ-সংবতের আরম্ভকাল স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা বিজয়সেনের রাজত্বকালের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। এই ১১১৯ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণসেনের জন্ম ধরিয়া লইলে, বক্তিয়ারের নদীয়া আক্রমণসময়ে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর ছিল, মিন্‌হাজের উক্ত উক্তির সহিত ইহার ঐক্য হয়। তবে তিনি লক্ষ্মণসেনের জন্মের যে অদ্ভুত কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার ঐক্য হয় না। কারণ, ১১১৯ খৃঃ অব্দে বিজয়সেন পূর্ণমাত্রায় রাজত্ব করিতেছিলেন, বল্লালসেনের রাজত্বের তখন নামগন্ধও নাই এবং বল্লালসেন তখন পরলোকগমনও করেন নাই, ইহলোকেই বিদ্যমান ছিলেন। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণসেনের পিতার পরলোকগমনের সময় তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং তাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তী করার জন্য তাঁহার মাতার প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে ঊর্দ্ধপদে ও নতমুণ্ডে রাখিয়া, শুভমুহূর্ত্তে লক্ষ্মণকে ভূমিষ্ঠ করান হইয়াছিল। তবে বল্লালসেনের মৃত্যুর কথা বিশ্বাস না করিয়া, লক্ষ্মণের জন্মঘটনা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণকে ভবিষ্যতে রাজচক্রবর্ত্তী করার জন্য শুভমুহূর্ত্তে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ করাইবার চেষ্টা হইলেও হইতে পারে। সে যাহা হউক, মিন্‌হাজের এরূপ বর্ণনা যতদূর সত্য, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। নান্যদেবের রাজত্বকালের সময়ের সহিত অদ্ভুতসাগরের সময়ের ঐক্য হওয়ায়, ১০৮২ শাকে বা ১১৬০ খৃঃ অব্দে বল্লালসেনের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। নগেন্দ্রবাবু কিন্তু ১০৮২ শাকে বল্লালসেনের রাজত্বারম্ভ বলিয়া স্বীকার করেন না, তিনি মিন্‌হাজের বর্ণনায় বিশ্বাস করিয়া, বলিতে চাহেন যে, লক্ষ্মণের জন্মসময়ের অব্যবহিতপূর্ব্বেই বল্লালসেন রাজত্ব করিতেছিলেন। তাহা হইলে ১১১৯ খৃঃ অব্দ বা ১০৪১ শাকে বল্লালসেন রাজত্ব করিতেছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। ১০৮২ শাকে বা ১১৬০ খৃঃ অব্দে তিনি সমস্ত গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়া গৌড়েশ্বর বলিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া থাকিবেন। তাহাই লক্ষ্য করিয়া ১০৮২ শাকে অদ্ভুতসাগরে তাঁহার 'রাজ্যাদৌ' লিখিত হইয়াছে, ইহাই নগেন্দ্রবাবুর মত। এই সম্বন্ধে তিনি দুইটি প্রধান প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। একটি প্রমাণে তিনি বলেন যে, অদ্ভুতসাগর হইতে জানা যায় যে, ১০৯০ শাকে বল্লালসেন অদ্ভুতসাগর আরম্ভ করিয়া সেই বর্ষেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, দানসাগরে ১০৯১ শাকে তাহা রচিত হওয়ার যে কথা লিখিত আছে, নগেন্দ্রবাবু বলেন, বল্লালের

গুরুদেব অনিরুদ্ধভট্ট তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আর একটি প্রমাণে তিনি সূক্তিকর্ণামৃত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চাহেন যে, ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের ৩৭ বৎসর রাজত্বকাল চলিতেছিল। তাহা হইলে ১০৯০ শাক হইতেই লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ হয়। তিনি ১০৯০ শাকে লক্ষ্মণের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লইয়াই বলিতে চাহেন যে, ১০৯০ শাকেই বল্লালের রাজত্বাবসান ঘটিয়াছে। সীতাহাটী হইতে আবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসনে যখন তাঁহার রাজত্বের ১১শ বর্ষ লিখিত দেখা যাইতেছে, তখন ১০৮২ শাকে কিরূপে তাঁহার রাজত্বারম্ভ ঘটিতে পারে? আমরা নিম্নে তাঁহার এই যুক্তিগুলির আলোচনা করিতেছি। প্রথমে তিনি অদ্ভুত-সাগরের যে শ্লোক হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ১০৯০ শাকেই বল্লালসেন দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা হইতে কিন্তু যে কথা বুঝিতে পারি না। নিম্নে তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকগুলি অবিকল প্রদত্ত হইল,—

"শাকে খনবখেন্দ্বব্দে আরেভেঽদ্ভুতসাগরম্।
গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরালানস্তম্ভবাহুর্মহীপতিঃ॥
গ্রন্থেঽস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষামহা-
দীক্ষাপর্ব্বণি দীক্ষণান্নিজকৃতে নিষ্পত্তিমভ্যর্চ্চ্য সঃ॥

নানাদানচিতাম্বুসঙ্কলনতঃ সূর্য্যাত্মজাসঙ্গমং
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জ্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতিশ্লাঘ্যো মহোদ্যোগতঃ।
নিষ্পন্নোঽদ্ভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালভূমিভুজঃ॥"

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে কিছু কিছু পাঠান্তর আছে। উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে এরূপ বুঝায় যে, ১০৯০ শাকে অদ্ভুতসাগর বল্লালসেন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া, লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তিনি স্বর্গে গমন করেন, লক্ষ্মণসেন তাহা সম্পূর্ণ করেন। ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে, যে ১০৯০ শাকে অদ্ভুতসাগর আরম্ভ করা হইয়াছিল, এবং সেই ১০৯০ শাকেই বল্লালসেন লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ১০৯০ শাকে অদ্ভুতসাগর আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ না হইতেই বল্লালসেন স্বর্গে গমন করেন। কোন অব্দে বল্লালসেন স্বর্গে গমন করেন, উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে তাহা বুঝা যায় না। ১০৯০ শাকে তাহা বুঝিতে হইলে, কষ্টকল্পনাই করিতে হয়। কিন্তু কষ্টকল্পনা করিয়া, একটা প্রমাণ খাড়া করা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। তাঁহার দ্বিতীয় প্রমাণ সূক্তিকর্ণামৃতের কথা। তিনি সূক্তিকর্ণামৃতের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,—

"শাকে সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতেশরদাম্
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশে।"

সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরার্থহেতোঃ কুতুকাৎ
শ্রীধরদাসেনেদং সূক্তিকর্ণামৃতং চক্রে ॥"

ইহা হইতে নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩৭ বর্ষে শ্রীধরদাস সূক্তিকর্ণামৃত রচনা করেন। ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩৭ বর্ষ হইলে, ১০৯০ শাকেই তাঁহার রাজত্বারম্ভ হয়, ইহাই নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা কিন্তু ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩৭ বর্ষ বলি না। উদ্ধৃতাংশের 'রসৈকবিংশে' কথাটিকে নগেন্দ্রবাবু ৩৭ বলিয়া অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা যে নহে, আমরা তাহা দেখাইয়া দিতেছি। উদ্ধৃতাংশটিতে দুইটি আর্য্যা ছন্দের শ্লোক আছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্লোকেরই চতুর্থ পাদে একটি করিয়া মাত্রা কম রহিয়াছে। কাজেই 'রসৈক-ত্রিংশে' এরূপ পাঠ ঠিক নহে। তদ্ভিন্ন যেখানে একত্রিংশ কথা বলা হইতেছে, সেখানে আবার তাহার সহিত 'রস' শব্দ যোগ করিয়া ৩৭ বুঝাইবার জন্য কবির এরূপ কষ্টকল্পনা করার প্রয়োজন বুঝা যায় না। 'রসৈকত্রিংশে'র স্থলে তিনি অনায়াসে 'ষড়েকত্রিংশে' লিখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে ছন্দোরক্ষা হয় না। বিশেষতঃ একত্রিংশের পূর্ব্বে 'রস' বা 'ষট্' বসাইলে, গণনার সাধারণ রীতি অনুসারে ৩১৬ই বুঝাইবে, ৩৭ বুঝাইবে না। তাহাকে ৩৭ বুঝিতে হইলে, উহাকে কদাচ সাধু প্রয়োগ বলা যাইতে পারে না। আর ৩৭এর সহিত বর্ষবাচক কোন শব্দেরও উল্লেখ নাই। 'শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে'ও সাধুপ্রয়োগ নহে। আমরা সেজন্য 'রসৈকত্রিংশে'র স্থলে 'বর্ষৈকত্রিংশে' এবং দ্বিতীয় শ্লোকের চতুর্থ পাদে 'সূক্তিকর্ণামৃতং' এর স্থলে 'সদুক্তিকর্ণামৃতং' বসাইতে চাহি। ইহাতে ছন্দোরক্ষা হয় এবং প্রয়োগদোষও ঘটে না। 'সূক্তিকর্ণামৃতে'র অপর নাম যে 'সদুক্তিকর্ণামৃত', সকলেই তাহা অবগত আছেন। 'রসৈক-ত্রিংশে'র স্থলে 'বর্ষৈকত্রিংশে' হইলে ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩১ বৎসর হয়। তাহা হইলে ১০৯৬ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অদ্ভুতসাগরের কথানুসারে ১০৮২ শকে বল্লালসেনের রাজত্বারম্ভ স্বীকার করিলে, ১০৯৬ শাকে তাঁহার ১৪ বৎসর রাজত্ব করা হয়। তাহা হইলে সীতাহাটীর তাম্রশাসনে বল্লালসেনের রাজত্বের যে ১১শ বর্ষ লিখিত আছে, ১০৯৩ শাকে তাহা গিয়া পড়িতেছে। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর সে আপত্তিরও মীমাংসা হইয়া যাইতেছে। যে সমস্ত প্রমাণ এক্ষণে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাদের দ্বারা আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। ভবিষ্যতে যদি নূতন কোন প্রমাণ আসিয়া পড়ে, তবে তাহার দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হইবে, সুধীগণ অবশ্য তাহাই স্বীকার করিয়া লইবেন। আমাদের এরূপ সিদ্ধান্তে বল্লালসেনের রাজত্বকাল অবশ্য অল্পই হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তিনি তাঁহার পিতা বিজয়সেনের সময় হইতে যে রাজকার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা নবাবিষ্কৃত বিজয়সেনের তাম্রশাসন হইতে বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, উপস্থিত প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে, ঐরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। ইহাতে দানসাগর, অদ্ভুতসাগর, সূক্তিকর্ণামৃত ও তাম্রশাসন সকলেরই সামঞ্জস্য হয় বলিয়া আমরা মনে করি। একটা কথা উঠিতে পারে যে, লক্ষ্মণ-

সংবৎ বা ১০৩২ শাক হইতে লক্ষ্মণসেনের জন্মসময় ধরিলে, ১০৯৬ শাকে তাঁহার রাজ্যারম্ভের সময় তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হয়। সে সময়ে পবনদূতের কবি তাঁহাকে কুবলয়বতীর প্রার্থী করিয়া বর্ণনা করা কেমন কেমন বোধ হয়। কিন্তু কুবলয়বতী তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যবিজয় সময়ে দেখিয়াছিলেন, সে সময়ে কলিঙ্গাঙ্গনাগণের সহিত তাঁহার কৌমারকেলি হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন রাজকবি যখন রাজার গুণ বর্ণনা করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার বয়সের প্রতিই বা লক্ষ্য করিবেন কেন? আর দিগ্বিজয়ী রাজার বয়সের কথা তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী কোন রমণী মনেই স্থানদান করেন না, পুরাণে ও ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সে যাহা হউক, এ সকলের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে আমরা এসকল বিষয়ের আলোচনা করিলাম। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় পবনদূতের বিজয়পুরের স্থাননির্ণয়। আমরা পূর্ব্বে তাহা যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে বিজয়পুর যাঁহার রাজধানী ও যিনি পবনদূতের নায়ক, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিয়া, আমরা তাহারই অবতারণা করিলাম। ভবিষ্যতে নূতন নূতন প্রমাণ উপস্থিত হইলে, এসকল সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, আমরা সুখী ভিন্ন দুঃখিত হইব না। কারণ, আমরা সত্যেরই প্রার্থী।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

পবনদূতের বিজয়পুর প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় অনেক প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা বর্ত্তমান নবদ্বীপকেই পবনদূতোল্লিখিত বিজয়পুর বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, কিন্তু এই বল্লালদীঘি ও বিজয়পুর সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে কোন প্রকার উল্লেখ নাই, এজন্য প্রবন্ধলেখকমহাশয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধে সকলপ্রকার বিরুদ্ধমতের আলোচনা দ্বারা অতি প্রকৃষ্টরূপেই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত করিয়াছেন এবং এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিজয়পুর কিংবা বল্লালদীঘির উল্লেখ নাই বলিয়া, ঐতিহাসিক প্রমাণাদি দ্বারা তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণীত হইলে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিতে পাই না। বৈষ্ণব-সাহিত্য ইতিহাস বা ভূগোল নহে। আর বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাহার উল্লেখ নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি—কারণ, সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-সাহিত্য এখনও আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয় নাই।—এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধকার মহাশয় যেরূপ পরিশ্রম করিয়া এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে বিক্রমপুর আর নবদ্বীপ যে অভিন্ন, তাহা নিঃসন্দেহরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে এবং অন্ধকার-যুগের যে বিষয়টি তিনি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিতই কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। তবে প্রবন্ধে উল্লিখিত বঙ্গ-বিজেতা বখ্তিয়ারের স্থানে মহম্মদ-বিন্-ইখ্তিয়ারের নামোল্লেখ করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, সেন-বংশের শেষ সময়ে যিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ ও জয় করিয়াছিলেন, তিনি বখ্তিয়ার নহেন—বখ্তিয়ারের পুত্র মহম্মদ-বিন্-ইখ্তিয়ার। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

অর্থশাস্ত্রের সমাজচিত্র

(মৌর্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস)

(৩)

পারিবারিক জীবন—পল্লীবিন্যাস; বাস্তু (বসতগৃহ)

গ্রাম ও নগরের কথা বলা হইয়াছে। এখন এক একটী পল্লী বা পাড়ার ব্যবস্থা কেমন ছিল, তাহা বলিব। সাধারণতঃ এক জাতির বা বর্ণের কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটী পল্লী গঠিত হইত। এক একটী পল্লীতে দুই তিনটা করিয়া প্রশস্ত রাজপথ থাকিত। এই রাজপথের উভয়-পার্শ্বেই লোকের বসতভিটা নির্মিত হইত। মৌর্যযুগের বাস্তুনির্মাণ-ব্যবস্থা-সম্বন্ধে কোন বিশদ বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। আরও দুঃখের বিষয়, ৪র্থ শতাব্দীর কোন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে অর্থশাস্ত্রে বাস্তুর সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতে এবং গ্রীকদিগের বর্ণনা হইতে আমাদের এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র সাহায্য হইবে। ঐ সকল বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, দরিদ্র লোকে সাধারণতঃ বাঁশের বা কাঠের বাটীতে বাস করিত। গৃহনির্মাণের জন্য কাঠের বহুল ব্যবহার ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। তবে রাজা, রাজকর্মচারী, ধনী, শ্রেষ্ঠী বা বণিকেরা নিজ নিজ পরিবারবর্গের জন্য ইষ্টক ও প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদাদি নির্মাণ করাইতেন। অর্থশাস্ত্রের "সন্নিধাতৃনিচয়কর্ম্ম" ও "গৃহবাস্তুক"—অধ্যায় দুইটীতে পাকা ইটের ও প্রস্তরের গৃহ ও অট্টালিকার উল্লেখ আছে। জাতকেও ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত দ্বিতল, ত্রিতল—এমন কি, সপ্ততল প্রাসাদেরও উল্লেখ দেখা যায়[1]। ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভের উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্যের বহুস্থানেই আছে। প্রস্তরের প্রাচীরেরও উল্লেখ আছে এবং মিঃ রিজ্‌ডেভিড্‌স্ অনুমান করেন যে, সিংহলের একটী পার্ব্বত্য-দুর্গের প্রাচীরের যে ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পাষাণ-স্থাপত্য ও পাষাণ-মূর্ত্তির উল্লেখও অনেক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

গৃহ-নির্মাণ-ব্যবস্থা

অশোকের সময় পাষাণ-স্থাপত্য বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। অশোক-স্তূপগুলির অধিকাংশই ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত। আজিও যে সকল অশোক-স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে, তাহার কারুকার্য্য ও পালিশ দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তবে [illegible] সময়ের পাটলিপুত্রের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ [illegible] যায়। গৃহনির্মাণের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। [illegible] ছিল। তবে দ্বিতলবাটীরও ব্যবস্থা দেখা যায়। যাহারা

১। জাতক—[illegible] ইত্যাদি।

[illegible] রাজা বা অন্যত্র যাত্রা ও অন্য লোকের গৃহের একত্র বাসও করিতেন। [illegible] পরিবারভুক্ত আত্মীয়-[illegible] ছিল। বর্ত্তমানে উহাদের বিষয় [illegible]

বিবাহ ও গার্হস্থ্য-জীবন

অর্থশাস্ত্রের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ লোকে ষোড়শ বৎসরের পর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গোদান-সংস্কারের পর বিবাহ করিত। বৌধায়ন-বশিষ্ঠাদি ধর্ম্মসূত্রে, এমন কি মনুসংহিতার মতে ব্রহ্মচর্য্যের কাল আরও অধিককালব্যাপী ছিল। বৌধায়ন ব্রাহ্মণের পক্ষে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত বৈদিক ব্রহ্মচর্য্যের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্য স্থলে আবার ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনু বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে দুই তিনটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, তাঁহার মতে ৩০ বা ন্যূনকল্পে ২৫ বৎসর, পুরুষের পক্ষে বিবাহের প্রকৃষ্ট বয়স। বিবাহের উদাহরণ স্থলে মনু বলেন,—

বিবাহের বয়স

ত্রিংশদ্বর্ষোহুদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

আমাদের চক্ষে স্মৃতিকারের মতগুলি উচ্চ আদর্শানুযায়ী বলিয়াই বোধ হয়। সমাজে ঐমত কার্য্য হইত বলিয়া বোধ হয় না। রামচন্দ্রের বিবাহ বোধ হয়, ষোড়শ বর্ষেই হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহও ঐরূপ কম বয়সেই হইয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধও বিবাহ করিব কি, না করিব—এই চিন্তায় কালক্ষেপ করিয়া ২৩ বর্ষ বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থেরাও বিবাহ ঐরূপ অল্পবয়সে করিতেন বলিয়াই মনে হয়। কৌটিল্য এ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলেন—"বৃত্তোপনয়নস্ত্রয়ীম্ আন্বীক্ষকীং চ শিষ্টেভ্যঃ, বার্ত্তামধ্যক্ষেভ্যঃ, দণ্ডনীতিং বক্তৃপ্রয়োক্তৃভ্যঃ। ব্রহ্মচর্য্যং চাষোড়শাদ্বর্ষাৎ। অতো গোদানং দারকর্ম্ম চ।"—১০ পৃঃ।

অর্থশাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। এই অষ্টপ্রকার বিবাহের উল্লেখ মন্বাদি স্মৃতি ও পরবর্ত্তী নিবন্ধমাত্রেই পাওয়া যায়। কৌটিল্য এই আট প্রকার বিবাহের প্রথম চারিটী অর্থাৎ ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব—এই চারিটীকে অন্য চারিপ্রকার বিবাহ হইতে বিভিন্ন করিয়াছেন। তিনি এই চারিটী ধর্ম্ম্য বিবাহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এই চারিটী বিবাহই [illegible] সম্পাদিত হইত এবং ইহাতে বর-কন্যার পিতার কর্তৃত্ব থাকিত।

অপর চারিটী বিবাহ অর্থাৎ গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস, ও পৈশাচ—এই কয়টীকে কৌটিল্য কোন নামে অভিহিত করেন নাই। আমরা ইহাদিগকে মানুষ বা লৌকিক বিবাহ বলিতে পারি। [illegible] বিবাহ [illegible] ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। বর ও কন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইত, তাহাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলিত। গান্ধর্বের উদাহরণ প্রাচীন ইতিহাস-

Dissolution of marriage হইত। কেবল একপক্ষ যদি বিবাহবন্ধন-মোচনে যত্নবান্ থাকিতেন, বিচ্ছেদ হইত না। কৌটিল্য বলেন,—অমোক্ষ্যা ভর্তুরকামস্য দ্বিষতী ভার্য্যা, ভার্য্যায়াশ্চ ভর্তা। পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ। কৌ°—১৫৫ পৃষ্ঠা।

শুধু বিবাহবন্ধনমোচন ভিন্ন এ বিবাহভঙ্গিতে দম্পতীর পক্ষে কতকগুলি আরও নিয়ম ছিল। স্ত্রী যখন বিবাহে আনিত শুল্ক বা স্ত্রীধন ভর্তা নিজে বিপৎকালে ভোগ করিতে পারিতেন না। ভোগ বা ব্যয় করিলে গান্ধর্ব ও আসুরমতে তাঁহাকে সুদেমূলে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইত। আবার রাক্ষস ও পৈশাচমতে ভর্তার পক্ষে ঐরূপ শুল্কের ব্যয় করা চৌর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ আইন অনুসারে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। তবে ইচ্ছামত অনেকগুলি বিবাহের পক্ষে আইনে প্রতিরোধক বাধা অনেক ছিল। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বা কেবল কন্যা উপর্য্যুপরি 'কন্যাজননী' হইলেই আইনমতে পুরুষ পুনর্বিবাহের অধিকার প্রাপ্ত করিতেন।

বহুবিবাহ

কৌটিল্য বলেন,—বর্ষাণ্যষ্টৌ অপ্রজায়মানাম্ অপুত্রাং বন্ধ্যাং চাকাঙ্ক্ষেত। দশ নিন্দুং দ্বাদশ কন্যা-প্রসবিনীম্। ততঃ পুত্রার্থী দ্বিতীয়াং বিন্দেত।—অর্থাৎ পত্নী বন্ধ্যা ও অপ্রজায়মানা হইলে স্বামী অষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। বিবাহের পর কেবল একটী মাত্র সন্তান হইয়া উহা মরিয়া গেলে, স্বামীকে দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। আর উপর্য্যুপরি কেবল কন্যাসন্তানমাত্র হইলে স্বামী দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। অতঃপর পুত্রলাভার্থ দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করিবেন।

এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ভর্তা আইন অনুসারে ২৪ পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

কামার্থ বহুবিবাহস্থলে কেবল অর্থদণ্ড দিয়াই ভর্তার নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁহাকে পূর্ব্ব-বিবাহিতা পত্নীর সন্তোষার্থ আধিবেদনিক শুল্ক অর্থাৎ Compensation দিতে হইত।

কাজেই আমাদের মনে হয় যে, সাধারণ লোকের পক্ষে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও, অর্থদণ্ডের ভয়ে ও স্ত্রীর আধিবেদনিক শুল্কদানের ফলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোক প্রায়শঃই বহুবিবাহে বিরত থাকিতেন। তবে ধনী লোকের, রাজা বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদিগের কথা স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহাদের পক্ষে সামান্য অর্থদণ্ড বা আধিবেদনিক শুল্কদান কিছুই ছিল না। তাঁহারা ইচ্ছামত বহু-বিবাহ করিতেন। আর রাজাদিগের ত কথাই ছিল না। মৌর্য্য ও মৌর্য্যপূর্ব্ব-যুগের সকল রাজারই বোধ হয়, বহু স্ত্রী ছিল। বুদ্ধের সময় কোশলরাজ প্রসেনজিতের একাধিক স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বিবাহিতা পত্নী ভিন্ন মল্লিকা-নাম্নী এক ফলওয়ালীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে আবার শাক্যবংশীয়া দাসীগর্ভজাতা বাসবক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করেন। মগধরাজ বিম্বিসার, অজাতশত্রু, মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি সকলেই বহুপত্নীক ছিলেন। অর্থ-শাস্ত্রের নিশান্তপ্রণিধি অধ্যায়ে দেখা যায় যে, প্রায় সকল রাজারই বহু পত্নী ও বহু উপপত্নী থাকিত। ইহাদের চক্রান্তের ফলে রাজাকে প্রাণের জন্য সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হইত। এমন কি, এখানে পত্নী [illegible] মহারাণীকেও সম্রাট বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। রাজান্তঃপুর [illegible], বৃদ্ধ ও [illegible] কর্মচারীদিগের দ্বারা সততই রক্ষিত হইত।

দাম্পত্য-জীবন

স্ত্রীধন

বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে যথাশক্তি অলঙ্কারাদি দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে স্ত্রীর বৃত্তি-স্বরূপ কিছু অর্থও দিতে হইত। অলঙ্কারের সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না। যাঁহার যেমন অবস্থা, তিনি স্ত্রীকে সেইরূপই দিতেন। বৃত্তির সম্বন্ধে নিয়ম ছিল,—উহা দুই সহস্র পণের কম হইত না। কৌটিল্য বলেন,—"আবধ্যানিয়মঃ। পরদ্বিসহস্রা স্থাপ্যা বৃত্তিঃ।" এই বৃত্তি ও লৌকিক বিবাহে কন্যা যে শুল্ক পাইতেন, তাহা স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বামী কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া প্রবাসে গেলে বা কোন কারণে উপায়াক্ষম হইলে, এই স্ত্রীধনই স্ত্রীর জীবিকা-নির্ব্বাহের সহায়তা করিত। ইহাতে স্বামীর কোন প্রকার স্বত্ব বা অধিকার থাকিত না। দম্পতী ধর্ম্ম্য বিবাহে আবদ্ধ হইলে, অর্থাভাব-বশতঃ বা বিপৎকালে স্বামী এই স্ত্রীধন ব্যয় করিতে পারিতেন। কিন্তু লৌকিক বিবাহে এইরূপ স্ত্রীধন ব্যয় দোষের ছিল। স্বামীকে উহা সুদেমূলে প্রত্যর্পণ করিতে হইত। রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহস্থলে উহা স্তেয় বা চৌর্য্য বলিয়া গণ্য হইত। গান্ধর্ব্বাসুরোপভুক্তং সবৃদ্ধিক-মুভয়ং দাপ্যেত। রাক্ষসপৈশাচোপভুক্তং স্তেয়ং দদ্যাৎ।—১৫২ পৃষ্ঠা।

সংসার—স্ত্রীর স্বামিসেবা, খোর-পোষ বা ভরণ-পোষণে স্বামীর দায়িত্ব

দ্বাদশ বৎসর বয়স হইলেই স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহারা অর্থাৎ স্বামিসহবাসের উপযুক্তা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই দ্বাদশ বৎসরের পর তাঁহাকে স্বামীর ঘর করিতে হইত। এই দ্বাদশ বৎসরকে আমরা তৎকালের age of consent বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ইহার পর স্ত্রী স্বামীর ঘর করিতে বা স্বামীর সেবা করিতে অস্বীকৃতা হইলে, তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিতা হইতেন। স্বামীরও ঐরূপ ষোড়শ বৎসরের পর স্ত্রীর প্রতিপালনাদি না করিলে তাঁহার অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

স্বামীকে নিজের অবস্থানুযায়ী সাধ্যমত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইত। কাল বা সময়ের হিসাব করিয়া তদুপযোগী অর্থ দিতে হইত (প্রবাসাদি গমনস্থলে) অথবা স্বামীর আয়ানুযায়ী মাসহারার ব্যবস্থা করিতে হইত। (যথা পুরুষপরিবাপম্)। শুল্ক, স্ত্রীধন ও আধিবেদনিক ধনদানে অসমর্থ হইলেও ঐরূপ মাসহারার ব্যবস্থা করিতে হইত। (অ° শা°—১৫৩ পৃ°)

কিন্তু স্ত্রী যদি শ্বশুরকুলের অন্য কাহারও আশ্রয় অবলম্বন করিতেন বা বিবাদাদিবশতঃ স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভিন্নভাবে বাস করিতেন (বিভক্তায়াং), তাহা হইলে তাঁহার স্বামীর উপর খোরাকীর কোন দাবী থাকিত না। (শ্বশুরকুলপ্রবিষ্টায়াং বিভক্তায়াং বা নাভিযোজ্যঃ পতিঃ)।

স্বামীর শাসন ও কর্তৃত্ব

স্ত্রীর উপর স্বামীর যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। স্ত্রী অবাধ্যা বা অবশতাপন্না হইলে বা স্বামীর আদেশ অবমাননা করিলে স্বামী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে, এমন কি কটু-সম্ভাষণাদি করিতে পারিতেন। উদাহরণস্বরূপ কৌটিল্য বলেন যে, স্বামী অপরাধিনী স্ত্রীকে—নগ্নে, বিনগ্নে, ন্যঙ্গে, অপিতৃকে, অমাতৃকে বলিয়া গালি দিতে পারিতেন, (নগ্নে বিনগ্নে ন্যঙ্গে অপিতৃকে অমাতৃকে ইত্যনির্দ্দেশেন বিনয়গ্রাহণম্)। তাহাতেও স্ত্রীর প্রতিপত্তির

পরিবর্তন না হইলে, স্বামী চড়চাপড় বা বেণুদল বা রজ্জুর দ্বারা স্ত্রীকে প্রহার করিতে পারিতেন। অকারণ প্রহার করিলে বা ঐরূপ শাসনের মাত্রা অধিক হইলে, স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত অত্যাচারের জন্য স্বামীকে বাক্‌পারুষ্য বা দণ্ডপারুষ্যের অর্দ্ধেক দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। (বেণুদলরজ্জুহস্তানামন্যতমেন বা পৃষ্ঠে ত্রিরাঘাতঃ। তস্যাতিক্রমে বাগ্‌দণ্ডপারুষ্যদণ্ডাভ্যাম্ অর্দ্ধদণ্ডাঃ—১৫৫পৃ°। কতকগুলি অপরাধে স্ত্রীলোকের অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। শাস্ত্রে অর্থদণ্ডের নিয়মগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, দণ্ডিতা স্ত্রীকে নিজের স্ত্রীধন হইতেই উহা দিতে হইত।) নিম্নে উহার কতিপয় লিখিত হইল।

১। স্ত্রী স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও দর্পক্রীড়া (কামকলাব্যাপারঘটিত কোন প্রকার ক্রীড়া) করিলে বা মদ্যপান করিলে উহার তিন পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত।

২। ঐরূপ দিনমানে স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও কোন স্ত্রী-প্রেক্ষাবিহার-গমন করিলে অর্থাৎ স্ত্রীলোকনটীদিগের দ্বারা পরিচালিত কোন প্রকার থিয়েটারাদি দেখিতে গেলে, ছয় পণ দণ্ড হইত। রাত্রিতে বাটীর বাহির হইলে বা কোন উৎসবাদিতে গমন করিলে বা পুরুষপরিচালিত কোন থিয়েটারাদিতে যাইলে, যথাক্রমে ১২ পণ, ৬ পণ অর্থদণ্ড হইত। ঐরূপ অন্য কোন পুরুষের সহিত পত্র ব্যবহার করিলে, দ্রব্যাদি আদান প্রদান করিলে (প্রতিষিদ্ধপুরুষব্যবহারেষু) স্ত্রীলোকদিগকে দণ্ডিত হইতে হইত। ব্যভিচারাদি স্থলে আরও অধিক কঠিন দণ্ড হইত, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হইবে।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ বাটীর বাহিরে যাওয়া সমাজে নিন্দিত ছিল। এখনকার দিনের মত কঠিন অবরোধ না থাকিলেও, যেখানে সেখানে বেড়াইতে যাওয়া, নিজের বাটী ছাড়িয়া প্রতিবেশীর গৃহে গমন করা প্রভৃতি বিশেষ দোষের ছিল। অর্থশাস্ত্রের নিষ্পতন ও পথ্যানুসরণাধ্যায়ে এই সমস্ত অপরাধ ও উহার দণ্ডের কথা বিবৃত আছে।

উচ্চবংশীয়া স্ত্রীলোকেরা কোন কার্য্যে গ্রামান্তরগমনের সময় স্বামিসঙ্গে বা কোন জ্ঞাতি বা গ্রামিকের বা কোন বিশেষ পরিচিত লোককে সঙ্গে করিয়া যাইতেন, নচেৎ উহা নিন্দার কারণ হইত। আত্মীয়-স্বজন বা পিতৃকুলে বা জ্ঞাতিকুলে কোন বিপদ হইলে বা কাহারও মৃত্যু হইলে, কেহ কঠিন রোগে পড়িলে বা অন্য কোন বিশেষ কারণবশতঃ একাকী গমন করিলে, তাহা দোষের বলিয়া গণ্য হইত না। (প্রেতব্যাধিব্যসনগর্ভনিমিত্তমপ্রতিষিদ্ধমেব জ্ঞাতিকুলগমনম্)। —১৫৭ পৃ°।

স্বামী অন্য দিনের জন্য প্রবাস গমন করিলে স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন।

স্বামীর প্রবাসগমন

ফিরিতে বিলম্ব হইলে স্ত্রী এক বৎসর পর্য্যন্ত পতিগৃহে স্বামীর অপেক্ষা করিতেন। আর যদি ভরণপোষণের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত পতিগৃহে থাকিয়া পতির অপেক্ষা করার নিয়ম ছিল। ইহার মধ্যেও যদি স্বামী না ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে জ্ঞাতিবর্গ প্রবাসীর পত্নীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এইরূপ চারি বা আট বৎসর অতীত হইলে, স্ত্রী যদি স্বামীর পুনরাগমনে সন্দিহান হইয়া পুরুষান্তর গ্রহণেচ্ছু

হইতেন, তাহা হইলে তিনি স্বামিদত্ত ধনাদি প্রত্যর্পণ করিয়া যথেচ্ছ পিতৃগৃহে বা অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে পারিতেন।

এখানে স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে বিশেষ কিছু বলা নাই। কাব্য-নাটকাদিতে অবশ্য আমরা একবেণীধরা কেশসংস্কার ও অঙ্গরাগবর্জ্জিতা প্রোষিতভর্তৃকার কথা পাই। তাহা সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদিপাঠকমাত্রেই বিদিত আছেন।

দীর্ঘপ্রবাস—ব্যবস্থা

স্বামীর প্রবাসগমনের সময় নিজের বা পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের জন্য স্ত্রী ঋণ-কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া সংসার চালাইতে পারিতেন। এই ঋণ-পরিশোধের জন্য স্বামী দায়ী হইতেন। কৌটিল্য বলেন,—পতির প্রাদুঃ—স্ত্রীধনম্ পণম্ অপ্রতিবিধায় প্রোষিতঃ ইতি সম্প্রতিপত্তাবুত্তমঃ। অসম্প্রতিপত্তৌ তু সাক্ষিণঃ প্রমাণম্।

স্বামী ভরণপোষণের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিলেই রাজাদেশে দণ্ডিত হইতেন। এসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের বিধিগুলি বড়ই সুন্দর। স্বামীর ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ স্ত্রীর প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য ছিল, তাহা প্রতিপালনে বিমুখ হইলে সমাজের অমঙ্গলাশঙ্কায় রাজপুরুষেরা কঠোরশাসনে উঁহাকে উহা হইতে বিরত করিতেন। অর্থশাস্ত্রের যুগ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারেরই পরবর্ত্তী। ঐ যুগের লোকে পৃথিবীর ক্ষণিকবাদে ব্যথিত হইয়াও নশ্বর জীবনের দুঃখ ও পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতির জন্য দলে দলে সন্ন্যাসী হইত। স্বামী স্ত্রীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, স্ত্রীও ভিক্ষুণী-সঙ্ঘে প্রবেশ করিত। এই সকলের মধ্যে প্রকৃত মুমুক্ষুর সংখ্যা কমই ছিল। কতক লোক অন্যের আদর্শ অনুকরণ করিতে গিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিত। আবার এখনকার মত অনেক দুষ্ট প্রবঞ্চকও ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বা সংসারের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘের কোন একটাতে যোগ দিত। এই সকলের ফলে সমাজে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিত। অনেক ভদ্রঘরের স্ত্রী স্বামি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া শিশু-পুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য বিপদে পড়িতেন; অনেকে আবার কুপথ-গামিনী হইতেন। এই সকল নিবারণের জন্য অর্থশাস্ত্রে অনেকগুলি বিধি দেখা যায়।

অর্থশাস্ত্রকার প্রব্রজ্যার কালনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ও প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বের যে সকল কর্ত্তব্য, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে লুপ্তব্যবায়েরই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর্ত্তব্য; অন্যের নহে। তিনি বলেন,—লুপ্তব্যবায়ঃ প্রব্রজেদ্ আপৃচ্ছ্য ধর্ম্মস্থান্। অন্যথা নিয়ম্যেত। শুধু তাহাই নহে। পুত্র কলত্রের ভরণপোষণ না করিয়া সংসারত্যাগ করিলে লোকে রাজাদেশে দণ্ডিত হইত। কৌটিল্য বলেন,—পুত্রদারমপ্রতিবিধায় প্রব্রজতঃ পূর্ব্বঃসাহসদণ্ডঃ। এ বিষয়ে রাজাদেশ বড়ই কঠিন ছিল। এরূপ কষ্টবৈরাগী প্রব্রজিতকে সাবধান ও অন্যান্য শাস্তিরক্ষকেরা যেওয়ার করিতেন ও উঁহাদের সংসারাদির ব্যবস্থা ও প্রব্রজ্যার কারণ অবগত হইয়া যথোচিত দণ্ড দিতেন। (১২৭ পৃ°—সদ্যোগৃহীতলিঙ্গিনং আসিদ্ধিনং বা প্রব্রজিতমলকব্যাধিতং অবিকারিণং গূঢ়দারভাণ্ডা‍ন্তানাযোগং বিবহন্তং দীর্ঘপথিকং সমূহং চোপগ্রাহয়েৎ।)

শুধু তাহাই নহে, রাজাজ্ঞায় অকাল-প্রব্রজিতদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত এবং বানপ্রস্থী ভিন্ন অন্য প্রকারের প্রব্রজিতদিগকে জনপদে স্থাপন করিতে বা গ্রাম-মধ্যে বাস করিতে

দেওয়া হইত না। স্ত্রীলোককে ধর্ম্মের নামে ফুসলাইয়া ভিক্ষুণী করিলে বা প্রব্রজ্যার পথে লইয়া আসিলে, পূর্ব্বসাহস দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল (স্ত্রিয়ং চ প্রব্রাজয়তঃ)—(বানপ্রস্থাদন্যঃ প্রব্রজিতভাবঃ সজাতাদন্যঃ সঙ্ঘঃ সামুত্থায়িকাদন্যঃ সময়ানুবন্ধো বা নাস্য জনপদমুপনিবেশেত। ন চ তত্রারাম-বিহারার্থাঃ শালাঃ স্যুঃ—৪৮ পৃ°)।

এই ত গেল স্বামী স্ত্রীর কথা। স্বামীর জীবনান্তে বা বানপ্রস্থাবলম্বনের পর পুত্রবতী বয়ঃস্থা স্ত্রী স্বামীর সংসারে থাকিয়া পুত্রাদি পালন করিতেন; নিজের স্ত্রীধন যাবজ্জীবন ভোগ করিতেন। পরে তাহা পুত্রাদি কাহারও হস্তগত হইত। বালবিধবারা প্রায়ই পুরুষান্তর গ্রহণ করিতেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সে সব কথা বলা হইবে।

যে সকল পরিবারে বহুবিবাহের ফলে অনেক সপত্নীর একত্রাবস্থান হইত, সেখানে নানাকারণে কলহ হইত। স্বামী সাধারণতঃ জীবৎপুত্রাকেই বেশী আদর-যত্ন করিতেন। ধর্ম্ম্য বিবাহের পত্নীদের মান্যও অধিক ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মতে ধর্ম্মকার্য্যাদিতে সবর্ণা ধর্ম্ম্যবিবাহমতে পরিণীতা স্ত্রীই স্বামীর সাহচর্য্য করিতেন।

অনেকে আবার অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিতেন। অসবর্ণবিবাহ তৎকালে সমাজে প্রচলিত ছিল। অনুলোম অসবর্ণবিবাহ গর্হিত বা নিন্দিত ছিল না। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ আর্য্যেরা চিরকাল ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়াছেন।

অসবর্ণা স্ত্রী

অর্থশাস্ত্রে অসবর্ণবিবাহের কতকগুলি নিয়ম দেখা যায়। পুরুষের অনন্তরা পত্নীর সন্তানেরা পিতার সবর্ণ বলিয়াই গণ্য হইতেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ও ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান পিতার সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী হইতেন এবং সবর্ণ বলিয়াই পরিগণিত হইতেন। "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরনন্তরাপুত্রাঃ সবর্ণাঃ॥" একান্তরা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদের স্থান সমাজে কিছু হীন হইয়া পড়িয়াছিল। অসবর্ণা নিম্নজাতীয়া স্ত্রীর সংসারেও বোধ হয়, কিছু হীনতা ছিল।

স্বামি-স্ত্রী জীবদ্দশায় পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ দিতেন। পিতা সংসারে থাকিতে থাকিতে যাহাদের বিবাহ না হইত, তাহাদের বিবাহের খরচ ও অবিবাহিতা কন্যাদের বিবাহের প্রদানিক বা dower সম্পত্তি হইতে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

অনেকে জীবদ্দশাতেই নিজ নিজ সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতেন। এরূপ বিভাগ স্থলে পুত্রদের সমান ভাগই হইত (জীবদ্বিভাগে পিতা নৈকং বিশেষয়েৎ।— ১৬১ পৃষ্ঠা)। পুত্রদিগের মধ্যে নাবালক কেহ থাকিলে বা কেহ প্রবাসী থাকিলে পিতা তাহার অংশ মাতুলবংশীয়দের হস্তে বা গ্রামবৃদ্ধদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেন। ইঁহারা ঐ পুত্র সাবালক হইলে, উহার অংশ বুঝাইয়া দিতেন।

ঔরসজাত পুত্র অভাবে অন্যের দ্বারা নিজ স্ত্রীতে অনেকে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন করাইতেন। অর্থশাস্ত্রের সময়েও বোধ হয়, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের প্রথা সমাজে অপ্রচলিত ছিল না। এখনকার দিনে অবশ্য ক্ষেত্রজের নামে আপামর জনসাধারণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু

সে যুগে উহা ঐরূপ কোন ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত না। কৌটিল্য অপুত্রক রাজগণকে ঔরসাভাবে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের উপদেশ দিয়াছেন।—বৃদ্ধস্তু ব্যাধিতো বা রাজা মাতৃবন্ধুতুল্যগুণবৎ-সামন্তানামন্যতমেন ক্ষেত্রে বীজমুৎপাদয়েৎ। ন চৈকপুত্রমবিনীতং রাজ্যে স্থাপয়েৎ।—৩৫ পৃষ্ঠা।

অনেকে দুহিতৃ-গর্ভজাত সন্তানকে পুত্রিকাপুত্ররূপে গ্রহণ করিতেন। আবার অনেকে পোষ্য-পুত্র বা দত্তক গ্রহণ করিতেন (তৎসধর্ম্মা মাতা-পিতৃভ্যাম্ অদ্ভির্দত্তো দত্তঃ)। অনেকে এইরূপ দত্তকের অভাবে সবর্ণ ও সদ্বংশজাত পুত্র ক্রয় করিতেন। এইরূপ পুত্রকে ক্রীতপুত্র বলিত। পোষ্যপুত্রের ন্যায় অনেকে পরের—(মাতা-পিতৃহীন) পুত্রকে লালন পালন করিতেন—ইহাদিগকে কৃতকপুত্র বলিত। অনেকে আবার পরিচিত বা আত্মীয় লোকের ত্যক্ত পুত্রকে নিজের করিয়া লইতেন—ইহাদিগকে অপবিদ্ধ পুত্র বলিত। এ সকলের অভাবে কানীন (কন্যাগর্ভঃ কানীনঃ—পত্নীর অবিবাহিতাবস্থায় উৎপন্ন), সহোঢ় (বিবাহকালে পত্নীর গর্ভস্থ সন্তান) ও পৌনর্ভব সন্তানও লোকের গৃহে স্থান পাইত। এখন অবশ্য পালিত বা পোষ্যপুত্র ভিন্ন (স্থানবিশেষে কৃত্রিম পুত্রও প্রচলিত) আর অন্য কোন প্রকারের পুত্রের দায়াধিকার বা সমাজে স্থান নাই।

পিতার জীবদ্দশায় পুত্রদিগের সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকিত না (অনীশ্বরাঃ পিতৃমন্তঃ), এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পিতার জীবদ্দশায় পিতা পুত্রের শিক্ষা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। কেন না, আমরা অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগকালে অবিবাহিত পুত্রের নৈবেশনিক এবং কুমারী কন্যার প্রাদানিক পাইবার ব্যবস্থা আছে।

পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্বন্ধে দুই একটী বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। কৌটিল্য বলেন,—

একস্ত্রীপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠাংশঃ। ব্রাহ্মণানামজাঃ, ক্ষত্রিয়ানাম্ অশ্বাঃ। বৈশ্যানাং গাবঃ। শূদ্রাণামবয়ঃ।

কাণলিঙ্গাস্তেষাং মধ্যমাংশঃ। ভিন্নবর্ণাঃ কনিষ্ঠাংশঃ।

চতুষ্পদাভাবে রত্নবর্জ্জানাং দশানাং ভাগং দ্রব্যাণামেকং জ্যেষ্ঠো হরেৎ। প্রতিমুক্তস্বধা-পাশো হি ভবতি। ইত্যৌশনসো বিভাগঃ।—পৃ° ১৬২।

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের কিছু অতিরিক্ত অংশলাভের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার অজ সম্পত্তি লাভ করিতেন। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ঐরূপ সমস্ত অশ্বগুলি জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য ছিল। ঐরূপ বৈশ্য ও শূদ্রদিগের মধ্যে ঐ ব্যবস্থা ছিল।

এগুলি ভিন্ন ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে জ্যেষ্ঠ পিতৃদ্রব্যাদির দশমাংশ পাইতেন। কৌটিল্য বলেন, ঐ অতিরিক্ত সম্পত্তির সাহায্যে তিনি পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতেন। পরবর্ত্তী যুগেও এই উদ্ধার ব্যবহার ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। মনু বলেন,—"জ্যেষ্ঠস্য বিংশ উদ্ধারঃ সর্ব্বদ্রব্যাচ্চ যদ্বরং।" কেন জ্যেষ্ঠ এই অতিরিক্ত অংশ লাভ করিতেন, তাহার বিশেষ কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। মনে হয় যে, পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে, সেইগুলি সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত সম্পত্তি দেওয়া হইত। পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা

এই সকল কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহারা কেবল জ্যেষ্ঠের উৎকর্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন,—জ্যেষ্ঠস্য জাতমাত্রেণ পুত্রীভবতি মানবঃ—এইজন্যই জ্যেষ্ঠের প্রাধান্য। ঐরূপ অন্যের মতে—জ্যেষ্ঠপুত্রপ্রভৃতস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্” ইত্যাদি।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্গুণ, অন্যায়বৃত্তি, মানুষহীন হইলে তাঁহার এই অংশের হ্রাস বা লোপেরও ব্যবস্থা দেখা যায়।

বহুবিবাহস্থলে অংশের তারতম্য দেখা যায়। কোন লোক ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, উক্ত বিবাহজাত পুত্রগণের মধ্যে ভাগের তারতম্য হইত। ব্রাহ্মণীপুত্র ৪ ভাগ পাইলে ক্ষত্রিয়াপুত্র ৩ ভাগ পাইতেন, বৈশ্যাপুত্র ২ ভাগ ও শূদ্রাপুত্র ১ ভাগ মাত্র পাইতেন।

নারীজীবন

অতঃপর নারীজীবনের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ কথা বলিব। অবশ্য দাম্পত্যজীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে উপরোক্তগুলি ভিন্ন আরও আমাদের অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। এই অধ্যায়ে সেইগুলি বলা হইবে।

সমাজ চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল। যুগে যুগে দেশকালপাত্রভেদে উহার পরিবর্তন হয়। উহা কিছুতেই একভাবে থাকিতে পারে না। কঠোর রক্ষণশীলতাও উহাকে একভাবে রাখিতে পারে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। ভারতেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। ঘটনাস্রোতে প্রাচীন আদর্শ, প্রাচীন আচার—সবই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকের সমাজে স্থান উচ্চই ছিল; স্বাধীনতা ছিল। শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উৎকর্ষের অবকাশ ছিল। তখন স্ত্রীলোক পুরুষের ক্রীড়নক বা ভোগের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই বা তাহাদের সামাজিক অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। এ অবস্থায় স্ত্রীলোক সর্ব্ববিষয়েই সমাজের উৎকর্ষ-সাধনের অধিকারে অধিকারিণী ছিলেন। সংসারে কর্তৃত্বের ভার ছিল তাঁহার হাতে। যজ্ঞাদি কর্ম্মে স্ত্রী স্বামীর সাহচর্য্য করিতেন। যজমানপত্নী ভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইত না। স্ত্রীলোকের বৈদিক সংস্কার ও শিক্ষারও অধিকার ছিল।[১] সমাজে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীলোকের অভাব ছিল না। আজিও ঋগ্বেদের মধ্যে ঘোষা, সূর্য্যা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি মন্ত্রদ্রষ্ট্রীদিগের দ্বারা প্রকাশিত বহু সূক্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐগুলির অংশবিশেষ আজিও বিবাহাদি প্রধান সংস্কারের সময় সাদরে উচ্চারিত হইতেছে।

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী যুগেও ঐ ভাব চলিয়াছিল। অবশ্য এ যুগ হইতেই সমাজে বহুবিবাহ, সপত্নীদ্বেষ প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছিল। স্ত্রীলোকের রাষ্ট্রীয় অধিকার ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছিল। স্ত্রীলোকের অবস্থা কিছু হীনও হইয়াছিল, কিন্তু একেবারে অবনত হয় নাই। তখনও দেশে গার্গী, মৈত্রেয়ীর অভাব হয় নাই। বাল্য বিবাহের একেবারে প্রচলন হয় নাই। স্ত্রীলোক জ্ঞান-

১। যম ও হারীত পুরাকল্পে কুমারীদিগের উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন ও অগ্নি সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন।

চর্চায় বঞ্চিত হয় নাই এবং তখনও দেশে নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ "স্ত্রিয়োঽনৃতং—" (মনু, ৯।১৮।) এই কদর্য্য আদর্শের প্রভাব বদ্ধমূল হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের যুগেও এই ভাব চলিতে লাগিল। দেশে ধর্ম্মের আন্দোলন চলিতে লাগিল। সকলেই সংসারের দুঃখবাদে পীড়িত হইল। জগৎ দুঃখের স্থানমাত্র; জীবন ক্ষণিক—সুখদুঃখ-জ্ঞান মোহমাত্র—নির্ব্বাণ বা মুক্তিই মানবের প্রধান উদ্দেশ্য—এই ভাব সকলেরই মনে বদ্ধমূল হইল। ব্রাহ্মণেতর পরিব্রাজকগণ জনসাধারণ সকলকেই (mass) এই মহামন্ত্র শিখাইলেন। এই মন্ত্রের শক্তিতে সকলেই জগৎকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল; সংসারের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেল। অনেকেই গৃহ ছাড়িল। নির্ব্বাণের উদ্দেশ্যে কেহ বনে, কেহ প্রান্তরে, কেহ বা সঙ্ঘে যোগদান করিল।

আন্দোলনে পড়িয়া স্ত্রীলোকেও আত্মহারা হইল। স্বাধীনতার যুগে তাহারাও পুরুষের ন্যায় নির্ব্বাণের পথে—প্রব্রজ্যার দিকে ধাবিত হইল। কতিপয় শিষ্যের, বিশেষতঃ আনন্দের অনুরোধে ভগবান্ বুদ্ধ স্ত্রীলোকের সঙ্ঘাধিকারে অনুমতি দিলেন। মাতা গোতমীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও প্রিয়-শিষ্য আনন্দের অনুরোধে প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি ভিক্ষুণীদিগের সঙ্ঘ গঠনের অধিকার দিলেন। ইহার বিষময় পরিণাম তাঁহার দূরদৃষ্টির অগোচর ছিল না। দলে দলে স্ত্রীলোক ভিক্ষুণীব্রত লইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে লাগিল। কি কুমারী, কি সধবা, কি বিধবা, কি সতী, কি কুলটা—সকলেই স্থান পাইল। থেরীগাথায় মুক্তা, সীহা, সুজাতা, গুপ্তা, অনুপমা, রোহিণী, সুমেধা প্রভৃতি কুমারীর নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক রমণী যৌবনে কুলটাবৃত্তি করিয়া পরে পবিত্র ভিক্ষুণীজীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধকাশী, অভয়মাতা, বিমলা ও অম্বপালীর নাম উল্লেখযোগ্য।

স্ত্রীলোকের সঙ্ঘাধিকারের ফল বিষময় হইল। ইহাদিগের মধ্যে সংসারতাপিত মুমুক্ষুর একেবারে যে অভাব ছিল, তাহা নহে। তবে অনেক স্ত্রীপুরুষই আন্দোলন বা হুজুগে পড়িয়া সংসার ত্যাগ করিতেন। এইরূপ কষ্টবৈরাগ্যে যাঁহারা সাময়িক বিতৃষ্ণার প্রভাবে সংসার ত্যাগ করিতেন, কালে আবার প্রলোভনে তাঁহারা ভোগসুখাদির দিকে আকৃষ্ট হইতেন, ফলে ব্যভিচারও ঘটিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চুল্লবগ্গের দশম অধ্যায়ে (৯—২৭) এইরূপ কতকগুলি ভিক্ষুণীর কলঙ্কের কথাও বিবৃত আছে।

সঙ্ঘের মধ্যেই যে নৈতিক অবনতি ঘটিল, তাহা নহে। সংসারের দুঃখবাদপ্রচারে ও অবাধভাবে সঙ্ঘে যোগ দেওয়াতে এক উপায়ে আবার সমাজে কর্ত্তব্যহীনতা ও ব্যভিচার আসিয়া পড়িল। অনেক পুরুষ নির্ব্বাণলাভের মোহে পড়িয়া যুবতী স্ত্রী, পুত্রকন্যা রাখিয়া সংসার ত্যাগ করিতেন। তাঁহাদের স্ত্রী ও পুত্রাদির ভরণপোষণ করার কথা মনে ভাবিতেন না। সম্বলহীন হইয়া ইহাদিগকে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত এবং ইহার ফলে অনেকেই কুপথে ধাবিত হইত।

এই সকল কারণে সমাজে অনেক দুর্নীতি আসিয়া পড়িয়াছিল। থেরীগাথায় লিখিত ভিক্ষুণীদিগের আত্মজীবনী পাঠ করিলে আমরা এগুলির প্রভাব বুঝিতে পারি। এগুলির অনেক স্থলেই স্ত্রীলোকের সংসারে অনাসক্তি, বিবাহে বিতৃষ্ণা ও গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যে বিদ্বেষ দেখা যায়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে থেরীগাথায় কুমারী থেরীদিগের বিবরণ হইতেও ক্ষেমা, কাশীসুন্দরী ও প্রভবার বৃত্তান্ত হইতে কুমারীদিগের বিবাহে বিতৃষ্ণা প্রতীয়মান হয়। অনেক থেরীর কাহিনীতেই স্ত্রী-জীবনের ক্লেশ, অত্যাচার, সন্তানজননে দুঃখাদির কথা উল্লেখ আছে। কৃশা গোতমীর ন্যায় অনেকেই নারীজীবনের ক্লেশ ভাবিয়া সংসার ছাড়িতেন। থেরীগাথা গ্রন্থ প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম মূল্যবান্ গ্রন্থ। উহা প্রাচীন বৌদ্ধ থেরীদিগের দ্বারা রচিত। বর্ত্তমান গ্রন্থ সম্রাট্ অশোকের সমসাময়িক বা কিছু পূর্ব্বতম।

ধর্ম্মসূত্রের বিবাহবিধি

এই থেরীগাথা গ্রন্থে বহু ভিক্ষুণীর আত্মজীবনী আছে। সেগুলি এমনভাবে লিখিত যে, উহা হইতে তাঁহাদের মনের ভাবের অকপট বর্ণনা আমরা পাইতে পারি। এই সকল কারণেই উহা ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস আলোচনায় আমাদের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, থেরীগাথা-পাঠে আমরা নিম্নলিখিত কয়টি জিনিস জানিতে পারি,—

১। স্ত্রীলোকের বিবাহে বিতৃষ্ণা ও সংসারে অনাসক্তি।

২। স্ত্রীপুরুষের সঙ্ঘে অবাধপ্রবেশের ফলে সামাজিক ব্যভিচার।

প্রথমটির উদাহরণস্বরূপ বহু কুমারী থেরীর কথা বলিয়াছি। কাশীসুন্দরী, ক্ষেমা ও প্রভবার বৃত্তান্তে বিবাহের আপত্তির বিষয় দেখান হইয়াছে, থেরীর কথাও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই বিবাহ করিয়া পাছে সংসারে লিপ্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় কুমারী অবস্থায় সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ব্যভিচারের দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋষিদাসী নাম্নী থেরীর আত্মজীবনী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পিতা তাঁহার তিন তিন বার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিন বারই যথাশক্তি স্বামিসেবা সত্ত্বেও তিনি পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন। দুইটি পতি সংসার ছাড়িয়া সঙ্ঘে যোগ দেন এবং মনের ধিকারে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন।

স্ত্রীলোকের প্রব্রজ্যায় বাধা

ব্যভিচারের আর একটী অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপ্পলবন্নানাম্নী থেরীর আত্মজীবনী হইতে পাওয়া যায়। যৌবনে বিবাহের অব্যবহিত পরেই একটী মাত্র কন্যা সন্তান জন্মিবার পরে স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেন; তিনি কন্যাটী লইয়া গৃহে থাকেন। কন্যাটীও বয়ঃস্থা হইয়া কিশোরী অবস্থায় সঙ্ঘে প্রবেশার্থ গৃহত্যাগ করে। কিছুদিন পরে, সংযম-সাধ মিটিলে, নিজ জন্মদাতা পিতাকে পতিত্বে বরণ করিয়া, উভয়ে পিতা ও কন্যা স্বামি স্ত্রী-রূপে গৃহে ফিরিয়া আসেন। তখন নিজ পতিকে কন্যার স্বামী হইতে দেখিয়া উপ্পলবন্না সংসারের প্রতি ঘৃণায় ও মনের ক্ষোভে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন।

উভো মাতা চ ধীতা চ মযং আসুং সপত্তিযো।
তস্সা মে অহু সংবেগো অব্ভুতো লোমহংসনো॥—থেরীগাথা।১১।৬৪॥

এইরূপ ব্যভিচার যে কত ঘটিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, এই সকল ব্যভিচারের ফলেই সমাজে কঠোর নীতির প্রাচুর্ভাব ঘটে এবং ফলে কন্যার অল্পবয়সে বিবাহ দিবার প্রথা

প্রচলিত হয় এবং পিতার ও কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রধান কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ধর্ম্ম-সূত্রগুলিতেই এইগুলির প্রথম প্রভাব দেখা যায়।

বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলেন,—

পিতুঃ প্রমাদাত্তু যদীহ কন্যা
বয়ঃপ্রমাণং সমতীত্য দীয়তে।
সা হন্তি দাতারমুদীক্ষমানা
কালাতিরিক্তা গুরুদক্ষিণেব॥
প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যাং ঋতুকালভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি॥
যাবন্তঃ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি
তুল্যৈঃ সকামামভিযাচ্যমানাং।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং
মাতাপিতৃভ্যাম্ ইতি ধর্ম্মবাদঃ॥

অর্থশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের স্থান ও অধিকার

এই শ্লোকগুলিতেই সামাজিক মনোভাব কতকটা পরিস্ফুট হইতেছে। তবে তখনও ঘোর কঠোরতা সমাজে প্রবেশ করে নাই—তখনও অষ্টবর্ষবয়স্কা গৌরী-দানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় নাই; বিবাহবিষয়ে কন্যা তখনও ক্রীড়নক হয় নাই। তখনও সমাজ কন্যার সুখকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতে শিখে নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা সকলেই অষ্ট প্রকার বিবাহ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য—এই চারিটীকে আদরের চক্ষে দেখিয়াছেন; পৈশাচ, আসুর, রাক্ষস ও গান্ধর্ব,—এই কয়টীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। তথাপি গান্ধর্ব বিবাহ ধর্ম্মসূত্রকারদিগের চক্ষে বিশেষ অনাদরের ছিল না। কন্যা নিজের মনের মত বর বাছিয়া বিবাহ করিবে, উহাতে তখনও তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি দাঁড়ায় নাই।

বৌধায়ন স্পষ্টই বলেন,—গান্ধর্ব্বমপ্যেকে প্রশংসন্তি সর্ব্বেষাং স্নেহানুগতত্বাৎ। ১।১১।২০ তাঁহার বিবেচনায় পরস্পরের স্নেহসম্বন্ধের নিবন্ধ থাকায় (তত্র স্নেহো মনশ্চক্ষুষো নিবন্ধঃ) গান্ধর্ব বিবাহ প্রশংসার্হ। টীকাকার আপস্তম্ববচন উদ্ধার করিয়া তাঁহারও এ বিষয়ে সহানুভূতি দেখাইতেছেন। যথা,—

"যস্যাং মনশ্চক্ষুষোর্নিবন্ধস্তস্যামৃদ্ধিঃনেতরৎ আদ্রিয়েত।"

বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরও মত এইরূপ; তিনি বলেন,—

কুমার্য্যৃতুমতী ত্রীণি বর্ষাণি উপাসীত।
ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেত্তুল্যম্॥

অর্থশাস্ত্রে কন্যার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। তবে "দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্ত-

ব্যবহার্য্য ভবতি"।—এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসরের সময়েই কন্যাসম্প্রদান ব্যবস্থা ছিল। এই বয়সের মধ্যে বিবাহ না দিলে, পিতার দণ্ডাদির ব্যবস্থা ছিল না। তবে ঋতুমতী হইলে পর কন্যা স্ব-ইচ্ছায় কাহাকেও বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে, ঐ ব্যক্তি কন্যাদূষণের অপরাধে অপরাধী হইতেন না।

কৌটিল্য বলেন,—

সপ্তার্ত্তবপ্রজাতাং পরাণাম্ উর্দ্ধম্ অলভমানাং প্রকৃত্য প্রাকামী স্যাৎ। ন চ পিতুরপহীনং দদ্যাৎ। ঋতুপ্রতিরোধিভিঃ স্বাম্যাদপক্রামন্তি।

ত্রিবর্ষপ্রজাতার্ত্তবায়াস্তুল্যো গন্তমদোষঃ। ততঃ পরমতুল্যোঽপ্যনলঙ্কৃতায়াঃ। ২৩১ পৃ°।

ইহা হইতেই তাৎকালিক সমাজবিধি বোধগম্য হয়। পরবর্ত্তী যুগের মনুও বিবাহের বয়সের দৃষ্টান্তস্বরূপ ত্রিশ বৎসরের পুরুষের সহিত দ্বাদশবর্ষা স্ত্রীর বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ("ত্রিংশবর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্")। পরবর্ত্তী স্মৃতিকারেরা কন্যার বিবাহের বয়স আরও কমাইয়া অষ্টমবর্ষ কালকে মুখ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কন্যার অল্প বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা একদিনে প্রণীত বা উহা সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই।

বিবাহের পর দাম্পত্যজীবনের অনেক কথাই পূর্ব্বে বলিয়াছি। স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্ত্তৃত্ব বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে উহাতে বুঝা যায় যে, মৌর্য্য ও তৎপূর্ব্ব যুগে স্ত্রী একেবারে স্বামীর দাসীরূপে পরিণত হন নাই। তাঁহার স্ত্রীধন তাঁহার নিজের সম্পত্তিই ছিল। তাহাতে স্বামীর হস্তক্ষেপ করিবার (অবশ্য সাংসারিক বিপদ্ বা অভাব ব্যতীত) কোন অধিকারই ছিল না। অর্থশাস্ত্রের যুগের বিধিগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, স্বামীর কর্ত্তৃত্ব অন্যান্য বিষয়ে ক্রমে দৃঢ় হইতেছিল। অপরাধে স্বামী কায়িক দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিতেন। তবে অতিরিক্ত প্রয়োগে দণ্ডার্হ হইতেন। স্বামী ইচ্ছামত পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে কারণ দর্শাইতে হইত এবং স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করিতে ও উহাঁকে অর্থ দিয়া তুষ্ট করিতে হইত।

স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্যজীবন কলহের বা কষ্টের কারণ হইলে উহারও প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল। অর্থশাস্ত্রে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা (separation বা divorce) দেখা যায়। অর্থশাস্ত্রকারের মতে চারিটী ধর্ম্ম্য বিবাহের (অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য) বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা ছিল না। (অমোক্ষো ধর্ম্মবিবাহানাম্)। অন্য বিবাহস্থলে যেগুলি প্রধানতঃ বৈশ্য ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলিতে উভয়ে উভয়ের বিদ্বেষী হইলে বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইত—অমোক্ষ্যা ভর্ত্তুরকামস্য দ্বিষতী ভার্য্যা—ভার্য্যায়াশ্চ ভর্ত্তা, পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ।

এইরূপ মোক্ষের স্থলে যদি স্বামিপক্ষ উদ্যোগী হইয়া বিচ্ছেদের চেষ্টা করিতেন, তিনি গৃহীতশুল্ক প্রত্যাখ্যান করিতেন। স্ত্রী মোক্ষের প্রার্থী হইলে শুল্ক ফিরিয়া পাইতেন না।

"পুরুষবিপ্রকারাদ্বা স্ত্রী চেৎ মোক্ষমিচ্ছেৎ নাস্মৈ যথাগৃহীতং দদ্যাৎ॥"—কৌ° ১৫৫ পৃ°।

থেরীগাথায় ঈষীদাসীর জীবনীতেও স্বামীর প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য উহাঁর দুইবার বিবাহের কথা

পাওয়া যায়। পুনর্ব্বিবাহিতার শুল্কসম্বন্ধীয় ব্যবস্থারও কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইতিহাসে আর অধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর।

পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহের কথার উল্লেখ আছে। তবে বিবাহবিচ্ছেদাদির কথা নাই। মনুস্মৃতিতে বা বশিষ্ঠ স্মৃতিতে বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহের কথা আছে। যথা,—

বশিষ্ঠ বলেন,—

পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ ১৭। ৭৪।

মনুও ঐরূপ বালবিধবার পুনঃসংস্কারের কথা বলিয়াছেন; পরাশরাদি অন্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্র-কারেরও ঐরূপ মত,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

এইরূপ পুনঃসংস্কারের নিষেধবিধি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। তবে পরবর্ত্তী যুগের পুরাণাদির মধ্যে নিষেধবিধি পাওয়া যায়। সমাজেও উক্ত মত গৃহীত হয়। বর্ত্তমানে সামাজিক আচার স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহের বিরোধী। স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহাদির ফলে সমাজে ব্যভিচারাদি ঘটিবার ভয়েই সমাজে ঐরূপ মত একরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত রাজবিধিতেও উহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই।[১]

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

——০——

১। স্ত্রীলোককে জবরদস্তি লইয়া ও স্ত্রীর ভরণপোষণের অপ্রতিবিধান না করিয়া সংসার ত্যাগ—এই উভয়ের সম্বন্ধে রাজকীয় নিষেধের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বাঙ্গলা ভাষায় কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া*

[১] বাঙ্গলা ভাষায় প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্য।

§ ১। ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি আর্য্যভাষায় খুব সম্ভব কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু-ইরানীয় যুগে, অর্থাৎ বৈদিক যুগের পূর্ব্ব অবস্থায়, ক্রিয়ার আত্মনেপদ-রূপ হইতে কর্ম্ম-বাচ্যের উৎপত্তি হয়। এই কর্ম্ম-বাচ্যের বিশিষ্ট রূপ বৈদিকে (বর্ত্তমানকালে) লট্, লোট্, লঙ্, লিঙ্, ও লেট্-এ, ও সংস্কৃতে কেবলমাত্র 'লট্'-এ, এবং 'লুঙ্' প্রথম পুরুষ এক বচনে ও '-মান'-প্রত্যয়-সিদ্ধ অসমাপিকা নাম-ক্রিয়ায় মিলে। বৈদিকে ও সংস্কৃতে অন্য সমস্ত তিঙন্ত-রূপে আত্মনে-পদ-দ্বারাই কর্ম্ম-বাচ্যের কাজ চলিত। কর্ম্ম-বাচ্যের বিশেষ চিহ্ন হইতেছে '-য-' প্রত্যয়। এই '-য-' প্রত্যয় উদাত্ত উচ্চারিত হইত; ধাতুতে এই প্রত্যয় জুড়িয়া, তৎপরে ইহাতে পুরুষ- ও বচনদ্যোতক প্রত্যয় সংযোজিত করা হইত। যেমন—

√ 'কৃ' পরস্মৈপদী লট্—'করোতি, করোষি, করোমি'।

আত্মনেপদী—'কুরুতে, কুরুষে, কুর্ব্বে'।

{ কর্ম্ম-বাচ্য লট্—'ক্রিয়তে, ক্রিয়সে, ক্রিয়ে'।
কর্ম্ম-বাচ্য লুঙ্ প্রথম পুরুষ এক-বচনে—'অকারি'।
নাম-ক্রিয়া বা বিশেষণ-ক্রিয়া (কৃদন্ত)—'ক্রিয়মাণ'।

[এতদ্ভিন্ন বৈদিক রূপ—লেট্—'ক্রিয়ৈ' (উত্তম পুরুষ), 'ক্রিয়াতে, ক্রিয়াতৈ' (প্রথম পুরুষ)।
লিঙ্—'ক্রিয়েয়, ক্রিয়েথ, ক্রিয়েতাম্'।
লঙ্—'অক্রিয়ে' ইত্যাদি।
লোট্—'ক্রিয়স্ব' ইত্যাদি।]

§ ২। ভারতে আর্য্যভাষার ইতিহাসের প্রথম যুগে, অর্থাৎ বৈদিক বা সংস্কৃত যুগে, উপর্য্যুক্ত কর্ম্ম-বাচ্যীয় প্রত্যয়-সিদ্ধ ক্রিয়া-পদের ব্যবহার সাধারণ ছিল। দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ প্রাকৃত-যুগে, লুঙের লোপ-সাধন হয়; লট্-এর প্রয়োগ অব্যাহত থাকে, এবং কর্ম্ম-বাচ্যে লট্, ও বিশেষণ-ক্রিয়া, এই দুই প্রকারের ক্রিয়া-পদে প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্য নিজ স্থান অটুট রাখিতে সক্ষম হয়। প্রাকৃত-যুগে আত্মনেপদী রূপের (তিঙ্-এর) লোপ ঘটে। সংস্কৃতের 'ক্রিয়তে' পদ, প্রাকৃতে 'করিয়তি, করীয়তি করিয়্যতি; করিয়দি, করীয়দি, করিজ্জদি; করীঅই, করিঅই, করিজ্জই'—এই প্রকার রূপ ধারণ করে; এই রূপগুলির মধ্যে '-তি'-প্রত্যয়ান্ত রূপগুলি প্রাচীন প্রাকৃতের (অশোক অনুশাসনের ও পালির যুগের প্রাকৃতের), '-দি-' ও '-ই-' প্রত্যয়ান্ত পদগুলি মধ্য ও অন্ত্য যুগের প্রাকৃতের (সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃতের, ও অপভ্রংশের)। সংস্কৃতের কর্ম্ম-বাচ্যের বিশিষ্ট প্রত্যয় '-য-', প্রাকৃতে '-ইঅ-' বা '-ঈঅ-' অথবা '-ইজ্জ-' রূপ প্রাপ্ত হয়, দেখা যাইতেছে। তদ্ভিন্ন, সংস্কৃতে যেখানে '-য-' পূর্ব্ব-গামী ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, প্রাকৃতে সেখানে সংস্কৃতের বিকৃত রূপই

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ (নৈহাটী) অধিবেশনে পঠিত।

দৃষ্ট হয়; যেমন 'দৃশ্-য়-তে, দৃশ্যতে'=প্রাকৃতে 'দিশ্শতি, দিস্সতি; দিশ্শদি, দিস্সদি; দিস্সই, দিশ্শই'। সংস্কৃতের অনুসরণে, প্রাকৃতে আবার অকর্ম্মক-ধাতুতে কর্ম্ম-বাচ্যের প্রসার ঘটে; যেমন 'ভবীঅতি, হুবীঅদি'='*ভব্যতে', সংস্কৃত 'ভূয়তে'।

§ ৩। ভারতে আর্য্যভাষার প্রগতির তৃতীয় স্তর হইতেছে হিন্দী আওধী বাঙ্গলা মারহাট্টী সিন্ধী রাজস্থানী পাঞ্জাবী প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলি। এই-সকল আধুনিক ভাষাতে কর্ম্ম বাচ্য কি উপায়ে দ্যোতিত হইয়া থাকে? এ ক্ষেত্রে দুই প্রকার পদ্ধতির প্রয়োগ পাওয়া যায়।

এক প্রকার পদ্ধতি হইতেছে বাক্য-বিন্যাসাত্মক; ইহাতে অন্য কোনও ধাতুর সাহায্য লইয়া, বাক্যটীকে ফেনাইয়া, কর্ম্ম-বাচ্যের দ্যোতনা হয়; যেমন, সংস্কৃতের প্রত্যয়-সিদ্ধ এক-পদাত্মক কর্ম্ম-বাচ্যীয় রূপ 'ক্রিয়তে'-র স্থলে, বাঙ্গলার বা হিন্দীর বহু-পদ-সিদ্ধ বাক্য-বিন্যাস-ময় কর্ম্ম-বাচ্যীয় বাক্য, 'ইহা করা যায়, ইহা করা হয়', বা 'য়হ্ কিয়া জায়্, য়হ কিয়া জাতা হৈ'। এই বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে (§ ১৮ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে আর্য্যভাষার প্রাচীন পদ্ধতি—প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বৈদিক বা সংস্কৃতের যুগের কথিত ভাষা হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ, প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ্ধতি। প্রাকৃতের '-ইঅ-, -ঈঅ-' বা '-ইজ্জ-, -ঈজ-', আধুনিক যুগের আর্য্যভাষা-গুলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সকল আর্য্যভাষায় ইহা রক্ষিত হইতে পারে নাই। বাক্য-বিন্যাসাত্মক পদ্ধতির উদ্ভব হওয়ায়, কতকগুলি আর্য্যভাষায় ইহাদের প্রয়োগ দ্রুত সংকুচিত হইয়া পড়ে।

ভৌগোলিক সংস্থান হিসাবে আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিকে পাঁচটী ভাগে ফেলা যাইতে পারে; পশ্চিমা ভাষা—পূর্ব্বী- ও পশ্চিমা-পাঞ্জাবী, সিন্ধী, রাজস্থানী-গুজরাটী; দখিনা—মারহাট্টা; মধ্য-দেশীয়—পশ্চিমা-হিন্দী (হিন্দী, উর্দু বা হিন্দুস্থানী; ব্রজভাখা, প্রভৃতি); পূর্ব্বী—পূর্ব্বী-হিন্দী (আওধী, বাঘেলী, ছত্রিশ-গড়ী), তথা ভোজপুরিয়া, মৈথিলী, মগহী, ও বাঙ্গলা-আসামী এবং উড়িয়া; এবং উত্তরিয়া বা পাহাড়ী ভাষা—পাঞ্জাবের পাহাড়ী অঞ্চলের ভাষা-সমূহ, কুমায়ুনী ও গাড়োয়ালী (গঢ়ৱালী), এবং নেপালী বা খস্কুরা। এই-সকল আধুনিক আর্য্যভাষার মধ্যে, পশ্চিমা ও উত্তরিয়া ভাষাগুলিতে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য এখনও পুরা জোরে বর্ত্তমান; কিন্তু মধ্য-দেশীয়, পূর্ব্বী, ও দখিনা ভাষাগুলিতে, হয় ইহার একেবারে লোপ ঘটিয়াছে, নয় ইহা লোপোন্মুখ হইয়া, অপ্রচলিত ও সাধারণের অজ্ঞাত-প্রকৃতিক হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, পশ্চিমী-পাঞ্জাবী, সিন্ধী ও রাজস্থানীতে, '-ই-, -ঈ-' বা '-ইজ-, -ঈজ-' প্রত্যয়ের যোগে কর্ম্ম-বাচ্য সংগঠিত হয়; যথা: পাঞ্জাবী 'মারদা'=মারন্ত, মারয়ন্, প্রহার-করিতে করিতে'। 'মারিন্দা'=ম্রিয়মাণ, প্রহৃত হইতে হইতে; 'চাহ্দা'=চাহন্ত, প্রার্থয়ন্: 'চাহিদা'=প্রার্থ্যমান (বাঙ্গলায় এই পাঞ্জাবী শব্দ, ইংরেজী demand অর্থে বহুশঃ প্রযুক্ত হয়); 'পঢ়ে'=পঠতি, পড়ে: 'পঢ়ীএ'=পঠ্যতে, পঠিত হয়; সিন্ধী 'করীজে, পঢ়ীজে'=কৃত হয়, পঠিত হয়; মাড়োয়ারী (মারবাড়ী) 'করণো'=করণ, 'করীজণো'=কৃত হওন; নেপালী 'গর্ঁ-লা (গর্-উঁ-লা)'=আমি করিব, 'গরীউঁ-লা (গর্-ঈ-উঁ-লা)'=আমাকে করা হইবে। পশ্চিমা ভাষাগুলির মধ্যে, এক-মাত্র আধুনিক গুজরাটীতে যা এই প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের

প্রয়োগ সংকুচিত হইয়াছে ; কেবল উত্তম পুরুষে বর্ত্তমানের বহু-বচনে এই ভাষায় '-ঈ'-প্রত্যয়-যুক্ত ক্রিয়া দৃষ্ট হয় ; যেমন—'হুঁ করুঁ'=অহং করোমি, আমি করি : 'অমে করীএ'=আমরা করি,—এখানে 'বয়ং কুর্ম্মঃ' ইহার বিকার না হইয়া, হইয়াছে, 'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে'-বাক্যের, 'ক্রিয়তে=করিঅই=করীএ'[১] ; আধুনিক গুজরাটীতে অন্যত্র অ-কারান্ত ণিজন্ত ক্রিয়াকেই কর্ম্ম-বাচ্যে ব্যবহার করা হয় (§ ২৯ দ্রষ্টব্য)।

§ ৪। দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমা ভাষাগুলি প্রাচীন ভারতীয় মূল আর্য্য-ভাষা হইতে লব্ধ প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের সংরক্ষণ বিষয়ে রক্ষণ-শীল। মধ্য-দেশীয় ভাষায় (হিন্দীতে) সাধারণতঃ প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যীয় পদের আর বহুল প্রয়োগ নাই ; কিন্তু ইহার পুরা লোপ এখনও ঘটে নাই, ইহা কচিৎ দৃষ্টও হয়। যেমন, ব্রজভাখা 'মারৈ'=মারে, মারয়তি, 'মারিয়ৈ'=মৃত বা প্রহৃত হয়, ম্রিয়তে। পূর্ব্বী ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম আওধীতেও কচিৎ এই কর্ম্ম-বাচ্য মিলে ; কিন্তু আজকালকার ভাষায় নয়, তুলসীদাসের প্রাচীন ভাষায় ; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ও তেস্‌সিতোরি মহাশয়-দ্বয় এইরূপ প্রয়োগ দেখাইয়াছেন[২]।

আধুনিক হিন্দী বা হিন্দুস্থানীতে যে সম্ভ্রমে অনুজ্ঞার প্রয়োগ আছে—যেমন 'কীজিএ' বা 'করিয়ে', তাহা, খুব সম্ভব, প্রাচীন প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া হইতে জাত ; অন্ততঃ পক্ষে, ইহা প্রাচীন বিধিলিঙের উপর কর্ম্ম-বাচ্যের প্রভাবের ফলে সৃষ্ট পদ[৩]।

হিন্দীর 'কপড়া চাহিয়ে'=বাঙ্গলা 'কাপড় চাই,' এই বাক্য-দ্বয়ে 'চাহিয়ে' বা 'চাই' শব্দ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া ; 'চাই'='চাহিয়ে'=প্রাকৃতে '* চাহিঅই, চাহিয়দি' ; 'চাহ্' ধাতুর সংস্কৃত রূপ মিলে না ; মিলিলে, সংস্কৃত-রূপ '* চহ্যতে' বা '* চষ্যতে' এই প্রকার হইত। বাঙ্গলায় 'কি চাই'-এর সঙ্গে, 'কি চাও' এই বাক্যের তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, 'কি চাই' =কিং প্রার্থ্যতে, ও 'কি চাও'=কিং প্রার্থয়ধ্বে ; 'তোমার আসা চাই'=তব আগমনং প্রার্থ্যতে। আধুনিক হিন্দীতে '-ই-, -ঈ-, -ইজ-, -ঈজ-' যুক্ত কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া লুপ্ত-প্রায় হইলেও, প্রাচীন হিন্দীতে ইহার প্রয়োগ বিশেষ প্রবল ছিল। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' পুস্তকে যে-সকল কবিতার সংগ্রহ আছে, সেগুলির অধিকাংশের ভাষাকে এক রকম প্রাচীনতম যুগের হিন্দী (পশ্চিমা হিন্দী) বলা যাইতে পারে ; এই ভাষায় প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য বিশেষ-ভাবে বর্ত্তমান। রাজস্থানীর সঙ্গে তুলনা করিলে, আধুনিক হিন্দীতে এই কর্ম্ম-বাচ্যের লোপ একটু

১। L. P. Tessitori- Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, §136, (Indian Antiquary, 1915) দ্রষ্টব্য। R. L. Turner কিন্তু Journal of the Royal Asiatic Society, 1916, p. 227তে গুজরাটীর 'করীএ' প্রভৃতি বহু-বচন ক্রিয়া-পদের অন্ত-রূপ ব্যাখ্যার প্রয়াসী হইয়াছেন : কুর্ম্মঃ=করিমো=করিমু=করীঁ=করী + প্রথম পুরুষ বহু-বচনের 'এ'-প্রত্যয়=করীএ।

২। Wilson Philological Lectures (1877), Bombay, 1914, p. 227 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1914, p. 901 ff.

৩। এ-সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—A.R. Hoernle—Comparative Grammar of the Gaudian Languages, §§ 480, 481, 499.

বিশেষ করিয়াই দৃষ্টিতে লাগে। পুরাতন মারহাট্টীতে '-ইজ-' কর্ম্ম-বাচ্য প্রচলিত ছিল[1]। আধুনিক মারহাট্টীতে ইহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

§ ৫। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের[2] বাঙ্গলায়, ও মাগধী-প্রাকৃত-সম্ভূত, বাঙ্গলার ভগিনী-স্থানীয় অন্যান্য আর্য্য ভাষায়, প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্য কত-দূর রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। বাঙ্গলা ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্ব্বেকার যুগের বাঙ্গলা ভাষা বা সাহিত্য আলোচনা করিবার কোন উপকরণই আমাদের হাতে ছিল না। কিন্তু ঐ সালে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক দুই-খানি বই প্রকাশিত হয়; ঐ দুই বইয়ে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্গলার আলোচনার জন্য কতকগুলি অতি মূল্যবান্ বস্তু বা উপকরণ বাঙ্গলা ভাষানুশীলন-কারীর সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বই দুইখানি হইতেছে, [১] মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'; এবং [২] শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্য।

§ ৬। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'তে নেপাল হইতে প্রাপ্ত এই কয়-খানি প্রাচীন পুথী প্রকাশিত হইয়াছে: [ক] 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়'; বৌদ্ধ সহজিয়া মতের কতকগুলি 'চর্য্যাপদ' বা গান; পুথীতে ৫০টী গান ছিল, কিন্তু কতকগুলি পাতা খণ্ডিত বলিয়া আমরা ৪৭টি মাত্র গান পাইয়াছি। এই গানগুলি প্রাকৃত-জ ভাষায় লিখিত; এবং এই ভাষাই হইতেছে প্রাচীনতম যুগের বাঙ্গলা, বা বাঙ্গলার প্রাচীনতম নিদর্শন। গানগুলির উপর একটী সংস্কৃত টীকা আছে। [খ] ও [গ] সরহ বা সরোজ-বজ্রের এবং কাহ্নু বা কৃষ্ণ-পাদের 'দোহাকোষ'; এই দুইখানি দোহা-কোষে কোনও প্রাকৃত-জ ভাষায় কতকগুলি গান ও দোহা আছে; ইহাদের সংস্কৃত টীকাও আছে। গান ও দোহাগুলির বিষয়, চর্য্যাপদগুলিরই মত, সহজিয়া বৌদ্ধ মতের সাধনার বিষয়। এই দুই দোহা-কোষের ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রকার পশ্চিমা অপভ্রংশ; এবং এই ভাষা বাঙ্গলা নহে। [ঘ] 'ডাকার্ণব' বা 'মহাযোগিনী-তন্ত্ররাজ'; এই বইখানি খণ্ডিত, ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক ও একটী প্রাকৃত-জ ভাষায় লিখিত বহু বাক্য আছে; সংস্কৃত ছায়া বা টীকা না থাকায়, এই প্রাকৃত-জ ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইয়া আছে; ইহাও মূলে কোনও পশ্চিমা অপভ্রংশ, বাঙ্গলা নহে।

১। ভাণ্ডারকর-কৃত Wilson Philological Lectures, pp. 226-227.

২। আলোচনার সুবিধার জন্য বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাসকে তিন যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: [১] প্রাচীন যুগ: বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি (অর্থাৎ বাঙ্গলার বিশেষ রূপের বিকাশ ও ইহার স্বস্থানীয় অন্য ভাষা হইতে পার্থক্য-ভাব) হইতে তাহার সাধারণ-রূপ-ধারণ পর্য্যন্ত; মোটামুটি ৯০০ বা ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; [২] মধ্য যুগ: যে যুগে বাঙ্গলা ভাষা দাঁড়াইয়া যায়, ও উচ্চারণ- ও ব্যাকরণ-গত কতকগুলি নূতন রীতি ইহাতে আসিয়া পড়ে: মোটামুটী ১২০০ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত; এই ৬ শত বৎসরকে আবার সন্ধি-ক্ষণীয় (Transitional), আদিম, মধ্যম ও অন্ত্য, এই চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১২০০-১৩০০; ১৩০০-১৫০০; ১৫০০-১৭০০; ১৭০০-১৮০০) [৩] আধুনিক যুগ—১৮০০র পরে। (এই যুগ-বিভাগ কিঞ্চিৎ আলোচনা- ও বিচার-সাপেক্ষ; একণে তাহার অবতারণা সম্ভবপর নহে।)

চর্য্যাগুলির ভাষাই প্রাচীন বাঙ্গলা; শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহা ১০ম-১১শ শতকের ভাষা; আমার ধারণা, ইহাকে ১০ম হইতে ১৩শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত সময়ের প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষার নমুনা হিসাবে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা যাইতে পারে[১]। দোহাকোষ-দ্বয়ের ভাষা পশ্চিমা অপভ্রংশ, চর্য্যাপদের ভাষা হইতে কিছু প্রাচীন; খ্রীষ্টীয় ৯-১০ শতকের যুগে এই প্রকারের ভাষা মধ্য-দেশে ও রাজস্থান এবং গুজরাট অঞ্চলে সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। আধুনিক পশ্চিমা-হিন্দী, রাজস্থানী ও গুজরাটী, এই শৌরসেনী অপভ্রংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত, এবং পশ্চিমা-হিন্দী (হিন্দুস্থানী, ব্রজভাখা প্রভৃতি) এই শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত। এই পশ্চিমা অপভ্রংশ সেই যুগের হিন্দীর মত ছিল। পূর্ব্ব-ভারতে কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত না হইলেও, সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মত ইহা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত।

১। চর্য্যাপদের ভাষা বাঙ্গলা কি না, এ-সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম আলোচনা-কারীদের মধ্যে এক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র চারিখানি বইয়ে যে একাধিক ভাষা বিদ্যমান আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। চর্য্যাপদের ৪৭টী গান আমরা পুথীতে যে আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে মূলের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হইয়াছে; পুথী লেখা হইয়াছিল নেপালে; নকলকার যে বাঙ্গলা বা গানের ভাষা জানিতেন না, তাহা বেশ বুঝা যায়; মূলের পাঠ যে বহু-স্থলে লিপিকর-প্রমাদ-প্রসূত, তাহা টীকায় প্রদত্ত পাঠ দেখিলেই ধরা যায়। কিন্তু গানগুলির ভাষাতে যে বিশিষ্টরূপে বাঙ্গলার ছাঁচ বিদ্যমান, তাহা দেখিতে বিলম্ব হয় না। গানের ভাষার ব্যাকরণে এই কয়টী প্রধান বাঙ্গলা ভাব: কর্তৃকারকে ও করণে 'এ, এঁ' প্রত্যয়; সম্প্রদানে 'রে'; অধিকরণে—'এ, ত, তে, তেঁ'; সম্বন্ধ-কারকে 'র, এর'; ক্রিয়াপদে অতীতে 'ইল', ভবিষ্যতে 'ইব' (বিহারীর মত 'অল'-'অব' নয়—তবে 'অব' দুই এক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে); অসমাপিকা ক্রিয়া—'ইআ' 'ই'; কার্য্যান্তর-সাপেক্ষ অসমাপিকা ক্রিয়ায়—'ইতে'; এবং '-অন'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-নামের বাহুল্য লক্ষণীয়। এইগুলি হইতেছে বাঙ্গলার বিশেষ রূপ। এতদ্ভিন্ন এই ভাষায় ব্যাকরণ-ঘটিত এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা সহজেই মধ্য যুগের বাঙ্গলার ও আধুনিক প্রাদেশিক বাঙ্গলার সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় গানগুলিতে ব্যবহৃত শব্দ-সমষ্টির বাঙ্গলা প্রকৃতি দেখাইয়াছেন। ইহার কতকগুলি বাক্য-রীতি বিশেষ-ভাবে বাঙ্গলা; এবং গানের অনেক পদের বা কলির ছায়া মধ্য যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে বিদ্যমান; একটী দৃষ্টান্ত: ৬ সংখ্যক চর্য্যাপদে:— 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী': শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে, ৭৮ পৃষ্ঠায়, 'চারি পাশ চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল নিজ মাঁসে জগতের বৈরী'; ৮৮ পৃষ্ঠায় 'আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী।' কবিকঙ্কণে, 'হরিণ জগত-বৈরী আপনার মাংসে' (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৫৪)।

চর্য্যার গানে যে সকল ছবি আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করে, সেগুলি বাঙ্গলা-দেশের; নৌকা, গুণ-টানা, নদী লইয়া এত উপমা তো বাঙ্গলা-দেশের বাহিরে পাওয়া যায় না। ইহাতে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্ব-বাঙ্গলার কথা আছে। সহজিয়া ধর্ম্ম, ও সহজিয়া ঢঙের গান রচনা করা ধারাবাহিক-রূপে বাঙ্গলা-দেশেই প্রচলিত; বৈষ্ণব-পদাবলী, দেহ-তত্ত্বের গান, বাউলের গান, শ্যামা-সঙ্গীত, এ-সবের আদিতে এই চর্য্যাপদ ও তজ্জাতীয় গান। বাঙ্গলা-ভাষী জাতির জাতীয়তার উন্মেষ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে; তাহার আগে বাঙ্গলা-ভাষা গড়িয়া উঠে নাই; তাই বাঙ্গলা-দেশের লোকে তখনকার যুগের একটা বড় সাহিত্যের ভাষা, পশ্চিমা অপভ্রংশ, ব্যবহার করিত; এবং লুই, কাহ্ণ, ভুসুকু প্রভৃতি বাঙ্গলায় লিখিতে আরম্ভ করিলেও এই পশ্চিমা অপভ্রংশের রেওয়াজ অন্তর্হিত হয় নাই। কাহ্ণ, সরহ প্রভৃতি ইঁহারা নিজ মাতৃ-ভাষা বাঙ্গলায় এবং পশ্চিমা অপভ্রংশে, এই দুইয়ে গান ও

§ ৭। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', বাঙ্গলা ভাষার মধ্য যুগের প্রাচীনতম পুস্তক। চর্য্যাপদে বাঙ্গলা ভাষা তখনও তরল অবস্থায়, কিন্তু বাঙ্গালা মূর্ত্তি ধরিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা একেবারে বিশিষ্ট, সুপরিজ্ঞাত বাঙ্গলা ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছে। যে পুথীতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় প্রাচীন-লিপিবিৎ পণ্ডিতের অভিমত অনুসারে, খ্রীষ্টীয় ১৩৫০-১৪০০র মধ্যে লিখিত; পুথীখানি গ্রন্থকারের সমসাময়িক। সৌভাগ্য-ক্রমে, পুথীখানি প্রাচীন বলিয়াই আমরা ১৪শ শতকের বাঙ্গলার বিশুদ্ধ নিদর্শন পাইতে পারিয়াছি। অন্যথা, বাঙ্গলার অন্যান্য প্রাচীন কবির ভাষার মত, পরবর্ত্তী পুথী-পরম্পরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতে আসিতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন ভাষা আধুনিক বাঙ্গলার রূপ ধরিয়া বসিত।

চর্য্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা—ইহাদের ছন্দঃ, বর্ণ-বিন্যাস ও পদ-সাধন, সমস্তই ইহাদের প্রাচীনত্বের পরিপোষক[১]। ইংরেজী ভাষার ইতিহাস আলোচনায়, লায়ামন, ওর্‌ম্ ও চসারের ভাষার তথা আংগ্লো-সাক্‌সনের যে স্থান, বাঙ্গলা-ভাষানুশীলনে যথা-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ও চর্য্যাপদের ভাষারও ঠিক সেই স্থান।

কবিতা রচিয়া গিয়াছেন; যেমন পরবর্ত্তি-যুগে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি, নিজ মাতৃ-ভাষা মৈথিলে, ও পশ্চিমা অবহট্‌ঠ বা অপভ্রষ্ট ভাষায়ও লিখিয়াছেন। পশ্চিম ভাষার বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বাঙ্গলা-দেশে থাকার দরুন, চর্য্যাপদের বাঙ্গলায় কতকগুলি পশ্চিম ক্রিয়া ও সর্ব্বনামের রূপ আসিয়া গিয়াছে; যেমন—'কিউ'=কৃত, করিল, প্রাচীন বাঙ্গলা রূপ হইবে 'কৈল'; 'চলিউ'=বাঙ্গলা 'চলিল'; 'জো সো'=বাঙ্গলা 'জে সে'; 'তসু'=তস্য,=বাঙ্গলা 'তা', বা 'তাহ-র' ইত্যাদি; ইহা খুবই সম্ভব যে, নেপালে বাঙ্গলা-ভাষায় অনভিজ্ঞ নকল-নবীশের হাতে পড়িয়া গানগুলিতে বাঙ্গলা রূপের পরিবর্ত্তে পশ্চিমা অপভ্রংশের রূপ আসিয়া গিয়াছে। চর্য্যাপদের ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, ইহা প্রাচীন বাঙ্গলা; চর্য্যার ভাষা 'প্রাকৃত' বা 'অপভ্রংশ' নহে, কারণ ইহাতে প্রাকৃতের দুই ব্যঞ্জনকে সংক্ষেপ করা হইয়াছে: যেমন—বর্ত্ম > বট্ট > বাট; ধর্ম্ম > ধম্ম > ধাম; আয়াত+ইল+ক > আয়িল > আয়িল, আইল; শয্যিকা > সেজ্জিঅ > সেজি; ইত্যাদি। এই লক্ষণ আধুনিক আর্য্য-ভাষার লক্ষণ। ইহা একটি মিশ্র বা 'খিচুড়ী' ভাষা নহে, কারণ (অপভ্রংশ-প্রভাবের ফলে আগত রূপগুলি ভিন্ন) ইহার সমস্ত রূপ বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস ধরিয়া দেখিলে সহজেই ব্যাখ্যাত হয়।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় কেবল চর্য্যাপদের ভাষাকেই বাঙ্গলা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২৫, পৃষ্ঠা ২১)। জারমানির বোন্‌-বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারমান য়াকোবি মহাশয় তৎ-সম্পাদিত 'সনৎকুমার-চরিত' নামক পশ্চিমা অপভ্রংশ কাব্যের ভূমিকায় চর্য্যাপদের ভাষা যে 'নিঃসন্দেহ-রূপে' বাঙ্গলা, এ-বিষয়ে আমার সহিত এক-মত হইয়াছেন।

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে 'সংশয়-প্রকাশ' করিয়া রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।) কিন্তু বঙ্গ-ভাষানুশীলন-কারীদের অগ্রণী, বহুশাস্ত্র-বিৎ শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমরা এক-মত হইতে পারি না; নিরপেক্ষ বিচার করিলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রামাণিকত্ব-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। ২৬ বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের ন্যায় প্রাচীন-সাহিত্যানুশীলক ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে প্রামাণিক গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে যুক্তি-প্রদর্শন করিয়া অনুকূল রায় দিয়াছেন।

§ ৮। সরহ ও কাহ্নের দোহাকোষের পশ্চিমা অপভ্রংশ ভাষায়, '-ই-, -ইজ্জ-, -ঈঅ-' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার কতকগুলি উদাহরণ মিলে ; যেমন—'পুরাণেঁ বক্‌খানিজ্জই' ('বৌদ্ধগান ও দোহা,' পৃঃ ৮৯)=পুরাণে ব্যাখ্যাত হয় ; 'সো মাই কহিজ্জে' (পৃঃ ১০৩ ; ='সো মইঁ কহিজ্জই')=তাহা মৎ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হয় ; 'সো পরমেসুরু কাসু কহিজ্জই' (পৃঃ ১০৩)=সে পরমেশ্বর [এর বিষয়] কাহাকে কহা যায় ; 'বিসয় রমন্ত ণ বিসঅ বিলিপ্যই (=বিলিপ্পই)' (পৃঃ ১০৫)=বিষয় ভোগ করিতে করিতে বিষয়ে লিপ্ত হয় না (বিলিপ্যতে) ; 'দেব পি (=বি) জই (=জই) লক্ক (=লক্‌খ) বি দীসই, অপ্যণু (=অপ্পণু) মারীঈ, স [কি]' করিঅই' (পৃঃ ১০৬) =যদি (জই) দেবতাও সাক্ষাৎ (লক্ক) দৃষ্ট হন (দীসই=দিস্‌সই=দিস্‌সদি=দৃশ্যতে), নিজে (অপ্পণু) সে মরে (মারীঈ=মারীঅদি=ম্রিয়তে), কিই ব করা হয় (করিঅই=ক্রিয়তে) ; 'কাসু কহিজ্জই' (পৃঃ ১০৯)=কাহাকে কহা হয় ; 'অইসো সো নিব্বাণ ভণিজ্জই জহি মন মানস কিং পি ন কিজ্জই' (পৃঃ ১৩৯)=সেই নির্ব্বাণকে এহেন বলা হয়, যেখানে মন কিংবা মন-জাত কিছুই করা হয় না ; 'জই পবন-গমন-দুআরে দিত তালা বি ভিজ্জই, জই তসু ঘোরান্ধারে মন দিব হো কিজ্জই' (পৃঃ ১৩০)—যদি পবন-গমন-দুয়ারে দেওয়া তালাকে ভেদ করা হয় (ভিদ্যতে), যদি তার (সেই) ঘোর আঁধারে মনকে প্রদীপও করা হয় ; ইত্যাদি।

§ ৯। দোহাকোষের পশ্চিমা অপভ্রংশে '-ই-' প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা গেলেও, '-ইজ্জ-' প্রত্যয়েরই প্রয়োগ বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান। চর্য্যাপদের প্রা-বাং তে প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার উদাহরণ আছে ; এখানে কিন্তু '-ই-'র ব্যবহার মিলে, '-ইজ্জ-'র নহে ; '-ই-' ভিন্ন, পূর্ব্ব-ব্যঞ্জনের সহিত মিলিত '-য়'-কারের দুইটী নিদর্শন আছে। যেমন—'সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই' (চর্য্যা ১)=সকল-সমাধ্যা কিং ক্রিয়তে ; 'হরিণা হরিণির নিলয় না জানী' (চর্য্যা ৬)=হরিণস্য হরিণীকরঃ (=হরিণ্যাশ্চ) নিলয়ঃ ন জ্ঞায়তে ; 'হরিণার খুর ন দীসঅ (দীসই)' (চর্য্যা ৬)=হরিণস্য-করং (=হরিণস্য) ক্ষুরং ন দৃশ্যতে ; 'পারিঅই' 'ভাবিঅই' (চর্য্যা ২৬)=প্রাপ্যতে, ভাব্যতে ; 'দুহিএ' (চর্য্যা ৩৩)=দুহ্যতে ; 'ছিজই' (চর্য্যা ৪৫)=ছিদ্যতে। চর্য্যাপদের প্রা-বাং তে বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হইলেও, প্রাচীন প্রত্যয়-মূলক রীতিরই বহুল প্রসার লক্ষিত হয়। বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্য চর্য্যাপদে অন-প্রত্যয়ান্ত নাম-শব্দের সহিত 'জা' বা 'যা' ধাতু যোগে নিষ্পন্ন হয় ; যেমন 'ধরণ ন জাই' (চর্য্যা ২)=ধরণ না যায়, ধরা যায় না।

'-ই-, -ইজ্জ-' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য পশ্চিমা শৌরসেনী অপভ্রংশে বিদ্যমান ; খুব সম্ভব, মাগধী অপভ্রংশ, যাহা হইতে বাঙ্গলার উদ্ভব, তাহাতে '-ইজ্জ-' প্রত্যয়ের প্রচলন ছিল না, মাত্র '-ইঅ-' প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যেরই ব্যবহার ছিল। মাগধী অপভ্রংশ হইতে প্রাচীন বাঙ্গলা এই প্রত্যয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অতি শীঘ্রই বাঙ্গলা-ভাষীদের কাছে ইহার প্রকৃত স্বরূপ লুপ্ত হইয়া যাইতে থাকে। 'যা' ধাতুর সাহায্যে বিন্যস্ত বাক্য-মূলক কর্ম্ম-বাচ্যের উদ্ভব ও প্রচারকে এই লোপের কারণ অনুমান করা যাইতে পারে।

§ ১০। ৪৭টী চর্য্যাপদে '-ই-' কর্ম্ম-বাচ্যের উদাহরণ নিতান্ত কম নয়, প্রায় ২০টী পাওয়া যায়। মধ্য যুগের বাঙ্গলায় এই প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য প্রাচীন রীতির ধারা বজায় রাখিয়া আসিবার

চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এই প্রত্যয় আর জীবিত নয়, ইহা প্রাচীনের মুমূর্ষু চিহ্নাবশেষ মাত্র। বাঙ্গলা-ভাষীদের ভাষাজ্ঞ-বোধে আর এই প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের স্থান নাই; তাই ইহা বাঙ্গলা ভাষা অনুশীলন-কারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। যতই বাঙ্গলা ভাষা আমাদের বর্ত্তমান সময়ের দিকে আগুয়াইয়া আসিতেছে, ততই এই প্রত্যয়ের সত্তা দুর্ব্বল ও দুজ্ঞের্য় হইয়া পড়িতেছে দেখা যায়। অবশেষে এই প্রত্যয়, বর্ত্তমান উত্তম পুরুষের প্রত্যয়ে জড়িত হইয়া, সম্পূর্ণ-রূপে কর্ত্তৃ-বাচ্যের ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়।

§ ১১। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে '-ই-' প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের বহু নিদর্শন আছে। কতকগুলি উদ্ধৃত হইল :—

পৃঃ ১৯—'যত নানা ফুল পান করপুর সব পেলাইল পাএ ॥ ৪ ॥
উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল—ছেন কাম না করিএ।'

('করিএ' = করিঅই = ক্রিয়তে; এরূপ করা হয় না, করা ঠিক নয়।)

পৃঃ ৫৭—'আইহন বীর তিন লোকেঁ ভালে জাণী।

(অভিমন্যুঃ বীর ইতি ত্রিভির্লোকৈঃ ভদ্রং জ্ঞায়তে = জাণিঅদি, জাণিঅই, 'জাণী'।)

পৃঃ ৫৯—'দাণ সাধিএ রতি পতিআশে।'

('সাধিএ'—তৎসম 'সাধ্' ধাতু, কর্ম্মবাচ্যে = দান সাধা হয়।)

পৃঃ ১১৮—'ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞি দুঈ হাথে না খাইএ।'

('খাইএ' = খাইঅই, খাদিঅদি, (খাদ্যতে); দুই হাতে খাওয়া হয় না, দুই হাতে খাওয়া ঠিক নয়)।

পৃঃ ১৩৭—'আপণা রাখিএ আপণে।'

('রাখিএ' = রক্খিঅই = রক্ষ্যতে; আত্মা রক্ষ্যতে আত্মনা।)

পৃঃ ১৪৫—'না এর আন্তরে গেলী চন্দ্রাবলী রাহী।
তার পাছে আর যত গোআলিনী সহী।
কথো দুর গিআঁ দেখিএ একখানী নাএ।
সত্বর হয়িআঁ রাহী তার পাস যাএ ॥'

('দেখিএ' = দেক্খিঅই = * দৃক্ষ্যতে = দেখা হয়, দৃষ্ট হয়)

পৃঃ ১৮৪—'বোলেঁ চালেঁ না পাইএ পরায় রমণী।' ('পাইএ' = পাবিঅই = প্রাপ্যতে।)

পৃঃ ১৮৫—'গোপত কাহ্নত কাহ্নাঞি হয় আধি বারী।' ('বারী' = বারিঅই = বার্য্যতে।)

পৃঃ ২৮৯—'পুনমীর চান্দ তোহ্মার বদন বুসিএ জগতজনে ল।'

('বুসিএ' = ঘোসিঅই = ঘুষ্যতে, ঘোষিত হয়।)

পৃঃ ৩৬৭—'সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ, জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে জুড়িএ কাহার বাপে ॥'

('জুড়িএ' = জোড়া হয়; তাপে, বাপে = করণে তৃতীয়া।)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে। পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে এই প্রকারের '-ইএ-, -ইয়ে-' প্রত্যয়-সিদ্ধ ক্রিয়া মিলিলে, সাধারণ বাঙ্গালী এই '-ইএ-' কে বর্ত্তমান উত্তম-পুরুষের '-ই-' প্রত্যয়-রূপেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, ও '-এ-'কে ছন্দোরক্ষার জন্য আনীত অক্ষর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 'পাইএ' 'করিএ' প্রভৃতি পদ খাঁটী কর্ম্ম-বাচ্যের পদ; কর্ম্ম-বাচ্যে ইহাদিগকে ধরিলে, উদ্ধৃত বাক্যগুলির যে সহজ ও সরল সমাধান হয়, উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া করিয়া ধরিলে তাহা হয় না। 'পাইএ, করিএ' প্রভৃতি আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলা ভাষার পদ, চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গলা 'পারিঅই, করিঅই'-এর পরিবর্ত্তিত রূপ; = প্রাকৃতে 'পারিঅই, করিঅই' < * 'পারি-অদি, করিঅদি < * পাপিঅতি, করিঅতি < * প্রাপ্যতি, * কর্য্যতি < প্রাপ্যতে, ক্রিয়তে।

প্রা-বাং তে কর্ম্ম-বাচ্য মুমূর্ষু অবস্থায়। মধ্য-যুগের বাঙ্গলার কর্ত্তৃবাচ্যের উত্তম-পুরুষের সহিত রূপ-সাদৃশ্যে দুইয়ে গোলমাল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ-ক্ষেত্রে গুজরাটীতে যাহা ঘটিয়াছিল—'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে > অমে করীএ', অর্থাৎ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার ক্রমে কর্ত্তৃ-বাচ্যে পরিণতি, তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে (§ ৩)।

§ ১২। বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তির যুগে (অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গলার ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থায়), কর্ত্তৃ-কারকের ও করণের মধ্যে গোলমাল ঘটিয়াছিল। এই দুই সম্পর্কের সংমিশ্রণ আধুনিক বাঙ্গলায়ও বিরল নয়। সর্ব্বনাম হইতে উদাহরণ লওয়া যাউক; সংস্কৃত 'অহম্' শব্দে স্বার্থে '-ক' যোগ করিয়া প্রাচীন প্রাকৃতে 'অহকং' রূপ সৃষ্ট হইল; 'অহকং' অশোকের গৌলি-লিপিতে 'হকং' রূপে পাওয়া যায়। 'হকং' হইতে প্রা-বাং-তে 'হউঁ' (হকং > *হগং > * হঅং > * হবং > হউ); 'হউঁ' চর্য্যাপদে 'হাউঁ' এই রূপে মিলে। যেমন, 'তু লো ডোম্বী হাউঁ কাপালী' (চর্য্যা ১০); 'এত কাল হাউঁ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ' (চর্য্যা ৩১)। প্রা-বাং তে 'হাঁউ'এর পাশাপাশি 'মই, মই' রূপও প্রচলিত ছিল; 'মই' < সংস্কৃত 'ময়া' + তৃতীয়ার '-এন' = '*ময়েন'। আদিম-মধ্য-যুগে বাঙ্গলায় এই 'হউঁ' লুপ্ত হয়, 'মই, মুই, 'মুঞি' তাহার স্থান লয়: প্রথমার 'হউঁ' ও তৃতীয়ার 'মই' দুইয়ে মিলিয়া যায়, 'মই'-ই দাঁড়াইয়া যায়। ('আহ্মা' 'আহ্মী' মূলে বহু-বচনের সর্ব্বনাম; ইহা মধ্য-যুগে বাঙ্গলায় এক-বচনে ব্যবহৃত হইতে থাকে: আহ্মা < অস্ম-; আহ্মী < অমহেহি, অম্হহি < অস্মাভিঃ)। 'হউঁ' লোপ পাইল বটে, কিন্তু ভাষায় তাহার চিহ্ন রাখিয়া গেল; নিষ্ঠা '-ত' + '-ইল-' প্রত্যয়-যুক্ত যে অতীত কালের ক্রিয়া মাগধী অপভ্রংশে উদ্ভূত হয়, যাহা হইতে বাঙ্গলার অতীতের 'ইল' প্রত্যয় ('চল্' ধাতু + 'ত' = চলিত; চলিত + ইল = চলিঅ + ইল্ল, চলিল্ল = চলিল, চলিলা), তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় উত্তম-পুরুষে 'হউঁ' যুক্ত হইতে লাগিল: 'চলিল, চলিলা + হঁউ > চলিলহোঁ, চলিলাহোঁ > চলিলওঁ, চলিলাওঁ, চলিলোঁ > চলিলুঁ, চলিলুঙ, চলিলুম > চ'ললুম, চলিনু, চনু' ইত্যাদি। তদ্রূপ, 'তব্য'-প্রত্যয়-যুক্ত রূপ, যাহা বাঙ্গলা ও উড়িয়াতে 'ইব' প্রত্যয়ে দাঁড়াইয়া গেল, তাহাতেও 'হউঁ' যুক্ত হইতে লাগিল: 'চলিতব্য = চলিঅব্ব, চলিব; চলিব, চলিবা + হউঁ > চলিবহোঁ, চলিবাহোঁ > চলিবোঁ > চ'লবো, > চলিমু, চ'লমু'; ইত্যাদি। মধ্যম-পুরুষেও তদ্রূপ 'ত্বং' > 'তু', ক্রমে তৃতীয়ার 'ত্বয়া' + '-এন' > * 'ত্বয়েন' > 'তই, তুই' কর্ত্তৃক দূরীভূত হইল।

তদ্ভিন্ন, আধুনিক অন্যান্য আর্য্য ভাষার মত, প্রা-বাংতেও সকর্ম্মক ক্রিয়া বাস্তবিক পক্ষে '-ত-' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ, কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিত; এবং কর্ত্তা তৃতীয়া বিভক্তিতে (করণ কারকে) হইত : যেমন—'ময়া পুস্তিকা পঠিতা' = '* মইঁ পোথী পঢ়িলী,' পরে 'মই পুথী পঢ়িলা + হউঁ = পঢ়িলাহোঁ, পড়িলুম'। অকর্ম্মক ক্রিয়ায় কিন্তু ক্রিয়া কর্ত্তারই বিশেষণ-স্থানীয় ছিল, কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়াই থাকিত : যেমন 'অহং চলিতঃ' = '* হউঁ চলিল' ; 'রাধিকা চলিতা' = 'চলিলী রাহী'। 'হউঁ চলিল'—এখানেও 'হউঁ' ক্রমে 'মইঁ' কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইল ; কর্ত্তৃ-কারক ও করণ-কারকে ভেদ না করিবার অভ্যাস এই রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার অন্যতম কারণ[১]। তদ্ভিন্ন, প্রাচীন বাঙ্গলায় ও মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় প্রথমা ও তৃতীয়ার রূপের পার্থক্য বড় একটা ছিল না ; উভয়েরই প্রত্যয় ছিল '-এ' ; তৃতীয়ার মূল প্রত্যয় হইতেছে সানুনাসিক '-এঁ' (=সংস্কৃত '-এন'), কিন্তু '-এঁ-' প্রথমাতে (কর্ত্তৃ-কারকে) ও যুক্ত হইত। এই-সব কারণে প্রাচীন বাঙ্গলায় ক্রিয়া-পদের কর্ম্ম-বাচ্য হইতে কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনয়ন সহজ হইয়াছিল। কর্ত্তৃ-বাচ্য হইতেছে সরল, সহজ বাক্য-রীতি ; কর্ম্ম-বাচ্যে বিতর্কের স্থান আছে ; কর্ম্ম-বাচ্য ভাবের বিশ্লেষণের ও চিন্তার অপেক্ষা রাখে, সুতরাং সহজেই ইহা পরিত্যক্ত হইতে পারে ; বিশেষ অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম-বাচ্য সম্বন্ধে (অর্থাৎ ভাব-বাচ্য সম্বন্ধে) এই বিচারের কথা বেশী করিয়া খাটে। প্রা-বাং ও মধ্য-যুগের বাঙ্গলাতে ভাব-বাচ্যের সূক্ষ্ম ধারাটুকু বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, সাধারণ বুদ্ধির লোকে সহজেই তাহাকে প্রথম পুরুষের কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনয়ন করিতে পারিলে খুশী হয়। যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে, 'পুণ্য কইলেঁ স্বগ্‌গে জাইএ, নানা উপভোগ পাইএ' (পৃঃ ৩৬৪)—এখানে 'জাইএ, পাইএ' = গম্যতে, প্রাপ্যতে ; গম্যতে = 'কোনও অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক গমন-ক্রিয়া সাধিত হয়'—এইরূপ বিচার-মূলক ধারণার পরিবর্ত্তে, 'লোকে যায়', 'মানুষে যায়' এইরূপ সরল ধারণাই সহজ ; কাজেই ভাব-বাচ্যের ক্রিয়ার কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনয়ন শীঘ্র শীঘ্র সংঘটিত হইয়াছিল।

§ ১০। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপ সুপ্রচুর। আরও কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল ; এগুলি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' হইতে উদ্ধৃত হইল।

ব-সা-প, ২য় খণ্ড—চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে—

'নীল মুকুতার হার মনোহর শোভিত দেখিএ গলে'। ('দেখিএ' = দেক্‌খিঅই = দৃশ্যতে)।

'অবলা পরাণে এত কি সহিএ'। ('সহিএ' = সহা হয়, সহা যায়)।

'ক্ষুরের উপর রাধার বসতি, নড়িতে কাটিয়ে দে'।

('কাটিয়ে দে' < কাটিঅই দেহ = কট্টিঅই, কট্টিঅদি, কৃত্ততে দেহঃ = দেহ কর্ত্তিত হয়)।

১। এখানে অনেকে মাগধী অপভ্রংশের উপর ভোট-ব্রহ্ম ভাষার প্রভাব দেখেন। তিব্বতী প্রভৃতি ভোট-ব্রহ্ম শ্রেণীর ভাষায় কর্ত্তা বরাবরই তৃতীয়ায়, অর্থাৎ করণ হইতে কর্ত্তা অভিন্ন ; এ সম্বন্ধে Jaeschke কৃত Tibetan Grammar (1883), § 30 দ্রষ্টব্য।

'মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিএ।' ('শুনিএ'=শুনিঅদি, শ্রুত হয়।

ব-সা-প—পৃঃ ১২২৩—

'সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।

ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হইতে ॥......

হরি-ভক্তি-বিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।

বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহা পাইয়ে পার॥'

('জানি'=জানিঅই=জ্ঞায়তে; 'পাইয়ে'=প্রাপ্যতে)।

পৃঃ ৮৪৪—'যে অঙ্গ দেখিএ সেই অঙ্গে অলঙ্কার।' ('দেখিএ'=দৃষ্ট হয়)।

'বিনি না পুছিলে কারো না জানিএ জাতি।' ('জানিএ'=জ্ঞায়তে)।

§ ১৪। পুরাতন বাঙ্গলায় এইরূপ বহু বহু উদাহরণ আছে। মাগধী-অপভ্রংশ-সম্ভূত অন্য ভাষা-দ্বয়ে, মৈথিলী ও উড়িয়াতেও, এই প্রকার কর্ম্ম-বাচ্য মিলে। যথা—

মৈথিলী (বিদ্যাপতির পদাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ)—

৯—'লখই ন পারিঅ জেঠ কনেঠ।'

(জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, তাহা দেখিতে পারা যায় না)।

১৪—'জত দেখল তত কহহি ন পারিঅ।'

(যতটা দৃষ্ট হইল, ততটা বলিতে পারা যায় না)।

৩০—'পঢ়হি ন পারিঅ আখর পাতি।'

(অক্ষর-পংক্তি পড়িতে পারা যায় না)।

৩৩—'সে নহি দেখল জে দিয় উপামা।'

(তাহা দেখা গেল না, যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়)।

৪৮—'সব তহ সুনিঅ ঐসন বেবহারা।'

(তার যে এমন ব্যবহার, ইহা সবাইয়ের কাছে শুনা যায়)।

৬০—'মধুরিপু সম নহি দেখিঅ সোহাবন, জে দিঅ তহিক উপাম রে।'

(মধুরিপুর মত শোভন এমন কিছু দেখা যায় না, যার সঙ্গে তাঁর উপমা দেওয়া যায়)।

৬৭—'ন জানিয় কিয় করু মোহন চোর।'

(মোহন চোর যে কি করিল তাহা জানা যায় না)।

উড়িয়া (জগন্নাথ-দাসের ধ্রুব-চরিত্র, কাঁথী সংস্করণ)—

পৃঃ ৫—'কম্পিই তাহার নিজ দেহী।' ('কম্পিই'=কম্প্যতে, কম্পিত হয়)।

পৃঃ ৩৩—'দেহ-মান দিশই খর্জ্জুর-বৃক্ষ প্রায়।' ('দিশই'=দৃশ্যতে)।

পৃঃ ১১—'দশ দিশ অন্ধকার, কিছি হি ন দিশি।' (=দৃশ্যতে)।

ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত আসামী ও বাঙ্গলায় বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না—বাঙ্গলা-আসামী,

উড়িয়া, মৈথিল-মগহী, ভোজপুরিয়া, এই কয় মাগধী-সম্ভূত আধুনিক ভাষার প্রাচীন নিদর্শন হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মাগধী-অপভ্রংশে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য বিশেষ-রূপে বিদ্যমান ছিল।

§ ১৫। আধুনিক বাঙ্গলার কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-বাচ্য, যেখানে কর্ত্তার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না, মূলে '-য়-'>'-ইঅ-' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া হইতে জাত বলিয়াই মনে হয়। যেমন, 'কাপড় ছিঁড়ে', 'বাঁশ ভাঙ্গে,' 'শাঁখ বাজে', 'হাঁড়ী ভরে' ইত্যাদি। এখানে 'ছিঁড়ে, কাটে, ভাঙ্গে, বাজে, ভরে' প্রভৃতি ক্রিয়াকে মূলতঃ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া-পদেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রাকৃতে 'ছিণ্ডিঅই, কট্টিঅই, ভঙ্গিঅই বা ভজ্জিঅই, বজ্জিঅই, ভরিঅই,' আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলার 'ছিণ্ডিএ, কাটিএ, ভাজিএ, বাজিএ, ভরিএ'; পরে কর্ত্তৃ-বাচ্যে রূপান্তরিত হইয়া, আধুনিক বাঙ্গলা বৈয়াকরণদের নিকট কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-বাচ্য নামে পরিচিত। সংস্কৃতেও ঐরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়[১]; যেমন 'যবঃ পচ্যতে'=যব পাকে; 'লোষ্টাঃ শীর্য্যন্তে'=মাটির ঢেলাগুলি ভাঙ্গে।

§ ১৬। আধুনিক বাঙ্গলার সাধারণ নিষেধার্থক অনুজ্ঞায় কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া লুক্কায়িত আছে বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গলার 'এ কাজ করে না,' 'জ্বর হ'লে নায় না', 'রবিবার দিন মাছ খায় না' প্রভৃতি বাক্যে, 'করে', 'খায়', 'নায়', আপাতদৃষ্টিতে কর্ত্তৃ-বাচ্যে প্রথম পুরুষ বর্ত্তমানের ক্রিয়া বলিয়া মনে হয়। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায়ও এইরূপ প্রয়োগ আছে। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে—

পৃঃ ১৮৫—'লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ আরতি না করী।'

পৃঃ ২৩৬—'প্রভু হয়িআঁ হেন না করী।'

পৃঃ ২৫৭—'কেহ তার না কহিএ মরণে।'

মধ্য-যুগের বাঙ্গলা উদাহরণগুলিতে '-ইঅ-' প্রত্যয় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; এবং ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, আদৌ এই প্রয়োগ ছিল কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ। 'এ কাজ করে না'<'এ কাজ করিএ না'=প্রাকৃতে 'এঅং কজ্জং ণ করিঅই'='এতৎ কার্য্যং ন ক্রিয়তে'। যেমন অন্য অবস্থায় ঘটিয়াছে, কর্ম্ম-বাচ্য ক্রমে কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনীত হইয়াছে। যেখানে বক্তব্য ক্রিয়া বা ঘটনা কোনও কর্ত্তার অপেক্ষা রাখে না, বা কর্ত্তার উপর নির্ভর করে না, সেখানেই এইরূপ কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ আইসে। বাঙ্গলা ভাষার বহু প্রবাদ-বাক্য নিঃসন্দেহ-রূপে এই প্রকার কর্ম্ম-বাচ্যময়। যেমন—

'জামায়ের জন্যে মারে হাঁস। গুষ্টী-শুদ্ধ খায় মাস।'

('মারে হাঁস'=হাঁস মারিএ=হংস মারিঅই=হাঁস মারা হয়;

'খায় মাস'=মাস খাইএ=মংস খাইঅই=মাংস খাওয়া হয়)।

'এক দেয় বর দেখে। আর দেয় বর দেখে।' (=দীয়তে কন্যা)।

§ ১৭। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায়, 'ইউ' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কতকগুলি ক্রিয়া-পদ আছে। কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

১। J. S. Speyer, 'Vedische und Sanskrit-syntax,' § 169.

পৃঃ ১৪০—'নাঅ বান্ধিতেঁ গিআঁ করিউ যতনে।'

পৃঃ ১৪১—'আনহ সকল সখিজন মেলী করিউ যুগতী।'

পৃঃ ১৪১—'পসার সাজিউ দধি দুধে, সেসি জীবার উপাএ।'

পৃঃ ২০৪—'নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে।

তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে।'

পৃঃ ২৫৩—'যমুনাক যাইউ রাধা লয়িআঁ সখীগণে।'

পৃঃ ২৭০—'দধি বিকে জাইউ মথুরা।'

পৃঃ ২৯২—'সত্বরে রাধা লইআঁ যাইউ ঘর।'

পৃঃ ৩১০—'বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে।'

পৃঃ ৩৪৫—'বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে।'

পৃঃ ৩৪৭—'কদম তলাক জাইউ চিত্তের হরিষে।'

এই 'ইউ' প্রত্যয়ের দ্বারা বিধিলিঙ্ ও অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশিত হইতেছে: 'বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে'—এই বাক্যে, 'করিউ যতনে' কে কর্ম্ম-বাচ্যের অনুজ্ঞা বলিয়া বোধ হয়,=ক্রিয়তাম্ যত্নঃ। তদ্রূপ 'বারতা পুছিউ'=বার্ত্তা পৃচ্ছ্যতাম্; 'যাইউ'=গম্যতাম্। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এই 'ইউ-' প্রত্যয়ের উদ্ভব খুব সম্ভব কর্ম্ম-বাচ্যের '-ই-' তে অনুজ্ঞা প্রথম পুরুষের '-উ' (=সংস্কৃতের '-তু') যোগ করিয়া হইয়াছে। কর্ম্ম-বাচ্যের উত্তম পুরুষ বর্ত্তমান '-ওঁ' প্রত্যয়, ও মধ্যম পুরুষের 'হু' প্রত্যয় (=সংস্কৃত -স্ব, আত্মনেপদী—'চলস্ব'='চলসু' > 'চলহু'), ইহাদের প্রভাবও কিছু পরিমাণে আসিয়া থাকিতে পারে।

[২] বাঙ্গলা ভাষায় বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্য।

§ ১৮। প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া-পদ বাঙ্গলার আর জীবন্ত নাই। যে পদ্ধতিতে এখন বাঙ্গলায় কর্ম্ম-বাচ্য সাধিত হয়, তাহা বিশ্লেষ- ও বাক্য-বিন্যাস-মূলক। যেমন—

[১] আমি দেখা যাই; [২] আমাকে, আমারে, আমায় দেখা যায়;

[৩] আমাকে, আমারে, আমায় দেখন যায়; [৪] আমি দেখা পড়ি; [৫] আমাকে, আমারে, আমায় দেখা হয়; [৬] আমি দৃষ্ট হই।

উপরি লিখিত যে ছয় প্রকার উপায়ে কর্ম্ম-বাচ্যের ভাব বাঙ্গলায় প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে [১], [৪] ও [৬]-ই যথার্থ কর্ম্ম-বাচ্য, যেরূপ কর্ম্ম-বাচ্য ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় পাওয়া যায়; এবং [২] [৩] ও [৫]-এর রীতি ঠিক কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ নহে, বরং ভাব-বাচ্যের। এই ছয় রীতির প্রচার বাঙ্গালায় খুবই সাধারণ; তবে ইহাদের অর্থ-ঘটিত সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

§ ১৯। [১] 'আমি দেখা যাই'। ইহার বাক্য-বিশ্লেষ এই প্রকার—'আমি' সর্ব্বনাম কর্ত্তৃ-কারক +'দেখা'='-আ'-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া, +'যা' ধাতু উত্তম পুরুষ। অতীতে 'দেখা গেলাম',

ভবিষ্যতে 'দেখা যাইব', ইত্যাদি। 'আমি দেখা যাই'—এইরূপ কর্ত্তৃ-কারকের প্রয়োগ বাঙ্গলায় চলিলেও, ইহা বাঙ্গলার ঠিক ধাতুগত প্রয়োগ নয়। বিশেষতঃ, যখন ক্রিয়ার যথার্থ কর্ম্ম সু নির্দ্দিষ্ট, তখন কর্ম্ম-পদকে কর্ম্ম-বাচ্যীয় কর্ত্তৃ-কারকে আনয়ন করা ঠিক বাঙ্গলার প্রকৃতি-সঙ্গত নয়। 'আমি দেখা যাই' অপেক্ষা, 'আমাকে দেখা যায়' অধিকতর স্বাভাবিক বাক্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেখানে কর্ম্ম অনির্দ্দিষ্ট, সেখানে '-আ'-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়ার সহযোগে কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ সহজ ও সরল; যেমন 'দেখা যায়' (কর্ত্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম 'ইহা' উহ্য); 'যদি বলা যায়' (কর্ত্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম 'উহা' বা 'ইহা' বা 'কিছু' উহ্য); 'শোনা যাইতেছে' ('ইহা', 'উহা' 'কথা', 'শব্দ', 'আওয়াজ', 'গীত' ইত্যাদি উহ্য)।

কর্ম্ম বা ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, ভাব-বাচ্যের প্রয়োগের দিকেই বক্তার বেশী প্রবণতা আসে কর্ম্ম-বাচ্যীয় 'আমি মারা যাই'—এখানে 'মারা যাওয়া'র কোনও বিশেষ অর্থ নাই—অস্পষ্ট অর্থ যে, আমি কোনও বিপদে পতিত হই; কিন্তু ভাব-বাচ্যীয় 'আমাকে মারা যায় (হয়)' এখানে 'মার' ধাতুর প্রহার অর্থে বিশিষ্ট ব্যবহার। মোটের উপর, 'মারা যাওয়া' এই যুক্ত ধাতু-দ্বয়ের দুই অর্থ, 'প্রাণত্যাগ করা' ও 'প্রহৃত হওয়া'; এবং বাঙ্গলায় ইহার ব্যবহার কতকটা স্বকীয় (idiomatic)।

এইরূপ প্রয়োগ (কর্ত্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম + বিশেষণ ক্রিয়া + যা ধাতু) পুরাতন বাঙ্গলায়ও আছে; যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পৃঃ ৩৩—'তোহ্ম যাইবেঁ মার' = তুমি মার যাইবে; পৃঃ ৭১—'বাঁন্ধিল জাই' = বাঁধা যায়। চর্য্যাপদের 'বেঙ্গ সংসার বড্‌হিল জাঅ' (চর্য্যা ৩৩) = বিকলাঙ্গ সংসার বর্দ্ধিত হইয়া যায়, তুলনীয় (এখানে অবশ্য সকর্ম্মক ক্রিয়া, অতএব কর্ম্ম-বাচ্য নহে)।

§ ২০। [২] 'আমাকে, আমারে, আমায় দেখা যায়': এই প্রয়োগে ক্রিয়ার একটু শক্যতার ভাব বিদ্যমান আছে। এখানে 'দেখা' পদের ব্যাখ্যা একটু কঠিন। সাধারণতঃ ইহাকে '-আ'-কারান্ত নাম-ক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়; 'দেখা' = দেখন বা দর্শন; 'আমাকে দেখা যায়' = আমার বিষয়ে বা আমার সম্পর্কে দর্শন ঘটে। 'আমাকে দেখন যায়'—এই প্রয়োগের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। কিন্তু এখানে 'দেখা' পদ খুব সম্ভবতঃ বিশেষণ ক্রিয়া, এবং সমস্ত বাক্যটী ভাব-বাচ্যে প্রযুক্ত: আমার সম্পর্কে কিছু দৃষ্ট হয় = আমাকে দেখা যায়। এইরূপ ভাব-বাচ্যে প্রয়োগ হিন্দীতে আছে; যেমন কর্ত্তৃ-বাচ্যে—'লোগ মুঝে দেখতে হৈঁ' = লোকে আমায় দেখে; কর্ম্ম-বাচ্যে, 'মৈঁ দেখা জাতা হূঁ' = আমি দৃষ্ট হই; ভাব-বাচ্যে, 'মুঝ কো দেখা জাতা হৈ' = আমাকে দেখা যায়।

এই ধাতু-যোগে সৃষ্ট বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্যের মূল কি? যা-ধাতু-যুক্ত এইরূপ প্রয়োগ প্রাকৃতে পাওয়া যায় না। অথচ প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে 'করিজ্জই' 'খাইজ্জই' 'দিজ্জই' প্রভৃতি '-ইজ্জ'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, তথা 'করিঅই, খাইঅই, দিঅই' প্রভৃতি '-ইঅ'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপ বিদ্যমান। অপভ্রংশের পরেই আধুনিক ভাষার যুগ; অপভ্রংশ-যুগের '-ইজ্জই' প্রত্যয়ই, আধুনিক আর্য্য ভাষায় 'জাই' বা যা-ধাতু-যুক্ত কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইয়াছে, এরূপ বিচার অযৌক্তিক হইবে না। অপভ্রংশে 'মরিজ্জই' পদ, অর্থ-দ্যোতনায় 'মরই' = * মরতি * মরন্তে' এইরূপ পদের সহিত অভিন্ন। এক্ষণে কর্ম্ম-বাচ্যের কোনও ধারণা নাই। 'মরিজ্জই'

পদের উৎপত্তি সাধারণ্যে 'মরি+জই বা জাই=মরিয়া যায়', এইরূপ দাঁড়াইয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। লোকের মনে, এখানে যা-ধাতুর অস্তিত্ব আছে, এরূপ ধারণা একবার হইয়া গেলে, সহজেই অন্য অকর্ম্মক ধাতুতেও যা-ধাতু-কে জুড়িয়া, ভাষায় নবীন উদ্ভূত ও বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত সংযুক্ত-ধাতুর মত প্রযুক্ত হওয়া আরম্ভ হইল। যেমন 'চলি জাই, পড়ি জাই, ভাঁগি জাই' ইত্যাদি। এখনে 'চলি, পড়ি' প্রভৃতিকে অসমাপিকা-ক্রিয়া, নাম-ক্রিয়া বা বিশেষণ-ক্রিয়া, এইরূপ নানাভাবে দেখা সহজ হইল। প্রথম প্রথম এইরূপ প্রয়োগে কর্ম্ম-পদ কর্ত্তৃ-কারকেই ব্যবহৃত হইত, পরে কর্ত্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম-পদকে সম্প্রদানে আনিয়া, ভাব-বাচ্যে প্রয়োগের রীতি আসিয়া যায়; যেমন—'* হউঁ দেক্‌খিজ্জই'='*মই দেখি জাই'='*মুই দেখিআ জাই' ='আমি দেখা যাই'; পরে, 'আমাকে দেখা যায়'। উত্তম পুরুষে কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ প্রাচীন যুগে খুব কমই আছে, এ কথা এস্থলে বলা দরকার; ইহার কারণ এই যে, উত্তম পুরুষ হইতেছে সুনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনাম; এবং যেখানে বাক্যে কিছুমাত্র অনির্দ্দিষ্ট-ভাব বিদ্যমান, সেই থানেই কর্ম্ম-বাচ্য ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক। প্রাকৃতের কর্ম্ম-বাচ্যের '-ইজ্জ-' প্রত্যয়ের সহিত আধুনিক ভাষার কর্ম্ম-বাচ্যে √ যা-ধাতুর যে যোগ আছে, তাহা Beames বীম্‌স্ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন[১]। বাঙ্গলায় ক্রিয়ার যে শক্যতার-ভাব √ যা-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যে বিদ্যমান, তাহাতে প্রাকৃতের বিধিলিঙের প্রত্যয় '-এজ্জ-'র কিছু প্রভাবও আছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

§ ৯-এর পারাগ্রাফে বলা হইয়াছে যে, মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে 'সংস্কৃত' '-য়-' প্রত্যয় (কর্ম্ম-বাচ্যে) '-ইঅ-' তে রূপান্তরিত হয়; '-ইজ্জ-', পশ্চিমা-প্রাকৃত ও পশ্চিমা-অপভ্রংশের রূপ। বাঙ্গলায় '-ইজ্জ-' > যা-ধাতুর প্রয়োগ পশ্চিমা-অপভ্রংশের প্রভাবের ফল বলিয়াই অনুমিত হয়।

§ ২১। [৬] 'আমাকে দেখন যায়।' এই-প্রকার প্রয়োগ বাঙ্গলায় অতি প্রাচীন, এবং চর্য্যাপদের বাঙ্গলা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বাঙ্গলা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মিলে। 'ধরণ ন জাই' (চর্য্যা ২), 'কহণ ন জাই' (৩৫), 'লেপন জায়' (৪); শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—পৃঃ ৩৮ —'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ'; ৫৮ পৃঃ—'প্রাণ ধরণ না জাএ।' মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এইরূপ প্রয়োগ অজস্র। আধুনিক বাঙ্গলায়, পশ্চিম-বঙ্গের মৌখিক ভাষায় ইহার প্রয়োগ একটু বিরল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গে এই প্রাচীন বাক্য-রীতি পূর্ণ-ভাবে বিদ্যমান। অন্যান্য আধুনিক মাগধী ভাষাগুলিতে '-অন'-প্রত্যয়ান্ত নামের সহিত যা-ধাতু-যোগে নিষ্পন্ন এই বাক্য-রীতি আজ-কাল তাদৃশ মিলে না; ইহা বাঙ্গলা ভাষারই বিশেষত্ব; মৈথিলী, মগহী ভোজপুরিয়াতে -'অল, -অব' প্রত্যয়ান্ত নামের, ও উড়িয়াতে '-ইব' প্রত্যয়ান্ত রূপেরই প্রয়োগ বেশী।

'করণ জায়'—এইরূপ প্রয়োগের মূলে, 'সংস্কৃত যুগের' '-অনীয়-ক'-প্রত্যয়ান্ত পদের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। 'করণীয়ক>করণিজ্জঅ>করণি জাএ>করণ জায়'; তদ্রূপ 'পঠনীয়ক>পঢনিজ্জঅ>পঢ়নি জায়>পঢ়ন, পড়ন যায়।' এই বিশ্লেষ-প্রক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা—'ই'-কার যুক্ত রূপ—বাঙ্গলায় পাওয়া যায় না; কিন্তু তুলসীদাসের ভাষায় (মধ্য-যুগের আওধীতে)

১। Comparative Grammar of the Indo-Aryan Languages, III, pp. 73-74.

ইহা বিদ্যমান আছে ; যেমন, তুলসীদাসের রামায়ণে 'বরনি জায়','কহনি জাই' ইত্যাদি। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় 'না যায় কহনে'—এইরূপ বাক্য পাওয়া যায় ; এখানে 'কহনে'র এ-কার, সম্ভবতঃ পূর্ব্বাবস্থার 'ই'-কারের চিহ্নাবশেষ হইতে পারে ('কহনিজ্জঅ > কহনি জাই > কহনে জায়')। '-অন-' প্রত্যয় যুক্ত নাম, + √যা—এইরূপ বিশ্লেষণ, বা বিশ্লিষ্ট বাক্য-রীতি, পশ্চিমা-প্রাকৃত হইতে পূর্ব্ব-দেশের ভাষায় (মাগধী প্রাকৃতে) আসিয়া যায়, এরূপ অনুমান হয়। এইরূপ বিশ্লেষ একবার গৃহীত হইয়া গেলে, নঞ্-অর্থক নিপাত 'না'- এর যোগে 'কহন না জায়', এইরূপ পদ্ধতি সহজেই রীতি-সিদ্ধ হইয়া যায়। 'না জায় কহন'—এই প্রকার বাক্যের উদ্ভব ঘটে। 'না কহুন যায়', এই প্রকার প্রয়োগ চলিতে পারে না, কিন্তু 'কহন যায় না' চলে ; ইহার কারণ এই যে, নাম-শব্দকে মধ্যে আনিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ 'না'-কে ক্রিয়া হইতে দূরে আনিয়া বিচ্ছিন্ন করা, বাঙ্গলার রীতি নয়।

মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় কচিৎ অ-কারান্ত নাম-ক্রিয়ার প্রয়োগও দেখা যায় : 'নিবার না যায় রে' (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, পৃঃ ৯৮১), 'বোল না যায়', ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গলায় ইহার অনুরূপ প্রয়োগ নাই। খুব সম্ভব এখানে ন-কারের সঙ্কলেখনে এইরূপ ঘটিয়াছে : 'নিবারণ না যায়' স্থলে 'নিবার না যায়'।

§ ২২। [৪] 'আমি দেখা পড়ি।' এই প্রকার প্রয়োগ বাঙ্গলায় প্রাচীন, কিন্তু ইহা একেবারে বাঙ্গলার বিশিষ্ট idiomatic প্রয়োগ। ইহাতে একটু আকস্মিকতা ও পরিসমাপ্তির সূক্ষ্ম দ্যোতনা থাকে। এই প্রয়োগ পূরা কর্ম্ম-বাচ্যের। 'দেখা' = আকারান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া। 'পড়' ধাতুর এইরূপ কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ, দ্রাবিড় ভাষায় পাওয়া যায় : ইহা আর্য্য ভাষার উপর দ্রাবিড়ের প্রভাবের ফল, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না ; আর্য্য ও দ্রাবিড় দুই শ্রেণীর ভাষায় এইরূপ প্রয়োগ আধুনিক, এবং ইহাকে দুই শ্রেণীর ভাষা-ভাষীদের চিন্তা-প্রণালী একই মার্গ ধরিয়া চলিবার ফল বলিয়া বিচার করাই অধিকতর সমীচীন হইবে।

'আমাকে দেখা পড়ে'—'পড়্' ধাতু-যোগে এইরূপ ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ বাঙ্গলায় অজ্ঞাত।

§ ২৩। [৫] 'আমাকে দেখা হয়।' এখানে 'দেখা' পদ, 'আ'-কারান্ত নাম-ক্রিয়া বলিয়া অনুমিত হয় : 'আমার সম্পর্কে দেখা ক্রিয়া ঘটে।' 'দেখা' = দেখন, দর্শন, এই নাম-শব্দ এখানে 'হয়' ক্রিয়ার কর্ত্তা। এই প্রয়োগে, ক্রিয়ার ভাবটিই বাক্যের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান ভাব ; ইহার সহিত 'দেখা যায়' বা 'দেখা পড়ে', এই বাক্যের যদি তুলনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বুঝা যায় যে, 'দেখা পড়ে' বাক্যে 'দেখা'-ক্রিয়ার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া হইতেছে না, কিন্তু 'দেখা হয়'—ইহাতে 'দেখা'-ক্রিয়ার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইতেছে। তুলনীয়—'দেখা গেল, দেখা পড়িল' = মাত্র দৃষ্টিগোচর হইল ; কিন্তু 'দেখা হইল' = সাক্ষাৎ-ক্রিয়া বা দর্শন-ক্রিয়া ঘটিল।

এই প্রয়োগ আধুনিক আর্য্য ভাষাগুলিতে অর্ব্বাচীন-কালে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়।

§ ২৪। [৬] 'আমি দৃষ্ট হই'। সংস্কৃত '-ত'-প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ সংযোগে গঠিত এইরূপ বাক্য-রীতি ভাষায় আধুনিক সৃষ্টি, এবং বইয়ের ভাষার বাহিরে এক-রকম অপ্রাপ্ত,—কৃত্রিম, পণ্ডিতী সৃষ্টি। অবশ্য, মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এইরূপ প্রয়োগ বিরল নহে, কারণ সংস্কৃত '-ত'-প্রত্যয়ান্ত

ক্রিয়া-পদ বাঙ্গলায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই শত শত আনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তবু ও, ইংরেজীর অনুকরণে, আজকাল সাহিত্যের ভাষার ইহার বহু প্রচার ঘটিয়াছে অনুমান করা যায়।

§ ২৫। 'আছ' ধাতুর সহিত 'আ'-কারান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া কর্ম্ম-বাচ্য গঠিত হয়। অব্যবহিত-পূর্ব্বে কৃত ক্রিয়া, যাহার ফল এখনও বিদ্যমান, তাহাকে জানাইবার জন্য এই প্রয়োগ; সাধারণতঃ অচেতন বা নপুংসক নামের সহিত ইহার ব্যবহার, এবং এই নাম-শব্দ আছ-ধাতু-জ ক্রিয়ার কর্ত্তা। যেমন—'এ বই আমার পড়া আছে' = আমা-কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছে, ও তাহার ফল এখনও বিদ্যমান; 'মাছ ধরা আছে' = মাছ ধরা হইয়াছে ও এখনও ধৃত অবস্থায় বিদ্যমান; 'এ কথা সকলের জানা আছে' বা 'ছিল' ইত্যাদি। বাঙ্গালায় এই প্রয়োগ নূতন বলিয়া মনে হয়।

§ ২৬। 'চল' ও 'খা' ধাতু-দ্বয়-যোগেও বাঙ্গলায় কর্ম্ম-বাচ্য গঠিত হয়। এই প্রয়োগ-দ্বয় অতি মাত্রায় idiomatic অর্থাৎ বাঙ্গলার স্বকীয় প্রকৃতি-গত। 'দেখা চলে'—এখানে 'দেখা' অ-কারান্ত নাম-ক্রিয়া; তদ্রূপ 'বলা চলে' ইত্যাদি। এই প্রয়োগ কতকটা ভাব-বাচ্যের মতন—কর্ত্তা অজ্ঞাত, বা অনির্দ্দিষ্ট, বা অপ্রধান।

'খা' ধাতুর প্রয়োগ 'সহা' অর্থে—'মার খাওয়া' = প্রহৃত হওয়া; খালি 'মার' শব্দের (নাম-শব্দের) সহিত ইহার প্রয়োগ। অন্য আর্য্য ভাষায় 'খা' ধাতুর ও দ্রাবিড়েও (দ্রাবিড়ে 'উণ' ধাতুর) এইরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়।

§ ২৭। আধুনিক বাঙ্গলায় কর্ম্ম-বাচ্যের ও ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ মুখ্যতঃ অনির্দ্দিষ্ট-কর্ত্তৃক। যেখানে আলাপ করিবার সময়ে সাধারণ 'তুমি' কিম্বা সম্মান-সূচক 'আপনি', কোন্‌টা প্রয়োগ করা উচিত সে বিষয়ে বক্তার মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, সেখানে কর্ত্তৃ-বাচ্য ব্যবহার না করিয়া, কর্ম্ম-বাচ্য বা ভাব-বাচ্য দ্বারা কাজ চালান হয়; যেমন—'কি করা হয়,' 'কোথা থাকা হয়' ইত্যাদি। 'ধরে নেওয়া যাক্'—প্রভৃতি অনির্দ্দিষ্ট-কর্ত্তৃক বাক্যেও কর্ম্ম-বাচ্যেরই প্রয়োগ।

তুলনীয়—'এখানে দিয়ে যাওয়া যায় না' = কেহ যাইতে সক্ষম হয় না—শক্তি-জ্ঞাপক বাক্য 'যাওয়া যায়' = জাইজ্জই = গম্যতে; এ-ক্ষেত্রে বিশ্লিষ্ট-রূপ 'ইজ্জ'-প্রত্যয়ান্ত কর্ম্ম-বাচ্য হইতে উদ্ভূত, এবং পশ্চিমের প্রাকৃতের প্রভাবে মাগধীতে আনীত; 'এখান দিয়ে যায় না' = সাধারণ নিষেধার্থক 'যায়' = জাইঅই—'ইঅ'-প্রত্যয়-সহযোগে নিষ্পন্ন খাঁটি বাঙ্গলার পুরাতন কর্ম্ম-বাচ্য।

[৩] বাঙ্গালা ভাষায় 'কর্ম্মণি' ও 'ভাবে' প্রয়োগ।

§ ২৮। হিন্দী প্রভৃতি পশ্চিমা ভাষায় সকর্ম্মক ধাতুর অতীত কালে কর্ত্তরি-প্রয়োগ অজ্ঞাত, কর্ম্মণি বা ভাবে-প্রয়োগই রীতি-সিদ্ধ। যেমন—

কর্ত্তৃ-বাচ্যে অকর্ম্মক-ক্রিয়া—'রহ্ গয়া' = অসৌ গতঃ।

কর্ম্ম-বাচ্যে সকর্ম্মক ক্রিয়া
'উস্নে রাজা দেখা' = তেন রাজা দৃষ্টঃ।
'উস্নে রাজা দেখে' = তেন রাজানঃ দৃষ্টাঃ।
'উস্নে রানী দেখী' = তেন রাজ্ঞী দৃষ্টা।
'উস্নে রানিয়াঁ দেখীঁ' = তেন রাজ্ঞ্যঃ দৃষ্টাঃ।

ভাবে সকর্ম্মক ক্রিয়া
'উস্নে রাজাকো দেখা' = তেন রাজ্ঞঃ বিষয়ে দৃষ্টং।
'উস্নে রাজাওঁকো দেখা' = তেন রাজ্ঞাং বিষয়ে দৃষ্টং।
'উস্নে রানীকো দেখা' = তেন রাজ্ঞ্যাঃ বিষয়ে দৃষ্টং।
'উস্নে রানিয়োঁকো দেখা' = তেন রাজ্ঞীনাম্ বিষয়ে দৃষ্টং।

অকর্ম্মক ক্রিয়ার ভাবে প্রয়োগ, যেমন 'উস্নে গয়া' = তেন গতম্, সাধু-হিন্দুস্থানীতে হয় না, কিন্তু ভাখা-হিন্দুস্থানীতে কচিৎ মিলে।

সকর্ম্মক অতীতের ক্রিয়া মূলে ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়ার স্থানীয়। ইহা কর্ম্মকে অনুসরণ করে, কর্ম্মের অনুসারে লিঙ্গ ও বচনে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে; এবং কর্ত্তা, তৃতীয়া বা করণে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক বাঙ্গলায় এইরূপ রীতি অজ্ঞাত; কিন্তু এখন অজ্ঞাত হইলেও, প্রা-বাংতে বিদ্যমান ছিল; পরে ক্রমে ক্রমে মধ্য যুগের বাঙ্গলায় কর্ম্ম বা ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ লুপ্ত হয়, বাক্য কর্ত্তৃ-বাচ্যে আসিয়া যায়। চর্য্যাপদের কতকগুলি উদাহরণে ইহা বেশ বুঝা যায়; যথা 'খুণ্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি' (৮) 'কাচ্ছি' স্ত্রী-লিঙ্গ, কাজেই 'মেলিলি'—ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ = খুণ্টিকাং উৎপাট্য মেলিতা কচ্ছিকা; 'তোহর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী' (১০) = তোর তরে মুই ঘলিলী হাড়েরী মালী = ময়া নিক্ষিপ্তা অস্থি-রচিতা মালিকা; 'সেজি ছাইলী, রাতি পোহাইলী' (২৮) = * শয্যিকা ছাদিতা, * রাত্রিঃ প্রভাতিতা; 'ঘরিণী লেলী' (৪৯) = গৃহিণী নীতা। অকর্ম্মক ক্রিয়ায় অতীতে ক্রিয়া-পদ কর্ত্তার বিশেষণ হইত; এরূপ অবস্থা আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় কচিৎ রক্ষিত আছে; যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'চলিলী রাহী' = চলিতা রাধিকা। পরে মধ্য-যুগে এইরূপ প্রয়োগ একেবারে অন্তর্হিত হয়। '-ইল-প্রত্যয়ান্ত' ক্রিয়ার অতীত রূপে সর্ব্বনাম-দ্যোতক প্রত্যয় সংযোজিত হইয়া, সংস্কৃতের 'অ-খাদৎ ঃ, আ-খাদয়-ঃ' প্রভৃতি তিঙন্ত-পদের মত, বাঙ্গলার ক্রিয়ার রূপ 'খা-ইল—অ' = খাইল 'খা-ইল—আ' = খাইলা, 'খা-ইল—আম' = খাইলাম তে দাঁড়াইয়া যায়।

[৪] ণিজন্ত-রূপের কর্ম্ম-বাচ্যে ব্যবহার।

§ ২৯। বাঙ্গলা ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় ণিজন্ত-ক্রিয়া কর্ম্ম-বাচ্যে ব্যবহৃত হয়। এই প্রয়োগে একটু সক্ষমতার ভাব বিদ্যমান। হর্ন্‌লে ও তেস্‌সিতোরি এই প্রয়োগ লক্ষ করিয়া গিয়াছেন[১]।

১। Gaudian Grammar, § 484 : Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, (Indian Antiquary, 1914-16), § 140.

আধুনিক গুজরাটীতে অন্য-প্রকার কর্ম্ম বাচ্যের প্রয়োগ নাই, কেবল মাত্র এই ণিজন্ত-প্রয়োগেরই চলন আছে।

বাঙ্গলা ভাষায় উদাহরণ :—

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন—পৃঃ ৮৯—'সেহি এহা পথে মাহাদানী বোলাএ' (=কথিত হয়); পৃঃ ১৮৬ 'যেহ্ন না ছাড়াএ ঘোণ' (=বিক্ষিপ্ত হয়);

আধুনিক বাঙ্গলা—

'বেশ মানায়'; 'কথাটা ভাল শুনায় না'; 'কথাটা চারাইয়াছে'; 'সে ভাল মানুষ কহায় বটে, কিন্তু লোক সুবিধার নয়'; 'এতে কিন্তু দোষ খণ্ডায় না'; 'যত পরখায়, তত দোষ বার হয়'; 'দুল পরিবার জন্য 'কান বেঁধায়'; 'এটা তত খারাপ দেখাবে না', ইত্যাদি। সাধারণতঃ এই সকল স্থানে অনির্দ্দিষ্ট-কর্ত্তৃকত্ব বিদ্যমান।

উড়িয়াতেও এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়; যথা—জগন্নাথ দাসের ধ্রুব-চরিত্র (কাঁথী সংস্করণ), পৃঃ ৮—'সে বোলাই পাটরাণী'; পৃঃ ৪৮—'দেবগণ মধে তু বোলাউ সুনাশীর'; পৃঃ ২৬—'দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র-রাজ এ বোলাই,' ইত্যাদি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[টিপ্পনী—এই প্রবন্ধে আমি 'গুজরাটী, মারহাট্টী' বানান লিখিয়াছি। এতাবৎ সাধারণতঃ 'গুজরাতী, মরাঠী' লেখা হয়, আমি নিজেও শেষোক্ত দুই রূপই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। এখন আমি 'গুজরাটী, মারহাট্টী (বা মারাঠী)' লেখার পক্ষে; কারণ এই দুই রূপ হইতেছে বাঙ্গলা-ভাষার নিজস্ব রূপ। 'সংস্কৃত' পদ 'গুর্জর-ত্রা' হইতে 'গুজরাত' শব্দের উৎপত্তি: 'গুর্জ্জরত্রা > গুজ্জরত > গুজরাত'; তাহা হইতে 'গুজরাতী,' এবং গুজরাটের লোকেরা এই দন্ত্য-ত-যুক্ত পদই ব্যবহার করে। তদ্রূপ 'মহারাষ্ট্রী > মহারাট্ঠী > মহরাঠী > মরাঠী'; মহারাষ্ট্র-নিবাসিগণ এই রূপই ব্যবহার করে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলাতে আমরা 'গুজরাট' পাই—এখানে 'রাষ্ট্র' শব্দের সহিত যোগ অনুমান করায় মূর্দ্ধন্য 'ট' আসিয়া গিয়াছে; এবং মহারাষ্ট্রীর প্রাচীন বাঙ্গলা রূপ 'মহারাষ্ট্রী, মারহাট্টী' বা 'মারাঠী'; প্রাকৃত রূপ-বিশেষ 'মরহাঠী'ও মেলে। এই দুই দেশের নাম চলিত বাঙ্গলায় আমরা 'গুজরাট,' ও 'মারহাট্ট' বা 'মারাট্টা দেশ' বলিয়া থাকি; এই রূপ দুইটী আমাদের বাঙ্গলা ভাষার। গুজরাটীরা বা মারহাট্টারা কি লেখে, তাহা দেখিবার দরকার মনে করি না। তাহারাও আমাদের বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার নাম 'বাঙ্গলা, বাঁঙ্‌লা, বাংলা' বা 'বাঙ্গালা'কে আমাদের মত বানান করিয়া লেখে না; তাহারা লেখে ও বলে 'বংগাল, বংগালী'। মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন 'গুজরাট' দেশের সম্বন্ধে কিছু লেখে বা বলে, তখন তাহারা নিজ ভাষার শব্দ 'গুজরাথ, গুজরাথী'ই ব্যবহার করে, 'গুজরাত, গুজরাতী' কদাচও মারহাট্টীতে দেখি নাই। তদ্রূপ 'ওড়িয়া' পঞ্জাবী, অসমীয়া' ইত্যাদি না লিখিয়া, বাঙ্গলায় 'উড়িয়া, পাঞ্জাবী, আসামী' লেখাই সমীচীন মনে করি। 'হিন্দুস্থানী' শব্দকে বিশুদ্ধ উর্দু রূপ ধরিয়া 'হিন্দোস্তানী' লিখিলে, বাঙ্গলা ভাষার

উপর উৎপীড়ন করা হইবে। কোনও ইংরেজ, French, German, Danishএর বদলে তত্তদ্-ভাষানুযায়ী 'বিশুদ্ধ' রূপ Fran$ais, Deutsch, Dansk লেখা বা বলার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না; তদ্রূপ ফরাসীও নিজ ভাষার অনুরূপ Anglais (ইংরেজ, আংরেজ) Allemand (এলেমান, জারমান) Danois (দিনেমার) ছাড়া আর কিছু প্রয়োগ করিবে না। 'বিশুদ্ধ' রূপের নজীর দেখাইলে, বাঙ্গলা ভাষায় তাবৎ তদ্ভব শব্দকে উক্ত নজীরের বলে বাঙ্গলা রূপ পরিত্যাগ করাইয়া আর কিছুর মূর্ত্তি ধরাইতে হয়। বরং 'গুজরাট, মারহাট্টা' প্রভৃতি পদই বাঙ্গলা ভাষার যথার্থ বিশুদ্ধি-রক্ষায় সহায়ক হইবে।]

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা *

[General Physics and Acoustics]

বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি সত্বেও উহা অসম্পূর্ণ—এ ভাষায় বিজ্ঞানালোচনা সম্ভব নয়। অধুনা জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। সকল সভ্য জাতিই বিজ্ঞানালোচনা করিয়া কত উন্নতি করিতেছেন ও কত ধন্য হইতেছেন ; আর আমাদের বিজাতীয় ভাষার সাহায্য ভিন্ন সেই আশা পূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই। য়ুরোপীয় কোন ভাষা না জানিলে বিজ্ঞান শিখিবার বা শিখাইবার কোন উপায় নাই। ইহা আমাদের জাতির একটা কলঙ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের ভাষায় পারিভাষিক শব্দের অভাববশতঃ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা এক রকম দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপযুক্ত পরিভাষা না থাকিলে, কেবলমাত্র প্রচলিত ভাষায় কখনও বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা চলে না। বহুলভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রচার ও সম্যগ্‌ভাবে উহার বিকাশ যদি আমাদের দেশের লোকেদের মধ্যে করিতে হয়, তাহার পূর্ব্বে উপযুক্ত পরিভাষা প্রণয়ন আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা পরিভাষা-সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদাদি স্থানে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙ্গালার কৃতী সন্তানগণ এবিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জ্যোতিষ ও রসায়নের জন্যই বেশী পরিশ্রম করিয়াছেন। তথাপি Physicsএর পারিভাষিক শব্দও কিছু কিছু তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত মহাশয়ের সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ ও বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত "পদার্থ-বিদ্যা" ও "পদার্থ-দর্শন" নামক পুস্তকদ্বয় হইতে আমি অনেকগুলি শব্দ লইয়াছি। এজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সাহা এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, বি এল্ প্রভৃতি বন্ধুগণ আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদেরও নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র General Physics Acousticsএর পরিভাষা আলোচিত হইবে।

পরিভাষা প্রণয়নকালে সর্ব্বাগ্রে আমাদের দেখা উচিত, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার কি আছে। সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে যাহা যাহা পাওয়া যায়, সেগুলি বজায় রাখিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত, কিন্তু যদি নব্য বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অর্থবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, সে স্থলে উহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা দরকার। চলিত ভাষায় যে কথাগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিতে বৈজ্ঞানিক অর্থের একটু আধটু বৈলক্ষণ্য থাকিলেও, সেগুলি আমাদের জীবনে, আমাদের সাংসারিক ব্যাপারে এত জড়িত যে, তাহাদের আমরা ছাড়িতে পারি না। আবার কতকগুলি বিদেশী ভাষা-

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনত্রিংশ বর্ষের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

প্রচলিত নাম হয় ত আমাদের চলিত ভাষায় এমন চলিয়া গিয়াছে যে, সেগুলিকে বাঙ্গালা বলিয়াই মনে হয়; তাহাদের বাঙ্গালা তরজমা আমাদের কর্ণে নূতন ও দুঃশ্রব করে। তাহাদের অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ মনে হয়। আরও অনেক শব্দ আছে, যেমন কোন যন্ত্রের বিশেষ নাম—যদিও সেগুলি সাধারণের মুখে শুনা যায় না, সেগুলির তরজমা করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না, কেবল অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলেই চলিবে। আর একটী কথা, যে শব্দটী অক্ষরান্তরিত করিতে হইবে, তাহার প্রকৃত উচ্চারণটী অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এসব ভিন্ন সমস্ত পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন আবশ্যক। প্রণয়নকালে মনে রাখা উচিত যে, আমাদের ভাষা সংস্কৃতমূলক; অতএব সংস্কৃত ধাতু ও শব্দের উপর প্রত্যয়াদি করিয়া য়ুরোপীয় পরিভাষা অবলম্বনে শব্দ-সৃষ্টি করিতে হইবে। বিজ্ঞানের ভাষাতেও অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি-দোষ মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য হয়। কখনও কখনও একটী শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; আবার হয় ত একই অর্থে একাধিক শব্দও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পারিভাষিক শব্দের পক্ষে প্রত্যেকটী তাহার একমাত্র নির্দিষ্ট অর্থে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। চলিত ভাষা হইতে শব্দ সংকলন করিবার সময় এ সব দোষের সম্ভাবনা আরও বেশী। অর্থাদির দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিতে গিয়া সময় সময় শ্রুতিকটুতা ও দুরুচ্চার্য্যতা দোষ আসিয়া পড়াও সম্ভব। তবে এই শ্রুতিকটুতাদি দোষ অভ্যাস ও পরিচয়ের সঙ্গে অনেক সময় কমিয়াও যায়। তথাপি যাহাতে শব্দগুলি ক্ষুদ্র ও সুখোচ্চার্য্য হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় পরিভাষা প্রণয়ন করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালীর প্রকৃতির উপর দৃষ্টি রাখা চাই। য়ুরোপীয় পারিভাষায় যে দোষ বা ভুল আছে, তাহা যেন অনুকরণ না করা হয়। এক সময় বৈজ্ঞানিকেরা gas ও vapourকে ভিন্নজাতীয় পদার্থ বলিয়া জানিতেন, কিন্তু এখন যখন উহা একজাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন আমাদের উহাদের জন্য দুইটী নামের সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন? ইংরেজি scale শব্দ বা spring শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমাদের কিন্তু প্রত্যেক অর্থে এক একটী শব্দ স্থির করিতে হইবে। য়ুরোপীয় পারিভাষিক শব্দের অনুবাদকালে সেই শব্দ অপেক্ষা তাহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। Ether শব্দের মূল অর্থ দহন বা উহার সহিত সংস্কৃত ইধ্ ধাতুর সহিত জ্ঞাতিত্ব আছে বলিয়া, তদর্থ-বোধক কোন শব্দ Etherএর জন্য সৃষ্টি করিতে গেলে চলিবে না। উহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উহার প্রতিশব্দ স্থির করিতে হইবে।

উক্ত দোষগুলি যথাসাধ্য নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়া, General Physics ও Acoustics এর কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিয়াছি এবং তাহাদের সম্যক্ বিচারার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সমীপে উপস্থিত করিতেছি। একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, আমার শব্দগুলিতে কোনরূপ অসঙ্গতি নাই—কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ নাই; এ কথাও বলা চলে না যে আমার শব্দ অপেক্ষা উপযোগী শব্দ আর কেহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন না। এক্ষণে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী আমার শব্দগুলির ভ্রম-সংশোধন ও উন্নতি-সাধন করিয়া দিলে কৃতার্থ বোধ করিব।

বিজ্ঞানের ভাষাকে এ সকল দোষ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। আবার একথাও ঠিক যে, অসঙ্গতি বা উপযোগিতা লইয়া তর্ক-বিতর্ক চালাইলে, সে তর্কের অন্ত নাই। অতএব বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া, আমাদের কর্ত্তব্য, সকলে মিলিয়া যথাশক্তি পূর্ব্বোক্ত দোষাবলী হইতে মুক্ত করিয়া পরিভাষা প্রণয়ন করা এবং তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গ্রন্থরচনা ও জ্ঞান-প্রচারে নিজেদের নিযুক্ত করা।

Physics নামক বিজ্ঞানশাস্ত্রে আমরা nature-সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকি। Nature এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি? Nature বলিলে যে যে অর্থ আমাদের মনে উদয় হয়, আমাদের ভাষায় "প্রকৃতি" শব্দটী সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এই স্থানে দার্শনিকগণ আসিয়া আপত্তি তুলিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ প্রকৃতি বলিলে সাঙ্খ্যদর্শনের প্রকৃতি আমাদের মনে হয় না, আমাদের natureই মনে হয়। অতএব natureএর অন্য কোন ভাল প্রতিশব্দ আমার মনে না আসায়, "প্রকৃতি"ই natureএর জন্য স্থির করিয়াছি। তাহা হইলে Physicsকে "প্রকৃতিবিজ্ঞান" বলা যাইতে পারে। Physicsএর জন্য পদার্থবিদ্যা, পদার্থদর্শন, ভূতবিদ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সেই স্থলে বোধ হয়, matterকে পদার্থ বা ভূত বলা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে matterকে জড়পদার্থ নাম দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য বলিতে পারেন যে, Physicsকে তাহা হইলে জড়পদার্থ-বিজ্ঞান বা জড়পদার্থবিদ্যা বলা হউক; কারণ, প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা এই জড়পদার্থ অবলম্বনেই ঘটিয়া থাকে। তথাপি এটাও ঠিক যে, Physicsএ আমরা কেবলমাত্র জড়পদার্থের গুণাবলী বুঝিয়াই ক্ষান্ত হই না, প্রকৃতিতে যাহা কিছু ঘটনা ঘটে, সমস্তই বুঝিবার চেষ্টা করি, যে শক্তি (energy)-বলে ঘটনাগুলি ঘটিতেছে, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর আলোচনা করি। এই সকল কারণে প্রকৃতিবিজ্ঞান কথাটি ভাল লাগিতেছে।

বাহুল্য-ভয়ে প্রত্যেক শব্দের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া, নিম্নে শব্দগুলির তালিকা দেওয়া গেল।

পারিভাষিক শব্দের তালিকা

(General Physics and Acoustics)

A

Acceleration—বেগোপচয়।

— angular—কৌণিক বেগোপচয়।

Acoustics—নাদবিজ্ঞান।

Action—ক্রিয়া।

Adhesion—সংসক্তি।

Adiabatic—নিত্যতাপাবস্থা।

Aeroplane—সপক্ষ বিমান।

—Plane of the—পক্ষ।

—Monoplane—একপক্ষ বিমান।

—Biplane—দ্বিপক্ষ বিমান।

—Triplane—ত্রিপক্ষ বিমান।

Affinity—অনুরক্তি।

Airship—পোত-বিমান।

Amplitude (of a vibration)—প্রসার।
Analysis—বিশ্লেষণ।
Anti-clockwise—বামাবর্ত্ত।
Artesian well—আর্ত্তিয়স কূপ।
Atmosphere—বায়ুমণ্ডল।
Atmosphere, one—একগুণ বায়ুচাপ।
Atmospheric pressure—বায়ুচাপ।
Atom—পরমাণু।
Attraction—আকর্ষণ।
Axis (of a figure)—অক্ষ।
Axis (coordinate)—নিয়ামিকা।

B

Balance—তুলাযন্ত্র।
—Hydrostatic—গুরুত্বমাপক তুলাযন্ত্র।
—Spring—তুলাস্প্রীং।
Baloon—ব্যোমযান।
Barometer—বায়ুচাপমান।
Beats—তরঙ্গস্পন্দন বা স্বরস্পন্দন।
Body—মূর্ত্ত পদার্থ।
Bow (for the violin)—ছড়ি।
Breaker—তরঙ্গভঙ্গ।
Bridge (of a sonometer)—আড়ি।
Buoyancy—উৎপ্লাবকত্ব।

C

Capillarity—কৈশিকতা।
Capillary force—কৈশিকাকর্ষণ।
Centrifugal force—কেন্দ্রাপসারী বল।
Centripetal force—কেন্দ্রাভিমুখী বল।
Characteristic property—প্রকৃতি-নির্দ্দেশক গুণ।
Character (of a musical sound)—ভাব।
Circle—বৃত্ত।
Circle of reference (of an S. H. M.)—ছন্দোবদ্ধ গতিসম্বন্ধীয় বৃত্ত।
Circumference—পরিধি।
Clip—টিপকল।
Clockwise—দক্ষিণাবর্ত্ত।
Closed figure—বদ্ধ ক্ষেত্র।
Coefficient—নিত্যগুণক।
Cohesion—সংহতি।
Column—স্তম্ভ।
Commensurable—পরিমেয়।
Compound—যৌগিক পদার্থ।
Compressibility—সঙ্কোচ্যতা।
Condensation (the act of making dense)—ঘনকরণ।
Condensation (in a wave)—সঙ্কোচন।
Conjugate points—যুগবদ্ধ বিন্দুদ্বয়।
Conservation of energy—শক্তিসমষ্টির সনাতনতা।
Conservative system of forces—সনাতন বলসমবায়।
Constant—নিত্য।
Coordinates—স্থিতিনির্দ্দেশক রেখা।
Couples—বলযুগ্ম।
Crane—উত্তোলক।
Crest (of a wave)—তরঙ্গশীর্ষ।
Crovas' disc—ক্রোভার ডিস্ক্।
Crystal—শর্করা।
Cylinder—চোঙ্গ।

D

Density—ঘনতা।
Dial—ফলক।
Diffraction—ব্যাবর্ত্তন।

Diffusion—বিসর্পণ।
Dimensions—ব্যাপ্তিমান।
Direction (of a force)—দিক্।
Discover—আবিষ্কার করা।
Displacement—স্থানভ্রংশ।
Dissipation—অপসারণ।
Divisibility—বিভাজ্যতা।
Dry air—নির্জল বায়ু।
Ductility—তান্তবত্ব।
Dynamics—গতি-বিজ্ঞান।

E

Ear—কর্ণ।
Ear-drum—কর্ণপটহ।
Eccentric circles—অসমকেন্দ্রিক বৃত্ত।
Eccentric point—কেন্দ্রাতিচারী বিন্দু।
Eccentricity—কেন্দ্রাতিচরণ।
Echoe—প্রতিধ্বনি।
Efficiency (of a machine)—দক্ষতা।
Elasticity—স্থিতিস্থাপকতা।
—Modulus of—স্থিতিস্থাপকতার নিত্যগুণত্ব।
Electron—তড়িদণু।
Element—মূলভূত।
Endosmore—অন্তর্বাহ।
Energy—শক্তি।
—Potential—প্রচ্ছন্ন শক্তি।
—Kinetic—প্রকট শক্তি।
Equilibrium—সাম্য ভাব।
—Neutral—উদাসীন সাম্যভাব।
—Stable—স্থায়ী সাম্যভাব।
—Unstable—অস্থায়ী সাম্যভাব।

Ether—ব্যোম।
Exhausted—বিরলীকৃত ; নিঃশেষিত।
Exosmose—বহির্বাহ।
Experiment—পরীক্ষা।
Extension—ব্যাপকতা।

F

Filtration—নিস্রাবণ।
Fire-engine—দমকল।
Float—ভেলা।
Flask—ফ্লাস্ক।
Flexure—নমনীয়তা।
Foot bellows—পায়ে চালান হাপর ; ভস্ত্রা ; যাঁতা।
Force—বল।
—component—কারণ বল।
—external—বহির্বল।
—internal—অন্তর্বল।
—parallel—সমান্তর বল।
—centre of—সমান্তর বলকেন্দ্র।
—like—সমমুখ সমান্তর বল।
—unlike—বিপরীতমুখ সমান্তর বল।
—parallelogram of—বলসমান্তরিক।
—resolution of—বলবিশ্লেষণ।
—resolved—বিশ্লিষ্ট বল।
—resultant—সঙ্ঘাত বল।
—triangle of—বলত্রিভুজ।
Forced vibration—অনুরণন।
Frequency—কম্পনসংখ্যা।
Friction—ঘর্ষণ।
Fulcrum—অবলম্ব বিন্দু।

G

Gas—বাষ্প।

Graph—চিত্রলেখ।

Gravitation—মাধ্যাকর্ষণ।

Gravity—ভূমধ্যাকর্ষণ।

—centre of—ভারকেন্দ্র।

H

Handle—হাতল।

Hardness—কাঠিন্য।

Hare's apparatus—হেয়ার যন্ত্র।

Harmonic motion—ছন্দোবদ্ধ গতি।

—simple—সহজ ছন্দোবদ্ধ গতি।

Harmonies—সপ্তকান্তর ধ্বনি।

Helicopter—হেলিকপ্টার।

Hermetically fitted—দৃঢ়বদ্ধ।

Heterogeneous—বিষম ধর্ম্মাঙ্গ।

Homogeneous—সমধর্ম্মাঙ্গ।

Horizon—ক্ষিতিজ তল।

Horizontal—ক্ষিতিজ সমান্তরাল।

Horizontally—ক্ষিতিজ সমান্তরালে।

Horse power—অশ্বক্ষমতা।

Hydraulic tourniquest—বারিভ্রমী।

Hydraulic press—বারিচাপ যন্ত্র।

Hydrometer—ঘনতা-মাপক।

—constant immersion—নির্দ্দিষ্ট নিমজ্জনাংশ ঘনতা-মাপক।

—variable immersion—অনির্দ্দিষ্ট নিমজ্জনাংশ ঘনতা-মাপক।

Hydrostatics—দ্রবস্থিতিবিজ্ঞান।

I

Impact—অভিঘাত।

Impenetrability—অভেদ্যতা।

Impulse—নোদনা।

Impulsive force—হঠবল।

Incidence—আপতন।

Incident angle—আপতন কোণ।

Incident ray—আপতনশীল রশ্মি।

Inclination—অবনতি।

Inclined plane—ক্রমনিম্ন সমতল।

Index (as in the Aneroid barometer, galvanometer &c.)—কাঁটা।

Index (as in the optical bench)—চিহ্ন।

Inertia—জড়তা।

Initial position—আদি স্থান।

Interference—constructive—উপচায়ক অধিসন্নিবেশ।

—destructive—সংহারক অধিসন্নিবেশ।

Intermittent fountain—সবিরাম উৎস।

Intermolecular space—অণু-ব্যবধান।

Intersection—ছেদ।

Interval—অবসর।

Invent—উদ্ভাবন করা।

Isochronous—সমকালব্যাপী।

Isothermal—নিত্যোষ্ণতাবস্থা।

J

Jet—নির্ঝর।

L

Lactometer—ল্যাক্টোমিটার।

Law—নিয়ম; বিধি।

Level—সমতল; জলসমক্ষেত্র।

Lever—দণ্ডযন্ত্র।

—arms of—যন্ত্রের ভুজ।

—fulcrum of—দণ্ডযন্ত্রের অবলম্ব বিন্দু।

Limiting Value—চরম মান।

Limits of audibility—শ্রুতিশক্তির সীমা।
Line—রেখা।
—curved—বক্র রেখা।
—straight—সরল রেখা।
Liquid (adj.)—তরল ; দ্রব।
Liquid (noun)—দ্রব।
Loop (of a wire &c.)—বলয়।
Loop (as in a stationary wave) —চলক্ষেত্র।
Loudness (of a musical sound) —প্রবলতা।

M

Machine—যন্ত্র।
Malleability—ঘাতসহত্ব।
Manometre flame—সংস্ফোন্মুখ শিখা।
Mass—জড়মান।
Matter—জড় পদার্থ।
Mean position (e. g. of an S. H. M) —মধ্যবর্ত্তী স্থান।
Medium—বাহক।
Mixture—মিশ্র পদার্থ।
Molecule—অণু।
Moment—আবর্ত্তন প্রবণতা।
Momentum—সমগ্র বেগ।
Motion—গতি।
Mouth piece (of an organ pipe)—মুখ।
Musical scale—স্বরগ্রাম।
Musical sound—সুশ্রাব্য স্বর।

N

Natural phenomenon—প্রাকৃতিক ঘটনা।
Nature—প্রকৃতি।
Node (as in a stationary wave) —স্থির ক্ষেত্র।
Noise—কোলাহল।
Note—স্বর।

O

Observation—পর্য্যবেক্ষণ।
Organ pipe—শুষির।
—closed—বদ্ধ শুষির।
—open—মুক্ত শুষির।
Origin—উৎপত্তি-বিন্দু।
Oscillation—আন্দোলন।
—Centre of—আন্দোলন কেন্দ্র।
Osmose—প্রতিবাহ।

P

Parachute—প্যারাচুট।
Particle—কণা।
Pendulum—দোলক।
—bob of—দোলক ঝুল।
—Compound—স্থূল দোলক।
—length of—দোলক দৈর্ঘ্য।
—Simple—আদর্শ দোলক।
Period (of vibration)—কম্পনকাল।
Phase—দশা।
Phase difference—দশান্তর।
Phenomenon—ঘটনা।
Phonograph—ফনোগ্রাফ।
Physics—প্রকৃতি-বিজ্ঞান।
Pipette—নলিকা।
Piston—চাপদণ্ড।
Pitch—সুর।
Plumb line—ওলন।
Pneumatics—বাষ্প-বিজ্ঞান।

Point—বিন্দু।
—of application—প্রয়োগ-স্থল।
—of support—আশ্রয়-স্থল।
—of suspension—প্রলম্বন-স্থল।
Pores—অন্তর।
Porosity—সান্তরতা।
Position—অবস্থিতি।
Power—ক্ষমতা।
—Horse—অশ্ব-ক্ষমতা।
Pressure—চাপ।
—Centre of—চাপকেন্দ্র।
Principle—মত।
Projectile—ক্ষেপণী।
Projection—অধিক্ষেপণ।
Propeller—প্রচালক।
Pulley—কপিকল।
Pump—Air—বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্র।
—Receiver of—বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্রের আধার।
—Gauge—বায়ু নিষ্কাশন-মান।
—Common (suction)—জলশোষণ-যন্ত্র।
—Condensing—বায়ুপূরণ-যন্ত্র।
—Force—জলোৎক্ষেপণ-যন্ত্র।

Q

Quality (of a musical sound)—ভাব।

R

Rack and pinion—র‍্যাক ও পিনিয়ন।
Radian—সমত্রিজ্যা কোণ।
Rarefaction (of goses)—বিরলতাপাদন।
Rarefaction (in a wave)—প্রসারণ।
Rate—হার।
Ratio—অনুপাত।
Reaction—প্রতিক্রিয়া।
Reed—জিহ্বা; পাতা।
Reed instrument—সজিহ্ব শুষির।
Reflected angle—প্রতিফলিত কোণ।
Reflected ray—প্রতিফলিত রশ্মি।
Reflection—প্রতিফলন।
Refracted angle—বিবর্তিত কোণ।
Refracted ray—বিবর্তিত রশ্মি।
Refraction—বিবর্তন।
Repulsion—বিপ্রকর্ষণ।
Resistance—বাধা।
Resolution—বিশ্লেষণ।
Resonance—সহজানুরণন।
Resonator—সহজানুরণক।
Rest—বিরাম।
—Absolute—নিরপেক্ষ বিরাম।
—Relative—সাপেক্ষ বিরাম।
Retardation—প্রতিবন্ধ বেগ।
—Angular—প্রতিবন্ধ কৌণিক বেগ।
Rigid body—দৃঢ় বস্তু।

S

Savart's Toothed Wheel—সাভার্টের দণ্ডচক্র।
Scale—মানদণ্ড; মাপকাঠি।
Scale (of measurement)—মানধারা।
Scale (musical) স্বরগ্রাম।
Screw—ইস্কুপ, স্ক্রু।
Screw (machine) স্ক্রু-যন্ত্র।
Section—ছেদ।
—Cross—অনুপ্রস্থ ছেদ।
—Longitudinal—অনুদৈর্ঘ্য ছেদ।
—Oblique—তির্য্যক্ ছেদ।

Sensitive flame— সংবেদী শিখা।

Shadow—ছায়া।

Shape—আকার।

Siphon—বক্রনালী।

Soap-film—সাবানের ঝিল্লি।

Solid—কঠিন।

Sonometer—তারযন্ত্র।

Sound—শব্দ; নাদবিজ্ঞান।

Space—অনন্তাকাশ।

Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব।

Specific gravity bottle—আপেক্ষিক গুরুত্বমাপক শিশি।

Speed counter—বেগমান।

Sphere গোলক

Spiral (like the watch spring)—কুণ্ডলী।

Spiral (solenoidal)—বেষ্টনী।

Spring—(fountain)—উৎস।

Spring (the elastic body)—স্প্রীং।

Standard—আদর্শ।

Statics—স্থিতিবিজ্ঞান।

Stationary wave—অপরিবর্তনশীল তরঙ্গ।

Steelyard—তুলাদণ্ড (তুলপাড়ি)।

Stop cock—কলছিপি।

Stratum—স্তর।

Suction—শোষণ।

Surface—তল; পৃষ্ঠ।

—Area of a body—কোন বস্তুর বহিস্তল।

—Curved—বক্রতল।

—Plane—সমতল।

Superposition (of waves)—অধিসন্নিবেশ।

Syren (Cagniard dela Rive's)—সাইরেন।

Syren (Seebeck's)—জেবেকের সাইরেন।

Syringe.—পিচকারী।

T

Tenacity—সংগ্রাহকতা।

Tension—টান।

Theory—বাদ।

Timber (of a musical sound)—ভাব।

Tone—ধ্বনি।

—Fundamental—স্ফুট ধ্বনি।

—Upper partial—উপধ্বনি।

Torsion—মোটন (মোচড়ান)।

Transmissibility (of pressure)—চাপ-সঞ্চালন।

Trough (of a wave)—তরঙ্গপাদ।

Tuning fork—(সুর মিলাইবার) দ্বিশাখ যন্ত্র।

U

Unison—সুরের মিল।

Unit—একক।

—Absolute—নিরপেক্ষ একক।

Vacuum—শূন্য দেশ।

Valve—কপাট।

Vapour—বাষ্প।

Velocity—বেগ।

—Uniform—সমবেগ।

—Varied—বিষম বেগ।

—Angular—কৌণিক বেগ।

Uniform—কৌণিক সমবেগ।

Varied—কৌণিক বিষম বেগ।

Rectilinear—সরলরৈখিক বেগ।

Vernier—বর্ণিয়ার যন্ত্র।

Vertical—লম্ব।

—Angle—উন্নতি।

—Plane—লম্বতল।

Vibration—কম্পন।

Vibroscope—ভাইব্রোস্কোপ।

Viscosity—আঠাসতা।

Volume—আয়তন।

Water mill—জলচক্র।

Wave—তরঙ্গ।

—Form curve—তরঙ্গ-রেখা।

—Front—তরঙ্গাগ্র।

—Length—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য।

—Longitudinal—আনুমার্গিক তরঙ্গ।

—Machine—তরঙ্গ প্রদর্শক যন্ত্র।

—Transverse—আনুপার্শ্বিক তরঙ্গ।

Weather glass or Wheel barometer —আবহাওয়া ঘড়ি।

Weight—ভার।

Weight—বাটখরা।

Well—কূপ।

—Artesian—আর্তেষন্ কূপ।

Wedge—কীলক যন্ত্র।

Wheel and axle—অক্ষচক্র যন্ত্র।

Wind refraction—বায়ুপ্রবাহজ বিবর্তন।

Work—কর্ম্ম।

Zeppelin—জেপলিন নামক পোতবিমান।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

আসামের নানা কথা *

১। জনার্দ্দন-মূর্ত্তি

গৌহাটি শহরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে শুক্রেশ্বর মহাদেবের ও জনার্দ্দন নারায়ণের মন্দিরদ্বয় যে শৈলভূমির উপরে অবস্থিত, তাহারই গাত্রে এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা যে কোন্ যুগে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত, কেহই বলিতে পারে না। পদ্মাসন-মূর্ত্তিটির উচ্চতা পুরুষ-প্রমাণ হইবে—হাতচারিটির একখানির অগ্রহস্ত চক্রসহ ভাঙ্গিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর—অঙ্গসৌষ্ঠব প্রশংসনীয়। পাহাড় কাটিয়া যে শিল্পী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার ভাস্কর্য্য অতিশয় প্রশংসার্হ। এই মূর্ত্তির স্থানীয় নাম 'জনার্দ্দন'। উপরে মন্দিরের মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত আর একটি মূর্ত্তি আছে, তাহাও জনার্দ্দনমূর্ত্তি বলিয়া খ্যাপিত।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভোট্ দেশের বৌদ্ধেরা আসিয়া কামাখ্যা প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে না গেলেও, এই মূর্ত্তির সাক্ষাতে গিয়া বন্দনাদি করিয়া থাকে।[১] সাহেবেরা তাই ইহাকে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিতেন। ডাঃ ব্লক্ আসিয়া ইহা যে বিষ্ণু-মূর্ত্তি, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যান—তাই এখন ঐ সুর ফিরিয়াছে। গেইট্ সাহেবের ইতিহাসেও ইহা এখন জনার্দ্দনের মূর্ত্তি বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই মূর্ত্তির আশে পাশে যাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে, তৎপ্রতি এ যাবৎ কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই।

যে পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া জনার্দ্দনের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতেই জনার্দ্দনের ডানদিকে ও বামদিকে আবার কতকগুলি ক্ষোদিত দেবমূর্ত্তি আছেন। ডানদিকে প্রথম গণেশ, তৎপর সূর্য্যদেব রহিয়াছেন। তাঁহাদের মূর্ত্তি—জনার্দ্দনের তুলনায় তত বড় না হইলেও, নেহাৎ ক্ষুদ্র নহেন। সূর্য্যের পায়ে উপানৎ রহিয়াছে। তার পরে জনার্দ্দনের বামে মহাদেব এবং তৎপরে পার্ব্বতী, সর্ব্বশেষ দেবীর বাহন—সিংহ অঙ্কিত হইয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, গণেশাদি পঞ্চ দেবতা এই স্থানে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন।

এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবের কোনওরূপ প্রভেদ ছিল না—এখনও নাই। মহাপুরুষীয়ারা বাঙ্গালার বৈরাগীদের ন্যায় শক্তিপূজার বিরোধী বটে, কিন্তু এই

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৯ বঙ্গাব্দের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। যোগিনীতন্ত্রে আছে,—"জনার্দ্দনঞ্চ দেবেশং রূপো বৌদ্ধস্বরূপিণং।

তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাপৈর্ম্মহাঘোরৈঃ সুদারুণৈঃ।"—২য় ভাগ, ৫ম পটল।

— ভোটিয়ারা গৌহাটি হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী 'হাজো' নামক স্থানে হয়গ্রীব মাধবের কাছেও গিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকে। বুদ্ধ বিষ্ণুরই অবতার—তাই বৌদ্ধ হইয়াও, ইহার এই দুই স্থলে, বিষ্ণুর রূপভেদ বলিয়াই বোধ হয়, পূজা করিয়া থাকে।

দলের মধ্যে ব্রাহ্মণ নাই বলিলেই হয়। 'হরিহর' এখানে প্রকৃতই একাত্মভাবে বিরাজমান— তাই শিবলিঙ্গ প্রণাম করাইতে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র পড়ান,—

"শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে।
অনাদিজগদীশায় নমো হরিহরাত্মনে॥

২। মোসলমানের আসাম আক্রমণের তারিখ

গৌহাটির উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে যে নগর অবস্থিত, তাহার নাম উত্তর-গৌহাটি। এই নগরের নিকটে একটা পর্ব্বতের গাত্রে কিছু দিন হইল, একটি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লিপিটি এই,—

"শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাসত্রয়োদশে।
কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কাঃ ক্ষয়মাযযুঃ॥

তুরগ=৭, যুগ্ম=২, ঈশ (রুদ্র)=১১; অতএব ১১২৭ শাকের ১৩ই চৈত্র তুরুষ্কেরা অর্থাৎ মোসলমানগণ কামরূপে আসিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইল। ঐ তারিখটি ইংরেজী ১৩০৬ অব্দের ২৬শে মার্চ্চ (কি একদিন অগ্রপশ্চাৎ) হইতে পারে।

ইহা দ্বারা অনেক ঐতিহাসিক তথ্য মীমাংসিত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করি। মোসলমান-দিগকে পূর্ব্ববঙ্গেও 'তুরুক্' বলিয়া থাকে; আসামেও প্রাচীনকালে ঐ নামই ছিল। এখন উহাদিগকে অসমীয়ারা 'গরীয়া' বলে—ইদানীন্তন মোসলমানগণ 'গৌড়'দেশ হইতেই প্রধানতঃ আসামে উপনিবিষ্ট হইয়াছে।

৩। চন্দ্রভারতির মণ্ডপ

উত্তর-গৌহাটির পূর্ব্বাংশে ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে যেস্থানে একটি সরকারী বাঙ্গলা-ঘর আছে, তাহারই কাছে একটি শিলালিপি দেখা যায়; সেইটি এই,—

"শীতে তরণিতাপেন গ্রীষ্মে লোহিত্যবায়ুনা।
সুখদোঽখিললোকানাং মণ্ডপশ্চন্দ্রভারতেঃ॥"

এই স্থানে 'চন্দ্রভারতি' নামক একজন কবি থাকিতেন। তিনি একটি মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া ঐ শিলালিপি যুড়িয়া দিয়াছিলেন; মণ্ডপের কোনও চিহ্ন নাই—লিপিটি মাত্র তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তাঁহার যে কবিজনোচিত রুচি ছিল, এই মণ্ডপের স্থাননির্ব্বাচনেই তাহার প্রকাশ পাইতেছে। 'চন্দ্রভারতি' ঠিক নাম নহে—নাম হরিচরণ। 'চন্দ্রভারতি' ও 'অনন্তকন্দলী' এই হরিচরণেরই উপাধি। আসামের প্রাত্নিকবর্য্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের এই মত। অনন্তকন্দলী আসামের 'কৃত্তিবাস'। তাঁহার রামায়ণ হইতে রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' অনেক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪। তেজপুরের নিকটস্থ গিরিগাত্রলিপি

তেজপুর শহর ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে অবস্থিত। এই শহরের মাইলখানিক ভাটিতে ব্রহ্মপুত্রের কিনারায় একটা পাহাড়ের গায়ে একটি ক্ষোদিত লিপি রহিয়াছে, তাহা এপর্য্যন্ত ভালরূপে পড়া হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে সর্ব্বশেষ গুপ্তাব্দ ৫১০ এবং মহারাজাধিরাজ হর্জ্জরের নাম ঠিকই পড়া গিয়াছে। ৫১০ গুপ্তাব্দে ৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়—তখন রাজা হর্জ্জর কামরূপের অধিপতি ছিলেন। এটা এই লিপি হইতে জানা যায়[১]।

এই লিপির ছাপ বঙ্গের প্রাচ্চিকশিরোমণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকটে পাঠার্থে প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি কথমপি ইহা পাঠ করিয়াছেন—কিন্তু লেখার অস্পষ্টতানিবন্ধন পাঠ সম্পূর্ণ প্রমাদশূন্য মনে করা যায় না। যাহা হউক, লিপিতে নাকি 'লাহরি' শব্দটি দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় ইহা 'লাহিড়ী' মনে করিয়াছেন। বঙ্গে সমানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজনের বারেন্দ্র-বংশীয়েরা 'লাহিড়ী' উপাধিধারী। ঐ ব্রাহ্মণগণ কোন্ সময়ে যে বঙ্গে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, অষ্টম শতাব্দীতে; কেহ বলেন, একাদশ শতাব্দীতে। অষ্টম শতাব্দীতেও যদি হয়, তথাপি এই লিপির সময়ে (৮২৯ অব্দে) 'লাহিড়ী'দের অস্তিত্ব থাকিলেও, কিরূপ ছিল—আসাম অঞ্চলে কোনও দিন কোনও লাহিড়ী (ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে) আসিয়াছিলেন কিনা, ইত্যাদি বিবেচনাপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল। অসমীয়া ভাষায় 'লাহরি' শব্দ আছে। ইহার অর্থ "প্রিয়তম"। প্রণয়িনীকে এই শব্দে সম্বোধন করা হয়। ইহা ব্যক্তিবিশেষের নাম হইতে কোনও বাধা নাই—'প্রাণনাথ', 'প্রিয়নাথ' নামও তো আছে।

এরূপ বিষয়ে একটু স্থানীয় তদন্ত করিলে ভাল হয়, ঈদৃশ ভ্রান্তির প্রতীকার হয়। ১৮৮০ অব্দে[২] ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র শ্রীহট্ট-ভাটেরার তাম্রশাসনে 'হল' শব্দ পাইয়া বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিলেন, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলেন না। কিন্তু শ্রীহট্টের যে কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে 'হল'-পরিমিত ভূমির মাপ বলিয়া দিতে পারিত।

৫। ৺কামাখ্যায় অদ্ভুত লিপি

৺কামাখ্যা-মন্দিরের চৌদেওয়ারির ভিতরে পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার সময়ে ডান দিকে নিরীক্ষণ করিলে ভূপতিত একখানা প্রস্তরে এক অদ্ভুত রকমের লেখা (?) দেখা যায়। কামাখ্যা-মন্দিরের চারি দিকেই ইতস্ততঃ যে সকল প্রস্তর দেখা যায়, সেগুলি ৺দেবীর প্রাচীনতম মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইবে; এরূপ প্রবাদ যে, পুরাণপ্রথিত নরকাসুর কর্ত্তৃক ৺কামাখ্যা দেবীর মন্দির সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত হয়। এই প্রবাদ বহু প্রাচীনত্বেরই সূচক এবং এই অক্ষরও বোধ হয়,

১। হর্জ্জর সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে "প্রাচীন কামরূপ-রাজমালা" প্রবন্ধ পঠিতব্য। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২০—৩য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

২। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, August, 1880 দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন মন্দিরের সংস্পৃষ্ট কোনও লিপি হইতে পারে। লিপিবিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ এবিষয়ে তথ্যনির্ণয় করিতে পারেন।

৬। আহোমরাজমুদ্রা

স্তম্ভলিপি ও গিরিগাত্রলিপি সরাইয়া লইয়া যাইবার জিনিস নহে। অতএব যে স্থানে পাওয়া যায়, সেই স্থানেরই কোনও ঘটনার বর্ণনা ইহাতে আছে—এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। খণ্ড প্রস্তরলিপি বা মূর্ত্তির পাদপীঠলিপি স্থানান্তরিত হইতে পারে[১], তাই সাবধানে ঐরূপ লিপিরও আলোচনা করিতে হয়। তাম্রশাসন, প্রাচীন পুথি ও মুদ্রার তো কথাই নাই। এগুলি অনায়াসে বহু দূরদূরান্তরে নীত হইতে পারে।

বীরভূম-বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় একটি মুদ্রার কথা আছে—১৩৩ পৃষ্ঠার সম্মুখে ঐ মুদ্রার ছবিও আছে। ইহা আসামরাজ গৌরীনাথ সিংহের মুদ্রা। শ্রীশ্রীহরগৌরীচরণপরস্য শ্রীশ্রীগৌরীনাথসিংহনৃপস্য— মুদ্রায় এই লিপি পড়িয়া গ্রন্থকার ঐ রাজার কোনও সন্ধান না পাইয়া বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। ইনি বড় বেশী দিনের রাজা নহেন—রাজত্বকাল ১৭৮০—১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। গদাধর সিংহ (জয়মতীর স্বামী) হইতে সকল আহোমরাজই অবিচ্ছেদে 'সিংহ' উপাধি ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মুদ্রার বিশেষত্ব এই যে, এইগুলির আকৃতি অষ্টকোণ। আহোমগণ যে ভূভাগে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহার পৌরাণিক নাম "সৌমার"। এই সৌমার-খণ্ড অষ্টকোণাকৃতি[২], তাই মুদ্রাও অষ্ট-কোণাকারে নির্ম্মিত হইত।

৭। আসামের পত্র-পত্রিকা (অবশিষ্ট)

আজ পাঁচ বৎসর হইল, পরিষদে "আসামের পত্র-পত্রিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল। পরিষৎ-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছে। তখনকার তালিকার এখন কিঞ্চিৎ সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছে।

১। 'আসাম রায়ত'—ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র; ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ গোসাই ছিলেন। অতি অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল।

২। 'অসমীয়া'—১৮৯৮ অব্দে মাসিকপত্ররূপে প্রচারিত হয়। তাহাও অল্পকালমাত্র চলিয়াছিল।

নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি সম্প্রতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে: 'আলোচনী', 'আসাম-বান্ধব', 'অরুণ'।

বিগত পাঁচ বৎসর-মধ্যে যে সকল নূতন পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের বিবরণও এস্থলে প্রদত্ত হইল,—

১। 'প্রভাত'—শিক্ষাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র—যোড়হাট নর্ম্মাল স্কুলের প্রধানশিক্ষক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী বি এ, বি টি কর্তৃক সম্পাদিত। অসমীয়া ভাষায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাবিষয়ক

১। সে দিন ত্রিপুরা-চণ্ডীমেলায় একটী মূর্ত্তি (লিপিযুক্ত পাদপীঠসহ) অপহৃত হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্য-বশতঃ ঐ লিপিটি পূর্ব্বেই পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল।

২। অষ্টকোণঞ্চ সৌমারং যত্র দিক্করবাসিনী।—যোগিনী-তন্ত্র, ২য় ভাগ, ১ম পটল।

পত্র। শরৎ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—এই চারি সংখ্যা সংবৎসর মধ্যে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৯ শকাব্দার ভাদ্র মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় আসামের ডিরেক্টার অনারেবেল মিঃ জে. আর কনিংহাম বাহাদুর ইংরেজীতে "ফোরওয়ার্ড" (Foreword) লিখিয়া পত্রের সম্মাননা করিয়াছেন।

২। 'অসমীয়া'—ইহা ১৯১৮ ইংরেজী ২৮শে আগষ্ট হইতে অসমীয়া ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ঐ দিন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অন্যতর প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মাধব দেবের মৃত্যু-তিথি ছিল।

৩। 'চেতনা'—১৩২৬ অব্দের ভাদ্র মাস হইতে মাসিক আকারে গৌহাটি শহর হইতে অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদক শ্রীযুত চন্দ্রনাথ শর্ম্মা বি এ, বি এল্ এবং শ্রীযুত অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী।

৪। 'অসমপ্রদীপিকা'—ধর্ম্মবিষয়ক অসমীয়া মাসিক পত্রিকা—সম্পাদক শ্রীযুত রজনীকান্ত বরদলই বি. এ অবসরপ্রাপ্ত একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট্ কমিশনার। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ হইতে চলিতেছে। সম্পাদক—একজন খ্যাতনামা অসমীয়া সাহিত্যিক। *

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

—০—

* বর্ত্তমান প্রবন্ধটী প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইতঃপরেও আরো এক দুইখানি পত্রিকার উদ্ভব ও বিলয় হইয়া থাকিতে পারে—পত্রিকাধ্যক্ষ।

চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা *

আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই বৎসরের প্রথম মাসিক অধিবেশনে 'আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। অদ্য আবার 'চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা' সংকলন করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তড়িদ্‌বিজ্ঞানের পরিভাষা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটী শাখায় ১৩১৯ সালের চতুর্থ অধিবেশনে পাঠ করেন।[১] তিনি তাঁহার প্রবন্ধে তড়িদ্ বিজ্ঞানের তাৎকালিক প্রচলিত পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া ও তৎসঙ্গে নিজে কতকগুলি নূতন পরিভাষা গঠন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, সেই প্রবন্ধের পর আর কেহই বাঙ্গালায় এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন নাই। এতদ্ব্যতীত 'নাগরীপ্রচারিণী সভা' হইতে প্রকাশিত "ভৌতিক পরিভাষা"ও বরোদা হইতে প্রকাশিত 'শ্রীসয়াজী শব্দসংগ্রহ' নামক পুস্তিকাদ্বয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে।

আমি প্রধানতঃ উপরোক্ত প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদ্বয় হইতে অধিকাংশ শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি। অধিকন্তু আরও কতকগুলি নূতন পারিভাষিক শব্দ রচনা করিয়া এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পরিভাষা সঙ্কলন করিবার সময় যে পরিভাষাগুলি আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ রচনা করিয়াছি বা ঐ পরিভাষাগুলিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছি। আবার যেখানে একাধিক পরিভাষা পাওয়া গিয়াছে, সেখানে যেটি আমার নিকট সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

Cell (voltaic):—ইহার পরিভাষা 'তাড়িত-কোষ' 'বিদ্যুৎকোষ' ও 'প্রবাহ-কোষ', করা হইয়াছে।[২] কিন্তু জীব-বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলিতে Physiological cellএর পরিভাষা 'কোষ' পাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'কোষ'কে 'voltaic cell'এর পরিভাষা করিলে চলিবে না। নূতন পরিভাষা রচনা করিতে হইবে। 'voltaic cell'এর পরিভাষা 'তড়িদ্ভাণ্ড' করিয়াছি।

Couple:—Couple দুইটি বলের সমষ্টিবাচক শব্দ (Collective term)। আমরা সংস্কৃত ভাষায় যুগ্ম, যুগল, যমক ও যমল শব্দগুলি 'দুই'এর সমষ্টিবাচক শব্দরূপে পাই। 'হিন্দী গণিত কী পরিভাষা' পুস্তিকায় 'যুগল' শব্দ coupleএর পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালায় 'যুগল' শব্দটি অতি সাধারণ। সুতরাং এই শব্দটি দুইটি বলের সমষ্টিবাচক একটি বাঁধাবাঁধি নির্দ্দিষ্ট অর্থে গ্রহণ করা চলে না। 'যুগ্ম' ও 'যমক' শব্দগুলির সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। কিন্তু 'যমল' শব্দটী বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত শব্দ নহে। সেইজন্য আমি 'যমল' 'couple'এর পরিভাষারূপে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী।

---

*। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

১। এই প্রবন্ধ সন ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

Electron :—'Electron'এর পরিভাষা শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় 'অতিপরমাণু' ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'তাড়িতবিন্দু' ও 'তাড়িতাণু' করিয়াছেন। 'Electron'কে যদি 'অতিপরমাণু', 'তাড়িতবিন্দু' বা 'তাড়িতাণু' করা যায়, তাহা হইলে 'Proton'কে কি বলা হইবে? 'Proton'ও কি 'অতিপরমাণু', 'তাড়িতবিন্দু' বা 'তাড়িতাণু' নয়? অতএব দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত শব্দত্রয়ের কোনটিই দোষহীন পরিভাষা নহে। আমি 'electron' ও 'proton'কে অক্ষরান্তরিত করিয়া 'ইলেক্ট্রন' ও 'প্রোটন' করিয়াছি।

Galvanometer, Galvanoscope, Electrometer ও Electroscope :—Galvanometer ও Electrometer যন্ত্রদ্বয়ই তড়িৎ মাপিবার যন্ত্রবিশেষ। একটি প্রবহমাণ বা ভোলটীয় তড়িৎ মাপিবার যন্ত্র ও অপরটি অচল তড়িৎ মাপিবার যন্ত্র। কিন্তু যন্ত্র দুইটি এক-জাতীয় নহে। এই Galvanometerএর পরিভাষা 'তড়িন্মান' করিয়া Electrometerএর পরিভাষা 'বিদ্যুন্মান' করিয়াছি। আর Calvanoscope ও Electroscopeএর পরিভাষা যথাক্রমে 'তড়িদ্বীক্ষণ' ও 'বিদ্যুদ্বীক্ষণ' করিয়াছি।

Ion, Anion ও Kation :—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় Ion, Anion ও Kation এর পরিভাষা যথাক্রমে 'কণা', 'সুকণা' ও 'কুকণা' করিয়াছেন। আমরা জড়পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্রাংশকে 'কণা' বা 'কণিকা' বলিয়া থাকি। যেমন তণ্ডুলকণা, রক্তকণা ইত্যাদি। অতএব Ion, Anion ও Kation এর জন্য নূতন পরিভাষা রচনা করা আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষায় 'কণ', 'কণা', 'কণিকা', 'কণী' প্রভৃতি শব্দগুলি ক্ষুদ্রার্থবোধক। 'কণা' ও 'কণিকা' শব্দ দ্বয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের ক্ষুদ্রাংশার্থে নিয়োগ করিয়া 'কণ', 'সুকণ' ও 'কুকণ' শব্দত্রয়কে যথাক্রমে Ion, Anion ও Kation এর পারিভাষিক শব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

Battery :—'নাগরী-প্রচারিণী' সভা হইতে প্রকাশিত 'ভৌতিক পরিভাষা'য় বিদ্যুদ্ঘটমালা' ও 'ব্যাটরি' Battery র পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমরেশ চক্রবর্তী 'প্রবাহভাণ্ডার' Batteryর পরিভাষা করিয়াছেন[১]। Batteryর পরিভাষা 'প্রবাহভাণ্ডার' করা চলে না। 'প্রবাহ-ভাণ্ডার' বলিলে accumulaled or voltaic cellও বুঝা যাইতে পারে। আমি Batteryর পরিভাষা 'ব্যাটারি'ই করিতে চাই।

'বিদ্যুদ্ঘটমালা', 'তড়িদ্ঘটমালা' প্রভৃতি শব্দগুলি আকৃতিগত-বর্ণনামূলক পরিভাষা-হিসাবে অতিসুন্দর। শব্দগুলি 'পুষ্পমালা' শব্দের সাদৃশ্যে রচিত হইয়াছে। 'পুষ্পমালা'য় যেরূপ সংযোজক সূত্র থাকে, এখানে ব্যাটারিতেও সেইরূপ সংযোজক তার থাকে[২]। কিন্তু 'ব্যাটারি'শব্দটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও সুখপাঠ্য হওয়ায়, আমি 'ব্যাটারি' শব্দটি গ্রহণ করিয়াছি, তবে বর্ণনামূলক প্রতিশব্দ হিসাবে 'বিদ্যুদ্ঘটমালা' ও 'তড়িদ্ঘটমালা' শব্দদ্বয়কে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

২। অবান্তর হইলেও এখানে একটি কথা বলিতেছি। স্থাপত্য-বিদ্যায় আমরা colonnade শব্দটি পাই। তাহার পরিভাষা 'পুষ্পমালা'র সাদৃশ্যে 'স্তম্ভমালা' করা যাইতে পারে।

যে সকল প্রবন্ধ বা পুস্তক হইতে পরিভাষাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে বা যে সকল পুস্তকের সহায়তায় পরিভাষাগুলি গঠিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা প্রবন্ধশেষে দিয়াছি।

নিম্নে সঙ্কলিত পরিভাষার তালিকা দেওয়া গেল। যে পরিভাষাগুলি আমি গঠন করিয়াছি, তাহার পার্শ্বে তারকা-চিহ্ন দিয়াছি।

A

Accumulator—সঞ্চায়ক।
Action—ক্রিয়া।
—, local—স্থানীয় ক্রিয়া।
—, secondary—গৌণক্রিয়া।
Agonic line—অকৌণিক রেখা।
Amalgam—রসক।
Ammeter—আঁপেরমান।*
Ampere—আঁপের।
Amber—তৃণমণি।
Analogy—উপমান।
Anion—সুকণ।*
Anode—এনোড বা সুদ্বার।
Armature—বর্ম্মাভাস।*
Astatic—মেরুমুখিতাহীন।*
Attraction—আকর্ষণ।
Aurora Polaris—মেরুজ্যোতি।
Axis—অক্ষ।

B

Battery—ব্যাটারি বা তড়িদ্ভাণ্ডমালা।
Branch—শাখা।
Bridge—সেতু।
—, meter—মিটার-সেতু।
—, wheatstone—হুইটষ্টোন সেতু।
Brush—বুরুষ।
Bulb—কন্দ।

C

Cable (electrical)—তাড়িত রজ্জু।
—, submarine—সমুদ্রস্থ তাড়িতরজ্জু।
Capacity—ধৃতিমান।
Cell,—voltaic—তড়িদ্ভাণ্ড।
—, standard—আদর্শ তড়িদ্ভাণ্ড।*
—, storage—সঞ্চয়ভাণ্ড।
Cells in series—ক্রমবিন্যস্ত তড়িদ্ভাণ্ড-মালা।*
—in parallel—সমান্তরবিন্যস্ত তড়িদ্-ভাণ্ডমালা।*
—in multiple arc—মিশ্রবিন্যস্ত তড়িদ্ভাণ্ডমালা।*
Circuit—কুণ্ডলী।
—, Branch—শাখাকুণ্ডলী।
—, external—বহিঃকুণ্ডলী।
—, internal—অন্তঃকুণ্ডলী।
—, open—মুক্তকুণ্ডলী।
—, closed—যুক্তকুণ্ডলী।
Commutator—পরিবর্ত্তক।*
Condenser—সংহতিযন্ত্র।
Coherer—সমবায়ী গ্রাহক।
Coil—গুটি।
—, resistance—প্রতিরোধ গুটি।
—, induction—প্রবর্ত্তন গুটি।
—, primary—প্রধান গুটি।
—, secondary—অপ্রধান গুটি।

Conduction—পরিচালন।

Conductivity—পরিচালনশীলতা।*

Conductor—পরিচালক।

—, good—সুপরিচালক।*

—, bad—কুপরিচালক।*

Cleavage—ভেদ।

Connecting screw—সংযোজক স্ক্রু।*

Contact stud—স্পর্শবোতাম।*

Couloumb—কুলম্ব।

Couple—যমল।*

Current—প্রবাহ।

—, eddy (Foucoult)—আবর্ত্তন-প্রবাহ, ফুকো প্রবাহ।

—, induced—প্রবর্ত্তিত প্রবাহ।

—, valtaic—ভোল্টীয় তড়িৎ।

—, alternating—পরিবর্ত্তিত প্রবাহ।*

Current elecrtity—প্রবহমান তড়িৎ।

Compound—যৌগিক পদার্থ।

D

Defleetion—ক্ষেপ।

Decilnation—চৌম্বক বলন।

Dielectric—অজ্ঞম।

—constant—অজ্ঞনাঙ্ক।

—current—অজ্ঞন-প্রবাহ।

Diamagnetic—বিষমচুম্বকধর্ম্মী।*

Dip (or inclination)—নতিকোণ।

—, line of—নতিরেখা।

—, circle—নতিবৃত্ত।

Discharge (electric)—বিদ্যুৎক্ষরণ।

—, slow—মন্থর ক্ষরণ।

—, spark—স্ফুলিঙ্গক্ষরণ।

—, brush—ধারাক্ষরণ।

Dynamo—ডাইনামো।

Dyne—ডাইন।

E

Electric field—বিদ্যুৎক্ষেত্র।

—machine—বিদ্যুৎযন্ত্র।

Electricity—তড়িৎ।

—, frictional—ঘর্ষণজ তড়িৎ।

—, Statical—অচল তড়িৎ।

—, Voltaic—ভোল্টীয় তাড়িৎ।

Electrolysis—তড়িদ্‌বিশ্লেষণ।

Electrolyte—তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য।

Electrove—তড়িদ্দ্বার।

Electromotive Force—বিদ্যুৎপ্রবাহক বল।

Electronegative—তড়িদ্‌-ঋণাত্মক।*

Electropositive—তড়িদ্ধনাত্মক।*

Electromagnetism—তড়িদ্‌-চুম্বকতা।*

Electron—ইলেক্ট্রন।

Electronic theory—ইলেক্ট্রনবাদ।*

Electro-engraving—তড়িন্মুদ্রণ।*

Electro-plating—তড়িদ্‌-রঞ্জন।

Electro-metallurgy—তড়িদ্‌-ধাতুবিদ্যা।*

Eletro-typing—তড়িদাঙ্কন।

Electrical charge—তড়িদাবেশ।*

Electrically charged—তড়িদাবিষ্ট।*

Emitter—প্রেরক।

Equipotential—সমপ্রভব।

Equivalent—প্রতিফল।*

—, chemical—রাসায়নিক প্রতিফল।*

—, electro chemical—তড়িদ্‌রাসায়নিক প্রতিফল।*

Element—মূলপদার্থ।

Elastic—স্থিতিস্থাপক।
Energy—শক্তি।
—, potential—স্থিতিশক্তি।
—, kinetic—গতিশক্তি।

F

Force—বল।
—, line of—বলরেখা।
Filament—তন্তু।*
—, carbon—অঙ্গারতন্তু।*
Fluid—সলিল।

G

Galvanometer—তড়িদ্মান।
—constant
—তড়িদ্মানাঙ্ক।*
—,fixed coil—আবদ্ধগুটি তড়িদ্মান।*
—,mirror—দর্পণতড়িদ্মান।*
—,moving coil
—চঞ্চলগুটি তড়িদ্মান।*
—,tangent
—স্পর্শিনী তড়িদ্মান।*
Galvanoscope—তড়িদ্বীক্ষণ।*
Galvano-thermometer
—তড়িৎ-তাপমান।*
Gas—গ্যাস।
Goldleaf Electroscope—সুবর্ণপত্র-বিদ্যুদ্বীক্ষণ।
Gradient—প্রবণতা।

H

Horse power—অশ্বক্ষমতা।

I

Induction—প্রবর্ত্তন।
—, mutual—দ্বৈতপ্রবর্ত্তন।
Inductance—প্রবর্ত্তনফল।
Inert—নিষ্ক্রিয়।*
Insulator—অপরিচালক।
Inverse ratio—বিপরীতানুপাত।*
Ion—কণ।*
Ionic theory—কণবাদ।*
Ionisation—কণীভবন।*
Isodynamic line—সমবল রেখা।*
Isogonic—সমকৌণিক রেখা।

K

Kation—কুকণ।*
Kathode—কেথোড বা কুদ্বার।
Keeper—চুম্বকতারক্ষক,
রক্ষক (সংক্ষেপে)
Key—তালী।*
—, plug—রোধনীতালী।*
—, push—তাড়নতালী।*
—, tapping—মৃদুতাড়নতালী।*

L

Law of inverse squares
—বিপরীতবর্গানুপাতিক নিয়ম।*
Leydengar—লিডেনভাণ্ড।
Lightening conductor
—বিদ্যুচ্চালক দণ্ড।*
Lodestone—অয়স্কান্ত।
Luminons tube—তেজোময় নল।*
Liquid—তরল।

M

Magnet—চুম্বক।
—, artificial—কৃত্রিম চুম্বক।
—, bar—চুম্বকদণ্ড।*
Magnetic needle—চুম্বকশলাকা।

Magnetic substance—চুম্বকধর্ম্মী পদার্থ।*

—strength—চুম্বক-প্রভাব।*

—chain—চৌম্বক শৃঙ্খল।*

Magnetometer, vibration —কম্পনশীল মেগনেটোমিটার।

Magnet, horseshoe—অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক

Magnetic field—চুম্বকক্ষেত্র।

—screen—চুম্বক-যবনিকা।

—meridian—চৌম্বক মধ্যরেখা।

Make & break—বন্ধন ও মোচন।

Mass—জড়মান।

Molecular rigidity—আণবিক দৃঢ়তা।*

Motor—মোটর।

—,electric—তাড়িত মোটর।

Magnetic storm—চুম্বক-ঝটিকা।

O

Ohm—ওম।

Ohm's law—ওমের নিয়ম।

Oscillation—স্পন্দন।

P

Paramagnetic—সমচুম্বকধর্ম্মী।

Permeability—(চৌম্বক) ভিদ্যতা।

Percussion—আঘাত।

Plane—সমতল।

—, inclined—প্রবণতল।

—, horizontal—ক্ষিতিজতল।

Plug—রোধনী। *

Pole (earth's)—মেরু।

—, magnetic—চুম্বক প্রান্ত।*

—, north (of earth)—উত্তর মেরু।

—, north (of a magnet)—উত্তরমুখী প্রান্ত।*

Pole, south (of earth)—দক্ষিণ মেরু।

—, south (of a magnet)—দক্ষিণমুখী প্রান্ত।*

—, consequent—আনুষঙ্গিক প্রান্ত *

Polarity—মেরুমুখিতা।*

—, north—উত্তরমুখিতা।*

—, south—দক্ষিণমুখিতা।*

—, positive—ধনপ্রান্ত।*

—, negative—ঋণপ্রান্ত।*

Polarisation of a cell—তাড়িতাণ্ডের বিকৃতি।

Potential—বিভব।

—, difference of—বিভবান্তর।

Power—ক্ষমতা।

Proton—প্রোটন।

Proportion—সমানানুপাত।

Q

Quadrant—বৃত্তপাদ।

Quadrant electrometer—পাদবিদ্যুন্মান।*

—, electroscope—পাদ-বিদ্যুদ্বীক্ষণ।*

Quantity—পরিমাণ

R

Resistance—রোধ।

—, specific—আপেক্ষিক রোধ।*

Resistivity—রোধশীলতা।

Reduction factor—সরল গুণনীয়ক।*

Rheostat—রিওষ্টাট।

Reel—কাটিম।

Ray—রশ্মি।

—,Röntgen—রঞ্জেন (রোণ্ট্‌গেন্) রশ্মি

Ray, α, β, γ = ক, খ, গ রশ্মি।
—, kathode—কুরশ্মি বা কেথোড রশ্মি।
Repulsion—বিকর্ষণ।
Relay—সহায়ক।
Retentivity—ধারণক্ষমতা।*
Receiver—গ্রাহক।
Response—সাড়া।
Regulator—শাসক।*
Rest—বিরাম।*

S

Saturation—পরিষেক।
—, magnetic—চৌম্বক পরিষেক।
Solenoid—সলিনয়েড।
Strength—প্রভাব।
Spiral—বেষ্টনী।
—, vibrating—কম্পনশীল বেষ্টনী।*
Shunt—পার্শ্ববর্ত্ম।*
Solution—দ্রব।
Solute—দ্রাব্য।
Solvent—দ্রাবক।
Surface—পৃষ্ঠ, তল।
Specific Inductive capacity—আপেক্ষিক প্রবর্ত্তন ক্ষম।
Solid—কঠিন।
Sunspot—সৌর কলঙ্ক।

T

Thermo-electricity—তাপ-তড়িৎ।
Table—সারণী।
—, Ampere's—আঁপেরের সারণী।
Tube of force—বল-নলিকা।
Tin—রঙ্গ, রাং।
—, foil—রঙ্গপত্র।
Theory—মতবাদ।

U

Unit—একক।

V

Voltaic pile—ভল্টীয় স্তূপ।*
Voltmeter—ভল্ট-মান।*
Valtameter—ভল্টামিটার।
Valency (valence)—মিলনাঙ্ক।

W

Work—কার্য্য।
Wire—তার।
—, telegraphic—তাড়িৎ বার্ত্তাবহ তার।
—, telephonic—টেলিফোঁর তার॥

গ্রন্থপঞ্জী

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—'তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা' নামক প্রবন্ধ।
২। 'নাগরী-প্রচারিণী সভা' কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ভৌতিক পরিভাষা'।
৩। 'নাগরী-প্রচারিণী সভা' কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'গণিত কী পরিভাষা'।
৪। শ্রীযুক্ত জয়সুখ রায় পুরুষোত্তম রায় জোষিপুরা ও শ্রীযুক্ত ভানুসুখরাম নির্গুণরাম মেহতা প্রণীত 'শ্রীসয়াজী বৈজ্ঞানিক শব্দ-সংগ্রহ'।
৫। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত 'পদার্থবিদ্যা'।
৬। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা' নামক প্রবন্ধ।

৭। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী।

৮। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত 'প্রকৃতি-পরিচয়'।

৯। স্বর্গীয় বামণশিবরাম আপ্তে প্রণীত English-Sanskrit Dictionary.

১০। ঐ প্রণীত Sanskrit-English Dictionary.

১১। শব্দ-কল্পদ্রুম।

১২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'রাসায়নিক পরিভাষা'।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

———o———
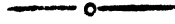
সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে 'আখ্যায়িকা' ও 'কথা' *

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যে গদ্য-সাহিত্যের "আখ্যায়িকা" ও "কথা"—এই দুইটী বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুবন্ধু ও বাণভট্টের তিনখানি পুস্তকে আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের যে স্বল্পমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাদের প্রতি আলঙ্কারিকগণের বিধানগুলি কতদূর প্রযোজ্য এবং এই সকল বিধান হইতে এই শ্রেণীর গদ্য-রচনার ইতিহাস কতদূর সংগ্রহ করিতে পারা যায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।[১]

আলঙ্কারিকগণের মধ্যে যাঁহারা এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে, বোধ হয়, ভামহ-ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইনি আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের অতি সূক্ষ্ম প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভামহের মতে (১ম অঃ, ২৫—২৯) আখ্যায়িকার এই কয়েকটী লক্ষণ,—(১) ইহা শ্রব্য ও প্রকৃতানুকূল বাক্যবিন্যস্ত গদ্যে লিখিত;

(২) কিন্তু ইহাতে মধ্যে মধ্যে বক্ত্র এবং অপরবক্ত্র ছন্দে শ্লোক থাকিতে পারে। এইরূপ শ্লোকের উদ্দেশ্য গল্পের পরবর্ত্তী ঘটনার আভাস দেওয়া[২]।

(৩) ইহার ভাব বা অর্থ উচ্চ অঙ্গের এবং ইহার বিশিষ্টতাস্বরূপ কবির কল্পনাপ্রসূত ঘটনাবলিও থাকিতে পারে[৩]; তদ্ভিন্ন আখ্যান অংশে থাকিবে,—কন্যাহরণ, সংগ্রাম, বিচ্ছেদ (বিপ্রলম্ভ) এবং পরিণামে নায়কের জয় ('উদয়')[৪]; নায়ক স্বয়ং স্বকীর্ত্তির বর্ণনা

---

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দে নৈহাটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে পঠিত।

১। পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কল্পনামূলক যে কোন রচনাকেই কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা ছন্দ বা মিলের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা এস্থলে একেবারে অস্বীকার করেন।

২। মূলে লিখিত আছে (সংস্করণ, ত্রিবেদী, বি, এস্, এস্ LXV, 1909) "বক্ত্রং চাপরবক্ত্রং চ কালে ভাব্যর্থ-শংসি চ।" কিন্তু হর্ষচরিতের টীকায় (শ্লোঃ ১০) শঙ্কর উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"কাব্যে কাব্যার্থ-শংসি চ।"

৩। "কবেঃ অভিপ্রায়কৃতৈঃ কথনৈঃ কৈশ্চিদ্ অঙ্কিতা", অর্থাৎ কবির স্বেচ্ছাকৃত বর্ণনাদ্বারা চিহ্নিত। মূলের এই পাঠ অশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়; কাব্যাদর্শের টীকায় প্রেমচন্দ্র এই শ্লোকার্দ্ধ এইভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"কবেঃ অভিপ্রায়-কৃতৈঃ অঙ্কনৈঃ অঙ্কিতা কথা"। এই পাঠান্তরে "কথা" শব্দ স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ভামহ-লিখিত পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তির (কন্যাহরণ প্রভৃতির) সহিত কিরূপে আখ্যায়িকার সংযোগ সংঘটন করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। ভামহের মূল পাঠ করিলে মনে হয় যে, ঐ দুইটী পঙ্‌ক্তিই আখ্যায়িকার সহিত সম্পর্কিত—উহাদের সহিত কথার কোন সম্বন্ধ নাই। অগ্নিপুরাণেও আখ্যায়িকাসম্পর্কে এই দুইটী পঙ্‌ক্তির একটী উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং সে স্থলে আমাদের অনুমানই সমর্থন করিতেছে।

৪। "বৃত্তম্ আখ্যায়তে তস্যাং নায়কেন স্বচেষ্টিতম্"—এই স্থলে "বৃত্ত" শব্দের সহিত "স্বচেষ্টিত" শব্দের সম্বন্ধ থাকায়, প্রকৃত ইতিহাস বা অভিজ্ঞতাজাত ঘটনাবলি বুঝাইতে পারে—কল্পনাসম্ভূত গল্প বুঝাইতে পারে না। এই সঙ্গে কথা-সাহিত্যে নায়ক স্বচরিত বর্ণন করিবেন না—ভামহের এই নিষেধও স্মরণ রাখা আবশ্যক। ভামহ কথা-সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ প্রশ্ন করিয়াছেন—'কোন্ অভিজাত ব্যক্তি স্বীয় গুণ-পরিমায় গর্ব্ব করেন!' এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ভামহের এই আপত্তি

করিবেন।[৫] ইহার আখ্যানভাগ কয়েকটী ছেদ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত থাকিবে ; ও পরিচ্ছেদগুলি "উচ্ছ্বাস" নামে অভিহিত হইবে।

পক্ষান্তরে "কথায়" বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দ। থাকিবে না ; উচ্ছ্বাসের বিভাগ থাকিবে না, এবং নায়ক স্বয়ং গল্পের বক্তা না হইয়া, অন্য কেহ বক্তা হইবেন। "কথা" সংস্কৃত অথবা অপভ্রংশ[৬] ভাষায় লিখিত হইবে। সুতরাং শেষোক্ত নির্দ্দেশ হইতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, "আখ্যায়িকা" কেবলমাত্র সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত হওয়া উচিত।

দণ্ডী এই সমস্ত সূক্ষ্ম প্রভেদকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এইগুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য বিধান নহে—সাধারণ বিধিমাত্র। ইনি বলেন,—কেহ কেহ আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের প্রভেদ এইভাবে নির্দ্দেশ করেন যে, প্রথমটীতে গল্পের নায়কই বক্তা ও অন্যটীতে নায়ক স্বয়ং অথবা অন্য কেহ গল্পের বক্তা—"নায়কেনেতরেণ বা বাচ্যা"। কারণ, স্বীয় গুণ-প্রকাশ দোষার্হ নহে, যতক্ষণ বক্তা ভূতার্থশংসী, অর্থাৎ যাহা সত্য মাত্র, তাহাই বর্ণনা করেন। দণ্ডী এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে নায়ক বা অন্য কাহারও বক্তৃত্ব লইয়াই যে প্রভেদের মূল, তাহা নহে ; কারণ, বর্ত্তমান কবিপ্রয়োগে এই বিধান সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হয় নাই—"অনিয়মো দৃষ্টঃ"। কখন কখন, দেখা যায়, আখ্যায়িকার বক্তা নায়ক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি।[৭] দ্বিতীয়তঃ, দণ্ডী বলেন, বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দ যে ব্যবহার করিতেই হইবে, আখ্যায়িকা-সম্বন্ধে এরূপ বাঁধাধরা নিয়ম নাই ; কারণ, এই ছন্দগুলি আর্য্যা বা অন্য ছন্দের মত কথা-সাহিত্যেও সময় সময় ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, আখ্যায়িকার পরিচ্ছেদবিভাগ যেমন উচ্ছ্বাস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কথায় পরিচ্ছেদ-বিভাগকে "লম্ভক" বলা হয়। সুতরাং ইহা হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। চতুর্থতঃ, কন্যাহরণ, সংগ্রাম, বিচ্ছেদ, অভ্যুদয় প্রভৃতি বিষয়গুলি শুধু এই সকল গদ্য-রচনায়

তো আখ্যায়িকাতেও সমভাবে প্রযোজ্য, তবে তিনি কোন্ যুক্তিতে আখ্যায়িকার নায়কে স্বচরিত বর্ণনা করিবার অধিকার দিয়াছেন ? কিন্তু আখ্যায়িকাবর্ণিত ঘটনা নায়কের (বক্তার) জীবনের প্রকৃত ব্যাপার বলিয়া ইহাকে আত্মপ্রশংসা বলা চলে না, আর, কথায় কল্পনার খেলা বেশিপরিমাণে থাকে, নায়কের পক্ষে অত্যবিস্তর গর্ব্বও চলিতে পারে, তাই কথায় নায়ক ও বক্তা স্বতন্ত্র হওয়া একান্ত প্রয়োজন—এই ভাবে বুঝিলে, তাঁহাদের উক্ত অসামঞ্জস্যের মীমাংসা হইয়া যায়।

৫। উচ্ছ্বাস শব্দের অর্থ—নিঃশ্বাসত্যাগ। সেইজন্য 'উচ্ছ্বাস' অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের নামান্তর। বক্তা এক-নিশ্বাসে সমস্ত গল্পটী বলিতে পারেন না, তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ দেওয়া দরকার, তাই 'উচ্ছ্বাস' বা অধ্যায়ের সৃষ্টি।

৬। ভামহের মতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা সাহিত্য-রচনায় ব্যবহার্য্য। কিন্তু তিনি কোন্ ভাষাকে অপভ্রংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। দণ্ডী স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কাব্যে আভীর প্রভৃতির কথ্য ভাষাই অপভ্রংশ নামে অভিহিত হয় ; কিন্তু শাস্ত্রে সংস্কৃত ভিন্ন যাবতীয় ভাষাকেই অপভ্রংশ বলা হয়।

৭। যেমন হর্ষচরিতে ; তরুণ বাচস্পতি টীকায় এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ণনীয় বিষয় নহে, সর্গবন্ধ মহাকাব্যেও[৮] এইগুলি পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চমতঃ, কবির[৯] উদ্ভাবনী শক্তির ফলস্বরূপ বিশিষ্ট ঘটনা অন্যান্য সাহিত্যের (অর্থাৎ কথা সাহিত্যের) দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; কেন না, কবিগণ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। শেষে দণ্ডী স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, "কথা" সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইতে তো পারেই, যে কোন ভাষাতেও লিখিত হইতে পারে। কারণ, কথিত আছে, অপূর্ব্ব উপাখ্যান "বৃহৎ কথা", "ভূত-ভাষায়"[১০] রচিত হইয়াছিল।

দণ্ডীর এই সমস্ত মন্তব্য ভামহের বিরুদ্ধে প্রকৃষ্টভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহা পণ্ডিত-গণমধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইসকল তর্ক বিতর্কের পুনরালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভামহ এই দুই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দণ্ডী তাহা আদৌ স্বীকার করেন নাই। এই দুই প্রাচীন অলঙ্কার-গ্রন্থের মধ্যে প্রচলিত কবি-প্রয়োগের উপর যেরূপ আস্থা দেখা যায়, তাহাতে এইরূপ মনে হয় যে, তাৎকালিক প্রচলিত কবি প্রয়োগসমূহের উপরই ইঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইঁহাদের মত-বিভিন্নতার কারণ এইখানেই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এই সূত্রে বাণ-রচিত "হর্ষচরিত" ও "কাদম্বরী" আলোচনা করা যাউক। গ্রন্থকার স্বয়ং এই দুইখানিকে যথাক্রমে "আখ্যায়িকা" ও "কথা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ভামহ ও দণ্ডী—এই দুই প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের বিধানগুলির উদাহরণ এই দুই আদর্শ কাব্যে কি পরিমাণে পাওয়া যায়, অথবা ইঁহাদের বিধানগুলি অন্যান্য বিশেষ গ্রন্থ অবলম্বনে নিবদ্ধ হইয়াছে কি না।

শ্লোক বা অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত কুড়িটী শ্লোকে "হর্ষচরিত"এর আরম্ভ, এবং জগতী ছন্দে রচিত একটী শ্লোকে এই উপক্রমণিকা-ভাগ শেষ হইয়াছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে ব্যাসের ও শিব-পার্ব্বতীর নমস্ক্রিয়া আছে; তদ্ভিন্ন সাধারণভাবে কবি ও কাব্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রধান কবিগণ ও প্রাচীন কাব্যসমূহের প্রশংসা আছে। সংক্ষেপে "আখ্যায়িকার"

৮। এস্থলে দণ্ডী ইচ্ছা করিয়া ভামহের মর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। এই সকল বিষয় মহাকাব্যের আলোচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভামহ এইরূপ বলিতে চাহেন যে, এই সকল বিষয় অন্যান্য কাব্যের পক্ষে সবিশেষ প্রযুজ্য না হইলেও, এইগুলি আখ্যায়িকার প্রধান লক্ষণ ও বিশেষত্ব।

৯। প্রাচীন ও আধুনিক টীকাকারগণ (তরুণ বাচস্পতি ও প্রেমচন্দ্র) এই "চিহ্ন" বা "অঙ্ক" অর্থে বুঝিয়াছেন, কোনও বিশিষ্ট শব্দবিন্যাস-কৌশল। (যথা—মাঘের শ্লেষে 'শ্রী', ভারবির 'লক্ষ্মী', প্রবরসেনের 'অনুরাগ' প্রভৃতি; ইহা অধ্যায়-সমাপ্তির চিহ্ন-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দণ্ডীর এই মন্তব্যের সহিত বোধ হয়, ভামহের উপরোক্ত মন্তব্যের সম্বন্ধ আছে। ভামহ বলেন,—আখ্যায়িকায় সময়ে সময়ে কবির উদ্ভাবনী শক্তির চিহ্ন থাকিতে পারে, (কবেঃ অভিপ্রায়-কৃতৈঃ কথনৈঃ কৈশ্চিদ্ অঙ্কিতা); এবং এই উদ্ভাবনী শক্তি প্রকৃত ঘটনা-মূলক আখ্যায়িকায় কল্পনাপ্রসূত গল্প বা অংশবিশেষে প্রযোজ্য।

১০। পৈশাচী প্রাকৃতকে লক্ষ্য করিয়া দণ্ডী "ভূতভাষা" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, তিনি এই গ্রন্থের প্রবাদ-মূলক উৎপত্তির বিষয় অবগত ছিলেন।

বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়া (শ্লোক ২০) গ্রন্থকার রাজা হর্ষের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, পৃথিবীতে বড় বড় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার বর্ত্তমান থাকা সত্বেও কোন বিশিষ্ট নৃপতির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই সাহিত্যচর্চ্চা।

ইহার পরই আরম্ভ হইল—গদ্য গল্প, যাহার আটটী উচ্ছ্বাস পাওয়া যায়। দশম সংখ্যক শ্লোকের শ্লেষোক্তি হইতে বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার প্রত্যেক অধ্যায়কে 'উচ্ছ্বাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রথম উচ্ছ্বাস ব্যতীত প্রত্যেক উচ্ছ্বাসের প্রারম্ভে যুগ্মশ্লোকে পরবর্ত্তী ঘটনার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল শ্লোকের ছন্দঃ প্রায়ই এক—সাধারণতঃ আর্য্যা। কেবল তৃতীয় উচ্ছ্বাসের একটী শ্লোকে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেই শ্লোকটী অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। প্রথম হইতে তৃতীয় উচ্ছ্বাসের পদ্যাংশে কবি-বংশের বিস্তৃত পরিচয় পাই, কবির বাল্যকাল, হর্ষের বৈমাত্র ভ্রাতার সভায় তাঁহার পরিচয়, তথায় সংবর্দ্ধনা, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন এবং আত্মীয়গণের নিকট রাজা হর্ষের আখ্যান-কথন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে প্রকৃত গল্পাংশ তৃতীয় উচ্ছ্বাস হইতে আরম্ভ হইয়া অষ্টম উচ্ছ্বাসে সহসা সমাপ্ত হইয়াছে।

ইহাও লক্ষ্য করা দরকার যে, গদ্যাংশের মধ্যে স্থানে স্থানে বিভিন্ন ছন্দে কতকগুলি শ্লোক রচিত আছে। তন্মধ্যে একটী শ্লোক (এন্, এস্, পি-সংস্করণ ১৯১৮, পৃ° ১২৫)[১১] বক্ত্র ছন্দে রচিত বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে এবং আর চারিটী (পৃ° ১৮, ৭৮, ১২৫ ও ১৫৯) সেইরূপ অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। গদ্যাংশের অন্তর্গত অন্যান্য শ্লোক (২য়, ৫৪ পৃ°) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত (২য়, ৭৯), আর্য্যা (৩য়, ৮৬ ; ৪র্থ, ১৪০ ; ৬ষ্ঠ ১৮৫) স্রগ্ধরা (৩য়, ৯৩) এবং শ্লোক (৫ম, ১৫৩) ছন্দে রচিত। শেষ দুইটী উচ্ছ্বাসে মোটেই শ্লোক নাই।

কাদম্বরীর আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষার অন্য প্রাচীনতর কথা-সাহিত্য সুবন্ধু-প্রণীত "বাসবদত্তা"র সাধারণ লক্ষণ সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। হর্ষচরিতে বাণভট্ট স্বয়ং এ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। আর্য্যা ছন্দে রচিত ১২টী শ্লোকে এই গ্রন্থের আরম্ভ। ইহাতে সরস্বতী, কৃষ্ণ, শিব ও সুকবিগণের স্তুতিবাদ এবং সুবন্ধুর গ্রন্থ-রচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

১১। বক্ত্র ছন্দের লক্ষণ এইরূপ,—

⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – – ⏑ | – ⏑ – ⏑ ⏑ – – ⏓ ।
⏑ – ⏑ – ⏑ – – | – ⏑ – – ⏑ – – ⏓ ।

প্রকৃতপক্ষে ইহা শ্লোকছন্দের প্রকারান্তর। পিঙ্গল (৫।৯) বলেন, ইহার পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদের অন্ত্যের পূর্ব্ববর্ণ দীর্ঘ হইবে। তাছাড়া অন্য সকল রকমে ইহাও পথ্যা বৃত্তের সমান। অপরবক্ত্র ছন্দের লক্ষণ এইরূপ,—

⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏓ ।
⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏓ ।

কিন্তু পিঙ্গলের মতে ইহার লক্ষণ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র :—

⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏓ ।
⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ।

গদ্য গল্পাংশ আমাদের কোন কাজে লাগিবে না, তবে এখানে এইটুকু বলা দরকার যে, ইহাতে বাসবদত্তার যে আখ্যান বিবৃত হইয়াছে, তাহা অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। গল্পের এই বিশিষ্টতা সম্ভবতঃ কবির উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। আখ্যান অংশে কোথাও ছেদ বা বিরাম নাই, অধ্যায় বিভাগ নাই, বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দের ব্যবহার নাই,—যদিও আর্য্যা, শিখরিণী, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ও স্রগ্ধরা ছন্দঃ প্রয়োগ হইয়াছে। গল্পের প্রবাহ শান্তিপ্রধান—শৃঙ্গারই ইহার প্রতিপাদ্য রস, ভামহের লক্ষণানুযায়ী কোন সংগ্রাম কিংবা কন্যা-হরণ ইহাতে নাই,—অবশ্য বাসবদত্তাকে বিন্ধ্য পর্ব্বতে লইয়া যাওয়ার ব্যাপারটা যদি কন্যাহরণ বলিয়া গণ্য করা না হয়।

কাদম্বরীর আখ্যানভাগ এত সুপরিচিত যে, এস্থলে তাহার পুনর্ব্বর্ণনার প্রয়োজন নাই। ইহার ধরণ বাসবদত্তার অনুরূপ, অথচ গল্পাংশ তত জটিল নহে। গল্পটী একটানা, গল্পের প্রারম্ভে বংশস্থ-ছন্দের শ্লোক আছে, তাহাতে ব্রহ্মা, শিব এবং গ্রন্থকারের গুরু ভৎসুর নমস্ক্রিয়া আছে, সৎকাব্যের প্রয়োজনীয়তার নির্দ্দেশ আছে, এবং গ্রন্থকারের জাতি ও বংশের পরিচয় আছে। গল্পের প্রবাহ পূর্ব্বের ন্যায় শান্তিপ্রদ—প্রেম বা শৃঙ্গার ইহারও মূল রস। গল্পটী কোন পরিচিত "ইতিহাসে"র উপর প্রতিষ্ঠিত নহে,—গল্পের প্রধান ও বিশিষ্ট ঘটনা সম্ভবতঃ কবির নিজের উদ্ভাবিত।

হর্ষচরিতকে অধুনালুপ্ত প্রাচীন আখ্যায়িকার মধ্যে আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিলে (ইহা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত), আমরা দেখিতে পাই যে, ভামহের নির্দ্দিষ্ট বিধান অনেক স্থলে ইহাতে প্রতিপালিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি আখ্যায়িকার যে সকল লক্ষণ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সকল লক্ষণের আদর্শ-স্বরূপে হর্ষচরিতকে গ্রহণ করা যায় না; অর্থাৎ হর্ষচরিতকে চোখের সম্মুখে রাখিয়াই যে ভামহ আখ্যায়িকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এ কথা বলা যায় না। হর্ষচরিত মনোরম গদ্যে লিখিত; ইহার মধ্যে মধ্যে শ্লোকও আছে, তবে বক্ত্র এবং অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত শ্লোকগুলি আখ্যানেরই অন্তর্ভুক্ত—পরবর্ত্তী ঘটনার আভাস-সূচক লক্ষণ এ সকল শ্লোকে নাই। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সাধারণতঃ আর্য্যা-ছন্দে যুগ্মশ্লোক প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গল্পটী বস্তুতই "উদাত্তার্থ"; কারণ, ইহা একজন বড় রাজার উপাখ্যান। ইহা রীতিমত উচ্ছ্বাসে বিভক্ত, কিন্তু কন্যাহরণ প্রভৃতি ব্যাপার ইহাতে নাই; তদ্ভিন্ন কবির উদ্ভাবনী শক্তির কি কি বিশেষ পরিচয় ইহাতে আছে, তাহাও বলা কঠিন, কেননা গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, সমসাময়িক গ্রন্থকার একজন রাজার জীবনের প্রকৃত ঘটনাবলি যেরূপ দেখিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভামহ বলিয়াছেন, আখ্যায়িকার নায়কই গল্পের বক্তা হইবেন, কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় বিশেষত্ব বা লক্ষণ হর্ষচরিতে পরিলক্ষিত হয় না। এই কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় ত ভুল হইবে না যে, বাণ-রচিত হর্ষচরিত ভামহের আখ্যায়িকার আদর্শ নহে,—অধুনালুপ্ত বা অপ্রাপ্ত অন্য কোন গ্রন্থই তাঁহার আদর্শ। তথাপি ভামহের লেখা হইতে এইটুকু সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আখ্যায়িকা ও কথার লক্ষণ

লইয়া নানা মতদ্বৈধ থাকিলেও, তাঁহার সময়ে নিশ্চয়ই 'আখ্যায়িকা' ও 'কথা' নামে দুই প্রকার গদ্য বিবৃতি প্রচলিত ছিল, এবং বিশিষ্ট কতকগুলি লক্ষণের দ্বারা উভয়ের পার্থক্য সূচিত হইত। বাঁধা-ধরা নিয়ম ছাড়িয়া দিলেও ভামহের ব্যাখ্যা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে আখ্যায়িকা কতকটা আত্ম-জীবনীর মত ছিল। এক্ষেত্রে বক্তা স্বয়ং গল্পের নায়ক—ইনি স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন; এবং সজ্জনের পক্ষে আত্ম-প্রশংসা নিন্দনীয় হইলেও, (দণ্ডীর মতে) ইনি এস্থলে সে দোষে দোষী বিবেচিত হইতে পারেন না। আখ্যায়িকা পাছে নীরস ঘটনার বর্ণনায় পর্য্যবসিত হয়, সেইজন্য ভামহ ইহার মধ্যে কবি-কল্পনা ও কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত-সমাবেশের ব্যবস্থা দিয়াছেন; কিন্তু ভামহ আখ্যায়িকার মধ্যে প্রকৃত ঘটনার অবতারণার উপর বেশী জোর দিয়াছেন। কারণ, ইহাই আখ্যায়িকা ও কথার পার্থক্যের মূল। পক্ষান্তরে, ভামহ কথার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শুধু নিষেধ-মূলক (কেবল ব্যবহার্য্য ভাষা-সম্বন্ধে স্পষ্ট আদেশ আছে); কিন্তু তাৎপর্য্যক্রমে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কথা কতকটা কল্পনাপ্রসূত অলীক গল্প বা বিবৃতি—সমানে একটানা কথিত হয়, আর ইহার বক্তা নায়ক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি হওয়া চাই। অন্যান্য অপ্রধান লক্ষণসম্বন্ধে (যেমন বক্ত্র অপরবক্ত্র ছন্দের ব্যবহার ও উচ্ছ্বাস-বিভাগ) দণ্ডী বাঁধা-ধরা নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত অপ্রধান লক্ষণগুলিকেও নিতান্ত বাজে নিয়ম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না; এই সকল ছোট ছোট লক্ষণসমূহের অনেকগুলি হইতে এই উভয় রচনার প্রকৃতিগত পার্থক্য সূচিত না হইলে, প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কেন এই বিষয় লইয়া এত মাথাকাটাকাটি করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। মোট কথা এই, অধ্যায়কে উচ্ছ্বাস বলা হইয়াছে কি না, বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দঃ ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, এই সকল আখ্যায়িকার মূল বিচারলক্ষণ নহে। মূল লক্ষণ এই যে, আখ্যায়িকার নির্দ্দিষ্ট বিরাম বা অধ্যায় থাকিবে; এবং কথা একটানা ধারাবাহিক বিবরণ হইবে; আর ইহার মধ্যে মধ্যে (প্রায়শঃ অধ্যায়ের প্রারম্ভে) শ্লোকে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের ঘটনা-প্রবাহের প্রতি ইঙ্গিত থাকিবে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আখ্যায়িকার মধ্যে বিরামের প্রয়োজন আছে, কেন না, নায়ককে (এস্থলে তিনি বক্তা) তাঁহার নিজের গল্প পুনরাবৃত্তি করিবার অবসর দিতে হয়। কথা-সাহিত্যে কিন্তু এই নির্দ্দেশক শ্লোকগুলির স্থান নাই; কারণ, কথা একটী বিরামহীন গল্পধারা। নায়ক স্বয়ং বক্তৃরূপে আখ্যায়িকায় আবির্ভূত হওয়ায়, আখ্যায়িকায় কতকটা সত্যের ছায়া পড়ে—কথায় এরূপ হয় না। কারণ, সেস্থলে কবি বা অন্য কেহ গল্পটী বিবৃত করিয়া থাকেন। ভামহের সময়ে এই দুই শ্রেণীর গদ্য-রচনায় সাধারণতঃ এইরূপ ছিল।—আখ্যায়িকা সাধারণতঃ আত্ম-জীবনের কাহিনী অথবা আধা ঐতিহাসিক ঘটনা-সম্বলিত এক গাম্ভীর্য্য-মূলক রচনা। কথা কিন্তু পুরা কল্পনা-মূলক গল্প, এবং (দণ্ডীর মতে) ইহাতে আত্ম-জীবনীর ধাঁজ থাকিলেও, কল্পনাকুশলতাই ইহার বিশিষ্টতা। পরবর্ত্তিকালে আখ্যায়িকার পতন হয় এবং উপরিলিখিত খুঁটিনাটি তখন আর লেখকেরা তাদৃরূপ মানিয়া চলেন নাই। কিন্তু রুদ্রট (বাণের গ্রন্থাবলী অবলম্বনে)

যে কথা-সাহিত্যের লক্ষণ ও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার ধরণ ও প্রকৃতি সুবন্ধুর[১২] সময় হইতে অল্পমাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

দণ্ডীর অভিমত হইতে, এবং পরবর্ত্তিকালে রচিত অগ্নিপুরাণ (ও বিশেষতঃ রুদ্রট) হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, এই দুই শ্রেণীর কাব্য আর ভামহোক্ত লক্ষণ-অনুযায়ী ছিল না এবং বোধ হয়, বাণভট্টের রচনার আদর্শে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। হর্ষচরিতের মত আখ্যায়িকা (যেখানে বক্তা নায়ক নহেন) দেখিয়া সম্ভবতঃ দণ্ডী স্থির করিয়াছিলেন যে, এই বিশেষত্ব, প্রচলিত প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, পার্থক্যের নির্দ্দেশক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং তরুণ বাচস্পতি এই বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ 'হর্ষচরিতে'রই উল্লেখ করিয়া ঠিক ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ভামহের সময় হইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী কবিগণের নূতন প্রয়োগ দ্বারা এই সকল বাঁধা-ধরা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়, দণ্ডী বক্তার ব্যক্তিত্বের, ছন্দের প্রকৃতির এবং অধ্যায়ের শিরোনামার উপর, এমন কি ভাষাগত তারতম্যের উপরও, ঝোঁক দেন নাই। তিনি তাঁহার সময়ের কবিপ্রয়োগ দেখিয়া এই সমস্ত তুচ্ছ পার্থক্যকে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছেন, এবং উভয় শ্রেণীর কাব্য বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও, উহাদের একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়াছেন। এই শ্রেণীর গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা একটী পরিবর্ত্তনের যুগ, যে যুগে প্রাচীন পার্থক্যসমূহ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িতেছিল, এবং যখন গদ্য-রচনার নিয়ম বা প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নূতন বিধি-নিষেধ সৃষ্ট হয় নাই। (এই শেষোক্ত ঘটনা দণ্ডীর নিষেধমূলক প্রতিকূল সমালোচনা হইতে বেশ বুঝা যায়।) এইরূপে দণ্ডীর পরবর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ রুদ্রটের[১৩] অগ্রবর্ত্তী বামন, দণ্ডী ও ভামহের মত-বিভিন্নতা ও তর্ক-বিতর্ক (বৃত্তি ১, ৩, ২২) বাতিল করিয়া দিয়া, কৌতূহলী পাঠককে "এ বিষয়ে অন্য লোকদের" গ্রন্থ দেখিয়া বলিয়াছেন। বামনের মতে এই সকল বাগ্‌বিতণ্ডার বিশেষ কোন আলঙ্কারিক মূল্য নাই।

অগ্নিপুরাণে অনেক স্থলে অবিতর্কে দণ্ডী এবং অপর গ্রন্থকর্ত্তাদের[১৪] মতই উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তখনকার আলঙ্কারিকদিগের উপর বাণরচিত গ্রন্থের প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল, এবং তাঁহারা নূতন অবস্থার অনুকূল করিয়া স্ব স্ব সংজ্ঞারও লক্ষণ

১২। কালক্রমে কথা-সাহিত্যের সংজ্ঞার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইলেও, ভামহের সংজ্ঞা কতকটা সাধারণ বিশেষত্ব-বাচক বলিয়া সুবন্ধুর "বাসবদত্তা" ও বাণের "কাদম্বরী"র পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু হর্ষ-চরিত যেমন তাঁহার আখ্যায়িকার আদর্শ ছিল না, সম্ভবতঃ বাসবদত্তাও সেইরূপ তাঁহার কথার আদর্শ ছিল না। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ভামহ ধর্ম্মকীর্ত্তির এবং সম্ভবতঃ বাণের সমসাময়িক ব্যক্তি। অধ্যাপক য়্যাকোবিও এইরূপ অনুমান করেন। Sb. der preuss. Akad., xxiv, 1922, পৃঃ ২১১—১৫; আমার History of Sanskrit. Poetics, Vol. I. পৃঃ ৪৮, ৫২) বাণের গ্রন্থাবলীর সহিত ভামহের পরিচয় থাকা সম্ভবপর হইলেও, তিনি সেই সময়ে বাণের গ্রন্থাবলিকে প্রামাণ্য আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই মনে হয় তাঁহার সময়ে প্রচলিত এবং অধুনা লুপ্ত অন্য প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, তিনি তাঁহার বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৩। মৎপ্রণীত History of Sanskrit Poetics, *loc. cit.* pp. 60-1, 81 দেখুন।

১৪। পাদটীকা ১৩শে উক্ত গ্রন্থের পৃঃ ১০২—৪ অগ্নিপুরাণের অলঙ্কার-অংশের কথা আলোচিত হইয়াছে।

নির্দ্দেশের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অগ্নিপুরাণের মতে, "আখ্যায়িকা"র লক্ষণসকল নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

১। গদ্যে গ্রন্থকারের বংশ-প্রশংসা ;

২। কন্যা-হরণ, যুদ্ধ, বিচ্ছেদ, প্রভৃতি বিপত্তির সমাবেশ ;

৩। উচ্ছ্বাস-বিভাগ ;

৪। চূর্ণক[১৫], অথবা বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দের প্রয়োগ ;

৫। রীতি ও বৃত্তির গুণসমূহের উদাহরণ-স্বরূপ সুললিত শব্দ-সমাবেশ ;

কিন্তু "কথা"-সাহিত্যে—

১। কবিতায় কবির বংশ-প্রশংসা ;

২। কোন গল্পান্তর কথান্তরম্) মূল গল্পের অবতারণাস্বরূপ (মুখ্যস্যার্থাবতারায়) প্রয়োগ।

৩। বিরাম বা পরিচ্ছেদ এবং সময়ে সময়ে লম্ভক[১৬] নামক বিভাগ ; এবং

৪। প্রতি গর্ভে চতুষ্পদী কবিতার অবতারণা প্রভৃতি থাকিবে[১৭]।

প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রচলিত বিধির তালিকামাত্র। কিন্তু দুইটী বিষয়ে প্রাচীন রীতির সহিত ইহার পার্থক্য সবিশেষ লক্ষ্য করা আবশ্যক। "কর্ত্তৃ-বংশ-প্রশংসা" এবং "কথান্তর"এর প্রয়োগ—এই দুইটী বিষয় প্রাচীনতর আলঙ্কারিকগণ আলোচনা করেন নাই। এস্থলে (বিশেষতঃ রুদ্রটের গ্রন্থে) বোধ হয়, বাণ-রচিত গ্রন্থের প্রভাব-বশতঃ এই দুইটী বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে।

রুদ্রট কেবল স্পষ্টভাবে প্রাচীনতর লেখকগণের সহিত ভিন্নমত হইয়াছেন। এখনও বলা যাইতে পারে যে, তিনি বাণ-রচিত গ্রন্থদ্বয়ের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্য রচনার সাধারণ বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে "কথা"র নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থাকা চাই,—

১। গ্রন্থ-সূচনায় কবিতায় দেবগণ ও গুরুগণের নমস্ক্রিয়া, এবং কবি-বংশের পরিচয় ও গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য বর্ণিত হইবে।

২। গল্পাংশ সংস্কৃত গদ্যে (কিংবা অন্য ভাষায় কবিতায়) রচিত হইবে, এবং ইহাতে সরল অনুপ্রাস ও "পুরবর্ণনা" প্রভৃতি থাকিবে। (যেরূপ "উৎপাদ্য কাব্যে" ১৬, ৩)

৩। আরম্ভে মূল গল্পের সম্বন্ধীয় একটী কথান্তর থাকিবে।

১৫। রুদ্রট (১, ৩, ২৩—২৫) চূর্ণের (গদ্য-সাহিত্যের বিভাগ-বিশেষের) সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেছেন—"অনাবিদ্ধ-ললিত-পদম্" (অসমস্ত সুমিষ্টপদ—উৎকলিকাপ্রায় ঠিক ইহার বিপরীত)

১৬। মুদ্রিত পুস্তকে আছে—"ভবেল্লম্ভকৈঃ কচিৎ" কিন্তু "ভবেদ্ বা লম্ভকৈঃ কচিৎ",—এই পাঠই সমীচীন।

১৭। অগ্নিপুরাণোক্ত খণ্ডকথা, পরিকথা এবং কথানিকা সম্বন্ধে "ধ্বন্যালোকলোচন" (পৃঃ ১৪১) দেখুন। লোচনে 'সকলকথা' নামে আর একটী বিশেষ বিভাগের উল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র অন্যান্য উপবিভাগ আলোচনা করিয়াছেন।

৪। কন্যালাভই গল্পের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া, ইহার মধ্যে শৃঙ্গার রসের পূর্ণ বিকাশ হইবে (বিন্যস্ত-সকল-শৃঙ্গারা)।

অপর দিকে "আখ্যায়িকা"য় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থাকা চাই :—

১। দেবগণ এবং গুরুগণের কবিতায় নমস্ক্রিয়া। প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন কবিগণের প্রশংসা, কবির নিজের অক্ষমতা স্বীকার এবং সেই সঙ্গে অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কবির গ্রন্থ-রচনার কারণ-নির্দ্দেশ। তন্মধ্যে নৃপে ভক্তি। গ্রন্থকারের গুণগ্রাহিতা-প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা বা অন্য কোন বিশেষ কারণ এই গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য হইতে পারে।

২। গল্পটী "কথা"র নিয়মে লিখিত হইবে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে কবির পরিচয় ও বংশ-বৃত্তান্ত গদ্যে রচিত হওয়া আবশ্যক, পদ্যে নহে।

৩। উচ্ছ্বাস-বিভাগ থাকিবে, এবং প্রথম অধ্যায় ব্যতীত প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে আর্য্যা ছন্দে রচিত দুইটী করিয়া শ্লোক থাকিবে।[১৮]

দেখা যাইতেছে, রুদ্রট-কর্তৃক উল্লিখিত এই লক্ষণগুলি বাণভট্টের গ্রন্থ দুইখানিতেই সম্পূর্ণভাবে ও যথাযথরূপে খাটে। রুদ্রট অগ্নিপুরাণের সহিত একমত হইয়া অবতরণিকাসূচক শ্লোকের যে নূতন ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাহার সমস্ত বিষয়গুলি বাণরচিত অবতরণিকা শ্লোকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রক্ষিত হইয়াছে। "আখ্যায়িকা"র নিয়ম এই যে, নৃপে ভক্তি বা অন্য কোন কারণ গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, তাহা কবিকে ছন্দে বর্ণনা করিতে হইবে এবং গদ্যে কবি নিজ জাতি ও বংশবৃত্তান্ত প্রদান করিবেন। এই নিয়ম বাণভট্টের "হর্ষচরিতে" প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে আর্য্যা ছন্দে রচিত দুইটী করিয়া শ্লোক থাকিবে এবং গদ্য গল্পাংশের অন্তর্গত শ্লোকগুলির সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, তবে সেগুলি বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত হইতেও পারে। এইসকল বিধিও "হর্ষচরিতে" অনুসৃত হইয়াছে। দণ্ডিকৃত সমালোচনা ও বাণভট্টের হর্ষচরিতের দৃষ্টান্তের পর গল্পের বক্তা কে হইবেন, ইহা লইয়া রুদ্রট মাথা ঘামান নাই, কারণ অগ্নিপুরাণকারের ন্যায় তিনি এই বিষয়ের উল্লেখ ও করেন নাই। বাণ-রচিত গ্রন্থদ্বয়ের পার্শ্বে রুদ্রটের মত বিশ্লেষণ-গুলি স্থাপনা করিয়া মিলাইয়া লইলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রুদ্রট "হর্ষচরিত" ও "কাদম্বরী"র রচনাবৈশিষ্ট্যগুলিকেই যথাক্রমে "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন। বাণ-রচিত দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থের পর হইতে আখ্যায়িকা ও কথা সম্বন্ধে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের সংজ্ঞা ও পার্থক্যসকল প্রাচীন প্রথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, এবং উক্ত দুই গ্রন্থই নূতন আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের আদর্শস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

---

[১৮] কতকগুলি খুঁটিনাটিও এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—যথা অতীত ঘটনা, বা বক্তারা যাহা দেখেন নাই (পরোক্ষ) এরূপ ঘটনা সম্বন্ধে, অথবা বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোন সন্দেহ ঘটিলে, কবি সন্দেহ-পরায়ণ ব্যক্তির সন্দেহ অপনোদনার্থ দুই একটি কাব্যালঙ্কার (যেমন অন্যোক্তি, সমাসোক্তি, বা শ্লেষ) প্রয়োগ করিবেন; এই সকল স্থলে আর্য্যা, অপরবক্ত্র, পুষ্পিতাগ্রা বা প্রয়োজনমত মালিনীর ন্যায় ছন্দঃ ব্যবহার করিবেন।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে—রুদ্রট এই দুই শ্রেণীর কাব্যের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। "আখ্যায়িকা"র সহিত প্রকৃত ঘটনার ঘনিষ্ঠতা থাকিবে কি না, এবং "কথা"র কল্পনামূলক গল্পের বিবৃতি থাকিবে কি না—তিনি এ সব বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। কন্যালাভই (প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের নির্দ্দিষ্ট আখ্যায়িকার বীরত্বব্যঞ্জক কন্যাহরণ নহে) কথা-সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি কথা-সাহিত্যের কোমল ভাবের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। এইরূপে শৃঙ্গার-রসের সমস্ত ভাবগুলি কথায় ফুটাইয়া তোলার পক্ষে কবিকে যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হইয়াছে, এবং এইরূপ বিধান করিয়া রুদ্রট, সুবন্ধু ও বাণ-রচিত গ্রন্থের এই বিশিষ্টতাটুকু আমাদের চোখের সামনে ধরিয়াছেন যে, প্রেমই তাঁহাদের গ্রন্থাবলির উপজীব্য ভাব। ইহা হইতেই, কল্পনোদ্ভূত প্রেমচিত্রচয় যে সংস্কৃত গদ্য কথা-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ বা প্রকৃতিস্বরূপ, তাহা রুদ্রট বুঝাইয়া দিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধন গদ্য-সাহিত্যের শুধু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করিয়াছেন (পৃঃ ১৪১); কিন্তু তিনি "সংঘটন" (বা রীতিসম্পর্কে সমাসের নিয়ম) সম্বন্ধে বিচার-প্রসঙ্গে এই বিষয়টী স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইনি বলিয়াছেন,—কথায় শব্দ-সমাবেশ আখ্যায়িকার ন্যায়, কিন্তু কথায় রস-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি রক্ষিত হওয়া চাই (৩, ৮)। রসের (বিশেষতঃ শৃঙ্গারের) বর্ণনবৈচিত্র্যই কথা-সাহিত্যের উপজীব্য ভাব, ইহাই তাঁহার মনোগত ভাব। পক্ষান্তরে অভিনবগুপ্ত আবার প্রাচীন প্রথার পক্ষপাতী। ইঁহার মতে, এই দুই শ্রেণীর রচনায় বৈচিত্র্য কেবল আকৃতিগত; উচ্ছ্বাস-বিভাগ, এবং বক্ত্র, অপরবক্ত্র শ্লোকের ব্যবহারেই আখ্যায়িকার বিশিষ্টতা, এবং কথায় এসকলের অভাব। হেমচন্দ্রও (পৃঃ ৩২৮) সমমতাবলম্বী, কিন্তু তিনি গল্পের বক্তা ও ভাষাগত আকৃতি-সম্বন্ধে দণ্ডীর মত স্বীকার করেন (পরবর্ত্তী প্রায় সকল গ্রন্থকারই ইহা স্বীকার করেন)। ইনি দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশেষভাবে "হর্ষচরিত" ও "কাদম্বরী"র উল্লেখ করিয়াছেন। কথা-সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে কবিতায় (শুধু গদ্যে নহে) লিখিত হইতে পারে বলিয়া রুদ্রট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইঁহারও সেই মত; এবং ইনি লীলাবতী নামে একখানি অজ্ঞাত কাব্যের উল্লেখ করিয়া স্বকীয় মতের পোষণ করিয়াছেন। বিদ্যাধর এ প্রশ্ন লইয়া আদৌ বিচার করেন নাই; আবার কথা-সাহিত্য বিদ্যানাথের অজ্ঞাত ছিল। তিনি গদ্য ও গদ্য-কাব্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া "কাদম্বরী" ও "রঘুবংশের" দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত আকৃতিগত লক্ষণ অবলম্বন করিয়া আখ্যায়িকার যেরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইনিও সম্পূর্ণরূপে তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক লেখক বিশ্বনাথ এই প্রশ্নের উপর কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি রুদ্রটের সাধারণ বিধিগুলিকেই সুন্দরভাবে সাজাইয়া দিয়াছেন; তাঁহার এই ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন পার্থক্যগুলি লোকে পূর্ব্বেই ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং বাণভট্টের গ্রন্থের আদর্শসম্ভূত গদ্য-রচনার নূতন ধারা দৃঢ়ভাবে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বিশ্বনাথ "আখ্যায়িকা"র আখ্যানবস্তু সম্বন্ধে নীরব থাকিলেও, তিনি রুদ্রটের ন্যায় জোর দিয়া বলিয়াছেন,—"সরসবস্তু"ই "কথা"-সাহিত্যের প্রাণ।

এইরূপে প্রাচীন সংস্কৃত "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্যের পরিণতির দুইটী বা তিনটী

সুস্পষ্ট স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, ভামহ ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন আকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। সেই বিশেষত্বগুলি সংক্ষেপে এইরূপ,—

আখ্যায়িকা—(১) প্রকৃত ঘটনামূলক ব্যাপারই ইহার বর্ণনীয় বিষয়; (২) বক্তা স্বয়ংই নায়ক; (৩) বক্ত্র এবং অপরবক্ত্র শ্লোক-সংবলিত "উচ্ছ্বাস" নামধেয় অধ্যায়ে গল্পাংশটী বিভক্ত; (৪) বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে কবির কল্পনার বিস্তার থাকিতে পারে, এবং কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিচ্ছেদ, এবং পরিণামে নায়কের জয় প্রভৃতি বিষয় আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; (৫) ইহাও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়া চাই।

কথা—(১) আখ্যান বস্তু সম্ভবতঃ উদ্ভাবিত কোন গল্প হইবে; (২) নায়ক ব্যতীত অন্য কেহ গল্পের বক্তা হইবেন; (৩) উচ্ছ্বাস-বিভাগ থাকিবে না; বক্ত্র বা অপরবক্ত্র শ্লোক থাকিবে না; (৪) ইহাও সংস্কৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত হইতে পারে।

এই সমস্ত লক্ষণগুলি বাণরচিত গ্রন্থদ্বয়ের পক্ষে রীতিমতভাবে প্রযুজ্য নহে। এই দুই গ্রন্থই কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তিকালের আলঙ্কারিকগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দেখা যাইতেছে, দণ্ডীর সময় হইতেই এই সমস্ত সূক্ষ্ম পার্থক্যের ধ্বংসমূলক প্রতিকূল সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তিকালে রচিত নূতন "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্য কতকটা বাণ-রচিত গ্রন্থ দুইখানির আদর্শ অবলম্বনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। রুদ্রট বাণরচিত গ্রন্থদ্বয়ের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া আখ্যায়িকা ও কথার সাধারণ বিধি-নিষেধ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সময় হইতে ইহাই প্রামাণিক আদর্শ বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই নূতন "আখ্যায়িকা" ও "কথার" বিশেষত্বগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

আখ্যায়িকা—(১) প্রকৃতঘটনামূলক ব্যাপার ও অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইবে; (২) বক্তাই যে কাব্যের নায়ক হইবেন, এমন কোন কথা নাই; (৩) উচ্ছ্বাস নামধেয় পরিচ্ছেদে ইহা বিভক্ত হইবে। প্রথম উচ্ছ্বাস ব্যতীত প্রত্যেকটীর প্রারম্ভে দুইটী করিয়া শ্লোকে (ছন্দ আর্য্যা হইলেই ভাল হয়) আলোচ্য পরিচ্ছেদের আভাস দেওয়া হইবে; ও (৪) একটি সাহিত্য-সম্বন্ধীয় ছন্দোবদ্ধ উপক্রমণিকা থাকিবে।

কথা—(১) আখ্যানবস্তু একটী গল্প হইবে। গল্পটী কবির উদ্ভাবিত, প্রায়শঃ প্রেমের গল্প; (২) নায়ক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি গল্পের বক্তা হইবেন; অবশ্য নায়কও কখন কখন স্বয়ং বক্তা হইতে পারেন; (৩) ইহাতে পরিচ্ছেদ-বিভাগ থাকিবে না; ও (৩) উপক্রমণিকা উক্তরূপ হইবে।

এইরূপে সংস্কৃত সাহিত্যে এই দুই প্রকার বর্ণনার লক্ষণ একবারে বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই বিশেষত্বগুলির বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে আসিয়া পড়ায়, পরে "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্যের এত অবনতি ঘটিয়াছিল যে, পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করিবার আর প্রয়োজন আছে, এইরূপ বিবেচনাই করেন নাই।

শ্রীসুশীলকুমার দে

—o—

'আহুঠ', 'আউট' ও সার্দ্ধ-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী *

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দান-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন,—

'হাথে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ্ন।
আইস ল রাধা লেখা করি দান॥ ১॥
আঁহুঠ হাথ কলেবর তোর।
দুই কোটি দান তাহাত মোর॥ ২॥' (৫৪—৫৫ পৃষ্ঠা)

'আমি কানু হাতে খড়ী লইয়া বলিতেছি, ওলো রাধা, আয়, দান (শুল্ক) হিসাব করি। তোর শরীর "আহুঠ" হাত পরিমাণের; তাহাতে আমার (প্রাপ্য) দান দুই কোটি।'

নৌকা-খণ্ডে এই শব্দ পুনরায় মিলে। রাধা খেয়ানিয়া-বেশী শ্রীকৃষ্ণের নৌকায় চড়িয়াছেন। ছোট নৌকা; তাঁহার মনে ভয় হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন,—

'আহুঠ হাথ নাঅ খানী তোর পাঁচ পাটে।
অনেক যতনে আনি চাপাইল ঘাটে॥' (১৫৩ পৃষ্ঠা)

'তোমার নৌকা খানি "আহুঠ" হাতের, পাঁচখানি মাত্র পাটাতনে নির্ম্মিত; অনেক কষ্টে তুমি তাহাকে ঘাটে আনিয়া ভিড়াইয়াছ।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় উক্ত গ্রন্থের যে উৎকৃষ্ট 'ভাষা টীকা' দিয়াছেন, তাহাতে 'আহুঠ' শব্দের অর্থ 'আট' ধরিয়াছেন। 'রাধার শরীর আট হাত' ('আহুঠ হাথ কলেবর তোর'—৫৫ পৃষ্ঠা)—এই অস্বাভাবিক উক্তির ব্যাখ্যার চেষ্টা বসন্ত বাবু এই বলিয়া করিয়াছেন,—' "হাথ" শব্দে পাণিতল (১০ অঙ্গুলি) ধরিলে, রাধার দেহের উচ্চতা ৩৷· হাতের কিছু কম হয়।' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ৪৮৮)। এতদ্ভিন্ন, বসন্ত বাবু 'আহুঠ' শব্দের অবস্থান প্রাচীন বাঙ্গলা ও আসামী পুস্তক হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন; যথা,—

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ডে,—

'স্বর্গে রাজ্য করে "আউট" কোটি বৎসর।' (পৃঃ ৪৮৮)

গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

' "আউট" হাত প্রমাণ আমার কলেবরে।' (পৃঃ ৫৫৪)

মাধব কন্দলি কৃত সুন্দরাকাণ্ডে—

' "আউঠ" হাতের কেশ এক গোটা বেণী।' (পৃঃ ৫৫৪)

আপাত-দৃষ্টিতে, শরীরের পরিমাণ 'আট' হাত—এইরূপ উক্তি প্রাচীন বাঙ্গলায় একাধিক স্থানে মিলিতেছে। 'আহুঠ' শব্দকে আটের সহিত সংযুক্ত করায় কিন্তু শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে একটু গোল ঠেকে। 'অষ্ট' হইতে 'আহুঠ—আউট' হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ অন্তরায় আছে;

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

'অষ্ট' > 'অট্‌ঠ' > 'আঠ' > 'আঠ্‌' 'আট্‌', এই তদ্ভব রূপে বিনা কারণে 'হ' অক্ষরের আগমন সম্ভব নহে। 'আট হাত শরীর'—অর্থ-গত অসামঞ্জস্যও রহিয়াছে।

বহুকাল ধরিয়া 'আহুঠ' শব্দের কোনও সন্তোষ-জনক সমাধান পাই নাই। কিছুকাল হইল, ভারতীয় অন্যান্য আর্য্য ভাষায় এই শব্দটী পাইয়াছি, এবং তাহাতে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি। 'আহুঠ—আউট' শব্দের অর্থ 'সাড়ে তিন'; ইহার মূল-রূপ হইতেছে 'অর্দ্ধ-চতুর্থ', শব্দ।

রাজস্থানের পদ্মনাভ কবি সংবৎ ১৫১২ (=খ্রীষ্টীয় ১৪৫৬) সালে 'কান্‌হড দে-প্রবন্ধ' নামে এক উৎকৃষ্ট বীর-রসাত্মক কাব্য-গ্রন্থ লেখেন। এই পুস্তকের ভাষাকে 'প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী' নাম দেওয়া হইয়াছে; এই ভাষা হইতে আধুনিক গুজরাটী ও মাড়োয়ারী ভাষা-দ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। (এ সম্বন্ধে ১৯১৪-১৬ সালের Indian Antiquary পত্রিকায় পরলোকগত L. P. Tessitori ডাক্তার এল্‌, পি, তেস্‌সিতোরী কৃত Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। 'কান্‌হড-দে-প্রবন্ধ' কাব্যে মুসলমান সুলতান 'অলাউ-দ্‌-দীন খল্‌জীর সেনাপতি অলফ খান কর্ত্তৃক অণহিলপাটন ও গুজরাট জয়, সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংস-সাধন ও তৎপরে মুসলমান-কর্ত্তৃক ঝালোরের রাজা কান্‌হড দের রাজ্যজয়ের সবিস্তর কথা, ও আনুষঙ্গিকভাবে রাজপুত-জাতির অসাধারণ শৌর্য্যের কথা বর্ণিত আছে। আমেদাবাদের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ডাহ্যাভাই পীতাম্বর দেরাসরী এই কাব্যের এক উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন (আমেদাবাদ, ইউনিয়ন প্রিন্টিঙ্‌ কোম্পানী লিমিটেড, ১৯১৩ সাল)। এই কাব্য পাঠ করিতে করিতে এই চৌপাইটী পাইলাম—

বীরমদেবি সংঘাসণ কাজ   উঠ দীহাডা কীধূ রাজ ॥২৯২॥ (পৃঃ ৯৯)

'বীরমদেবের সিংহাসন কাজ (হইয়াছিল এই, যে তিনি) 'উঠ' দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।' শ্রীযুক্ত দেরাসরী 'বিবেচন' বা টীকায় 'উঠ দীহাডা' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'সাডাত্রণ দিবস'='সাড়ে তিন দিন'।

স্বতঃই প্রাচীন বাঙ্গলার 'আহুঠ' শব্দের কথা মনে হইল।

A. F. Rudolf Hoernle হোরন্‌লে কৃত Comparative Grammar of the Gaudian Languages (1880) পুস্তকে 'আহুঠ' 'উঠ' শব্দের পূর্ণ সমাধান আছে। 'আহুঠ, আউট' শব্দ আধুনিক বাঙ্গলায় নাই বলিয়া, বহু পূর্ব্বে হোরন্‌লের বই আলোচনা কালে এই শব্দগুলি আমার দৃষ্টিপথ এড়াইয়া যায়। ঐ বইয়ে §§ ৪১৩—৪১৬ প্যারায় (পৃঃ ২৬৮—২৭০) আধুনিক আর্য্য ভাষায় ভগ্ন-সংখ্যা-বাচক শব্দ-সমূহের বিচার আছে। তদ্ভিন্ন Kellogg কেলগের হিন্দী ব্যাকরণে সংখ্যা-বাচক শব্দের পর্য্যায়টীও দর্শন-যোগ্য।

সংস্কৃতে সার্দ্ধ-সংখ্যা বুঝাইতে গেলে, বিশেষ বিশেষ সংখ্যা-নামের, বা প্রায়শঃ তাহাদের ক্রম-বাচক রূপের, পূর্ব্বে 'অর্দ্ধ' শব্দ যোগ করিয়া নিষ্পন্ন পদের প্রয়োগ আছে। যে সংখ্যার সার্দ্ধ-রূপ জানাইতে হইবে, 'অর্দ্ধ' শব্দকে তদূর্দ্ধ সংখ্যার ক্রম-বাচক রূপের পূর্ব্বে জুড়িয়া দিতে হয়; কেবল 'সার্দ্ধ এক' জানাইবার জন্য এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায়; এখানে 'দ্বি' শব্দেরই প্রয়োগ

হয়, ইহার ক্রম-বাচক 'দ্বিতীয়' পদের আগম নাই; এবং 'অর্দ্ধ' শব্দ 'দ্বি'র পূর্ব্বে না বসিয়া, পরে বসে। সার্দ্ধ-সংখ্যা-বাচক পদ, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, টিউটনিক প্রভৃতির মাতৃ-স্থানীয় ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি-আর্য্য ভাষায় এই রীতিতেই হইত, ইহা অনুমান করা যায়। টিউটনিক ভাষাগুলিতে এই রীতি; যেমন, জারমান ভাষায়, anderthalb = দ্বিতীয় অর্দ্ধ = দ্ব্যর্দ্ধ = ১½; drittehalb = তৃতীয়-অর্দ্ধ = ২½; viertehalb = চতুর্থ অর্দ্ধ = ৩½, ইত্যাদি। আংগ্লো-সাক্সন বা প্রাচীন-ইংরেজিতেও এই রীতি। গ্রীকেও কচিৎ পাওয়া যায়; যেমন tríton hēmitálanton = তৃতীয় অর্দ্ধ-তালান্ত = অর্দ্ধ-তৃতীয় বা আড়াই টালেণ্ট অর্থ। 'অর্দ্ধ-তৃতীয়' = যাহার (পূর্ণ এক ও দুইয়ের পর) তৃতীয় হইতেছে মাত্র অর্দ্ধ; তদ্রূপ 'অর্দ্ধ-চতুর্থ' = যাহার (এক, দুই ও তিনের পর) চতুর্থ হইতেছে অর্দ্ধ; এইরূপ চিন্তা-প্রণালীতে এই প্রকারের পদের উদ্ভব।

আধুনিক আর্য্য-ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত ভগ্ন- বা সার্দ্ধ-সংখ্যা-দ্যোতক পদগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষা হইতেই গৃহীত। নিম্নে ভারতীয় আর্য্য (সংস্কৃত) সার্দ্ধ সংখ্যা-বাচক পদ ও তাহাদের ক্রম-বিকাশে উৎপন্ন আধুনিক রূপ প্রদর্শিত হইল।

½ = 'অর্দ্ধ' > 'অদ্ধ' > 'অদ্ধ' > আধ', সমাসে কুত্রচিৎ 'অধ'; এই রূপটী প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই মেলে। বাঙ্গলা-ভাষার মূল মাগধী-প্রাকৃতের বিশেষত্ব ছিল, র-যোগে দন্ত্য-ধ্বনির মূর্দ্ধন্যীকরণ; 'অর্দ্ধ' হইতে 'অড্‌ঢ', 'আঢ', 'আড়' রূপই বাঙ্গলার বিশিষ্ট, নিজস্ব রূপ হওয়া উচিত। 'আড়পাগ্‌লা' = 'আধ-পাগ্‌লা', 'আড়-মাদ্‌লা', 'আড়ে গেলা' = 'অর্দ্ধচর্ব্বিত করিয়া গেলা' প্রভৃতি শব্দে এই 'অড্‌ঢ' > 'আড়' রূপ বিদ্যমান। (শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' দ্রষ্টব্য)। তদ্ভিন্ন 'দেড়', 'আড়াই' শব্দেও এই মূর্দ্ধন্য-যুক্ত 'অড্‌ঢ' পদ বিদ্যমান। (নিম্নে দ্রষ্টব্য)। গুজরাটীতে 'অড়াধা' = 'আড়' + 'আধ' — এই পদে দুই ভিন্ন ভিন্ন আর্য্য-ভাষার মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য রূপের মিশ্রণ দেখা যাইতেছে।

১½ = 'দ্ব্যর্দ্ধ': (১) 'দ্বি-অর্দ্ধ' > '* দি-অড্‌ঢ' > '* দিঅঢ' > 'দেঢ' (হিন্দী, উড়িয়া), 'দেড়' (বাঙ্গলা), দীড় (মারহাট্টী); (২) 'দ্বি-অর্দ্ধ' > '* দি-অড্‌ঢ' > '* ডি-অড্‌ঢ' > 'ডেরঢ়'; 'ডেঢ়, ডেড়' (হিন্দী), 'ডেঢ়, ডেওঢ়া' (পাঞ্জাবী), 'ডেড়' (বাঙ্গলা কথ্য ভাষায়), 'ডেঢ়' বা 'ডেঢ' (সিন্ধী); (৩) 'দ্বি-অর্দ্ধ > '*দো-অড্‌ঢ' বা '*ডো-' > 'ডোরঢ়', 'ডোঢ়'; 'দোঢ়', 'দোহোড়' (গুজরাটী); 'ডোঢ়া, ডোঢ়া' (হিন্দী), 'দোঢ়, ডূঢা, ডূঢ়' (পাঞ্জাবী)। গুণন-কালে হিন্দীতে 'ডোঢ়া, ডেঢ়া' পদের ব্যবহার হয়।

২½ = 'অর্দ্ধ-তৃতীয়' (১) 'অড্‌ঢ-তিতীয়' > 'অড্‌ঢতীয়, -তিয়' (উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থে haplology বা 'সকৃদবস্থান' দ্বারা একটী 'ত'-কারের লোপ; অশোকের অনুশাসনে 'অঢতিয়' = 'অড্‌ঢতীয়') > '* অড্‌টইয়' > '* অঢ্‌ঈ' > 'অঢ়ী'; (গুজরাটী) 'অড়ী, হড়ী'; (২) '* অড্‌ঢ-তৃতীয়' > '* অড্‌ঢ-অঈয়' > '* অড্‌ঢাঈয়' 'অড্‌ঢাইঅ' > 'অঢ়াঈ'; 'অঢ়াঈ', 'ঢাঈ' (হিন্দী), 'অঢ়াঈ' (সিন্ধী), 'ঢাঈ', 'টাঈ' (পাঞ্জাবী), 'আড়াই' (বাঙ্গলা); (৩) '* অড্‌ঢ-তৃতীয় > 'অড্‌ঢ-তিয্য' > '* অড্‌ঢ-অইজ্জ' > '* অড্‌ঢইজ্জ > '* অঢ়ীজ্জ' > 'অডীচ' (মারহাট্টী)।

৩३ = 'অর্দ্ধ-চতুর্থ' > '* অড্‌ঢ-চতুট্‌ঠ' > '* অড্‌ঢ-যহুট্‌ঠ' > 'অড্‌ঢ-অউট্‌ঠ' '* অড্‌ঢউট্‌ঠ' > '* অড্‌ঢুট্‌ঠ'; পরে, খুব সম্ভবতঃ অর্ব্বাচীন প্রাকৃত বা অপভ্রংশে, '* অঢুট্‌ঠ'; তদনন্তর উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ দুই মূর্দ্ধন্য মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঢ' ও 'ট্‌ঠ'এর একটীকে 'হ' কারে আনীত করিয়া, '* অহুট্‌ঠ', 'আহুঠ'। কিংবা '* অদ্ধ চতুট্‌ঠ', '* অদ্ধ-অউট্‌ঠ' > 'অদ্ধুট্‌ঠ' (জৈন-প্রাকৃতে)। প্রাচীন বাঙ্গলায় আদ্য অক্ষর 'অ-কার' কে 'আ'তে রূপান্তরিত করিবার দিকে বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়; তদনুসারে বাঙ্গলায় 'অহুট্‌ঠ' > 'আহুঠ' রূপ, যাহা চতুর্দ্দশ শতকের বাঙ্গলায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে) ও 'আউঠ' রূপে আসামীতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গলায় (পঞ্চদশ শতকের পরে) 'হ' লোপে ও মহাপ্রাণ 'ঠ'র প্রাণ বর্জ্জনে এই শব্দের রূপ 'আউট'। আধুনিক বাঙ্গলায় এই শব্দ লুপ্ত। পাঞ্জাবীতে ও হিন্দীতে এই শব্দ মেলে—হিন্দী রূপ 'হূঁঠা,' 'হৌঁঠা,' হূঁটা', 'হৌঁটা', বা 'হোটা'; পাঞ্জাবী রূপ—'উঠা' 'উঁটা', 'উঠা' (হোয়র্ন্‌লের পুস্তক দ্রষ্টব্য); পুরাতন রাজস্থানী 'কান্‌হডদে প্রবন্ধ' কাব্যে—'উঠ', আধুনিক রাজস্থানীতে 'হূঠা'। 'হূঁটা', 'হৌঁটা', 'হোটা' প্রভৃতি হিন্দীতে ও অন্য ভাষায় গুণনকালে, বিশেষতঃ ভরীপের সময় ব্যবহৃত হয় (Kellogg কৃত হিন্দী ব্যাকরণ দ্রষ্টব্য)।

প্রাচীন মৈথিলীতেও এই শব্দ পাইয়াছি। মৈথিলী ভাষার প্রাচীনতম পুস্তক, যাহার সম্বন্ধে আমরা কোনও খবর পাইয়াছি, তাহা হইতেছে, কবিশেখর জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের রচিত 'বর্ণ-রত্নাকর'। এই বই খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম পাদে (১৩০০—১৩২৫তে) লেখা হয়। * 'বর্ণরত্নাকর'এর মূল পুথির ১৮খ সংখ্যক পাতায় 'অহুঠ' শব্দ পাওয়া যায়। নায়কের শয়ন-বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শয্যার বিবরণ দিতেছেন :—'স্ফটিকক দণ্ডা, পদ্মরাগক দণ্ডিআ, অহুঠ হাথ দীর্ঘ, অঢ়াএ হাথ ফাণ্ড সেজ' = 'স্ফটিকের দাঁড় (= পায়া, পদ্মরাগের দাঁড়ী (= ছাপরের খুঁটী), সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ, আড়াই হাত ফাঁড়ের শয্যা'। 'আট হাত লম্বা' বিছানার কথা শুনা যায় না; তদ্ভিন্ন বর্ণরত্নাকরে 'আট' অর্থে 'আঠ' শব্দের প্রয়োগ বহুবার আছে, কিন্তু এই স্থান ভিন্ন অন্যত্র 'অহুঠ' রূপ নাই। Kellogg এর ব্যাকরণ অনুসারে, এই শব্দের রূপ আধুনিক মৈথিলে 'হুঠা, হুঠে, হুট্‌ঠা, হুঠা, হুট্‌ঠে'; মগহীতে 'হুঠা, হুঠা'; ভোজপুরিয়াতে 'হুঁঠা, অংগুঠা, অংগূঢ়া'।

---

* ইহার একমাত্র পুথি বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে; পুথিখানির লেখার তারিখ ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ। বইখানি গদ্যে লেখা; ইহা একখানি অভিধান বা শব্দ সংগ্রহের মত বই, নানা বিষয়ের বর্ণনা-ব্যপদেশে বহু মৈথিল ও সংস্কৃত শব্দ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেমন 'নগর-বর্ণনে' নগরস্থ সমস্ত জাতি ও ব্যবসায়ী প্রভৃতির তালিকা, 'রাজসভা-বর্ণনে' রাজার অনুচর পার্শ্বচরাদির নামের তালিকা; 'নায়িকা-বর্ণনে' অলঙ্কার প্রসাধনাদির বর্ণনা আছে, তদ্রূপ মৃগয়া অভিষেক ভোজনাদির ও বর্ণনা আছে। মৈথিলের প্রাচীন স্বরূপ ও ব্যাকরণ জানার পক্ষে এই বইয়ের সহায়তা অমূল্য। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র ভূমিকায় সিদ্ধাচার্য্যগণের নাম আলোচনা-কালে 'বর্ণ-রত্নাকর'এর উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে প্রাপ্ত সিদ্ধাদের তালিকাও দিয়াছেন। এই বই এর মূল পুথিখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত এক নকলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই পুস্তক প্রকাশ করিবার কথা হইতেছে।

'অদ্ধ্‌ট্‌ঠ' শব্দ (জৈন) অর্দ্ধ-মাগধীতে পাওয়া যায়। 'অর্দ্ধ-চতুর্থ' শব্দের 'অদ্ধ্‌ট্‌ঠ'তে পরিবর্ত্তন, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্ব্বেকার নহে। সংস্কৃতে 'অদ্ধ্‌ট্‌ঠ'র কি রূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে অর্ব্বাচীন কালের পণ্ডিতেরা ঠিক করিতে না পারিয়া, প্রাকৃত শব্দের অনুকরণে সংস্কৃতে 'অধ্যুষ্ট' এই একটী কৃত্রিম শব্দের সৃষ্টি করেন। 'অধ্যুষ্ট' কচিৎ সংস্কৃতে প্রযুক্ত দেখা যায়; যেমন 'অধ্যুষ্ট-বলয়'='সাড়ে তিন পাকের তাগা বা বালা; সাড়ে তিন পাকে জড়াইয়া সাপের অবস্থান' (Monier Williams এর সংস্কৃত অভিধান দ্রষ্টব্য)।

৪½='অর্দ্ধ-পঞ্চ' বা 'অর্দ্ধ পঞ্চম' > '*অড্‌ঢ় পঞ্চম' > '*অড্‌ঢ় পঞ্চৱঁ' > '*অড্‌ঢ়উঞ্চঅ' > 'ঢৌঁচা' (পাঞ্জাবী), 'ঢোঁচা' (হিন্দী), 'ঢ়চা' (রাজস্থানী), 'ধোঁচা, ধোঁচে ঢোঁচে, ঢৌঁচহ, ঢোচা' (মৈথিলী), 'ধোঁচা' (মগহী) 'ধমুচা, ধঙ্গুচা' (ভোজপুরিয়া)। 'হুঠা' প্রভৃতির ন্যায় এই শব্দ জহুরীদের কাজে ও গুণনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫½=হিন্দী 'পোঁচা'; মৈথিলী 'পহুঁচ', পহুঁচে, পোঁচা'; মগহী, ভোজপুরিয়া 'পহুঁচা'।

৬½= হিন্দী 'খোঁচা', মৈথিলী 'খোঁচ', খোঁচে, খোঁচা', মগহী 'খোঁচা', ভোজপুরিয়া 'বিছিয়া'।

৭½=হিন্দী 'সতোঁচা', মৈথিলী 'সতোঁচা', মগহীতে এই শব্দ নাই, ভোজপুরিয়া 'চলোসা'।

৫½, ৬½, ও ৭½এর জন্য শব্দগুলি আধুনিক; আদি আর্য্য ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয় না। হোর্ন্‌লে ও কেলগ-এর মতে এই পদগুলি 'ধোঁচা'=৪½ এর অনুকরণে সৃষ্ট। সংস্কৃতে কিন্তু ৫½='অর্দ্ধ-ষষ্ঠ', ৬½='অর্দ্ধ-সপ্তম' ইত্যাদি পদের প্রচলন ছিল। আমরা 'সাড়ে বার' অর্থে 'অর্দ্ধ-ত্রয়োদশ' এর প্রয়োগ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাই।

আড়াইয়ের ঊর্দ্ধ সার্দ্ধ-সংখ্যা জানাইতে হইলে সাধারণতঃ 'সাড়ে, সাড়ে' শব্দের প্রয়োগ হয়। এই 'সাড়ে, সাড়ে' শব্দের মূল, 'সার্দ্ধ-ক' শব্দ; 'সার্দ্ধ-ক' < 'সড্‌ঢ অ' < *'সাড়া'; ইহার তির্য্যক্ রূপ, বহুবচনার্থে, 'সাঢ়ে', 'সাড়ে'='সড্‌ঢ হ'; এ-কার দ্বারা বহুবচন দ্যোতন—তুলনীয়, হিন্দী 'ঘোড়া'—বহুবচন 'ঘোড়ে'। গুজরাটীতে আমাদের 'সাড়ে' শব্দের প্রতিশব্দ হইতেছে 'সাড়া'; এই আ-কারান্ত রূপ বহুবচনের; এক বচনে '*সাড়ো' হইত।

বাঙ্গলা দেশে, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কোথাও না কোথাও, 'অর্দ্ধ-চতুর্থ' > 'আহুঠ, আউট'= ৩½, ও 'অর্দ্ধ-পঞ্চম' > 'অঢোঁচা, ঢোঁচা'=৪½, শব্দের অনুরূপ শব্দ এখনও বিদ্যমান থাকা সম্ভব। এ সম্বন্ধে, আশা করি যিনি এইরূপ শব্দ পাইয়াছেন, বা যাঁহার জরীপ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকার দরুন পাইবার সম্ভাবনা আছে, তিনি আমাদের কৌতূহল দূর করিবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

—o—

শুদ্ধিপত্র

অধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়-লিখিত ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রিংশ ভাগের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" প্রবন্ধের ভ্রম-সংশোধন—

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৭		২১	Acoustics	ও Acoustics
৭৮		২	ফবে	ঠেকিবে
৮১	১ম	২০	নিত্যগুণস্থ	নিত্যগুণক
৮১	,,	২৩	Endosmore	Endosmose
৮১	২য়	৬	নিস্তালন	নিশ্চালন
৮১	২য়	২১	বলসমাস্তরিক	বলসামান্তরিক
৮২	১ম	১১	Harmonies	Harmonics
৮২	,,	১৩	tcurniquest	tourniquet
৮২	২য়	২৮	যন্ত্রের	দণ্ড যন্ত্রের
৮৪	১ম	২৭	goses	gases
৮৪	২য়	২২	দণ্ডচক্র	দন্তচক্র
৮৫	২য়	১	Rive's	Tour's
৮৬	১ম	৭	আশ্বাসতা	আস্থানতা

—০—

অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্ম এবং সংস্কার *

সমাজ ও সামাজিক-জীবন ব্যতীত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা লৌকিক ধর্ম্ম, ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কার প্রভৃতির বিবরণ পাই। যদিও উহা খুব অল্প, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের উত্তরাংশের তাৎকালিক সমাজের ধর্ম্মজীবন এবং লোকসাধারণের মানসিক অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া ইহার মূল্য কম বলা যায় না।

অর্থশাস্ত্র ধর্ম্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যার গ্রন্থ নহে বা উহাতে কৌটিল্য ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম—এই ত্রিবর্গের আপেক্ষিক মর্য্যাদা প্রভৃতি লইয়া বিশেষ কোন বাদানুবাদ করেন নাই। তাহা হইলেও অর্থশাস্ত্রে আমাদের জ্ঞাতব্য অনেক কথাই পাওয়া যায়। বিদ্যা-সমুদ্দেশ অধ্যায়ে আমরা জ্ঞানের ভিত্তিমূলক শাস্ত্রসমুদায়ের উদাহরণ পাই। এই সম্পর্কে কৌটিল্য আন্বীক্ষকী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। আবার, আন্বীক্ষকী বা তর্কশাস্ত্রের (চিন্তামূলক দর্শনের) উদাহরণ-স্বরূপ তিনি সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়তের কথা বলিয়াছেন (সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষকী।—অ° শা° পৃঃ ৬)। এগুলি দেখিয়া কৌটিল্য-সম্বন্ধে একথা অবিসংবাদিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, অসংখ্য রাজনৈতিক লেখকদিগের মধ্যে তিনিই পর বিজ্ঞানকে (Metaphysics) উহার উপযুক্ত স্থান দিয়াছেন এবং উহাকে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া মানিয়াছেন।[১] অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষকীর বিবরণ আমরা পাই না বলিলেই হয়; বর্ত্তমান রচনাতেও তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সাংখ্য এবং যোগ-সম্বন্ধে আমরা বিশদভাবে কিছুই পাই না এবং লোকায়তের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলিলেই হয়। লোকায়তিকেরা অবশ্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনাদিতে নাস্তিক—পার্থিবসুখপ্রয়াসী বেদবিরোধী জড়বাদী বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছেন।

লোকায়ত-দর্শনের সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা অর্থশাস্ত্রে নাই। তবে কামসূত্র এবং সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থাদিতে আমরা যাহা পাই, তাহাতে বোধ হয় যে, লোকায়তিকেরা পরলোকে অবিশ্বাসী ছিলেন এবং পার্থিব ইন্দ্রিয়সুখই যে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা তাঁহারা প্রচার করিতেন।

অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত বেদের বিরুদ্ধবাদীদিগের এবং ব্রাহ্মণদিগের শত্রুদের মধ্যে বৌদ্ধেরা এবং আজীবকেরাই প্রধান। কৌটিল্য সিদ্ধতাপস ভিন্ন ইহাদের আর সকল সম্প্রদায়েরই উপর বিদ্বেষ-ভাবসম্পন্ন। সিদ্ধতাপসদের কথা আমরা পরে বিশেষরূপে বলিব। এই সকল দলের প্রতি কৌটিল্যের বিদ্বেষভাব তৎকালীন লৌকিক বিরাগেরই পরিচায়ক। ইহার বিবরণ অপরাপর অনেক পুরাতন গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

১। প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষকী মতা।

প্রকীর্ণক-নামক অধ্যায়ের কোনও বিশেষ স্থলে বৌদ্ধ এবং আজীবকদিগের কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। তথায় আমরা দেখি যে, যজ্ঞ উপলক্ষে অথবা পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডাদি প্রদান করিবার সময় যদি কেহ শাক্য বা আজীবকদিগের ন্যায় "বৃষল-প্রব্রজিত"দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন, তবে তাঁহার ১০০ পণ অর্থদণ্ড হইত ("শাক্যাজীবকাদীন্ বৃষল-প্রব্রজিতান্ দেবপিতৃকার্য্যেষু ভোজয়তঃ শত্যো দণ্ডঃ।"—অঃ শাঃ পৃঃ ১৯৯)। এই ব্যাপার এবং পাষণ্ডদিগের প্রতি প্রযুক্ত অপরাপর নিয়মাবলী হইতে এই সকল দলের উপর শাসন-কর্ত্তৃবর্গের মনের ভাব প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগকে গ্রামে থাকিতে কিংবা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দেওয়া হইত না। শ্মশানের নিকট তাহাদিগের আবাস থাকিত। (পাষণ্ডচণ্ডালানাং শ্মশানান্তে বাসঃ)।

"বানপ্রস্থাদন্যঃ প্রব্রজিতভাবঃ সজাতাদন্যঃ সঙ্ঘঃ সামুত্থায়িকাদন্যঃ সময়ানুবন্ধো বা নাস্য জনপদমুপনিবেশেত"।—পৃঃ ৪৮। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেন।

যদিও প্রধান দার্শনিক-সম্প্রদায়গুলির কথা অতি অল্প, তথাপি অর্থশাস্ত্রের বিবরণে লৌকিক ধর্ম্মের উপর আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করে এবং উহা সামাজিক বিজ্ঞান, ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রমবিকাশের তুলনাকল্পে বাস্তবিকই বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমরা যে ইহাতে কেবলমাত্র বহুসংখ্যক দেবদেবীর, রাক্ষস এবং প্রেতাত্মার পূজাকলাপ দেখিতে পাই, তাহা নহে, অদ্ভুত ক্রিয়াদি এবং প্রাচীন যুগের সংস্কার প্রভৃতিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আজ পর্য্যন্ত উহাদের অনেকগুলি প্রচলিত আছে। কৌটিল্যের সময়ের দেবদেবীর মধ্যে কতকগুলি বৈদিক যুগে এবং অপরগুলি নিঃসন্দেহে তৎপরবর্ত্তী যুগে প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বশ্রেণীর ভিতর ইন্দ্র, যম, বরুণ, সবিতা, অগ্নি, সোম, অদিতি, অনুমতি, সরস্বতী ইত্যাদির নাম অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গের দেবতাদিগের মধ্যে কেবল ইন্দ্রই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। অনাবৃষ্টির সময়ে ইন্দ্রকে শচীনাথরূপে বৃষ্টিদানের নিমিত্ত আহ্বান করা হইত (পৃঃ ২০৬, ১, ১০)। ঐন্দ্রাবার্হস্পত্য নামক ক্রিয়াতে ও বন্ধ্যানারীকে পুত্রদানের এবং গর্ভস্থিত শিশুর গুণবৃদ্ধির জন্যও ইন্দ্রের পূজা করা হইত। পরলোকগত মৃতব্যক্তিদিগের নিয়ামক বা দণ্ডকর্ত্তা-হিসাবে যম তাঁহার পূর্ব্বপদ বজায় রাখিয়াছিলেন এবং বরুণও মন্দকর্ম্ম বা কুকার্য্যাচরণেচ্ছুর দমনকারী বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পূজিত হইতেন।

এ সকল ছাড়া আমরা পরবর্ত্তি যুগের কতকগুলি দেবতা-সম্বন্ধে অনেক আভাস পাই। যথা,—কোনও নূতন নগর বা দুর্গ নির্ম্মিত হওয়ার পর, তাহার কতকগুলি অবশ্যকরণীয় ক্রিয়া-কলাপের সম্পর্কে কতকগুলি দেবতার উল্লেখ পাই। তাহাদের পূজায় নূতন নগরবাসীদিগের শান্তি এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইত বলিয়া কৌটিল্য মনে করিতেন। সেই সকল দেবতার নাম,—অপরাজিত, অপ্রতিহত, জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বি, শ্রী এবং মদিরা। (অপরাজিতাপ্রতিহত-জয়ন্তবৈজয়ন্তকোষ্ঠকান্ শিববৈশ্রবণাশ্বিশ্রীমদিরাগৃহং চ পুরমধ্যে কারয়েৎ।—অঃ শাঃ পৃঃ ৫৫—৫৬) এই সকল দেবতাদিগের সম্মানের জন্য নগরমধ্যে (দুর্গমধ্যে) মন্দির নির্ম্মাণ করা হইত। এই সকল

দেবতাদের মধ্যে প্রথম চারিটির নাম জৈন-গ্রন্থ 'উত্তরাধ্যয়নসূত্রে' পাওয়া যায়, কিন্তু এই সমুদায় দেবতার পূজার বা সার্থকতার কথা কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। দেবতাদিগের নামগুলির অর্থ কিন্তু খুব স্পষ্ট। অপরাজিত এবং অপ্রতিহত অর্থে শত্রুদিগের দ্বারা অবিজিতকে বুঝায়; জয়ন্ত এবং বৈজয়ন্ত শব্দে 'রণে বিজয়ী'—বিজয়দাতা বুঝায়। ইঁহাদিগকে আমরা যুদ্ধের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলিয়া লইতে পারি। ইঁহাদিগের সঙ্গে আমরা শিবের পূজার উল্লেখ দেখি (আশীর্ব্বাদ বা মঙ্গল-দাতা)। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেও শৈবদিগের সংখ্যা অত্যধিক। বৈশ্রবণ কিংবা কুবের—ইনি ছিলেন ধনাধিপতি, ইঁহার পূজা উপাসকদিগের ধনসম্পদ্ আনয়ন করিত। অশ্বিদ্বয় ছিলেন দেব-চিকিৎসক, ইঁহাদিগকে চিকিৎসা-পারদর্শী বলিয়া জনসাধারণ ভক্তি করিত; শ্রী বা লক্ষ্মী প্রাচুর্য্য এবং সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন—ইনি বৈদিকযুগের শেষার্দ্ধাংশ হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। শতপথব্রাহ্মণে ইনি প্রথম উল্লিখিত হন [শতপথ ব্রাঃ—পৃঃ ১১, ৪-৩ বিঃ; Buddhist India, পৃঃ ২১৭-২২০], পরে ইঁহার বিশেষ উল্লেখ আছে। অবশেষে মদিরার কথা বলা হইয়াছে। মদিরার বিষয়ে আমরা পূর্ব্ববর্ণনা হইতে এই জানিতে পারি যে, ইঁহার স্থান নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। পরবর্ত্তিকালে এই দেবী মহাদেবী দুর্গা বলিয়া কথিতা হন। উক্ত যুগে সম্ভবতঃ ইনি উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার নাম মদিরা (wine) দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত সময়ে মদিরার প্রচলন খুব বেশী ছিল।

ইহার পর চারি দিকের চারিটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ পাই। (যথাদিশং চ দিগ্দেবতাঃ)। উপযুক্ত স্থানেই ইঁহাদের মন্দিরাদি ছিল। নগরের চারিটি দ্বার চারিজন দেবতার উদ্দেশে উৎ-সর্গীকৃত হইত। উক্ত দেবতাদের নাম ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম ও সেনাপতি। (ব্রাহ্মৈন্দ্রযাম্যসৈনাপত্যানি দ্বারাণি ..)। দুর্গমধ্যে কুমারী দেবীর পূজার জন্য একটি মন্দির নির্ম্মিত হইত।

এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল নগরীতেই কোনও না কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কিংবা নগররাজ-দেবতার উদ্দেশে মন্দির উৎসর্গ করা হইত (ততঃ পরং নগররাজদেবতাঃ)।

গ্রামেও গ্রামবাসীদিগের নিজের দেবতা থাকিত। অর্থশাস্ত্রের একাধিক স্থলে আমরা তাহার উল্লেখ পাই। আমরা দেখি যে, গ্রাম্য দেবতার সম্পত্তি গ্রামের মাতব্বর লোকদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। অপর কোনও স্থানে কৌটিল্য স্থানীয় দেবতাদিগের নামে বৃষ উৎসর্গের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৪৮, ১৭১ ও ১৭২, গ্রামদেববৃষাঃ)। উহারা অবধ্য ছিল।

পারিবারিক দেবতার কথাও আমরা পাই। তাহারা গৃহস্থালী বা ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা ছিলেন।

যে সকল দেবতাদিগের কথা বলা হইল, ইঁহাদের প্রত্যেকের পূজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান, এবং ইঁহাদিগের মন্দিরাদির পরিচালনের নিমিত্ত ক্ষেত্রাদি সংলগ্ন ছিল। অর্থশাস্ত্রের সময়ে এ সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একজন পৃথক্ দেবতাধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিল।

সে সময়ে প্রতিমাদিরও প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়, তবে সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই পাই না। অন্ততঃ দুই স্থলে দেবতাদিগের প্রতিমার উল্লেখ দেখা যায় (দৈবতপ্রতিমানাং চ গমনে দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ।—পৃঃ ২৩৪, পং, ১৫; দেবধ্বজপ্রতিমাভিবা" পৃঃ ৪০০, পং, ১৯)।

অন্যান্য উপাস্য দেবতাদিগের মধ্যে নদী, পর্ব্বত এবং পবিত্র বৃক্ষাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথাও পাওয়া যায়। উপনিপাত-প্রতিকার অধ্যায়ে এক স্থানে আমরা বন্যা-নিবারণার্থ পর্ব্বদিনে নদী-পূজার কথা পাই (পর্ব্বসু চ নদীপূজাঃ কারয়েৎ)। গঙ্গাপূজার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ের মধ্যেই পর্ব্বতপূজার কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে (পৃঃ ২০৮ ও ২০৯, —পর্ব্বসু চ পর্ব্বতপূজাঃ কারয়েৎ)।

এই সমস্ত দেবতাগণের পূজার পরেই আমরা বিপদ্ দূরীকরণার্থ দানব, উপদেবতা এবং এমন কি, প্রাণিপূজার কথাও উল্লেখ করিতে বাধ্য। কৌটিল্যের সময়ে দানবপূজা খুব বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ঔপনিষদিক পরিচ্ছেদে অসুরদিগের মধ্যে আমরা বলি, বৈরোচন, শম্বর, ভণ্ডীরপাক, নরক, নিকুম্ভ এবং অন্যান্য অনেকের নাম উল্লিখিত দেখিতে পাই (পৃঃ ৪১৭—৪১৯)। ঘোটক ও হস্তিসমূহ হইতে ভূত দূরীকরণার্থ উপদেবতার পূজা সাধারণতঃ অমাবস্যার দিনেই সম্পন্ন হইত (কৃষ্ণসন্ধিষু ভূতেজ্যাঃ।—পৃঃ ১৮৩, পং ৯ ও পৃঃ ১৩৯, পং, ৬)।

প্রাণিপূজার মধ্যে সর্প, ইঁদুর, কুম্ভীর এবং ব্যাঘ্র পূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত পূজা পূর্ণিমা বা অমাবস্যার দিনেই সম্পন্ন হইত। ইহার মধ্যে সর্পপূজার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানা স্থানে ইহার কথা বলা হইয়াছে। "কোশাভিসংহরণম্" অধ্যায়ে ধনশূন্য রাজ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করার কৌশল বর্ণনার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, জীবন্ত সর্পকে শূন্যগর্ভ সর্প-প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইত। তাহাতে সর্পদেবতার উদ্দেশে কিছু দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে প্রবর্ত্তিত করা হইত (পৃঃ ২৬০)।

এতদ্ভিন্ন পবিত্র বৃক্ষ ও চৈত্যকে লোকে সম্মান প্রদান করিত। মাটির স্তূপ প্রভৃতিকেই সম্ভবতঃ চৈত্য বলা হইত। কতকগুলি চৈত্য বৃক্ষ এবং ধর্ম্মমন্দিরাদির সহিত সংলগ্ন থাকিত। ইহা বোধ হয়, ঐগুলি প্রাচীনতর আচারের বা বিশ্বাসের অঙ্গীভূত ছিল। এইগুলি রাক্ষস ও দুষ্টাত্মাদিগের আবাসস্থল বলিয়া পরিগণিত ছিল। "উপনিপাত-প্রতিকার" নামক অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, পর্ব্বদিনের সময়ে দানবভয়নিরাকরণার্থ ঐ সমুদায় চৈত্যের পূজা করা হইত। এ সম্বন্ধে আমরা আরও যে সমুদায় ক্ষুদ্র বিবরণ পাই, তাহাতে জানিতে পারি যে, চৈত্যস্থিত আত্মাদিগকে পতাকা, ছত্র এবং অপরাপর জিনিষ দিয়া সন্তুষ্ট করা হইত। ছাগবলির কথাও পাওয়া যায় (পর্বসু চ বিতর্দিচ্ছত্রোল্লোপিকাহস্তপতাকাচ্ছাগোপহারৈঃ চৈত্যপূজাঃ কারয়েৎ।—পৃঃ ২১০)। রাজসরকার হইতে চৈত্যগুলিকে রক্ষা করা হইত এবং কেহ যদি চৈত্যগুলির অনিষ্ট করিত, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইত (পৃঃ ১৯৭), যথা—

সীমবৃক্ষেষু চৈত্যেষু দ্রুমেষ্বালক্ষিতেষু চ।
ত এব দ্বিগুণা দণ্ডাঃ কার্য্যা রাজবনেষু চ॥

লোকের মনের উপর দানব, অপদেবতা বা অন্য প্রকারের দুষ্টাত্মার খুব আধিপত্য ছিল। দানবদিগের কথা অনেক জায়গায় আছে এবং "উপনিপাত-প্রতিকার" অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে,

অথর্ব্ববেদের পুরোহিতদিগকে তাহাদিগের দূরীকরণার্থ নিযুক্ত করা হইত। বলিতে কি, এই দানববিশ্বাস শাসনকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের জন্য ব্যবহৃত হইত।

লোকের মানসিক ভাব এইরূপ থাকাতে দৈবশক্তিতে, ভোজবাজী ও মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসের আর অবধি ছিল না।

লোকের অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হওয়ার কথা অনেক স্থলে সুপরিব্যক্ত আছে। যেমন সিদ্ধতাপস জটিল, মুণ্ড সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহারা বিনা আহারে অনেক দিন থাকিতে পারে; তাহারা তাহাদের উপাসকদিগের জন্য সম্পদ্ আনিতে পারে এবং সাধারণের ও নিজের মন্দ দূর করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা বলিয়া দিতে পারে। ইহাদের মধ্যে অনেকে বলিত যে, তাহারা এমন মন্ত্র-তন্ত্র জানে, যাহাতে রুদ্ধ দরজা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া যায়, স্ত্রীলোকের মনে ভালবাসা সঞ্চার হয়, কিংবা নূতন ক্ষত আরোগ্য হয়। এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে, এই সকল লোকের মধ্য হইতেই অপরাধীর অনুসন্ধানের জন্য বহুসংখ্যক রাজকীয় গুপ্তচর নিযুক্ত করা হইত।

ইহার সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্রাদিতে লোকের বিশ্বাস খুব প্রবল ছিল। দেবতার কোপই মহামারী দুর্ভিক্ষ এবং সংক্রামক ব্যাধির হেতু বলিয়া লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এবং রাজসরকারও সিদ্ধতাপস এবং অথর্ব্ববেদজ্ঞ লোকদিগকে আপদ্ নিরাকরণের জন্য নিযুক্ত করিতেন। কৌটিল্য নিজেও তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে আমরা বৃষ্টির জন্য তন্ত্রমন্ত্র (পৃঃ ২০৮ "মহাকচ্ছবর্দ্ধনম্" ক্রিয়া নদীর তীরে বৃষ্টির জন্য!—বর্ষাবগ্রহে শচীনাথগঙ্গাপর্ব্বতমহাকচ্ছপূজাঃ কারয়েৎ), এবং মহামারীর কবল হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সিদ্ধ ও তাপসেরা যে কঠোর তপ, জপ এবং প্রায়শ্চিত্ত করিত, তাহার উল্লেখ পাই (ঔষধৈশ্চিকিৎসকাঃ, শান্তিপ্রায়শ্চিত্তৈর্বা সিদ্ধতাপসাঃ)। অগ্নির আক্রমণ হইতে গ্রাম রক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বদিনে অগ্নিপূজা করা হইত (বলিহোমস্বস্তি-বাচনৈঃ পর্ব্বসু চাগ্নিপূজাঃ কারয়েৎ।)। মহামারী হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে ক্রিয়াগুলি করা হইত, তাহাতে অনেক নূতনত্ব আছে। এই সমস্ত উপলক্ষে কেবলমাত্র যে দেবতাদিগকেই আহুতি প্রদান করা হইত এবং 'মহাকচ্ছবর্দ্ধন' ক্রিয়া করা হইত, তাহা নহে শ্মশানে গোদোহন করা, মৃতদেহ (কবন্ধ) দাহ করা (তীর্থাভিষেচনং মহাকচ্ছবর্দ্ধনং গবাং শ্মশানাবদোহনং কবন্ধদহনং দেবরাত্রিং চ কারয়েৎ।—পৃঃ ২০৮) এবং রাত্রিতে দেবতাদের উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করা হইত।

কোন না কোন সাধনের জন্য লোকে আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া করাইত, যেমন অর্থ ও সম্পদ্ পাইবার জন্য, পুত্রজনন জন্য, স্ত্রীলোকের ভালবাসা পাইবার জন্য ক্রিয়াদি। অর্থশাস্ত্রের শেষ পুস্তকটি হইতে আমরা এই সমস্ত গুপ্ত বিদ্যার বা কৌশলাদির কথা জানিতে পারি। তাহাতে আমরা যে কেবলমাত্র শত্রুর অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য ঔষধ ও বিষের কথা পাই, তাহা নহে—ইহাতে অন্ধ, মূঢ়, বধির, ক্ষয়রোগগ্রস্ত এবং কুষ্ঠাক্রান্ত করিবার জন্য অনেক ঔষধ বা ক্রিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল ছাড়া ইহাতে এমন কতকগুলি বিধি-নিয়মের উল্লেখ আছে, যাহা পালন করিলে লোকে মাসাবধি উপবাস করিতে, অনেকদূর ভ্রমণ করিতে, অদৃশ্য হইতে, অথবা

অগ্নি ও ক্লান্তি হইতে নিরাপদ্ হইতে পারে। এ সমস্ত ব্যাপারের অধিকাংশই সিদ্ধ ও তাপসগণ দ্বারা সাধিত হইত। তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন; এমন কি স্বয়ং রাজারা তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতেন।

এইগুলির অধিকাংশই চৈত্যে কিংবা শ্মশানে অনুষ্ঠিত হইত। একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা আরও দেখি যে, এ সমস্ত গোপনীয় ব্যাপার কিংবা তাহাদের আশ্চর্য্যজনক ক্ষমতার উপর লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মনুষ্যশরীরের বিভিন্ন অংশে কিংবা অস্বাভাবিক মৃত্যুকবলিত নীচজাতীয় লোকের মস্তকের খুলিতে বিভিন্ন অদৃশ্য দৈবশক্তির আরোপ করা হইত। শ্মশানে দেবোদ্দেশে মদ্যদান ও প্রাণিবধ প্রভৃতি খুব ফলদায়ক বলিয়া ধারণা ছিল। এই সমস্ত উপরোক্ত ক্রিয়াগুলিতে যে তন্ত্রের এক-আধটু অধিপত্য আছে, তাহার আভাস দেয়। কিন্তু এগুলি অথর্ব্ব পুরোহিতগণ দ্বারা পরবর্ত্তিকালে উদ্ভাবিত অথবা প্রাচীন আচারের অনুকরণ মাত্র, বর্ত্তমানে আমরা উহার সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। যাহা হউক, এ সমস্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পরবর্ত্তিকালে তন্ত্রে পরিণত একটি ধর্ম্মমতের ও আচারের তখন ক্রমবিকাশ হইতেছিল।

এই সময়ে আবার অনেকগুলি বৈদিক যজ্ঞের প্রচলন ছিল,—স্নপন, অভিষেক, রাজসূয়, ক্রতু। বিশেষতঃ এই সমস্ত কার্য্যে নিয়োজিত পুরোহিতগণের প্রাপ্যের নিয়মাবলী হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। বৈদিক ধর্ম্মানুযায়ী এবং লোকের বিশ্বাসানুযায়ী কতকগুলি দিন বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। পর্ব্বদিন ব্যতীত আরও পবিত্র তিথির উল্লেখ আছে। এই সকল দিন বিশ্রাম দিন বলিয়া পরিগণিত হইত এমন কি, এই সকল দিনে শ্রমিকেরাও অতিরিক্ত বেতন ব্যতীত কাজকর্ম্ম করিত না (পৃঃ ১১৪)

উৎসবাদির বিশেষ প্রচলন ছিল। অন্য প্রকারের সম্মিলন ত ছিলই, তাহা ছাড়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সম্মিলন খুবই প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে পঞ্চরাত্র দেবরাত্রি উৎসব, যাত্রা ও সমাজের উল্লেখ আছে। জনসাধারণ এই সব সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া আনন্দোৎসবে ও উপাসনায় সময় যাপন করিত। মদ্যপান এই সকল উৎসবের একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং চারিদিনের জন্য মদ্য প্রস্তুতে কোন লাইসেন্স লাগিত না। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে উপাসনার জন্য বিশেষ বিশেষ সম্মিলনের কথাও উল্লেখ আছে (পৃঃ ২০৬ দেবরাত্রি)।

মানবজীবনে নক্ষত্রগণের প্রভাব সম্বন্ধে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সীতাধ্যক্ষ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, শস্য উৎপাদনে বৃহস্পতি ও শুক্রের প্রভাব আছে। জন্মনক্ষত্র ও জন্মতিথিতে নরপতিগণ পূজাদির অনুষ্ঠান করিতেন এবং উক্তদিনে তাঁহারা কয়েদীদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিতেন (বন্ধনাগারে চ বালবৃদ্ধব্যাধিতানাথানাং চ জাতনক্ষত্রপৌর্ণমাসীষু বিসর্গঃ :—পৃঃ ১৪৬)। কৌটিল্য নক্ষত্রের এরূপ শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু নক্ষত্রগণের সুখসম্পদ্ নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু এরূপ বিশ্বাসবান্ লোককে তিনি নিজে নিম্নলিখিতভাবে উপহাস করিতেছেন।—

নক্ষত্রমতিপৃচ্ছন্তং বালমর্থোঽতিবর্ত্ততে।
অর্থো হ্যর্থস্য নক্ষত্রং কিং করিষ্যন্তি তারকাঃ॥—পৃঃ ৩৫১।

জনসাধারণ কিন্তু এ গুলিতে বিশ্বাস করিত। করকোষ্ঠী হস্তগণনা শরীরের শুভাশুভ লক্ষণ নিরীক্ষণ (অঙ্গবিদ্যা) অন্তরচক্র ইত্যাদি দ্বারা অনেক লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। রাজা ও ধনীরা জ্যোতির্ব্বিদ্ মৌহূর্ত্তিক ভবিষ্যদ্বক্তা কার্ত্তান্তিক, নৈমিত্তিক ও কার্য্যলক্ষণবিদ্‌গণের (পৃঃ ২০৮) পরামর্শ লইতেন। জম্ভকবিদ্যা, প্রচ্ছন্নবিদ্যা, মায়াগত ইত্যাদিতে লোকের আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। জনসাধারণ এ সমস্ত বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ গ্রহণ এবং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিত।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুথি *

পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনকালে তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য যখন প্রেমভরে অচৈতন্য হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার সেই অলৌকিক প্রেমাবেশ দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, উড়িষ্যার রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম। বাসুদেব বাঙ্গালার নব্যন্যায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি যাঁহাকে কেবলমাত্র ভাবোন্মত্ত যুবক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কয়েকদিনের আলাপের পরই বুঝিলেন যে, তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভাও অলৌকিক। চতুর্বিংশতি-বর্ষ-বয়স্ক এক তরুণ যুবকের নিকট বঙ্গ ও উৎকলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের পরাভব হইল। গুণ-প্রেম-বিমুগ্ধ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত হইলেন।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের লোকে পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যের প্রেম দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর, এই অপূর্ব্ব বার্ত্তা উৎকলের চারি দিকে প্রচার হইল এবং দলে দলে লোক আসিয়া শ্রীচৈতন্যের ভক্তরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। রাজমন্ত্রী রায় রামানন্দ সন্ন্যাসীকে দেখা মাত্র সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া পূজা করিলেন। উৎকলের প্রতাপশালী স্বাধীন নৃপতি গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রও সন্ন্যাসীর কাহিনী শুনিয়া তাঁহার পদধূলি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাজপণ্ডিতের সাহায্যে রাজা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপালাভে সমর্থ হইলেন। এইরূপে রাজপণ্ডিত, রাজমন্ত্রী এবং স্বয়ং রাজা যখন একে একে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন সমস্ত উৎকল-দেশ ব্যাপিয়া এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের নেতৃস্থানীয় থাকিয়া যাঁহারা এতকাল হিন্দুসমাজের সমগ্র পূজার্ঘ্য পাইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা কেবল ঈর্ষ্যাবশে শ্রীচৈতন্যের নিকট হইতে দূরে থাকিলেন; আর সকলেই আসিয়া তাঁহার অভিনব প্রেমধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল।

শ্রীচৈতন্যদেবকে পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও উৎকল—সকল স্থানের লোকই আপনার জন বলিয়া দাবী করিয়াছিল—কেন না, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস উৎকলের যাজপুরে (জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' দ্রষ্টব্য); তথা হইতে উপেন্দ্র মিশ্র রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহট্টে গমন করেন এবং শ্রীহট্টে যখন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইল, তখন আবার জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে চলিয়া আইসেন। এই তিন অঞ্চলের লোককে প্রেমধর্ম্মের একতাবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্বভারতের আধ্যাত্মিক-জীবনের একতার প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, ইহা বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, তাঁহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার বন্ধ হইয়া গেল না। দুঃখী শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ সমগ্র উৎকল দেশে যে প্রেমের স্রোত বহাইলেন, তাহার প্রভাব আজও উড়িষ্যায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট বঙ্গভাষা কতদূর ঋণী, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালী তাঁহার

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

প্রেমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তাঁহার জীবনচরিত ও ধর্ম্মসম্বন্ধে অমূল্য গ্রন্থরাজি লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে অপূর্ব্ব সম্পদে বিভূষিত করিল। আর উৎকলবাসী যে শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকিবেন, ইহা কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে? তাঁহাদের দেশে একাদিক্রমে অষ্টাদশ বর্ষ ধরিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অধিষ্ঠান করিলেন। তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া কোন উড়িষ্যাবাসীরই কি সে চিত্র চিরতরে অঙ্কন করিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা হইল না?

সে সময়ের উৎকল আধুনিকাদিগের ন্যায় নির্জ্জীব ছিল না। মুসলমানগণ যখন উত্তর ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বাংশ জয় করিয়াছিল, তখনও উৎকল তাহার স্বাধীনতা হারায় নাই। উৎকলের অদূরবর্ত্তী বঙ্গদেশে তিনশত বৎসর মুসলমান অধিকার স্থায়িভাবে স্থাপিত হইলেও, তাহাদের শৌর্য্য বা চাতুর্য্য উৎকলবাসিগণকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিতে পারে নাই। মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের সময়ে (১৫০৪—১৫৩২ খৃষ্টাব্দে) উৎকল যে শুধু রাজনৈতিক হিসাবেই উন্নত ছিল, তাহা নহে—বিদ্যাগৌরবেও উৎকল ভারতের মধ্যে তখন একটি প্রধান স্থান অধিকার করিত। প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক উৎকলদেশীয় কবি বলরাম দাস তাঁহার গুপ্তগীতায় লিখিয়াছেন,—

মুকত মণ্ডপ মধ্যর॥
বিপ্রে যে জপ স্তুতি সারি।
বসিলে বেদান্ত বিচারি॥

আবার ভাষা-সাহিত্যের দিক্ দিয়াও দেখা যায় যে, সেই সময়েই জগন্নাথ দাস, অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি মহাকবিগণ স্ব স্ব রচনার দ্বারা উৎকল-সাহিত্যের শোভা-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছেন, এরূপ সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার প্রেমধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় মনে হয় যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন, কেবল অনুসন্ধানের অভাবে আমরা ঐসকল গ্রন্থের বিবরণ অবগত নহি।

অথচ শ্রীচৈতন্যদেবকে ও তাঁহার ধর্ম্মকে ঐতিহাসিকভাবে আলোচনা করিতে গেলে, উড়িষ্যাবাসিগণের লিখিত গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ হইবে। আমাদের দেশে শ্রীচৈতন্যদেবের যে কয়খানি প্রাচীন জীবনচরিত আছে, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনার দিক্ দিয়া এতই পরস্পর বিরুদ্ধ যে, তাহা হইতে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মুরারিগুপ্ত 'চৈতন্যচরিতামৃতম্' নামক সংস্কৃতগ্রন্থে ও গোবিন্দ কর্ম্মকার 'কড়চা'য় তাঁহার জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারিগুপ্তের নবদ্বীপলীলা পর্য্যন্ত বর্ণনা খুবই প্রামাণ্য। তাহার পর, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা ততদূর প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ, প্রথমতঃ মুরারি গুপ্ত সকল সময়ে নীলাচলে উপস্থিত থাকিতেন না, বা তাঁহার সহিত দেশভ্রমণ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে সর্ব্বশেষে এই শ্লোকটি থাকায় গ্রন্থলেখার কাল সম্বন্ধে বড়ই সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িতে হয়—

চতুর্দ্দশশতাব্দান্তে পঞ্চবিংশতিবৎসরে।
আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

১৪২৫ শকে তো শ্রীচৈতন্যের বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। তখনকার লেখা গ্রন্থে তাঁহার তিরোভাবের বর্ণনা থাকে কি করিয়া ?[১]

গোবিন্দের মুদ্রিত কড়চা' আজও সাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অকৃত্রিম বলিয়া গৃহীত হয় নাই। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইলেও, তাহার মধ্যে শ্রীচৈতন্য ২০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রভৃতি অনেক সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ কথার বিরুদ্ধবাণী আছে। কবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্যচরিমৃত মহাকাব্যং,' 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' নামক গ্রন্থদ্বয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোভাবের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে লিখিত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত',. লোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', বাসুঘোষ, গোবিন্দ দাস প্রভৃতির শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পদাবলী প্রভৃতি সকলই শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের কিছুকাল পরে লিখিত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থগুলির গ্রন্থকারগণ যদি ঐতিহাসিকভাবে তথ্যানুসন্ধান করিয়া গ্রন্থাদি লিখিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘটনা-সম্বন্ধে খুব বেশী পার্থক্য দেখা যাইত না এবং যে অল্প দিন পরে তাঁহারা গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সত্যের বিলোপ হইবারও সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু উক্ত গ্রন্থকারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই গৃহত্যাগী সাধুপুরুষ ও সম্প্রদায়-বিশেষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের জীবনী লইয়া যেমন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এক একটি মতবাদ গঠন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যকে লইয়াও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। এখানে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিবার ব্যাকুলতায় তাঁহারা তাঁহার সমস্ত জীবনীকে হয় শ্রীকৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালিয়া দেখাইয়াছেন, আর না হয়, অলৌকিকতার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। যেখানে ঘটনার সবিশেষ বর্ণনা পাইলে আমরা খুসী হইতাম, সেখানে তাঁহারা তত বেশী অনুসন্ধিৎসা দেখান নাই। এক একটি মহাপুরুষ লইয়া যে সম্প্রদায় গঠন করা হইয়া থাকে, কেবলমাত্র সেই সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া সেই মহাপুরুষকে দেখিলে, তাঁহাকে. ঐতিহাসিকভাবে বুঝা যাইবে না, ইহাই হইতেছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা-প্রণালীর অভিমত।

১। তারয়িত্বা জগৎ কৃৎস্নং বৈকুণ্ঠৈঃ প্রসাধিতঃ।
জগাম নিলয়ং হৃষ্টো নিজমেব মহর্দ্ধিমৎ॥১।২।১৪

'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকার অষ্টম বর্ষের ২৬৮ পৃষ্ঠায় একজন লেখক দুইখানি পুথিতে নিম্নলিখিত পাঠ পাইয়াছিলেন লিখিতেছেন,—

চতুর্দ্দশশতাব্দেঽন্তে পঞ্চত্রিংশতিবৎসরে।
আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।

এই শ্লোকটিকে গ্রহণ করিলে, শ্রীচৈতন্যের ২৮ বৎসর পর্য্যন্ত ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থের প্রথম ও শেষভাগ বোধ হয় প্রক্ষিপ্ত।

অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিতে হইলে সাম্প্রদায়িক জীবনচরিত, কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থ আমাদের একমাত্র উপজীব্য। তাঁহার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার জীবনীর তাবৎ উপকরণ লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে কতকগুলি প্রামাণিক ও সুপরিজ্ঞাত গ্রন্থ আছে, তাহাদের আলোচনাও যথেষ্ট হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু সম্বন্ধে উড়িষ্যায় কিছু পুস্তক, জনশ্রুতি ইত্যাদি পাওয়া যায় কি না, এই চেষ্টায় উৎকলে আমি কিছু অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কাশীমবাজারের মহারাজ বাহাদুরের উৎসাহে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়াই সৌভাগ্যক্রমে আমি দুইখানি মূল্যবান্ পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। পুথি দুইখানি গত ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম আমার দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দুইখানি পুথির সম্বন্ধে আমি আপনাদের নিকট কিছু আলোচনা করিতে চাই।

ইহার মধ্যে প্রথম পুথিখানির নাম "কৃষ্ণপ্রেমরসচন্দ্রতত্ত্বভক্তিলহরী-শ্রীচৈতন্য-সার্ব্বভৌম-সংবাদ"। পুথিখানি ৺পুরীধামের উড়িয়া-মঠে ছিল। তথা হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরস্থ 'মুক্তিমণ্ডপ' গ্রন্থাগারে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র মহাশয়ের নিকট ঐ গ্রন্থ আমি চাওয়ায়, তিনি আমাকে উহা দেখিতে দিয়াছেন। গ্রন্থ ৮২ খানি তালপত্রে ২২টি প্রকরণে সমাপ্ত। প্রতি পত্রে চারি লাইন করিয়া উড়িয়া অক্ষরে সংস্কৃত পদ্যে লেখা আছে। পুথিখানি যে অতি প্রাচীন, তাহা দেখিলেই অনুমান হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয় উহা পরীক্ষা করিয়া ৩০০ হইতে ৪০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। গ্রন্থখানির অক্ষর এত প্রাচীন যে, সাধারণ শিক্ষিত উড়িষ্যাবাসিগণের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি উহার পাঠোদ্ধার ভাল করিয়া করিতে পারেন নাই। আমি আমার বন্ধু 'উড়িয়া' আফিসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজবন্ধু দাস এম্ এ মহাশয়ের সাহায্যে যেটুকু পাঠোদ্ধার করিতে পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি।

গ্রন্থখানিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দর্শন-সম্বন্ধে এক একটি করিয়া প্রশ্ন সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর শ্রীচৈতন্য তাহার বিশদ উত্তর দিতেছেন। গ্রন্থকারের বা লিপিকরের নাম তারিখ প্রভৃতি গ্রন্থখানিতে কিছুই না থাকায়, ইহা কিরূপ প্রামাণ্য, তাহা এখন বলা যাইতেছে না। যদি এরূপ হয় যে, শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমকে যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া কোন উৎকলবাসী ভক্ত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থ ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও ধর্ম্মপিপাসু ভক্তের নিকট অতি আদরণীয় হইবে। গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হইলে, উহার সহিত অপরাপর বৈষ্ণব সিদ্ধান্তগ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়া তবে এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা যাইবে। আর যদি ঐ গ্রন্থ কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বকপোলকল্পিতও হয়, তাহা হইলেও, শিব, দুর্গা, ব্রহ্মা প্রভৃতিকে বক্তা না করিয়া, শ্রীচৈতন্যকে বক্তা বানাইয়া তাঁহার মুখ দিয়া কি বলান হইতেছে, তাহাও জানিবার যোগ্য। পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন,

তজ্জন্য আর কিছু না পাওয়া যাউক, উৎকলের বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্প্রদায়-বিশেষের মতবাদ যে ইহাতে পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পুথিখানি যিনি নকল করিয়াছিলেন, তিনি দিগ্‌গজ পণ্ডিত! 'উবাচ' শব্দে বিসর্গ, 'ব্রহ্মণঃ' স্থলে 'ব্রহ্মস্য', গ্রন্থারম্ভে 'অথ' স্থলে 'ইতি' প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। এই ভুল পাঠ লইয়াই যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম প্রকরণের প্রথমেই সার্ব্বভৌম ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

ব্রহ্মস্য কিমরূপস্য ব্রহ্মো বা পরমোপর।
ব্রহ্মরূপ ন জানামিঃ কথয়স্ব মহাপ্রভো।

পরবর্ত্তী ১৩টি শ্লোকে শ্রীচৈতন্য ইহার উত্তর দিয়াছেন। ইহার পরেই সার্ব্বভৌম মন্ত্রাদি-সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

মন্ত্ররাজ কিমন্ত্র সর্ব্বমন্ত্র পরে বদেৎ।
অমন্ত্রং মে বক্তব্যং কৃপাসিন্ধুস্বত্যাং ভবেতং॥

এইরূপে গ্রন্থমধ্যে মন্ত্র, বীজমন্ত্র, কামগায়ত্রী, রাধিকাতত্ত্ব, জগন্নাথমূর্ত্তিতত্ত্ব, ভক্তির সাধন, ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, 'হরেরাম' মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রভৃতি নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শেষ প্রকরণে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

ভক্তি কুত্র স্থিতং বাপি মুক্তি কুত্র স্থিতং প্রভো।
ভক্তি মুক্তিদ্বয়োভেদো অনুকম্পায় মহাপ্রভো॥

শ্রীচৈতন্যের সহিত সার্ব্বভৌমের ভক্তি-মুক্তি লইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে, তাহার সহিত এই প্রকরণে বর্ণিত বিচার কতদূর মিলিতেছে, তাহা গ্রন্থের সম্পূর্ণরূপে পাঠোদ্ধার না হইলে বলা যাইতেছে না। গ্রন্থের স্থানে স্থানে সার্ব্বভৌম অতি সুন্দরভাবে শ্রীচৈতন্যের স্তব করিতেছেন। দুই একটি স্থল আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু পাঠ অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিয়া আর উদ্ধার করিলাম না। গ্রন্থখানি শীঘ্রই সুপণ্ডিত দ্বারা নকল হইয়া আসিবে, তখন সুধীবৃন্দ এ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম 'চৈতন্য-বিলাস'। পুথিখানি পুরী মার্কণ্ডেশ্বর-সাহীর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণজগদ্দেব রায়ের বাটীতে ছিল। কিন্তু ঐ পুথির প্রথম ভাগে 'নববৃন্দাবনবিহার' ও শেষভাগে 'প্রেমসুধা-নিধি' নামক গ্রন্থদ্বয় সংযুক্ত থাকায়, উহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। আমি সৌভাগ্যক্রমে উহা দেখিতে পাইয়া পুথিখানি লইয়া আসিয়াছি। এ পুথিখানি তেমন প্রাচীন নহে, তবে সন্ধান পাইয়াছি যে, উড়িষ্যার একটি গ্রামে কোন প্রাচীনা বৈষ্ণবীর একখানি ঐ গ্রন্থের অতি প্রাচীন পুথি ছিল। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর, এখন তাহা খুব সম্ভবতঃ তাঁহার শিষ্যার নিকট আছে। আমি ঐ শিষ্যার সন্ধানও পাইয়াছি; শীঘ্রই পুনরায় উড়িষ্যায় যাইয়া প্রাচীন পুথিগুলির সন্ধান করিব।

এখানি উড়িয়া-ভাষায় লিখিত একখানি অতি সুন্দর কাব্য। ইংরাজীতে এ শ্রেণীর কাব্যকে

Dramatic Poem বলিয়া থাকে। কবির নাম মাধব। তিনি যে বেশ পণ্ডিত লোক ছিলেন ও ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শন ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা কাব্যখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। গ্রন্থারম্ভে "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" শ্লোকটি লিখিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে লিখিয়া আনিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে শুনাইয়াছিলেন। তৃতীয় শ্লোকটি—"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো" প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে যে ব্রহ্মসংহিতা আনিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ঐ শ্লোক লিখিত আছে দেখিয়াছি। দ্বিতীয় শ্লোকটি খুব সম্ভবতঃ কবির স্বকৃত; কারণ, এ পর্য্যন্ত অন্য কোন গ্রন্থে শ্লোকটি পাই নাই। শ্লোকটি অতিমধুর,—

অবিরতকৃতরাধাধ্যানসংকল্পগৌরঃ
ক্ষিতিপতিরমণীয়ং পূর্ণচন্দ্রাননশ্রীঃ।
পতিতগতিনিধার্য্যো ভূতলে খ্যাতকীর্ত্তিঃ
জয়তু জয়তু কৃষ্ণঃ পূর্ণচৈতন্যমূর্ত্তিঃ॥

একজন উৎকলবাসীর নিকট শ্রীচৈতন্যের যে ভাব সর্ব্বপ্রথমেই মনে জাগিয়া উঠে, ইহাতে তাহারই বর্ণনা আছে। তৃতীয় চরণে "নিধার্য্যো" পদটি বোধ হয়, বিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত নহে। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন যে, যে সময় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রবর্ণনায় যাইতেছে, তাহা উত্তমভাবেই যাইতেছে, অন্য সকল সময় বৃথা যায়। ঐ অংশ এবং পরে, কৃষ্ণকে না ভজিলে, জন্ম অজন্ম হয়, নয়ন, শ্রবণ প্রভৃতি বৃথা হয়, এই অংশ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের দুইটী স্থলের অবিকল অনুবাদ। ঐ অনুবাদ অতি হৃদয়গ্রাহী। কবি অতি সরল ভাষায় অদ্বৈতবাদকে নিরস্ত করিয়া বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত কিরূপে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি,—

সেহু সর্ব্বনাম সর্ব্বরূপরে বিখ্যাত।
এমন্তে সে ব্রহ্ম বলি বোলন্তি জগত হে॥
বনলতা তরুজল সবরূপ সেহি।
সর্ব্বজীবঠারে পরমব্রহ্ম অছি রহি যে॥
এমন্ত বোলিণ জ্ঞানী, এহু অটি ভ্রম।
এহু দুইটী নিশ্চে, শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম যে॥
বন ঘন জল ব্রহ্ম বোলি বোলু যেবে।
এহাঙ্কর নাম ধরি দেখু থাই সর্ব্বে যে॥
কাহারি ত মুক্তি নোহে সুখ দুঃখ ভোগ।
ঈশ্বরের মায়া এহু তহিঁ রে ভ্রমায়ে যে॥
শুন মোহ তত্ত্ব দিব্য, তত্ত্বর বিধান।
ক্লেশ মাত্র রহে ন, লভন্তি সুখমান যে॥

বিষ্ণু নারায়ণ বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ হরি।
এ আদি নাম তাঙ্কর অটে গতিকারী যে॥
রাজার যেমন্ত রাজ্য পালহে অটঈ।
তাহার দেবার সর্ব্বজনকু হুঅঈ হে॥
তহিঁ অন্তেপুর হই অছয়ি তাহার।
তহিঁ অন্য ঠাকু গলে, দিশে বলৎকার হে॥

এই অংশ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি এ ভাগবতরত্ন মহাশয়কে দেখাইলে, তিনি ইহার নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"ব্রহ্মের বিশ্বানুগত্ব বা বিশ্বময়ত্ব (Immanence) অনেক সময়ে আরাধনা বা পূজার ভাব নষ্ট করিয়া দেয়। Pantheism অনেক সময়ে জড়বাদে পরিণতি লাভ করে। 'তরু-লতা আদি সকলই ব্রহ্ম'—এই মত উল্লেখ করার পর, গ্রন্থকারের মনে যেন ভয়ের উদয় হইয়াছে। এই কারণে তিনি ব্রহ্মের Transcendence বা বিশ্বাতীতত্ব বর্ণনা করিতেছেন। এই প্রকাশিত বিশ্ব ঈশ্বরের মায়া-বৈভব, ইহা ছাড়া তাঁহার স্বরূপ-বৈভব আছে। রাজা স্বরূপে অন্তঃপুরে থাকেন, সেখান হইতে শক্তি চালন করিয়া কর্ম্মচারিগণের দ্বারা তিনি যেমন রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান্ সেইরূপ নিজের স্বরূপ-বৈভবে থাকিয়া মায়াশক্তির সাহায্যে দেবগণের দ্বারা বিশ্ব শাসন করিতেছেন। স্বরূপশক্তির এই বর্ণনা গৌড়ীয় ভক্তিবাদের একটি বিশেষ শিক্ষা। কবি এই তত্ত্ব বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়াছেন।"

কবি মাধবের জীবনী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই। তিনি নিজে নিজের পরিচয় দিয়াছেন,—

সেহি শ্রীচৈতন্য কথা কিছিহি বর্ণিবি।
এহি মনকু মোহর সুফল করিবি যে॥
বন্দাঈ যে গদাধর গুরু মহেশ্বর।
সে পাদকমলে চিত্ত রহু মাধবর যে॥

এই গদাধর শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত হইলে, মাধবের তাঁহার শিষ্য হওয়া খুবই সম্ভব হয়—কেন না গদাধর পণ্ডিত টোটা গোপীনাথের সেবা করিতেন। তাঁহার উৎকলবাসী শিষ্য সেবক ছিল। এরূপ একজন শিষ্য এই মাধব হইবেন। 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তি-রত্নাকর' খুঁজিয়া আমরা পাঁচ জন বিভিন্ন মাধবের পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ তিন জনকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। বৈষ্ণব-বন্দনার মধ্যে আছে,—

শ্রীহরি ভট্ট বন্দোঁ মাহাতী বলরাম।
বন্দোঁ পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম॥

উক্ত মাধব পট্টনায়ক কি এই গ্রন্থের লেখক হইতে পারেন? মাধব পট্টনায়কের সম্বন্ধে অন্য

কোথাও যখন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তখন মনে করা যাইতে পারে যে, তিনি একখানি সুন্দর লীলাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বৈষ্ণব-বন্দনায় স্থান পাইয়াছে। আর উৎকলের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ যখন শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তখন বিদ্বান্ কায়স্থ-কুলে এই কবির জন্ম হওয়া অসম্ভব নহে। তবে এসম্বন্ধে আপাততঃ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে না।

এই কাব্যখানি ঐতিহাসিকের তৌলদণ্ডের কঠোর ওজনে কোথায় স্থান পাইবে জানি না, তবে মনে হয় যে, কবিত্বগৌরবের জন্য ইহা ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য হইবে।

মাধব গ্রন্থশেষে বলিতেছেন,—

যেতে চরিত গৌরব ব্রহ্মাশিবে অগোচর
ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ।
তাহাঙ্ক ভাষারু মুহি উৎকল-ভাষারে যঁহি
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস॥
সাধুজনে ন ঘেন দোষ কহই মাধব তুম্ভ পদেরে আশ॥

ঐ ঠাকুর শব্দের অর্থ যদি গুরু ধরা যায় এবং উদ্ধৃত পদের অর্থ যদি এরূপ করা যায় যে, গদাধর বঙ্গভাষায় যে সকল কথা মাধবকে বলিয়াছিলেন, মাধব তাহাই কাব্যাকারে উড়িয়া ভাষায় লিখিয়াছিলেন তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান্ হয়।

এরূপ হওয়া যে একেবারে অসম্ভব নহে, তাহার কয়েকটি কারণ নিম্নে লিখিতেছি,—

১। শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করার পর, বৃন্দাবনে গমন করেন। তথা হইতে পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া যে দ্বাদশ বৎসরকাল নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মাধব এই কাব্য রচনা করিতে পারেন। যেহেতু,—

(ক) মাধব, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভক্তগণসঙ্গে নীলাচলেই বাস করিতে লাগিলেন, ইহা বলিয়াই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন,—

ভকতঙ্ক ঘেনি সঙ্গে বঞ্চন্তি ভাবতরঙ্গে
তঁহু নেউটি আইলে শ্রীনীলাচলে।
কৃষ্ণসুখে বঞ্চন্তি দিন পরম হরষ ভক্ত জনছি মন॥

(খ) নীলাচলে অবস্থানকারী শ্রীচৈতন্যকে আহ্বান করিলেই ভূমিকায় লিখিত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের সঙ্গতি হয়,—

পতিতপাবন তুম্ভে গৌর অবতার।
যুগে যুগে এহিরূপে জনঙ্কু নিস্তার যে॥

(গ) পুনরায় ভূমিকায় নীলাচলে শ্রীচৈতন্য বাস করিতেছেন, এইরূপ বর্ত্তমানকাল উল্লেখ-পূর্ব্বক লেখা হইয়াছে,—

বৃন্দাবনে করি বাস ছাড় কুবাসনা।
হরিনাম গাঈ হর ধন্ত তো রসনা যে ॥
চৈতন্য রূপরে এহা কৃষ্ণ ভগবান।
প্রকাশ করি অছন্তি কহি শাস্ত্রমান যে ॥

২। গ্রন্থখানি যদি শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী কালে লেখা হইত, তবে কোন না কোন পরবর্ত্তী মহাজনের বন্দনা থাকিত, কিন্তু এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন, অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ, মুরারি, দামোদর পণ্ডিত, গদাধর, শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, হরিদাস, চন্দ্রশেখরাচার্য্য, কেশব ভারতী—এই কয়টী নাম ব্যতীত আর কোন নামের উল্লেখ নাই। কবির গুরু যদি গদাধর পণ্ডিত না হইতেন, তিনি যদি কেবলমাত্র গদাধরের শাখাভুক্ত হইতেন, তবে নিশ্চয়ই কবি তাঁহার সাক্ষাৎ গুরুর বন্দনা করিতেন।

৩। যাঁহাকে চোখের উপর সর্ব্বদা দেখা যায়, তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস থাকিলেও, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যকে কৃষ্ণলীলার নিক্তিতে ওজন করিয়া কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালা যায় না। মুরারি ও গোবিন্দ সচক্ষে শ্রীচৈতন্যের কার্য্য-কলাপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই, বৃন্দাবন দাসের ন্যায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণলীলার উপমা টানেন নাই। কবি মাধব ভূমিকায় শ্রীচৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ, এ কথা বলিলেও গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বত্রই শ্রীচৈতন্যকে মানুষ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহার অলৌকিক শক্তি বা কৃষ্ণলীলার সহিত তাঁহার কার্য্যের সামঞ্জস্য লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করেন নাই। চোখের উপর শ্রীচৈতন্যকে না দেখিলে, শুধু তাঁহার সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পড়িয়া তাঁহাকে সাধারণ মানুষরূপে বর্ণনা করা কিছু কঠিন বলিয়া মনে হয়। শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীলোচন দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় প্রভৃতি তাঁহার জীবনী আলোচনায় যেরূপ সাম্প্রদায়িক বিচার ঢুকাইয়াছেন, তাহার হাত হইতে কোন পরবর্ত্তী লেখকের নিস্তার পাওয়া কিছু কঠিন বলিয়াই মনে হয়।

'তাহাঙ্ক ভাষারু মুহিঁ উৎকল ভাষারে তঁহি
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস।'

এই পদের অর্থ যদি অন্য কোন গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করিতেছেন, ইহা হয়, তাহা হইলে সে গ্রন্থকার কে, তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

'ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ।'

এই পদের 'ঠাকুর শ্রীমুখ' শব্দ দ্বারা যথার্থ মুখের বাক্যকে না বুঝাইয়া যদি গ্রন্থই বুঝায়, তাহা হইলে এই ঠাকুর কে? বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুইজন লেখকের নামের পশ্চাতে ঠাকুর শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে—বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও লোচনদাস ঠাকুর। বৃন্দাবন দাস মহাশয় মাধবের বর্ণিত সন্ন্যাস-কাহিনী অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। লোচনদাস ঠাকুরের সহিত মাধবের গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের মিল আছে, সুতরাং ঐ 'ঠাকুর' শব্দ দ্বারা লোচনদাস উপলক্ষিত হইতে পারেন। কিন্তু এসম্বন্ধে আমার মনে কয়েকটি আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে।

(১) লোচনের বন্দনা ও ভূমিকা অতি সাধারণ ধরণের, তাহাতে গণেশ, সরস্বতী, হরগৌরী প্রভৃতির ও নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের বন্দনা আছে। মাধবের ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে একই বলিয়া বন্দনা করা হইয়াছে; আর কাহারও নামোল্লেখ তাহাতে নাই। মাধবের বন্দনাই বৈষ্ণবোচিত। তদ্ব্যতীত মাধবের ভূমিকা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ ও বৈষ্ণব-দর্শন দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া অতি প্রসন্নগম্ভীর হইয়াছে।

(২) লোচনদাস মুরারির 'চৈতন্য-চরিত' অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন, ইহা ভূমিকায় বলিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে কিন্তু বৃন্দাবন দাসের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবের গ্রন্থ যদি অনুবাদ হইত, তাহা হইলে ঐ দুই গ্রন্থকারের নামেরও উল্লেখ থাকিত। মাধব মূর্খ নহেন—তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবত, বৈষ্ণব-দর্শনবাদ, বিদগ্ধমাধব ও ব্রহ্মসংহিতা পাঠ করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লেখা থাকিলে, তাহা তিনি অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। একমাত্র লোচনের নাম করিয়াই অবসর গ্রহণ করিতেন না। বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ কখনও পরের লেখা নিজের বলিয়া চালাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, লোচনের গ্রন্থে যেরূপ সাম্প্রদায়িক আভাস আছে, মাধবের মধ্যে তাহা কোথাও দেখা যায় না। লোচন গ্রন্থ আরম্ভই করিয়াছেন গোলোক, রুক্মিণী ও ভগবানের কথাবার্ত্তা লইয়া ও যেখানেই পারিয়াছেন—হয় কৃষ্ণলীলা, না হয়, রামলীলার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার মিল করিয়াছেন। লোচনের শ্রীচৈতন্য বেশ জানেন যে, তিনি ভগবান স্বয়ং। আর মাধবের চৈতন্য কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর যুবক। অথচ মাধব শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন না।

(৩) লোকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হইলেই মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে—

কৃষ্ণর চরিত যেন্থ কবিবি বর্ণন।

তেনু সুখ পাইবে এথিরে সাধুজন হে॥

এরূপ মঙ্গলাচরণ শুনিয়া কে বলিবে যে, কবি অনুবাদ করিতে যাইতেছেন?

(৪) লোচন শ্রীচৈতন্যের ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি পরিণতবয়স্ক হইয়া গ্রন্থ লিখিবেন; পরে সেই গ্রন্থ উৎকলে আসিবে এবং তাহাই দেখিয়া গদাধরের শিষ্য তাহার অনুবাদ করিবেন, এ যুক্তি কতদূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

(৫) মাধবের প্রথম পাঁচ সর্গে ও শেষ দশমছন্দে লোচনের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কবিত্বময় পদগুলি নাই; প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে লোচনের সে পদগুলি উদ্ধার করিলাম না।

(৬) অনেকগুলি ভাব ও ঘটনা লইয়া লোচনের সহিত মাধবের বৈষম্য দেখা যায়,—

(ক) কেশব ভারতী নবদ্বীপে একবার আসিয়াছিলেন, একথা মুরারি, লোচন ও মাধব—তিনজনেই বলিয়াছেন, কিন্তু লোচন একটি নূতন কথা বলিয়াছেন যে, বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে একরাত্রি কেশব ভারতীকে স্বগৃহে রাখিতে বলিলেন এবং পরদিন প্রভাতে তাঁহাকে না দেখিয়া সন্ন্যাস করিতে প্রস্তুত হইলেন।

লোচন বলেন যে, কেশব ভারতী যখন চৈতন্যকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রথমে শুক, প্রহ্লাদ ও কৃষ্ণ বলিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য বলিলেন যে,—

'তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয়।
তে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময়॥'

মাধবের চৈতন্যকে ভারতী—

"কহে অংশ স্বয়ং তুম্ভে জগতেশ্বর।
এ বাণী শুনিন প্রভু হৃদকাতর॥"

শ্রীচৈতন্যকে যখনই কেহ ভগবান্ বলিতেন, তখনই তিনি অতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন। এস্থলেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

(খ) লোচনের গ্রন্থে নিমাই সন্ন্যাস করিবেন জানিয়া মুরারি বলিতেছেন,—

"তুমি দেশান্তরে যাবে সবারে এড়িয়া
খাইব সংসার ব্যাঘ্রে সাভারে ধরিয়া॥"

শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন,—

"আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেও দুখ।
কেমন পিরিতি কর মোরে তোরা লোক॥"

শ্রীচৈতন্যকে ভক্তগণ প্রীতিবশেই রাখিতে চাহিয়াছিলেন। ঐহিক বা পারত্রিক কোন স্বার্থের জন্য নহে। লোচন এস্থলে স্বার্থের অবতারণা করিয়া কিছু রসভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মুরারি নিজে তাঁহার গ্রন্থে এরূপ কথাবার্ত্তা-সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

মাধবের চৈতন্য ভক্তগণের নিকট প্রেম ও নম্রতার সহিত বিদায় চাহিতেছেন—সে বিদায়ের মধ্যে প্রীতির রস উছলিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্য কাতর হইয়া বলিতেছেন,—

"শুন সর্ব্বজনে মোরে আশীষ কর।
কৃষ্ণভক্তি হোই, দুঃখ পলাই দূর॥"

(গ) লোচন বলিয়াছেন যে, শচীদেবী নিমাই সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা লোকমুখে শুনিয়া নিজে যাইয়া নিমাইকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অন্যান্য সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সন্ন্যাসের কথা অন্তরঙ্গ কয়েকটি ভক্ত ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াই নিমাই মায়ের নিকটে আসিতেছিলেন, ইহার মধ্যে শচীদেবীর অন্য লোকের নিকট সন্ন্যাস-সংকল্প শুনিবার অবসর কোথায়?

মাধব বর্ণনা করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের নিকট স্বসংকল্প প্রকাশ করিয়া মায়ের নিকট নিজেই সন্ন্যাসের কথা বুঝাইয়া বলিতে আসিলেন। মাতা একথা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এই চিত্র কেমন স্বাভাবিক! নিমায়ের মধুর চরিত্রের সহিত ইহার বেশ সামঞ্জস্য হয়।

লোচনের নিমাই শচীর ক্রন্দন দেখিয়া বলিতেছেন,—

অস্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন।
মিছা কাজে দুখ চিত্তে কর কি কারণ॥
বারে বারে কহি তারে নাহি অবধান।
মিছা কর লোহমোহ ক্রোধ অভিমান॥

আসন্নপুত্রবিরহকাতরা জননীর প্রতি এরূপ বাণী একটু রূঢ় শুনায় না কি?

শচীর ক্রন্দন শুনিয়া মাধবের চৈতন্যেরও উক্তি অনুরূপ,—

বেলুঁ বেলুঁ সুত বদন নিরেখি, জননী করন্তি রোদন।
কাতর হোইণ গৌরাঙ্গ মাতাঙ্কু কহি ন পারন্তি বচন। (মাতাঙ্কু)
চাহিঁণ স্থকিতে রহিলে
কিছু বেল অন্তে প্রবোধবচন কহিবাকু সে আরম্ভিলে॥
মিথ্যা এ সংসার, দণ্ডকে জীবন নরহিন যাই সত্বরে।
যাকু বোলু সুত বন্ধু ইষ্ট ভ্রাত, কেহু যিব তোর সঙ্গরে (ভো মাত)
ন লভু বিমর্গ কথারে, মোঠারে মমতা কলা প্রায় করি মমতা কর
কৃষ্ণ ঠারে।
কেতে জন্মে মুহি তোহর জনক, কেতে জন্মে তু মোর ভগিনী।
কেতে জন্ম পাণ্ড মনুষ্য হেলু নিএথক, চিত্তে শোক তেজি (ভো মাত)।

এইরূপ স্থল বর্ণনা করিতে যাইয়া বৃন্দাবন দাসের নিমাই শ্রীভগবানের যত অবতার আছেন, তাঁহাদের মাতাই শচী দেবী ও নিজে তিনি সেই সকলের অবতার ইহা বলিয়াছেন।

মাধবের বর্ণিত শচীর বিলাপ অতি সুন্দর, অতি মর্ম্মস্পর্শী। শচী বলিতেছেন,—

গৌরদেহকু কোলরে বসাই মুখরে দেঅন্তি চুম্বন।
মাথারে কুলিশ পকাই জীবন ছাড়ি যিবু তুহি নন্দন॥ (ভো সুত)
কে তোতে এহু শিক্ষা দেলা
কহুঁ কহুঁ তোর কঠিন শরীর ফাটি ন যাইত রহিলা॥
তু মোর অন্ধর লউড়ি, গলা হার, নেত্র পিতুলি, জীব জীব।
তোতে ন দেখি মু জীবন রাখিবি এহা মোর দেহ সহিব॥ (ভো সুত)

রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যে উপেক্ষিতা' বলিয়া যাঁহাদের নাম দিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও এক উপেক্ষিতা রমণী আমাদেরই ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। বৃন্দাবন দাস বৈরাগ্যহানির ভয়েই হউক, আর শ্রীকৃষ্ণলীলায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্থান নাই বলিয়াই হউক; শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস করিয়া যাইবার পূর্ব্বে বা পরে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও মুরারি গুপ্তও বিষ্ণুপ্রিয়ার শোকের উল্লেখ করেন নাই। শ্রীচৈতন্য ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন; শচীদেবীর দুঃখ হইল—ভক্তবৃন্দের দুঃখ হইল—নদীয়াবাসী সকলের দুঃখ

হইল—আর যে অভাগিনীর অমন স্বামী চিরতরে চলিয়া গেল, সে কি পাষাণী—যে, তাহার চোখ দিয়া এক বিন্দু অশ্রুও পড়িল না? বৈষ্ণব কবিরা কি তাঁহাদের সম্প্রদায় লইয়া এতই ব্যস্ত যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার এক বিন্দু অশ্রুজলের কথা লিখিবার অবসর তাঁহাদের হইল না? কবি লোচন দাস, বাসুঘোষ, কি জয়ানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে লোচনের বর্ণনাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। সন্ন্যাসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বা কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আর মাধব কিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি ;—

লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়া অনেক কথা বলিয়া, বলিতেছেন,—

শুন শুন প্রাণনাথ　　　মোর শিরে দেহ হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
বড় প্রতি আশা ছিল　　　নিজ দেহ সমর্পিব
এ নবযৌবনে দিবে হাত ॥

ইহার পর বলিতেছেন যে, তিনি বিষ খাইয়া মরিবেন ; নিমাইয়ের সন্ন্যাস করিয়া কাজ নাই।

লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই কোনরূপে সান্ত্বনা দিয়া বিলাসাদি দ্বারা তুষ্ট করিলেন। পরে শেষরাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে জাগাইয়া আবার সন্ন্যাসবিষয়ে কাতরে জিজ্ঞাসা করায়, নিমাই তাঁহাকে চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখাইয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিলেন। আর মাধবের বিষ্ণুপ্রিয়ার বর্ণনা শুনুন—একটু বড় হইলেও, ইহা কাব্যামোদীদের প্রীতি উৎপাদন করিবে জানিয়া উদ্ধার করিতেছি,—

গদগদ হোই রামাবর।
কহি ন পারে কিছি উত্তর ॥
পুন পুন গাঢ়ে রোদন করন্তি।
কান্ত পাদে নিবেশিণ শির হে ॥ (সুন্দরী)
বসাঙ্গলে কান্তকোলে আনি।
ভুজে আলিঙ্গন কলে পুনি ॥
বন্ধুলি অধরে চুম্বন দেই।
স্নেহে করন্তি মধুর বাণী সে ॥ (গৌরাঙ্গ)
আগো ন মুঞ্চ নয়ন আপ।
মনু ছাড় কঠোর সন্তাপ ॥
দয়ানিধি তোর এসন দেখিণ।
শার সন্ধুছি কুসুমচাপরে ॥ (সুন্দরী)
নানা মন্তরে উচাট কলে।
গাঢ় রতিরে মন তোষিলে।

তনু ঘর্ম্মবিন্দু সুখাঙ্গ বহন ।
মনিভূষণ মাত্র খঞ্জিলে সে ॥ (নাগর)
যেঁউ অঙ্গ অত্যন্ত রুচির ।
তঁহি লাগি সার্থ অলঙ্কার ।
কি শোভা দিশিলা উপমা দেবাকু নহি ।
নব পঞ্চ ভুবনর রস ॥ (শ্রীঅঙ্গ)
কান্ত কোমল চরণ ধরি ।
কহে বিষ্ণুপ্রিয়া মনোহারী ।
এহি কমল চরণে যাউথির ।
খরা বরষারে দস্ত ধরি হে ॥ (জীবন)
দীর্ঘ নীল কুঞ্চিত কুন্তল ।
কি ছিন থিব শির কমল ।
এমন্ত শোভাকু ধরি থিব তুম্ভে ।
এহা দেখিব নেত্রযুগল হে ॥ (সুন্দর)
দিব্য কুণ্ডল ন থিব কর্ণ ।
তৈল বিনু শরীর বিবর্ণ ।
ঘর তেজি যাঈ সন্ন্যাস মাত্র
কেতে মনোরথ হেব পূর্ণ হে ॥ (জীবন)
তেজি দিব্য সুক্ষ্ম বসন ।
ডোর কৌপীন পিন্ধিব ধন ।
ধিক ধিক্ প্রাণ ন থাউ দণ্ডে হে ।
ফাটি যাউ শরীর বহন হে ॥ (জীবন)
যেবে মুই যোগাইলি নাহি
দিব্যকন্যা ত অছন্তি মহী
যেতে ইচ্ছা তেতে বিভা হুঅ তুম্ভে ।
প্রাণনাথ ! গৃহ ছাড় নাহি হে ॥ (সুন্দর) ।
সাত গর্ভ যাঈছি মাতার ।
প্রাণ তেজিবে তুম্ভ বিধুর ।
তাঙ্কঠারে দয়া নোহিলা হৃদয়রে ।
এরে কঠোর হেলে সুন্দর হে ॥ (জীবন)
ধর্ম্ম ন সাধি গৃহরে যাঈ ।
ঈহা কেঁউ পুরাণে পঢ়ঈ ।

অন অপরাধী রমণী তেজিলে।
জানি অছ ত ধরম হৈ হে॥
শচীহৃদয় লোহে পাষাণ।
প্রাণ তেজিবে তুম্ভ বিহীন।
বৃদ্ধ মা'শা ভজিথিবা, কান্ত তেজি।
পুণ্যমাণ লভিবু সুজান হে॥ (জীবন)
শিশুকাল যাহাঙ্কর তুলে
খেলু আছ নানা কুতুহলে
সে সখামানঙ্ক দয়া ন বসিলা
এহু কোমল হৃদকমল হে॥ (সুন্দর)
নদীয়ার নরনারী শিরে।
বজ্র পকাঈ যিব হেলারে।
কেতে পৌরষ লভিব জগতে
এহু শিক্ষা দেলা কে তুম্ভরে হে॥
পুন পুনঃ করন্তি রোদন।
কান্তপাদ করি আলিঙ্গন।
যেবে যিব মোতে সঙ্গে ঘেনি যাঅ।
ঘটিথিবি জানি তুম্ভ মন হে॥ (জীবন)

মাধবের দশম সর্গে বর্ণিত ভাব, ভাষা বা ঘটনা, কিছুরই সহিত লোচনের কোনরূপ মিল নাই। লোচনের মুদ্রিত গ্রন্থ বোধ হয়, অসম্পূর্ণ—তাহাতে প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করার পর, বিভীষণের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, মাধবের গ্রন্থে ঐরূপ অলৌকিক কোন ঘটনা নাই। শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তথা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, ইহাই বর্ণনা করিয়া মাধব গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত আমি লোচনের সহিত মাধবের কেবল পার্থক্যই দেখাইয়া আসিতেছি। খুঁটীনাটীতে পার্থক্য থাকিলেও, মূলতঃ উভয়েই এক বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু মাধবের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম ছন্দ একেবারে লোচনের সহিত মিলিয়া যায়। কেবল ভাষা ও অক্ষরে মাত্র ভেদ—নহিলে ভাব ও ঘটনা অবিকল একরূপ। প্রথম পাঁচ সর্গ ও শেষ সর্গ পড়িয়া দুইজন যে পৃথক্ কবি, তাহা বেশ বুঝা যায়, কিন্তু মধ্যের এই চারি সর্গ পড়িয়া একক অপরের অনুবাদক বলিয়া মনে হয়। লোচন মুরারির নিকট হইতে লইয়া লিখিয়াছেন, স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু যে কয়েকটী অধ্যায়ে মাধবের সহিত তাঁহার লেখায় মিল দেখা যাইতেছে, সে কয়টী অধ্যায়ের বিষয় মুরারির গ্রন্থে কিছুই নাই। এ বিষয়ে তিনি মাধবের নিকট ঋণী হইলেও হইতে পারেন। আবার মাধব, আমার ওকালতী সত্ত্বেও, সত্য সত্যই লোচনের গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ

করিতে পারেন। অথবা উভয়েই কতকগুলি প্রচলিত গীতি হইতে স্ব স্ব কাব্য লিখিয়াছেন, ইহাও হইতে পারে। গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা বলিলাম। এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ভার সুধীগণের হস্তে দিয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতে চাই।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

—০—

জৈন-দর্শনে স্যাদ্‌বাদ

(১)

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিপূরণকল্পে যে যে সম্প্রদায় তাঁহাদের আপন আপন স্বাধীন চিন্তার ফলস্বরূপ বহুমূল্য রত্নরাজি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, জৈনগণ তাঁহাদের অন্যতম। কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দঃশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে জৈনাচার্য্যগণ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে তর্কশাস্ত্রে বা প্রমাণশাস্ত্রে তাঁহারা যে স্বতন্ত্র চিন্তাধারার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। এই চিন্তাধারারই নাম "স্যাদ্‌বাদ"। জৈন-সম্প্রদায় প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। এই দুই প্রধান শাখা আবার বহু প্রশাখায় বিভক্ত। এইরূপ এক একটী প্রশাখার নাম গচ্ছ। শুনা যায়, প্রায় এরূপ ৮৪টী গচ্ছ উদ্ভূত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর শাখার মধ্যে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনে কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও দার্শনিক মতবাদে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, যে স্বতন্ত্র চিন্তার ধারা স্যাদ্‌বাদের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার উদ্ভবের কারণ কি? ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বৈদিক। আর অবশিষ্টগুলি অবৈদিক। এইরূপে বৈদিক ও অবৈদিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা ভিন্ন আরও অন্যান্য উপায়ে ভারতীয় দর্শনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়; যেমন আস্তিক ও নাস্তিক, সেশ্বর ও নিরীশ্বর; কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে শেষোক্ত বিভাগগুলির কোন বিশেষ উপযোগিতা নাই। বৌদ্ধ, জৈন ও চার্ব্বাক-দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, সুতরাং উহারা অবৈদিক। অবশিষ্টগুলিতে বেদের প্রমাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং উহারা বৈদিক। বৈদিক দর্শনগুলিকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—শ্রুতিপ্রধান ও যুক্তিপ্রধান। পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা—এই দুইটী দর্শন শ্রুতিপ্রধান। কারণ, শ্রুতিবাক্যই ইহাদের প্রধান প্রমাণ। যদিও যুক্তি-তর্ক প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তথাপি সে যুক্তি-তর্কের প্রয়োগ কেবল শ্রুত্যার্থ উপপন্ন করিবার জন্য, কোন বিষয়ের অঙ্গীকার বা প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য নহে। ন্যায়-বৈশেষিকাদি অবশিষ্ট দর্শনগুলি যুক্তিপ্রধান, অর্থাৎ ঐ সকলে প্রধানতঃ যুক্তিবলেই স্বমত সংস্থাপন ও পরমত খণ্ডন করা হইয়াছে। যুক্তিই তাহাদের মূলভিত্তি। ঐ সকল দার্শনিকেরা যুক্তির সাহায্যে স্বমতবিসংবাদী শ্রুতিবাক্যের অর্থান্তর করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মোট কথা, যে দর্শন যতটা পরিমাণে যুক্তির উপর নির্ভর করিতে সাহস পাইয়াছে, তাহা ততটা পরিমাণে শ্রুতির নিগড় বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অতএব বেশ বুঝা যায় যে, যে দর্শনগুলি অবৈদিক, তাহাদের বস্তুগত্যা একমাত্র অবলম্বন যুক্তি-তর্ক[১]। কারণ, তাহারা ত বেদের নিকট পৃষ্ঠপোষণের প্রত্যাশা রাখে না, কেবলমাত্র যুক্তি-

---

১। পক্ষপাতো ন মে বীরে ন দ্বেষঃ কপিলাদিষু।
যুক্তিমদ্বচনং যস্য তস্য কার্য্যঃ পরিগ্রহঃ॥

তর্কের উপর নির্ভর করিয়াই আপনাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। এই জন্যই দেখা যায় যে, বৌদ্ধ ও জৈন-দর্শনে যুক্তি-তর্কই একমাত্র অবলম্বন —এজন্যই তাঁহাদের মতবাদগুলি একটা প্রবল সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—এজন্যই তাঁহারা যাহা প্রতীতি অথবা অনুমানসিদ্ধ, অতিরিক্ত কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব বা কার্য্যকারিতা স্বীকার করেন না, বা করিতে প্রস্তুত নহেন। এইরূপ যুক্তি-তর্ক সহকৃত প্রবল সাধারণ জ্ঞান বৌদ্ধ ও জৈন—উভয় চিন্তাধারাকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল বটে, আমরা কিন্তু ক্রমশঃ দেখিতে পাইব যে, বৌদ্ধ অপেক্ষা জৈন আরও একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই দেখাইয়াছেন যে, আমাদের বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রামাণ্য সেই খানে, যেখানে উহা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এককথায় ব্যবহারোপযোগিতাই জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরূপিত করে। আমাদের জ্ঞান বস্তুসম্বন্ধে এমন সংবাদ দিবে, যাহা দ্বারা আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে সার্থকতা লাভ করা যায়। এ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ও জৈন একই কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মতপার্থক্য নাই। কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে সার্থকতার জন্য বস্তুর স্বরূপ কীদৃশ হওয়া উচিত, এই খানেই জৈন বৌদ্ধ হইতে পৃথক্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এস্থলে এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জৈনগণ উক্ত প্রকার প্রবল সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে ব্যাবহারিক জীবনের অপ্রতিকূল, প্রতীতি ও অনুমানসিদ্ধ জগতের স্বরূপসম্বন্ধে যে মতবাদে উপনীত হইয়াছেন, তাহারই নাম "স্যাদবাদ"। এই স্যাদ্‌বাদ জৈন-দর্শনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। অগ্রে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কতকগুলি গোড়ার কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

জগৎ-সংসারকে বুঝিবার চেষ্টা হইতেই দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি এবং সেই চেষ্টার পরস্পর বিভিন্নতা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তি। আমরা সেই সমুদায় চেষ্টাগুলিকে মোটামুটি দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথমতঃ একপ্রকার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা জগতের বস্তুজাতকে কয়েকটী সামান্য ভাবের (Abstract Concepts) ছাঁচে ফেলিয়া বুঝিয়া লওয়া হয়, আর বস্তুবিশেষের যে বিশিষ্টতা, তাহাও সেই সামান্য ভাবের অভিব্যক্তিমাত্র বলিয়া ধরা হয়। আবার এই কথাটীকেই আরও একটু বড় করিয়া ধরিয়া বলা যাইতে পারে যে, ঐ সকল সামান্য ভাবগুলিও একটী চরম সামান্যের (Highest General Concept) অন্তর্ভূত। এইরূপে বিশ্লেষণ প্রণালী অবলম্বনে জগতের বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য হইতে পরিশেষে নির্ব্বিশেষ সত্তা বা একত্বে পৌছান হয়। দর্শনশাস্ত্রের ইহা একটী চিরন্তন প্রণালী। ইহাতে বাস্তব জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও বহুত্বের নিকট বিদায় লইয়া কেবল ভাব-জগতের (Subjective) একটানা একত্ব, নিত্যত্ব অথবা সত্তারূপ চরম-সামান্যের আশ্রয় লইতে হয় সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা মনন বা চিন্তনের সৌকর্য্য সাধিত হয়। এই প্রণালী অবলম্বনেই পাশ্চাত্য দর্শনের আদি আচার্য্য থালিস্ বলিয়াছিলেন, "অপই সকল বস্তুর উপাদান"। স্পিনোজা বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের সর্ব্বগ্রাসী সত্তাতেই সকল বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান; এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রচার করিতেছেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের সমুদায় বস্তুই একমাত্র জড়শক্তির প্রকারভেদমাত্র। আর এই প্রণালী অবলম্বনেই ভারতে অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে বাহ্য জগতকে বুঝিবার আর একটী ঠিক ইহার বিপরীত প্রণালী আছে। আমাদের প্রতীতি জানাইয়া দেয় যে, প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা বিলক্ষণ অথবা প্রত্যেক বস্তুই স্বলক্ষণ। কেননা, প্রত্যেক বস্তু কতকগুলি গুণের সমষ্টিমাত্র এবং প্রত্যেক সমষ্টিই অপর সমষ্টি হইতে ভিন্ন, এবং শুধু ইহাই নহে,—এই গুণগুলিও নিয়তপরিবর্ত্তনশীল। নিত্য অপরিণামী এবং বস্তুসমুদায়ে অনুগামী কোন সামান্য সত্তা আমাদের প্রতীতির গম্য নহে, অনুমানেরও যোগ্য নহে। মোট কথা হইতেছে এই যে, যাহা কিছু আমরা প্রতীতির সাহায্যে অনুভব করিতে পারি, তাহা কেবল অনুক্ষণ পরিণমমান বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। কতকটা এই প্রথা অবলম্বনে জগতে বহুত্ববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কতকটা এইরূপ চিন্তা-প্রণালী অবলম্বনেই পাশ্চাত্য জগতে হব্‌স্, গ্যাসেণ্ডি প্রভৃতি মনীষিগণ বহুত্ববাদ (Pluralism) ও স্বলক্ষণবাদে (Individualism) উপনীত হইয়াছেন। আর সম্পূর্ণ এই প্রণালী অবলম্বনেই বৌদ্ধেরা ক্ষণভঙ্গবাদ ও স্বলক্ষণবাদে উপস্থিত হইয়াছেন।

এখানে আমরা দেখিতে চেষ্টা পাইব যে, পূর্ব্বোক্ত দুই বিপরীত চরম চিন্তা-পদ্ধতির সামঞ্জস্য হইতে স্যাদ্‌বাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কেবল স্যাদ্‌বাদ কেন, যে কোন মতবাদই এইরূপ ভাব-সংঘর্ষ ব্যতিরেকে বিকাশ লাভ করে না। এস্থলে ভাবজগতে পূর্ব্বপক্ষ (Thesis) ও উত্তরপক্ষের (Antithesis) সংঘর্ষে সমন্বয় বা সমাধান (Synthesis) সম্ভাবিত হয়, এই প্রকার হেগেলের অভিমতের যাথার্থ্য কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়[১]। যে সময়ে জিনমতাবলম্বিগণ তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, ঠিক সেই সময়ে দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদের প্রবাহ ভারতে বহিয়া যাইতেছিল। এক দিকে উপনিষদ্ গুরুগম্ভীরস্বরে প্রচার করিতেছিলেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তুনিচয় যে বহু এবং নানা গুণ বা রূপ লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই বহু এবং নানারূপের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই—আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বস্তুসমুদায়ের যে বর্ণ, গঠন, বা আকার, দ্রবত্ব, কাঠিন্য বা সংঘাতত্ব, তাপ বা শৈত্য, মিষ্টতা, তিক্ততা বা সৌরভ প্রভৃতি বিবিধ গুণের গ্রহণ করে, সে গুণসকল আমাদের ভ্রান্তির ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহারা সর্ব্বৈব মিথ্যা বা অবাস্তব। উহাদের সকলের মধ্যে অনুগত যে একটী দ্রব্যত্ব বিদ্যমান আছে, তাহাই সত্য এবং অপরিণামী। বর্ণ, গঠন, দ্রবত্ব, কাঠিন্য প্রভৃতি গুণসকল অসত্য বা ভ্রান্তিমূলক বিকারমাত্র। উহারা নিয়তপরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব কিছুই নাই। একই মৃৎপিণ্ড হইতে ভাণ্ড কলসাদি বহুবিধ মৃন্ময়পাত্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বস্তুগত্যা তাহাদের মধ্যে অনুগত একমাত্র মৃৎপিণ্ডই সত্য[২]। ইহাকেই আরও একটু বড় করিয়া দেখিলে বলা যায়, যেমন মৃৎপিণ্ড সকল মৃন্ময়-বিকারের মধ্যে অনুগত, ঐরূপ সুবর্ণকুণ্ডল-বলয়াদির মধ্যেও অনুগত ও নিত্য। আবার ঐ সুবর্ণ, মৃত্তিকা এবং ঐরূপ অন্যান্য দ্রব্যমধ্যে অনুগত একটী বস্তু আছে, যাহার নাম সত্তা (Being) উহার অপর নাম সামান্য বা জাতি। উহা সকল বস্তুতে অনুগত এবং নিত্য, অর্থাৎ উহার পরিণাম বা পরিবর্ত্তন নাই।

১। Schwegler's History of Philosophy, Introduction.

২। ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৬।১।৪

অপরদিকে বৌদ্ধ বলিতেছিলেন যে, সামান্য এবং নিত্যত্ব বলিয়া কোন বস্তু নাই। আমাদের সহজ প্রতীতি বলিয়া দেয় যে, যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য, তাহার সমুদায়ই বিশেষ বিশেষ গুণ। সেই বিশেষ বিশেষ গুণগুলি আবার সতত পরিবর্ত্তনশীল। এই নিয়তপরিবর্ত্তনশীল বিশেষ গুণের অতিরিক্ত, সুতরাং অতীন্দ্রিয় কোন নিত্য সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ কল্পনামূলক। সেরূপ সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব প্রতীতি বা অনুমানসিদ্ধ নহে। যাহার প্রতীতি হয়, তাহা কেবল বিশেষ গুণ বা গুণব্যক্তি। ফলতঃ প্রত্যেক পরিণমমান বিশেষ গুণ প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন অস্তিত্বের সৃষ্টি করিতেছে।

জৈনেরা বলিলেন যে, পদার্থতত্ত্বসম্বন্ধে ঔপনিষদিক ও বৌদ্ধমত—উভয়েই একদেশদর্শী বা একান্তবাদী। তাঁহাদের মতে প্রয়োজনসিদ্ধিই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। পদার্থের জ্ঞান এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, উহার দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি হয়; উহা আমাদের ব্যবহারে সহায়তা করে। এই কথাটাই আরও একটু অন্যভাবে বলা যায় যে, যে জ্ঞানকে আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, তাহার কর্ম্মই হইল, পদার্থের ব্যবহারোপযোগিতা প্রদর্শন করা[১]। বস্তুর ব্যবহারোপযোগিতাসূচক জ্ঞানেরই মূল্য আছে। কারণ, যদি আমার কোন বস্তুবিষয়ে এমন জ্ঞান হইয়া থাকে, যাহার সাহায্যে আমি সেই বস্তুটী হেয়, কি উপাদেয়, তাহা দ্বারা আমার প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে, কি না হইবে, ইহা বুঝিতে না পারি, তেমন জ্ঞান আমার বাস্তবিক কোন উপকার সাধন করে না। উহার ব্যাবহারিক জগতে কোন মূল্য নাই। সে জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক, তাহার নাম বিপর্য্যয়।

তবেই দেখা যাইতেছে, সম্যগ্‌ জ্ঞান বা প্রমাণের স্বরূপই হইতেছে যে, তাহা পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিবে এবং পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বই হইতেছে, **অর্থক্রিয়াকারিতা**[২] অর্থাৎ জ্ঞাতার **প্রয়োজনসাধকতা**। পদার্থের পদার্থত্ব নিষ্পন্ন সেইখানে, যেখানে সে জ্ঞাতার প্রয়োজনসিদ্ধি করে। প্রতীতি (Experience) আমাদের এই কথাই পরিস্ফুটরূপে জানাইয়া দেয়। এই প্রকার ব্যবহারোপযোগিতামূলক প্রামাণ্য জ্ঞান কেবল জৈন দর্শনের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। ইহা বৌদ্ধ প্রমাণবাদেরও মূলসূত্র। বৌদ্ধ ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য তাঁহার ন্যায়বিন্দুটীকায় দেখাইয়াছেন যে, যে জ্ঞান অবিসংবাদী অর্থাৎ অভীপ্সিত অর্থের প্রাপক, তাহাই সম্যগ্[৩] জ্ঞান। বাৎস্যায়ন ঋষি ন্যায়সূত্রভাষ্যের মুখবন্ধে জ্ঞানের প্রমাণ্য সম্বন্ধে এই একই কথা বলিয়া গিয়াছেন।[৪] ঐরূপ পঞ্চদশী ও বেদান্তপরিভাষাকার মহোদয়গণও সংবাদিজ্ঞানের প্রমাণ্য ও বিসংবাদিজ্ঞানের ভ্রমাত্মকতা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আধুনিক প্রতীচ্য দার্শনিকদিগের মধ্যেও এই ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ বহুলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা এই মতবাদের নাম দিয়াছেন—(Pragmatism) প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম্। এই প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম বা ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ প্রাচীন পাশ্চাত্য

১। প্রমাণাদর্থসংসিদ্ধিস্তদাভাসাদ্বিপর্য্যয়ঃ—পরীক্ষামুখসূত্র।১।

২। বস্তুনস্তাবদর্থক্রিয়াকারিত্বং লক্ষণম্—ষড় দর্শনসমুচ্চয়ে জৈনদর্শন, মণিভদ্রকৃত টীকা।

৩। অবিসংবাদকং জ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানং। জ্ঞানমপি প্রদর্শিতমর্থং প্রাপয়ৎ সংবাদকমুচ্যতে—ন্যায়বিন্দুটীকা, ৩১।পৃঃ

৪। ন্যায়সূত্র, (বাৎস্যায়ন-ভাষ্য) প্রারম্ভে প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ অর্থবৎ প্রমাণম্।

মতবাদে অন্তর্নিহিত থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকটভাবে দর্শনজগতে প্রথম বিকাশ লাভ করে, উহার কিছু পরে William James, Dr. Schiller এবং Dewey প্র্যাগম্যাটিজ্‌মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন।

James বলিয়াছেন, প্রমাণ বা সম্যগ্‌জ্ঞান তাহাকে বলি, যাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে, আমাদের জীবন-যাত্রার বিশেষ সুবিধা হয়। আমার সম্মুখবর্ত্তী এই টেবিলটীর সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান, তাহা প্রমাণ, কারণ আমি দেখিতেছি, এই জ্ঞানে আস্থা স্থাপন করিয়া আমার কার্য্যের সুবিধা হইতেছে, আমি দেখিতেছি যে, আমি উহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি; আমার কাগজপত্রগুলি রাখিবার সুবিধা হইতেছে[১]। Dr. Schiller ইহারই নাম দিয়াছেন—"Humanism." কারণ, তিনি বলিতে চান যে, মানবের সর্ব্বপ্রকার জিজ্ঞাসার বা জ্ঞান-পিপাসার মূলে একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিহিত আছে, সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিলেই, সকল অনুসন্ধিৎসা সার্থক হয়। সুতরাং কোন জ্ঞান প্রমাণ বা অপ্রমাণ, ইহা নিশ্চয় করিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে, উহা সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল কি প্রতিকূল[২]।

এই Pragmatism বা ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ লইয়া আজ পাশ্চাত্য দর্শন-জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, এই প্র্যাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্‌ বা ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ ভারতে নূতন নহে, বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতীয় প্রায় সকল দর্শনেই, অল্প-বিস্তর-রূপে উহা নিহিত রহিয়াছে। যাহা হউক, পাশ্চাত্য ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদী দার্শনিকেরা বলিতেছেন যে, আমরা এমন কোন জ্ঞানের সত্যতা বা প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, যাহা মানবের জীবনযাত্রার সহিত বাহ্য জগতকে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট করে না। জ্ঞান বলিতে এমন কিছু বুঝিতে পারি না, যাহা কেবল জ্ঞাতার আন্তর ভাব-জগতে একটি সামঞ্জস্য (Formal Consistency) স্থাপন করে মাত্র। জ্ঞানের সাফল্য সেইখানে, যেখানে উহা জ্ঞাতাকে বাহ্য বস্তুর স্বরূপ প্রদর্শন-পূর্ব্বক উহা হেয়, কি উপাদেয়, তাহা জানাইয়া দেয়। সুতরাং বস্তুনিরপেক্ষভাবে কেবল আন্তর ভাব-জগতের সামঞ্জস্য স্থাপন করাই জ্ঞানের কার্য্য নহে। পরন্তু প্রতীতির সাহায্যে পদার্থ-তত্ত্ব নির্ণয়পুরঃসর উহা হিত বা অহিত, ইহা বলিয়া দেওয়াই জ্ঞানের সার্থকতা। এই জন্যই আজকাল পাশ্চাত্য জগতে আরিষ্টটলের বস্তুনিরপেক্ষ প্রামাণ্যশাস্ত্র (Formal Logic) মহাগোলে পড়িয়াছে। উহা আর তর্কশাস্ত্রের জনক আরিষ্টটলের নামের অথবা কেবল নিজের প্রাচীনতার দোহাই দিয়া প্র্যাগম্যাটিক লজিকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া জীবন-সংগ্রামে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়া উঠিতেছে না। কারণ, Schiller প্রমুখ আধুনিক Prgmatic Logician এরা যুক্তিসহকারে ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, বাহ্য জগতের দেয়

১। "The true is the name of whatever proves itself to be good in the way of belief and good too, for definite assignable reasons."—James' Pragmatism, P. 76.

২। In an actual knowing the question whether an assertion is true or false is decided uniformly by its consequences,—by its relation to the purpose which put the question."—Schiller's Humanism, p. 154.

জ্ঞানের উপাদান উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের আকারের সামঞ্জস্য লইয়া থাকিলে সত্যের অপলাপ করা হয়[১]। কারণ, উহা দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হয় না।

অনেকটা এইরূপ ব্যবহারোপযোগিতার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বাস্তব-জগতের প্রতীতিসিদ্ধ ও অনুপেক্ষণীয় বস্তুস্বভাবের জিজ্ঞাসাই জৈন-দর্শনের প্রারম্ভ। অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য প্র্যাগম্যাটিক লজিক ও জৈন-দর্শনের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে কি না, অথবা প্র্যাগম্যাটিক প্রামাণ্যবাদের প্রামাণ্য কতদূর গ্রাহ্য, সে সকল বিষয় আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। জৈন বলিতে চান, বাহ্য বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া দেখিতে পাই, উহার স্বরূপ কেবল উপনিষৎ-কথিত নিত্য সত্তাতেই পর্য্যবসিত নহে। পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের ন্যায় ইহাও বলা যায় না যে, উহা কেবল ক্ষণবিনাশী ও পরস্পর অসংবদ্ধ গুণ-ব্যক্তির প্রবাহমাত্র। উপনিষদ্ যে বলিয়াছেন, বস্তুস্বরূপ একান্ত নিত্যসত্তা, তাহা অর্দ্ধসত্য; আবার বৌদ্ধ যে বলিয়াছেন, নিত্যসত্তা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, প্রতীতির সাহায্যে যাহার উপলব্ধি করি, তাহা কেবল ক্ষণভঙ্গুর গুণপ্রবাহ, তাহাও অপরার্দ্ধ সত্য। সম্পূর্ণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়—উভয়ের সমবায়ে। প্রকৃত বস্তুস্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখা যায়, উহা নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে। উহা সামান্যের আধার; আবার বিশেষেরও আধার। এক দিকে যদি বস্তুকে কেবল নিত্য বলা যায়, তাহা হইলে একান্ত পক্ষ আশ্রয় করা হয়; আবার, অপর দিকে যদি উহাকে কেবলমাত্র নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য গুণসমষ্টি বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও একান্ত পক্ষ অবলম্বন করা হয়। কিন্তু বস্তু অনেকান্তধর্ম্মাত্মক। উহা নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে[২]। (Permanent in the midst of Changes). নিত্যাংশে উহার নাম দেওয়া হয়, "দ্রব্য"; অনিত্য অথবা নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল গুণসমষ্টি অংশে উহার নাম দেওয়া হয়, "পর্য্যায়"। জৈন-দর্শনে দ্রব্য ও পর্য্যায়—এই দুইটী শব্দ উক্তরূপ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলকথা, বস্তু দ্রব্যপর্য্যায়াত্মক, বস্তুমাত্রই দ্রব্যও বটে, আবার পর্য্যায়ও বটে। এ ত্রিভুবনে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা ঐরূপ দ্রব্যপর্য্যায়াত্মক নহে[৩]। ইহাই জৈনদিগের "অনেকান্তবাদ"। তাঁহারা বলিতে চান যে, বস্তুকে মাত্র একরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিলে, অন্যরূপ বিশেষণের আর অবকাশ থাকিল না। বস্তুকে কেবল নিত্য বলিলে, তাহাকে অনিত্য বলিবার আর উপায় রহিল না, সামান্য বলিলে, আর বিশেষ বলিবার উপায় রহিল না; দ্রব্য বলিলে, পর্য্যায় বলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বস্তুর স্বভাব হইল এই যে, উহা একান্তস্বরূপ নহে, নিত্য হইলে যে আবার অনিত্যও নহে,

---

১। It is not possible to abstract from the actual use of the logical material and to consider forms of thought in themselves without incurring thereby a total loss, not only of truth, but also of meaning.—Preface to Schiller's Formal Logic.

২। "আদীপমাব্যোমসমস্বভাবং স্যাদ্বাদমুদ্রানতিভেদি বস্তু"—স্যাদ্বাদমঞ্জরী, পঞ্চম শ্লোক।

৩। "দ্রব্যং পর্য্যায়বিযুতং পর্য্যায়া দ্রব্যবর্জ্জিতাঃ।
ক কদা কেন কিংরূপা দৃষ্টা মানেন কেনচিৎ॥"

এ কথা বলা চলে না ; সামান্য হইলে যে বিশেষ হইবে না, তাহা নহে, বা দ্রব্য হইলে পর্য্যায় হইবার নহে, এরূপ একান্তপক্ষ আশ্রয় করা সঙ্গত নহে। কারণ, উহা বস্তুর স্বভাববিরুদ্ধ, সুতরাং একের অপেক্ষায় অন্য বাক্য মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরে এই বিষয় আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

এই স্থানে গ্রীক্-দর্শনের ইহার ঠিক অনুরূপ একটী চিন্তার ধারার কথা মনে পড়ে। ইলিয়াটিক দার্শনিক পার্মেনাইডিস্ বলিয়াছিলেন যে, শুধু নিত্য অপরিণামী বিশ্বব্যাপী সত্তারই (Being) অস্তিত্ব আছে ; উহাই জগতের মূলভিত্তি। গতি (motion), পরিণাম (change), উৎপাদ (origin) বা বিনাশ (decay) বহুত্ব, বিশেষ বা বৈচিত্র্য বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই। উহারা আমাদের ভ্রান্তিমাত্র। যাহা অস্তিত্ববান্, তাহা কেবল একমাত্র নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক নিত্যসামান্য সত্তা। আবার এই ইলিয়াটিক-দর্শনের নির্ব্বিশেষ সত্তাবাদের প্রতিপ্রসবস্বরূপ হিরাক্লাইটাস্ প্রচার করিলেন যে, বস্তুর গতি, পরিণাম, উৎপাদ ও বিনাশ, এককথায় জগতের প্রপঞ্চপ্রবৃত্তির অনন্তপ্রবাহই বাস্তবিক সত্য। নিত্যনির্ব্বিশেষ ধ্রুবসত্তা আমাদের ভ্রান্তির ফল। এইরূপে দেখা যায়, এক দিকে ইলিয়াটিক দার্শনিকগণ বাস্তব-জগতের অনন্ত ধর্ম্মবৈচিত্র্য ও বিশেষের কথা ভুলিয়া সত্তামাত্রের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, আবার অন্য দিকে হিরাক্লাইটাস্ নির্ব্বিশেষ অপরিণামী সত্তার কথা উড়াইয়া দিয়া কেবলমাত্র অনন্ত পরিণাম-প্রবাহের (Ceaseless Becoming) কথাই ধরিয়া বসিয়াছিলেন। সেই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, পরে আরিষ্টটল্ এই দুই বিভিন্নমুখী চিন্তাস্রোত—এই দুই একান্তপক্ষ মিলিত করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, বাস্তবিকপক্ষে বস্তুর স্বরূপ এই উভয়ের সামঞ্জস্যেই পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন যে, বস্তু সামান্যও বটে, বিশেষও বটে ; উহা এক হিসাবে নিত্য ও আবার অনিত্যও বটে, উহা "দ্রব্য"ও বটে, "পর্য্যায়"ও বটে। বস্তুর যাহা সামান্য বা নিত্য, তাহা বিশেষ ও পরিণামের মধ্য দিয়া, যাহা দ্রব্য, তাহা পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ করে। বস্তুর স্বরূপই হইল সামান্য-বিশেষাত্মক বা দ্রব্য-পর্য্যায়াত্মক। আরিষ্টটলের ভাষায় উহা *Universalia in robus.*

এক্ষণে জৈনের অনুমোদিত বস্তুস্বরূপ আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রাচীন জৈন-দার্শনিক উমাস্বাতি তাঁহার "তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে" বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বস্তু বলিতে বুঝি, "উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ"। বস্তুমাত্রেই আমরা তিনটী ধর্ম্মের সদ্ভাব লক্ষ্য করি, যথা,—উৎপাদ, ব্যয় ও ধ্রৌব্য। শেষোক্তটীকে পূর্ব্বে ধরিলে আমরা বলিতে পারি যে, প্রত্যেক বস্তুরই এমন কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, যাহারা ধ্রুব অর্থাৎ অপরিণামী, উহারাই এক হিসাবে বস্তুর নিত্যত্ব বজায় রাখে। কিন্তু আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে, উহার কতকগুলি ধর্ম্মের অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তন বা বিনাশ হইতেছে, এবং ঐ বিনষ্ট ধর্ম্মগুলির স্থলে কতকগুলি নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইতেছে। একখণ্ড সুবর্ণ স্বর্ণকারহস্তে কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কারে পরিণত হয়। সুবর্ণের এমন কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, যাহারা ঐ কুণ্ডল-বলয়াদি উৎপাদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির মধ্যে সুবর্ণের সুবর্ণত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয়।

পক্ষান্তরে উহার অপর কতকগুলি ধর্ম্ম নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুবর্ণখণ্ডের কুণ্ডলাকারে পরিণতির পূর্ব্বে যে ধর্ম্মগুলি উহার প্রাথমিক আকার সম্পাদন করিয়াছিল, কুণ্ডলাকারে পরিণতির পরে আর সে ধর্ম্মগুলির অস্তিত্ব নাই। তাহাদের বিনাশ হইয়াছে এবং সেই বিনষ্ট ধর্ম্মগুলির স্থলে অপর কতকগুলি নূতন ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া সুবর্ণখণ্ডের বর্ত্তমান কুণ্ডলাকার সম্পাদন করিয়াছে। এইরূপে কুণ্ডলের বলয়াকারে পরিণতিতেও কতকগুলি পুরাতন ধর্ম্মের নাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কতকগুলি নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, বস্তুর স্বরূপ একান্ত নিত্য সত্তা নহে; আবার একান্ত অনিত্য পরিণম্যমান ধর্ম্মসমষ্টিও নহে। ইহা এক হিসাবে নিত্যও বটে, আবার অন্য হিসাবে অনিত্যও বটে। ইহা ধ্রুবও বটে, আবার উৎপাদ এবং ব্যয়শীলও বটে।

এইখানে পাতঞ্জলভাষ্যকার শ্রীব্যাসদেবের বিবৃত ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা অনুসারে দ্রব্যের ত্রিবিধ পরিণামের কথা মনে পড়ে। স্যাদ্‌বাদমঞ্জরীকার মল্লিসেন সূরিও স্বীয় অনেকান্তবাদের সমর্থন-প্রসঙ্গে যোগ-দর্শনের এই ত্রিবিধ পরিণামবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাসদেব পরিণামের স্বরূপ কি?—এই প্রশ্ন স্বয়ং উত্থাপিত করিয়া বলিতেছেন[১], অবস্থিত অর্থাৎ কোনরূপে স্থির পদার্থের পূর্ব্বধর্ম্ম বিগত হইয়া অন্যধর্ম্মের উৎপত্তি হইলে, তাহাকে পরিণাম বলা হয়। সেই পরিণাম আবার ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-ভেদে তিন প্রকার। মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মী পিণ্ডাকার ধর্ম্ম হইতে ঘটরূপ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে, ধর্ম্মপরিণাম লাভ করে। এক কথায় মৃৎপিণ্ডের ধর্ম্মপরিণাম মৃদ্‌ঘট। ঘটরূপ ধর্ম্ম অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। ইহাই লক্ষণ-পরিণাম। লক্ষণ শব্দে কাল বুঝায়। অনন্ত কালপ্রবাহে (Time Continuum) পতিত পদার্থনিচয় অনাগত বা ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া অতীতে গিয়া মিশিতেছে। এইরূপে কালের অপেক্ষায় বস্তুর পরিণাম হইয়া থাকে। আবার ঐ ঘট নূতন ও পুরাতন ভাব গ্রহণ করিয়া প্রতিক্ষণেই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার নাম অবস্থা-পরিণাম। ভাষ্যকার আরও দেখাইয়াছেন যে, এই ত্রিবিধ পরিণামকে আবার একমাত্র অবস্থা-পরিণাম—এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, কোনও একটী ধর্ম্মীর এক ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্ম পরিগ্রহ করাও অবস্থা-পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ রূপ ধর্ম্মেরও এক লক্ষণ হইতে লক্ষণান্তর প্রাপ্তিকে অবস্থা-পরিণাম বলা যাইতে পারে। অতএব প্রকৃতপক্ষে একমাত্র দ্রব্য বা ধর্ম্মীরই পরিণাম হয় এবং এই একদ্রব্য পরিণামই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাভেদে ত্রিধা কল্পিত হইয়া থাকে; এবং ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই ত্রিবিধ পরিণামের একটীও ধর্ম্মীর স্বরূপ অতিক্রম করে না অর্থাৎ সকলেই ধর্ম্মীতে অনুগত থাকে। ফলে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে এবং উক্ত ত্রিবিধ পরিণামও একমাত্র ধর্ম্মপরিণামেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতেছে।

মল্লিসেন সূরি কিন্তু এই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ স্বীকার করেন নাই[২]। তিনি যোগ-দর্শনের এই

১। পাতঞ্জল-দর্শন, বিভূতিপাদ ১৩শ সূত্র ও তদুপরি ভাষ্য দ্রষ্টব্য। 'অথ কোঽয়ং পরিণামঃ? অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ।

২। স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী, পৃষ্ঠা ১৮ এবং পরবর্ত্তী (চৌখাম্বা-গ্রন্থমালা)।

ত্রিবিধ পরিণাম স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতে এই পরিণমমান ধর্ম্ম, ধর্ম্মী হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, কিন্তু একান্ত বা অত্যন্ত ভিন্নও নহে, আবার একান্ত অভিন্নও নহে। ধর্ম্মী ধর্ম্ম হইতে একান্ত ভিন্ন হইলে, এই ধর্ম্মীর বা দ্রব্যের এই সকল ধর্ম্ম, অথবা এই ধর্ম্মী এই সকল ধর্ম্মের আশ্রয়ভূত, এইরূপ ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাবের লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহার অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। আরও একটী দোষ এই হয় যে, অন্য পদার্থের ধর্ম্মও আলোচ্য পদার্থের সহিত ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারে। পক্ষান্তরে ধর্ম্মী ধর্ম্ম হইতে একান্ত অভিন্ন হইলে ধর্ম্মী অথবা দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বজায় থাকে না। উহা পরিণমমান অসংখ্য ধর্ম্মপ্রবাহে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং ক্ষণভঙ্গবাদের প্রসক্তি হয়।

ইহা হইতে আরও প্রতিপন্ন হয় যে, বস্তুস্বরূপ নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে। কিন্তু একান্ত নিত্যও নহে, আবার একান্ত অনিত্যও নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জৈনগণ ঘোর ব্যবহারবাদী, তাঁহাদের মতে বস্তুস্বরূপ এরূপ হওয়া চাই যে, উহা দ্বারা কোনরূপ অর্থক্রিয়া বা কার্য্যোৎপত্তি সাধিত হয়। এখন যদি বস্তুকে একান্ত নিত্য বলা হয়, তবে সর্ব্বপ্রথম নিত্য বলিতে কাহাকে বুঝি, তাহা জানা চাই। নিত্যের লক্ষণ দেওয়া হয় এইরূপ,—"অপ্রচ্যুতানুৎপন্নস্থিরৈকরূপো হি নিত্যঃ"। যাহা নিত্য, তাহার স্বরূপ 'অপ্রচ্যুত' অর্থাৎ যাহার প্রচ্যুতি বা ব্যত্যয় হয় না। এককথায় যাহা অব্যয়। দ্বিতীয় বিশেষণটী হইল, 'অনুৎপন্ন' অর্থাৎ নিত্য বলিতে এমন কোন দ্রব্য নহে, যাহার পূর্ব্বে অস্তিত্ব ছিল না, পরে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; 'স্থির' অর্থাৎ স্থিতিশীল এবং 'একরূপ' অর্থাৎ যাহার রূপান্তর হয় না বা অপরিণামী। এখন যদি নিত্যের স্বরূপ হইল এই প্রকার, তবে দেখিতে হইবে, বস্তুকে একান্ত নিত্য বলা যায় কি না। বস্তু যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত নিত্যের লক্ষণানুসারে বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, অর্থক্রিয়া দুই প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে—হয় ক্রমে, না হয় অক্রমে, অর্থাৎ যুগপৎ[১]। অর্থক্রিয়া ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু ক্রমে কালক্ষেপ বুঝায় এবং যে কারণ অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ, তাহার কালক্ষেপ সঙ্গত হয় না। কালক্ষেপ মানিয়া লইলে, কারণে সামর্থ্যাভাব স্বীকার করিতে হয়। কেননা, যদি কারণের সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা ক্রিয়ার প্রথম অবস্থাতেই কালান্তরভাবিনী ক্রিয়ার সম্পাদন করিয়া ফেলিত। আবার যদি বলা যায়, কালক্ষেপেও কারণের অসামর্থ্য প্রতিপন্ন হয় না, তাহা হইলেও আর এক প্রকার অসামর্থ্য কারণে আরোপিত হইয়া পড়ে। তাহা এইরূপ,—মনে করুন, কোন কারণ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রিয়ার প্রথম ক্ষণেই সম্পূর্ণ ফল উৎপাদ না করিয়া, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং আরও পরবর্ত্তী ক্ষণের অপেক্ষা করে, তাহার কারণ এই যে, অন্যান্য সহকারি-ভাবের সমাবেশ (Collateral Collocation of Circumstances) প্রথম ক্ষণেই হইয়া উঠে না। সুতরাং ফলসমাপ্তির জন্য কারণকে সহকারী ভাবের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এজন্য কারণ ফলোৎপাদনে স্বয়ং অসমর্থ। কেননা, সে সহকারী ভাবের অপেক্ষা করে। এইরূপে জৈন বলিতে চান যে, কার্য্য কারণ-সম্বন্ধ আলোচনায় দেখা যায় যে, বস্তুর স্বভাব একান্ত নিত্য—এইরূপ কল্পনা করিলে অর্থক্রিয়াকারিত্ব ক্রমে সম্পাদিত

১। বস্তুনোঽর্থক্রিয়াকারিত্বং ক্রমাক্রমাভ্যাং ব্যাপ্তম্"—স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী।

হইতে পারে না। আবার অক্রমেও সম্ভব নহে। কেননা, বস্তু যে অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ বা এককালে অন্তকালভাবিনী সমুদায় ক্রিয়া সম্পাদন করে, ইহা প্রতীতিবিরুদ্ধ। আর এককক্ষণে সকল ক্রিয়ার সম্পাদন হইয়া গেলে, পরক্ষণে করিবার আর কিছু থাকে না। পক্ষান্তরে বস্তু ক্রমে ক্রিয়া সম্পাদন করে, এ কথা বলিলেও পূর্ব্বোক্ত দোষের প্রসক্তি হয়। এইরূপে দেখা গেল যে, বস্তুস্বরূপ একান্ত নিত্য কল্পিত হইলে, 'ক্রমে' অথবা 'যুগপৎ' কোন ক্রমেই অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে।

আবার বস্তু একান্ত অনিত্য হইলেও, উহা দ্বারা অর্থক্রিয়াকারিত্ব নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কেননা, যাহা অনিত্য, তাহা প্রতিক্ষণবিনাশী, সুতরাং তাহা 'ক্রমে' অর্থক্রিয়া করিতে পারে না। ক্রমে দেশকৃত বা কালকৃত ব্যাপ্তি বুঝায়, কিন্তু প্রতিক্ষণবিনাশীর ব্যাপ্তি অসম্ভব। পক্ষান্তরে অনিত্য বস্তু 'অক্রমে' বা যুগপৎ অনেক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। কারণ, উহাও প্রতীতিবিরুদ্ধ। বীজ একটী বস্তু। উহা যুগপৎ রসশোষণ, অঙ্কুরোদ্ভাবন, প্রভৃতি অন্যান্য ক্রিয়ার জনক হইতে পারে না, ইহা প্রতীতি আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। এইরূপে দেখা গেল, বস্তু একান্ত নিত্য, অথবা একান্ত অনিত্য কল্পিত হইতে হইলে, উহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব সিদ্ধ হয় না; কিন্তু অর্থক্রিয়াকারিত্বই হইল, বস্তুর প্রাণস্বরূপ। এককথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, বস্তু একান্ত নিত্য, অথবা একান্ত অনিত্য হইলে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য-কারণ-ভাবের লোপ হয়। সুতরাং বস্তুস্বরূপ নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে। এইরূপ যুক্তি-তর্ক-সাহায্যে জৈনেরা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বস্তু অনেকান্তস্বভাব। তাহার সম্বন্ধে কোন একটী মাত্র একান্তধর্ম্মজ্ঞাপক বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমবায়েই বস্তুর বস্তুত্ব সিদ্ধ হয়। বস্তুকে যেরূপ একান্ত নিত্য বা একান্ত অনিত্য বলিতে পারা যায় না, সেইরূপ উহাকে কেবল সামান্য বা কেবল বিশেষ, এইরূপ নির্দ্দেশ করাও যায় না। এ স্থলে সামান্য ও বিশেষ— এই দুইটী পারিভাষিক শব্দের অর্থ আমাদের স্পষ্ট করিয়া জানিয়া রাখা আবশ্যক।

প্রশস্তপাদ বলেন যে, যে ধর্ম্ম অনেক বস্তুতে অনুবৃত্ত হয় এবং যাহা নিত্য, তাহার নাম সামান্য। যে ধর্ম্ম এই পুস্তকে, ঐ পুস্তকে, রামের পুস্তকে, শ্যামের পুস্তকে ও অন্যান্য পুস্তকে বিদ্যমান আছে, এবং যাহা বিদ্যমান আছে বলিয়াই, এই সকল পুস্তককে পুস্তক বলা যাইতেছে, অথবা যাহা দ্বারা এই সকল পুস্তকের পুস্তকত্ব নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহারই নাম সামান্য। শুধু তাহাই নহে, সামান্য ধর্ম্মটী নিত্য, অর্থাৎ এ পুস্তক, সে পুস্তক বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু উহাদের সকলে অনুগত যে পুস্তকত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম আছে, তাহার বিনাশ নাই। এই সামান্যের অপর নাম জাতি। এই সামান্যে আমরা বস্তুনিচয়ের সাধারণ ধর্ম্মের সংগ্রহ করি এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টতাকে বাদ দিয়া থাকি। এই সামান্য আবার ব্যাপকতার তারতম্যানুসারে পর, অপর এবং পরাপর,—এইরূপ ত্রিবিধ বিবেচিত হইয়া থাকে। যে সামান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক, তাহার নাম পরসামান্য, যে সামান্য অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যাপক, তাহার নাম অপরসামান্য। আবার যে সামান্য এক সামান্যের সহিত তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যাপক, কিন্তু অন্য সামান্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পব্যাপক, তাহার

নাম পরাপরসামান্য। ফলকথা, পর, অপর, এবং পরাপর—এই প্রকার ভেদ তুলনামূলক। এই হিসাবে সত্তারই ব্যাপকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং সত্তাই পরসামান্য। আর দ্রব্যত্ব পরাপর-সামান্য; কেননা, সত্তার অপেক্ষায় উহা অল্প এবং পুস্তকত্বের অপেক্ষায় অধিকব্যাপ্তিবিশিষ্ট। কারণ, পুস্তক যেমন দ্রব্য, ঐরূপ লেখনী, মসীপাত্রও এক একটী দ্রব্য। সুতরাং পুস্তকত্ব দ্রব্যত্বের অপেক্ষায় অপরসামান্য।

আবার যে ধর্ম্ম বস্তুর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া এককে অপর হইতে ব্যাবৃত্ত করে, তাহাই বিশেষ। এক কথায় বিশেষ বস্তুর ইতর-ব্যবচ্ছেদক ধর্ম্ম। আমার হস্তস্থিত লাল পুস্তকখানির যে ধর্ম্ম, উহাকে অন্যান্য নীল, পীত বা এমন কি, অপর লাল পুস্তক হইতে পৃথক্ করিয়া জানাইয়া দেয়, তাহারই নাম বিশেষ।

এই সামান্য ও বিশেষ লইয়া বস্তুর স্বরূপনির্ণয়সম্বন্ধে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত উত্থিত হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে, সামান্যই প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়। পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চে রাম, শ্যাম, অশ্ব, গো, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি সমুদায় বস্তুরই মধ্যে একমাত্র সত্তাই অনুগত আছে এবং ইহাই তত্ত্ব। ইহা ভিন্ন বিশেষের পৃথগস্তিত্ব কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। মীমাংসক এবং অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকেরা এই-ভাবে বস্তুর স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে বৌদ্ধেরা বলিয়াছেন যে, আমাদের বাস্তবিক উপলব্ধির বিষয় হইতেছে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। যখন গো, অশ্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়, তখন সেই প্রত্যক্ষীভূত গো বা অশ্বের বিশিষ্ট বর্ণ এবং অবয়ব-সংস্থান ভিন্ন গো, অশ্ব প্রভৃতিতে অনুগত সত্তারূপ কোন অতিরিক্ত পদার্থের অনুভব হয় না। এ কথাটী বৌদ্ধেরা নিম্ন-লিখিত শ্লোক দ্বারা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। ঐ শ্লোকটী পাঠ করিলে হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। শ্লোকটী এই,—

> এতাসু পঞ্চস্ববভাসিনীষু
> প্রত্যক্ষবোধে স্ফুটমঙ্গুলীষু।
> সাধারণং রূপমবেক্ষতে যঃ
> শৃঙ্গং শিরস্যাত্মন ঈক্ষতে সঃ॥[১]

মানুষের হাতের আঙ্গুল পাঁচটী। কোনটী ছোট, কোনটী বড়, কোনটী স্থূল, কোনটী ক্ষীণ। লোকে কথায় বলে, হাতের পাঁচটী আঙ্গুল কখনও সমান হয় না। সেই পাঁচ আঙ্গুলকে যে সমান দেখে, তাহার মত মূর্খ পৃথিবীতে কে আছে? বৌদ্ধ তাঁহাকে আর কিছুই বলেন নাই, কেবল বলিয়াছেন যে, তাহার মস্তকে নিশ্চয়ই শৃঙ্গ আছে। ইহাতে আপনারা যাহা বুঝিতে হয়, বুঝুন।

ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ এই সামান্য ও বিশেষ—উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে সামান্য ও বিশেষ পরস্পর নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র এবং সামান্য এবং বিশেষ পরস্পর বিরুদ্ধ। যে সামান্য, সে সামান্যই। আবার যে বিশেষ, সে বিশেষই। যেমন—জল ও অগ্নি একত্র থাকিতে পারে

১। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ধৃতশ্লোকঃ।—ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়, পৃঃ ৪৫—৪৬।

না, তেমনই সামান্য ও বিশেষ একত্র সমাবিষ্ট হইতে পারে না। একই মাত্র বস্তুতে সামান্য ও বিশেষ-ভাব কল্পনা করা যায় না। যদি বলা যায় যে, সামান্য গোত্বাদি শবল ধবলাদি বিশেষের সম্পূর্ণ বিপরীত বা বিরুদ্ধ হইলে, আমরা এতদুভয়ের ঐক্য প্রত্যক্ষ করি কি প্রকারে, তাহার উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণ বলেন যে, উহা সত্য নহে, সামান্য ও বিশেষ সম্পূর্ণ বিবিক্ত বা পৃথক্, কিন্তু জ্ঞাতার প্রবৃত্তি অনুসারে বিশেষ অথবা সামান্যের উপলব্ধি হয়। জ্ঞাতা যদি বিশেষের পক্ষপাতী হন, তবে তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হয়, বিশেষ; আবার জ্ঞাতা যদি সামান্যের পক্ষপাতী হন, তবে তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হয়, সামান্য। সুতরাং বস্তুস্বরূপ সামান্য-বিশেষাত্মক নহে। সামান্য ও বিশেষ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র এবং বিপরীত, এজন্য একই বস্তুতে যুগপৎ সামান্য ও বিশেষ—এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ কল্পনা করা যায় না।

জৈনগণ উপরি উক্ত সামান্য ও বিশেষ-বিষয়ক ত্রিবিধ একান্তবাদের নিম্নলিখিতরূপ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা এস্থলেও আমাদিগকে অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ বস্তুতত্ত্বের স্মরণ করাইয়া দিয়া সপ্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বস্তুস্বরূপ অনেকান্তরূপ না হইলে, তদ্দ্বারা ব্যবহারোপযোগিতা সিদ্ধ হয় না। গো এই শব্দটী উচ্চারিত হইলে বাস্তব-জগতের যে প্রাণিবিশেষ আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তাহাতে যেমন খুর, ককুদ, লাঙ্গুল, সাস্না, বিষাণাদি অবয়ববিষয়ক সর্ব্বগোব্যক্তিতে অনুবৃত্ত একটী সামান্য ভাবসমষ্টির অনুভূতি হয়, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে গো, মহিষাদি হইতে ব্যাবৃত্ত, এইরূপ বিশেষেরও প্রতীতি হয়। এইরূপে যে স্থলে 'শবলা গোঃ'—এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হয়, সে স্থলেও গোত্ব এই সামান্যের সঙ্গে সঙ্গে শবলরূপ এই বিশেষেরও প্রতীতি হয়। সুতরাং বেদান্তী বা মীমাংসক যে একান্ত অথবা বিশেষবিরহিত সামান্যের কথা বলেন, তাহা প্রতীতি-বিরুদ্ধ, এবং বৌদ্ধও যে একান্ত বা সামান্যবিরহিত বিশেষের কথা বলেন, তাহাও প্রতীতি-বিরুদ্ধ।

স্বতন্ত্র সামান্য-বিশেষবাদী ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণের মতও অশ্রদ্ধেয়। কারণ, সামান্য বা জাতি প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে, আবার উহা হইতে ভিন্নও বটে। এই কথাটী তাঁহারা সাংখ্যের সদৃশ-পরিণাম ও বিসদৃশ-পরিণামবাদের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাংখ্য-মতে সৃষ্টিকালে যখন বিসদৃশ-পরিণাম ঘটে, তখন গুণত্রয়ের গুণপ্রধানভাবহেতু বস্তুস্বভাবের যেমন বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিতে সামান্য অবস্থান করিয়াও অপ্রধানভাব অবলম্বন করায়, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। আবার প্রলয়কালে যখন সদৃশ-পরিণাম হয়, তখন যেমন সত্ত্ব সত্ত্বরূপে রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে পরিণত হইয়া জগত-বৈষম্যের তিরোভাব সাধন করে, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির বৈচিত্র্য, বা বৈশিষ্ট্য গুণীভূত করিয়া তাহাদের সকলে অনুবৃত্ত সামান্যকে প্রধানভাবে ধরিয়া লইয়া, এই গো-ব্যক্তি, ঐ গো-ব্যক্তির সমান, এরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে; এবং ইহা প্রতীতিসিদ্ধও বটে, পক্ষান্তরে বিশেষও সামান্য হইতে একান্ত পৃথক্ নহে। কারণ, বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, যদি তাহার সর্ব্বাংশই সামান্যের দ্বারা অধিকৃত হইত, অর্থাৎ সামান্য যদি সর্ব্বগত হইত, আমাদের

বস্তু-সম্বন্ধে ধারণার সবটাই যদি একমাত্র নির্ব্বিশেষ-সামান্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে বিশেষ নিরাশ্রয় হইত, অর্থাৎ বিশেষ অসর্ব্বগত হইত এবং এইরূপে সর্ব্বগতত্ব ও অসর্ব্বগতত্বরূপ দুইটী একান্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একই বস্তুতে সমাবেশ ধারণা করা অসম্ভব হইত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বিসদৃশ পরিণাম-রীতিতে সামান্যেরও অনেকত্ব কল্পনা অসঙ্গত হয় না। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিতে সামান্যের অপ্রধানভাবে অস্তিত্ব আছেই, যদিও আমরা বস্তুর অবগতিকালে কেবল উহার বিশেষ ধর্ম্মেই প্রাধান্য অর্পণ করি। এই হিসাবে বস্তুতে সামান্য-বিশেষরূপ ধর্ম্মের অধ্যাস প্রতীতি বা অনুমানবিরুদ্ধ নহে।

জৈনেরা বস্তুর স্বরূপনির্ণয়-প্রসঙ্গে আরও এক প্রকার উভয়াত্মকতা বা অনেকান্ততা সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে বস্তু সৎও বটে, আবার অসৎও বটে।[১] কারণ, বস্তুমাত্রকে যদি কেবল সৎ অর্থাৎ আছে মাত্র—এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে উহা দ্বারা কেবলমাত্র এক অনির্দ্দিষ্ট সত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বস্তু-স্বরূপের আভাস পাওয়া যায় না। কেবল বলিতে হয়, only that it is, and not what it is. আবার উহাকে যদি একান্ত অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলেও বস্তুর সত্তার একেবারে লোপ হয়। তাহা হইলে এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, বস্তুর স্বরূপনির্দ্দেশ কিরূপে সুসঙ্গত হয়? জৈন বলিতেছেন যে, বস্তুস্বরূপ সদসদাত্মক। সৎ ও অসৎ—এই উভয়াত্মক। ইহার অর্থ এই যে, যে কোন বস্তুরই নিজের একটী সত্তা আছে, উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, করিলে বস্তুর কোন নির্দ্দেশই চলে না।[২] ঘটের সত্তাই যদি না থাকিত, তাহা হইলে, ইহা একটী ঘট, এই প্রকার স্বরূপ-নির্দ্দেশ অসম্ভব হইত। সুতরাং নিজ স্বরূপাংশে বস্তু সৎ, ইহা সিদ্ধ হইল। পক্ষান্তরে ঘটে ঘট-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য পদার্থের ধর্ম্মসকলের অস্তিত্ব নাই। ঘটে পটধর্ম্মের অসদ্ভাব। ঘটে পট নাই, সুতরাং পটত্ব অপেক্ষায় ঘটের বিদ্যমানতা নাই। অর্থাৎ পটাপেক্ষায় ঘট অসৎ। ফলকথা, সকল বস্তুই স্বরূপাংশে সৎ আবার স্বব্যতিরিক্ত অন্য যে কোন দ্রব্য অপেক্ষায় অসৎ[৩]। এ যাবৎ যাহা বলা হইল, তাহা যে কেবল অজীব (পুদ্গল) সম্বন্ধেই খাটে, তাহা নহে। জীব অথবা আত্মা সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, উহাও নিত্যানিত্যত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার। সুতরাং উপরি উক্ত সকল কথাই আত্মা সম্বন্ধে সমভাবেই খাটে।

উল্লিখিত যুক্তি-প্রণালী-সাহায্যে জৈনগণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, পরিদৃশ্যমান বস্তুজাত নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে। তাহাদিগকে সামান্যও বলা যায়, আবার বিশেষও বলা যায়। তাহারা সৎও বটে, আবার তাহাদিগকে অসৎ বলিলেও প্রতীতিবিরুদ্ধ হয় না। এককথায়

১। স্যাদ্বাদমঞ্জরী (চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা)—পৃ° ২৬১ ; ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় (চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা) —পৃ° ৪৭।

২। "একান্তসত্ত্বে বস্তুনো বৈশ্বরূপ্যং স্যাৎ। একান্তাসত্ত্বে চ নিঃস্বভাবতা ভাবানাং স্যাৎ।"

৩। "সর্ব্বমস্তি স্বরূপেণ পররূপেণ নাস্তি চ।
অন্যথা সর্ব্বসত্ত্বং স্যাৎ স্বরূপস্যাপ্যসম্ভবঃ।"—ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়।

বস্তু অনেকান্তরূপ এবং উহার ধর্ম্মও অনন্ত। ঘট একটী বস্তু। উহার নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব দ্রব্যাত্মকতা, পর্য্যায়ত্মকতা, সামান্য ভাব, বিশেষ ভাব, আমত্ব, পাকজরূপাদিমত্ব, আকার, গঠন, দিগধিকার, জলাদিধারকত্ব, পুরাণত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অনন্ত। ঐরূপ জীব-জগতেও দেখা যায় যে, কোন মানবাত্মার কর্ত্তৃত্ব, অমূর্ত্তত্ব, বিষাদ, শোক, দুঃখ, সুখ, গতি, আহার, বিহার, সক্রিয়ত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রভৃতি অপরিমেয় ধর্ম্ম রহিয়াছে। সুতরাং জীবাজীবলক্ষণ বস্তুজাতের মধ্যে কোন একটী বস্তু-সম্বন্ধে কোন এক প্রকার নির্দ্দেশ ঐকান্তিক সত্য (absolutely true) হইতে পারে না। উহা কেবলমাত্র পাক্ষিক সত্য (relatively true) এইরূপ বলাই সুসঙ্গত। একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমি মৃদ্ঘটের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। আমি বলিতে পারি, আমার সম্মুখে অবস্থিত এই মৃদ্ঘটটী একটী দ্রব্য। এস্থলে দ্রব্য বলিতে আমি বুঝি কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। সুতরাং এরূপ নির্দ্দেশ এক প্রকার সত্য। কারণ, মৃদ্ঘটটী মৃদ্দ্রব্যাংশে মৃৎপরমাণুর সমষ্টি ত বটেই। আবার জৈনমতে আকাশ একটী দ্রব্য[১]। কিন্তু আকাশ পরমাণুর সমষ্টি নহে। সুতরাং মৃদ্ঘটটী আকাশ যে অর্থে দ্রব্য, সে অর্থে দ্রব্য নহে। এইজন্য এই মৃদ্ঘটটী একটী দ্রব্য, এ বাক্য সত্য; আবার অন্য হিসাবে সত্য নহে। এককথায় মৃদ্ঘটটী দ্রব্যও বটে, আবার অদ্রব্যও বটে। এইরূপে এই 'মৃদ্ঘটটী কতকগুলি পরমাণুর সংস্থানবিশেষ,' এ কথাটী একটী পাক্ষিক সত্য। কারণ, উহা মৃৎপরমাণুর-সংস্থান-বিশেষ ত বটে, আবার উহা পরমাণুর সংস্থানবিশেষ নহে, এ কথাও সত্য। কারণ, উহা জলীয় পরমাণুর সংস্থানবিশেষ ত নহে। আবার উহাকে মৃৎপরমাণুসংস্থানবিশেষ বলিতে পারি এবং উহাও পাক্ষিক সত্যরূপে স্বীকৃত হইতে পারে। কারণ, ঐ সংস্থানের সাধক কুম্ভকার দেবদত্ত। পক্ষান্তরে উহা মৃৎপরমাণুসংস্থানবিশেষ নহে, ইহা বলিলেও সত্য কথা বলা হইল। কারণ, ঐ সংস্থান যজ্ঞদত্ত কর্ত্তৃক সাধিত হয় নাই। অর্থাৎ দেবদত্তের কর্ত্তৃত্বাপেক্ষায় এই মৃদ্ঘট মৃৎপরমাণু-সংস্থানবিশেষ। আবার যজ্ঞদত্তের অকর্ত্তৃত্বাপেক্ষায় ঐ মৃদ্ঘট মৃৎপরমাণু-সংস্থান-বিশেষ নহে। আরও এক পদ অগ্রসর হইলে বলা যায় যে, এই মৃদ্ঘট দেবদত্ত-রচিত মৃৎপরমাণু সংস্থানবিশেষ এ কথা সত্য। আবার যেহেতু মৃদ্ভৃঙ্গারের পরমাণু-সংস্থান এই মৃদ্ঘটে নাই, সে জন্য মৃদ্ভৃঙ্গারপরমাণুসংস্থানের অপেক্ষায় এই মৃদ্ঘট দেবদত্ত-রচিত মৃৎপরমাণু-সংস্থান-বিশেষ নহে। এইরূপে জৈনগণের মতে কোন বস্তু-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বচন-বিন্যাস (Judgment) কেবল পাক্ষিক সত্য বলিয়া ধরা উচিত। কোন একপ্রকার বচন-বিন্যাস একান্ত সত্য প্রদান করে, এ কথা বলা চলে না। কারণ, বস্তু অনন্ত ধর্ম্মের আধার এবং একপ্রকার বচন-বিন্যাসে একটীমাত্র ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া তাহাকে একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, ধর্ম্মান্তরের নির্দ্দেশকালে সেই নির্দ্দেশক বাক্য উক্ত বচন বিন্যাসের সহিত বিরোধ উপস্থিত করে, সুতরাং উহাকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে। ফলে কোন এক বচন-বিন্যাস কোন এক বস্তুর ধর্ম্মবিশেষ উদ্দেশে

১। ধর্ম্মাধর্ম্মাকাশপুদ্গলকালজীবলক্ষণং দ্রব্যষট্‌কম্। দ্রব্যের অপর নাম অস্তিকায় (বোধ হয়, ইংরেজিতে category শব্দের তুল্যার্থক)।

প্রযুক্ত হইলে সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু সেই একই বচন-বিন্যাস সেই বস্তুরই ধর্ম্মান্তরের অপেক্ষায় প্রযুক্ত হইলে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এক্ষণে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, জৈনেরা নয় বলিতে কি বুঝেন। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, জৈনমতে বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত। এই অনন্ত ধর্ম্মের সদ্ভাব সত্ত্বেও আমরা উহার কোন কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ নিরুদ্ধ করিয়া যে ভিন্ন ভিন্ন বচন বিন্যাস সাহায্যে এই বস্তু এবম্ভূত, এইরূপ বস্তু নির্দ্দেশ করি, উহার পারিভাষিক নাম **নয়**[১]।

আর এক কথা। যদিও বস্তুর অনন্ত ধর্ম্মাত্মকতাবশতঃ অনন্ত প্রকারে বস্তু নির্দ্দেশ করা যায়, সুতরাং অনন্ত নয়ের সৃষ্টি হইতে পারে, তথাপি সেই সমুদায় নয়গুলিকে কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, প্রধানতঃ দুই উপায়ে বস্তুস্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এক উপায় হইতেছে যে, আমরা উহাকে একটী সংহত দ্রব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। তখন উহার যে অনন্ত ধর্ম্ম আছে, তাহাদের আর পৃথক্ সত্তা চিন্তা করি না, মনে করি যেন তাহারা দ্রব্যের সত্তার সহিত মিলিত হইয়া আছে। আবার অন্য উপায় হইতেছে যে, বস্তুর দ্রব্যত্ব উড়াইয়া দিয়া কেবল উহা যে অসংখ্য ধর্ম্মের সমষ্টি, সেই ধর্ম্মগুলিকে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বাস্তব বলিয়া চিন্তা করিতে পারি। কারণ, কেবল উহারাই আমার প্রতীতি-গম্য। এই যে স্থূলতঃ দুইটী উপায়ের উল্লেখ করা হইল, উহার প্রথমটীর পারিভাষিক নাম **দ্রব্য নয়**, দ্বিতীয়টীর নাম **পর্য্যায় নয়**। এই দ্রব্য নয়ের আবার তিনটী বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। যথা—**নৈগম নয়, সংগ্রহ নয়** এবং **ব্যবহার নয়**। এইরূপ পর্য্যায় নয়েও চারিটী বিভাগ আছে, যথা—**ঋজুসূত্র নয়, শব্দ নয়, সমভিরূঢ় নয়** এবং **এবম্ভূত নয়**।

এক্ষণে উক্ত নয়গুলির প্রকৃতি নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি, বস্তুর স্বরূপনির্ণয় করিতে গেলে দেখা যায়, উহাতে সামান্য ও বিশেষ—উভয়েরই সমাবেশ আছে। কিন্তু এই উভয়ের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও যদি আমরা একের পরিবর্ত্তে অপরটী ব্যবহার করি, অর্থাৎ বস্তুর সামান্য-বিশেষরূপ উভয়াত্মকতা সত্ত্বেও যদি বস্তুকে কখন বা সামান্য, কখন বা বিশেষ কল্পনা করি, তাহা হইলে ঐরূপ কল্পনার পারিভাষিক নাম **নৈগম নয়**[২]। ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণ বস্তু-সম্বন্ধে ঐরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, সুতরাং জৈনেরা ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণকে নৈগম-নয়ানুগামী নাম দিয়া থাকেন। আবার যদি বিশেষ বিশেষ বস্তুর বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য ভুলিয়া গিয়া সকলকে কোন একরূপ সামান্যে সংগৃহীত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইল **সংগ্রহ নয়**[৩]। সংগ্রহ দ্বিবিধ। পর ও অপর। যদি নিখিল বস্তুকে একমাত্র সত্তায় সংগৃহীত করা হয়, তবে তাদৃশ সংগ্রহের নাম পরসংগ্রহ। কিন্তু আবার যদি সকল দ্রব্যকে

১। "তত্র অনিরাকৃতপ্রতিপক্ষো বস্ত্বংশগ্রাহী জ্ঞাতুরভিপ্রায়ো নয়ঃ।—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২। নিগমো হি সংকল্পস্তত্রভবস্তৎপ্রয়োজনো বা নৈগমঃ।—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৩। স্বজাত্যবিরোধেনৈকধ্যমুপনীয়ার্থানাক্রান্তভেদান্ সমস্তসংগ্রহণাৎ সংগ্রহঃ। প্রমেয়, ষষ্ঠ।

দ্রব্যরূপ সামান্যে সংগৃহীত করা হয়, তবে তাহার নাম অপরসংগ্রহ। ইহাকে অপর বলিবার কারণ এই যে, ইহা হইতে পর বা চরমসংগ্রহ আছে। কারণ, দ্রব্যত্ব সত্তাতে সংগৃহীত হয়। অদ্বৈত বেদান্ত পরসংগ্রহ গ্রহণ করিয়াছেন। সেজন্য জৈনেরা অদ্বৈতবাদিগণকে সংগ্রহনয়াবলম্বী নাম দিয়াছেন।

সংগৃহীত অর্থের বিধিপূর্ব্বক অবহরণ অর্থাৎ বিভজন (বি-অবহরণ) বা বিভাগ করার নাম ব্যবহার নয়[১]। জৈন বলিতে চান যে, বিশ্লেষণ-প্রণালী অবলম্বনে অনন্ত বিশেষ বা বৈচিত্র্যের নিরাস করিতে করিতে আমরা যে কেবল সদাত্মক পর বা চরম সংগ্রহে উপনীত হই, তাহা দ্বারা ব্যাবহারিক জগতে কোন ফললাভ হয় না। ব্যাবহারিক জগতে দেখিতে পাই যে, বস্তু অনন্ত এবং তাহাদের ধর্ম্মও অনন্ত। ব্যবহার-জগৎ চায় কি যে, তোমার অখণ্ড, অভিন্ন, একটানা কল্পিত 'সৎ'কে ভাঙ্গিয়া টুকুরা টুকুরা করিয়া ফেলিয়া বাস্তব ঘট পট প্রভৃতি অনন্ত বৈচিত্র্যময় অনন্ত বস্তুর সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া দাও। পরসংগ্রহ বলিতে চায়, নিখিল বস্তুই সৎ। ব্যবহার নয় বলিতে চায়, তোমার ঐ সৎকে আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বলিব যে, যাহা সৎ, তাহা হয় দ্রব্য, না হয় পর্য্যায়, অর্থাৎ গুণ বা ধর্ম্ম। অপরসংগ্রহে সর্ব্বদ্রব্য দ্রব্যত্বে সংগৃহীত হয়, সকল পর্য্যায় পর্য্যায়ত্বে সংগৃহীত হয়। কিন্তু ব্যবহার নয় বলিতে চায়, যাহা দ্রব্য, তাহা জীব, অজীব (পুদ্গল) ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ ও কাল—এই ছয়টী পদার্থে বিভাজ্য। যাহা পর্য্যায়, তাহাও দ্বিধা বিভাজ্য। কারণ, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের সহিত সহভাবী (Co-extensive), আর কতকগুলি ক্রমভাবী (Successive)। পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, জৈনগণ বস্তুস্বরূপ বলিতে দ্রব্যপর্য্যায়াত্মক বুঝিয়াছেন।[১] ইহা দ্বারা সামান্য-বিশেষ-ভাবেরও কথঞ্চিৎ একত্র সমাবেশ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য, ব্যবহার-প্রামাণ্যবাদী জৈনগণের ব্যবহার নয়ই অনুমত। কারণ, ইহার সাহায্যে বস্তুস্বরূপ নির্ণয়ে ব্যাবহারিক জীবনে সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়।[২]

উপরে দ্রব্য নয় তিনটীর পরিচয় দেওয়া গেল। পর্য্যায় নয়ের আবার চারিটী বিভাগ আছে। যথা ঋজুসূত্র নয়, শব্দ নয়, সমভিরূঢ় নয় ও এবম্ভূত নয়। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত তিনটীর দার্শনিক উপযোগিতা কিছুই নাই, সে কারণ উহাদের আলোচনা করা হইল না। প্রমেয়কমল-মার্ত্তণ্ডকার ঋজুসূত্র নয়ের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। ঋজু বলিতে প্রাঞ্জল অথবা স্পষ্ট। বর্ত্তমান ক্ষণ আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট, উহাকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষায় সহজে বুঝি। যাহা দ্বারা বর্ত্তমান ক্ষণস্থায়ী বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান হয়, তাহারই নাম ঋজুসূত্র নয়। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধেরা এই ঋজুসূত্রনয়াবলম্বী। তাঁহারা বলেন, সর্ব্ববস্তুই ক্ষণিক। অতীত বা অনাগত বলিয়া কোন বস্তুই নাই। কোন বস্তু বলিতে এইমাত্র বুঝি যে, উহা কতকগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ ধর্ম্মের সমষ্টি এবং বর্ত্তমান ক্ষণে ক্রিয়ার জনক। প্রতিক্ষণেই নব নব ধর্ম্মসমষ্টির উৎপত্তি হইয়া পরক্ষণেই বিনাশ

১। সংগৃহীতার্থানাং বিধিপূর্ব্বকমবহরণং বিভজনং ভেদেন প্ররূপণং ব্যবহারঃ।...ব্যবহারস্তু তদ্বিভাগমভিপ্রৈতি।
—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২। প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডে ধৃত শ্লোকাংশঃ—"ব্যবহারানুকূল্যাত্তু প্রমাণানাং প্রমাণতা"।

প্রাপ্ত হইতেছে। বস্তু বলিতে এই প্রতিক্ষণে জায়মান নূতন নূতন ধর্ম্মসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা হইল, দ্রব্য ও পর্য্যায়-নয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এতক্ষণে স্যাদ্‌বাদের পরিচয় আরও সুগম হইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বস্তুর অনন্ত ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিশেষ ধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া বচন-বিন্যাস করার পারিভাষিক নাম "নয়"। যেমন বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত এবং ঐ ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধও অনন্ত, সেইরূপ নয়ও অনন্ত হইতে পারে। সুতরাং নয়গুলি কেবল পাক্ষিক সত্য প্রকাশ করিতে সমর্থ; উহারা একান্ত সত্য প্রকাশ করিতে পারে না; এবং ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্ত এবং বৌদ্ধ আচার্য্যগণ উঁহাদের আপন আপন মতবাদকে একান্ত সত্যের প্রকাশক বলিয়া বিবেচনা করায়, কিরূপ গোলে পড়িয়াছেন। তাঁহারা নয়ের পরিবর্ত্তে নয়াভাস প্রচার করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণবশতঃ জৈন আচার্য্যগণ উপদেশ দিয়াছেন যে, যে কোন নয়াবলম্বনে বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে আমাদের কোন নির্দ্দেশ বা বচন-বিন্যাসই একান্ত বা অখণ্ড সত্য প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। সকল প্রকার নির্দ্দেশই পাক্ষিকভাবে সত্য। অতএব যাহাতে আমাদের বস্তুনির্দ্দেশ কোনরূপে বাধিত না হয়, সেই জন্য সকল প্রকার বচন-বিন্যাসের পূর্ব্বেই "স্যাৎ" এই শব্দের প্রয়োগ করা উচিত। "এই বস্তুর প্রকৃতি এইরূপ", এইভাবে বচন-বিন্যাস করিলে, সেই বস্তুর প্রকৃতির অন্যরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বস্তু অনন্তধর্ম্মাত্মক। বস্তুর এইরূপ হওয়ার যতদূর সম্ভাবনা, এতদতিরিক্ত যে কোন অন্যরূপ হওয়ারও ঠিক ততদূর সম্ভাবনা। সুতরাং "এই বস্তু হয় ত এইরূপ", এ কথা বলিলে, উহার অন্যরূপ হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা হইল না। এইরূপে সকল প্রকার বাক্যবিন্যাসেই "স্যাৎ" এই শব্দের প্রয়োগ করা বিধেয়। ইহারই নাম "স্যাদ্বাদ"। কিন্তু সে যাহা হউক, স্যাদ্‌বাদ শব্দটি একটি প্রহেলিকার মত মনে হয়। বোধ হয়, এটীকে বাঙ্গালায় "হয়তবাদ" বলিলে আমরা ততটা চমকিয়া উঠি না।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই স্যাদ্‌বাদের চরম পরিণতি কিরূপ। আমরা দেখিয়াছি যে, বস্তুর স্বরূপসম্বন্ধে সকল প্রকার বাক্যই 'স্যাৎ'-শব্দপুরঃসর প্রয়োগ করিতে হইবে; কারণ, কোন এক প্রকার বাক্যই কোন বস্তুর প্রকৃতি-সম্বন্ধে একান্ত সত্য প্রদান করিতে সমর্থ নহে। উহা এক হিসাবে সত্য হইলেও, অন্য হিসাবে আবার অসত্য, এক হিসাবে যে বাক্য বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যায় (affirmation), অন্য হিসাবে আবার তাহাকেই নিষেধপূর্ব্বক প্রয়োগ (negation) করা যাইতে পারে। আবার এই বিধি ও নিষেধের ক্রম ও যৌগপদ্য কল্পনা করিয়া জৈনাচার্য্যগণ স্যাদ্‌বাক্যের সপ্তধা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই স্যাদ্‌শব্দপুরঃসর এবং বিধি ও নিষেধ-সহকারে ঐ বিধি-নিষেধের ক্রম এবং যৌগপদ্য অনুসারে যে সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গ সম্ভব হইতে পারে, উহাদিগের সমুদায়ের নাম **সপ্তভঙ্গী নয়**। এই সপ্তপ্রকার বচনভঙ্গের সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা যাইবে। **এই সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গের সাধারণতঃ নাম দেওয়া হয়—স্যাদ্‌বাদ।** কিন্তু 'স্যাদ্‌বাদ'—এই শব্দটী আরও একটী অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বস্তুর অনন্তধর্ম্মত্ববশতঃ জৈনগণ যে অনেকান্ত-

বাদরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই **অনেকান্তবাদেরও অপর নাম দেওয়া হয়—'স্যাদ্‌বাদ'**[১]। অতএব দেখা গেল যে, বস্তুর অনন্তধর্ম্মত্বহেতু বস্তুস্বরূপনির্ণায়ক অনেকান্তবাদকে যেমন স্যাদ্‌বাদ বলা হয়, আবার সেই অনন্তধর্ম্মাত্মক বস্তুর পরিচায়ক বচনভঙ্গেরও নাম দেওয়া হয়—স্যাদ্‌বাদ। এক অর্থে ইহা বস্তুর স্বরূপনির্ণায়ক, অপর অর্থে ইহা সেই নির্ণীত বস্তুর প্রকাশক। বলা বাহুল্য, তত্ত্বনির্ণয় এবং উহার প্রকাশের চেষ্টা অভেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, অর্থ এবং বাক্য ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, ভাব ও ভাষা ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। ফলে স্যাদ্‌বাদ বলিতে জৈনাচার্য্যগণের বস্তুতত্ত্ববাদ এবং বস্তুর স্বরূপপ্রকাশক সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গ অর্থাৎ সপ্তভঙ্গী নয়, এই উভয়ই বুঝিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য

— ০ —

১। স্যাদিত্যব্যয়মনেকান্তদ্যোতকং, ততঃ স্যাদ্‌বাদোঽনেকান্তবাদো নিত্যানিত্যাদ্যনেকধর্ম্মশবলৈকবস্ত্বভ্যুপগমঃ ইতি।

—স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী, পৃঃ ১৪ (চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা)।

শুদ্ধিপত্র

শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়-লিখিত ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১০শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত "চৌম্বক ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা" প্রবন্ধের ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্তম্ভ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৫	৬	২য়	রজ্জ	রজ্জু
,,	৯	১ম	Sccondary	Secondary
৯৬	৫	১ম	বিদ্যুংযন্ত্র	বিদ্যুদ্‌যন্ত্র
,,	৯	১ম	Couloumb	Coulomb
,,	,,	২য়	তাড়িৎ	তড়িৎ
,,	১২	,,	Electrovc	Electrode
,,	১৫	১ম	Valtaic	Voltaic
,,	১৭	,,	elecrtity	electricity
,,	২০	,,	Defleetion	Deflection
,,	২২	,,	অঙ্গম	অঙ্গন
৩	২৩	২য়	Eletro-typing — তড়িদাঙ্কন	Electro-typing — তড়িদঙ্কন
,,	৩২	১ম	ধারাস্ফরণ	ধারাস্ফুরণ
৭	১৪	,,	তড়িদমানাক্ষ	তড়িদ্‌মানাঙ্ক
,,	২২	২য়	Leydengar	Leyden jar
,,	২৩	,,	Lightening	Lightning
,,	২৬	,,	Luminons	Luminous
,,	২০	,,	পাদবিদ্যুন্মান	পাদবিদ্যান্মান
,,	২১	,,	পাদ-বিদ্যুদ্বীক্ষণ	পাদ-বিদ্যাদ্বীক্ষণ
৯৯	১৬	,,	Valtameter	Voltameter
,,	২১	,,	তাড়িদ্	তড়িদ্

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রিংশ খণ্ডের

নাম-সূচী

ষ

স

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

একত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

বঙ্গাব্দ, ১৩৩১

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্
মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক
প্রকাশিত

একত্রিংশ ভাগের সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

জৈন-দর্শনে স্যাদ্‌বাদ

(২).

এক্ষণে এই সপ্তভঙ্গী নয় কিরূপ, তাহা আরও একটু বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। সপ্ত-ভঙ্গের প্রথম ভঙ্গটী এইরূপ,—"স্যাৎ কথঞ্চিৎ স্বদ্রব্য-ক্ষেত্র-কাল-ভাব-রূপেণ অস্ত্যেব সর্ব্বং কুম্ভাদি।" আমরা কেবলমাত্র "কুম্ভঃ অস্তি"—এইভাবে বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে 'কুম্ভঃ অস্তি'—এই বাক্যে যে অস্তিত্বের আভাস আছে, সে অস্তিত্বকে একান্তভাবে ধরিতে হয়, সুতরাং অস্তিত্ব শব্দের সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থ গৃহীত হয় বলিয়া, 'অস্তি' এই শব্দের দ্বারা 'মৃত্তিকা অস্তি', 'বৃক্ষঃ অস্তি', 'বস্ত্রম্ অস্তি'—এইরূপ বাক্যও সত্য বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত হইয়া পড়ে। আর এক কথা, উহা দ্বারা যে কোন উপাদানে প্রস্তুত কুম্ভ, যে কোন কালে, যে কোন দেশে বিদ্যমান কুম্ভ, এবং যে কোন রূপ বা বর্ণবিশিষ্ট কুম্ভের অস্তিত্বের কল্পনা সম্ভব হইয়া পড়ে।

কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে কুম্ভটী স্বীয় উপাদান-দ্রব্য মৃত্তিকা অবচ্ছেদে বিদ্যমান আছে, জল প্রভৃতি রূপে নহে, এইরূপে স্বীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেশ অবচ্ছেদে বিদ্যমান পরক্ষেত্রে নহে, কুম্ভটী পাটলিপুত্র নামক দেশবিশেষে আছে, কান্যকুব্জে নহে। এইরূপে স্বীয় কাল অপেক্ষায় বিদ্যমান, কিন্তু পরকীয় কাল অপেক্ষায় নহে, কুম্ভটী শীতকালে বিদ্যমান, কিন্তু বসন্তে নহে। এবং উহা রক্তবর্ণের, কিন্তু পীতবর্ণের নহে। কিন্তু যদি কেবলমাত্র ঐকান্তিক অস্তিত্বের কথা বলা হয়, তাহা হইলে এ সকল ব্যাবর্ত্তকের অভাবে বস্তুর প্রতিনিয়ত স্বার্থ-স্বরূপের (Identity) অভাব হইয়া পড়ে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, প্রথম প্রকার বচন-ভঙ্গের দ্বারা কুম্ভটী কোন বিশেষ দেশ, কাল, উপাদান এবং রূপের অপেক্ষায় অস্তিত্ববান্ এবং আমরা বলিয়া থাকি—'স্যাৎ কুম্ভঃ অস্তি', বা আরও সংক্ষেপে 'স্যাদস্তি'। আবার যেহেতু এই কুম্ভের অস্তিত্বের অঙ্গীকার কেবল অন্যান্য যাবতীয় বস্তু ও তাহাদের ধর্ম্মের নাস্তিত্বের (Non-being) অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং কেবল 'স্যাদস্তি' ইহাই বলা চলে না, 'স্যান্নাস্তি', ইহাও বলিতে হয়। তবে এই 'স্যাদস্তি' ও 'স্যান্নাস্তি' এই দুয়ের মধ্যে জ্ঞাতা বা বক্তার উদ্দেশ্য অনুসারে প্রাধান্য দিতে হয়। কখন বা তিনি অস্তিত্বের দিক্‌টাই বলিতে চান, তখন ঐ দিক্‌টাই প্রাধান্য লাভ করে; আর নাস্তিত্বদিক্‌টা গৌণ বা অপ্রধান হইয়া থাকে। কিন্তু অস্তিত্বের সঙ্গে নাস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট; একটী অন্যটী

ব্যতিরেকে থাকে না।[১] অতএব সপ্তভঙ্গী-নয়ের প্রথমটী হইল, 'স্যাদস্তি'; দ্বিতীয়টী 'স্যান্নাস্তি'। প্রথমটী বিধি-কল্পনা-প্রসূত; দ্বিতীয়টী নিষেধ-কল্পনা-প্রসূত।

সপ্তভঙ্গী-নয়ের তৃতীয় ভঙ্গ অতি সুগম। কেবলমাত্র বিধি ও নিষেধের ক্রমিক কল্পনা হইতে উৎপন্ন[২]। উহা এই প্রকার 'স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি চ'। চতুর্থ ভঙ্গটী এইরূপে উদ্ভূত হয়। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ধর্ম্ম যদি যুগপৎ প্রাধান্য-সহকারে একই বস্তুতে আরোপিত হয়, তাহা হইলে বস্তুর স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য হইয়া উঠে। ইহারই নাম অবক্তব্য নয়। প্রথম তিনটী নয় হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, প্রথম দুইটীতে একবার বিধির প্রাধান্য ও আর একবার নিষেধের প্রাধান্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গেই তদিতর সমুদায় বস্তু এবং তদীয় অন্য যাবতীয় ধর্ম্মের নাস্তিত্বের অঙ্গীকার অনুস্যূত রহিয়াছে। তবে যখন আমরা কোন বস্তুতে অস্তিত্বের আরোপ করি, তখন উহাতে বিধির প্রাধান্য; আবার যখন নাস্তিত্বের আরোপ করি, তখন উহাতে নিষেধের প্রাধান্য। এই দুই স্থলেই বিধি ও নিষেধের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য অনুসারে বাক্য-বিন্যাস করা হইয়া থাকে মাত্র; ক্রম বা যৌগপদ্যের প্রসর নাই। কিন্তু তৃতীয় নয়ে বিধি-নিষেধ, উভয়েরই প্রধান্য থাকিলেও, ক্রমিক আরোপবশতঃ উহা চতুর্থ ভঙ্গ হইতে বিভিন্ন। চতুর্থ নয়ে বিধি এবং নিষেধ, উভয়ই প্রধান এবং উভয়ই সমকালে একই বস্তুতে আরোপিত হয়। একই কালে একই বস্তু 'অস্তি'ও বটে 'নাস্তি'ও বটে, সুতরাং মানব ধীর অগম্য এবং এজন্য অবক্তব্য, কিন্তু গত্যন্তর নাই। কারণ, বস্তুর স্বরূপই হইল—ঐরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে আশ্রয় দেওয়া। মানব-চিন্তাশক্তি এইখানে স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করিতে বাধ্য।

উপরি-উক্ত ভঙ্গ চারিটী পরস্পর মিলিত করিলে আরও তিনটী ভঙ্গের সৃষ্টি হয়। সুতরাং পঞ্চম ভঙ্গটীর প্রকার হইবে এইরূপ—'স্যাদস্তি চ অবক্তব্যশ্চ'। বস্তুর অস্তিত্ব আছে, আবার অবক্তব্যও বটে। ষষ্ঠ ভঙ্গটী হইবে,—'স্যান্নাস্তি অবক্তব্যশ্চ'। অর্থাৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাইও বটে, আবার অবক্তব্যও বটে। এবং সর্ব্বশেষে সপ্তম ভঙ্গে আমরা পাই,—'স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ স্যাদবক্তব্যশ্চ'। বস্তুর অস্তিত্ব আছে—নাইও বটে; আবার অবক্তব্যও বটে। উপরি-উক্ত সপ্ত প্রকার বচন-বিন্যাসের সমুদায়ের নাম সপ্তভঙ্গী নয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বস্তুর ধর্ম্ম যখন অনন্ত, তখন বিধানপুরঃসর হউক বা নিষেধ-পুরঃসরই হউক, বচনভঙ্গও কেন অনন্ত হউক না, কেবল সপ্তপ্রকারই বা কেন হইবে? এ প্রশ্ন জৈনাচার্য্যগণ নিজেই উত্থাপিত করিয়া, নিজেই সমাধান করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,

---

১। "তস্মাদ্বস্তুনোঽস্তিত্বং নাস্তিত্বেনাবিনাভূতং নাস্তিত্বং চ তেন ইতি। বিবক্ষাবশাচ্চ অনয়োঃ প্রধানোপসর্জ্জনভাবঃ।"

—স্যাদ্বাদমঞ্জরী, পৃঃ ১৭৮

"The affirmation of any assertion and the denial of its contradictory are logical equivalents, which it is allowable and indispensable to make use of as mutually convertible"—Mill's *Examination of Hamilton's Philosophy*—pp. 471—472.

২। ক্রমতো বিধিনিষেধকল্পনয়া তৃতীয়ঃ।

যে, বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত, ইহা সত্য। কিন্তু যে কোন এক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিধি-নিষেধপূর্ব্বক বচনবিন্যাস করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, ঐরূপ সপ্তপ্রকার বচন-ভঙ্গেরই সম্ভাবনা; কারণ, উক্ত অবলম্বিত বস্তু-ধর্ম্ম-বিষয়ক জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি সপ্ত প্রকারের অধিক হইবার উপায় নাই। উহা সপ্তপ্রকারেই নিয়ন্ত্রিত। তাঁহারা বলেন যে, যেমন অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের সাহায্যে সপ্তধা বচন-বিন্যাস সম্ভব দেখান গেল, ঐরূপ সামান্য ও বিশেষ, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতির সাহায্যেও সপ্তপ্রকারই বচন নির্দ্দেশ হইবে। যথা স্যাৎ সামান্যং, স্যাদ্বিশেষঃ, স্যাদুভয়ং, স্যাদবক্তব্যং, স্যাৎ সামান্যাবক্তব্যং, স্যাদ্বিশেষাবক্তব্যং, স্যাৎ সামান্যবিশেষাবক্তব্যম্। এস্থলেও বিধি নিষেধের প্রয়োগ অব্যাহত আছে। 'বস্তু স্যাৎ সামান্যং'—এই বাক্যে সামান্যের বিধান করা হইতেছে এবং স্যাদ্বিশেষঃ—এই বাক্যেও নিষেধ নিহিত আছে। কারণ, বিশেষ ব্যাবৃত্তিপরায়ণ, এবং ব্যাবৃত্তি অর্থে পার্থক্য বা পৃথক্‌করণ বুঝায়। যখন কোন বস্তু অন্য বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত, একথা বলা হয়, তখন আমরা বুঝি যে, প্রথম বস্তুটী দ্বিতীয় বস্তুটীর সহিত সমান নহে। সুতরাং বিশেষেও নিষেধ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এইরূপে নিত্যত্বানিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসম্বন্ধেও বিধি-নিষেধ-সহকারে সপ্তভঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, জৈনাচার্য্যগণের মতে বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত হইলেও, বচনভঙ্গ সপ্তধা নিয়মিত। সাতের বেশী হয় না। কিন্তু সাতের কমে নামিতে পারা যায় কিনা, সে কথা জৈনাচার্য্যগণ উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা মনে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। যাহা হউক, জৈনগণ বিবেচনা করেন যে, এই সপ্তপ্রকার বচনভঙ্গই বস্তু-সম্বন্ধে খাটে। কেন না, ইহাদের যে কোন একটী বচনভঙ্গ মাত্র পাক্ষিক, অথবা আপেক্ষিক সত্যের প্রকাশক, সুতরাং উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় না। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা ও বৌদ্ধ আচার্য্যগণ প্রত্যেকেই এইরূপ এক একটী নয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ মাত্র খণ্ডসত্যে উপনীত হইয়াছেন। বস্তুস্বরূপ-পরিচায়ক অখণ্ড সত্যের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই কারণ ঐরূপ পাক্ষিক বা খণ্ডসত্যের পরিচায়ক বচন-বিন্যাসের তাঁহারা নাম দিয়াছেন "বিকলাদেশ", "নয় সপ্তভঙ্গী" অথবা নয়াভাস। পক্ষান্তরে সমুদিত ভঙ্গসপ্তক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ-প্রকাশে সমর্থ, সুতরাং অখণ্ড সত্যের পরিচায়ক। এজন্য উহার নাম "সকলাদেশ" অথবা "প্রমাণ-সপ্তভঙ্গী"[১]।

উপরে স্যাদ্‌বাদের এক প্রকার পরিচয় দেওয়া গেল। এক্ষণে আমরা উহা হইতে স্যাদ্‌বাদ-সম্বন্ধে কয়েকটী তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। সে কয়েকটী তথ্য এই,—প্রথমতঃ যদি প্রতীতিলব্ধ জ্ঞানে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ না থাকে, তবে বাস্তবিক বস্তু অনন্ত এবং পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ সত্তা (বিধি), অসত্তা (নিষেধ) এবং অবক্তব্য অথবা অনির্ব্বাচ্য এই কোটিত্রয়ে বস্তু-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বাক্য-বিন্যাসই

১। বিকলাদেশস্বভাবা হি নয়সপ্তভঙ্গী বস্ত্বংশমাত্রপ্ররূপকত্বাৎ।
সকলাদেশস্বভাবা হি প্রমাণসপ্তভঙ্গী যথাবৎ বস্তুপ্ররূপকত্বাৎ।"

—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,—পৃ ২০৬ খ।

(judgment) সীমাবদ্ধ। তৃতীয়তঃ কোন এক প্রকার বাক্য-বিন্যাসই একান্ত সত্য হয় না, আপেক্ষিক সত্যের সূচনা করে মাত্র। তাহা হইলে স্যাদ্‌বাদে বাহ্যবস্তুর স্বরূপ হইতেছে এইরূপ। বস্তুর জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে (Realism), কিন্তু বস্তু-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই বস্তুর এক একটা দিক্ (aspects) অথবা এক এক রকম ধর্ম্মের বা বিকাশের (manifestations) গ্রহণ করিতে সমর্থ, সুতরাং পাক্ষিক সত্যের আভাস দেয় মাত্র, এবং এই অফুরন্ত বিকাশের পশ্চাতে যে স্বরূপ-শক্তি আছে, তাহার অস্তিত্ব উক্ত অনন্ত বিকাশের নিদান-স্বরূপ অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে কি ইহা Herbert Spencerএর Transfigured Realismএর সহিত সমপর্য্যায়-ভুক্ত। একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, Spencerএর চিন্তাপ্রণালী ও স্যাদ্‌বাদ ঠিক একই নহে। স্পেন্সরের মতেও বস্তুজগৎ জ্ঞান-জগৎ হইতে স্বতন্ত্র এবং আমাদের জ্ঞান কেবল উহার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং উহা আপেক্ষিক সত্য প্রদান করে বটে। কিন্তু ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের অন্তর্নিহিত যে শক্তি আছে, তাহা এক ও অনন্ত (Absolute and Infinite) —যাহার বলে আপেক্ষিক (relative) সত্যগুলির উদ্ভব বা অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয়। পক্ষান্তরে স্যাদ্‌বাদে বস্তুর বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং স্যাদ্‌বাদ ও স্পেন্সরের Transfigured Realism উভয়ই বস্তুতন্ত্রবাদী হইলেও স্পেন্সর একত্বের পক্ষপাতী (Monistic) পক্ষান্তরে স্যাদ্‌বাদ বহুত্বের পক্ষপাতী (Pluralistic Realism). এতদ্ভিন্ন স্পেন্সর আমাদের জ্ঞেয় জগতের (world of experience) ভিত্তিস্বরূপ যে এক স্বরূপশক্তির (Power) স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কিন্তু তাঁহার মতে অজ্ঞেয় (unknown and unknowable); পক্ষান্তরে স্যাদ্‌বাদে বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞান অস্বীকৃত হয় নাই।

আর এক কথা, স্যাদ্‌বাদে আমরা পাইলাম যে, সকল প্রকার জ্ঞানই আপেক্ষিক (relative truths). কিন্তু এই আপেক্ষিক ভাবটাই আবার নিজেই আপেক্ষিক। কোন প্রকার জ্ঞান আপেক্ষিক সত্য বলিলে ইহাই বুঝায় যে, উহার আপেক্ষিকতা অন্য কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বা উহাকে অপেক্ষা করে। সুতরাং এই প্রকার চিন্তাপ্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অবশেষে এক অনপেক্ষ অখণ্ড সত্যের কল্পনা করিতে বাধ্য হই, যাহাতে 'এই অসংখ্য আপেক্ষিক সত্যের সমাধান হয়'[১]। কিন্তু জৈনগণ তাঁহাদের অনেকান্তবাদ বা স্যাদ্‌বাদে এরূপ অবশ্য-উত্থাপনীয় অনপেক্ষ বা একান্ত সত্যের (Absolute truth) স্বরূপ-নির্ণায়ক কোন প্রশ্ন স্পষ্টভাবে উত্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা কেবল এইটুকু মাত্র আভাস দিয়াছেন যে, সপ্তভঙ্গী নয়ের সমুদিত প্রয়োগেই প্রামাণ্য; আর তদ্ভিন্ন যাবতীয় বাক্য-বিন্যাস প্রমাণাভাস—অর্থাৎ পাক্ষিক সত্য। অবশ্য জৈনগণ এক প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা তাঁহাদের **'কেবল জ্ঞান'**। এই জ্ঞানে সাধারণের অধিকার নাই। যাঁহার সমস্ত কর্ম্মের মল ধৌত হইয়া গিয়াছে—এক কথায় যিনি 'জিন' হইয়াছেন, তাঁহারই এই **বিশুদ্ধ জ্ঞান** (Pure Intelligence) যাহা আত্মার

১। Cf. Bradley's "Coherence view of Truth". "But though transcending these modes of experience, it includes them all fully".—*Essays on Truth and Reality*, pp. 343-44.

স্বাভাবিক সম্পত্তি, ফিরিয়া আসিয়াছে। এই 'কেবল জ্ঞান' বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্বভাব এই যে, ইহার নিকটে দেশ বা কালকৃত ব্যবধান দূর হইয়া গিয়া বস্তুর স্বরূপজ্ঞান উদ্ভাসিত হয় ও একান্ত এবং অখণ্ড সত্য স্বয়ং প্রকাশ লাভ করে। (Intellectual Intuition ইহা অনেকটা Schellingএর মত) কিন্তু এই 'কেবল জ্ঞান' এক মুখ্যজ্ঞান ধরিয়া লইয়া বস্তুস্বরূপ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে, জৈনগণের অনেকান্ত-বাদরূপ সিদ্ধান্তের হানি হয়।

এক্ষণে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, (১) জৈনদিগের চিন্তাধারার সহিত ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের কিরূপ সম্বন্ধ; (২) সত্তা, অসত্তা এবং অবক্তব্য বা অনির্ব্বাচ্য, এই কোটিত্রয় অবলম্বনে সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গের বাস্তবিক অবকাশ আছে কিনা; এবং (৩) সর্ব্বশেষে স্যাদ্‌বাদের সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য তর্ক-শাস্ত্রের কোন সাদৃশ্য আছে কিনা।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, দর্শনশাস্ত্রের মতবাদগুলি প্রায়শঃ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমকালীন অন্যান্য মতবাদের সংঘর্ষেই সমুৎপন্ন হয়। এক্ষণে দেখিতে চেষ্টা করা যাউক যে, জৈনদিগের স্যাদ্‌বাদ যখন প্রথমে জগতে ঘোষিত হয়, তখন ঐ প্রকার চিন্তার ধারা ভারতীয় অন্যান্য দর্শনে স্থান পাইয়াছিল কিনা। যে সময় ভারতে স্যাদ্‌বাদের ঘোষণা আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ভারতে আরও দুইটী প্রধান চিন্তার ধারা প্রবাহিত ছিল। একটী বৌদ্ধ ও অপরটী ঔপনিষদিক. জৈনদিগের ধর্ম্ম ও দার্শনিক গ্রন্থ আলোচনায় দেখা যায়, ভদ্রবাহু-রচিত "সূত্রকৃতাঙ্গ-নির্যুক্তি" নামক গ্রন্থে স্যাদ্‌বাদের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ আছে। এই ভদ্রবাহুর জীবনকাল-সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার আলোচনায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই[১]। তবে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, তিনি যে সময়ে তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন, সে সময় বৌদ্ধগণের ধর্ম্ম ও দার্শনিক মত অনেক-পরিমাণে সংগঠিত হইয়াছিল[২], এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি প্রাচীনতম উপনিষদ্‌গুলি রচিত হইয়াছিল[৩] এবং উহাদের চিন্তার ধারা এবং মতবাদগুলি সমসাময়িক দার্শনিক-জগতের উপর কতক-পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমাদের ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভদ্রবাহু সর্ব্বপ্রথম স্যাদ্‌বাদের প্রচার করিলেও পরবর্ত্তী জৈনাচার্য্যগণ উহার পরিপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। জৈনাচার্য্য উমাস্বাতি বাচকমুখ্য "তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র" নামক জৈন-দর্শনের একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রায় পাঁচশত বর্ষ পরে সমন্তভদ্র ঐ গ্রন্থের যে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহার মুখবন্ধের নাম "আপ্ত-মীমাংসা"। এই আপ্ত-মীমাংসায় স্যাদ্‌বাদের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং সমন্তভদ্রের জীবনকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ।

১। পরলোকগত মহাত্মা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে ভদ্রবাহুর কাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

২। প্রায় সমুদায় ত্রিপিটক বৌদ্ধ-গ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪১ বৎসরের পূর্ব্বেই সঙ্কলিত হইয়া গিয়াছিল।—দাশগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৩। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির সময় ৭০০—৬০০ খৃঃ পূঃ (ঐ)।

অতএব পরবর্ত্তী কালে মাণিক্য নন্দী-রচিত "পরীক্ষামুখসূত্র" (আনুমানিক ৮০০ খৃষ্টাব্দ), প্রভাচন্দ্র কবি-রচিত পরীক্ষামুখসূত্রের টীকা "প্রমেয়কমল-মার্ত্তণ্ড" নামক গ্রন্থ (আনুমানিক ৮২৫ খৃষ্টাব্দ) হরিভদ্র-রচিত "ষড়্দর্শনসমুচ্চয়" (১১৬৮ খৃষ্টাব্দ), মল্লিষেণ কৃত "স্যাদ্বাদমঞ্জরী" (১২১৪ শকাব্দ ১২৯২ খৃষ্টাব্দ[১]) প্রভৃতি গ্রন্থে স্যাদ্বাদের পরিপোষণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, খৃষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে স্যাদ্বাদের চিন্তা-প্রণালীর উপর বৌদ্ধ ও ঔপনিষদিক প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক, স্যাদ্বাদের উপর বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্যবাদের প্রভাব কিরূপে সম্ভাবিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, স্যাদ্বাদের হস্তে ক্রীড়নক হইল তিনটী,—সত্তা, অসত্তা ও অবক্তব্য, অথবা সামান্য, বিশেষ ও অবক্তব্য; অথবা নিত্য, অনিত্য ও অবক্তব্য, অর্থাৎ দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমিক উল্লেখ ও তাহাদের যুগপৎ প্রাধান্যবশতঃ বস্তুর অনির্ব্বাচ্যতা। বৌদ্ধ ত্রিপিটকের মধ্যে অভিধম্ম-পিটকের সুত্ত ও বিনয়-পিটকের সহিত প্রতিপাদ্য-বিষয়ে সাম্য থাকিলেও উহাদের অপেক্ষায় অভিধম্ম-পিটক অধিক-পরিমাণে যুক্তি-তর্কের সাহায্য গ্রহণ করে। আবার সেই অভিধম্ম-পিটকের মধ্যে "কথাবত্থু" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় বিরুদ্ধ-মতাবাদিগণের[২] খণ্ডনপ্রসঙ্গে দ্বিকোটিক তর্কের উত্থাপন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাঁহাদের মতবাদগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের আধার, সুতরাং অশ্রদ্ধেয়। ইহার কিছু পরে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনই (৫০১ খৃষ্টাব্দ) প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহার শূন্যবাদ স্থাপন প্রসঙ্গে অস্তি, নাস্তি এবং অবক্তব্যরূপ ত্রিকোটিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোন বস্তুরই কোন নিজস্ব 'স্বভাব' বা সত্তা নাই। তাপকে অগ্নির স্বভাব বলা যায় না। কারণ, তাপ এবং অগ্নি উভয়েই অন্য অনেক কারণের উপর নির্ভর করে। যাহা অন্যের উপর নির্ভর করে না, কেবল তাহাই কোন বস্তুর স্বভাব হইবার যোগ্য। তাপ অন্যের উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাপ অগ্নির স্বভাব হইতে পারে না; এবং জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা অন্যের উপর নির্ভর করে না, সুতরাং সর্ব্ববস্তুই নিঃস্বভাব। ইহাই প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা শূন্যবাদের নিগূঢ় অর্থ। ফলতঃ যেমন আমরা কোন বস্তু-সম্বন্ধে "ইহার স্বভাব এই"—এরূপ বিধিপূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি না, সেইরূপ "ইহার স্বভাব এরূপ নহে"—এরূপ নিষেধ-বাক্যও প্রয়োগ করিতে পারি না। সুতরাং বস্তু-স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে।

১। মল্লিষেণ তাঁহার পুস্তকের রচনা-কাল পুস্তকের শেষে স্বয়ং দিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রীমল্লিষেণসূরিভিরকারি তৎপদগগন দিনমণিভিঃ।
বৃত্তিরিয়ং মনুরবিমিতশকাব্দে দীপমহসি শনৌ।" (মনুরবি—১২১৪)

২। কথাবত্থুর টীকাকার এই কয়েকটী বিরুদ্ধমতবাদীর উল্লেখ করেন যথা,—মহাসঙ্ঘিকাঃ, লোকোত্তরবাদিনঃ, কক্কুলিকাঃ, প্রজ্ঞপ্তিবাদিনঃ, একব্যবহারিকাঃ এবং সর্ব্বাস্তিবাদিনঃ। ইহাদের মধ্যে মহাসঙ্ঘিকবাদে জৈন-সম্মত আত্মার কৃৎস্ন-শরীর-ব্যাপিত্বের ন্যায় চিত্তের সর্ব্বশরীর ব্যাপিত্বের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম"-শীর্ষক প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।—(নারায়ণ, ১৩২২, শ্রাবণ)।

দৃশ্যমান জগতে বস্তুনিচয় এক ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, আবার পরক্ষণেই ধ্বংসলাভ করিতেছে। এইরূপ উৎপাদ ও ধ্বংস ব্যতিরেকে তাহাদের কোন নিজস্ব স্বভাব নাই। এ জগৎটাই এরূপ নিঃস্বভাব, উৎপাদ ও বিনাশের প্রবাহ মাত্র। ইহারই অপর নাম "প্রপঞ্চ-প্রবৃত্তি"। এই প্রপঞ্চ প্রবৃত্তির নাশেই নির্ব্বাণ; এবং নির্ব্বাণ ও শূন্য একই। নির্ব্বাণের স্বরূপ হইতেছে এই যে, উহা ভাবরূপও নহে, আবার অভাবরূপও নহে। নির্ব্বাণ ভাবরূপ হইলে, উহা কতকগুলি কারণ-সামগ্রী হইতে "সংস্কৃত" বা উৎপন্ন এবং যাহা উৎপন্ন, তাহা ধ্বংসশীল। আবার উহা অভাবস্বরূপও হইতে পারে না। কারণ, যখন শূন্যবাদে কোনরূপ ভাবপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না, তখন অভাব-পদার্থের অস্তিত্ব স্বতঃই নিরাকৃত হয়। সুতরাং দেখা গেল, নির্ব্বাণ ভাবস্বরূপও নহে — অভাব-স্বরূপও নহে। পরিশেষে মাধ্যমিকেরা নির্ব্বাণ বা শূন্যকে "চতুষ্কোটি বিনির্ম্মুক্ত" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অর্থাৎ উহা 'অস্তি'ও নহে, 'নাস্তি'ও নহে, তদুভয়ও নহে, অনুভয়ও নহে। উহা অনির্ব্বাচ্য বা জৈনের ভাষায় বলিতে গেলে, উহা অবক্তব্য। এইরূপে অস্তি, নাস্তি ও অবক্তব্য লইয়া বৌদ্ধ বিচারপ্রণালী জৈনের স্যাদ্‌বাদকে অনুপ্রাণিত করে নাই, এ কথা সাহস করিয়া বলা চলে না।

স্যাদ্‌বাদ ও বেদান্তের অনির্ব্বাচ্যবাদ। অদ্বৈতবাদে মায়া ও মায়াপ্রসূত এই জগৎ-প্রপঞ্চের স্বরূপ-নির্ণয়প্রসঙ্গেও ঠিক এই সত্তা, অসত্তা ও অবক্তব্যরূপ ত্রিকোটিক চিন্তা-প্রণালীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। মায়া বা অবিদ্যার স্বরূপ কি না—উহা সৎ। কারণ, যাবৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি না হয়, তাবৎ উহার অস্তিত্ব আছেই ত এবং উহা জগৎ-প্রপঞ্চের প্রসবিত্রী বটেই ত। আবার ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই উহার তিরোভাব, সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-সংসারেরও তিরোভাব হয়, সুতরাং মায়া সৎও বটে, অসৎও বটে। পরন্তু উহা 'সদসত্ত্বাভ্যামনির্ব্বাচ্যা'। এইরূপে এই অনির্ব্বচনীয়া মায়া হইতে প্রসূত বলিয়া জগৎ-সংসারের যাবতীয় বস্তুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার এবং অনির্ব্বাচ্য।

এই মায়ার স্বরূপ এবং অনির্ব্বাচ্যবাদ বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি অতি প্রাচীন উপনিষদে ঠিক এইরূপে প্রচারিত নাই সত্য এবং এমন কি, মায়া শব্দটী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্ব্বে আর কোন উপনিষদে উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহাও সত্য, তথাপি বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ ও ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে মায়াবাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে জগন্মিথ্যাত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে যে চিন্তাপ্রণালী আরব্ধ হইয়া, পরে ভগবান্ বাদরায়ণ ও শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই অন্ততঃ পরোক্ষভাবে জৈনাচার্য্যগণের চিন্তার ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

পক্ষান্তরে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের তর্কপাদে "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ", এই সূত্রের ভাষ্যে স্যাদ্‌বাদানুসারে একই বস্তুতে যুগপৎ সত্তা ও অসত্তাদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ অসম্ভব বলিয়া স্যাদ্‌বাদের খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের স্বীকৃত অদ্বৈতবাদ যদি বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে অনির্ব্বাচ্যা মায়ার

সাহায্যে জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিতে হয়। জগতের বস্তুজাত মায়াপ্রসূত বলিয়া তাহারাও সৎও বটে, অসৎও বটে, এজন্য অনির্ব্বাচ্য। সুতরাং বাস্তবিকপক্ষে তিনিও ত বস্তুতে সদসত্ত্বাদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সমগ্র তর্ক-পাদে ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি মতবাদ খণ্ডন-প্রসঙ্গে যে যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও জৈনচার্য্যগণের চিন্তার ধারার অনেকটা অনুরূপ। তাঁহার পরে শ্রীহর্ষ তাঁহার "খণ্ডনখণ্ড-খাদ্যে" অনির্ব্বাচ্যবাদ-সাহায্যে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এ জগতে কোন বস্তুই অস্তি বা নাস্তি—এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত করা যায় না। উহা সৎও নহে, অসৎও নহে, আবার উহা সৎও বটে, অসৎও বটে; উহা সদসত্ত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়; উহা অনির্ব্বাচ্য বা অবক্তব্য। এজন্য শ্রীহর্ষের খণ্ডনের অপর নাম "অনির্ব্বচনীয়তাসর্ব্বস্ব"। নৈয়ায়িকই শ্রীহর্ষের শরব্য। কারণ, নৈয়ায়িকই লক্ষণ-সাহায্যে বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহর্ষও নৈয়ায়িকের যত লক্ষণ উক্ত প্রকার ত্রিকোটিক যুক্তি-সাহায্যে একে একে তাহার সমস্ত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যখন লক্ষণ টিকিল না, তখন জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব নির্ব্বচন করা যায় না। এক কথায় উহা অনির্ব্বাচ্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা ইহা সংগ্রহ করিতে পারি যে, খুব সম্ভব প্রাচীন বৌদ্ধ ও ঔপনিষদিক ত্রিকোটিক বিচারপদ্ধতি দ্বারা পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জৈনগণ স্যাদ্বাদের অবতারণা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্য বা শূন্যবাদ ও বৈদান্তিক অনির্ব্বাচ্যবাদের সহিত স্যাদ্বাদের প্রভেদ এই যে, বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক—উভয়েই বস্তুকে এক হিসাবে বাধিত করিয়াছেন, স্যাদ্বাদ বস্তুস্বরূপ সাধিত করিয়াছে। বৌদ্ধমতে বাহ্য জগৎ শূন্য, বেদান্তমতে ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তার অপেক্ষায় ব্যাবহারিক জগৎ বাধিত এবং ব্যাবহারিক বাহ্যজগতের মধ্যেও এক উচ্চস্তরের সত্যের অপেক্ষায় নিম্নস্তরের সত্য বাধিত। স্যাদ্বাদ দেখাইয়াছে যে, বস্তু সত্তা ও অসত্তা, নিত্যতা ও অনিত্যতা, প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার হইতে পারে। ঐরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশেই বস্তুর বস্তুত্ব সিদ্ধি। বিরোধি-ধর্ম্মাধ্যাস বস্তুর বাধিতত্ব বা শূন্যতা আপাদন করা দূরে থাকুক, বস্তুর বাস্তবতাই সম্পাদন করে। কারণ, প্রতীতি ও তদুপরি প্রতিষ্ঠিত অনুমান আমাদিগকে জ্ঞাপন করে যে, কেবল নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, সামান্য ও বিশেষ, দ্রব্য ও পর্য্যায়—এই উভয়াত্মক বস্তুই আমাদের প্রয়োজন-সিদ্ধির সহায়। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সমুদায় বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং বৈদান্তিক অনির্ব্বাচ্যবাদে জগৎ প্রপঞ্চের বাধ ও বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্য বা শূন্যবাদে জগৎ-প্রপঞ্চের নাশ, পরন্তু জৈনের স্যাদ্বাদে জগতের প্রতিষ্ঠা।

আর এক কথা। আমরা পূর্ব্বে স্যাদ্বাদের সপ্ত প্রকার বচন-ভঙ্গের আলোচনা-কালে দেখিয়াছিলাম যে, জৈনাচার্য্যগণের মতে বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত হইলেও, বচনবিন্যাস সপ্ত প্রকার মাত্রই হইবে; কারণ, তাঁহারা বলেন যে, বচনভঙ্গ জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত সপ্ত প্রকার জিজ্ঞাসার পর আর সন্দেহের বা জিজ্ঞাসার অবসর থাকে না। সেইখানেই বচনের বিশ্রান্তি হয়। সুতরাং স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যশ্চ, স্যাদস্তি চ

তিনটী নিয়ম আছে। সেই তিনটী নিয়মের কার্য্য হইতেছে, ভাব-রাজ্যের সামঞ্জস্য নিরূপিত করা। Law of Identity অনুসারে আমরা বলিতে বাধ্য যে, যে বস্তুটীকে একবার যে প্রকার বলিয়া ধরিয়া লইব, কখনই তাহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। যেমন A is A, ঘট ঘটই। A is B, এ কথা বলা চলে না, বা ঘটটী নূতন বা ঘটটী পুরাতন, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা চলে না। Law of Contradiction বলে যে, একটী মাত্র বস্তুতে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কল্পনা করা যায় না। A cannot be both B and not—B. ঘটটী মৃৎ-সংস্থানবিশেষও বটে, আবার মৃৎসংস্থানবিশেষ নয়ও বটে, একথা বলা যায় না। এইরূপে Law of Excluded middle এ বলা হয় যে বস্তু কোন দ্বিকোটিবিনির্ম্মুক্ত, এ কথা বলা চলে না। হয় বল, ঘট অস্তি, না হয় বল, ঘটটী নাস্তি; উহা 'অস্তি' ও 'নাস্তি'—এই দুই ভিন্ন অপর কিছু, এ কথা বলা চলে না। আজকালকার পাশ্চাত্য প্র্যাগ্‌ম্যাটিক্ তর্ক-শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলিতে চান যে, ঐ সমস্ত নিয়ম পরিণাম বা পরিবর্ত্তনহীন আন্তর-জগতে খাটিতে পারে, কিন্তু বাস্তব-জগতে খাটে না। সেই জন্য Dr. Schiller তাঁহার Formal Logic নামক গ্রন্থে প্রাচীন আরিষ্টটলের মতবাদ-খণ্ডন-প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "Are they laws of thought or of things?" বাস্তব-জগতের বস্তু লইয়াই আমাদের কারবার করিতে হয়। সুতরাং আমাদের চিন্তার নিয়মাবলী এমন হওয়া উচিত যে, উহারা সেই বাস্তব-জগতের বস্তু-সমুদায়ের প্রকৃতি-নির্ণয়ে সমর্থ হয়। আজ আমরা এতক্ষণ স্যাদ্‌-বাদ আলোচনা-প্রসঙ্গে বস্তুর প্রকৃতি-সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিলাম, ঠিক এই প্রকার বস্তুর প্রকৃতি-সম্বন্ধে ধারণা লইয়াই Schiller-প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রবিদ্‌গণ চিরন্তন বস্তুনিরপেক্ষ তর্কশাস্ত্রের (Formal Logic) সংস্কারসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, আরিষ্টটল-কথিত একান্ত-স্বরূপতা (rigid identity) ভাবজগতে থাকিতে পারে, প্রকৃতিসিদ্ধ বস্তুজগতে ঐরূপ একান্তস্বরূপতার অস্তিত্ব নাই। প্রতি বস্তুই নিত্যও বটে, পরিণমমানও বটে, উহার স্বরূপতা বজায় রাখিয়াও অনুক্ষণ ভেদকে আশ্রয় করিয়া থাকে। উহাতে Identityও আছে, আবার differenceও আছে। জৈনের ভাষায় বলিতে গেলে, উহা উৎপাদ, ধ্রৌব্য ও ব্যয়যুক্ত। উহা 'অস্তি'ও বটে, 'নাস্তি'ও বটে, আবার অবক্তব্যও বটে। সুতরাং উপরি-কথিত একান্তবাদী Law of Identity, Contradiction এবং Excluded Middle নিয়মত্রয়ের অবকাশ বস্তুজগতে নাই।

শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য

—০—

আমাদিগের অয়নাংশ *

আমাদিগের অর্থাৎ হিন্দুদিগের অয়নাংশ লইয়া যে গোলযোগ ঘটিয়া আছে, তাহার মীমাংসার কিছু সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কয়েকবার ভারতের নানাস্থানে যে জ্যোতির্বিদ্গণের সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে সমবেত সভ্যগণ কেবল বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। পঞ্জিকাকারগণ স্বেচ্ছামত অয়নাংশ স্থির করিয়া নিজ নিজ পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। অধিকাংশ পঞ্জিকাতেই সূর্য্যসিদ্ধান্তমতানুযায়ী সিদ্ধান্ত-রহস্য-মতে অয়নাংশ গণিত হইয়া আসিতেছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকায় স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রীর মতানুসারে অয়নাংশ গ্রহণ করা কতদূর যুক্তিপূর্ণ, তাহার উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীমান্ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের প্রণীত "বঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্কার" নামক পুস্তকে ইহার সবিশেষ আলোচনা আছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার পরমবন্ধু শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Journal of the Department of Letters নামক সাময়িক পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডে হিন্দুগণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক কয়েকটী প্রবন্ধ একত্রে প্রকাশ করেন। প্রথম প্রবন্ধটীতে তিনি হিন্দুদিগের অয়নাংশ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সাহায্যে তাহার মূলতত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তটী বিশেষ যুক্তিপূর্ণ মনে হওয়ায়, তাহা সাধারণ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উপস্থাপিত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বলিয়া রাখি যে, ইহা তাঁহার প্রবন্ধের অনুবাদ নহে; অয়নাংশের মূলতত্ত্বটী হিন্দু ও পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের পক্ষ হইতে এভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, যাহাতে সকলেই বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আর এক কথা, জ্যোতিঃশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-প্রকাশের উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। কারণ, সে কথা আমার পক্ষে আদৌ খাটে না। এই প্রবন্ধ-পাঠে যদি সকলে অয়নাংশের মূলতত্ত্বটী যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে যাহাতে ইহা কর্ম্মক্ষেত্রে গৃহীত হয়, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

উল্লেখ করিয়া রাখি যে আমাদের মধ্যে অনেকেই কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে না পারিয়া বৃথা বাদ-বিসংবাদ করিয়া থাকেন; তাঁহারা কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মতান্তর হইতে মনান্তরে উপনীত হন ও বৃথা গালাগালি করিয়াই ক্ষান্ত হন—ফলে কিছুই হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রে এরূপ হওয়া অতীব দুঃখের বিষয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রে কোন বিষয় এইরূপ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক ভিন্ন পরিমার্জ্জিত হইতে পারে না, ইহাতে আমরা আমোদ না পাইয়া রাগান্বিত হইব কেন? এই বিষম বুদ্ধিবৃত্তির ফলে আমাদের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩১ বঙ্গাব্দের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রবন্ধটী পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রাচীন সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থে অয়নাংশ-সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সোমসিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, বৃদ্ধবসিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত, বসিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত, মহাসিদ্ধান্ত, ও সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে অয়নাংশ-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মূল, সরল অনুবাদ ও একটী করিয়া উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, অয়নাংশ-নিরূপণের মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সাহায্যে অয়নাংশের মূলতত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করা হইয়াছে। সাধারণের উপলব্ধির জন্ত পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের যে যে অংশ না জ্ঞাত থাকিলে উপস্থাপিত বিষয়টী হৃদয়ঙ্গমে অসুবিধা হইবে, তৎসম্বন্ধে প্রথমে কিছু লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থে অয়নাংশ নিরূপণের যে প্রক্রিয়াগুলি বিবৃত আছে, তাহাদের মূলতত্ত্ব পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, বিশুদ্ধরূপে অয়নাংশ-নিরূপণের উপায়-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।

১। আমরা বেদাঙ্গ জ্যোতিষ এবং পিতামহ-সিদ্ধান্তে অয়নাংশের কোন উল্লেখ পাই নাই। ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্তেও এ সম্বন্ধে কোন কথা দেখা যায় না। গ্রহলাঘবাদি আধুনিক গ্রন্থ অনাবশ্যক-বোধে আলোচিত হইল না।

(ক) **সোমসিদ্ধান্ত**। আমরা সোম-সিদ্ধান্তে সংক্ষেপে অয়নাংশ-নিরূপণের প্রক্রিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাই। স্পষ্টাধিকারে ৩১ ও ৩২ শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

> যুগে চ ষট্‌শতৈকত্বে ভচক্রং প্রাক্ চ লম্বতে।
> তদ্‌গুণো ভূদিনৈর্ভক্তো দ্যুগণোঽয়নখেচরঃ॥
> তদ্ভুজচক্রদোর্লিপ্তা ত্রিশত্যাপ্তায়নাংশকাঃ।
> সংস্কার্য্যা জূকমেষাদৌ কেন্দ্রে স্বর্ণং গ্রহে কিল॥

একযুগে (মহাযুগে) ভচক্র ছয়শত বার পূর্ব্বদিকে লম্বিত হয়। এই সংখ্যা ভূদিন (অর্থাৎ সৃষ্টির আদি হইতে গত দিন-সংখ্যা) দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে দ্যুগণ (অর্থাৎ এক যুগের দিন-সংখ্যা) দ্বারা ভাগ করিলে, অয়ন-খেচর (অয়নগতি) নির্ণীত হইবে।

ভূদিনের অয়নগতির ভুজচক্রকে (অর্থাৎ ভুজজ্যাকে) ৬০০ ছয় শত দ্বারা বিভক্ত করিয়া ২০০ দুইশত দ্বারা গুণ করিলে, অভীষ্ট ভূদিনের অয়নাংশ পাওয়া যাইবে।

অয়নগ্রহ তুলাদি ছয় রাশিতে হইলে অয়নাংশ গ্রহে যোগ এবং মেষাদি ছয় রাশিতে থাকিলে বিয়োগ করিয়া সংস্কার করিতে হইবে।

প্রথম প্রক্রিয়াটী একটী ত্রৈরাশিক মাত্র—দ্যুগণ : ভূদিন :: ৬০০ : অভীষ্ট ভূদিনের অয়নগতি। (ক)

দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটী (ক) এর ভুজজ্যা নিরূপণ করা।

তদ্বৎপ্রাগংশকক্রান্তিপ্রাপ্তেঃ স্যাৎ প্রাগ্‌লম্বস্য চ।
প্রাক্‌ চক্রং চলিতং স্বেতি নারদেবোপর্য্যতে॥
প্রাগংশক্রমমপ্রাপ্তে প্রাক্‌ চক্রং চলিতং ভবেৎ।
প্রাক্‌পশ্চাচ্চলনাংশোনাঃ স্বর্ণং স্যাত্তাস্কগাদিষু॥
ক্রান্তিকীলাংশলগ্নানাং লম্বনং দ্যুগতং দ্বয়োঃ।
স্ফুটার্থময়নার্থং চ প্রত্যহং হ্যুদয়াস্তয়োঃ॥
যদ্দিনে যস্য কক্ষা চ তত্র তেষাম্‌ প্রবৃত্তিতঃ।
ইত্যেতদেকং চলনং প্রাক্‌ যুগেতানি চ ষট্‌শতম্‌॥
যুক্ত্যাহয়নগ্রহস্তস্মিংস্তুলাদৌ প্রাক্‌চলং ভবেৎ।
তচ্ছুদ্ধচক্রে বিযুক্ত্যা মেষাদৌ প্রাক্‌ চলং ভবেৎ॥
অয়নাংশস্তদ্‌ভুজাংশাস্ত্রিঘ্নাঃ সন্তোদশোদ্ধৃতাঃ।
প্রাক্‌প্রত্যক্‌চলনং চক্রস্যোবেতি মন্যতে তু যঃ॥

সৃষ্টির আদি হইতে পরবর্ত্তী কালে কর্কটের আদিতে এবং মকরের অন্তে স্থিত যাহা দক্ষিণ ও উত্তর দিকে প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে গমনাগমন করিতেছে, সেই সচলক্রান্তি পশ্চাদ্দিকে ২৭ সাতাইশ অংশ চালিত হয়, তবে তাহাতে এই অন্যথা যে, ইহা প্রতিবৎসর কিঞ্চিৎ করিয়া চালিত হয়। এইরূপে পশ্চিমদিকে চালিত ক্রান্তি নিজ স্থান হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমাংশ প্রাপ্ত হইলে, ভচক্র পূর্ব্বদিকে চালিত হইতে থাকে এবং সৃষ্ট্যাদি স্থানে যাবৎ উপস্থিত না হয়, তাবৎ চলিতে থাকে। সচল ক্রান্তিপাতের নিজ স্থান হইতে আদিস্থানের অন্তর অয়নাংশ। নিজ পূর্ব্বগতি এবং পূর্ব্বাংশ-স্থিত ক্রান্তি পাইবার জন্য ভচক্র পূর্ব্বদিকে চালিত হয়—নারদও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ক্রমশঃ পূর্ব্বাংশ অপ্রাপ্তে (অর্থাৎ যতদিন পূর্ব্বাংশ প্রাপ্ত না হয়) চক্র পূর্ব্বদিকে চালিত হয়। (ভচক্রের) এই পূর্ব্ব ও পশ্চিমে চলনের জন্য অয়নাংশ সূর্য্যাদিতে যুক্ত এবং বিযুক্ত হয়। ক্রান্তিচ্ছায়া ও লগ্নের দিনগত লম্বন (পরিমাণ) এবং প্রত্যহ উদয়াস্তের স্পষ্টার্থ অয়নের জন্য (হইয়া থাকে)।

যে কক্ষায় ছিল, সেই কক্ষায় ক্রান্তিপাতের পুনরাগমনে এক অয়নচলন হয়। এক যুগে তাহা পূর্ব্বদিকে ৬০০ বার। অয়নগ্রহের তুলাদিতে পূর্ব্বদিকে গতি হইলে, অয়নাংশ যোগ করিতে হয়। মেষাদিতে শুদ্ধচক্রে পূর্ব্বদিক্‌গমনে বিয়োগ করিতে হয়।

অয়নগ্রহের ভুজাংশকে তিন গুণ করিয়া দশ ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে।

এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে রাশিচক্রের গতি জানিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মসিদ্ধান্তকারের মতেও অয়নগ্রহ এক যুগে (মহাযুগে) ছয়শত বার পূর্ব্বদিকে চালিত হয়। তিনিও অয়নগ্রহের ভুজাংশ গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপরে যে প্রক্রিয়াটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সোমসিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন, তবে ইহাও একটী ত্রৈরাশিক—

১০ (৯০) : অয়নগ্রহের ভুজজ্যা : : ৩ (২৭) : অভীষ্ট অয়নাংশ।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩। এক মহাযুগে অয়নগ্রহের ৬০০ বার চলনের হিসাবে অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যায় অয়নগ্রহের চলন ২৭৩৬০।২৫১ অংশ ৯ কলা।

ইহার চক্রাংশ (বৃত্তাংশ) ২৫১ অংশ ৯ কলা।

ইহার ভুজজ্যা = ২৫১ অংশ ৯ কলা — ১৮০ অংশ

= ৭১ অংশ ৯ কলা

সুতরাং অয়নাংশ

$$= ৭১।৯ \times \frac{৩}{১০}\ \frac{(২৭)}{(৯০)}$$

= ২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকলা।

(গ) সূর্য্যসিদ্ধান্ত। এই গ্রন্থে অয়নাংশের মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অনুযায়ী; অয়নাংশের বিবরণ কিন্তু সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তখানি অন্যান্য সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থগুলি অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ ও প্রচলিত। ইহার অনেক টীকাও লিখিত হইয়াছে। অয়নাংশবিবরণ যে স্থলে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব-পশ্চাৎ শ্লোকগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী অয়নাংশের শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রক্ষিপ্ত হইলেও অয়নাংশের মূলতত্ত্বের যে কোন গোলযোগ নাই, তাহা অন্যান্য সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

ত্রিপ্রশ্নাধিকারে ৯—১২ শ্লোকে অয়নাংশের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্‌গুণাদ্‌ভূদিনৈর্ভক্তাদ্ দ্যুগণাদ্যদবাপ্যতে ॥
তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ ॥
তৎসংস্কৃতাদ্ গ্রহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদিকম্।
স্ফুটং দৃক্‌তুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুবদ্বয়ে।
প্রাক্ চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে।
অন্তরাংশৈরথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে ॥

এক মহাযুগে ভচক্র ৩০ × ২০ বা ৬০০ বার পূর্ব্বদিকে লম্বিত হইতে থাকে (ভাস্করাচার্য্য ৩০৩ বার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকারগণ ৬০০ বার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন)।

অহর্গণকে ৬০০ দিয়া গুণ করিয়া যুগের দিন-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহার ভুজাংশকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ দিলে যাহা হইল, তাহাই অয়নাংশ

অয়নাংশ সংস্কৃত গ্রহ হইতে ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদি সাধিত হইবে।

অয়নে (অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংযোগে) এবং বিষুবদ্বয়ে দৃগ্‌দৃক্‌তুল্যতা দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ হইবে।

ছায়া হইতে প্রাপ্ত রবি (রবিস্ফুট) হইতে গণিতাগত রবি হীন হইলে চক্র পূর্ব্বগামী হয়। ছায়া সাধিত রবি হইতে গণিতাগত রবি অধিক হইলে উভয়ের অন্তরাংশ পরিমাণে চক্র পশ্চিমগামী হয়।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের অয়নাংশের মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্তানুযায়ী। প্রথম ও তৃতীয় প্রক্রিয়াটি ত্রৈরাশিক।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ।

সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩ অভীষ্টবর্ষের অহর্গণে ভচক্রের পরিভ্রমণ।

$$=\frac{\text{অহর্গণ} \times ৬০০}{\text{যুগের দিন-সংখ্যা}}$$

$$=২৭৩৬০।২৫১ \text{ অংশ } ৯ \text{ কলা।}$$

ইহার ভুজজ্যা ৭১ অংশ ৯ কলা।

সুতরাং অয়নাংশ

$$=৭১।৯ \times \frac{৩}{১০}$$

$$=২১ \text{ অংশ } ২০ \text{ কলা } ৪২ \text{ বিকলা।}$$

(খ) বৃদ্ধবশিষ্ঠসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের গ্রন্থকার মূলতত্ত্ব বজায় রাখিয়া একটী অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়ায় অয়নাংশ নিরূপণের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মাসাধিকারে ৩৬—৩৮ শ্লোকে অয়নাংশ বর্ণিত আছে ;

অষ্টাদশ শত ১৮০০ শিষ্টেহব্দে
৩২১ বিনিঘ্নে বিভাজিতে বিয়তে।
যুক্তে যুগে পদে শতগজকৈঃ ১৮০০
ভাংশকা স্মৃতাঃ।
ছায়াগণিতাগতয়োর্ভানোর্বিবরং ভাংশকাস্ত বা।
ছায়ার্কাদ্গণিতার্কো হীনঃ পূর্ব্বাস্তথা পশ্চাৎ ॥
খচরাশ্চলন্তি তস্মাৎ পূর্ব্বে যুক্তাশ্চ পশ্চিমে হীনাঃ।
কর্ম্মাদর্শচ্ছায়া চরদলনাড্যাদিকং সাধ্যং ॥

১৮০০ বৎসরের অবশিষ্ট বর্ষকে (অর্থাৎ অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যাকে ১৮০০ দ্বারা ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে,) ২৭ দিয়া গুণ করিয়া ১৮০০ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে।

অয়নাংশ অযুগ্মপাদে থাকিলে যুক্ত ও যুগ্মপাদস্থ হইলে বিযুক্ত হইবে।

ছায়াসূর্য্য ও গণিতসূর্য্যের প্রভেদ অয়নাংশ (নামে অভিহিত) ; ছায়ার্ক গণিতার্ক হইতে হীন হইলে অয়নাংশ পূর্ব্বে এবং অন্যথা হইলে পশ্চিমে অবস্থিত হয়।

সূর্য্যাদি গ্রহের পূর্ব্বে থাকিলে অয়নাংশ যুক্ত এবং পশ্চিমে থাকিলে অয়নাংশ বিযুক্ত হইবে। তাহা হইতে অপমচ্ছায়া চরদলনাড্যাদি সংস্কার করিতে হয়।

বৃদ্ধবসিষ্টসিদ্ধান্তের মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্তমতানুযায়ী। প্রক্রিয়াটী একটী ত্রৈরাশিক।

এক যুগে অর্থাৎ ৪৩২০০০০ বৎসরে ভচক্র ৬০০ বার লম্বিত হয়, সুতরাং $\frac{৪৩২০০০০}{৬০০}$ বা ৭২০০ বৎসরে ইহা একবার লম্বিত হয়। এই সময়ে অর্থাৎ ৭২০০ বৎসরে অয়নাংশ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২৭ × ৪ বা ১০৮ অংশ গমনাগমন করে।

সুতরাং অয়নাংশের ২৭ অংশ গমনে $\frac{৭২০০}{৪}$ বা ১৮০০ বৎসর লাগে।

ক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমে পরিভ্রমণ করে বলিয়া গ্রন্থকার অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যাকে ১৮০০ দিয়া ভাগ দিতে বলিয়াছেন। ভাগফল যত হইবে, ততবার ক্রান্তি-পাতবিন্দু ও নিরয়ণবিন্দুর মিলন হইবে, সুতরাং ভাগশেষ যাহা থাকিবে, সেই বর্ষ-সংখ্যায় ক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অপসৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে ত্রৈরাশিক দ্বারা ঐ বর্ষ-সংখ্যার অয়নাংশ নির্ণীত হইবে।

১৮০০ : অবশিষ্ট বর্ষসংখ্যা : : ২৭ : অভীষ্ট বর্ষের অয়নাংশ।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দে ১লা বৈশাখের অয়নাংশ।

সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩ $= \frac{১৯৬৯৯২৫০২৩}{১৮০০} =$ ১০৯৪৪০২ ভাগশেষ ১৪২৩

সুতরাং অভীষ্ট বর্ষের অয়নাংশ $= \frac{১৪২৩ \times ২৭}{১৮০০} =$ ২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকলা।

(৩) বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত। এই গ্রন্থে কেবল অয়নাংশ-নিরূপণের সঙ্কেত দেওয়া আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (স্ফুটগত্যাধিকারে) ৫৫ম শ্লোকে অয়নাংশ-নিরূপণের উপায় লিখিত আছে,—

অব্দাঃ খখদ্ব্যগৈ ৭২০০ র্ভাজ্যাস্তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশোদ্ধৃতাঃ।
অয়নাংশা গ্রহে যুক্তাঃ...

সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ৭২০০ দ্বারা বিভক্ত করিয়া তাহার অংশাদির ভুজজ্যা তিন গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে। ইহা গ্রহে যুক্ত হইবে।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দে ১লা বৈশাখের অয়নাংশ সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩

$\frac{১৯৬৯৯২৫০২৩}{৭২০০} = \frac{১৯৬৯৯২৫০২৩ \times ৬০০}{৪৩২০০০০} =$ ২৫১ অংশ ৯ কলা

ইহার ভুজজ্যা $=$ ২৫১।৯ $-$ ১৮০ $=$ ৭১ অংশ ৯ কলা।

সুতরাং অয়নাংশ $=$ ৭১।৯ $\times \frac{৩}{১০} \frac{(২৭)}{(৯০)} =$ ২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকলা।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ইহার মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বা সূর্য্যসিদ্ধান্তমতানুযায়ী।

(চ) **মহাসিদ্ধান্ত**। আর্য্যভটের রচিত মহাসিদ্ধান্তে আমরা দুইটী পৃথক্‌গতির উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ মধ্যমাধিকারের ১১ শ্লোকে সপ্তর্ষি-ভগণের উল্লেখ আছে। ইহাতে লিখিত আছে,—

সপ্তর্ষীণাং কুনিধুধিধুধিজ্ঞা

এককল্পে সপ্তর্ষিগণের ভগণ ১৫৯৯৯৯৮। দ্বিতীয়তঃ এই শ্লোকে ও তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে অয়নগ্রহের ভগণ দেওয়া আছে,—

.........মসিহটমুধাঃ।

অয়নগ্রহস্য

অয়নগ্রহের ভগণ এক কল্পে ৫৭৮১৫৯।

আর্য্যভট দুইটী ভগণই এক কল্পের জন্য স্থির করিয়াছেন।

পুনশ্চ স্পষ্টাধিকারের ১৩ শ্লোকে অয়নাংশ বর্ণিত হইয়াছে—

অয়নগ্রহদোঃ ক্রান্তিজ্যা চাপং কেন্দ্রবদ্ধনর্ন স্যাৎ।

অয়নলবাস্তৎ সংস্কৃতখেটাদায়নচরার্দ্ধপলানি ॥

অয়নগ্রহের (অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত অয়নগ্রহ-ভগণের) ভুজজ্যা হইতে ক্রান্তিজ্যা নির্ণয় করিয়া তাহার চাপকে মেষাদি ৬ রাশিতে যুক্ত এবং তুলাদি ৬ রাশিতে বিযুক্ত হইবে। ইহাই অয়নলব অর্থাৎ অয়নাংশ। তৎসংস্কৃত খেট (গ্রহ) হইতে অয়ন (দৃক্‌কর্ম্মাদি) ও চরার্দ্ধপল নির্ণীত হয়।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ। সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩।

এককল্পে অয়নগ্রহ-ভগণ ৫৭৮১৫৯

এক কল্পের বর্ষ-সংখ্যা ৪৩২০০০০০০০

সুতরাং ৪৩২০০০০০০০ : ১৯৬৯৯২৫০২৩ :: ৫৭৮১৫৯ : অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যায় অয়নগ্রহ ভগণাদি

অভীষ্ট বর্ষসংখ্যায় অয়নগ্রহ ভগনাদি $= \frac{১৯৬৯৯২৫০২৩ \times ৫৭৮১৫৯}{৪৩২০০০০০০০}$

$= \frac{১১৩৮৯২৯৮৮১৩৭২৬৫৭}{৪৩২০০০০০০০}$

= ২৭৩৬৪১।৬৩ অংশ ২৬ কলা ৫১·৮ বিকলা

বৃত্তের প্রথম পাদে থাকায় ৬৩ অংশ ২৬ কলা ৫১·৮ বিকলা ইহাই ভুজজ্যা।

৬৩ অংশ ২৬ কলা ৫১·৮ বিকলা = ৩৮০৬·৮৬ কলা।

৩৮০৬·৮৬ কলার চাপ = ৩০৭৫·৪৬

পরমক্রান্তিজ্যার চাপ = ১৩৯৭

অয়নগ্রহের ক্রান্তিজ্যার চাপ $= \frac{(৩০৭৫·৪৬) \times ১৩৯৭}{৩৪৩৮}$

= ১২২০·৫৯৮ চাপ

ইহার ধনু = ২২ অংশ ১ কলা ১২·৪৮ বিকলা

= অয়নাংশ (যুক্ত)।

এ স্থলে মহাসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে দুইটী বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, সপ্তর্ষি-ভগণের এক কল্পে যে সংখ্যা উল্লিখিত আছে, তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয়, লিপি-প্রমাদবশতঃ ইহা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংখ্যাটী ৬টী অঙ্কবিশিষ্ট হইবে এবং সম্ভবতঃ ইহা ১৫৯৯৯৮ হইবে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

দ্বিতীয়তঃ, মহাসিদ্ধান্তের টীকায় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী অয়নগ্রহ-সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তৎপ্রকাশিত মহাসিদ্ধান্তের বিষয় বর্ণনার ৪ পৃষ্ঠা এবং contents এর ৩ পৃষ্ঠায় তিনি অয়নগ্রহ হইতে বাৎসরিক অয়নাংশ ১৭৩'৪৪৭৭ বিকলা স্থির করিতে চাহেন। তিনি লিখিয়াছেন—

এককল্পে অয়নগ্রহের ভগণ-সংখ্যা ৫৭৮১৫৯ × ১২৯৬০০০ বিকলা (অর্থাৎ ৩৬০ অংশের বিকলা-সংখ্যা); এবং এক কল্পের সৌর-বর্ষসংখ্যা দিয়া ঐ রাশিকে বিভক্ত করিলে এক সৌর বর্ষে অয়নগ্রহ চলন

$$= \frac{৫৭৮১৫৯ \times ১২৯৬০০০}{৪৩২০০০০০০০} \text{ বা } ১৭৩'৪৪৭৭ \text{ বিকলা।}$$

ইহাকে তিনি এক সৌরবর্ষের অয়নাংশ বলিয়া স্বীকার করিতে চান। কিন্তু আর্য্যভটের মতে অয়ন-গ্রহের ৩৬০ অংশ-ভ্রমণে অয়নাংশের গমনাগমন ২৪ × ৪ = ৯৬ অংশ মাত্র হইবে। সুতরাং বার্ষিক অয়নাংশ =

$$\frac{১৭৩'৪৪৭৭ \times ৯৬}{৩৬০} = ৪৬'২৫২৭ \text{ বিকলা}$$

আমরা পরে ইহার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

(ছ) সিদ্ধান্তশিরোমণি। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে ১৭ এবং ১৮ শ্লোকে অয়নাংশ সম্বন্ধে ইহা লিখিত আছে—

> বিষুবৎক্রান্তিবলয়োঃ সম্পাতঃ ক্রান্তিপাতঃ স্যাৎ।
> তদ্ভগণাঃ সৌরোক্তা ব্যস্তা অযুতত্রয়ং কল্পে॥
> অয়নচলনং যদুক্তং মুঞ্জালাদ্যৈঃ স এবায়ং।
> তৎপক্ষে ভগণাঃ কল্পে গোহঙ্গর্তুনন্দগোচন্দ্রাঃ॥

বিষুবরেখা ও ক্রান্তি-বৃত্তের সম্পাতে ক্রান্তিপাত হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ক্রান্তিপাতের ভগণ বিপরীত-গতিতে এক কল্পে তিন অযুত। মুঞ্জাল প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্গণ তাহাকে অয়নচলন বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এককল্পে ক্রান্তিপাত-ভগণ ১৯৯৬৬৯।

পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়ের সঙ্কলিত সিদ্ধান্ত-শিরোমণির গোলাধ্যায়ের ১৪৭ পৃষ্ঠায় মুঞ্জালের অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে।

> উত্তরতো যাম্যদিশং যাম্যান্ততঃ পুনঃ সৌম্যদিগ্ভাগং।
> পরিসরতাং গগনসদাং চলনং কিঞ্চিদ্ভবেদপমে॥

বিষুবদপক্রম-মণ্ডল-সম্পাতে প্রাচিমেষাদিঃ।
পশ্চাত্তুলাদিরনয়োরপক্রমাসম্ভবঃ প্রোক্তঃ॥
রাশিত্রয়ান্তরেঽস্মাৎ কর্কাদিরমুক্রমান্মৃগাদিশ্চ।
তত্র চ পরমাক্রান্তি র্জিন-ভাগ-মিতার্থ তত্রৈব॥
নির্দ্দিষ্টোঽয়নসন্ধিশ্চলনং তত্রৈব সম্ভবতি।
তদ্ভগণাঃ কল্পে স্যুর্গোরস-রস-গোঽঙ্ক-চন্দ্র-মিতাঃ॥

উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গগনে বিদ্যমান ক্রান্তি চলিতে চলিতে কিঞ্চিৎ সরিয়া যাইতেছে। বিষুবদ্‌বৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের সম্পাতের পূর্ব্বদিকে মেষাদি এবং পশ্চিমদিকে তুলাদি রাশি ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিত। ক্রান্তিপাত হইতে তিন রাশি অন্তরে যথাক্রমে কর্কটাদি ও মকরাদিতে পরমক্রান্তি অবস্থিত। তাহাই অয়নসন্ধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং সেই স্থান হইতে অয়ন-চলনের আরম্ভ। এককল্পে তাহার ভগণ ১৯৯৬৬৯। এসম্বন্ধে আমরা আবার আলোচনা করিব।

২। এক্ষণে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলিতে অয়নাংশ-নিরূপণের মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

(ক) প্রথমতঃ, সোমসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বৃদ্ধবসিষ্ঠসিদ্ধান্ত এবং বসিষ্ঠসিদ্ধান্তের মূলতত্ত্ব একপ্রকার। আমরা দেখিতে পাই যে, (১) অয়নগ্রহ (বা ভচক্র) এক মহাযুগে ৬০০ বার পূর্ব্বদিকে চালিত (ঘূর্ণিত হয়), (২) তৎসঙ্গে ক্রান্তিপাতবিন্দু নিরয়ণবিন্দু হইতে কয়েক অংশ (৩০ বা ২৭) সরিয়া গিয়া আবার নিরয়ণবিন্দুতে আগমন করতঃ অপর দিকে ঐ কয়েক অংশ (৩০ বা ২৭) পর্য্যন্ত সরিয়া গিয়া আবার পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হয়। এসম্বন্ধে আবার দুইমত দেখা যায়—(১) সোমসিদ্ধান্তের এবং (২) অন্যান্য সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলির মত। (১) সোমসিদ্ধান্ত-মতে ক্রান্তিপাত-বিন্দু নিরয়ণ বিন্দুর উভয়দিকে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত চালিত হয় এবং অয়নগ্রহের একবার পূর্ণপরিবর্ত্তনে (৩৬০ অংশ) ক্রান্তিপাতবিন্দু মোট ৩০ × ৪ বা ১২০ অংশ গমনাগমন করে।

ধরা যাউক, নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অয়নগ্রহ ও ক্রান্তিপাতবিন্দু চালিত হইল। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশে (অর্থাৎ প্রথম পাদের শেষে) উপস্থিত হইল, তখন ক্রান্তিপাতবিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ৩০ অংশ সরিয়া আসিয়াছে। অয়নগ্রহ চলিতে চলিতে ১৮০ অংশে উপস্থিত হইলে, ক্রান্তিপাতবিন্দু পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইল। অয়নগ্রহ যখন ২৭০ অংশে আসিয়া পড়িল, ক্রান্তিপাতবিন্দু তখন নিরয়ণ-বিন্দুর অপরদিকে চালিত হইয়া তাহা হইতে ৩০-অংশ দূরে উপস্থিত হইল। অবশেষে যখন অয়নগ্রহ ৩৬০ অংশে অর্থাৎ আদ্য-স্থানে আসিয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইল; ক্রান্তিপাতবিন্দুও পশ্চাদ্‌গতিতে উহাদের সহিত একত্র হইল।

সুতরাং কোন নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক বর্ষের অয়নাংশ নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে উহা সাধিত হয়। (১) অভীষ্ট বর্ষে অয়নগ্রহের ঘূর্ণন-সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে। অয়নগ্রহের পূর্ণপরিবর্ত্তনে অয়নাংশ শূন্য হয় বলিয়া পূর্ণপরিবর্ত্তনের পর যে অংশকলাদি অবশিষ্ট থাকে

তাহা হইতেই অয়নাংশ নির্ণীত হয়। এক মহাযুগে অয়নগ্রহ চলন ৬০০ বার হয়, সুতরাং ত্রৈরাশিক দ্বারা অভীষ্ট-বর্ষসংখ্যায় অয়নগ্রহ চলন নির্ণীত হয়। (২) অবশিষ্ট অংশকলাদির ভুজ-সংস্কার করিতে হইবে। এক্ষণে ইহার আবশ্যকতা দেখা যাউক। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশে আসিল, ক্রান্তিপাতবিন্দু ৩০ অংশে আসিয়া পৌঁছিল। প্রথম পাদে অবস্থিতির দরুণ নিরায়ণ-বিন্দু হইতে উভয়ের দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়, সুতরাং অয়নগ্রহ যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই তাহার ভুজজ্যা, এস্থলে অয়নগ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করা সহজসাধ্য। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশ হইতে দ্বিতীয়পাদে গমন করিবে, তখন তাহার সঙ্গে ক্রান্তিবিন্দু পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে অপসৃত হইতে থাকিবে, এক্ষণে নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অয়নগ্রহের দূরত্ব (অয়নাংশসম্বন্ধে) লইতে হইলে ১৮০ অংশ হইতে তাহার স্থানের দূরত্ব পশ্চাদগণনায় তাহার ভুজজ্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপে তৃতীয়পাদে প্রথমের মত এবং চতুর্থপাদে দ্বিতীয়ের মত ভুজজ্যা নির্ণীত হইবে। (৩) অয়নগ্রহের অবশিষ্ট অংশাদির ভুজজ্যা হইতে ত্রৈরাশিক দ্বারা অয়নাংশ নির্ণীত হইবে। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, অয়নগ্রহের ৯০ অংশ গতিতে অয়নাংশের ৩০ অংশ গতি হয়।

৯০ : ৩০ : : অয়নগ্রহের অংশাদির ভুজজ্যা : অয়নাংশ।

(২) ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত ও বৃদ্ধবসিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের মত এক প্রকার। তাহাদের মত সোমসিদ্ধান্তমতানুযায়ী, তবে এই প্রভেদ যে, তাহাদের মতে অয়নগ্রহের ৯০ অংশ চালনে ক্রান্তিপাত-বিন্দু ২৭ অংশ চালিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতে ইহা মোটামুটি ২৬ অংশ ৩০ কলা।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, আর্য্যভটের মত উল্লিখিত সিদ্ধান্তজ্যোতিষগ্রন্থগুলির মত হইতে কয়েক বিষয়ে ভিন্ন। (১) আমরা মহাসিদ্ধান্তে সপ্তর্ষি-ভগণের উল্লেখ দেখি। সপ্তর্ষি-নক্ষত্রপুঞ্জের ধ্রুবতারার চতুর্দ্দিকে একবার পূর্ণ পরিবর্ত্তনকে সপ্তর্ষি-ভগণ কহে, এক কল্পে তাহা ১৫৯৯৯৯৮ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আর্য্যভটের মতে ২৭০০ বৎসরে এক সপ্তর্ষি-ভগণ হয় ইহাই আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতে Precessional period; আধুনিক মতে ইহা ২৫৮৬৮ বৎসর। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, লিপিপ্রমাদবশতঃ ২৭০০০ বৎসর ২৭০০ বৎসরে পরিণত হইয়াছে ২৭০০০ বৎসর হিসাবে ইহার বাৎসরিক গতি ৪৮ বিকলা হয়। সম্ভবতঃ ১৫৯৯৯৯৮ স্থলে ১৫৯৯৯৮ হইবে। (২) আর্য্যভটের মতে অয়নাংশ-নিরূপণ এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ, তাহার মতে অয়নগ্রহ ভগণ এককল্পে ৫৭৮১৫৯, অন্যান্য সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থাপেক্ষা হীনতর। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ক্রান্তিপাত-বিন্দুর নিরয়ণ-বিন্দুর উভয় দিকে গমনাগমন না ধরিয়া পরমক্রান্তি-বিন্দুর (Solstitial Point) নিরয়ণ-বিন্দুর উভয় পার্শ্বে গমনাগমন হইতে অয়নাংশ নিরূপণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, তাঁহার মতে অয়নগ্রহের ক্রান্তিজ্যাই অয়নাংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। চতুর্থতঃ, অয়নগ্রহের পূর্ণ ঘূর্ণনে পরমক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৪ অংশ করিয়া উভয় দিকে গমনাগমন করে। যদিও তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন নাই, তথাপি তাহা সহজেই নির্ণীত হয়। অয়নগ্রহ যেমন সরিতে থাকে,

পরমক্রান্তি-বিন্দুও নিরয়ণ-বিন্দু হইতে সরিতে থাকে। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশে আসিয়া পড়ে, তখন ইহার ক্রান্তিজ্যা ২৪ অংশ, সুতরাং ইহাই অয়নাংশ। অয়নগ্রহ দ্বিতীয় পাদে উপস্থিত হইলে, অয়নগ্রহের ভুজজ্যা ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে বলিয়া তাহার ক্রান্তিজ্যাও কমিতে থাকিবে এবং পরমক্রান্তি আবার নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে ধাবিত হইবে। অয়নগ্রহ ১৮০ অংশে থাকিলে, পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইবে। অয়নগ্রহ তৃতীয় পাদে উপনীত হইলে, প্রথম পাদের ন্যায় পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে সরিতে থাকিবে (তবে অপর দিকে) এবং অয়নগ্রহ ২৭০ অংশে আসিলে পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে আবার ২৪ অংশ দূরে আসিয়া পড়িবে। অয়নগ্রহ চতুর্থ পাদে আসিলে পরমক্রান্তি-বিন্দু পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে ধাবিত হইবে, এবং অবশেষে অয়নগ্রহ ও পরমক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইবে। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-মতে ইহা ২৪ অংশ ৩০ কলা। পঞ্চমতঃ, অয়নগ্রহের ক্রান্তিজ্যার পরিমিত অয়নাংশ নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া দেখা যাইতেছে যে, অয়নগ্রহের চলনের হার (rate) একরূপ হইলেও, অয়নাংশের গতির হার সমরূপ হইবে না। যেমন অয়নগ্রহ প্রতি বৎসর সমহারে চালিত হইতে থাকে, অয়নাংশের গতি কিন্তু প্রতি বৎসর বিভিন্ন হইতে থাকিবে। পর পর কয়েক বৎসরের অয়নাংশ নির্ণয় করিলেই, তাহা প্রতীয়মান হইবে।

(গ) তৃতীয়তঃ, মুঞ্জাল ও ভাস্করের অয়নাংশ একেবারে অন্যান্য গ্রন্থকারের অয়নাংশ হইতে ভিন্ন। মুঞ্জালের মতে এককল্পে ক্রান্তিপাত-ভগণ ১৯৯৬৬৯ অর্থাৎ এক ক্রান্তিপাত-ভগণে ২১৬৩৬ বৎসর লাগে এবং এক বৎসরে তাহার গতি ৫৯.৯ বিকলা। ইহা কিন্তু অয়নগ্রহ নহে—পাশ্চাত্য জ্যোতিষের precessional period নহে, তাহা আর্য্যভটের মতে ২৭০০০ বৎসর। পাশ্চাত্য মতে precessional period (অয়নাংশ) ২৫৮০০ বৎসর এবং বৎসরে তাহার গতি ৫০.২ বিকলা। পাশ্চাত্য জ্যোতিষিগণের মতে ইহার হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নিউকোম্ব সাহেবের মতে বাৎসরিক হার

= ৫০.২৫৮ বিকলা + ০.০০০ ২২২ (খ্রীষ্টাব্দ—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)।

সুতরাং ভাস্করের সময় ও তাহার পূর্ব্বে ইহার বাৎসরিক গতি ৫০.২ বিকলা অপেক্ষাও কম ছিল, ২৭০০০ বৎসর হিসাবে তাহার গতি ৪৮ বিকলা হয়, সুতরাং মুঞ্জালের ক্রান্তিপাত-ভগণ precessional period বলিয়া গ্রহণ করিবার বিশেষ বাধা আছে। আমরা পরে দেখিব যে, ক্রান্তিপাত-বিন্দু যেমন পশ্চিম দিকে চালিত হইতেছে, তৎসঙ্গে মন্দোচ্চ (aphelion) পূর্ব্বদিকে চালিত হইতেছে এবং ইহার বাৎসরিক গতি গড়ে ১১.৮ বিকলা। দুই গতি যোগ করিলে ৬২ বিকলা হয়, সুতরাং ক্রান্তিপাত-বিন্দু হইতে ধরিলে মন্দোচ্চের গতি অথবা মন্দোচ্চ হইতে ধরিলে ক্রান্তিপাত-বিন্দুর বার্ষিক গতি মোটামুটি ১কলা হইবে এবং ইহাই মুঞ্জালের ক্রান্তিপাত-ভগণের বার্ষিক গতি বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য মতে ক্রান্তিপাত-ভগণ মোটামুটি ২০৯৮৬-বৎসর। সুতরাং দেখা গেল যে, মুঞ্জালের ক্রান্তিপাত-ভগণ পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মন্দোচ্চ বিন্দু হইতে ক্রান্তিপাত-বিন্দুর রাশিচক্রে সম্পূর্ণ ভ্রমণ (অর্থাৎ মন্দোচ্চ-বিন্দু হইতে অপসৃত হইয়া তাহার সহিত পুনর্ম্মিলন)।

৩। এক্ষণে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সাহায্যে আমাদের অয়নাংশের মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটন করা যাউক। আবশ্যক বোধে অয়নাংশ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-সম্বন্ধে কিছু সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

কৃষ্ণপক্ষে কোন মেঘশূন্য রজনীতে তারকাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, তারকাগুলি একত্রে পরস্পরের সম্বন্ধে স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে তন্মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, আবার কতকগুলি ধ্রুববিন্দুর (North Pole) চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; তাহারা প্রকৃতপক্ষে অস্তগত না হইলেও, দিবসে সূর্য্যের আলোকে অদৃশ্য থাকে। এই তারকাপুঞ্জের সম্পূর্ণ ঘূর্ণনে (অর্থাৎ একস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সেই স্থানে আসিতে) প্রায় একদিন ও এক রাত্রি অতিবাহিত হয়। যে সময়ে কোন একটী তারকার সম্পূর্ণ ঘূর্ণন সাধিত হয়, সেই সময় নাক্ষত্র-দিন নামে অভিহিত। আমাদের ঘটিকাযন্ত্রে নির্ণীত সময় হিসাবে এক নাক্ষত্র-দিনের পরিমাণ ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। গোলাকার পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘূর্ণনের জন্য আমরা পৃথিবীর উপর হইতে আকাশমার্গস্থ তারকাগুলিকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতে দেখি, বাস্তবিক তাহারা আমাদের সম্পর্কে নিশ্চল। পৃথিবীর কাল্পনিক অক্ষদণ্ড (axis of rotation) উভয়দিকে বর্দ্ধিত করিয়া দিলে, যে দুই স্থলে তাহা আকাশ-মার্গ ভেদ করিবে, তাহা উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুববিন্দু। আমরা পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে বাস করি, এজন্য কেবল উত্তর ধ্রুবটী দেখিতে পাই ; যাঁহারা দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বাস করেন, তাঁহারা দক্ষিণ ধ্রুবটী দেখিতে পান ; আর যাঁহারা বিষুবরেখার উপর বাস করেন, তাহারা দুইটী ধ্রুবই ক্ষিতিজ রেখায় দেখিবেন। আমরা উত্তর ধ্রুবের চারিদিকে তারকাগুলি ঘুরিতে দেখি।

পৃথিবীর তলদেশস্থ যে কোন স্থান হইতে আকাশ গোলার্দ্ধের ন্যায় দেখায় এবং পৃথিবীর ঐ স্থানটী তাহার কেন্দ্রস্বরূপ মনে করা যায়। এইরূপে আমরা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ আকাশ একটী বৃহৎ গোলকরূপে মনে করিতে পারি এবং পৃথিবীকে তাহার কেন্দ্রস্থ বলিতে পারি। এই আকাশ-গোলকে আমরা উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুব (পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সমরেখায়) স্থির করি এবং ঐ উভয় ধ্রুবের সমদূরে আকাশমার্গে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়, যাহার নাম বিষুবন্মণ্ডল (Equinoctial or Celestial Equator)। পৃথিবীর বিষুবদ্বৃত্তের সমতল আকাশমার্গে বর্দ্ধিত করিলে, তাহা বিষুবন্মণ্ডলের সহিত মিলিত হইবে। আবার দুই ধ্রুবের মধ্য দিয়া আকাশ-মার্গে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বহু বৃত্ত কল্পনা করা হয়, তাহাদের নাম ঘটিকা-বৃত্ত (Hour circle)। আমরা আকাশগোলকে ঐরূপ ২৪ বৃত্ত কল্পনা করি ; প্রত্যেকে এক এক ঘণ্টা অন্তরে থাকে। পৃথিবীর তলদেশস্থ কোন স্থানের যাম্যোত্তর বৃত্তের (meridian) সমতল আকাশমার্গে বর্দ্ধিত করিয়া দিলে, তাহা যে স্থানে মিলিত হইবে, তাহাও বৃত্তাকার ; এই বৃত্তের নাম আন্তরীক্ষ যাম্যোত্তর বৃত্ত (Celestial meridian)। কোন স্থানের শীর্ষদেশে যদি ঘটিকাবৃত্ত থাকে, তাহা তখন আন্তরীক্ষ যাম্যোত্তর বৃত্তের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

এক্ষণে সূর্য্য-সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। আমরা দেখি, সূর্য্য প্রতিদিন তারকাবলীর মত পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, আবার পরদিন প্রাতে উদিত হইতেছে। কিন্তু সূর্য্যের ও নক্ষত্রগণের গতির মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। আমরা যদি সন্ধ্যার পর এমন কয়েকটী তারকা দেখিয়া রাখি, যাহারা সূর্য্য অস্ত যাইবার কিছুক্ষণ পরে অস্ত যায় এবং যদি সেগুলিকে প্রতিদিন লক্ষ্য করিয়া যাই, আমরা দেখিব যে, তাহারা ক্রমশঃ আরও শীঘ্র অস্ত যাইতেছে এবং অবশেষে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই অস্ত যাইতেছে এবং সন্ধ্যার সময় অদৃশ্য হইয়া যায়। কিছুকাল পর দেখিব যে, সেগুলি প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উদিত হইতেছে এবং নিশ্চয় সূর্য্যাস্তের বহু পূর্ব্বেই অস্ত যাইতেছে। এইরূপে ৩৬৫ দিবস গত হইলে, আমরা আবার সন্ধ্যার পর ঠিক সেই সময়ে ঐ তারকাগুলি দেখিতে পাইব। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যদিও সূর্য্য ও তারকাগুলি প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইতেছে, তারকাগুলি প্রথমতঃ সূর্য্যের সহিত উদিত ও অস্তমিত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রে উদিত ও অস্তমিত হইতে হইতে বৎসরান্তে (৩৬৫ দিনে) আবার একসঙ্গে উদিত ও অস্তমিত হয়। তারকাগুলি অগ্রগামী হয় এবং সূর্য্য পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে সুতরাং আমরা সূর্য্যের দ্বিবিধ গতি বলিতে পারি—(১) তারকাদিগের সহিত পূর্ব্ব-পশ্চিমে গতি (ঘূর্ণন) এবং (২) ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হওয়ায়, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আকাশমার্গ বেষ্টন করিয়া পুনরায় সেই তারকাপুঞ্জের সহিত মিলনের জন্য গতি। সূর্য্যের তারকাদের সহিত পূর্ব্ব-পশ্চিমে একদিনের গতি গড়ে ২৪ ঘণ্টায় সাধিত হয় অর্থাৎ নক্ষত্রদের তুলনায় সূর্য্যের গতিতে ৪ মিনিট সময় বেশী লাগে—অর্থাৎ সূর্য্য প্রতিদিন ৪ মিনিট করিয়া পিছাইয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তনবশতঃ আমরা তারকাপুঞ্জের ন্যায় সূর্য্যের পূর্ব্বপশ্চিমে দৈনিক গতি দেখিতে পাই ; বাস্তবিক পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-সম্পর্কে সূর্য্য নিশ্চল। সূর্য্যের দ্বিতীয় গতির পথ অর্থাৎ সূর্য্য আকাশমার্গে যে বৃত্তাকার পথ অবলম্বন করিয়া বৎসরে একবার পশ্চাদ্‌গতিতে ঘুরিয়া আসিতেছে, সে কক্ষার নাম ক্রান্তিবৃত্ত (ecliptic)। ক্রান্তিবৃত্তের উভয় পার্শ্বে প্রায় ৮ অংশ-পরিমিত স্থানের তারকাপুঞ্জ লইয়া আমাদের রাশিচক্র। ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডল সমান্তরাল নহে এবং উভয়ে দুই বিপরীত স্থানে ছেদিত হয়। এই মিলনস্থান-দ্বয়কে ক্রান্তিপাত (Equinoctial points) কহে। যে ক্রান্তিপাত হইতে সূর্য্য বিষুব-মণ্ডলের দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে গমন করে, তাহা মেষক্রান্তি (First point of Aries) এবং যাহা হইতে বিষুবন্মণ্ডলের উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করে, তাহার নাম তুলাক্রান্তি (First point of Libra)। এই দুই ক্রান্তিপাতের ব্যবধানে বিষুবন্মণ্ডল ও ক্রান্তিবৃত্তের যে স্থানদ্বয় পরস্পর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে থাকে, তাহা পরমক্রান্তি-নামে অভিহিত (Solstitial points). আমরা উত্তর গোলার্দ্ধে থাকিয়া যদি প্রতিদিন সূর্য্যের উদয় ও অস্ত-স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকি, দেখিতে পাইব যে, ২১এ মার্চ্চের পর (৭।৮ই চৈত্রের পর) সূর্য্য মেষক্রান্তিপাত হইতে প্রতিদিন উদিত হইবার সময় উত্তরদিকে উর্দ্ধে সরিয়া যাইতেছে এবং তিন মাসকাল এইরূপে সরিতে সরিতে পরমক্রান্তিস্থানে উপনীত হয়। সূর্য্য আবার দক্ষিণদিকে সরিয়া আসিয়া তিনমাসে তুলাক্রান্তির

উপর আসিয়া পড়ে এবং আরও দক্ষিণে নামিতে থাকিয়া, তিন মাসে অপর পরমক্রান্তি-স্থানে উপনীত হয় এবং পুনরায় উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া বাকি তিন মাসে মেষক্রান্তিপাতে আসিয়া পড়ে। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর নিজ কক্ষায় ভ্রমণের জন্য আমরা সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতে দেখি। পৃথিবী নিজ অক্ষদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজ কক্ষ দিয়া যেমন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইতে থাকে, সূর্য্যকে আমরা বিপরীত দিকে আকাশমার্গে তারকামণ্ডলের মধ্য দিয়া পশ্চাৎপদ হইতে দেখি। পুনশ্চ পৃথিবীর বিষুবদবৃত্ত এবং তাহার কক্ষের সমতল পরস্পরকে ছেদ করে বলিয়া, ক্রান্তিপাতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সূর্য্যকে বিষুবন্মণ্ডলের একবার উত্তরে ও একবার দক্ষিণে যাইতে দেখি।

আকাশমার্গে কোন জ্যোতিষ্কের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে, আমরা প্রধানতঃ দুইটী পন্থা অনুসরণ করি (চিত্র ১)। প্রথমতঃ, আমরা বিষুবন্মণ্ডলের উপর তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমরা যদি ঐ জ্যোতিষ্কের উপর দিয়া এমন একটী বৃত্তাংশ (ধনু) কল্পনা করি, যাহা ধ্রুবদ্বয়ের উপর দিয়াও গমন করিয়া বিষুবন্মণ্ডলকে ছেদ করে, তাহা হইলে, ঐ ধনু দ্বারা জ্যোতিষ্কটীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি। মেষক্রান্তি হইতে বিষুবন্মণ্ডলে ঐ ছেদস্থান পর্য্যন্ত যে ধনু থাকে, তাহাকে সরলোত্থান (Right ascension) বলে, (যেমন চিত্রে ঘক) আর ঐ ধনুর যে খণ্ড জ্যোতিষ্কটী ও বিষুবন্মণ্ডলের সহিত ছেদের মধ্যবর্ত্তী হয়, তাহা ঐ জ্যোতিষ্কটীর ক্রান্তি বা declination নামে অভিহিত (যেমন ঙক)। আমরা right-ascension এবং declination এর দ্বারা কোন জ্যোতিষ্কের স্থান-নির্দ্দেশ করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, ক্রান্তিবৃত্তের উপর আমরা কোন জ্যোতিষ্কের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমরা বিষুবন্মণ্ডলের ধ্রুবের ন্যায় ক্রান্তিবৃত্তের দুইটী ধ্রুববিন্দু কল্পনা করিতে পারি এবং right ascension এর মত ক্রান্তিবৃত্তের ধনুকে Longitude (স্ফুট, যেমন ঘগ) ও declinationএর মত ধনুর খণ্ডকে latitude (যেমন ঙগ) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই দুইএর দ্বারা আমরা জ্যোতিষ্কটীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি।

চিত্র ১

আমরা ইতিপূর্ব্বে নাক্ষত্রিক দিনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই সময়ে কোন একটী নক্ষত্র কোন স্থানের যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া আবার তাহার উপর আসিয়া পড়ে। যে সময়ে মেষক্রান্তি যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর আসিয়া পড়ে, সেই সময় হইতে নাক্ষত্রিক দিনের আরম্ভ ধরা হয়। আমাদের সৌরমণ্ডলের (অর্থাৎ মধ্যস্থ সূর্য্য ও তাহার গ্রহ-উপগ্রহ ধরিয়া সৌরমণ্ডল) চতুর্দ্দিকে বহু দূরে তারকাগুলি বিক্ষিপ্ত, সুতরাং আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডে ঘূর্ণনের জন্য ইহার তলদেশে প্রত্যেক স্থানেই দিবারাত্রে (এক-

দিনে) একবার চতুর্দিকে ঘুরিয়া আসিতেছে ; তজ্জন্য ক্রান্তিপাত এক বার যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর দিয়া গমন করে। এক নাক্ষত্রিক দিন আমাদের সৌর দিন অপেক্ষা কম। যে সময়ে মেষক্রান্তি যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর আসিয়া পড়ে, তখন এক নাক্ষত্রিক দিনের শেষ এবং দ্বিতীয় নাক্ষত্রিক দিনের আরম্ভ হয় বলিয়া ঘড়ী নাক্ষত্রিক দিন-পরিমাণার্থ চালিত হইলে, তাহা ঐ সময়ে শূন্য ঘণ্টা মিনিটাদি প্রদর্শন করিবে। এইরূপ ঘটিকাযন্ত্র নাক্ষত্রিক সময় নিরূপণের জন্য ব্যবহৃত হইবে। কারণ, নাক্ষত্রিক দিন আবার নাক্ষত্রিক ঘণ্টা-মিনিটাদিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

এক্ষণে সৌর দিন (solar day) কাহাকে বলে, দেখা যাউক। সূর্য্য স্থানীয় যাম্যোত্তর বৃত্ত অতিক্রম করিয়া পুনরায় তাহার উপর আসিতে যে সময় লাগে, তাহাই একটী সৌর দিন। এক বৎসরে ৩৬৫·২৪১৪ অথবা ৩৬৫$\frac{1}{4}$ সৌর দিন। সূর্য্যের ক্রান্তিবৃত্ত ধরিয়া আকাশমার্গে একবার ঘুরিয়া আসিতে যে সময় লাগে, তাহাই সৌর-বৎসর। সূর্য্যঘড়ি (Sundial) দ্বারা সৌরদিনের সময় নিরূপিত হয়। সৌর-দিনগুলি সব সমান নহে; তাহার কারণ, ক্রান্তিবৃত্তে সূর্য্যের গতি সমভাব নহে, অর্থাৎ পৃথিবীর নিজকক্ষে দৈনিক গতি সমভাবে সাধিত হয় না। সৌরদিনগুলি সব অসমান হওয়ায়, সাধারণ ঘটিকা-যন্ত্রের দ্বারা তাহাদের প্রকৃত সময় নিরূপণ করা অসম্ভব। সৌরদিনগুলির পরিমাণ অসমান হওয়ায় ঐ সকল দিনের ঘণ্টা-মিনিটাদিও সব অসমান জানিতে হইবে। এ কারণ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ একটী মধ্যসূর্য্য বা গণিতসূর্য্য কল্পনা করিয়াছেন। প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ সূর্য্যের একবার ক্রান্তিবৃত্তে ঘুরিয়া আসিতে যে সময় লাগে (অর্থাৎ এক সৌরবর্ষে), সেই সময়ে এই কাল্পনিক সূর্য্যকে বিষুবমণ্ডলে একবার ঘুরিয়া আসিতে স্থির করা হয়। এই সময়কে সৌরদিন-সংখ্যা-হিসাবে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগকে মধ্য-সৌরদিন বলিয়া স্থির করা হয়, সুতরাং মধ্য-সৌরদিনগুলি পরিমাণে সমান বুঝিতে হইবে এবং তজ্জন্য সাধারণ ঘটিকাযন্ত্রের সাহায্যে মধ্য-সৌরদিনের সময় নিরূপিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা গেল যে, মধ্য-সৌরদিনগুলি সব সমান, কিন্তু প্রকৃত সৌরদিনগুলি সেরূপ নহে; তাহাদের কতকগুলি পরিমাণে বৃহত্তর, কতকগুলি ক্ষুদ্রতর। আবার কতকগুলি মধ্য-সৌরদিন অপেক্ষা বৃহত্তর, কতকগুলি সমান, আর কতকগুলি ক্ষুদ্রতর; তবে প্রভেদ বেশী নয়। মধ্য-সৌরদিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ও প্রকৃত সৌরদিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় (যেমন মধ্য-সৌরদিনের ১২ ঘটিকা ও প্রকৃত সৌরদিনের ১২ ঘটিকা), এই উভয়ের অন্তর্বর্ত্তী সময় (মধ্য-সৌরদিনের সময় হইতে হিসাবে) Equation of time বা সমকালপ্রভেদ নামে অভিহিত। সচরাচর আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ও পঞ্জিকায় মধ্যাহ্ন সময় লওয়া হয়। গণিত-সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল হইতে প্রত্যক্ষ সূর্য্যের মধ্যাহ্নকালের অন্তরই মধ্যাহ্নে সমকাল-প্রভেদ। যখন মধ্যসূর্য্য অগ্রগামী হয়, অর্থাৎ মধ্য সৌরদিনের মধ্যাহ্ন প্রকৃত সৌরদিনের মধ্যাহ্নের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তখন সমকালপ্রভেদ যুক্ত হইবে; আর যদি মধ্য-সৌরদিনের মধ্যাহ্ন পশ্চাতে থাকে, তাহা হইলে সমকাল প্রভেদ বিযুক্ত হইবে। বৎসরের মধ্যে চারিবার মধ্যসূর্য্য ও প্রত্যক্ষ-সূর্য্য একস্থানে থাকে বলিয়া সমকালপ্রভেদ কিছুই থাকে না; ৩৪ ঠা

বৈশাখ, ১২রা আষাঢ়, ১৬৷১৭ই ভাদ্র ও ১০৷১১ই পৌষ—এই চারিদিনে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য নাবিক-পঞ্জিকায় প্রতিদিনের সমকালপ্রভেদ হিসাব করিয়া লিপিবদ্ধ থাকায়, তাহা হইতে উভয় দিনেরই সময় হিসাব করিয়া লওয়া যায়।

এক্ষণে গণিত বা মধ্য এবং প্রত্যক্ষ সৌরদিনের প্রভেদের (অর্থাৎ সমকাল-প্রভেদের) কারণ দেখা যাউক। প্রথমতঃ ঐ প্রভেদের মূলতত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। ইহার কারণ দুইটী। (১) পৃথিবীর কক্ষ ঠিক বৃত্তাকার নহে—তাহা বৃত্তাভাস (elliptical)। বৃত্তে একটী কেন্দ্র থাকে, কিন্তু বৃত্তাভাসে দুইটী foci বা উপকেন্দ্র থাকে। বৃত্তাভাসের এক উপকেন্দ্রে বা focusএ সূর্য্য অবস্থিত। কক্ষের যে স্থান সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ, তাহা পেরিহেলিয়ন (perihelion) নামে অভিহিত এবং যে স্থান সর্ব্বপেক্ষা দূরস্থ, তাহা আপ্‌হেলিয়ন (aphelion) বা মন্দোচ্চ নামে অভিহিত। যে রেখা পেরিহেলিয়ন হইতে আপ্‌হেলিয়ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাকে line of the apsides বা উচ্চরেখা কহে। (২) ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডল সমান্তরাল না হইয়া কিছু তির্য্যক্‌ভাবে থাকায়, পরস্পরে দুই বিপরীত স্থানে ছেদিত হইয়া ক্রান্তিপাতের সূচনা করিয়াছে। আমরা পৃথিবীর উপর বাস করিয়া তাহার যাম্যোত্তর রেখাগুলির (যাহারা বিষুবদ্বৃত্তের সমকোণে মেরুদ্বয়-মধ্যে অর্দ্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত) পরস্পরের দূরত্ব হইতে সময় নিরূপণ করিতে পারি এবং তজ্জন্য মধ্যসূর্য্যকে বিষুবদ্বৃত্তের উপর কল্পনা করিতে বাধ্য হই। এই মধ্যসূর্য্যের সহিত তুলনার জন্য ক্রান্তিবৃত্তে চালিত প্রত্যক্ষ-সূর্য্যের স্থান ক্রান্তিবৃত্ত হইতে বিষুবন্মণ্ডলে যথাযথ গ্রহণ করিয়া থাকি। ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডল সমান্তরাল নয় বলিয়া প্রত্যক্ষসূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তে যদি সমগতিতে ভ্রমণ করিত, তাহা হইলেও, বিষুবন্মণ্ডলে তাহার গতি সমভাবে হইতে পারে না, তাহার উপর আবার প্রত্যক্ষসূর্য্য নিজ কক্ষায় বিষমগতিতে ভ্রমণ করে। এই জন্য মধ্যসূর্য্য ও প্রত্যক্ষসূর্য্যে গতির প্রভেদ লক্ষিত হয়।

পৃথিবীর কক্ষের আকৃতির বৃত্তাভাসবশতঃ যে সমকালপ্রভেদ ঘটিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে এক্ষণে আলোচনা করা হউক (চিত্র ২)। ভৌতিক নিয়মাধীনে পৃথিবী যখন পেরিহেলিয়নের নিকট
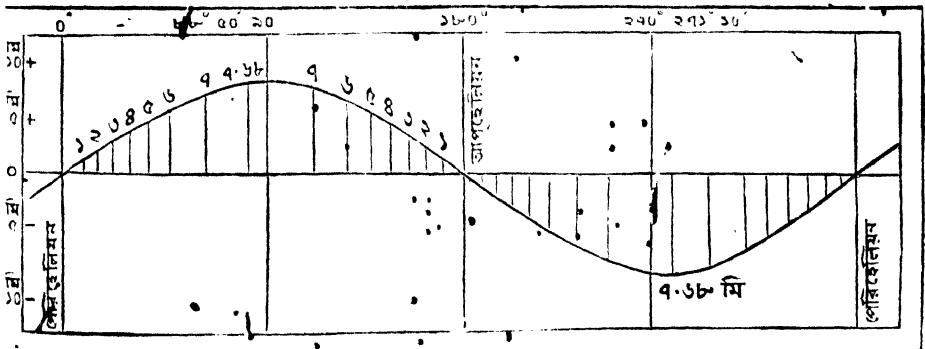
চিত্র ২

আসিয়া পড়ে, তখন তাহার গতি সর্ব্বাপেক্ষা বেগশালিনী হয় এবং তজ্জন্ত প্রত্যক্ষসূর্য্য যে হারে ক্রান্তিবৃত্তে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে (অর্থাৎ পৃথিবী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে) গমন করিতেছে, তাহা মধ্য-সূর্য্যের গতির হার অপেক্ষা অধিকতর। নিজ অক্ষদণ্ডের চারিদিকে পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘূর্ণনবশতঃ প্রকৃত সৌরদিনগুলি মধ্য-সৌরদিন অপেক্ষা দীর্ঘতর। পেরিহেলিয়নে প্রকৃত সৌর-দিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় কাল্পনিক মধ্য সৌরদিনের ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় একসঙ্গে থাকে বলিয়া, এই সময়ে সমকালপ্রভেদ শূন্য হয়। কিন্তু পেরিহেলিয়নের পর যত দিন গত হয়, প্রত্যক্ষ-সৌরদিন-গুলি ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইতে থাকে বলিয়া, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় কাল্পনিক মধ্য-সৌরদিন-গুলি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পশ্চাতে সরিয়া যায় এবং সমকালপ্রভেদ এখন যুক্ত হয়। তিন মাসের শেষে সমকাল প্রভেদ + ৭½ মিনিট হয়, কিন্তু তাহার পর আবার প্রত্যক্ষ-সৌরদিনগুলি খর্ব্বতর হইতে থাকে এবং তজ্জন্য সমকালপ্রভেদও কম হইতে থাকে। তিন মাসের শেষে (অর্থাৎ পেরিহেলিয়ন হইতে ছয় মাসের শেষে) আবার ঐ দ্বিবিধ দিনগুলির পরিমাণ সমান হওয়ায়, সমকাল-প্রভেদও শূন্য হইয়া পড়ে ; এই সময় পৃথিবী মন্দোচ্চে বা আপ্হেলিয়নে অবস্থিতি করে। পৃথিবী যেমন আপ্হেলিয়ন হইতে আবার কক্ষের অপরদিক্ দিয়া যাত্রা করে, তখন প্রত্যক্ষ দিন-গুলি কাল্পনিক মধ্য-দিনগুলির অগ্রগামী হওয়ায়, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্য-সৌরদিনের সময়ের অগ্রে অবস্থিত করিতে থাকে ; তজ্জন্য সমকাল-প্রভেদ হীন হইতে থাকে। ক্রমশঃ তিন মাসের শেষে সমকালপ্রভেদ ৭½ মিনিট পর্য্যন্ত হইয়া আবার অবশিষ্ট তিন মাসে কম হইতে হইতে পেরিহেলিয়নএ তাহা শূন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা গেল যে, পেরিহেলিয়ন এবং আপ্হেলিয়ন—এই দুই স্থানে সমকালপ্রভেদ শূন্য এবং দুইএর মধ্যস্থানে সর্ব্বাধিক প্রভেদ ৭½ মিনিট যুক্ত বা বিযুক্ত হইয়া থাকে।

এক্ষণে ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডলের পরস্পর তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থানবশতঃ সমকালপ্রভেদের বিষয় আলোচনা করা যাউক। ১ম ও ৩য় চিত্র দ্বারা বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হইবে। মেষক্রান্তি হইতে
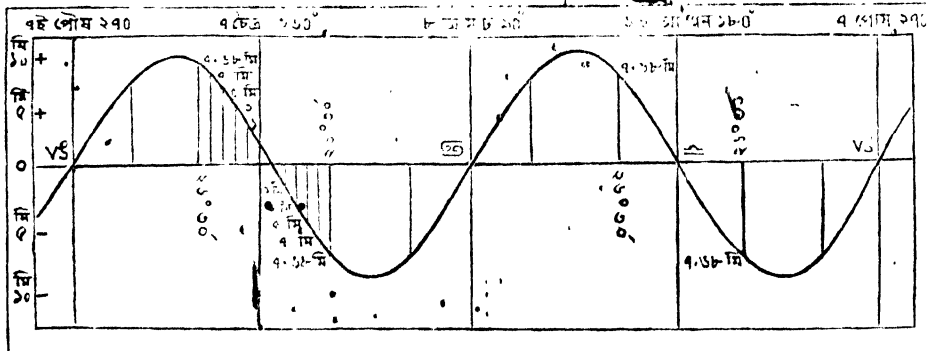
চিত্র ৩

প্রত্যক্ষ ও কাল্পনিক মধ্যসূর্য্যের গতি ধরা হউক। প্রত্যক্ষসূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তে ও কাল্পনিক মধ্যসূর্য্য বিষুবন্মণ্ডলে গমন করিতেছে। দুই ক্রান্তিপাতস্থানে ও দুই পরমক্রান্তি-স্থানে সমকালপ্রভেদ

সমান হইবে। কারণ, এই চারি স্থানে তাহাদের সরলোত্থান (right ascension) সমান হইয়া থাকে। অন্য স্থানে উভয়ের সরলোত্থান সমান হয় না। মেষক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃত-সৌরদিনগুলি কাল্পনিক মধ্যসৌরদিনের অগ্রগামী হওয়ায়, সমকালপ্রভেদ বিযুক্ত হইবে এবং দেড়মাসে প্রভেদ সর্ব্বাধিক হইয়া (−১০ মিনিট) অবশিষ্ট দেড়মাসে আবার শূন্য হইয়া যায়। তৎপরে দেড়মাসে সমকালপ্রভেদ +১০ মিনিট হইয়া আবার কমিতে থাকিয়া শূন্য হইয়া পড়ে, এক্ষণে সূর্য্যোদয় তুলাক্রান্তিতে উপস্থিত হয়। এইরূপে পুনর্ব্বার সমকালপ্রভেদ প্রথমে −১০ মিনিট এবং শূন্য হইয়া আবার + ১০ মিনিট হইবার পর সূর্য্যোদয় মেষক্রান্তিতে উপস্থিত হয়।

আমরা দ্বিবিধ কারণবশতঃ সমকালপ্রভেদ বিভিন্নভাবে আলোচনা করিলাম। কিন্তু আমরা যাহা প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাই, তাহা এই দুই প্রকার সমকালভেদের মিলন-ফল।

পৃথিবীর কক্ষের বৃত্তাভাসবশতঃ প্রকৃত-সৌরদিন ও মধ্যসৌরদিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রভেদ (অর্থাৎ সমকাল) প্রভেদ ৭½ মিনিটের অধিক হয় না—

মধ্যসৌরসময়—প্রকৃত সৌরসময় = +৭½ মিনিট।

প্রকৃত সৌর সময়—মধ্য সৌর সময় = −৭½ মিনিট।

ক্রান্তিবৃত্তের তির্য্যগ্‌ভাবে স্থিতির কারণ সমকালপ্রভেদ ১০ মিনিট পর্য্যন্ত হইতে পারে—

মধ্য সৌরসময়—প্রকৃতসৌরসময় = +১০ মিনিট।

প্রকৃত সৌরসময়—মধ্য সৌর সময় = −১০ মিনিট।

এক্ষণে দেখা যাউক, দুই কারণবশতঃ সমকালপ্রভেদ একত্র করিলে, কোন কোন সময়ে তাহা শূন্য হইবে। প্রথমতঃ যদি উভয় কারণেই এক সময়ে সমকালপ্রভেদ শূন্য হয়, তাহা হইলে সমকাল ভেদের মিলনফল শূন্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রথম কারণবশতঃ সমকাল-প্রভেদ +৭½ মিনিট হয় এবং দ্বিতীয় কারণবশতঃ −৭½ মিনিট হয়, তাহা হইলে একত্রিত সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে। বিষুবমণ্ডলের মেষক্রান্তির নিকটস্থ যে স্থানে সমকালপ্রভেদ শূন্য হয়, তাহাই প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ নিরয়ণ-বিন্দু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। * শূন্য সমকালপ্রভেদ বৎসরে চারিবার ঘটিয়া থাকে—দুই ক্রান্তিপাত-বিন্দু ও দুই পরমক্রান্তির সন্নিকটে। আমরা পরে দেখিব যে, ক্রান্তিবিন্দুদ্বয় নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৬ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত দুই দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহা ৩০ অংশ বা ২৭ অংশ বলিয়া ধরিয়া গিয়াছেন। আর নিরয়ণ-বিন্দুদ্বয় পরমক্রান্তির দুই পার্শ্বে ২৪ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। আর্য্যভট তাহা ২৪ অংশ ধরিয়া গিয়াছেন।

* সাধারণতঃ আমরা "নিরয়ণ-বিন্দু" রেবতী নক্ষত্রে স্থিত বলিয়া মনে করি। সূর্য্যসিদ্ধান্তে "পৌষ্ণান্তে-ভগণঃ স্মৃতঃ" এই পদের অর্থ "পৌষ্ণস্য রেবতীযোগতারায়া অন্তে নিকটে প্রদেশে" রঙ্গনাথের টীকায় পাওয়া যায় বলিয়া এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্তের শ্লোকের অর্থ "সূর্য্যের নিকটে" করিলে বুঝিতে পারিব, ইহা পৃথিবীর কক্ষের 'পেরিহেলিয়ান' ও সূর্য্যের দিক্ হইতে আপ্‌হেলিয়ান-স্থানে অবস্থিত এবং যখন গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, সে সময়ে তাহা রেবতী নক্ষত্রের সঙ্গে মিলিত ছিল। (পরিশিষ্ট দেখুন)।

আমরা একরূপে নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ক্রান্তিপাতদ্বয়ের উত্তর দিকে ২৬ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত বিক্ষেপের কারণ নিদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা দেখিয়াছি যে, পৃথিবীর কক্ষের বৃত্তাভাসবশতঃ এবং বিষুবন্মণ্ডলের সহিত ক্রান্তিবৃত্তের বক্রভাবে স্থিতির দরুণ সমকালপ্রভেদ ঘটিয়া থাকে। যদি পৃথিবীর কক্ষ (অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্ত) এবং ক্রান্তিপাতদ্বয় চিরকাল নিশ্চল হইয়া একস্থানে অবস্থিতি করিত, তাহা হইলে সমকালপ্রভেদ এক সময়ে একপ্রকার হইত—ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইত না। কিন্তু দুই কারণে বৎসরের পর বৎসর সমকালপ্রভেদের সময় পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং তজ্জন্য ক্রান্তিপাতবিন্দু ও নিরয়ণ-বিন্দু—এই উভয়ের পরস্পরের দূরত্বেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। প্রথমতঃ পৃথিবীর বৃত্তাভাসকক্ষ অতি ধীরে ধীরে ঘূর্ণিত হইতেছে, ইহাকে আমরা পেরিহেলিয়নের গতি বলি। সুতরাং পেরিহেলিয়ন ও আপহেলিয়ন একস্থানে নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, সমকালপ্রভেদের সময়ও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বিষুবন্মণ্ডলের বিপরীত-ঘূর্ণনে ক্রান্তিপাতদ্বয় কক্ষ-বর্ত্তনের বিপরীত দিকে অপসরিত হইতেছে এবং তজ্জন্যও সমকালপ্রভেদের সময় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মোট সমকাল প্রভেদের সময় এই দুই পরিবর্ত্তনের জন্য প্রতি বৎসর অতি অল্পপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

উপরোক্ত দুইটী পরিবর্ত্তনের উপর আরও দুইটী পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, তদ্দ্বারাও সমকালপ্রভেদের এত অল্পপরিমাণ বিভিন্নতা লক্ষিত হয় যে, তাহা গণ্য না করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। প্রথমতঃ বৃত্তাভাস কক্ষের আকার অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু ইহা এত অল্প যে, বহুবৎসর পর্য্যন্ত তজ্জন্য গণনার কিছু ক্ষতি হয় না। তবে সোমসিদ্ধান্তে যে অয়নাংশের গতি ৩০ অংশ, পরে ব্রহ্মসিদ্ধান্তাদিতে ২৭ অংশ এবং আধুনিক হিসাবে ২৬ অংশ ৩০ কলা—এই যে পার্থক্য হিন্দুগণের স্থূল গণনার উপর সমুদায় নির্ভর না করিয়া, অন্ততঃ কিছুও কক্ষের আকৃতির পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ ক্রান্তিবৃত্ত এবং বিষুবন্মণ্ডলের সম্পাতে যে কোণ হয় (যাহাকে আমরা পরমক্রান্তি বলি) তাহা অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা উপস্থিত বৎসরে প্রায় অর্দ্ধ বিকলা করিয়া কমিয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারাও সমকালপ্রভেদের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না।

পেরিহেলিয়ন ও ক্রান্তিপাতবিন্দুর বিপরীত দিকে ঘূর্ণনের জন্য ক্রান্তিবিন্দু ও নিরয়ণ-বিন্দুর মধ্যস্থ দূরত্ব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অনুমান ৪০০০ খৃষ্টপূর্ব্বে আপহেলিয়ন ও মেষক্রান্তি নিরয়ণবিন্দুর সহিত একস্থানে অবস্থিত ছিল। তদবধি আপহেলিয়ন কক্ষের ঘূর্ণনবশতঃ প্রতিবৎসর ১১·৮ বিকলা করিয়া পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইতেছে এবং মেষক্রান্তি প্রতি বৎসর ৫০·২ বিকলা করিয়া পশ্চিমদিকে সরিয়া যাইতেছে, কাজেই আপহেলিয়ন হইতে মেষক্রান্তির দূরত্ব প্রতিবৎসর ১১·৮ + ৫০·২ অথবা ৬২ বিকলা করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে; এ কারণ সমকালপ্রভেদ প্রতিবৎসর পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং নিরয়ণ-বিন্দুর স্থানও পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য হইতেছে। ক্রান্তিপাত ও আপহেলিয়নের বিপরীত বর্ত্তনে নিরয়ণ-বিন্দু উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং ক্রান্তিপাত হইতে পূর্ব্বে অপসারিত হইতে থাকে। পৃথিবীর কক্ষের বৃত্তাভাসবশতঃ সমকালপ্রভেদ

৭½ মিনিট হইয়া থাকে এবং ইহা পেরিহেলিয়নের ৯০ অংশ (সূক্ষ্মরূপে ৮৯ অংশ ৫০ কলা) দূরে অবস্থিত এবং একদিকে যুক্ত ও অপরদিকে বিযুক্ত (অথবা আপহেলিয়ন হইতে ৯০ অংশ, একদিকে বিযুক্ত ও অপরদিকে যুক্ত)। সুতরাং যদি ক্রান্তিবৃত্তের তির্য্যগ্‌ভাববশতঃ সমকাল-প্রভেদ ঐ স্থানে ৭½ মিনিট হয় এবং যুক্ত স্থানে বিযুক্ত ও বিযুক্ত স্থানে যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিষুবমণ্ডলের ঐ স্থানে মিলিত সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে এবং তথায় নিরয়ণ-বিন্দুর অবস্থিতি হইবে। এইরূপ হইতে গেলে ক্রান্তিপাতবিন্দুকে আদ্য-স্থান হইতে ২৭ অংশ (২৬ অংশ ৩০ কলা) পশ্চিমে সরিয়া যাইতে হইবে। এক্ষণে আপহেলিয়ন মেষক্রান্তি হইতে ৯০+২৭ বা ১১৭ অংশ দূরে যাইয়া পড়িবে। কিন্তু ক্রান্তিবৃত্তের উপর তাহার স্থান ১২০ অংশ দূরে হইবে। আপহেলিয়ন মেষক্রান্তিপাত হইতে আরও অগ্রসর হইতে থাকিলে, নিরয়ণ-বিন্দু ক্রান্তিপাতের দিকে ধাবিত হইবে। যখন আপহেলিয়ন মেষক্রান্তি হইতে ১২০+৬০ বা ১৮০ অংশ দূরে যাইবে এবং পেরিহেলিয়ন মেষক্রান্তির উপর আসিয়া পড়িবে, তখন নিরয়ণ বিন্দুও উহাদের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। আপহেলিয়ন আরও চলিতে চলিতে যখন মেষক্রান্তি হইতে ১৮০+৬০ বা ২৪০ অংশে (পেরিহেলিয়ন ৬০ অংশে) আসিয়া পড়িবে, তখন নিরয়ণ-বিন্দু মেষক্রান্তিপাতের অপরদিকে ২৭ অংশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইবে। অবশেষে যখন আপহেলিয়ন সরিতে সরিতে ২২০+১৪০ বা ৩৬০ অংশে উপনীত হইবে, নিরয়ণ-বিন্দুও আবার প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ আপহেলিয়নের সহিত মেষক্রান্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমরা যদি নিরয়ণ-বিন্দুকে স্থির ও নিশ্চল ধরি, তাহা হইলে ক্রান্তিপাতবিন্দুকে নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বপশ্চিমে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে পারি। এইরূপে আমরা মেষক্রান্তি ও তুলাক্রান্তি—উভয়কেই নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বপশ্চিমে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে পারি। পরমক্রান্তিদ্বয়কে ঐ রূপে ২৪ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে দেখা যায়। দুইখানি অভ্রপট্টে অথবা সেলিউলয়েড্‌ পট্টে দ্বিবিধ সমকাল-প্রভেদ (চিত্রানুরূপ) পৃথক্ পৃথক্ অঙ্কিত করতঃ দুইটী পট্টকে বৃত্তাকারে বন্ধন করিয়া একটী অপরটীর ভিতরে রাখিয়া বিপরীত দিকে ঘুরাইলে মিলিত সমকালপ্রভেদ শূন্যের স্থান অর্থাৎ নিরয়ণ-বিন্দুর স্থান স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। গোলত্রিকোণমিতির সাহায্যেও বিষয়টী প্রমাণ করা যায়, তাহা অনাবশ্যক ও অপেক্ষাকৃত কঠিনবোধে পরিত্যক্ত হইল।

এক্ষণে ক্রান্তিপাতের নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অপসৃত হইয়া ২৭ অংশ দূরে গমন করতঃ পুনর্ব্বার তাহার সহিত মিলিত হইয়া, অপর দিকে ২৭ অংশ যাইতে কত সময় অতিবাহিত হয়, তাহার আলোচনা করা যাউক।

আমরা দেখিয়াছি—

(১) মেষক্রান্তিপাত হইতে আপহেলিয়নের ১১৭ অংশ (১২০ অংশ) গমনে নিরয়ণ-বিন্দু মধ্যস্থ হইয়া মেষক্রান্তিপাত হইতে ২৭ (৩০ অংশ) সরিয়া আসে। নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিলে এক দিকে আপহেলিয়ন ৯০ অংশ দূরে এবং অপরদিকে মেষক্রান্তি ২৭ অংশ দূরে অবস্থিত থাকে।

আপহেলিয়ন—৯০ অংশ—নিরয়ণ-বিন্দু—২৭ অংশ—মেষক্রান্তি···(ক)

(২) মেষক্রান্তি-পাত হইতে আপহেলিয়ন আরও ৬০ অংশ দূরে চালিত হইলে, অর্থাৎ মোট ১২০+৬০ বা ১৮০ অংশ অপসৃত হইলে নিরয়ণ-বিন্দু মেষক্রান্তি-পাতের উপর আসিয়া পড়ে। তখন নিরয়ণ-বিন্দু হইতেও আপহেলিয়ন ১৮০ অংশ দূরে থাকে (২৭কে মোটামুটি ৩০ ধরা হইল)

আপহেলিয়ন—৬০+৯০+২৭ অংশ—{ মেষক্রান্তি / নিরয়ণ-বিন্দু }···(খ)

(৩) মেষক্রান্তিপাত হইতে আপহেলিয়ন আরও ৬০ অংশ সরিয়া গেলে অর্থাৎ মোট ১২০+৬০+৬০ বা ২৪০ অংশ সরিয়া গেলে, নিরয়ণ-বিন্দু ক্রান্তিপাতের অপরদিকে ২৭ অংশ সরিয়া যাইবে। নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিলে আপহেলিয়ন ২৪০+৩ = ৭০ অংশে দূরে থাকিবে।

আপহেলিয়ন—৬০+৬০+৯০—মেষক্রান্তি—২৭ (৩০)···(গ)

(৪) অবশেষে মেষক্রান্তিপাত হইতে আপহেলিয়ন আরও ১২০ অংশ, অর্থাৎ মোট ১২০ ৬০+৬০+১২০ বা ৩৬০ অংশ সরিয়া গেলে (অর্থাৎ পুনরায় মেষক্রান্তির সহিত মিলিত হইলে), নিরয়ণবিন্দুও পশ্চাৎপদ হইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইবে।

আপহেলিয়ন
নিরয়ণ-বিন্দু } ···(ঘ)
মেষক্রান্তি

আমরা আপহেলিয়ন, নিরয়ণ-বিন্দু এবং মেষক্রান্তিপাতবিন্দুর চতুর্বিধ সম্পর্ক (ক-ঘ) দেখিলাম। এক্ষণে তাহাদের ব্যবধানে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহার আলোচনা করা যাউক। বলিয়া রাখিতে হইবে যে, এত প্রাচীন কালের হিসাব মোটামুটি ভিন্ন হইতে পারে না, সুতরাং গণনা সবই স্থূল বলিয়া ধরিতে হইবে। এমন কি, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতেও এত অধিক বর্ষের গণনা সূক্ষ্ম হইতে পারে না। আমরা দেখিলাম যে, প্রতি বর্ষে আপহেলিয়ন ক্রান্তিপাত হইতে ৬২ বিকলা (৬১.৯) করিয়া সরিয়া যাইতেছে: উপস্থিত তাহা মোটামুটি এক কলা বলিয়া ধরা যাইবে।

আদ্য-কাল এবং প্রথম সম্পর্কের (ক) ব্যবধান আপহেলিয়নের গতি ১২০ অংশ হওয়ায় ১২০×৬০÷১=৭২০০ বৎসর। তদ্রূপ প্রথম (ক) এবং দ্বিতীয় সম্পর্কের (খ) ব্যবধানে ৬০×৬০÷১=৩৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। দ্বিতীয় (খ) এবং তৃতীয় (গ) সম্পর্কের ব্যবধানে ৬০×৬০÷১=৩৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। অবশেষে তৃতীয় (গ) এবং এক চতুর্থ সম্পর্কের (ঘ) ব্যবধান ১২০×৬০÷১=৭২০০ বৎসর হইবে। সর্বসুদ্ধ ২১৬০০ বৎসর হইবে। সুতরাং ক্রান্তি-বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া আপহেলিয়নের এক সম্পূর্ণ ঘূর্ণন দ্বারা তাহার সহিত পূর্ণমিলনে ২১৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। তাহা হইলে এক মহাযুগে আপহেলিয়ন বা পেরিহেলিয়নের গতি [illegible] বা ২০০ বার সাধিত হয়। ২১৬০০ বৎসর মোট

হিসাব বলিয়া ধরিতে হইবে ; আধুনিক মতে সূক্ষ্ম গণনায় ২০৯৮৬ বৎসর হয়। মুঞ্জাল ও ভাস্করের অয়নচলন এই আপ্‌হেলিয়নের গতি, তাঁহাদের মতে ইহার এক পূর্ণঘূর্ণনে ২১৬৩৬ বৎসর অতিবাহিত হয়। তাঁহারা ক্রান্তিপাতকে আপ্‌হেলিয়নের স্থান হইতে চালিত বলিয়া ধরেন।

৪। এক্ষণে প্রাচীন সিদ্ধান্তগ্রন্থে উল্লিখিত অয়নাংশ-নিরূপণের মূলতত্ত্ব পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের তুলনায় আলোচনা করা যাউক।

আমরা আপ্‌হেলিয়নের এক সম্পূর্ণ ঘূর্ণনের সময় ২১৬০০ বৎসর দেখিয়াছি এবং ঐ সময়ে অয়নাংশের নিরয়ণ-বিন্দুর উভয় পার্শ্বে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমনাগমন দেখিয়াছি। আপ্‌হেলিয়ন এক যুগে ২০০ বার ঘূর্ণিত হয়, তাহাও জানিয়াছি।

সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষগুলির মতে এক যুগে চক্রের বা অয়নগ্রহের পূর্ব্বদিকে ৬০০ বার গতি লিখিত হইয়াছে এবং ৯০ অংশ অয়ন-গ্রহের গতিতে ২৭ অংশ (বা ৩০ অংশ) অয়নাংশের গতি হয়। আমরা পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের মতে এই অয়নাংশের সম্পূর্ণ গমনাগমন তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—(১) ৭২০০ বৎসরে নিরয়ণ-বিন্দু হইতে পূর্ব্বদিকে ২৭ অংশ গমন ; (২) পূর্ব্বদিক্ হইতে নিরয়ণ বিন্দু অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে ২৭ অংশ গমন ; ইহাতে ৩৬০০+৩৬০০ বা ৭২০০ বৎসর লাগে ; (৩) পূর্ব্বদিকে আবার ঐ ২৭ অংশ গমন করিয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলন, ইহাতে ৭২০০ বৎসর লাগিবে। এই হিসাবে অয়নগ্রহের গতিও তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) ৯০ অংশ, (২) ৯০+৯০ বা ১৮০ অংশ ; (৩) ৯০ অংশ। এই তিন গতির সমষ্টি ৩৬০ অংশ। সুতরাং অয়নগ্রহের পূর্ব্বগতি (নিরয়ণ-বিন্দু হইতে পূর্ব্বদিকে লঙ্ঘন—ইহাই সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলিতে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে) অর্থাৎ ইহার গতিসমষ্টির ⅓ ভাগ যদি এক যুগে ৬০০ বার সাধিত হয়, তবে তাহার সম্পূর্ণ গতি (৩৬০ অংশ ব্যাপিয়া) এক যুগে ⅓×৬০০ বা ২০০ বার সাধিত হইবে। সুতরাং আমরা এক সম্পূর্ণ অয়নগ্রহের ঘূর্ণন একযুগে ২০০ বার ধরিতে পারি এবং অয়নগ্রহকে আপ্‌হেলিয়ন বা পেরিহেলিয়নের গতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, তবে তাহার গতি ক্রান্তিপাতবিন্দু হইতে না ধরিয়া নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিতে হইবে। অয়নগ্রহের গতি ঐরূপে এক যুগে ৬০০ বার সাধিত হইলে, অয়নাংশের গতিও ঐ সময়ে ৬০০ বার সাধিত হইবে। অয়নগ্রহের এক পূর্ণাবর্ত্তনে অয়নাংশ শূন্য হয়, এজন্য কোন অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যায় অয়নাংশ-নিরূপণে অগ্রে অয়নগ্রহের পূর্ণাবর্ত্তনের পর 'অবশিষ্ট অংশ-কলাদি হইতেই অয়নাংশ নির্দ্ধারিত হইবে। তাহা ত্রৈরাশিক সাহায্যে অনায়াসেই নিরূপিত হইবে।

এক যুগের দিনসংখ্যা : অভীষ্ট বর্ষের দিনসংখ্যা : : ৬০০ : অভীষ্ট বর্ষের দিন-সংখ্যার অয়ন-গ্রহের গতি। গতিতে যে ভগ্নাংশ থাকিবে, তাহাই অংশ-কলাদিতে পরিণত করিলে অবশিষ্ট অংশ কলাদি হইবে।

অয়নাংশ নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বপশ্চিমে গণনা করা হয় বলিয়া অয়নগ্রহের পূর্ণগতির পর অবশিষ্ট অংশ-কলাদি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে 'নিরূপিত' হওয়া আবশ্যক ; তজ্জন্যই তাহাদের ভুজ-সংস্কারের আবশ্যকতা। এই বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

অয়নগ্রহের অংশ-কলাদির ভুজজ্যা হইতে অয়নাংশ নিরূপিত হইবে। আমরা জানি যে, অয়নগ্রহের ভুজজ্যা ৯০ অংশ হইলে অয়নাংশ নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৭ অংশ (সোমসিদ্ধান্তমতে ৩০ অংশ) দূরে থাকিবে। এক্ষণে ত্রৈরাশিক-সাহায্যে অয়নাংশ নিরূপিত হইবে।

৯০ : অয়নগ্রহের অংশকলাদির ভুজজ্যা : : ২৭ : অয়নাংশ

৫। অবশেষে পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতে বিশুদ্ধরূপে অয়নাংশ নিরূপণের প্রণালী আলোচনা করা যাউক।

আমরা জানিয়াছি যে, মধ্যসূর্য্যকে বিষুবন্মণ্ডলে ঘূর্ণিত বলিয়া কল্পনা করা হয়। প্রত্যক্ষসূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তে পরিভ্রমণ করে। সমকাল প্রভেদ নির্ণয় করিবার জন্য প্রত্যক্ষসূর্য্যের গতি বিষুবন্মণ্ডলে নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক এবং সম্ভবপর, তবে নির্দ্দিষ্ট স্থানের কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়; যেমন, ক্রান্তিবৃত্তে সূর্য্যের স্থান অর্থাৎ সূর্য্যের দ্রাঘিমা (লঙ্গিটিউড্—longitude) ১২০ অংশ হইলে বিষুবন্মণ্ডলে সূর্য্যের স্থান অর্থাৎ সূর্য্যের সরলোত্থান (রাইট্-আসেন্‌সান্—Right ascension) ১১৭ অংশ। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, সূর্য্যের স্থান উভয় বৃত্তেই মেষক্রান্তি হইতে গণিত হয়। কারণ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও মধ্যসূর্য্যের গতি একস্থান হইতে আরম্ভ ধরা যাইবে। মিলিত সমকালপ্রভেদ শূন্য হইলে (অর্থাৎ নিরয়ণ-বিন্দুতে) বিষুবন্মণ্ডলে চালিত মধ্যসূর্য্য এবং তাহাতে নির্দ্ধারিত প্রত্যক্ষসূর্য্য একসঙ্গে মিলিত হয়। নিরয়ণ-বিন্দু হইতে স্পাপ্‌হেলিয়ন ৯০ অংশ দূরে থাকিলে মেষক্রান্তিপাত অপরদিকে ২৭ অংশ দূরে থাকে এবং তখন অয়নাংশ ২৭ অংশ বলিয়া গৃহীত হয়। কাজেই মেষক্রান্তি হইতে তন্নিকটস্থ নিরয়ণ-বিন্দুর দূরত্ব (ঐরূপে তুলাক্রান্তি হইতে তন্নিকটস্থ নিরয়ণ-বিন্দুর দূরত্ব) অয়নাংশ বলিয়া পরিগণিত। যে সময়ে সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে, সেই সময়ে প্রত্যক্ষসূর্য্যের বিষুবন্মণ্ডলে নির্দ্ধারিত স্থানের নিকটস্থ ক্রান্তিপাত (মেষ বা তুলাক্রান্তি) হইতে দূরত্বই অয়নাংশ হইবে; অর্থাৎ নিকটস্থ ক্রান্তিপাতবিন্দু হইতে গণিত নিরয়ণ-বিন্দুতে প্রত্যক্ষসূর্য্যের দ্রাঘিমা বা সরলোত্থানই অয়নাংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

যখন মেষক্রান্তিতে সমকালপ্রভেদ বিযুক্ত হইবে, তখন মেষক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বে থাকিবে, যখন যুক্ত হইবে, তখন মেষক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দুর পশ্চিমে থাকিবে। নিরয়ণ-বিন্দু মেষক্রান্তির পূর্ব্বে অয়নাংশযুক্ত এবং পশ্চিমে থাকিলে অয়নাংশবিযুক্ত হইবে। ইহাও সিদ্ধান্তগ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

এক্ষণে নাবিকপঞ্জিকার সাহায্যে অয়নাংশ কিরূপে সূক্ষ্মভাবে গণিত হইতে পারে, দেখা যাউক।

১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের (আদিতে) অয়নাংশ নিরূপণ করা যাউক। প্রথমতঃ, ১৮৪৪ শকাব্দের আদি ইংরাজি সনের কত তারিখ, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। কেবল ইংরাজি সন জানিলেই চলিতে পারে; কারণ, ইংরাজি সনের প্রথম যে দিন সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে, সেই দিনেই নিরয়ণ-বিন্দুর মেষক্রান্তির নিকট স্থিতি বলিয়া ধরিতে হইবে। ১৮৪৪ শকাব্দা ইংরাজি ১৯২২ সনের সম বলিয়া, আমরা ঐ সনের নাবিকপঞ্জিকা হইতে মেষক্রান্তির নিকটস্থ নিরয়ণ-বিন্দুর স্থিতিকাল ১৫।১৬ এপ্রিলের মধ্যে পড়িয়াছে জানিতে পারিব। দ্বিতীয়তঃ, এই দুই দিনের

মধ্যে কোন সময় সমকালপ্রভেদ শূন্য হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ ঐ সময়ের সূর্য্যস্ফুট নাবিকপঞ্জিকা হইতে নির্ণয় করিয়া যাহা হইবে, তাহাই বিশুদ্ধ অয়নাংশ হইবে।

নিরয়ণ-বিন্দুর স্থিতিকাল অথবা সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবার সময় নিরূপণ করিতে হইলে দুইটির একটী পন্থা অনুসরণ করা যাইতে পারে। প্রথম পন্থাটী অতি সহজ এবং একটী ত্রৈরাশিক প্রক্রিয়া মাত্র, তবে ইহার ফল স্থূল হইবে। দ্বিতীয় পন্থাটী অপেক্ষাকৃত জটিল, তবে ইহার ফল সূক্ষ্ম।

প্রথম প্রক্রিয়া।

১৫ই এপ্রিল, সমকালপ্রভেদ −০ মিনিট ১০·৭৯ সেকেণ্ড } গ্রিণউইচের বেলা
১৬ই এপ্রিল, সমকালপ্রভেদ +০ মি 　 ৪·০৫ সে } ১২টার সময়

দুইএর প্রভেদ +০ মি 　 ১৪·৮৪ সে

সুতরাং ১৪·৮৪ : ১০·৭৯ : : একদিন : দিনের ভগ্নাংশ

দিনের ভগ্নাংশ = $\frac{১০৭৯}{১৪৮৪০}$ = ১৭ ঘণ্টা ২৭ মি ০·৪৮ সে।

নাবিকপঞ্জিকায় দিবা ১২টার সময়ে ঐ সমকালপ্রভেদ লিখিত হওয়ায় সমকালপ্রভেদ শূন্যের সময় ১৭ ঘ ২৭ মি ০·৪৮ সে − ১২ ঘণ্টা = প্রাতঃকাল ৫টা ২৭ মি ০·৪৮ সে। ইহা গ্রীণউইচের ঘটিকা হিসাবে বুঝিতে হইবে।

কলিকাতার দেশান্তর ৫ ঘ ৫৩ মি ২১সে এবং কলিকাতা গ্রীণউইচের পূর্ব্বে স্থিত বলিয়া তাহা যুক্ত হইবে।

সুতরাং কলিকাতায় সমকালপ্রভেদের শূন্যকাল ৫টা ২৭ মি ০·৪৮ সে + ৫টা ৫৩ মি ২১সে = ১১টা ২০ মি· ২১·৪৮ সে হইবে। ইহা নিরয়ণ-বিন্দুর অবস্থিতি-কাল।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অগ্রপশ্চাৎ কয় দিনের সমকালপ্রভেদ ধরিতে হইবে।

এপ্রেল সমকালপ্রভেদ	প্রথম প্রভেদ	দ্বিতীয় প্রভেদ
১৪ই −০ মি ২৫·৯৯ সে (ক¹)		
	+১৫·২০ সে (খ¹)	
১৫ই −০ 　 ১০·৭৯ 　 (ক°)		−০·৩৬ সে (গ¹)
	+১৪·৮৪ (খ$_0$)	
১৬ই +০ 　 ৪·০৫ 　 (ক$_1$)		−০·৩৮ সে (গ°)
	+১৪·৪৬ (খ$_2$)	
১৭ই +০ 　 ১৮·৫১ 　 (ক$_2$)		

বেসেল (Bessel)-কৃত অন্তর্নিবেশ (interpolation) সূত্র (formula) হইতে গঠিত নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে সূক্ষ্মরূপে দিনের ভগ্নাংশ নিরূপিত হইবে।

$$\text{দিনের ভগ্নাংশ} = \frac{-\text{ক}^\circ}{\text{খ}_0 - \left(\frac{\text{গ}^1+\text{গ}^\circ}{২}\right) \times \frac{১}{২} - \left(\frac{\text{গ}^1+\text{গ}^\circ}{২}\right) \times \frac{১}{২} \times \frac{+\text{ক}^\circ}{+\text{খ}^\circ}}$$

= ১৭ ঘ ২৩ মি ২৭·৪৮ সেকেণ্ড।

সুতরাং সমকালপ্রভেদের শূন্যকাল = সকাল ৫টা ২৩ মি ২৭.৪৮ সেকেণ্ড।

কলিকাতায় সমকালপ্রভেদের শূন্যকাল = ১১টা ১৬ মি ৪৮.৪৮ সে।

গ্রিণউইচ ঘটিকায় সমকালপ্রভেদের শূন্যকালের সূর্য্যের স্ফুট গ্রহণ করিলে তাহাই অয়নাংশ হইবে। এ কারণ পর পর কয়দিনের সৌরস্ফুট নাবিকপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।

এপ্রিল ১২টার সময়ের সৌরস্ফুট					প্রথম প্রভেদ	দ্বিতীয় প্রভেদ
১৩	২২ অংশ	৪৬ কলা	১৭.৭ বিকলা	(ক^{২})		
					৫৮ক ৪৪.৪ বি (খ^{২})	
১৪	২৩	৪৫	২.১	(ক^{১})		−১.৮ বি (গ^{২})
					৫৮ ৪২.৬ (খ^{১})	
১৫	২৪	৪৩	৪৪.৭	(ক$^{\circ}$)		−১.৭ (গ^{১})
					৫৮ ৪০.৯ (খ$_{\circ}$)	
১৬	২৫	৪২	২৫.৬	(ক$_{১}$)		−১.৮ (গ$^{\circ}$)
					৫৮ ৩৯.১ (খ^{১})	
১৭	২৬	৪১	৪.৭	(ক$_{২}$)		−১.৬ (গ^{১})
					৫৮ ৩৭.৫ (খ$_{২}$)	
১৮	২৭	৩৯	৪২.২	(ক$_{\circ}$)		

দেখা যাইতেছে যে, ১৫৷১৬ই এর মধ্যে কোন এক সময়ের সৌরস্ফুট নিরূপণ করিতে হইবে। এই সময়কে দিনের কোন অংশ হিসাবে (কারণ, আমরা প্রতিদিনের স্ফুট পাইতেছি) "স" বলিয়া ধরিলে, ১৫ই তারিখের ১২টা হইতে তাহা $\text{ক}^{\text{স}}$ বলিতে পারা যায়। এক্ষণে বেসেলের সূত্রমত $\text{ক}^{\text{স}}$ নিরূপিত হইবে। $\text{ক}^{\text{স}}$ই আমাদের অয়নাংশ।

$$\text{ক}^{\text{স}} = \text{ক}^{\circ} + \text{স}\text{খ}^{\circ} + \frac{\text{স}(\text{স}-১)}{২}\left(\frac{\text{গ}^{১}+\text{গ}^{\circ}}{২}\right)$$

এস্থলে $\text{স} = ১৭\text{ঘ } ২৭ \text{ মি } ২৭.৪৮ \text{ সে} = \frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭}$ দিন

$$\text{সুতরাং অয়নাংশ} = ২৪ \text{ অংশ } ৪৩ \text{ ক } ৪৪.৭ \text{ বিকলা} + \frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭} \times ৫৮\text{ক } ৪০.৯ \text{ বিকলা}$$

$$+ \frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭} \times \left(\frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭} - ১\right)$$

$$\times \frac{১}{২} \times \left(\frac{-১.৭ - ১.৮}{২}\right)$$

$$= ২৫ \text{ অংশ } ২৬ \text{ ক } ১৬ \text{ বিকলা}।$$

এইরূপে নাবিকপঞ্জিকার সাহায্যে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বর্ষের অয়নাংশ নির্ণয় করিলে ইহার বার্ষিক গতি জানা যাইবে। কয়েক বর্ষের অয়নাংশ নিরূপণ করিতে পারিলে ইহার গতির হার শুদ্ধরূপে জানা যাইতে পারে। কিছু অধিক গত বর্ষসংখ্যার অয়নাংশ ধারাবাহিকরূপে স্থির করিয়া, তাহাদের সাধারণীকরণ (integration) প্রক্রিয়ার দ্বারা এমন একটী নিয়ম গঠিত হইতে পারে, যাহাতে নাবিকপঞ্জিকার বিনা সাহায্যে বহু বর্ষ পর্য্যন্ত অয়নাংশ গণিত হইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তে "পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ" কথাগুলিতে রেবতী নক্ষত্রের শেষে ভগণের আদি না বুঝাইতে পারে। এই বাক্যাবলী সোমসিদ্ধান্তে এবং ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তেও দেখা যায়। ভাস্করাচার্য্যও রেবতী নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এ কারণে পৌষ্ণান্তে অর্থে রেবতীর অন্তে ধরিলে আমরা দেখি যে, আদিবিন্দু সচল না হইয়া নিশ্চল হইবে এবং তাহা আমাদের মূল তত্ত্বের প্রমাণের বিপক্ষে যাইবে। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্তজ্যোতিষগুলির পূর্ব্বের নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া জানিতে পারি যে, তৎকালে নক্ষত্রের আদি অশ্বিনী বলিয়া ধরা হইত না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কৃত্তিকার নিকট আদিবিন্দু অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে। আবার পিতামহসিদ্ধান্তে আদিবিন্দুর স্থান ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে ছিল। মহাভারত রচনাকালে শ্রবণা নক্ষত্রকে আদি বলিয়া ধরা হইত। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আদিবিন্দু সচল এবং হিন্দুগণ বহুদিন হইতে আদিবিন্দুর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃষ্ঠা	১৩	পংক্তি	২৫	"যাম্যোদগ" "যাম্যোদগ্" হইবে।
পৃষ্ঠা		"	৩১	"তেষামন্তরং শাস্ত্রদাস্পদাৎ"। "তেষামন্তরংশাস্তদাস্পদাৎ" হইবে।
পৃষ্ঠা	১৪	পংক্তি	১০	"বিযুক্ত্যা" "বিযুক্ত্যা" হইবে।
পৃষ্ঠা	"	"	১২	"যঃ" "যঃ" হইবে।
পৃষ্ঠা	১৫	পংক্তি	১৯	"কৃত্যো" "কৃত্যো" হইবে।
পৃষ্ঠা	"	"	২৩	"বিষ্ণুবদ্দ্বয়ে" "বিষুবদ্দ্বয়ে" হইবে।
পৃষ্ঠা	১৬	পংক্তি	২৫	"নাড়াদিকং" "নাড্যাদিকং" হইবে।

মুর্শিদাবাদের একটী প্রাচীন লিপি *

আমি ইতিপূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্বিংশ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় "মুর্শিদাবাদের কয়েকখানি লিপি" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সে সময় তথাকার যে সকল শিলালিপি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, উক্ত প্রবন্ধে সমস্তই সন্নিবেশিত ছিল। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর রাজধানী বড়নগরের অপর পারে অধুনা দেবীপুর নামক যে গণ্ডগ্রাম অবস্থিত আছে, এক কালে তাহা সাধু মোহান্তদিগের লীলাক্ষেত্র ছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সর্ব্বশ্রেণীর ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরা উক্ত স্থানে মানবদেহের সার্থকতার জন্য আসিয়া মন্দির-মঠাদি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধুসঙ্গমে ও ধর্ম্মযাজনে জীবন যাপন করিতেন। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্রোতের কবলে অধিকাংশ ধ্বংস হইয়া উক্ত দেবীপুর গ্রামের সামান্য অংশই একণে বর্ত্তমান আছে। উক্ত গ্রামে প্রসিদ্ধ তিনটী আখড়া বা মঠ ছিল। প্রত্যেক মঠেই এক বা ততোধিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাতে দেবসেবা ও অতিথি-সৎকারাদির সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে উক্ত গ্রামের সেই আখড়াগুলির বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নাবশেষে ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কিছু দিবস পূর্ব্বে তথাকার মধ্যম আখড়ায় একটী শিলালিপি রক্ষিত আছে শুনিয়া, আমি তাহা দেখিতে যাই। উক্ত আখড়ার একটী গৃহে কাল প্রস্তরের একটী বৃহৎ শিলালিপি দেখিতে পাই। সে সময় আমার নিকট তাহার প্রতিলিপি (rubbings) লইবার কোন সরঞ্জাম ছিল না। পূর্ব্বপ্রদেশের প্রত্নবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার বন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয় গত শ্রাবণ মাসে পরিদর্শন উপলক্ষে তথায় গমন করিলে, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিয়া ঐ প্রস্তরটী তাঁহাকে দেখাই। আমাদের সঙ্গে ইতিহাস-প্রেমিক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস সরকার মহাশয়ও ছিলেন। সেই সময় এই শিলালিপির ছাপ লওয়া হয়, তাহাই আজ আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৪।০ ইঞ্চি, কঠিন কাল প্রস্তরে তোলা অক্ষরে ক্ষোদিত। ইহার চারি ধারও সুন্দর নক্সায় শোভিত। সমস্ত লিপিটী মধ্যভাগে একটী স্থূল রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত, উপরিভাগে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষায় পাঁচটী কবিতা লিখিত আছে। নিম্নভাগ আর একটী স্থূল রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত; তাহার বাম দিকে বাঙ্গালা অক্ষরে পদ্যে ও দক্ষিণ দিকে পারসী কবিতায় লিপিটী ক্ষোদিত আছে। উপরোক্ত চারি ধারে প্রত্যেকটীর মধ্যভাগে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় দেবতাদিগের নমস্কার ক্ষোদিত আছে। এইরূপ তিন ভাষাযুক্ত শিলা-লিপি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিলালিপির সারাংশ এই যে, বিক্রমসংবৎ ১৭৮১, শকাব্দা ১৬৪৬ বর্ষে বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুরপুরের সন্নিকট দেবীপুরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

জমি ক্রয়পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থে হরিমন্দির নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করাইয়াছিলেন। লিপিতে জমির পরিমাণ বাইশ বিঘা আট কাঠা, এবং চৌহদ্দী—পশ্চিমে গঙ্গার আইল, উত্তরে দেবীপুর ও দক্ষিণে বাহাদুরপুর লিখিত আছে। ঐ জমি রত্নেশ্বরের স্ত্রীর নিকট হইতে ক্রয় করার উল্লেখ হিন্দী, বাঙ্গালা ও পারসী—এই তিনটী ভাষাতেই আছে। হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় কেবলমাত্র রত্নেশ্বরের স্ত্রীর নিকট উদ্যান হইতে খরিদ করার বিষয় লিখিত আছে। কিন্তু পারসী ভাষাতে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব রত্নেশ্বরের বিধবা পত্নী ঈশ্বরী দেবীর উদ্যান হইতে লাখরাজ জমি খরিদ করার উল্লেখ থাকায়, রত্নেশ্বরের স্ত্রীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। লেখকের নাম রামকৃষ্ণ উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত দেবীপুর ও বাহাদুরপুর গ্রামদ্বয়ের অস্তিত্ব এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বঙ্গদেশের যে ইতিহাসগুলি সচরাচর পাওয়া যায়, তাহাতে উল্লিখিত মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহের কোন বিবরণ দেখা যায় না। তিনি নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের কোন না কোন স্থানের প্রতিপত্তিশালী পুরুষ ছিলেন। হিন্দীতে নৃপ গন্ধর্ব্ব সিংহ ও পরে তাহার বিশেষণস্বরূপ মহারাজ শব্দ লিখিত আছে। বাঙ্গালায় মহারাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুর এবং পারসীতে কেবলমাত্র রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ লিখিত আছে। যাহা হউক, গন্ধর্ব্ব সিংহ যে, সে সময়ে কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এই শিলালিপির আর একটী বিবেচ্য বিষয়ে আমি আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সেটী এই যে, ইহার হিন্দী ভাষার লিপিতে বিক্রম সংবৎ ১৭৮১ লিখিত আছে। বাঙ্গালা ভাষার লিপিতে শকাব্দা "ষোলষস" ও অঙ্কে "৪৬ সনে" অর্থাৎ ১৬৪৬ সনের উল্লেখ আছে। ইহার সামঞ্জস্য হওয়াই বিবেচ্য বিষয়। সংবৎ ১৭৮১ ও শকাব্দা ১৬৪৬ এই দুইয়ে অমিল নাই। কিন্তু ঐ সনে হিজরী ১১৪৬ স্থলে ১১৪২ হওয়া উচিত ছিল। যদি উপরোক্ত সংবৎ কিংবা শকাব্দা এবং হিজরী—এই দুই সন তারিখ, একটী জমি ক্রয় করিবার ও অপরটী শুভদিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সময় ধরা যায়, তাহা হইলে, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষার লিপির সন তারিখই অর্থাৎ সম্বৎ ১৭৮১, শকাব্দা ১৬৪৬ বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া—(অক্ষয়তৃতীয়া) মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় বলিয়া ধরা উচিত। জমি ক্রয়ের সময় অবশ্য ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে হইবারই কথা; অথচ পারসী ভাষার লিপির সন তারিখ তাহার আরও তিন চারি বৎসর পরের সময় নির্দ্দেশ করিতেছে। এ সম্বন্ধে আমার আর কোনরূপ সাধন না থাকায়, আমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। এক্ষণে এই অপ্রকাশিত শিলালিপির লিখিত মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহ সম্বন্ধে যদি কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক তাহার ফলাফল প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম বিশেষ সফল হইবে।

শিলালিপির বঙ্গাক্ষরে অক্ষরান্তর

(দেবনাগর)

১। শীর্ষভাগে—শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবজু সদাসহাই।

২। দক্ষিণভাগে—শ্রীলছমনায় নমঃ।

৩। নিম্নভাগে—শ্রীগণেশায় নমঃ॥ শ্রীঃ॥

৪। বামভাগে—শ্রীরঘুনাথায় নমঃ॥

(উপর অংশে দেবনাগর)

১। সম্বত্ ১৭৮১ বৈশাখ মাস সুদি তীজ॥ শ্রীনৃপ গন্ধর্ব্ব সিংঘ ভুব মোলন বয়ো ধর্ম্মকো-বীজ॥ দেবপুরী অস্থানু য়

২। হ বাগু গঙ্গকে তীর॥ জর খরীদি লীনোঁ সোঈ শ্রীহরিসুমরণকোঁ ধীর॥ রতনেস্বরকী নারিনেঁ দয়ো খুসী করি মোল॥.থ

৩। রি রোপী মহারাজনেঁ .ধর্ম্মপুরী অডোল। উত্তর দেবীপুর বসে পচ্ছিম গঙ্গা আলি॥ মেঁড বহাদুর পুর লগী দচ্ছিন

৪। পুরব খালি॥ বীঘা বীস পর দোয়হৈ আঠ বিসে পরিমাঁন॥ হরিমন্দিলু কীন্হো তহাঁ বাঁধ্যৌ কূপ নিরাঁন॥ ৫॥

(নিম্নে বাম অংশে বাঙ্গালা)

১। ওঁ শ্রীমহারাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুর রত্নে—

২। সরের স্ত্রি স্থানে বাগ হইতে বাইশ বিঘা আট

৩। কাঠা ইহ পশ্চিমে গঙ্গার আলি উত্তরে দেবীপু—

৪। র পুর্ব্ব দক্ষিণ বাহাদুরপুর জর খরিদ লইয়া

৫। সকাব্দা সোলবস ৪৬'। সনে বৈসাখ মাসের ×

৬। অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে হরিমন্দির ও কূপ দিলা।

(নিম্নে দক্ষিণ অংশে পারসী)

১। রাজা গন্ধরব্ সিন্হ্ বহাদুর বাগু করদন্দ জর খুরীদ শুদ নমুদ অন্দর হবেলী চাহসীরী অফজীদ।

২। মী-গিরফ্ৎ অজ নিজদ মুসমাত ঈশ্বরী দেবা চোবুদ; অহলিয়ে রতনেসর জুন্নারদার মুতবরক বয়ুদ।

৩। বিস্তউ দো বিঘা মোয়াজী হস্ত বিস্ওয়ে লাখরাজী, হদ্দ মঘরিব অওজ দরিয়ায়ে মৌজ দর মৌজমিজাজ।

৪। পুর বহাদুর হর দো সুদ মসরীক ও জনুব দারদ জমীন, তা শমাল হদ্দ দেবীপুর মোকর্রর শুদ। আমীন।

৫। অজ তরারিখ নহুম শব্রাল দহ উ শশ্ সনহ্ জলুস, য়ক হজার উ য়কসদ উ চেহল উ শশ্ হিজরী মনুষ

৬। অজু খৎ-ই রামকৃষ্ণ

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

—o—

"মুর্শিদাবাদের একটী প্রাচীন লিপি"
পাঠ সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয় আমাদের সমক্ষে এই অপূর্ব্ব ত্রিভাষাময় লিপিখানি উপস্থিত করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু দেবনাগরী ও বাঙ্গলা অংশে প্রদত্ত তারিখ তিনি যেরূপ পড়িয়াছেন, আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তিনি স্বকীয় পাঠ অবলম্বন করিয়া দেবনাগরী ও বাঙ্গালা অংশের সংবৎ ও শকাব্দের সহিত ফারসী অংশের হিজরী সনের অসামঞ্জস্য দেখিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রবন্ধের শেষ প্যারাগ্রাফে সেই অসামঞ্জস্যের কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি উভয়ে মিলিয়া এই লিপিখানির ভূষার ছাপাটি আলোচনা করি। ফারসী পাঠটিও আমরা পড়ি। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ফারসী অংশের তারিখটী লইয়া অনুশীলন করেন। আমরা দেখিতেছি, লিপিতে কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

দেবনাগরী অংশে প্রথম ছত্রে তারিখ এই দেওয়া আছে:—

সংবতু ১৭৯১ বৈসাষ (ষ=খ) মাস সুদি তীজ ॥

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু ১৭৮১ পড়িয়াছেন। স্পষ্ট ৭৯১ আছে, ৭৮১ নহে।

বাঙ্গালা অংশে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রে তারিখ এই আছে:—

সকাব্দা' সোলষ পাচপোন বৈসাখ মাসের অক্ষয় ত্রিতিয়া দিবশে ॥

অর্থাৎ শকাব্দা ১৬৫৫ বৈশাখ মাস অক্ষয় তৃতীয়া।

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু পড়িয়াছেন, "সকাব্দ সোলষস ৪৬। সনে" ইত্যাদি। এই পাঠ মোটেই আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। "পঞ্চান্ন" স্থলে "পাচপোন" বঙ্গদেশে বিরল নহে। "সোলষস ৪৬"—অর্দ্ধ অংশ অক্ষর বিন্যাসের দ্বারা, অর্দ্ধ অংশ সংখ্যা-লেখের দ্বারা—এইরূপে কাল-নির্দ্দেশ একেবারে ভুল। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু "পা" কে "স ৪" পড়িয়াছেন, "চ" কে "৬" ধরিয়াছেন, "পোন" কে '। সনে' পড়িয়াছেন। ইহাতেই যত গোল।

সংবৎ ১৭৯১=শকাব্দা ১৬৫৫=খ্রীষ্টীয় ১৭৩৪, এখানে কোনও গোল নাই।

ফারসী অংশের পঞ্চম ছত্রে তারিখ এই দেওয়া আছে:—

অজ্ তব্বারিখ ই নহুম্ শব্ব্বাল দহ্ উ শশ্ সনহ্ জলুস য়ক্ হজার উ য়ক্ স্দ্ উ চিহিল উ শশ্ হিজরহ্।

রাজ্যাঙ্ক (সনহ্ জলুস্) ১৬ (দহ্-উ-শশ্) ৯ই শওয়াল, এক হাজার এক শত চল্লিশ ও ছয় হিজরী (=১১৪৬ হিজরী)।

দিল্লীতে মুহম্মদ শাহ হিজরী ১১৩১ হইতে ১১৬১ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের ষোড়শ বর্ষ = ১১৪৬ হিজরী। ১১৪৬ হিজরী ১৪ জুন ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়। ১১৪৬ হিজরীর শওয়াল মাস ১৭৩৪ সালের মার্চ্চে পড়ে। সুতরাং ১৭৯১ সংবৎ = ১৬৫৫ শকাব্দ = ১১৪৬ হিজরী—এই তিনে বেশ মিল আছে।

দেবনাগরী অংশের ভাষা রাজস্থানী-মিশ্র ব্রজভাষা; চতুর্থী বিভক্তিস্থলে "নে" ("রতনেসুরকী নারিনেঁ দয়ৌ" = রত্নেশ্বরের স্ত্রীকে দিল) রাজস্থানীর বিভক্তি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

—o—

হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ *

হিন্দু, দেবতা উপাসনা করেন। বৌদ্ধ, গুরুর উপাসনা করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধে এই প্রথম ও প্রধান তফাৎ। হিন্দু দেবতা উপাসনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য—দেবতার সঙ্গে এক লোকে বাস করেন, সমান আকার প্রাপ্ত হন, সমান অলৌকিক শক্তি লাভ করেন, এমন কি, একদেশে দেবতার দেহের সহিত মিলিত হন। পুরা মাত্রায় দেবতা হন, এ কথা তাঁহারা মনেও ধারণা করিতে পারেন না। বৌদ্ধেরা গুরু ভজনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য—গুরু হইবেন, বুদ্ধ হইবেন, শূন্য হইবেন। শূন্যে শূন্য মিশিয়া যাইবে।

বৌদ্ধেরা দেবতাকে অত্যন্ত ছোট বলিয়া মনে করেন। দেবতারা মানুষের চেয়ে একটু বড় হইতে পারেন, কিন্তু গুরুর চেয়ে তাঁহারা অনেক নীচে। শাক্যমুনি যখন বোধিমূলে বসিয়া বোধিলাভ করিলেন, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের অধিপতি, ব্রহ্মা রূপলোকের অধিপতি; ইঁহারা দুজনেই বুদ্ধের কাছে জোড়হস্ত। নারায়ণপরিপৃচ্ছা নামক পুস্তকে আছে যে, নারায়ণ সাজিয়া গুজিয়া, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করিয়া, গরুড় আসনে বসিয়া বুদ্ধদেবের নিকটে আসিলেন এবং গূঢ় দার্শনিক মতের মীমাংসা করিয়া লইয়া গেলেন। শাক্যসিংহ যখন জন্মাইলেন, তখন শাক্যদের নিয়ম অনুসারে খোকাটীকে মহেশ্বরের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। মহেশ্বর নিজে উঠিয়া ছেলেটীকে কোলে করিয়া লইলেন। এই সকল দেখিয়া বেশ জানা যায় যে, আমাদের যে বড় বুড় দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলেই বুদ্ধ অপেক্ষা অনেক ছোট। কিন্তু বেদের সময় হইতেই আমরা ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি। বেদে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, দেবতাদের আহার, আহারের স্থান, সব তৈয়ার করিতেন; ঋগ্বেদী তাঁহাদের হব বা আহ্বান করিতেন। তাঁহারা খাইতে বসিলে সামবেদী আহারের সময় তাঁহাদের স্তব উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন। দেবতারা আহারে তৃপ্ত হইয়া তাঁহাদের বর দিয়া যাইতেন, যথা—পুত্র, পশু, দ্রবিণ ইত্যাদি। বেদের পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা হইলেন। তাঁহাদের কাছেও আমরা বর চাহিতাম—ধন দাও, পুত্র দাও, পশু দাও। যাঁহারা পার্থিব সুখের জন্য ব্যগ্র নহেন, তাঁহারা সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য ও বড় জোর সাযুজ্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের চরম প্রার্থনা, নির্ব্বাণ ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। অনুপধিশেষনির্ব্বাণ বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া।

আমরা ঠাকুরদের ধ্যান করি। বলি—"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং, ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী", অথবা বলি,—"বন্দে শৈলসুতাসুতং," "ভজামি, প্রণমামি" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু বৌদ্ধেরা যখন তাঁহাদের দেবতাদের ধ্যান করেন, তাঁহারা "আত্মানং অমুকদেবতারূপেণ বিভাব্য" পূজা করেন, আমিই বজ্রযোগিনী হইয়াছি, আমিই লোকেশ্বর হইয়াছি, আমিই প্রজ্ঞাপারমিতা

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বার্ষিক চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

হইয়াছি বলিয়া পূজা করেন। এই সকল দেবতা ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবতা হইতে পৃথক্। ইঁহাদের কথা পরে বলিব। আমাদের দেবতারা অনেক বৌদ্ধ দেবতার পায়ের তলে থাকেন। অনেক সময়ে আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও ঐরূপ দুর্দ্দশা বৌদ্ধেরা করিয়া থাকেন।

মহাযানের পর বৌদ্ধদের যে সব যান হইয়াছে, তাহাতে দেবতা আছে। কিন্তু সে সকল দেবতা দেব ও দেবী, আমাদের দেব ও দেবীদের মত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা ডিপার্টমেন্টের দেবতা নহেন; তাঁহারা সকলেই শূন্যের প্রতিমূর্ত্তি। আপনারা পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের নাম শুনিয়াছেন। বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি; তাঁহারা পাঁচটি স্কন্ধের শূন্যমূর্ত্তি। পাঁচটী স্কন্ধ কি কি? রূপস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ, এই পাঁচটী স্কন্ধের শূন্যমূর্ত্তির নাম পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ। ইঁহাদের পাঁচটী শক্তি আছেন, রোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্য্যতারিকা। ইঁহাদের আবার পাঁচজন বোধিসত্ত্ব আছেন; গণেশ, মহাকাল, পদ্মপাণি, রত্নপাণি, বিশ্বপাণি। এই শক্তিগুলি ও এই বোধিসত্ত্বগণ সবই শূন্যমূর্ত্তি। এই পনরটী শূন্যমূর্ত্তি হইতে অসংখ্য অসংখ্য বুদ্ধ দেব দেবীর মূর্ত্তি হইয়াছে; সবই শূন্যমূর্ত্তি। বৌদ্ধেরা—আমরা সেই সেই মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছি, এই বিভাবনা বা ধ্যান করিয়া তাঁহাদের পূজা করেন। আমরা শূন্যমূর্ত্তির ধ্যানই করি না। আমরা আমাদের সম্মুখে যে মূর্ত্তি, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহাকে দেবতা করিয়া লইয়া ধ্যান করি।

আমাদের শূন্য অন্ধকার তমোভূত। বৌদ্ধদের শূন্য প্রভাস্বর, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ। আমাদের আদিসৃষ্টি আছে। বৌদ্ধদের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনাদিপ্রবাহ। উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, তোমার আপনার চরকায় তেল দাও। তুমি কোথা থেকে এলে, কোথায় যাইবে, তাই ভাব। পৃথিবীর কথা ভাবায় তোমার দরকার নাই। আকাশ কোথা হইতে হইল, জিজ্ঞাসা করিলেও সেই কথাই বলিতেন। সুতরাং তাঁহার কাছে সৃষ্টিকথা শুনিবার আশা নাই। যখন বৌদ্ধদের মধ্যে যুবা বৃদ্ধে দলাদলি হইল, তখন যুবকেরা প্রথম যে বই লেখে, সেই মহাবস্তু অবদানে লেখা আছে, আগে বহু দিন পূর্ব্বে—কত কল্পকোটি বৎসর পূর্ব্বে, তাহার ঠিকানা নাই, জীব ছিলেন তাঁহারা স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁহাদের শরীরে ভার ছিল না, তাঁহারা দিক্, কাল, আকাশে ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদের দুঃখ ছিল না, নিরন্তর প্রীতিসুখে বিচরণ করিতেন। কিছু কাল পরে একটা হ্রদের মত দেখা দিল। উহাতে অতি পাতলা অথচ অতি সুমিষ্ট জলের মত একটা পদার্থ ছিল; তাই অনেকে খাইতে লাগিলেন, খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে একটু একটু ভার বোধ হইতে লাগিল। আবার বহুকাল পরে আর একটা কি বাহির হইল, তাহা খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে তেজ বা আলো ক্রমে কমিতে লাগিল। ক্রমে গাছ দেখা দিল, সমস্ত গাছই ফলভরে অবনত, সেই ফল তাঁহারা খুব খাইতে লাগিলেন, শরীরের ভারও একটু বাড়িল, আলোও কমিয়া গেল। তাহার পর শস্যক্ষেত্র দেখা দিল, তাঁহারা তাহাও খাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্ত্রীত্ব ও পুংচিহ্ন আবির্ভূত হইল, ক্রমে তাঁহাদের সন্তান সন্তুতি হইতে লাগিল এবং ফসল তৈয়ারি করা দরকার হইল। যখন আমার খেতের ফসল

তুমি খাইতে লাগিলে, তখন সকলে একত্র হইয়া একজন মহাকায় পুরুষকে নিয়োগ করা হইল। তাঁহার বেতন নির্দ্ধারণ করা হইল, উৎপন্নের ৬ ভাগের একভাগ। তাঁহার নাম হইল মহাসম্মত। এই সব পড়িয়া আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুরা যে অন্ধকার হইতে সৃষ্টি বলিয়াছেন, ইঁহারা তাহা বলেন না। ইঁহারা বলেন, আলো হইতেই অন্ধকার হইয়াছে। আর হিন্দুরা যে বলেন,— "অষ্টাভির্লোকপালানাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ" অর্থাৎ রাজা দেবাংশ, ইঁহারা তাহাও বলেন না। ইঁহাদের রাজা গণদাস; লোকে তাঁহাকে বাছিয়া লইয়া বেতন দিয়া রাখিয়াছে। উত্তর অঞ্চলের বৌদ্ধেরা রাজাকে কখনই বড় বলিয়া মানিত না। সেই জন্ত ভারতবর্ষে ও চীনে রাজাদের হাতে তাঁহাদের অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সময়ে সময়ে সমস্ত বৌদ্ধ সংঘ বিনাশ করিয়া ফেলা হইত। রাজাদের হাতে হিন্দুদের এ দুর্ভোগ বড় ভুগিতে হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম নগরের পক্ষেই সুবিধা হিন্দুধর্ম্ম নগর ও গ্রাম, সর্ব্বত্রই সমান ভাবে আদর পাইত। কৌটিল্য বৌদ্ধদের বড় ভাল চক্ষে দেখিতেন না। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, উহাদিগকে পাড়াগাঁয়ে, যেখানে লোক চাষবাস করিয়া খায়, সেখানে যাইতেই দিবে না। নূতন গাঁয়ে উহাদের প্রবেশ নিষেধ। উহারা সেখানে গেলে, লোককে ভিক্ষু করিতে চেষ্টা করিবে, চাষবাস বন্ধ হইয়া যাইবে। হিন্দুরা গৃহস্থ, তাঁহারা সংসারের উন্নতি চান, বৌদ্ধদের সে দিকে দৃষ্টিই নাই। সে জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধে কখনই ঠিক বনিবনাও হইত না। অথচ হিন্দুরা ভিক্ষা না দিলে বৌদ্ধদের ভিক্ষু হওয়াই চলিত না।

হিন্দুরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিতেন, তাঁহাদের শেষ আশ্রম যতি বা ভিক্ষু। যে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ না হইয়া যতি হইত, হিন্দুরা তাহাকে ভাল চক্ষে ত দেখিতই না, বরং তাহাকে শাস্তিও দিত। কিন্তু বৌদ্ধেরা বর্ণ ও আশ্রম না দেখিয়াই সকলকে ভিক্ষু করিত। বুদ্ধদেবের সময়েই এই ব্যাপার লইয়া মহা গোলযোগ উঠে। তিনি যখন কপিলবাস্তুতে ধর্ম্ম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন দলে দলে শাক্যেরা বাল যুবা বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ ভিক্ষু হইতে লাগিল। শুদ্ধোদন দেখিলেন, ক্রমে শাক্যদের জাতি ও নাম লোপ হইতে চলিল। তখন তিনি বুদ্ধকে বলিলেন, তুমি ২১ বৎসরের আগে যদি কাহাকেও ভিক্ষু কর, তাহা হইলে তোমাকে তাহার পিতা মাতার সম্মতি লইতে হইবে। তাই নিয়ম হইল, ২১ বৎসর বয়সের আগে কাহাকেও ভিক্ষু করা হইবে না। সে নিয়ম আজও আছে। বৌদ্ধদের যে কম্মবাচা আছে, তাহাতে কেহ ভিক্ষু হইতে আসিলে তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার বয়স ২১ বৎসর হইয়াছে ত?" এইরূপে শুদ্ধোদন নাবালকদিগকে ভিক্ষু হওয়ার দায় হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুদের মতে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিল, সে চতুর্ব্বর্ণ-সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার দেহ অশুচি। তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা ভাগ করিয়া লইবে। সে যদি আবার ফিরিয়া আসে, তাহাকে আর বর্ণাশ্রমের মধ্যে গ্রহণ করা হইবে না। সে ভ্রষ্ট যোগী হইয়া থাকিবে। সংসারে প্রবেশ করিলে সে আর আপনার পূর্ব্বপদ পাইবে না। বৌদ্ধেরা কিন্তু অনেককে সংঘ ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে দেয়। উহারা কয়েক বৎসরের জন্যও ভিক্ষু করিতে রাজী।

অশোক রাজা একবার এক বৎসরের জন্ত সংঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে সংঘে যায়, সে আপনার সমস্ত সম্পত্তি স্বত্ব লইয়া সংঘে যায়। তাহার সম্পত্তি তাহার থাকে না, উহা সংঘের হইয়া যায়। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের ঠাট্টা করিত, হিন্দুদের ত সন্ন্যাস লওয়া নয়, পুত্র পৌত্রদের সম্পত্তি বাঁটিয়া দিবার একটা ফন্দী। আমাদের সংঘে আশা মানে, আপনার সমস্ত সম্পত্তি সাধারণীকরণ বা দুনিয়াকে দান করা। হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া সর্ব্বদা বিবাদবিসম্বাদ হইত। মনে কর, একজন বড় ধনী আছেন; তাঁহার একটী ছেলেকে উহারা ভিক্ষু করিল। তাহার পিতা মরিলে তাহার অংশ সংঘের হইয়া যাইবে। অন্য ভাইএরা তাহাতে রাজী হইত না। সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ হইত। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনে এও একটা প্রধান কারণ। ভিক্ষুদের দেখিলেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা ভয় পাইত—ছেলে ধরিতে আসিয়াছে।

হিন্দুদের ভূসম্পত্তি সবই সপিণ্ডদের হইত। ছেলে জন্মাইলেই সে সম্পত্তির অংশাধিকারী হইত। বাপ আর সে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। মিতাক্ষরা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা যে, জন্মমাত্রেই স্থাবর সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় এ মত চলে না। এখানে বাপ মরার সময় যে যে ছেলে, পৌত্র বা প্রপৌত্র বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা উত্তরাধিকারের স্বত্ব পাইবে। এটা অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালায় বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল বলিয়া হইয়াছে। হিন্দুরা communal interest দেখিত, বৌদ্ধেরা personal interest দেখিত।

বুদ্ধদেব নিজে যে সকল আইন করিয়া গিয়াছিলেন, সবই সংঘের জন্য। তাঁহার বিনয় সংঘের মধ্যেই চলিত। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের জন্য তিনি যে সকল নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও সংঘ ও উপাসক উপাসিকার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, তাহারই উপর স্থাপিত। এই সকল নিয়মের বাহিরে উপাসক উপাসিকাদিগকে অর্থাৎ গৃহস্থ বৌদ্ধদিগকে রাজার আইন মানিয়া চলিতে হইত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অথবা ধর্ম্মস্থীয় ও কণ্টকশোধন রাজার হাতে ছিল। এ সকল বিষয়ে বৌদ্ধেরা কোন আইন কানুন ভারতবর্ষে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষের বৌদ্ধদিগকে চিরদিনই রাজার অধীন হওয়া চলিতে হইত। ইৎসিং এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন, কেমন করিয়া সংঘ রাজার সঙ্গে যাহাতে বিবাদ না হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। একজন ভিক্ষুকে কোন কারণে সংঘ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, সংঘাধিপ তাহার যাহা কিছু ভিক্ষু-সম্পত্তি ছিল, তাহার কাপড় চোপড় বিছানা প্রভৃতি তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে আর সেই জিনিস লইবার জন্য সরকারের সাহায্য লইবার সুবিধা পাইল না। অনেক রাজা বৌদ্ধ সংঘকে গ্রাম দান করিতেন। নালন্দার মঠগুলির ২০০ খানা গ্রাম ছিল। গ্রামণীর যে কাজ, তাহা সংঘেরাই করিতেন। সুতরাং সংঘ যে একেবারে রাজার কথা মানিব না, তাহা বলিতে পারিতেন না। অনেক রাজা আবার এই সকল গ্রাম বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়, এক সংঘের গ্রাম অন্ত সংঘকে দেওয়া হইত। সংঘে আবার ব্যবসা ও বাণিজ্য চলিত। সুতরাং রাজার সঙ্গে তাঁহাদিগকে ভাব রাখিয়া চলিতে হইত। রাজা বৌদ্ধবিরোধী হইলে এবং তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণ প্রবল হইলে সংঘকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু তথাপি

সংঘের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল। লোকে যখন সংঘের অনুরাগী থাকিত, রাজা সহজে তাহাদের উপর হুকুম চালাইতে বা তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে যাইতেন না।

রাজনীতি, সমাজ শাসন ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে যে তফাৎ ছিল, তাহা কতক কতক দেখান হইল। কিন্তু দার্শনিক মত বিষয়ে উহাদের তফাৎ বড়ই বেশী ছিল। হিন্দুরা এখন বলেন, তাঁহাদের ছয়খানি দর্শন,—মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। মীমাংসা বৌদ্ধদের থাকিতেই পারে না, কারণ, উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া ব্যস্ত। এই শাস্ত্রকে দর্শন বলিতেও পারা যায়, নাও বলিতে পারা যায়। যখন উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া নিয়ম করে, তখন উহা দর্শন নহে। কিন্তু যখন যজ্ঞ করিলে অপূর্ব্ব হয় বলে, অপূর্ব্বে বা অদৃষ্টের বলে স্বর্গ ও নরক হয় বলে, স্বর্গের লক্ষণ করে, প্রমাণ কয়টা ও তাহার লক্ষণ কি বলে, তখন উহা দর্শন। বেদান্ত, বেদের উপনিষৎগুলি প্রমাণ মনে করিয়া, তাহার উপর ব্রহ্ম, অপবর্গ প্রভৃতি কথার বিচার করে, তখন উহা নিশ্চয়ই দর্শন। যখন এ দুখানি দর্শন বেদকে ভিত্তি করিয়া তৈয়ারি হইয়াছে, তখন ইহার সহিত বৌদ্ধদের কোনও সম্পর্ক নাই।

পাতঞ্জল দর্শন যোগের কথা। যোগ সবাই করে—বৌদ্ধেরাও করে, জৈনেরাও করে, হিন্দুরাও করে; সুতরাং উহাকে দর্শন না বলিলেও চলে। একজন দর্শনসমূহের ইতিহাস-লেখক জৈন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, যোগ দর্শন নয়, উহা কতকগুলি নিয়ম মাত্র; সকল যোগীই উহা মানিয়া চলেন। পতঞ্জলির যোগসূত্রে আমাদের বা বৌদ্ধদের কোনই আপত্তি নাই।

সাংখ্য লইয়া মহাগোল। সকল দর্শনের চেয়ে সাংখ্য পুরাণ। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় উঠিবার অনেক আগে সাংখ্যদর্শন হইয়াছিল। সকলেই উহা হইতে আপন আপন মতের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ দেবের যে দুজন গুরু ছিলেন, দুজনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের যে কৈবল্য, তাহা বুদ্ধদেবের পছন্দ হয় নাই। তাই তিনি উহাঁদিগকে ছাড়িয়া ছয় বৎসর ধ্যান ধারণার পর পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সে পরমার্থ-জ্ঞান কিন্তু ঐ সাংখ্য মতের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। তবে সাংখ্যদের মূল কথা যে সৎকার্য্যবাদ, তাহা উনি ত্যাগ করিয়াছেন। কারণ সৎ, তাহা হইতে সৎ কার্য্যের উৎপত্তি অর্থাৎ কার্য্য কারণের পরিণাম মাত্র। বুদ্ধদেব সৎকার্য্যবাদটিকে ঘুচাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্।" গোড়ায় যদি সৎকার্য্যবাদ বন্ধ করিয়া ক্ষণিকবাদ হইল, আগায়ও তাহা হইলে কেবলবাদ ভাঙ্গিয়া গিয়া শূন্যবাদ হইল। বুদ্ধদেব বলিলেন, "সর্ব্বং শূন্যং শূন্যম্।" সাংখ্য ও সব জিনিষের সংখ্যা করিয়া থাকে বলিয়া সাংখ্য নাম পাইয়াছে। বৌদ্ধেরাও তেমনি সকল বিষয়েরই সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন। মূল সাংখ্য ২২টী সূত্র মাত্র। প্রত্যেকটিরই একটি করিয়া সংখ্যা আছে। যথা—১। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ২। ষোড়শ বিকারাঃ। ৩। পুরুষ ইত্যাদি। বৌদ্ধেরাও তেমনি বলেন, চতুরার্য্যসত্য, ষট্পারমিতা, দশভূমি ইত্যাদি। যদিও বৌদ্ধদের সাংখ্যদের মত সূত্রাবলী নাই, কিন্তু দার্শনিক পদার্থগুলির সংখ্যা করা সম্বন্ধে দুজনই একপন্থী।

কপিলসূত্রগুলিতে বেদ যে প্রমাণ, সে কথা নাই। তাই হিন্দুরাও বইখানাকে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। সাংখ্য বলিতে তাঁহাদের কাছে ষষ্টিতন্ত্র বুঝাইত। ষষ্টিতন্ত্রের পুথি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু উহার এক সূচি অহির্বুধ্ন্য পঞ্চরাত্রে পাওয়া গিয়াছে। আর ঐ ষষ্টিতন্ত্র সংক্ষেপ করিয়াই ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার কারিকা লিখিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই হিন্দু সাংখ্যের প্রাচীনতম পুথি। উহাতে বেদ যে প্রমাণ, সে কথা আছে। কিন্তু সে বেদ সাংখ্যজ্ঞান হইতে অনেক নীচে। "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ"—দৃষ্ট পদার্থ হইতে যেমন একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয় নাই, আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদোদিত ক্রিয়াকলাপ হইতেও সেইরূপ অত্যন্ত ও একান্ত দুঃখনিবৃত্তি হয় না। নাই হউক, তথাপি উহা বেদ মানে, উহাকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কপিলকে গ্রহণ করা যায় না, সে বেদ মানে না। কপিলের উপর হিন্দুদের এত ঘৃণা যে, শ্রাদ্ধ-সভায় যদি কাপিল বা লোকায়ত উপস্থিত হয়, উহাদিগকে শিয়াল কুকুরের মত তাড়াইয়া দিতে হইবে। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যও সাংখ্যের একখানি নূতন পুথি। এখানিও হিন্দুরা গ্রহণ করিয়াছেন, যে হেতু ইহাতে বেদকে প্রমাণ বলিয়া মানে। সুতরাং দুরকম সাংখ্য আছে,—এক রকম হিন্দুদের ও আর একরকম বৌদ্ধদের। বৌদ্ধেরা কাপিল সূত্রের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরকৃষ্ণকারিকা চীন দেশের ত্রিপিটকে পাওয়া যায়।

বৈশেষিক লইয়া আরও গোল। প্রবাদ আছে, বৈশেষিক আঠার রকম। আমরা ত তত পাই নাই। এক রকম সকলেই জানে, কণাদের ষট্‌পদার্থী—উহাতে বেদের কথা আছে,—"বুদ্ধিপূর্ব্বো বাক্যকৃতির্বেদে"; সুতরাং হিন্দুরা উহা গ্রহণ করিয়াছেন। আর এক রকম দশপদার্থী বৈশেষিক চীন দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে, উহাতে বেদের উল্লেখ একেবারে নাই, হিন্দুরা উহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধেরা উহা রাখিয়াছে। বৈশেষিক এক রকম "ফিসিকাল সাএন্স"; সুতরাং উহাতে সকলেরই দরকার। হইতে সকলেরই হইবে, সকলেই আপন আপন মত করিয়া লইয়াছেন।

আরও বেশী গোল ন্যায়শাস্ত্র বা লজিক লইয়া। দুপক্ষেই বলেন, উহা অক্ষপাদের লেখা। অক্ষপাদ দুজনেরই ভরসা। কিন্তু টীকায় দুরকম হইয়া গিয়াছে। আমি অনেকগুলি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, অক্ষপাদের সূত্রগুলি শুদ্ধ মাত্র তর্কশাস্ত্র। আমরা উহাতে কিছু কিছু প্রক্ষেপ করিয়া উহাকে দর্শনশাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছি। সে সকল কথা এখানে আর পুনরুক্তি করিব না। উহাতে চারিটি প্রমাণের কথা আছে, সে কথাও পরে বলিব। এখানে এই মাত্র বলি যে, বাৎস্যায়ন ঐ সূত্রের টীকা লিখিলে দিঙ্‌নাগ উহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। আবার উদ্দ্যোতকর ঐ ভাষ্যের বার্ত্তিক লিখিয়া দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন করেন। আবার বৌদ্ধেরা ঐ মত খণ্ডন করেন। আবার বাচস্পতি মিশ্র তাহার খণ্ডন করেন এইরূপে বহুবার খণ্ডন মণ্ডনের পর দুই সম্প্রদায়ের মত দুই রকম হইয়া গিয়াছে। দিঙ্‌নাগের মত চীন ও জাপানে খুব চলিতেছে। ভারতবর্ষে বাৎস্যায়নের মতই প্রবল।

তর্কশাস্ত্রের ইতিহাস অতি বিচিত্র। চাণক্যের সময় বোধ হয়, গোতমের সূত্র চলিত ছিল না। কারণ, আমরা অনুমান বলি ও অনুমান শব্দ প্রয়োগ করি। তিনিও অনুমান শব্দ প্রয়োগ করেন

বটে, কিন্তু আমরা যাহাকে অনুমান বলি এবং যাহার জন্য অনুমান শব্দ প্রয়োগ করি, তাঁহার মতে তাহা সাদৃশ্যজন্যজ্ঞানজন্য জ্ঞান। গোতমসূত্র চলিত থাকিলে উনি এরূপ করিতে পারিতেন না। অশোকের সময় কথাবস্তু নামে একখানি বৌদ্ধদের বিচারগ্রন্থ লেখা হয়। উহাতে বিচার করিয়া বৌদ্ধদের সমস্ত মত স্থাপন করা হয়। উহা উহাঁদের তৃতীয় সঙ্গীতির সময় রচিত হয় এবং সমস্ত স্থবিরবাদের আচার্য্যগণ উহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। উহার বিচার-প্রণালী বিচিত্র। মুসলমান আমলে আদালতে যেমন জবাব, হদ্দজবাব, রদ্দজবাব চলিত ছিল, উহা কতকটা সেইরূপ। একটা কথা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফেকড়ি উঠিল, সব ফেকড়ি উদ্ধার করিয়া তবে মূলকথার বিচার হইল। মীমাংসকদের বিচার-প্রণালী আর একরকম। ১। সন্দেহ। ২। বিষয়। তাহার পর পূর্ব্বপক্ষ, তাহার পর উত্তর। তাহার পর নির্ণয়। এই পাঁচটির নাম অধিকরণ। কিন্তু মহাযানীরা ঠিক ইংরাজী সিলগিসম (syllogism) মত কথা কহিত, উহাকে তাহারা প্রয়োগ কহিত, উহাতে বিচারটা বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইত।

বিচারপ্রণালী হইতেই প্রমাণের কথা উঠে—উভয় সম্প্রদায়ের প্রমাণাবলী বড় বিচিত্র। বুদ্ধদেব সাত রকম প্রমাণ মানিতেন। পৌরাণিকেরা আট রকম, কেহ কেহ প্রতিভা বলিয়া আর একটা প্রমাণও মানিতেন। মীমাংসকেরা ছয়টি মানিতেন। গোতম একদিকে আর নাগার্জ্জুন আর একদিকে; দুজনেই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ, এই চাররূপ প্রমাণ মানিতেন। বৈশেষিকেরা দুইটি মাত্র প্রমাণ মানেন বলিয়া কথা আছে। কিন্তু কণাদের পুথিতে আগাগোড়াই আগমের কথা আছে। কণাদ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা বায়ু প্রমাণ করিতে অক্ষম হইয়া, আগমের উপর নির্ভর করিয়া বায়ু নামক পদার্থ স্থাপিত করিয়াছেন। আকাশের স্থাপনা সেইরূপে। সুতরাং বলিতেই হইবে, তিনি আগমও মানিতেন। ঈশ্বরকৃষ্ণও এই তিনটী প্রমাণই মানিয়া গিয়াছেন। চার্ব্বাকেরাই কেবল প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ মানিতেন না।

নাগার্জ্জুনের ও বর্ত্তমান আকারে গোতমসূত্রের পর চারিটি প্রমাণই পণ্ডিতসমাজে আদর পায়। কিন্তু ইহার এক শত বৎসর পরে মৈত্রেয় নামে একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক উপমান প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন দেখেন না। তিনি তিনটি প্রমাণই যথেষ্ট মনে করিতেন। তাঁহারও এক শত বৎসর পরে দিঙ্নাগ নামে একজন বড় পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন, শব্দও প্রমাণ হইতে পারে না। প্রমাণ দুই বই নয়—প্রত্যক্ষ আর অনুমান একেবারে বর্ত্তমান ইউরোপীয় লজিকের মত হইয়া গেল preception and inference. অনুমান প্রমাণ হইলেই কিরূপে অনুমান করিতে হয়, তাহাতে কয়বার বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লইয়া বিবাদ হয়। এই বাক্য-প্রয়োগের নাম "অবয়ব"। গোতমের পূর্ব্বে দশ রকম অবয়ব ছিল। বাৎস্যায়ন বলেন, গোতম প্রথম পাঁচটি অবয়ব উড়াইয়া দিয়া, পাঁচটি অবয়বের অনুমান সাজাইয়া গিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরা এখনও পাঁচ অবয়বেই অনুমান সাজান। দিঙ্নাগ কিন্তু আর দুইটি তুলিয়া দিলেন। বলিলেন, তিনেই যথেষ্ট। প্রতিজ্ঞা, হেতু আর উদাহরণ। প্রথমটিতে পক্ষ ও সাধ্য নির্দ্দেশ, দ্বিতীয়টিতে হেতু নির্দ্দেশ ও তৃতীয়টিতে সাধ্য ও হেতুর মধ্যে ব্যাপ্তি দেখান। অবয়ব কম হওয়ায় বৌদ্ধদের

বিচারপ্রণালী পরিষ্কার ও সংক্ষেপ হইয়া উঠিল। উহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা ভার হইয়া উঠিল। দিঙ্‌নাগের সংস্কৃত বই এতদিনের পর পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইতেছে। বইখানি ছাপা হইলে উহাতে আমাদের ও বৌদ্ধদের ন্যায়শাস্ত্র বুঝিবার খুব সুবিধা হইবে।

বৌদ্ধদের মেটাফিজিক্‌সের ইতিহাস আছে। বুদ্ধদেবকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে? তিনি তাহার জবাব দিতেন না। যদি বা কিছু বলিতেন ত বলিতেন, সে কথায় তোমার কি? তুমি ত জন্মজরামরণের হাত হইতে এড়াইয়া গেলে, তোমার ত ত্রিতাপ নাশ হইল, সেই যথেষ্ট। শূন্য জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি তাহাই বলিতেন। ৫০০ বৎসর পরে অশ্বঘোষও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উক্তি,—

দীপো যথা নির্ব্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥
কৃতী তথা নির্ব্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥

কিন্তু তাঁহার পর এক শত বা দেড় শত বৎসরের পর নাগার্জ্জুন সাহস করিয়া নির্ব্বাণ বা শূন্যের লক্ষণ করিলেন,—"সদসৎ তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যম্।" উহা সৎও নয়, অসৎও নয়। দুএ জড়াইয়াও নয়, দুই ছাড়াও নয় অর্থাৎ উহা অনির্ব্বচনীয়। শূন্যই পরমার্থ, শূন্যই সত্য, শূন্যই বজ্র। শূন্যবাদ ক্রমে দুই ভাগ হইয়া গেল।

দৃঢ়ং সারমসৌশীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহি অবিনাশি চ শূন্যতা বজ্রমুচ্যতে॥

এই একদল বলিল, শূন্য ছাড়া আর কিছুই নাই। উহার নাম অপ্রতিষ্ঠিতসর্ব্বধর্ম্ম। আর এক দল মায়োপমাদ্বৈতবাদ। শূন্য ছাড়া সব বস্তু মায়ার মত। শঙ্করাচার্য্য ইহার সাত শত বৎসর পরে মায়াবাদ প্রচার করেন। সে মত বৈষ্ণবেরা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভক্তিমত প্রচার করিলেন। বিষ্ণুস্বামী বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মত, মধ্বাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রচার করেন। শঙ্করের উপর কিন্তু সকলেরই রাগ— তিনি প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ। শঙ্করের দুই তিন শত বৎসর পরে উদয়নাচার্য্য সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, আমাদের দেশের ন্যায়-মত দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া যান। তিনি শূন্যবাদ খণ্ডন করেন, ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করেন ও অদৃষ্ট-সহকৃত ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া যান।

দর্শনশাস্ত্র অতি কঠিন, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমার এতক্ষণ ধরিয়া দর্শনের চর্চ্চাটা ভাল

হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, উহা শেষ করিয়া উঠা কঠিন। তবে কালচারের কথা বলিতে গেলে দর্শনশাস্ত্রের কথাটা না বলা ভাল নয়।

বৌদ্ধেরা গোড়ায় দেশীয় ভাষায়ই বই লিখিতেন। আমরা এখন যাহাকে পালি বলি, উহাতে কত ভাষা আছে, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন পুথিগুলির ভাষা প্রায়ই পৃথক্ পৃথক্। বৌদ্ধেরা আর এক ভাষায় পুথি লিখিতেন, তাহার নাম মিশ্রভাষা; উহার কতক সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত। এই ভাষায় অনেক বই আছে। গদ্যে এই লেখা, মাঝে মাঝে প্রমাণস্বরূপ পদ্য। পদ্য ও গদ্যের ভাষা একরূপ নহে, পদ্যের ভাষা পুরাণ। ক্রমে গদ্য অংশ সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। সে সংস্কৃত পড়িলেই মনে হইবে, এ মহাভাষ্যের ভাষা নয়, কোন প্রাকৃতের তর্জ্জমা মাত্র। এ সব কথা আগে কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামে একখানি বই আছে, উহার গদ্যটা ঐ রকম সংস্কৃত, আর পদ্যটা মিশ্র। নেপাল হইতে যে কয়খানি পুথি পাইয়াছি, সব ঐ রকম। কিন্তু তকলা মাকান মরু খুঁড়িয়া যে সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবটাই ঐ মিশ্র ভাষায় লেখা।

শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা অনেকেই সংস্কৃত লিখিতেন। দার্শনিকেরা ভাল সংস্কৃতই লিখিতেন। তথাপি কুমারিল তাঁহাদের অব্যুৎপন্ন শব্দ, অশুদ্ধ শব্দ লইয়া বিশেষ বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা দার্শনিক ছিলেন না, তাঁহাদের সংস্কৃত বুঝাই যায় না। তাঁহারা বলিতেন, আমরা ব্রাহ্মণদের মত সুশব্দবাদী নই, আমাদের অর্থ বোধ হইলেই হইল। আমরা পুংলিঙ্গ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ লিখিব, প্রথমা স্থানে সপ্তমী লিখিব, আত্মনেপদের স্থানে পরস্মৈপদ লিখিব, একবচন স্থানে বহুবচন লিখিব, যাহা খুসী করিব, অর্থ বোধ হইলেই হইবে।

বৌদ্ধদের ভিতর একদল পাণিনির টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত বাক্য পাণিনির সূত্র হইতেই বাহির করিতে চান, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেন। পাণিনির সূত্র ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে ইঁহারাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি পাণিনির সমালোচনা করিয়াছেন, অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন। ইঁহারা তাহা করেন না। লক্ষ্মণসেন বৈদিক সূত্রগুলি বাদ দিয়া একখানি ব্যাকরণ করিতে চান। তিনি সে ব্যাকরণের ভার দিয়াছিলেন, একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের উপর। তাঁহার নাম পুরুষোত্তম।

ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের জ্যোতিষ বিচিত্র। তাঁহারা মনে করেন, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা দুই প্রস্থ, জোড়াজোড়া আছে। আজ যাহারা উদয় হয়, কাল তাহারা আসে না, পরশু দিন তাহারা আবার আসিবে। হিন্দুদের কিন্তু এরূপ নাই। সেই গ্রহনক্ষত্রই রোজ উদয় হয়।

ধর্ম্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও হিন্দুর ভিতর যে ভেদ আছে, তাহার কিছু কিছু বলিলাম। এখন আহার বিহার, আচার ব্যবহারে তাঁহাদের যে ভেদ আছে, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। হিন্দুদের আহারের ব্যবস্থা চারায়ণ ঋষি করিয়া গিয়াছেন। লোকে পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে ভোজন করিবে। কেহ কেহ বলেন, অপরাহ্ণে না হইয়া সন্ধ্যার পর ভোজন করিবে। ইহা ছাড়াও সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাতঃকালে অনেকে একটা প্রাতরাশ করিয়া থাকিতেন।

তাহার আর একটা নাম ছিল কল্যবর্ত্ত। ক্রমে এতবার খাওয়া উঠিয়া গিয়া একবার দিনেও একবার রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এক সূর্য্যতে দুইবার খাইতে নাই। এ খাওয়ার মানে আচমনীয় দ্রব্য অর্থাৎ যাহা খাইয়া আচমন করিতে হয় অর্থাৎ মুখ ধুইতে হয়; কিন্তু ফলাহার যখন তখন করা যায়; ফলাহার শব্দের অর্থ ফল খাওয়া, কিন্তু উহার এখন একটা পারিভাষিক অর্থ হইয়াছে। পানিফলের জিলিপি, পানিফলের কচুরি, এগুলিও ফলাহারের মধ্যে গণ্য হইয়াছে; যখন তখন খাওয়া যায়। খাইয়া মুখ না ধুইলেও চলে।

বৌদ্ধদের খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু আর একরকম। তাঁহারা একবার খাইবেন; বারটার আগে সে খাওয়াটি হইয়া যাওয়া চাই। খাইতে খাইতে যদি বারটা বাজে, অমনি উঠিয়া যাইতে হইবে। ছায়াটা দু আঙ্গুল পূর্ব্বে হেলা পর্য্যন্ত সময়ে খাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধদের ভিতর ঘোর দলাদলি হইয়া যায়। অনেকে বারটার পূর্ব্বেও একটু আধটু জলযোগ করিতেন। বারটার পর কিন্তু তরল পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই খাইবার নিয়ম ছিল না। তরল পদার্থ যথা—নারিকেলের জল, ফলের রস, ইত্যাদি। দক্ষিণ দেশের বৌদ্ধেরা অর্থাৎ সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধেরা এখনও এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু উত্তরের বৌদ্ধেরা, গোড়াগুড়িই খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে একটু শিথিল ছিলেন। তাই নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ-বৌদ্ধদের ভিতর ঝগড়া, তাই নিয়েই দলাদলি। ক্রমে যখন মহাযান মত প্রবল হইল, তখন খাওয়া দাওয়ার বাঁধাবাঁধিটা একেবারে উঠিয়া গেল। এখনকার নেপালী ও তিব্বতী বৌদ্ধদের সম্বন্ধে একজন ইংরাজ বলিয়াছেন, সকল ধর্ম্মেই আছে, Fast and worship—এদের দেশে কিন্তু Feast and worship; না খাইয়া তাহারা কিছু করে না। আর আমাদের বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদের 'ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ'—আহার করিয়া কোনরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে না; ভিক্ষুককে ভিক্ষামুঠাও দিবে না।

উপবাস

উপবাস শব্দের অর্থ কি? উপ উপসর্গ ও বস্ ধাতু। এ থেকে 'না খাওয়া' হল কেমন করে? এ সম্বন্ধে শতপথ-ব্রাহ্মণে লেখা আছে যে, যজমান যেমন যজ্ঞ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন অর্থাৎ যজ্ঞশালা বাঁধিলেন, দেবতারা অমনি রাত্রে আসিয়া সে যজ্ঞশালার নিকটে ঘুরিতে লাগিলেন। যজ্ঞশালার নিকটে দেবতারা বাস করেন বলিয়া তাহার নাম হইল উপবাস। তার পর দিন এই সকল দেবতা অতিথিকে না খাওয়াইয়া যজমান খাইতে পারে কি না, ইহা লইয়া বিচার উঠিল। একদল বলিলেন—"অনশন", আর একদল বলিলেন,—না, কিছু খাইতে হইবে। শেষের মত প্রবল হইল, অল্প বিস্তর বৃক্ষের ফল খাইতে পারিবে, কিন্তু সে পেট ভরিয়া খাইলে হইবে না। পিতৃকৃত্য করিতে গেলে কিন্তু একেবারেই খাইতে পারিবে না। আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে বড়ই কড়াকড়ি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা সর্ব্বদাই বলেন,—"ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ।" বৈষ্ণবেরা কিন্তু কিছু আহার না করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না। তান্ত্রিকেরাও তাই করেন। স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক কিন্তু কড়াকড়ি করিয়া "ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ" করেন।

বৌদ্ধেরা অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পুর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাস করেন। প্রথম প্রথম উহার নাম ছিল—উপোসথ, পোসধ। জৈনেরা কিন্তু তাহাও ছাড়িয়া দিয়া শুধু 'পো' করিয়াছেন। ঐ দিন তাঁহারা না খাইয়া বিহারে যাইতেন ও বৈকাল বেলাটা ধর্ম্মকথা শুনিয়া কাটাইতেন। বারব্রত ইত্যাদিতে উত্তরের বৌদ্ধেরা বড় উপবাস করেন না। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন নিয়ম নাই। আমরা যেমন অনেক বাছিয়া গুছিয়া খাই, তাঁহারা তেমন করেন না। যে বুদ্ধের অহিংসা প্রধান কথা, তাঁহার শিষ্যেরা এখন মাংস খাইতে কোনরূপ দ্বিধাই করেন না। তবে অনেকে নিরামিষ-ব্রত করিয়া থাকেন। চীনেরা আমিষ বলিয়া দুধ ঘিও খায় না। তাহারা উহাকে animal food বলে। পেঁয়াজ রসুনে বৌদ্ধদের কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। মদেও তাহাদের আপত্তি নাই। আমার বন্ধু ইন্দ্রানন্দ বলিতেন, যে যত বড় পণ্ডিত হইবে, সে তত বেশী মদ খাইবে।

ক্ষৌরকার্য্য

প্রাচীন কালে হিন্দুরা কামাইতে হইলে দুজন নাপিত রাখিতেন;—একজন নাভির উর্দ্ধটা কামাইত—আর একজন অধঃটা কামাইত। যে উপরের দিক্‌টা কামাইত, সে আচরণীয় হইত, যে নীচের দিক্‌টা কামাইত, সে অনাচরণীয় হইত। বাৎস্যায়ন কামসূত্রে বলেন, দাড়ী ও গোঁপ কামান চতুর্থ দিনে করিতে হয়, নখ কাটাও তাই। অধোদেশ উৎপাটন করিয়া কামাইলে দশ দিন, না হলে পাঁচ দিন। উরত কামাইতে হইলে ফেনা ব্যবহার করিতে হইত। সন্ন্যাসীদের ও স্ত্রীলোকদের বগল কামাইতে নাই। সন্ন্যাসীদের অধোলোম কামাইতে নাই। মাথার সব চুল রাখা সে কালে পুরুষের মধ্যেও চলিয়াছিল। এখনও দক্ষিণ দেশে পুরুষেরা সব চুল রাখে ও বিনুনী করিয়া খোঁপা কাটে। মাথাটি ওল করিয়া কামাইয়া মধ্যে খুব বড় রকমের টিকি রাখা আর্য্যাবর্ত্তে চলিয়াছিল—সন্ন্যাসীরাই কেবল সমস্ত মাথাটা কামাইতেন, শিখা পর্য্যন্তও রাখিতেন না।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মাথাটী তল করিয়া কামাইতেন, তাঁহারা মাথার চুল পনের দিনের বেশী রাখিতে পারিতেন না। নয় দিনের মধ্যেই কামাইতে হইত। যেখানে যেখানে বৌদ্ধ মঠের ঢিপি পাওয়া গিয়াছে, সেইখান সেখানেই অনেক ক্ষুর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, বৌদ্ধেরা নিজে নিজেই কামাইতেন। অনেকেই শরীরের সমস্ত লোম কামাইয়া ফেলিতেন। গৃহস্থ বৌদ্ধদের গ্রাম্য নাপিতেরাই কামাইত। হয় ত ভিক্ষুদেরও কামাইত। কিন্তু বিহারে মেলা ক্ষুর পাওয়ায় সে বিষয়েও একটু সন্দেহ হইয়াছে। নাপিতেরা পাটনী, চণ্ডাল, মুচি, হাড়ী প্রভৃতি অনেক জাতিকেই কামাইত না। এই সব জাতির নিজের জাতির মধ্যেই নাপিত থাকিত। তাহারাই আপনাদের জাতিদের মধ্যে কামাইত। গ্রাম্য নাপিতেরা মুসলমানদের কামাইত; এমন কি, তাহাদের পায়ের নখ কাটিতেও আপত্তি করিত না। কিন্তু এই সকল জাতিকে তাহারা কখনই কামাইতে যায় না। অনেক সময় মজা হয়। একজন মুচি যদি মুসলমান হয়, গ্রাম্য নাপিতেরা তাহাকে কামাইবে; কিন্তু যদি সেই মুচি ভেক লইয়া বৈষ্ণব হয় ত তাহাকে কামাইবে না। হাড়ীদের নাপিত নাই। তাহারা নিজে নিজেই কামায়। সে জন্য

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, হাড়ীর ক্ষুরে তোকে কামাইয়া দিব, অর্থাৎ তোকে একেবারে অনাচরণীয়, অব্যবহার্য্য করিয়া দিব অর্থাৎ কোন নাপিত তোকে কামাইবে না।

বিছানা

হিন্দুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে চার-পাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। চার-পাইয়ের নাম আসন্দী। দড়ির ছাওয়া, বাঁশের বা কাঠের চার-পা। ক্রমে খাট-পালং, তক্তপোষ প্রভৃতি নানারূপ শয্যাধার চলিতে লাগিল। এমন কি, আমরা এখন শ্রাদ্ধের দানেও একখানা খাট, একখানা তক্তপোষ, অন্ততঃ একখানা পিঁড়িও দিয়া থাকি। বৌদ্ধেরা কিন্তু উচ্চাসন এবং মহাসন একেবারেই বর্জ্জন করেন। উচ্চাসন বর্জ্জন করিলে তাঁহার খাট, পালং ও চৌকী, চার-পাই চলে না। মাটিতে মাদুর বিছাইয়া শুইতে হয়। মহাসন ত্যাগ করায় গদী, তোষক, বিছানার চাদর, তাকিয়া, গিদ্দে, বালিশ, পাশ-বালিশ, গাল-বালিশ, পা-বালিশ, সব ত্যাগ করিতে হয়। বড্ড বড়মানুষী কর, একখানি কার্পেটের উপর শুইয়া থাক, না হয় গালিচা কাঁথাই তাঁহাদের বেশী সম্বল। বিচিত্র বিচিত্র কারিকরী করা কাঁথা, ফুল-তোলা কাঁথা বৌদ্ধদের জন্য হইয়াছিল বোধ হয়। এখনও অনেক জাতীয় সন্ন্যাসীর কাঁথাই সম্বল।

পোষাক

বেদের সময় ব্রাহ্মণরা মাথায় একটা পাগড়ী দিতেন। এখনও কোন বৈদিক কার্য্য করিতে গেলে একটা উষ্ণীষ লইতে হয়। তাঁহারা জুতাও ব্যবহার করিতেন। উপানহ না হইলে তাঁহাদের চলিত না। একখানা ধুতি ও একখানা চাদর থাকিত। তাহার উপর উপবীতও থাকিত। এখন ত উপবীত, কয়েক খেই কাপাশের সুতা হইয়াছে, কিন্তু পৈতার সময় চামড়ার পৈতা ব্যবহার করিবার কথা আছে। চামড়া পাওয়া যায় না বলিয়া অন্ততঃ একটুকরাও কালসারের চামড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। আগে বোধ হয়, একখানা চামড়া দিয়া গাটা ঢাকিয়া রাখিতেন। জামা বোধ হয় থাকিত না। কারণ, সেলাই-করা কাপড় লইয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার বিধি নাই।

বৌদ্ধদের কিন্তু এক ধুতি আর এক চাদর। এ ছাড়া আর কোন পোষাকের কথা শোনা যায় না। চাদরখানা এক কাঁধে ফেলিয়া আর কাঁধ হইতে খুলিয়া রাখা হইত। সে কাপড় ও উত্তরীয় আবার খুব সেলাই-করা হইত। সেলাইয়ে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। সে কাপড়ও তাঁহারা সর্ব্বদা যে পরিষ্কার রাখিতেন, এমন নহে, কিন্তু ছোপাইয়া পরিতেন। কি দিয়া ছোপান হইত, ঠিক জানা যায় না। কখনও কখনও বলে কাষায় বস্ত্র, কখনও বলে রক্ত বস্ত্র। রাঙ্গা রঙ দিয়া ছোপাইতেন, কি কাষায় রঙ দিয়া ছোপাইতেন, অথবা হয় ত দুই রঙকেই তাঁহারা রক্ত বলিতেন। তবে দেশের নিয়মানুসারে তাঁহারা যে জামা বা চৌবন্দী ব্যবহার করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নেপালী বৌদ্ধেরা নেপালী গৃহস্থের মতই কাপড় পরেন। তবে নেপালে এখন বিহারও নাই, মঠও নাই। যাঁহারা বিহারে বাস করেন, তাঁহারা যদিও আপনাদিগকে ভিক্ষু বলেন, তথাপি বিবাহ করেন ও ছেলেপিলে লইয়া সংসার করেন।

স্নান

ব্রাহ্মণদের অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা রকম স্নানের ব্যবস্থা আছে,—ভস্মস্নান, গোময়-স্নান, ঘৃতস্নান, দুগ্ধস্নান, দধিস্নান, অবগাহন স্নান, শিখামজ্জন স্নান, উষ্ণজলে স্নান, তোলাজলে স্নান। বৌদ্ধদের ভিতর এতরূপ স্নান ছিল না হিন্দুরাও যে এত রকম স্নান সর্ব্বদাই করিতেন, তা নয়, যজ্ঞে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে যজমানকে এরূপ স্নান করাইতেন, অভিষেকের পূর্ব্বে রাজাকে এরূপ স্নান করাইতেন, অন্য সময় অবগাহন স্নানই প্রায় করিতেন। না পারিলে মাথা ধুইয়া ফেলিতেন অথবা গা ধুইয়া ফেলিতেন। বিবাহের সময় বরকন্যাকে তোলাজলে স্নান করাইতেন। বৌদ্ধদের স্নান জলে জলেই হইত, ভস্মাদির স্নান সম্বন্ধে বড় শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের সময় তাঁহারা মন্ত্র পড়িতেন,—"যথা হি জাতমাত্রেণ স্নাপিতাঃ সর্ব্বতথাগতাঃ। তথাহং স্নাপয়িষ্যামি শুদ্ধং দিব্যেন বারিণা॥ ওঁ সর্ব্বতথাগতাভিষেকসময়শ্রিয়ে হূং হূং।"

মুখ ধোওয়া

ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ স্থানেই দাঁতন করিতেন। দাঁতনের কাঠি হয় আট আঙ্গুল, না হয় বার আঙ্গুল থাকিত। কিন্তু শ্রাদ্ধাদির সময় তাঁহারা দাঁতন করিতেন না, পাছে দাঁত দিয়া রক্ত পড়িয়া ক্ষতাশৌচ হয়। ক্ষতাশৌচ হইলে শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার থাকে না, সে জন্য শ্রাদ্ধের দিন ১২টা কুলকোচা করিয়া মুখ ধোওয়া ব্যবস্থা করা আছে। মাজনে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। অনেক জিনিষ দিয়া তাঁহারা মাজন তৈরী করিতেন। কিন্তু তর্জ্জনী অঙ্গুলী দিয়া দাঁত মাজা অত্যন্ত নিষেধ। মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়া দাঁত মাজাই খুব প্রশস্ত। কারণ, অঙ্গুলীর মধ্যে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা কমজোর। উহা দিয়া ঘষিলে দাঁতে চাড় লাগে না। তর্জ্জনী দিয়া ঘষিলে চাড় লাগে ও উহাতে বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। দাঁতন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা অনেক গাছ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সকল স্মৃতির পুস্তকেই কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে হয় এবং কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে নাই, তাহার লম্বা ফর্দ্দ আছে। যে কাঠ নরম, অনায়াসে চিবাইয়া তুলি করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। বেশী বয়সে দাঁত পড়িয়া গেলে দাঁতন ছেঁচিয়া দাঁত পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। যে সব গাছে কষ আছে, সেই গাছের ডালেই ভাল দাঁতন হয়, তাহাতে দাঁতের গোড়াও শক্ত হয়।

বৌদ্ধেরা দাঁতনী করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের দাঁতন প্রায়ই বার আঙ্গুল হইত। আট আঙ্গুল দাঁতন তাঁহারা বড় ব্যবহার করিতেন না। দাঁতন বার আঙ্গুল হইলে উহা দ্বারা জিব-ছোলারও কাজ করিতে পারা যায়। বৌদ্ধেরা ধাতুদ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। কাজেই তাঁহাদের ধাতুনির্ম্মিত জিবছোলা থাকিত না। সুতরাং তাঁহারা বার আঙ্গুল দাঁতনই পছন্দ করিতেন। আট আঙ্গুল দাঁতন দিয়া জিব ছুলিতে গেলে দাঁতে আঙ্গুল লাগিত এবং কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। মাজন দিয়া দাঁতন করিলে প্রায় দাঁতে পাথুরি হয়। মাড়ী ও দাঁতের মধ্যে একটা পাথরের মতন শক্ত জিনিষ জন্মিয়া মাড়ীকে আলগা করিয়া দেয়। সে জন্য মাজনটা সে কালে দন্তরোগ ব্যতিরেকে বৌদ্ধ

বা ব্রাহ্মণ, কেহই ব্যবহার করিতে চাহিতেন না। দাঁতন করিতে গেলে দাঁতনটী বার বার ধুইতে হইত। একবার মুখ হইতে বাহির করিলেই তাহা ধুইয়া আবার ব্যবহার করিতে হইত। ইৎসিংএর পুস্তকে আমরা পাই যে, চীনেরা আমাদের কাছ থেকে দাঁতন করা শিখিয়াছিল। কিন্তু আমরা এখন দাঁতন করাটা অসভ্যতা বলিয়া মনে করি। দাঁতন নিত্য নূতন হওয়ার কথা ছিল। না পাইলে একদিন কাটিয়া পাঁচ দিন ব্যবহারও চলিত।

মুখ ধোওয়ার সংস্কৃত নাম আচমন। আচমনে তিনবার জল মুখের মধ্যে দিতে হয়। তারপর দুইবার ওষ্ঠ ও অধর স্পর্শ করিতে হয়। তাহার পর চক্ষু কর্ণ নাসিকা স্পর্শ করিতে হয় অর্থাৎ ঐগুলি ধুইতে হয়। তত্ত্বকরগুপ্ত বলেন, দাঁতন করিবার সময় মন্ত্র পড়িতে হয়,—"ওঁ নমো রত্নত্রয়ায়, নমো হারিত্যৈ, মহাযক্ষিণ্যৈ, অয়ে পাযে ফুঃ স্বাহা।"

কাপড় কাচা ও তেলমাখা

ধোবা বা রজকে ব্রাহ্মণের কাপড় কাচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নিজ হাতে রোজই কাপড় ধুইয়া ফেলিতেন। ছেঁড়া কাপড় অথবা ময়লা কাপড় পরা তাঁহাদের নিষেধ ছিল। কয়দিন অন্তর তাঁহারা কাপড় ধোবাবাড়ী দিতেন, তাহা জানা যায় না। তবে রোজ কাপড় কাচায় তাঁহাদের কাপড় শীঘ্র ময়লা হইত না। বৌদ্ধেরা কিন্তু তাঁহাদের কাপড় ধোবাবাড়ী দিতেন, এ কথা শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের পর যে রোজ তাঁহারা কাপড় কাচিতেন, সেটা ঠিক। নিজের হাতে কাপড়খানি নিঙড়াইয়া শুকাইয়া লইতেন। ব্রাহ্মণেরা গামছা ব্যবহার করিতেন এবং তেলও মাখিতেন। বৌদ্ধেরা তেল মাখিতেন ও গামছা ব্যবহার করিতেন কি না, কোন পুস্তকে দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মণদের অভ্যঞ্জন অর্থাৎ স্নানের পূর্ব্বে মাখিবার অনেক জিনিষ ছিল। আমলকীবাটা তাহাদের মধ্যে একটা। তাঁহারা ঐ দ্রব্য একদিন তৈরী করিয়া দুই তিন দিন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অনেক ধর্ম্ম কর্ম্মের সময় তাঁহারা অভ্যঞ্জন স্নান করিতেন না। স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রীলোকেরা রুক্ষস্নান করিতেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠে পাইখানা থাকিত। পাইখানার ভিতর কুঁদসী-ভরা জল থাকিত ও একটা ছোট পাত্র (কুণ্ডি) থাকিত। পাইখানার ভিতর দেয়ালে একটা ডাণ্ডা গোঁজা থাকিত। ভিক্ষুরা সেইখানে কাপড় রাখিতেন। তাঁহারা সেখানে তিনটী মাটির গুলি লইয়া যাইতেন। কার্য্য শেষ হইলে দুইটী গুলির দ্বারা দুই বার শৌচ করিতেন। আর তৃতীয়টী দ্বারা বাঁ হাতটী ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া সেখানে একখানা ইটের উপর পনেরটী গুলি সাজান থাকিত। সাতটি দ্বারা সাতবার বাঁ হাত ধুইতেন আর সাতটী দ্বারা সাতবার দুই হাত ধুইতেন। অবশিষ্টটির দ্বারা জলপাত্র, বাহু, তলপেট এবং পা ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতেন। তত্ত্বকরগুপ্ত তাঁহার 'আদিকর্ম্মরচনায়' বলিয়াছেন,—

"রত্নত্রয়শরণগতানাং বৌদ্ধানাং প্রত্যূষমাদায় বর্চ্চোমূত্রকরণাদি যা যা শিক্ষোক্তা ভগবতা বিনয়াদিষু সামান্যেন সা সর্ব্বা উচ্যতে। তথা চ—

কুর্য্যাৎ কৃত্যাং গূঢ়াং প্রাতঃ বর্চ্চপ্রস্রাবকর্ম্মকম্ ।
ততোঽপি বহুভিশ্চৈব মৃত্তিঃ প্রক্ষালয়েৎ গুদম্ ॥
বামে পাণৌ ততঃ সপ্ত বিহিতা শুদ্ধয়ে মৃদঃ ।
উভয়োরপি সপ্তৈব পৃথক্ পৃথগবস্থিতাঃ ॥
ইতি হস্তাদি যত্নেন ক্ষালয়েৎ বহুনাম্বুনা ।
শারীপুত্রাদিয়ং শিক্ষা দুষ্কৃতাত্বন্যথা ভবেৎ ॥"

তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, শারীপুত্রের সময় হইতেই ইৎসিং ও ততকরগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত একই শিক্ষা চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুদের কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ। তাঁহাদের পাইখানার ব্যবস্থা ছিল না। নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সেখান হইতে তীর ছুঁড়িলে যেখানে গিয়া পড়ে, সেখানে তাঁহারা শৌচ করিতে যাইতেন। শৌচ কার্য্যটা জলের দ্বারা সাধিত হইত। তাঁহারা দুই হাতেই হাতমাটি করিতেন। কিন্তু যতক্ষণ তৈল ও গন্ধ দূর না হইত, ততক্ষণ হাতে মাটি করিতে ছাড়িতেন না। অন্ততঃ বারো বার হাতে মাটি করিতেন। এখনকার লোকের মতন মাটিতে বাঁহাত ঘষিয়াই কাজ সারিতেন না। স্মৃতিতে যদিও পাইখানার নাম পাওয়া যায় না, অশোক রাজার পাইখানা ছিল। তিনি সেখানেও রাজকার্য্য করিতেন। বল্লালসেনেরও পায়ুক্ষালন-মন্দির ও স্বেদাগার ছিল। প্রস্রাব করিয়া জল নেওয়া উভয় পক্ষেরই বিধি ছিল।

ব্রাহ্মণেরা ঘুম ভাঙ্গিলেই ঠাকুর, দেবতার নাম করিয়া উঠেন, অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন,—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।

বৌদ্ধেরা প্রাতঃকালে উঠিয়াই "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" ও এই সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গাথা পাঠ করেন।

দিনের কাজে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের যে ভেদ, তাহা দেখাইলাম। এখন উভয়ের সংস্কারগুলি দেখাইব। হিন্দুদের দশবিধ সংস্কার—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এখনকার নেপালী বৌদ্ধদের দুইটী মাত্র সংস্কার। একটী পাঁচ বছরে, তাহার নাম ভিক্ষু হওয়া। আর একটী ১৭ বৎসরে—তাহার নাম বজ্রাচার্য্য বা গুভাজু হওয়া। আমাদের সংস্কারের মানে যে, আমরা প্রথম যে কার্য্যটি করিব, সেটি মন্ত্রপূত করিয়া করিব। কোন সংস্কার করিতে হইলে গণপতি পূজন, গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা, অয়ুষ্য-মন্ত্র জপ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া, কুশণ্ডিকা বা বহ্নিস্থাপন করিতে হয়। সেই মন্ত্রপূত বহ্নিকে সাক্ষী করিয়া তাঁহারা প্রথম কার্য্যটী করিয়া থাকেন। গর্ভাধানও তাই, পুংসবনও তাই, সীমন্তোন্নয়নও তাই, বরাবরই তাই। কার্য্যটী যখন করি, তখন মন্ত্র পাঠ করি।

গর্ভাধানের অর্থ বলিয়া দিতে হইবে না। পুংসবনের অর্থ এই যে, সাত মাস গর্ভের সময়— যখন গর্ভস্থ শিশুর পুরুষ বা স্ত্রীচিহ্ন প্রকট হইবার সময় হয়, সেই সময় স্বামী গৌর্য্যাদি পূজা করিয়া, প্রাতঃকালে গ্রামের ঈশান কোণে যে বটগাছ থাকে, তাহারই ঈশান কোণে কোন শুঁয়ার ঠিক নীচে দুটী ফল ধরিয়াছে দেখিয়া, ফলশুদ্ধ সেই শুঁয়াটি কাটিয়া, মাটিতে না ছোঁয়াইয়া, সেইটী বাড়ীতে আনেন,—আনিয়া এমন উঁচু জায়গায় রাখিয়া দেন, যেন মাটি না স্পর্শ করিতে পারে। তাহার পর কোন কোন ভিঁয়াচ পোয়াতী আসিয়া সেটি বাঁটিয়া দিলে স্বামী, অগ্নির সমীপে স্ত্রীর পিছনে দাঁড়াইয়া, সেই বাটা বটের শুঁয়া প্রথমে তাহার ডান নাকে ও তৎপর তাহার বাঁ নাকে শোঁকান। 'সংস্কার, এই কাজ করিলেই পুত্রসন্তান হইবে। জাতকর্ম্মেও এইরূপ নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে বহ্নিস্থাপনান্ত সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। তাহার পর নাড়ীচ্ছেদ। কিন্তু ইহাতে প্রায়ই বিলম্ব হওয়া প্রযুক্ত নাড়ী মোটা হইয়া যায়, ছেদেও কষ্ট হয়—বালকেরও প্রাণনাশ হয়। তাই নাড়ীচ্ছেদের পর এ সব কার্য্য হয়। যখন ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্রী ছিলেন, অর্থাৎ বাড়ীতে অগ্নিশালা থাকিত এবং সেখানে গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়, এই তিন প্রকার আগুন থাকিত, তখন এ সকল দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া বহ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত তাঁহাদের করাই থাকিত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বাঁশের চেঁচাড়ী মন্ত্রপূত করিয়া, সেই অগ্নিতে তাতাইয়া অবিলম্বেই নাড়ীচ্ছেদ করা হইত। যতদিন ব্রাহ্মণেরা সাগ্নিক ছিলেন অর্থাৎ এক অগ্নি রক্ষা করিতেন, তাঁহাদেরও এ দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। এ সকল দুর্ভোগ শুধু নিরগ্নিক হইয়াছি বলিয়াই ভুগিতে হয়। নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণও ঠিক ঐরূপ সংস্কার। বহ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত করিয়া, সেই বহ্নির সম্মুখে বসিয়া, মন্ত্র পড়িয়া করিতে হয়। এক উপনয়নের মধ্যে আমরা চারিটা সংস্কার সারিয়া লই। উপনয়ন মানে ছেলেকে গুরুর কাছে লইয়া যাওয়া। গুরু তাহাকে প্রথমে সাবিত্রী উপদেশ দেন—দিন কতক পরে তাহার বেদারম্ভ হয়। বহুকাল পরে তাহার বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে তাহার সমাবর্ত্তন হয় অর্থাৎ সে আবার ঘরে ফিরিয়া আসে। আমরা কিন্তু এই চারিটি সংস্কারকেই এক উপনয়ন নাম দিয়া ঘণ্টা দুএকের মধ্যে সারিয়া দিই। বিবাহও এইরূপই সংস্কার। বিবাহ শব্দের আসল মানে—বৌটীকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে বহিয়া লইয়া যাওয়া। কন্যাদান, স্ত্রী আচার, কুশণ্ডিকা, লাজাহোম, অরুন্ধতী দর্শন—এ সকলগুলিই বিবাহটীকে সংস্কার করিবার জন্য, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য। নেপালী বৌদ্ধদের মধ্যে এত সব সংস্কার কিছুই নাই। উহাদের একটা সংস্কার আছে গর্ভপরিহার, অর্থাৎ সুপ্রসব হইবে, তাহার জন্য প্রার্থনা। তাহার পর ছেলে ৫।৬ বৎসরের হইলে, সে যে বিহারের ছেলে, সেই বিহারের যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে বড় ভিক্ষু, তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে হয়। সে বলে, আমি ভিক্ষু হইব। বুড়াটী বলেন, তুমি হইও না, বড় কষ্ট করিতে হয়—বড় বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, তুমি ও কাজ পারিবে না, তুমি ছেলে মানুষ। সে বলে, আমি নিশ্চয়ই করিব, নিশ্চয়ই পারিব, আমি শাক্যপুত্র—আমি পারিব না কেন? বুড়াটী তখন একখানি রূপার ক্ষুর বাহির করিয়া, তাহার মাথাটি মুড়াইয়া দেন, আপনার কাছে

রাখেন ও হবিষ্য খাওয়ান। পাঁচ সাত দিন হবিষ্য খাইবার পর সে বলে,—মহাশয়, আমি আর পারি না, আমি মার কাছে যাব। বুড়া তাহাকে আবার বুঝান, তোমার যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু সে কিছুতেই মানে না। তখন তাহাকে একটু মদ ও শূকরের মাংস খাওয়াইয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখান থেকেই সে ভিক্ষু হয়, ঠাকুর-ঘরে যেতে পারে, ঠাকুর ছুঁতে পারে, পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাইতে পারে ও পূজার আয়োজন করিয়া দিতে পারে। ইহার পর তাহার আর এক সংস্কার আছে—সেটা সতের বছরের সময়। যদি সে সতর বছরের মধ্যে একেবারে স্ত্রী-সংসর্গ না করে, তাহা হইলে তাহাকে আবার মাথা মুড়াইয়া কতগুলি মন্ত্র পড়িতে হয়, তাহা হইলে সে বজ্রাচার্য্য বা গুভাজু হয়। সে তখন ঠাকুর-ঘরে পূজার অধিকারী হয়, তাহার পাঁচটী অভিষেক হয়,—মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক, পট্টাভিষেক। তখন সে পূরা বজ্রাচার্য্য হয় এবং সকল প্রকার ধর্ম্মকার্য্যেই তাহার অধিকার হয়। কিন্তু যদি সতের বছরের আগে স্ত্রীসংসর্গ করে, তাহা হইলে সে কখনও বজ্রাচার্য্য হইতে পারে না, তাহার বংশও ভিক্ষু থাকিয়া যায়। উহাদের বিবাহ সংস্কার নহে। বিবাহ মানে শক্তিগ্রহণ অর্থাৎ যোগমার্গে ও জ্ঞানমার্গে যাইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা। মোটামুটি ভিক্ষুদের বিবাহ আগে একটা গাছের সঙ্গে হয় অথবা ফলের সঙ্গে হয়। তাহার পর সে যাহাকে শক্তি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারই সঙ্গে থাকে, স্ত্রীপুরুষের ন্যায় থাকে; ছেলেপুলে হয়, গৃহস্থালী করে। দুই প্রকার বিবাহের বা শক্তি-গ্রহণের প্রণালী আমি পাইয়াছি,—একটী ত ভদ্রসমাজে প্রকাশ করিবার মত নহে। বৌদ্ধেরা কিন্তু বলে—এ সব কেতাবী কথা, কাজের নয়; আমাদের আসল শক্তিগ্রহণ ওরূপ নয়।

এই ত গেল নেপালী ভিক্ষুদের কথা—ইহারা সব গৃহস্থ হইয়া গিয়াছে, একটীও আসল সন্ন্যাসী নাই। শেষ আসল ভিক্ষু একশত বৎসরের উপর হইল মরিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পর সবই এক হইয়া গিয়াছে। ভিক্ষুর ছেলে ভিক্ষু হয়—বজ্রাচার্য্যের ছেলে বজ্রাচার্য্য হয়, কিন্তু বৌদ্ধদের আসল বজ্রাচার্য্য অনেক উচ্চে। যে কেহ বৌদ্ধ হইবে,—গৃহস্থই হউক, ভিক্ষুই হউক, তাহাকে প্রথম পঞ্চ শীল গ্রহণ করিতে হইত। আমি প্রাণিহিংসা করিব না, না দিলে পরের জিনিষ লইব না, ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডন করিব না, মিথ্যাকথা বলিব না, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করিব না। যাহারা এই সকল শীল গ্রহণ করিয়া অভ্যস্ত হইয়া যাইত, তাহাদিগকে আরও তিনটী শীল দেওয়া হইত,—কটুবাক্য বলিব না, গান বাজনা করিব না, স্রক্‌চন্দনাদি ব্যবহার করিব না। গৃহস্থেরা কিন্তু ইহার অধিক শীল লইতে পারিবে না। ইহার অধিক আর দুইটী শীল শুধু ভিক্ষুদের জন্য—একটী উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ ও একটী রজতকাঞ্চন ত্যাগ, স্থবিরবাদে অর্থাৎ দক্ষিণী বৌদ্ধদের শেষ ও চরম; কিন্তু উত্তর দেশের বৌদ্ধদের ইহার উপরও কিছু আছে। তাঁহারা শীলকে সম্বল বলেন—এই দশটা শীল তাঁহারা অষ্ট সম্বল করিয়া তুলিয়াছেন; নবম সম্বলের নাম বোধিসত্ত্বসম্বল।

তত্তকরগুপ্ত রত্নত্রয় শরণের কথা বলিয়া বলিতেছেন,—"অনেনৈব রত্নত্রয়শরণেন বৌদ্ধ ইতি গীয়তে। ইদঞ্চৈতৎ রত্নত্রয়শরণং বৌদ্ধদর্শনস্য উপাসকাদিসর্ব্বসম্বলানাং বীজভূতম্। সম্বলা-

শৈক্ষতানি (?) কতিসংখ্যাস্তে সম্বরা উচ্যন্তে বিস্তারায়াম্‌। উপাসকাদিপোষধান্তা অষ্টৌ। বোধিসত্ত্বমহাযানে পূর্ব্বোক্তা এব অষ্টৌ বোধিসত্ত্বসম্বলো নবমঃ অগ্রনয়মহাযানে পূর্ব্বোক্তা এবং নব বজ্রব্রতসম্বরো দশমঃ তত্র উপাসক উপাসিকা শ্রামণের ভিক্ষু শ্রামণেরী শিক্ষমাণা ভিক্ষুণী ত্রিসম্বানাং স্ত্রীপুরুষাশ্রয়ভেদাৎ সপ্তসম্বরাঃ।”

তাহা হইলে বুঝা গেল, হীনযানী বৌদ্ধ অপেক্ষা মহাযানীদের আরও দুইটা সম্বল আছে। একটা বোধিসত্ত্বসম্বল, আর একটা বজ্রব্রতসম্বল। "বোধিসত্ত্বসম্বল" বলিতে গেলে নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিব, এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বজ্রব্রতসম্বল অর্থাৎ আমি শূন্য হইয়া গিয়াছি, এই ধারণা। বজ্র বলিতে গেলে শূন্যতাকেই বুঝায়।

বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সংস্কারের কথা সব বলা হইল। এখন উহাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা উহাকে ইষ্টি বলিতেন। অগ্নিত্রয়সাধ্য যাগের নাম ইষ্টি। সাগ্নিকেরাও ইষ্টি করিতেন, কিন্তু তাঁহারা একাগ্নিতেই কার্য্য করিতেন। আমাদের এখন বহ্নি স্থাপন করিয়া, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া দাহ করিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শবদাহ না হয়, ততক্ষণ সেই শব আত্মীয় স্বজন ভিন্ন কেহ স্পর্শ করিতে পারে না, অন্ততঃ আপনার জাতির লোক ভিন্ন অন্য কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। শব স্পর্শ করিলেই অশৌচ হয়, যাহারা দহন বহন করে, তাহাদেরও অশৌচ হয়। চুল্লীটী ভাল করিয়া পরিষ্কার করা, যাহারা শবদাহ করে, তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। যদি একখানি কয়লা চুল্লীতে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের প্রত্যবায় হয়। সাধারণ লোকের সংস্কার, চুল্লীটি পরিষ্কার করিলে আর জন্মে লোকটা ফর্সা হয়, আর যদি একখানিও কয়লা পড়িয়া থাকে, তবে তাহার গায়ে তিল হয়। চুল্লী অপরিষ্কার রাখিলে সে লোকটা কাল হয়। দাহকারীদের আর একটা প্রধান কর্ত্তব্য, শবের যে অংশ পোড়ে না, সে অংশ গভীর জলে ফেলিয়া দেওয়া ও অস্থি সঞ্চয় করিয়া দূর জলে ফেলিয়া দেওয়া।

আমরা শবকে অশুচি মনে করি, অস্থিকেও অশুচি মনে করি। তাই হাড় ছুঁইলেই আমাদের স্নান করিতে হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু সেরূপ করেন না। শুধু হাড় নয়—আমরা নখ, চুল কাটা হইয়া গেলে তাহাকে অস্পৃশ্য মনে করি—তাহা ছুঁইলেও আমাদের অশৌচ হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু এই নখ, চুল ও হাড়কে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন, তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য পাথরের বাক্স বা কৌটায় পুরিয়া রাখেন এবং তাহার উপরে বড় বড় স্তূপ নির্ম্মাণ করেন, স্তূপের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করেন, স্তূপের পূজা করেন, স্তূপের চারিদিকে দিঙ্‌মালা দেন। এই জায়গায় বৌদ্ধ হিন্দুতে বড়ই তফাৎ। বৌদ্ধদের শব অনেক সময় ফেলিয়া দেয়, অনেক সময়ে শ্মশান-রক্ষকের নিকট পোড়াইবার জন্য কিছু পয়সা দিয়া আসে। কিন্তু বড়লোক মরিলে খুব জাঁক করিয়া, সে দেহ তৈলদ্রোণীতে পুরিয়া দাহ করে এবং হাড়গুলি পুঁতিয়া, তাঁহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করে। বুদ্ধদেবের হাড়গুলি প্রথম আট ভাগ হইয়া যায় ও আট জায়গায় স্তূপ হয়। রাজা অশোক তাহাদের মধ্যে সাতটির 'সলিলনিধান' উঠাইয়া, তাহার চৌরাশী হাজার ভাগ করেন এবং তাহার উপর চৌরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। নেপালে এখনও অনেকগুলি স্তূপ অশোক-

স্তূপ বলিয়া পরিচিত। সাহেবেরা বলেন,—ওগুলিকে অশোকের বলিতে দ্বিধা করা উচিত নয়। কারণ, উহাদের পরিমাণ অশোক-স্তূপের মত ও উহাদের মাল-মসলাও অশোক-স্তূপের মত। তাহার পর শ্রাদ্ধ। অগ্নিহোত্রীরা পিতৃপিণ্ড নামে যজ্ঞ করিতেন। উহা অগ্নিত্রয়সাধ্য। সাগ্নিক ও নিরগ্নিকেরা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ মানে—মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ন, বস্ত্র ও পিণ্ডদান। ইহা সমস্তই বেদমন্ত্রে হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ নানা রকম আছে—প্রেতশ্রাদ্ধ, মাসিক শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, অমাবস্যা শ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। ভূতের ভয়ে অনেকরূপ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সে শ্রাদ্ধ যে কেহ করিতে পারে—তাহার অধিকারী, অনধিকারী নাই। ইহার মধ্যে প্রধান ত্রিপিণ্ড শ্রাদ্ধ। যব, মাষ ও তিল,—এই তিনের ত্রিপিণ্ড করিতে হয়। ভত্তকরগুপ্তের মতে বৌদ্ধেরাও নানারূপ শ্রাদ্ধ করে। তিনি বলেন, ভগবান্ গৃহস্থাশ্রমীদের জন্য শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব তাহার বিধি বলিতেছি। নিত্যশ্রাদ্ধের সময় বলিতে হয়। "বোধিসত্ত্বচর্য্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধেরা যেমন পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব—"ওঁ অদ্য অমুক মাসে, অমুক তিথিতে অমুক গোত্রে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, তাঁহাদের পত্নীদের ও অতিথিদের জন্য বজ্রতণ্ডুল হইতে উৎপন্ন সব্রত অন্ন আঃ হুং স্বাহা," এইটী তিনবার পাঠ করিয়া দিবেন। তাহার পর সেই বুদ্ধেরা যেমন সকল পুণ্য কর্ম্মের পরিণামস্বরূপ সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব। আমার এই পুণ্য মোক্ষের হেতু হইবে। পার্ব্বণশ্রাদ্ধ ও অপরপক্ষের শ্রাদ্ধেও এই বিধান। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে যাহার শ্রাদ্ধ, কেবল তাহারই নাম গোত্র উচ্চারণ করিবে, আর সকলই পূর্ব্বের মত। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধও এইরূপে করা যায়। কোথায় হাঁটু পাতিতে হইবে, কোথায় হাত মুখ রাখিতে হইবে, কোথায় তিল কুশ গ্রহণ করিতে হইবে—এই সব নিজেই বিচার করিয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণভোজন ও সঙ্ঘভোজন

ব্রাহ্মণেরা ছোঁয়া লেপাটা বড়ই দোষ মনে করেন। পৈতা হওয়ার দিন হইতে ব্রাহ্মণের ছেলেরা ব্রাহ্মণ হয়। সেই দিন থেকে তাহারা কাহারও এঁটো খায় না এবং কেউ ছুঁলেও খায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণভোজনে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন দিতে হয় ও মাঝখানে একটু ফাঁকও রাখিতে হয়। জলপাত্র ডান দিকে দিতে হয়। যাতে ছোঁয়া লেপা না হয়, সে জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ইৎসিং বলেন, সে কালে ভারতবর্ষে সঙ্ঘভোজনেও এরূপ করা হইত। সাত ইঞ্চি উঁচু পিঁড়ীর উপর বসিয়া, উঁবু হইয়া (আসনপীঁড়ি হইয়া বসা দোষ) বসিয়া তাঁহারা খাইতেন। দুখানা পিঁড়ীর মধ্যে, অন্ততঃ এক ফুট জায়গা খালি থাকিত। ব্রাহ্মণভোজনে সকলের পাতে পরিবেষণ না হইলে ব্রাহ্মণেরা খাইতে পারিতেন না। এবং খাইতে বসিয়া মাঝে কেউ উঠিয়া যাইতেন না। কিন্তু সঙ্ঘের লোকেরা যাঁর পাতে যখন পরিবেষণ হইত, অমনি খাইতে পারিতেন, অন্য লোকের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। ব্রাহ্মণেরা খাইতে বসিয়া জল খাইতে হইলে

ঘটী বাঁ হাতে ধরিয়া আল্‌গোছে জল খান, অথবা ডান হাতে ধরিয়া চুমুক দিয়া খান। বৌদ্ধেরা বাঁ হাতে চুমুক দিয়া জল খাইতেন। ইৎসিং বলেন, তিনি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, সমস্তই বুদ্ধদেবের বহি হইতে বলিতেছেন। তা'হলে সঙ্ঘভোজনেও ব্রাহ্মণদের মত এত ছোঁয়া লেপা ছিল না। কিন্তু আমি ১৮৯৮ সালে এক সম্যক্ সম্ভোজনে উপস্থিত ছিলাম। নেপালের সমস্ত বিহারে যত সঙ্ঘ ছিল, সব সেখানে উপস্থিত ছিল—প্রায় ১৩ হাজার ভিক্ষু একত্র খাইতেছিলেন। তাঁহাদের কিন্তু সব ছোঁয়া লেপা। সারি সারি চাদর বিছাইয়া বসিয়াছেন। একের চাদরের উপর আর একজনের চাদর পড়িয়াছে। যত বড় মানুষের সারি, চাদরও তত বড়। চাদরে যা পড়িতেছে, খাওয়ার হইলে ভিক্ষুরা তাহা তখনই খাইতেছেন, ভাত, ব্যঞ্জন, লুচি, পরটা, মুলো সিদ্ধ, ডাল—সব সেখানে বসিয়াই খাইতেছেন,—কড়ি, পয়সা, চাল, সুপারি, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি যাহা বসিয়া খাবার জিনিষ নয়, সেগুলি পাতে রহিতেছে,—যাবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইবেন। তাহা হইলে আর ছোঁয়া লেপার বাকি কি রহিল? আমাদের দেশে পালি পার্ব্বণে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছি - ভিখারী বৈষ্ণবেরা ওরূপ করিয়া চাদর বিছাইয়া বসে, তাহাদের কিন্তু রান্না খাবার কেউ দেয় না; দেয়—চাল, ডাল, কড়ি, পয়সা, ফল। ইহাদিগকে যেমন সকলেই কিছু কিছু দেয়, সম্যক্ সম্ভোজনে কিন্তু ঠিক সেরূপ নহে। দানপতি (আমরা ইহাঁকে কৃতী বলি) সকলকেই পরিতোষ করিয়া দিবেন, একজনকেও ফাঁক্ রাখিতে পারিবেন না। অন্যান্য বৌদ্ধেরা—তাঁহারা গৃহস্থই হউন, ভিক্ষুই হউন বা গুভাজুই হউন, সকলেই দান করিবার জন্য কিছু কিছু লইয়া আসিবেন। একজনে হয় ত এক মণ চাউল লইয়া আসিয়াছেন; তাহাতে যত জনকে দেওয়া হয়, দেওয়া হইল। তার পর তিনি চলিয়া গেলেন। একজন হয় ত সুপারি লইয়া আসিয়াছেন। পাঁচ হাজারটী সুপারি পাঁচ হাজার লোককে দিলেন। বাকি ৭ হাজারকে দিতে পারিলেন না—তিনি চলিয়া গেলেন। সম্যক্ সম্ভোজনের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক একজন লোক কি পাইল? তিনি বলিলেন, রান্না জিনিষ ত তাহারা খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর নগদে ও জিনিষে প্রত্যেকে সাড়ে দশ আনা করিয়া পাইয়াছে।

আমি এ পর্য্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধদের যে তুলনামূলক সমালোচনা করিলাম, ইহার উদ্দেশ্য, এ দুয়ে কতটুকু তফাৎ, তাহার কিছু সন্ধান দেওয়া। পূর্ণ সমালোচনা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কারণ, আচার-ব্যবহার সব দেশে সমান নয়—এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে কত জায়গায় যে কত বদল হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। হিন্দু বলিতে গেলেও অসংখ্য জাতি, অসংখ্য ধর্ম্ম বুঝায়। বৌদ্ধ বলিতে গেলেও তাই। তবে মোটামুটি কথা এই, বৌদ্ধেরা গুরু মানে, গুরুকে দেবতার চেয়ে বড় ব'লে মানে, গুরুপদ পরমপদ ব'লে মনে করে। গুরুকে তন মন-ধন কিছুই দিতে দ্বিধা করে না, আর সম্পূর্ণরূপে গুরুর মত হইতে চায়, গুরুই শূন্য, গুরুই পরমার্থ। শূন্য যেমন শূন্যে মিশাইয়া যায়, গুরুও তেমনি শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছেন। আমরাও তেমনি গুরুতে—শূন্যে মিশাইয়া যাইব। এরূপ মত—আমরা এখন যাঁহাদিগকে হিন্দু বলি, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক আছে।

তত্তকরগুপ্ত বলিয়াছেন,—"গুরুর্বুদ্ধো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুঃ সংঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। স্বয়ং তথাগতৈর্যস্মাৎ গুরুরেবাত্র কারণম্॥ সংবুদ্ধেভ্যো যথা দত্তে ফলং তথা। তেনৈব সূত্রতন্ত্রেষু গুরুপূজা প্রকাশ্যতে। প্রদত্তে পুনরন্যেভ্যঃ ফলং পাত্রানুরূপকম্। বিনয়েষ্বপি সূত্রেষু তন্ত্রেষ্বপি জগৌ মুনিঃ॥"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা*

(১) কোষবিজ্ঞান (Cytology)

Achromatic spindle, Achromatic figure—ভাজনতুরী, তুরীমণ্ডল, তুর্য্যাবস্থা।
Achromatin, linin—ধারণ পদার্থ।
Acrosome—মুকুট।
Amitosis—সরল ভাজন।
Amphiaster, diaster—দ্বিতারকাবস্থা।
Amphinucleolus—মিশ্রগুলিকা, মিশ্রবিন্দু।
Anaphase—তন্তুচলনাবস্থা।
Archoplasm—তুরীতন্তু পদার্থ
Aster—অংশুখণ্ড, অংশুমণ্ডল।
Bivalent chromosome—যুগ্মজ রঞ্জনতন্তু।
Bud variation—মৌকুর ভাবান্তর।
Cell—কোষ।
Cell membrane, cell wall—কোষাবরণ।
Central fusion nucleus—মধ্যস্থ মিলিত কোষসার।
Central spindle fibres—মধ্য তুরীতন্তু।
Centriole—আকর্ষণ কেন্দ্র।
Centrosome—আকর্ষণ গোলক।
Centrosphere, attraction sphere—আকর্ষণীবেষ্ট।
Chondriccont, plastocont—দৃঢ় তন্তু।
Chondriomite দৃঢ় মালিকা।
Chondriosome, plastosome—দৃঢ়বস্তু।
Chromatin—রঞ্জনবস্তু।
Chromidia—রঞ্জন কণিকা, সার কণিকা।
Chromidiogamy—কণিকাসঙ্গম।
Chromomere—তন্তুপর্ব্ব।
Chromosome—রঞ্জনতন্তু।
Cytaster—ভেদন কেন্দ্র।
Cytoplasm—কোষবস্তু।
Daughter plate—ভেদজ পট্ট।
Diarinesis—ভিন্নতন্ত্ববস্থা।
Diplotene stage—দ্বিতন্ত্ববস্থা।
Equatorial plate—বিদার পট্ট।
Gametogenesis—জনন-কোষোৎপাদন।
Germinal vesicle—ডিম্বকোষসার।
Idiochromatin—জননরঞ্জনবস্তু।
Idioplasm—কুলবহ বস্তু, তেজঃ বস্তু।
Idiosome—স্বতন্ত্র গুলিকা।
Karyogamy—কোষসার সঙ্গম।
Karyolymph—সাররস।
Karyomere—সারখণ্ড।
Karyosome—রঞ্জন পিণ্ড, রঞ্জন গুলিকা।
Kinetonucleus—চালন কোষসার।
Leptotene stage—সূক্ষ্মতন্ত্ববস্থা।
Macrogomete—ডিম্বকোষ।
Macronucleus—বৃহৎ কোষসার।
Mantle fibres—আকর্ষণ তন্তু।
Meiosis—সংখ্যার্দ্ধীভবন।
Metaphase—তন্তুভেদাবস্থা।
Metaplastic bodies—জাতবস্তু।
Microgamete, spermatozoon—শুক্রকোষ, পুংবীজাণু।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিংশ বার্ষিক দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

Micronucleus—অণুকোষসার।

Mitochondria, Plastachrondria—সূত্রকণা।

Mitosis, Karyokinesis—জটিল কোষভেদ, জটিল কোষভাজন।

Monaster—এক তারকাবস্থা।

Multipolar mitosis—বহুমেরুক কোষভাজন।

Nuclear membrane—কোষসারাবরণ।

Nucleolus—সারচিহ্ন, সারগুলিকা।

Oogonia—আদ্যডিম্বকোষ।

Nucleus—কোষসার।

Oocyte—আর্ত্তবকোষ। Ovum, macrogamete—ডিম্বকোষ।

Pachytene stage,—স্থূলতন্ত্বস্থা।

Parasynclesis, parasynapsis—পার্শ্বমিলন।

Parthenogenesis—অসঙ্গমোৎপত্তি।

Plasmosome—রসগুলিকা।

Plastin—যোজন বস্তু।

Plastochondria = mitochondria.

Plastocont = chondriocont.'

Plastosome = chondriosome.

Polar body—মেরুকণা।

Prochromosome—আদ্যতন্তু।

Pronucleus—পুরঃকোষসার।

Prophase—তন্তুগঠনাবস্থা।

Protoplasm—জীববস্তু।

Segregation—পৃথগ্‌ভবন।

Spermatid—আদ্যশুক্র-কোষ।

Spermatocyte—শুক্রকোষ।

Spermatogonium—আদ্যজননশুক্রকোষ।

Spindle fibres তুরীতন্তু।

Spireme—তন্তুজাল।

Strepsitene stage—জড়িততন্ত্বস্থা।

Structure, reticular—জাল গঠন।

" fibrillar তন্তুময় গঠন।

" granular—কণাময় গঠন।

" alveolar—কোষ্ঠময় গঠন।

Syndesis—ক্ষণিক বা সাময়িক মিলন।

Syngamy—সঙ্গম।

Synizesis—রঞ্জনসঙ্কোচ, একত্রীভবন।

Telophase—পুনর্গঠনাবস্থা।

Trophochromatin পোষণ রঞ্জনবস্তু।

Trophonucleus—পোষণ কোষসার।

Zygotene stage—তন্তুমিলনাবস্থা।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

—o—

হিন্দু রাজনীতি-শাস্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান ও গুরুত্ব*

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক নিবন্ধ-লেখকগণ পরস্পর সন্নিহিত কতকগুলি রাজ্যের সমষ্টিকে মণ্ডল নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত মণ্ডলের স্বরূপ ও গুরুত্বের বিষয় আলোচনা করিয়া, প্রসঙ্গক্রমে প্রচলিত কয়েকটী মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিব। পুরাণ, মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে মণ্ডলের বিবরণ থাকিলেও তাহা এতই সংক্ষিপ্ত যে, তদ্দ্বারা এত দিন উহার প্রকৃত গুরুত্ব বুঝা যাইত না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রকাশের পর এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, এই মণ্ডলের কল্পনা প্রাচীন যুগের রাজা ও রাজনৈতিকগণের পক্ষে কত দূর উপকারী হইয়াছিল।

প্রত্যেক রাজ্যেরই পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সহিত মৈত্রী বা শত্রুতা, কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা স্বাভাবিক। সান্নিধ্যবশতঃ নানা কারণে রাজ্যগুলির একটিকে অপরটির সম্পর্কে আসিতে হয় এবং অবস্থা বুঝিয়া বিভিন্ন রাজ্য সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ নীতির আশ্রয় লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। কি অবস্থায় কোন্ রাজ্য সম্বন্ধে কিরূপ নীতি অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা বিচার করিবার সুবিধার জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু রাজনীতিবিশারদগণ মণ্ডলের কল্পনা করিয়াছেন।

মণ্ডলের উদ্দেশ্য।

তাঁহারা অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছিলেন, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে যে সকল রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা সমাধানের জন্য সাধারণতঃ ১২টী রাজ্যের কথা চিন্তা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। এই জন্য প্রচলিত মতে নিকটবর্তী ১২টী রাজ্যের সমষ্টিকে একটী মণ্ডল বলিয়া গণ্য করা হয়। এই স্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে, মণ্ডল একটি কল্পিত বস্তু মাত্র। অবস্থার বৈচিত্র্য অনুসারে বার অপেক্ষা ন্যূন বা অধিকসংখ্যক রাজ্য লইয়াও মণ্ডল সৃষ্ট হইতে পারিত। এই জন্যই কামন্দকীয় নীতিসারে (৮, ২০-২৮) এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অর্থশাস্ত্রকর্তারা মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির সংস্থান অনুসারে এক একটি নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুবিধার জন্য একজন রাজাকে কেন্দ্রস্বরূপ ধরিয়া লইয়া, তাহার নামকরণ করা হইয়াছে 'বিজিগীষু'। এই বিজিগীষুর সম্মুখ দিকে অবস্থিত পর পর পাঁচজন রাজার নাম 'অরি', 'মিত্র', 'অরিমিত্র', 'মিত্রমিত্র' ও 'মিত্রারিমিত্র' এবং পশ্চাৎদিকে অবস্থিত চারিজন রাজার নাম যথাক্রমে 'পার্ষ্ণিগ্রাহ', 'আক্রন্দ', 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসার' ও 'আক্রন্দাসার'। ইহা ছাড়া 'বিজিগীষু'র পার্শ্ববর্তী আরও দুইজন বলবান্ রাজাকে যথাক্রমে 'মধ্যম' ও 'উদাসীন' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। সর্ব্বসমেত এই বারজন রাজার রাজ্য লইয়া একটি মণ্ডল পরিকল্পিত হইয়াছে।

মণ্ডল কল্পনা।

---

* রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

'বিজিগীষু' এই নামটির ব্যুৎপত্তির দিকে অত্যধিক দৃষ্টি রাখিলে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার সুবিধা হয় না। যে রাজা যুদ্ধে 'জয় ইচ্ছা করেন', তিনিই 'বিজিগীষু'—এইরূপ ভাবিলে নিতান্ত ভুল করা হইবে। প্রকৃতপক্ষে যে রাজাকে কেন্দ্র করিয়া মণ্ডলের কল্পনা করা হয়, রাজনীতিশাস্ত্রে তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিজিগীষু'। এইরূপ না হইলে যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আর মণ্ডলের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইত না; অথচ শাস্ত্রে দেখা যায়, শান্তির সময়েও মণ্ডলের শক্তি বিচার করিয়া কার্য্য করাইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ দুইটী অব্যবহিত প্রদেশের অধিপতির মধ্যে নানা কারণে প্রায়ই বাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে। এই হেতু অব্যবহিত সান্নিধ্যকেই একের প্রতি অন্যের শত্রুতার কারণরূপে ধরিয়া লইয়া, বিজিগীষুর ঠিক পরবর্ত্তী রাজাকে 'অরি' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই নিয়মে 'অরির' পরবর্ত্তী রাজা সান্নিধ্যহেতু তাহার অরি হওয়ার কথা, সুতরাং তাহাকে বিজিগীষুর 'মিত্র' বলা হয়। এইরূপে মিত্রের পরবর্ত্তী রাজা 'অরিমিত্র', তৎপরবর্ত্তী 'মিত্রমিত্র' এবং তাহার পরে 'মিত্রারি-মিত্রের' স্থান কল্পিত হইয়া থাকে। এই পাঁচজন রাজার রাজ্য বিজিগীষুর সম্মুখভাগে অবস্থিত। পশ্চাৎদিকেও চারিটী রাজ্যের স্থান ধরিয়া লওয়া হয়। প্রথম রাজা 'বিজিগীষু'র সন্নিহিত, সুতরাং শত্রু; কিন্তু সম্মুখে অবস্থিত অরির সহিত পার্থক্য রাখিবার জন্য ইহার নাম করা হইয়াছে 'পার্ষ্ণিগ্রাহ'। পার্ষ্ণি অর্থাৎ পশ্চাৎদিক্ হইতে আক্রমণ করার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই ইহার এইরূপ নাম। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পার্ষ্ণি-গ্রাহের পরবর্ত্তী রাজা অবশ্যই তাহার শত্রু, সুতরাং 'বিজিগীষু'র মিত্র। পার্ষ্ণিগ্রাহের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিজিগীষু ইহাকে 'আক্রন্দন' অর্থাৎ আহ্বান করেন, অতএব ইহার নাম 'আক্রন্দ'। ইহার পরবর্ত্তী রাজা পার্ষ্ণিগ্রাহের মিত্র এবং তৎপরবর্ত্তী আক্রন্দের মিত্র। ইহারা বিপদের সময় নিজ নিজ বন্ধুর প্রতি 'আসার' অর্থাৎ সাহায্য প্রদানের জন্য দ্রুত গমন করে বলিয়া ইহাদের নাম যথাক্রমে 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসার' এবং 'আক্রন্দাসার'। এই সকল স্থলে সমীপবর্ত্তিতাকেই শত্রুতার কারণ ধরিয়া, অব্যবহিত প্রদেশের অধিপতিকে অরি এবং তৎপরবর্ত্তীকে মিত্র স্থির করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা স্বাভাবিক হইলেও অব্যভিচারী নিয়ম নহে। সোমদেব সূরি তাঁহার নীতিবাক্যামৃতে ষাড়্‌গুণ্যসমুদ্দেশ প্রকরণে বলিয়াছেন,—"কার্য্যং হি মিত্রত্বামিত্রত্বয়োঃ কারণং, ন পুনর্বিপ্রকর্ষসন্নিকর্ষৌ।" অনেক সময়ে কার্য্যনিবন্ধন শত্রুতা বা মিত্রতা জন্মে। দূরত্ব বা সান্নিধ্য উহার কারণ হইতে পারে না। কৌটিল্যের মতানুসারেও সান্নিধ্য ব্যতীত অন্য কারণে শত্রুতা জন্মিতে পারে (৭ অধিকরণ)। কামন্দকীয় নীতিসারেও (৮, ১৪) একই বস্তু প্রাপ্তির জন্য আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে পরস্পরের শত্রু বলা হইয়াছে। সুতরাং সকল সময়ে সান্নিধ্যই শত্রুতার কারণ হয় না। এই স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বিজিগীষুর সম্মুখভাগ বা পশ্চাদ্ভাগ একটা কল্পনা মাত্র। ইহা দ্বারা এই মাত্র বুঝা যায় যে,—যে দিকে অরির অবস্থিতিস্থান থাকিবে, সেইটাকেই সম্মুখ বলিয়া ধরিতে হইবে, এবং তাহার বিপরীত দিক্ হইবে পশ্চাদ্ভাগ।

'অরি', 'বিজিগীষু' প্রভৃতির স্থান ও নাম নির্দ্দেশ।

এখন মণ্ডলের মধ্যে 'অরি' ও 'বিজিগীষু' এই দুইজন প্রধান প্রতিপক্ষ এবং তাহাদের প্রত্যেকের চারিজন করিয়া সহায়, এই দশজন রাজার পরিচয় পাওয়া গেল। অবশিষ্ট দুই জন—'মধ্যম' ও 'উদাসীন' ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত। ইহাদের সম্বন্ধে বড় একটা ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া আসিতেছে। এই নাম দুইটি এমন ভ্রান্তিজনক যে, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থেও ইহাদের ঠিক স্বরূপ নির্ণীত হয় নাই। তাঁহারা 'মধ্যম'কে বিবাদের মীমাংসাকারী মধ্যস্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং "উদাসীন"কে নিরপেক্ষ রাজা বলিয়া ভাবিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। মণ্ডলস্থিত অপর রাজারা সকলেই সময়বিশেষে বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে পারে অথবা নিরপেক্ষ থাকিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যে রাজা 'অরি' ও 'বিজিগীষু' অপেক্ষা অধিক বলশালী, কিন্তু উভয়ের মিলিত বল অপেক্ষা অল্পশক্তিসম্পন্ন, তাহাকেই শাস্ত্রকারগণ 'মধ্যম' আখ্যা দিয়াছেন (অর্থশাস্ত্র ৬, ২, কামন্দক ৮, ২১ মূল এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত টীকা)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মণ্ডলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বলবান্ রাজার নাম 'মধ্যম'। 'উদাসীন' আবার তদপেক্ষাও বলবান্। যে রাজা 'অরি', 'বিজিগীষু' ও 'মধ্যম' অপেক্ষা অধিক সামর্থ্য ধারণ করে, কিন্তু উহারা তিনজন মিলিত হইলে সমকক্ষ হইতে পারে না, তাহার নাম 'উদাসীন'। 'মধ্যম' মণ্ডলের মধ্যে মধ্যম শক্তিসম্পন্ন; 'উদাসীন' উর্দ্ধে আসীন। অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। 'মধ্যম' বা 'উদাসীন' কারণবশতঃ 'বিজিগীষু'র শত্রু বা মিত্র হইতে পারে। অথবা যুদ্ধকালে নিরপেক্ষও থাকিতে পারে। ইহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে শত্রুতা, মিত্রতা বা নিরপেক্ষতা ঠিক বিচার্য্য বিষয় নহে; বলবত্তাই ইহাদের লক্ষণ। অর্থশাস্ত্রের 'বিজিগীষু'র অতি নিকটেই কোন এক দিকে 'মধ্যমে'র স্থান এবং 'অরি', 'বিজিগীষু' ও 'মধ্যমে'র পার্শ্বে 'উদাসীনে'র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'মধ্যম', 'উদাসীন,' 'অরি' এবং 'বিজিগীষু' এই চারি জন মণ্ডলের প্রধান অবয়ব। অপর রাজাদিগকে আবশ্যকমত 'অরি' বা 'বিজিগীষু' কোন এক জনের পক্ষভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

মধ্যম ও উদাসীন সম্বন্ধে প্রচলিত মতের খণ্ডন।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে যে সকল রাজনৈতিক সম্পর্ক উদ্ভূত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নিরূপণই মণ্ডল কল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। রাজ্যের সাতটি অবয়ব,—রাজা, মন্ত্রী, দেশ ও তাহার অধিবাসী, দুর্গ, কোশ, সৈন্য এবং সহায়। এই সপ্তাঙ্গের শক্তির উপর প্রত্যেক রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে। মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক রাজাকে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সপ্তাঙ্গের বলাবল নির্দ্ধারণ করিয়া, অবস্থাবিশেষে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয়, এই ষড়্‌গুণের মধ্যে কোন একটির অথবা দুইটি গুণের মিশ্রণে উৎপন্ন উপায়গুলির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইগুলিই রাজ্যের রক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনের উপায়স্বরূপ। সকল কয়টির গুণাগুণ বিচার করিয়া, যেটি দ্বারা অধিক পরিমাণে অনিষ্ট নিবৃত্তি বা ইষ্টলাভ হইতে পারে, বিবেচনাপূর্ব্বক সেটি অবলম্বন করাই রাজনীতি।

সপ্তাঙ্গ ও ষড়্‌গুণ।

যুদ্ধাবসানে শত্রুর সহিত অথবা শান্তিপূর্ণ সময়েও কোন ব্যক্তির সহিত পণে আবদ্ধ হইয়া

মৈত্রী-স্থাপনের নাম সন্ধি। "অপকারো বিগ্রহঃ" অর্থাৎ কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করিয়া বৈরভাব প্রকাশ করাকে বিগ্রহ বলে। কৌটিল্য (৭, ২) বিগ্রহের অনেকগুলি দোষ দেখাইয়াছেন এবং সন্ধি দ্বারা কাজ চলিলে বিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বিশেষভাবে শক্তিসঞ্চয়ের পর উপযুক্ত কালে সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রার নাম "যান"।

উপযুক্ত সামর্থ্যের অভাব বুঝিলে যুদ্ধযাত্রা না করিয়া, নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন এবং কোন উপায়ে শত্রুর অনিষ্ট সাধনের নাম 'আসন'। 'আসনে' অবস্থিত রাজা শত্রুর বাণিজ্যাদি বিষয়ে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া, তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া, নিজে শত্রু অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই যান ও আসন, উভয়ই বিগ্রহের একটা প্রকার মাত্র। কামন্দক (১১, ৩৫, ৩৬) বলিয়াছেন,—"যেহেতু যান ও আসন দ্বারা শত্রুর অপকারই করা হয়, অতএব এই দুইটি বিগ্রহেরই রূপ।" একের সহিত সন্ধি করিয়া অপরের সহিত যুদ্ধ করার নাম 'দ্বৈধীভাব'। শত্রু সংহারে অপরের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হইলে এই দ্বৈধীভাবের আশ্রয় লইতে হয়। যখন যান, আসন, বিগ্রহ বা দ্বৈধীভাব, কোনটিই অবলম্বনের সামর্থ্য থাকে না এবং শত্রুও যখন সন্ধি করিতে প্রস্তুত না হয়, তখন অপর একজন বলবান্ রাজার শরণাপন্ন হইতে হয়; ইহাকেই বলে 'সংশ্রয়'। বিভিন্নাবস্থায় অবলম্বনীয় এই মূল নীতি কয়টি ছাড়া বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মত "বিগৃহ্যযান," 'সন্ধায়যান', 'বিগৃহ্যাসন" ও 'সন্ধায়াসন' প্রভৃতি মিশ্রিত উপায়গুলি অবলম্বন করা আবশ্যক হইতে পারে।

অর্থশাস্ত্রে মণ্ডলের স্বরূপ ও মণ্ডলস্থ রাজাদের অবলম্বনীয় ষড়্‌গুণ সম্বন্ধে বিশদভাবে উপদেশ আছে। কেহ কেহ এ সম্বন্ধে কৌটিল্যের উক্তিগুলির আপাত-সুলভ অর্থ গ্রহণ করায় প্রাচীন হিন্দু-রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথমতঃ কৌটিল্য ১২টি রাজ্যের সমবায়ে মণ্ডলের কল্পনা করিয়াছেন দেখিয়াই ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার "প্রাচীন ভারতে" (১৩৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সম্বন্ধেই কৌটিল্যের মণ্ডল-ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং এ দেশে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের ন্যায় কোন বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে অর্থশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল; কারণ, তাহা না হইলে, ঐ পুস্তকে এতগুলি রাজ্যের একত্র সমাবেশের কল্পনা থাকিতে পারিত না। অতএব তাঁহার মতে অর্থশাস্ত্র রচনার সময়ে ভারতবর্ষ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অধ্যাপক ভিণ্টারনিট্‌স্‌ও কলিকাতা রিভিউ পত্রে (১৯২৪, এপ্রিল; পৃঃ ২৭) এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু মণ্ডলান্তর্গত রাজ্যগুলির সংখ্যা দেখিয়াই ঐরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। একটি মণ্ডল কতখানি স্থান লইয়া বিস্তৃত থাকিতে পারে, কৌটিল্য তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে ফ্রান্স, জার্ম্মাণ ও রুসিয়ার মত বড় বড় রাজ্যকেও একই মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ধরা যাইতে পারে। বিশেষতঃ বার (১২) এই সংখ্যাটি এই স্থলে সম্ভাবিত সংখ্যা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকালে 'বিজিগীষু'র সহিত যে কয় জন রাজার শত্রুতা বা মিত্রতা ঘটিয়া থাকে, কেবল সেই কয়জনই

মণ্ডল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

সেই সময়ে আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। অতএব অনেকগুলি রাজার নাম দেখিয়াই মণ্ডলস্থ রাজ্যগুলির ক্ষুদ্রত্ব নির্দ্ধারণ করা অযৌক্তিক।

ঐ পুস্তকেরই আর এক স্থলে (১৩৯ পৃঃ) ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ ভিন্ন কখনই শান্তিতে বাস করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ, 'বলশালী হইলে যুদ্ধ করিবে', 'সামর্থ্য থাকিলেই সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিবে' এবং 'কোন রাজ্য অব্যবহিত হইলেই তাহার অধিপতিকে শত্রুরূপে গ্রহণ করিতে হইবে'—ইহাই হইল ভারতীয় রাজনীতি-শাস্ত্রের উপদেশ।" কিন্তু এই উক্তিগুলি একে একে মূলের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যে, অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত বাক্যগুলির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যহীন অনুবাদের দ্বারা ঐতিহাসিকপ্রবর এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ—'অভ্যুচ্চীয়মানো বিগৃহ্ণীয়াৎ' (৭, ১), 'হীনেন বিগৃহ্ণীয়াৎ' (৭, ৩) এই সকল বাক্যের দ্বারা কৌটিল্য বল সঞ্চয় হইলেই যুদ্ধ করিতে উপদেশ দেন নাই কিংবা নিজের অপেক্ষা দুর্ব্বল রাজা পাইলেই তাহার অনিষ্ট করিতে বলেন নাই। যখন অন্যান্য কারণে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে, তখন উপযুক্ত বল সঞ্চয় করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তিসম্পন্ন রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই কৌটিল্যের উপরিউক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। কারণ, তিনি অন্যত্র (৭, ২) বিগ্রহকে ক্ষয়, ব্যয়, প্রবাস ও প্রত্যবায়ের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং সন্ধি ও বিগ্রহের মধ্যে বিগ্রহকে পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কামন্দকীয় নীতিসারে (১০; ৩—৫) বিগ্রহের কুড়িটি কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, কেবল বল সঞ্চয় হইলেই যুদ্ধ করাটা নীতিশাস্ত্রকারের অভিপ্রেত নহে। উপায়ান্তর থাকা সত্ত্বেও যিনি যুদ্ধ করিবার মন্ত্রণা দেন, তাঁহাকে নীতিবাক্যামৃতে (যুদ্ধোদ্দেশ প্রকরণে) নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং বিনা কারণে যুদ্ধায়োজন ভারতীয় রাজনীতি-শাস্ত্রের অনুমোদিত, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ প্রবল ব্যক্তির পক্ষে দুর্ব্বলের সহিত সন্ধির নিয়ম প্রতিপালনে অনিচ্ছা থাকা সম্ভব হইলেও, ভারতবর্ষে সচরাচর এমন ঘটনা ঘটিত বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সন্ধিমোক্ষপ্রকরণের প্রথমেই (৭, ১৭) কৌটিল্য বলিয়াছেন,—"সত্যং বা শপথো বা পরস্রেহ চ স্থাবরঃ সন্ধিঃ" অর্থাৎ সাধুতা বা শপথের উপর প্রতিষ্ঠিত সন্ধি কখনই ভগ্ন করা চলে না। এইরূপে সন্ধিভঙ্গ সম্বন্ধে কৌটিল্য নিজের অভিমত প্রকাশের পর আশঙ্কা করিয়াছেন যে, প্রবল ব্যক্তিরা বলগর্ব্বে সন্ধির নিয়ম নাও মানিতে পারে। কিন্তু ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, এই উক্তিটিকেই স্মিথ সাহেব ভারতবর্ষে সন্ধি-ভঙ্গ ঘটনার প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ সমীপবর্ত্তিতাই শত্রুতার স্বাভাবিক কারণরূপে বর্ণিত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহের অস্তিত্ব অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনুমান আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আধুনিক কালেও আমরা সে বিষয়ে প্রমাণ পাইতেছি। কিন্তু তাহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ঐ রাজ্যগুলি পরস্পর সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিবে। বিশেষতঃ উচ্ছৃঙ্খলভাবে

ষাড়্‌গুণ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

যুদ্ধ-করার পক্ষে সে কালেও অনেক বাধা ছিল। মণ্ডলস্থ অপর রাজগণের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে প্রত্যেক রাজাকেই কথঞ্চিৎ নিয়মিতভাবে চলিতে হইত। কেবল শক্তি থাকিলেই কাহাকে উৎপীড়ন করা চলিত না। কৌটিল্য বলিয়াছেন (৭, ১৩), যে ব্যক্তি ধার্ম্মিককে পীড়া দেয়, সে মিত্রগণেরও অপ্রিয় হইয়া থাকে এবং (৭, ১৬) যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থীর প্রতি অত্যাচার করে, অসন্তুষ্ট মণ্ডল তাহার উচ্ছেদের জন্য চেষ্টিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন রাজা অন্যায় আচরণ করিলে মণ্ডলস্থিত অপর রাজগণ তাহাতে বাধা দিত এবং ঐ ভয়েই তাহাকে তাদৃশ আচরণ হইতে বিরত থাকিতে হইত। এরূপ অবস্থায় মণ্ডলের গঠন-প্রণালী হইতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মণ্ডলস্থ রাজ্যগুলি সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

খুলনা জেলার মাঝির ভাষা*

নিম্নে খুলনা জেলার মাঝিদিগের ব্যবহৃত কথাগুলি দেওয়া গেল। বাঙ্গলার মাঝিমাল্লারা যে ভাষায় কথা বলে,—যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে, তাহাদিগকেও ভাষায় স্থায়ী আসন দান না করিলে আমাদের মাতৃভাষা কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ লাভ করিতে পারিবে না।

এ স্থলে ইহাও বলা উচিত যে, খুলনা জেলার মাঝিমাল্লারা অনেকেই ফরিদপুর বা তৎসন্নিহিত স্থান হইতে আগত। উচ্চারণের পার্থক্য ব্যতীত স্থানীয় মাল্লাদিগের সহিত সামান্য একটু ভাষাগত পার্থক্যও তাহাদের আছে। কিন্তু সে পার্থক্য বড় বেশী নহে। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান মাঝিদিগের ভিতরও একটু ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু ইহাও সামান্য মাত্র।

মাঝিদের ভাষার উচ্চারণও যথাসম্ভব তাহারা যেরূপ ভাবে উচ্চারণ ক'রিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবেই লিখিত হইল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থিত খুলনার উচ্চারণ কতকটা পূর্ব্ববঙ্গের মত, আবার কতকটা পশ্চিমবঙ্গের মত। আবার অনেক স্থলে তাহার উচ্চারণে একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে। যথা,—কেডা (কে), যা'বানে (যা'বখন), ধানডুন, চালডুন্ (এগুলি পূর্ব্ববঙ্গের অনুরূপ ; 'ডুন্' ত সম্পূর্ণ পূর্ব্ববঙ্গীয়) ; কিন্তু খা'চ্ছিল, যা'চ্ছিল, সকল সময় ঠিক পশ্চিমবঙ্গের মতন, যদিও 'টান্'টা ভিন্ন। আবার 'ভাত'কে খুলনাবাসী ঠিক পূর্ব্ববঙ্গীয়ের মত 'বাত'ও বলে না বা পশ্চিমবঙ্গের মত 'ভাত'ও বলে না। তাহার 'ভ'এর উচ্চারণ অনেকটা 'ব' ও 'ভ'এর মাঝামাঝি। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে।

শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উচ্চারণ অনেকটা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ ; কিন্তু তাহা কৃত্রিম,—অনুকরণজাত। চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ করিতে তাঁহারাও এখন অভ্যস্ত হন নাই।

শব্দ	প্রতিশব্দ
নাও বা না'ও	নৌকা। যথা :—এ না'ওখান কা'র ?
দাড়	দাঁড়।
বোঠে	বৈঠা। যথা :—বোঠে না বাতি পারিস্ ত হাটুরে নায় আসিস্ কেন ?
হাল	হাল।
চোঁড় বা লগি	একটা লম্বা ও সরু বংশদণ্ড। তীরের নিকট অল্প জলে নৌকা চালাইতে হইলে ইহার সাহায্য লওয়া হয়। যথা :—তাড়াতাড়ি যা'তি চাও ত লগি খোচাও (বা লগি ঠেল।)
বাদাম	পাল। যথা :—এমন বাতাসে বাদাম না খাটাবি ত কবে খাটাবি ?
মস্তুল	মাস্তুল।
ছৈ বা ছাপ্পড়	নৌকার উপরের ছাউনি। যথা :—আমার এ নতুন ছৈ, বাবু, এক ফুটও জল প'ড়বে না
ফুকোর	জানালা।
পাটাতন	নৌকার ভিতরকার তক্তার আচ্ছাদন।
খোল	নৌকার 'ফ্রেম' ও তক্তার আচ্ছাদনের মধ্যের শূন্য জায়গা।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিংশ বার্ষিক, দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শব্দ	প্রতিশব্দ
ডরা খোল	নৌকার খোলের ঠিক মাঝখানটা, অর্থাৎ ফ্রেমের ভিতর দিকের মধ্যস্থল।
গোলোই	নৌকার ঠিক অগ্রভাগের ত্রিভুজাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড। যথা :—গোলোইতি পা দিয়ে ওঠ্কেন (উঠিবেন) না, বাবু।
শড়া	দাঁড় নৌকার সহিত বাঁধিয়া রাখিবার জন্ম তাহার মধ্যস্থলে যে মোটা দড়িটার বাঁধন দেওয়া হয়, সেই দড়িটা।
দাড়ের পাতা	জলের ভিতরে দাঁড়ের যে চেপ্টা তক্তাখানি থাকে। যথা,—পাতায় জল পায় না, কেমন দাড় বা'স ?
টাবুরে নাও	ছোট নৌকা, সাধারণতঃ একজন মাঝিতেই চালায়।
ডিঙ্গি নাও	আরও ছোট নৌকা; সাধারণতঃ মৎস্যব্যবসায়ীরা ইহাতে করিয়া মাছ লইয়া হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।
ডোঙ্গা	সাধারণতঃ তালগাছের কাণ্ডে নির্ম্মিত হয়। আকারও নৌকার মত নহে।
পাতাম নাও	যে নৌকার তক্তাগুলি পাশাপাশি রাখিয়া, এক প্রকার চেপ্টা পেরেক দ্বারা আবদ্ধ।
খিলেম নাও	ইহার একখানা তক্তার মুখের এক পাশের খানিকটা চাঁচিয়া ফেলিয়া, অন্য তক্তাটীও সেইরূপ করিয়া, কাঠের খিল দিয়া আবদ্ধ।
তেকা'ঠে নাও, পাচকা'ঠে নাও	গঠনের বিশেষত্ব অনুযায়ী।
ছ্যাওট	জল সেচনের পাত্র।
(নৌকা) ভিড়োনো	নৌকা তীরে লাগান। যথা—এই ঘাটে নাও ভিড়োও, মাঝি।
গুণ	গুণের দড়ি। যথা :—গুণ টানার সময় দেখ্তি (দেখ্তে) হয় যে, গাছে বাধে, কি কিসি (কিসে) বাধে ?
পানুসী	বড় নৌকা।
ছিপ্ বা হাটুরে নাও	সরু অথচ খুব লম্বা নৌকা; খুব দ্রুতগামী। ইহাতে চড়িয়া ব্যবসায়ীরা হাট করিয়া থাকে।
খেয়া	খেয়া নৌকা।
ভাওয়ালে বা বোট	ধনীদিগের ব্যবহারোপযোগী নৌকা।
বজরা	প্রকাণ্ড বড় নৌকা; ইহাতে করিয়া ব্যবসায়ীরা মাল-পত্র চালান করিয়া থাকে।
পাড়ি দেয়া	এড়োএড়ি ভাবে নদী পার হওয়া।
চল্তি নাও	চলন্ত নৌকা।
গাঙ	নদী।
জোয়ার	জোয়ার।
ভাটি	ভাঁটা।
উজোন	উজান।
গোণ	অনুকূল স্রোত।
উজোনো	স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়া।
ভাটোনো	ভাঁটার টানে ভাসিয়া যাওয়া। যথা,—নাও ভাটোলো যে।
বান	বন্যা। যথা,—এবার গাঙে বান ডাহিছে।
একটানা	বর্ষাকালে নদীর স্রোত একমুখেই বহিয়া থাকে, তাহাকেই একটানা কহে। যথা :—সমস্ত বর্ষাতা গাঙে একটানা থাকে।
তোড়	স্রোতের প্রাবল্য।
কূল বা কেনারা	নদীর তীর।
ভাঙ্গন	কূল নদীতে ভাঙ্গিয়া যাওয়া। যথা :—এবার পশ্চিম দিকে ভাঙ্গন ধরিছে।

শব্দ	প্রতিশব্দ
কানাল	গভীর স্রোত; সাধারণতঃ ভাঁটার দিকে।
বাক	নদীর বাঁক।
তিরমুনি	ত্রিমোহানা।
গোলা	ঘূর্ণাবর্ত্ত।
ভ্যামতা	নদীর মোড়।
খোচ	ছোট ছোট বাঁক।
ঠোটা	অনেকটা অন্তরীপের মত; যে স্থানের তীরভূমি অনেকটা ত্রিভুজের আকৃতিতে নদীর ভিতর দিকে আসিয়া পড়িয়াছে।
চর	নদীগর্ভোত্থিত তীরভূমি।
লোণা	লবণাক্ত।
রায়ভাটি বা সারভাটি	শেষ ভাঁটা; যখন স্রোতের বেগ অত্যন্ত অধিক হয়।
ভা'ল ফিরোনো	নৌকার মুখ ফিরাইয়া গতি পরিবর্ত্তন করা।
ডক্	বৃষ্টি (সাধারণতঃ মুসলমানদিগের ভাষা)।
তুভোন্	তুফান।
ম্যাঘ	মেঘ।
ঝড়	ঝড়।
ভাড়া	ভাড়া। [ভাড়া পাওয়াকে মাঝিরা সাধারণতঃ ভাড়া বাঁধা কহে। যথা,—ভাড়া বাঁধ্‌তে পারিছিস্ ভাই ?]
মুহোড় বাতাস	প্রতিকূল বাতাস।
পিঠেম বাতাস	অনুকূল বাতাস।
মাঝি	যে হাল ধরে।
মাল্লা	দাঁড়ি বা অন্যান্য সকলে।
চড়নদার	পুরুষ যাত্রী।
শোয়ারি	স্ত্রী-যাত্রী।
বাঁধ্‌লা	খালের বা নদীর মুখের বাঁধ।
পয়ান	খালের মুখে যে বাঁধ থাকে, তাহার স্থানে স্থানে বর্ষাকালে খালের ভিতর ঢুকিবার পথ থাকে। তাহার নাম পয়ান।
কাচি চর	নূতন মাটি পড়িয়া সম্প্রতি যে চর গঠিত হইয়াছে বা হইতেছে; কাঁচা চর।
ঘোলা	পলি। যথা,—এবার বানে প্রায় এক হাত ঘোলা ফেলিছে।
মোট মাটারি	যাত্রীর জিনিষ পত্র।
বা'র দেওয়া	নৌকাকে নদীর ভিতর (কূল হইতে) বাহির করিয়া আনা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব *

নাথধর্ম্মের বহু তথ্যপূর্ণ 'অনাদিপুরাণ' বা অনাদিচরিত্র, 'হাড়মালা গ্রন্থ', 'যোগিতন্ত্রকলা' প্রভৃতি কয়েকখানি 'কলমীপুথি' আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রথম দুইখানি বহি 'খাইবাম', 'ভজিলু', 'ত্রস্ম', 'হৈআ' প্রভৃতি শিশু বাঙ্গালা ভাষার অলঙ্কারে ভূষিত। 'যোগিতন্ত্রকলা'র ভাষা সংস্কৃত, তবে এ সংস্কৃতের ব্যাকরণ রচনা করিতে পাণিনিও একটু প্রমাদে পড়িবেন। বহিগুলি কখন্ ও কাহার দ্বারা লিখিত, বলা যায় না; তবে প্রত্যেক বহির শেষে লেখা আছে, ঐগুলি অন্য বহির নকল এবং পুথিলেখক "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" বলিয়া রচনাতে কোনও ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। 'যোগিতন্ত্রকলা' নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। উহাতে নাথযোগি-গণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বহু কথা লিখিত আছে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি ও বাইবেলে যাহা লিখিত আছে, নাথধর্ম্ম ইহার চেয়ে বিশেষ অধিক কিছু বলে নাই। প্রথমে শুধু 'নৈরাকার রাত্রি' ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

তখন — "নাই আদ্য অনাদ্য না ছিল ধর্ম্মেশ্বর।
না ছিল বর্ম্মা বিষ্ণু শিব গজেশ্বর॥
না ছিল চন্দ্র সূর্য্য শর্গে ইন্দ্রশর।
না ছিল আকাশ পাতাল ধরণী পবন॥
না ছিল অগ্নি পানি না ছিল হর্ত্তাসন।
না ছিল দরিয়া সাগর কুলাকুল॥ †

কিন্তু সেই 'নৈরাকারে'র মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁর আদি অন্ত, 'রূপ রেখ' নাই, তিনি "উদয় না হইছে না জাইব অস্ত।" কিন্তু তিনি সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছেন, তিনি পরম গুণবান্, তিনি সকলের কর্ত্তা, সকলের দাতা এবং 'সমাই'কের পালক। তিনি 'সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা' ও 'সর্ব্ব-সংহারক'। কিন্তু তিনি কে? তাঁর নাম কি? "শেই অলেকনাথ আছয়ে ঈশ্বর।"

শ্রুতিতে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন,—সৃষ্টি হউক, আর সৃষ্টি হইয়া গেল। বাইবেলে পরমপিতা বলিলেন,—আলো হউক, আর আলো হইয়া গেল। অনাদিপুরাণেও—

"হেনকালে অলেকনাথ করিলেক মন।
সত্যজুগ সৃজিতে মনে হইল যেইখন॥"

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩০শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† আমার প্রথম ইচ্ছা ছিল, বানানগুলি যত দূর সম্ভব, সংশোধিত করিয়া দিব। কিন্তু তাহাতে আমার অনেক সাহিত্যিক বন্ধু আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, মূলে যেরূপ লেখা আছে, তাহাই যথাযথভাবে প্রকাশ করা উচিত।—লেখক।

শ্রুতিতে 'নৈরাকার রাত্রি'র গভীর অন্ধকার দূরীকরণার্থ প্রথমে আলো, আর বাইবেলে প্রথম জল এবং পরে আলো সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু নাথধর্ম্মে প্রথমে সত্যযুগ সৃজন করিয়া অলেকনাথের সৃষ্টি করার পক্ষে কি সুবিধা হইল, অনাদিপুরাণ সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই। তারপর অলেকনাথ "ইচ্ছা হনে 'অনাদ্য' সৃজিলা আচম্বিতে।" তাঁহার ইচ্ছা, 'অনাদ্যে'র উপর সৃষ্টি নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিবেন। অনাদ্যকে সৃজন করিয়া অলেকনাথ "নৈরাকার রাত্রি হনে দিবস নিকালিলা" ও "সাত দিবসের নাম নির্ণয় কৃরিলা।" প্রথম বারের নাম সোমবার, সেই দিন অনাদির জন্ম হইয়াছিল। 'অনাদ্য' বা 'অনাদিধর্ম্মনাথ' সৃষ্ট হইয়াই 'বলে মুই মুই।' ইহাতে অলেকনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—

"মুই মুই করি কর্ব্ব বড় দাপ।
অখনে সৃজিছি তরে আমি তর বাপ॥"

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে অনাদিরও বলিবার অনেক ছিল,—

"অনাদি বলয়ে প্রভু সৃজিলা আমারে।
কিরূপে আছয়ে কথা না দেখি তুমারে॥
হেটে চাইলু স্থল নাই উপরে নাই কেশ।
ধরিবারে লক্ষ নাই পুজিবারে দেয়॥"

'হাড়মালা' গ্রন্থেও ঠিক একইরূপ কথা আছে। তবে সেখানে 'অলেকনাথ' নয়, তিনি 'নিরঞ্জন গোঁসাই'। তিনি প্রথমে সত্যযুগ সৃজন করিবার প্রয়োজন দেখেন নাই। তিনি প্রথমেই—

"মনেতে ভাবিয়া দেব চাহে চারিভিতে।
হেনকালে অনাদি জন্মিলা আচম্বিতে॥" *

সে যাহা হউক, অনাদির উত্তরে অলেকনাথ বা নিরঞ্জন গোঁসাই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি কোথায় থাকেন, বলিয়া দিলেন—"শূন্যরূপে থাকি আমি শূন্যে অধিষ্ঠান।" (হাড়মালা)। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অহঙ্কার করার সমর্থন তিনি করিতে পারিলেন না। তিনি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। অহঙ্কারের ক্ষমা নাই, তিনি অনাদিকে শাপ দিয়া ফেলিলেন;—

"শিদ্ধি না হইল পিণ্ড পড়িব তুমার॥
সৃষ্টি সৃজিবাঅ তুমি বড় দুক্ষ পাইআ।
তাকে শংহারিব আমি শিবরূপ সৃজিআ॥
শিবরূপে য়েকজন করিমু সৃজন।
আদিরূপ শক্তি দিআ করিমু সংহারণ॥"

---

* হিন্দুস্থানী নাথ যোগিগণের নিকট নিম্নলিখিতরূপ সৃষ্টির ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়,—'জলাময় রহে যব মহী এসংসারা, স্থাবর জঙ্গম মহী একাকারা, আদি মহাপুরুষকো জন্ম, মহাজন্ম তবগোস্বামী আপে নিরঞ্জন। মহাকায় শরীর জলমে ভাসে, ফিরে গোস্বামী তিন অর্বুত বৎসর, এসা সময়মে প্রভুকো মুখমে উঠে হাইতি, তিস্‌মে জনম লিয়ে উলুপকী মোহ ভাই। ধ্যান ভাঙ্গনেছে নিরঞ্জন আঁখ মেলকে চাহিয়, সম্মুখমে উলুপকী দেখনেকো পাইয়ে।' ইত্যাদি।

হাড়মালা গ্রন্থে নিরঞ্জন গোঁসাই 'শিবরূপ শৃজিআ' সংহার করেন নাই, সংহার করিবার জন্ম তিনি 'কাল' সৃজন করিয়াছেন। অলেকনাথ শাপ দিয়া অনাদিকে "আপে জুগ আপে জোগি আপে আপ ধ্যাই" প্রভৃতি তত্ত্বকথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, অনাদি তপ আরম্ভ করিলেন এবং কি দিয়া তিনি সৃষ্ট হইয়াছেন, জানিবার জন্ম অলেকনাথকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। অলেকনাথ পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রহ্মনাম ব্রহ্মতত্ত্ব'ও শুনাইয়াছিলেন। অনাদিনাথ—

"য়েতেক শুনিয়া বলইন নাথের চরণে।
শূর্ণ্যেতে রহিল বসিয়ে তোমারো স্থানে॥
শূণ্যে শৃজিলায় প্রভু তুমার গোচর।"

এই কথা শুনিয়া অলেকনাথ মুখ হইতে অমৃত ছাড়িলেন আর সেই অমৃত হইতে স্থল সৃষ্ট হইল। অনাদিনাথ সেই স্থলের উপর আসন করিয়া বসিলেন। তারপর অলেকনাথ নিজের দেহের শক্তি হইতে 'কাকেতুকা' দেবীকে সৃজন করিলেন। কাকেতুকা দেবী অনাদির 'পদাস্তর' সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলেন। তখন অলেকনাথ এই অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে কল্পনা করিয়া 'অজেরোহ্ল (?) হনে' গঙ্গার সৃষ্টি করিলেন ও অনাদির জটার মধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া, অন্তরীক্ষ হইতে ডাকিয়া অনাদিকে বলিলেন,—

"আদি দেবি শৃজিছি তুমার লাগি শক্তি।
গঙ্গা দেবি শৃজিছি আদির অঙ্গে গতি॥
আদিয়ে অনাদ্যায় শৃষ্টি নির্ম্মিছি।
দুইয়ে মিলি শৃষ্টি কর আপনার ইছি॥"

সৃষ্টি করার ভার অনাদির উপর অর্পণ করিয়া অলেকনাথ চলিয়া গেলেন। আমরা আরও দেখিতে পাইব, সৃষ্টিকার্য্যে অনাদি যখন একটু গণ্ডগোলে পড়িয়াছেন, তখনই অলেকনাথ আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। এরূপ সৃষ্টিকার্য্য আপাততঃ নষ্টিক (Gnostic) দর্শনের মতানুযায়ী বোধ হইতেছে। *

অলেকনাথের কৃপায় কাকেতুকাদেবী ওরফে আদিদেবী জীবিতা হইলেন, এবং আদি অনাদি মিলিয়া সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে আকাশ সৃষ্ট হইল, আকাশে ইন্দ্র রাজা হইলেন। তারপর চন্দ্র-সূর্য্য সৃষ্ট হইল, সূর্য্য লালবর্ণ দেওয়া হইল। তারপর বাসুকি ও পাতাল সৃজন করা হইল, বাসুকিকে পাতালে স্থান দেওয়া হইল এবং তাহার 'ফটের উপর

---

* "—Some lesser God had made the world,
But had not force to shape it as he would,
Till the High God behold it from beyond
And enter it and make it beautiful"—Tennyson.

তিন কুল (ত্রিকোণ?)' পৃথিবী স্থাপন করা হইল। বিভিন্ন উপাদানে শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ দুই প্রকার তারা সৃজন করা হইল।

"তবে ধর্ম্মে মুষ্টি কশাইআ চাইলা।
মুষ্টিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই মূর্ত্তি দেখিলা॥
তবে অনাদ্যে হস্তের মুষ্টি ফিরাইলা।
ঊর্দ্ধমুখ মহাদ্যেব তথায় দেখিলা॥
হস্ত হনে তিন পুত্র থইলা তিন স্থানে।"

"হাড়মালা"য় কিন্তু নিরঞ্জন গোঁসাই অনাদিকে শাপ দিয়া অন্তর্হিত হইলেই "শিবশক্তি বিদ্যমান" হইলেন ও হরি ব্রহ্মা তারপর সৃষ্ট হইলেন।

শ্রীযুক্ত তমোনাশ বাবু নাথধর্ম্মের শিবকে বৈদিক যুগের রুদ্র বা পৌরাণিক যুগের মহাযোগী শিব হইতে পৃথক্ ও কম ক্ষমতাশালী দেখিয়াছেন। আমরা কিন্তু নাথধর্ম্মের শিবকে বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের শিব অপেক্ষা পৃথক্ দেখিলেও কম ক্ষমতাশালী দেখিতেছি না। অলেকনাথ অনাদিকে বলিতেছেন,—

"আমার অং (অঙ্গ?) শিব অং জানিয় আপনে।
* * * *
শিব অং সিদ্ধি অং বেই অং তুমি।
তুমার নাম রাখিলাম অনাদ্যি ধর্ম্মনাথ।
শিবর নাম রাখিলাম ঈশ্বর আদিনাথ॥"

আমরা আরও দেখিতে পাইব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে শিবই খুব চালাক চতুর, বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাশালী। তিনিই পিতার প্রিয়পুত্র ও পিতার আশীর্ব্বাদে তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণুর গুরু হইয়াছিলেন।

অনাদিনাথ তিন পুত্রকে তিন স্থানে রাখিয়াছেন, আর তাহাদের খোঁজ নেন নাই। তাহারা তিনজন "চক্ষে না দেখে, কর্ণে না শুনে," এমতাবস্থায় "অস্থলভিতর" পড়িয়া রহিয়াছে। অনাদিনাথ আদিদেবীর সহিত পুত্রগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের প্রত্যেকের কাছে গমন করিলেন। প্রথমে ব্রহ্মচারীর বেশে ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন, তিনি পাঁচ দিনের উপবাসী, এবং "অপুড়া পৃথিবী (?) দেয় ভুজনের ঠাই।" ব্রহ্মা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তিনি চক্ষেও দেখেন না, কর্ণেও শুনেন না, তিনি "অপুড়া পৃথিবী" কোথায় পাইবেন? তাঁহার যদি চক্ষু কর্ণ থাকিত, তবে তিনি ব্রহ্মাগ্নি দিয়া ব্রহ্মচারীকে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন। বৈষ্ণব-বেশে বিষ্ণুর কাছে গিয়া অনাদিনাথ একই প্রার্থনা করেন এবং প্রায় একইরূপ উত্তর পান। অতঃপর "মহাভুগেশ্বর"-বেশে শিবের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিতেই,—

"য়েত শুনিআ শিব যুক্তি করে মনে।
পিতা পরে কেহ নাই লয়ে মর মনে॥"

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পিতাকে যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন করিলেন,—

"তিন জটা আছে আমার শিরের উপর।
বন্দন ভুজন তথা করহ শর্ত্তর॥"

পুত্রের ব্যবহারে অনাদিনাথ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবার গুপ্ত মন্ত্র ও কৌশল শিখাইয়া দিয়া গেলেন। শিব দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ-শক্তি লাভ করিয়া, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে ঐ সকল কৌশল শিখাইয়া দিলেন। তাঁহারা শিবকে গুরু ভজিয়া, অনাদি ধর্ম্মনাথের কৃপায় দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ-শক্তি লাভ করিলেন, এবং অনাদি ধর্ম্মনাথকে 'আদেশ'* জানাইলেন।

তারপর অনাদিধর্ম্ম আদিদেবীর 'তনু' হইতে লক্ষ্মী, সাবিত্রী ও গৌরীদেবীকে সৃজন করিলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে লইয়া "কুটেশ্বরে" গমন করিলেন। সেখানে অনাদিনাথের আদেশে শিব, আদিদেবীর মড়া তনুর কেশে কাঠ, মাথার খুলিতে ভাণ্ড ও দেহরস জলরূপে ব্যবহার করিয়া, নিজের শরীর হইতে "অগ্নি পানি নিকালিয়া", "চন্দ্রের গোলিতে" অন্ন পাক করেন এবং সমস্ত দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান। সমস্ত দেবগণের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহাকে "শ্রীপত্রে" অন্ন দেওয়া হইল। শ্রীপত্রের অধিকারী নিজে অনাদিধর্ম্মনাথ। ভোজনান্তে শিব বলিলেন,—এখন অন্ন ভোজনান্তে সমস্ত দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু "পুনি কিরূপে হৈব অন্নের শ্রীজন।" তখন "অনাহেতু ভীমনাথে মারিলেক ছিটা," আর অন্ন সৃষ্ট হইয়া, পৃথিবীতে পড়িয়া, গাছ হইয়া উঠিল এবং তাহাতে ধান ধরিল। কিন্তু সে ধানে চাউল নাই, তখন—

"ধর্ম্মের আজ্ঞায়ে দেবি-দুগ্ধ ছিটি দিলা।
চুচার মধ্যে দুগ্ধ ক্ষির বসিলা॥"

এখন অনাদিধর্ম্মনাথ, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে একে একে গঙ্গা গৌরী বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সৃষ্টির ঈশ্বর করিবেন ও ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া অমর করিবেন বলিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে আদেশ মানিলেন না। কারণ, গঙ্গা গৌরী তাঁহাদের "শাতমায়"। অতঃপর শিবকে গঙ্গা গৌরী বিবাহ করিতে আদেশ করা হইল। শিব 'ধর্ম্মের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি,' 'সাধি ব্রহ্মজ্ঞান' গৌরীকে 'কোলে' ও গঙ্গাকে 'শিরে' লইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া অনাদি বর দিলেন, 'অন্তকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু ভজিবা তুমাতে।" অতঃপর শিবের বীর্য্য হইতে 'কুলনাথে'র জন্ম ও গৌরীর বীর্য্য হইতে 'বিন্দুবতী'র জন্ম হইল। ধ্যানে আজ্ঞা পাইয়া শিব, কুলনাথের সহিত বিন্দুবতীর বিবাহ দিলেন, এবং কুলনাথকে যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া "শিব গোত্র, নাথ পৌদ্যাত" দিলেন। †

* 'আদেশ' শব্দ দণ্ডবৎ অর্থে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও নাথযোগিগণের কোনও উৎসবাদিতে বহু লোক জড় হইলে, যিনি সভায় লোক মিলিত হওয়ার পরে আসিতেন, তিনি সভাস্থ লোকজনকে মাটিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ কিম্বা নমস্কারাদি না করিয়া "সবাইর (=সবার) পদে আদেশ" বলিয়া সভায় আসন গ্রহণ করিতেন।

† যোগিতন্ত্রকলামতে শিব বা অনাদি যোগিনীকে বিবাহ করেন, এবং আদিনাথের সঙ্গে বিন্দুবতীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে ব্রহ্মা মন্ত্রপাঠক, শিব যাজক।

তারপর অনাদিধর্ম্ম, বিষ্ণুকে লক্ষ্মী ও ব্রহ্মাকে সাবিত্রী সমর্পণ করিয়া, অলক্ষিতে দক্ষিণ-সাগরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে আসনে বসিয়া, মনে মনে কল্পনা করিয়া এক অক্ষয় বটবৃক্ষ, এক গৃধিনী, 'জন্মেজয় রাজা' (যমরাজা ?) ও চিত্রগুপ্ত সৃজন করিলেন এবং বিভিন্ন অঙ্গের ঘর্ম্ম হইতে পবন, চন্দনবৃক্ষ প্রভৃতি সৃজন করিলেন। অক্ষয় বটবৃক্ষ হইতে তিন যুগের নিদর্শন-স্বরূপ তিন তাল জন্মিল; সত্যযুগের তালের উপর গৃধিনী বসিল। যমরাজকে বটবৃক্ষের নীচে বসাইয়া জম্বুদ্বীপের রাজা করিয়া দিলেন। পাপ পুণ্য বুঝিবার ভার চিত্রগুপ্তকে অর্পণ করিলেন এবং গৃধিনীকে চারি যুগের সাক্ষিস্বরূপ সে স্থানে স্থাপন করিলেন। তারপর তাঁহার জটার মল হইতে যে 'হরমুল বৃক্ষ' উৎপন্ন হইল, তাহার ফল ভক্ষণ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের ভার দিয়া, অনাদিধর্ম্মনাথ অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—পিতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ-সমুদ্রের নিকট গিয়া, গৃধিনীর নিকট হইতে সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন এবং তিন ভাই সাগরের কূলে বসিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেন। তখন অনাদি, মৃত গরুর রূপ ধরিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট ভাসিতে ভাসিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েই ঘৃণাভরে ধ্যান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। মৃত গরু যখন শিবের নিকট উপস্থিত হইল, তখন শিব চিন্তা করিলেন, এরূপ প্রাণী এখনও পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই, ইহা নিশ্চয়ই পরমপিতার লীলা—এই ভাবিয়া জলে সাঁতার দিয়া গিয়া তিনি সেই গো-মূর্ত্তিকে ধরিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইহা দেখিয়া, শিবকে নিন্দা করিয়া চলিয়া গেলেন। অনাদিধর্ম্ম, তখন তিন ভাই কিরূপে তাঁহার সৎকার করিবেন, তাহা বলিয়া দিলেন—ব্রহ্মা বিষ্ণুর আচার "ভাশা পুড়াগাড়া" এবং শিব গর্ত্ত খুঁড়িয়া, আসনে বসাইয়া সমাধি করিবেন। শিব পিতাকে সমাধিস্থ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সেখানে লইয়া আসিলেন, তাঁহারা এখন পিতার দেহ দেখিতে পাইলেন, এবং শিবের নিকট হইতে শুনিয়া, পিতৃ আদেশমত তাঁহার সৎকার করিলেন।

অনাদিকে যখন দাহ করা হইল, তখন তাঁহার নাভি ভস্মীভূত হয় নাই। উহা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয় এবং রাঘব উহা ভক্ষণ করে। তারপর—

"রাঘবের পেট ফাটি মীন নিকলিলা।
নাভি স্থনে মিননাথ জন্ম হইলা॥" *

---

* মীননাথের জন্ম সম্বন্ধে অন্যত্র অন্যরূপ উল্লেখ আছে। গণ্ডযোগে এক ব্রাহ্মণের এক পুত্র জন্মে। পুত্র মা-খেকো হবে, এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ তাহাকে জলে নিক্ষেপ করেন এবং রাঘব তাহাকে ভক্ষণ করে। যখন মহাদেব পার্ব্বতীর—

"তুহ্মি কেনে ভয় গোসাঞি আহ্মি কেনে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ যেন জোগে জোগে তরি॥"—গোরক্ষবিজয়

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য, ক্ষীরোদসাগরে মনোহর টঙ্গিতে বসিয়া পার্ব্বতীকে যোগশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব বলিতেছিলেন, তখন—

"মাৎস্যরূপ ধরি তথা মীনযোগেন্দ্র।
টঙ্গির তলাতে রহে যোগাল স্বন্দর॥"—গোরক্ষবিজয়। (পর পৃষ্ঠে)

অনাদির পেট কাটিয়া চৌরঙ্গী* সিদ্ধার জন্ম হইল। অগ্নির আলের তেজ হইতে জালন্ধুড়ি-সিদ্ধা, কর্ণ হইতে কর্ণকাটি বা কানিফা, চর্ম্ম হইতে চর্ম্মনাথ, ধূম্র হইতে ধূম্রনাথ, পা হইতে পাগলনাথ, নাভিস্থল হইতে নারদ প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধা ও নবনাথের জন্ম হইল এবং—

"শ্রীগুলি ফুটি নিকলিছইন শ্রীনাথ।
অনন্তকুটি সিদ্ধার গুরু শ্রীগোরক্ষনাথ ॥"

অনাদির চক্ষু ফুটিয়া পৃথিবীতে পড়িল এবং তাহা হইতে রুদ্রাক্ষবৃক্ষের জন্ম হইল। যোগিতন্ত্র-কলামতে অনাদির মস্তক হইতে গোরক্ষনাথের জন্ম হয় † এবং তাঁহার মুখ হইতে দাহননাথ, হৃদয় হইতে মেঘনাথ, নাভি হইতে পিণকনাথ, জঙ্ঘা হইতে উদ্ধারনাথ, জানু হইতে পাগলানাথ, বাহু হইতে ভৃকটিনাথ, গুহ্য হইতে সত্যনাথ এবং চরণ হইতে বিন্দুনাথের উৎপত্তি হয়। তাঁহার হাড় হইতে হাড়িপা ও চর্ম্ম হইতে চৌরঙ্গী সিদ্ধার জন্ম হয়।

গোরক্ষনাথের জন্ম অনাদির অঙ্গ হইতে হইলেও তিনি অন্যান্য সিদ্ধার মত নহেন, তিনি অলেকনাথের স্বরূপ। অলেকনাথ অনাদিকে বলিতেছেন,—

"যেই কালে তুমার অং (অঙ্গ ?) আমি ছুড়ি জাইবা।
তুমার শৃগুলি ফুটি আমি নিকলিবা ॥
আমার নাম গুরু গোরক ধরিবা।
গুরু গোরক নামে শংষার তরাইবা।"

পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু কুটেশ্বরে চলিয়া গেলেন এবং শিব শ্মশানে বসিয়া তপ আরম্ভ করিলেন। তপে সন্তুষ্ট হইয়া তখন অলেকনাথের স্বরূপ গোরক্ষনাথ সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং শিবকে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, "নিলবেদ" ও "শোসম্বেদে"র ‡ তত্ত্ব বলিয়া দিয়া তাঁহাকে শ্মশানের মাটি খুঁড়িতে আদেশ করিলেন।

এবং পার্ব্বতী যখন নিম্রাণসা হইয়া অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, তখন ঐ বালক রাঘবের পেট হইতে "হুঁ হুঁ" বলিয়া শিবের কথার উত্তর দিতেছিল। তখন মহাদেব তাহাকে ধরিয়া ফেলেন এবং রাঘবের পেট চিরিয়া বাহির করেন।

* চৌরঙ্গী—হাড়িপা কানুপার সমসাময়িক একজন সিদ্ধা। বিশ্বকোষকারকের মতে এই সিদ্ধার নাম হইতে কলিকাতার চৌরঙ্গী রোডের নাম হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই নাথসিদ্ধা কলিকাতার কালীঘাটের কালীর স্থাপক ও পূজক ছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সন্নিকটে কোথায় নাকি তাঁহার আশ্রম ছিল।

† একখানি কলমী পদ্মাপুরাণে আছে—"মাথা ফুটি বাহির হইলা শ্রীগোলকনাথ।" গোলক স্থানে খুব সম্ভব গোরক্ষ হওয়া উচিত ছিল।

‡ আমরা এতকাল চারি বেদের কথাই জানিতাম। কিন্তু যোগিতন্ত্রকলা ও অনাদিপুরাণে নিলবেদ ও শোসম্বেদ নামে আরও দুইখানা বেদের উল্লেখ পাই। বহু অনুসন্ধান করিয়াও এই বিষয় অন্য কোনও বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। যোগিতন্ত্রকলা ও বেদমালা নামক আর একখানা ক্ষুদ্র পুথিতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাইলাম,—

মাটি খুঁড়িয়া শিব যে সমস্ত বস্তু পাইলেন, তদ্দ্বারা গোরক্ষনাথ শিবকে নানারূপ অঙ্গ-ভূষণ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অনাদ্যের রুধিরে গৈরিক বসন, নাভির দ্বারা কর্ণের কুণ্ডল, নাসিকা দ্বারা নাদ, মেরুদণ্ড দ্বারা হস্তের "দ্বাদশ" প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তারপর শ্মশানের ভস্মে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া, শিবের গলায় বাসুকিকে পৈতারূপে স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার মস্তকে নিজ মস্তকের লাল টুপী * পরাইয়া দিলেন এবং রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে তুলিয়া দিলেন। গোরক্ষনাথ শ্মশানের ভস্ম হইতে "ভস্ম'আ" (বৃষ ?) সৃজন করিলেন এবং শিব সেই বৃষে চড়িয়া কুটেশ্বরে গমন করিলেন।

প্রথমে ত্রিরাত্র শ্রাদ্ধ হইল। এই শ্রাদ্ধে গোরক্ষনাথ অলক্ষিতে থাকিয়া পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তারপর একাদশ দিবসে পুনর্ব্বার শ্রাদ্ধ হয়। এই শ্রাদ্ধেও গোরক্ষনাথ স্মরণমাত্রে "শ্রীকবিলাশ" হইতে আসিয়া পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র, যম প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধা, রাগ রাগিণী, বাসুকি, গৃধিনী পক্ষী প্রভৃতিকে আনিয়া শ্রাদ্ধে উপস্থিত করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথকে শিব ভিন্ন অন্য কেহ দেখিতে পাইতেন না। শ্রাদ্ধ হইতেছে, কিন্তু পুরোহিত নাই দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"বাপের জজ্ঞ করিতে ব্রাহ্মণ কেবা য়েতে।"

শিব তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীগুরু গোরকনাথ পুরইত য়েথাতে ॥
হস্ত পদ নাই তার বিন্দু হংশ কলা।
আছয়ে জগত ভরি শমাইর দরশনে খেলা ॥
বাপের জজ্ঞেতে নাথ পুরইত হৈলা।
তাহানে কেয় দেখিতে না পাইলা ॥
কিঞ্চিৎ ধ্যানে শুন আমার সাক্ষাতে।
য়েতেক মর্ম্মভেদ কইলাম তুমাতে ॥"

"সামবেদ যজুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদ আর।
নিল অনিল বেদ ষষ্ঠম বেদ সার ॥"—যোগিতন্ত্রকলা।
"পঞ্চমুখী ব্রহ্মা এক মুখ কাটিয়াছে রুদ্র।
সেই মুখ হইতে হুসঘনা বেদ উৎপন্ন ॥"—বেদমালা।

এই দুই অদ্ভুতপ্রকৃতির নামবিশিষ্ট বেদদ্বয়ের বিবরণ যদি কেহ কোথাও পাইয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।—লেখক।

* লাদপৈতা আজকালও নাথযোগিগণ ধারণ করেন, এবং স্থানে স্থানে অধুনাও অনেকে লাল টুপী ও কুণ্ডল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফরাসী পর্যটক de la vallee,ভ্রমণ-কাহিনীতেও যোগীদিগের এই লালটুপী ও কুণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"He (Yogiraj) had a golden bead hanging from his ear as big as a musket-bullet ; and had a little red cap like those worn by Italian-galley slaves." (J. Tal-boys Wheeler's A Short History of India, Burma and Nepal.) 116-117.

সে যাহা হউক, শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, পিণ্ডের অন্ন শিব নিজ হস্তে রন্ধন করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিতগণকে ভোজন করাইবার জন্য "ভাণ্ডোরার" সামগ্রী আনান হইল এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সাবিত্রী, লক্ষ্মী, গঙ্গা ও ভগবতীকে আদেশ করিলেন,—

"তুমি চাইরে মিলি রন্দন করউকা ইহাতে।"

অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করা হইল, পুরোহিতকে এই অন্ন ব্যঞ্জনের অর্ঘ্য দেওয়া হইল। অতঃপর নিমন্ত্রিতগণকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করান হইল এবং তারপর সকলে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রস্থান করিলেন।

অনাদিপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টির ইতিহাস এই। এখন সৃষ্টি ত হইল; সৃষ্টির একদিন ধ্বংস হইবে, কিছুই থাকিবে না। তখন—

"পৃথিবী মিশাইব আবে, আব মিশাইল রবিতে।
রবি মিশাইল বায়ে বায় মিশাই আকার্শেতে॥
কলসী ভাঙ্গিলে জেন মীশাইব আকাশে।
আকাশ ভাঙ্গিলে জাইব মহা আকাশে॥
রবি ভাঙ্গিলে জাইব তেন অভিপ্রায়ে।
শরূপ মিশাইব তেন নাথগুরুর পায়ে॥"

শ্রীরাজমোহন নাথ

---০---

"নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধের আলোচনা *

ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট মহাশয় বলিলেন,—

প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ অনাদি-পুরাণ, হাড়মালাগ্রন্থ ও যোগিতন্ত্রকলা নামক তিনখানি গ্রন্থের হস্তলিখিত পুথি অবলম্বন করিয়া, নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব নিরাকরণ করিতে গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে একখানি সংস্কৃতে ও অপর দুইখানি বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। ইহাদের রচনাকাল জানা যায় না। প্রত্যেক পুথির 'নিগমন' বা সমাপ্তি অংশে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' উক্তি আছে দেখিয়া মনে করিতে হয়, ইহা আজকালের, নিতান্ত আধুনিক সময়ের রচনা নহে। ইহাও নিশ্চয় যে, ইহা অতিশয় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রচনাও নহে। আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব বা cosmology বলিতে আমাদের যাহা বুঝা উচিত, ঠিক তাহা নাই; তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব, পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা বা রূপকচ্ছলে সরল, সহজবোধ্য ও সাধারণ ভাষায় বর্ণিত আছে মাত্র। এই পৌরাণিক আধ্যাত্মিক কাহিনীর মূল অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বাগ্রে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তই আমাদের মনে পড়ে। বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশ-বাতাস, মর্ত্ত্য-পাতাল, স্থাবর-জঙ্গমাদি বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহা আদৌ ছিল না। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আবৃত ছিল। অগাধ জলরাশি বা নিরাকারা বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে একমাত্র অলেখ প্রভু নিরঞ্জনই ছিলেন। তিনি জ্যোতির্ম্ময় ও আলোকস্বরূপ। তাঁহার দয়াতেই বিশ্বভুবনের সৃষ্টি হয়, জল স্থলের আবির্ভাব হয়, স্থাবর জঙ্গম উৎপন্ন হয়, মনুষ্য ও মনুষ্যসভ্যতার উৎপত্তি ও অভ্যুদয় হয়। আপাতদৃষ্টিতে নাসদীয় সূক্ত নাথসৃষ্টি-কাহিনীর প্রধান অবলম্বন হইলেও বস্তুতঃ ইহার মধ্যে অঘমর্ষণ, হিরণ্যগর্ভ, অনিল, ব্রহ্মণস্পতি, হিরণ্যগর্ভ ও বিশ্বকর্ম্মাদি সূক্তের উপদেশও বিদ্যমান আছে। শুধু তাহাই নহে; ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদাদি গ্রন্থের সৃষ্টিকথার প্রভাবও তন্মধ্যে যথেষ্ট আছে। আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহারে মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিণাম বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক যে পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্পষ্ট উক্ত আছে—পৃথিবী জলে, জল রবি বা অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ মহাকাশে লীন হয়। একমাত্র অলেখ নিরঞ্জনই অবশিষ্ট থাকেন। সিদ্ধ নাথগুরুগণ মানব হইলেও তাঁহারা এবং প্রভু নিরঞ্জন স্বরূপতঃ একই।

প্রোক্ত নাথ সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথই সকলের শীর্ষস্থানীয় শিরোমণি। প্রবন্ধের অবলম্বিত পুথির মধ্যে তাঁহাকে 'অনন্ত কুটি সিদ্ধার গুরু'রূপে প্রশংসা করা হইয়াছে। এই প্রশংসা নিরর্থক নহে। গোরক্ষনাথের আবির্ভাবকালে, পূর্ব্বে ও পরে আর্য্যাবর্ত্তে—বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে বহু নাথগুরু ও নাথপন্থী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বামাচারী ছিলেন, কেহ

---

* ১৫ই ভাদ্র ১৩৩১ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পাঠের পর যে সকল আলোচনা হয়, তাহাই দেওয়া হইল।—সম্পাদক।

কেহ বামাচার হইতে বিরত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই হঠযোগী ছিলেন। শিবপদ সকলেরই প্রার্থিত বস্তু ছিল। দৈহিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রাণায়ামাদি দ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া অলেখ নিরঞ্জন আত্মার স্বরূপ দর্শন করাই তাঁহাদের সাধনার চরম লক্ষ্য ছিল। ন্যাসের স্থান অনুসারে নাথসিদ্ধগণ হাড়পা, কাণফা প্রভৃতি নামে বিশিষ্টতা লাভ করেন। গোরক্ষনাথের দৃষ্টি ব্রহ্মরন্ধ্রেই স্থাপিত ছিল। তিনি কামিনীকাঞ্চনমুক্ত ও অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি নাথ-ধর্ম্মের প্রভূত সংস্কার সাধনও করিয়াছিলেন। কদলীরাজ্যে কামিনী-কাঞ্চন-মোহে মীননাথের পতন হইয়াছিল সত্য। কিন্তু মীননাথ নিজে মিথুনবিরোধী ছিলেন। কাজেই তাঁহার পক্ষে গোরক্ষনাথের গুরু হওয়ার অধিকার ছিল। আমার বিশ্বাস, গোরক্ষনাথের নামের ছায়ায় সকল নাথধর্ম্ম ও নাথ-সম্প্রদায়ের সমাবেশ হইয়া থাকিবে। পরে একই ভাবে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের নামের ছায়ায় বিভিন্ন-পন্থী বৈষ্ণবসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তথাপি চক্ষু থাকিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই সম্মিলন, সমাবেশ বা সমন্বয়ের অন্তরালে পূর্ব্ববিভিন্নতা এবং বৈশিষ্ট্যগুলিও বিদ্যমান আছে। নাথ-সৃষ্টিকাহিনীর ভিত্তি বৌদ্ধ সাহিত্য-দর্শন নহে। বৈদিক সাহিত্য বা বেদান্তই ইহার মূলে নিহিত আছে। বুদ্ধের আবির্ভাবের দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাঞ্চল শৈব-জাতীয় বহু শ্রমণ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন বেদান্ত ও বৌদ্ধমতে ও বৌদ্ধমতের ভিত্তির উপর পরে বহু সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও সাধন-পন্থার সমাবেশ ও সংঘর্ষ হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই এক ভাবে না এক ভাবে বৈদিক পরা বিদ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা যাজক ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য স্বীকার করিতেন না। ইহার আভাস আমরা বক্ষ্যমাণ পুথি-গুলিতে দেখিতে পাই। পিতৃযজ্ঞে বা পিতার শ্রাদ্ধকার্য্যে পুত্র ব্যতীত অন্য পুরোহিতের প্রয়োজন কি আছে? পুত্র ভিন্ন পিতার প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান্ আর কে হইতে পারে? গোরক্ষনাথের ধর্ম্মাদর্শমতে নাথসৃষ্টিকাহিনীতে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ থাকিতে পারে না; বাস্তবিক পক্ষে ইহার মধ্যে প্রকৃতিকে অলেখ নিরঞ্জনের পশ্চাতেই রাখা হইয়াছে। কিন্তু যখন কালক্রমে গৃহস্থগণ নাথধর্ম্মভুক্ত হইয়া পড়েন এবং পূর্ণভাবে নাথসমাজ বা church গঠিত হয়, তখন তাঁহাদের জীবনাদর্শের অনুযায়ী প্রকৃতি পুরুষ সংযোগাত্ম সাংখ্যভাবের অবতারণা করিতে হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সমাজ গঠন নাথধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু বৎসর পরেই সম্ভব হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয় "নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্বের" সহিত ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্য দেখাইয়া নাথধর্ম্মের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশেষতঃ পুরুষসূক্ত, প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই; সুতরাং ঋগ্বেদমূলক হইলে নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব অধিক পুরাতন হইতে পারে না। নাথধর্ম্ম বেদমূলক না হওয়াই সম্ভব। বেলুচিস্তানে, গান্দারে ও গাতীতে এবং সিন্ধুদেশে, সেহ্বানে ও সক্করে মুসলমান নাথপন্থী আছে। সিন্ধুদেশে সনাতনপন্থী, শিখ ও হিন্দু নাথপন্থী আছে। ইহারা অনন্ত জ্যোতির উপাসনা করে এবং প্রদীপ

দিবারাত্রি জ্বালাইয়া রাখে। রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যের সেরিকা, ভর্ত্তরি ও ইন্দোর রাজ্যের তুদাখেড়ি নামক স্থানে নাথপন্থীদের আশ্রমে এইরূপ অনন্ত জ্যোতিঃ বা প্রদীপ দিবারাত্রি জ্বালাইয়া রাখা হয়। রাজপুতানা, মধ্যভারত ও গুজরাটের নাথপন্থীদের মধ্যে অগ্নি বা অনন্ত জ্যোতির উপাসনাই প্রবল। বেলুচিস্তান, সিন্ধু, রাজপুতানা, মধ্যভারত ও গুজরাটের নাথধর্ম্মে সাকার অগ্নির উপাসনার যে সাদৃশ্য আছে, তাহা বাঙ্গালার নাথপন্থীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বদেশের অর্থাৎ বাঙ্গালার নাথধর্ম্ম শৈবধর্ম্মের প্রাবল্যের যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা নাথগুরু গোরক্ষনাথের নব প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালা দেশের নাথপন্থীরা অনন্ত জ্যোতিঃ প্রজ্বালিত রাখে না। এই বিষয়ে পশ্চিম-ভারতের নাথধর্ম্মের সহিত পূর্ব্বভারতের বা বাঙ্গালার নাথধর্ম্মের সাদৃশ্য দেখা যায় না। পশ্চিম-ভারতের নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব অন্যরূপ; তাহাতে নিরঞ্জন কর্ত্তৃক অন্ধকার বা শূন্য হইতে অগ্নির বা আলোকের উৎপত্তির কথা আছে। সে উপাখ্যান পূর্ব্বদেশে শুনিতে পাওয়া যায় না। পশ্চিম-ভারতের নাথপন্থীরা বলে যে, উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি নাথসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সেই জন্য পশ্চিম-ভারতের নাথসম্প্রদায়ের গুরুগণ ভর্ত্তৃহরি বা ভর্ত্তরি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নাথধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু পূর্ব্বভারতের নাথধর্ম্ম গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক সংস্কৃত, ইহা আদিম নাথধর্ম্ম নহে।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—

আজ নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন কথা শুনিতে পাইলাম। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু মুসলমান নাথপন্থীদের কথা বলিয়াছেন। মুসলমান নাথপন্থীদের কথা আমি পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না। আজ নূতন জিনিষ শেখা গেল। 'প্রবাসী'তে আমি নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। সেই উপলক্ষে অন্যান্য স্থানের ন্যায় যোধপুরেও নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। সেখানকার 'দরবার লাইব্রেরী'তে 'গোরখবোধ' নামে একখানি পুথি দেখিতে পাই। তাহার সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে হাড়মালার সৃষ্টিতত্ত্ব মোটেই মেলে না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, গোরক্ষনাথ যে একজনই ছিলেন, তাহা নহে। শঙ্করাচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত শিষ্যেরা যেমন শঙ্করাচার্য্য নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, সেইরূপ বোধ হয়, গোরক্ষের পরবর্ত্তী অনেক নাথসাধুও গোরক্ষনাথ নামে পরিচিত হইতেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মহারাষ্ট্র দেশে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মারাঠী ভাষায় লিখিত ভাষ্য সমেত একখানি গ্রন্থ রচিত হয়—নাম 'জ্ঞানেশ্বরী'। গ্রন্থকারের নাম জ্ঞানেশ্বর, গ্রন্থের রচনা ১২৯০ খৃষ্টাব্দ। এই পুস্তকে গোরক্ষনাথের নাম আছে, আরও লেখা আছে যে, জ্ঞানেশ্বর গোরক্ষনাথ হইতে শিষ্যপরম্পরায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। সুতরাং এ হিসাবে গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতকে আসিয়া পড়িতেছেন। নানক গোরখের তর্ক ব্যাপারও খুব প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া গোরখনাথের সময় সম্বন্ধে বহু মতই প্রচলিত। এইরূপ নানা ব্যাপার দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, গোরক্ষনাথ একজন নন।

ইহাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে। দত্তগোরক্ষসংবাদ, জ্ঞানসিদ্ধান্তযোগ, বিবেকমার্ত্তণ্ড, নবনাথভক্তিসার—আরও অনেক বই আছে। এগুলি লইয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত ইহাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলিতে হইবে।

নাথেরা হঠযোগী। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের সহিত মিশিয়ন ইহাদের ধর্ম্ম অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদের গ্রন্থে বা মতে বৈদিক, বৌদ্ধ বা নানকপন্থী প্রভৃতি মতবাদ দেখিলেই যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহাদের ধর্ম্ম বেদমূলক, বৌদ্ধমত-মূলক, তাহা নহে। এরূপ করিলে বরং আমরা ভুলই করিব। আমি নির্ব্বিবাদে বিলাতী মত অনুসরণ করিয়া বলিতে চাই না যে, পুরুষসূক্ত অপ্রাচীন। নাথধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন, এ কথাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। রাখালবাবু বলিয়াছেন যে, নাথধর্ম্মের উৎপত্তি পশ্চিমে। কিন্তু বাঙ্গালায় যে নাথধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই, ইহাও বলা যায় না।' মীননাথ ও 'মৎস্যেন্দ্রনাথ, উভয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ একেবারে বাঙ্গালার লোক। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় মৎস্যেন্দ্রনাথের 'কৌলজ্ঞানবিনির্ণয়' গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ বরিশালের চৈদোর লোক। জাতিতে কৈবর্ত্ত।

নাথেদের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া, এইটাই যে নাথেদের সৃষ্টিতত্ত্ব, এরূপ বলিবার উপায় নাই। কালস্রোতে, স্থান ও গুরুভেদে নাথেদের সৃষ্টিতত্ত্ব নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুথি পাঠ করিয়া তাহার নির্ণয় করা দরকার।

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—

প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, হয় ত অদ্যকার এই প্রবন্ধে একটি নীরস বিষয়ের আলোচনা হইবে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, আমরা আশাতীত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। তজ্জন্য প্রবন্ধপাঠক ডাঃ বড়ুয়া মহাশয়, এবং আলোচনাকারী শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ও শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ডাঃ বড়ুয়া মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুকে আমি অনুরোধ করি, তাঁহারা এ বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা করিয়া পরিষদের কোন আগামী অধিবেশনে আমাদিগকে শুনাইবেন। প্রবন্ধোক্ত পুথির সঙ্গে হয় ত পশ্চিম দেশের নাথধর্ম্মের বৈসাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু অদ্যকার আলোচিত সৃষ্টিতত্ত্ব যে বেদের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। নাসদীয় সূক্ত ছাড়া বেদের অন্যত্রও সৃষ্টির কথা আছে এবং তাহার সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে। বেদে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" বলিয়া যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার সহিত নাথধর্ম্মের "নিরঞ্জনে"র ত কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। পরন্তু বেদে ব্রহ্মের "নিরঞ্জন" সংজ্ঞাটিও অপরিচিত নহে। তার পর গোরক্ষনাথকে নাথগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও হিন্দুধর্ম্মের সহিত মেলে। পাতঞ্জলে ঈশ্বরকে "সঃ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদশক *

শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত জগন্নাথদশক, ইদানীং কেহ দেখিয়াছেন বা উহার অস্তিত্ব জানেন বা ইহা কখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। সন ১২৭৪ সালে ৯৬নং আহীরিটোলা ঠিকানায় শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'নিত্যকর্ম্ম' পুস্তকের ৫—৬ পৃষ্ঠায় "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গত শ্রীজগন্নাথাষ্টকং" দেখিতে পাই। উহা অত্যন্ত অশুদ্ধ। উহার প্রথম শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত হইল,—

"কদাচিৎ কালিন্দীতটে বিপিন সঙ্গীততরল
মুদাভি দশনকমল স্বাদ্য মধুপং।
মাপস্থ্য ব্রহ্মাম ভবতি গণেশার্চ্চিতপদঃ
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥"

১৩২৮ চৈত্র সংখ্যার "সুবর্ণবণিক্‌সমাচারে" দেখিলাম, "কবি বিশ্বম্ভর পানি ও জগন্নাথমঙ্গল" প্রবন্ধ-লেখক ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বলিতেছেন,—জগন্নাথমঙ্গলের সন ১৩০১ সালের সংস্করণে গ্রন্থশেষে "জগন্নাথের স্তব" নূতন সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। "জগন্নাথের স্তবটি সেই সর্ব্বজনপরিচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গত শ্রীজগন্নাথাষ্টক।"

তবেই দেখা গেল, ১২৭৪ বঙ্গাব্দে জগন্নাথ অষ্টক প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু উহা অত্যন্ত অশুদ্ধ, উহা হইতে প্রকৃত পাঠের উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই। সন ১৩০১ সালে যে জগন্নাথ অষ্টক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমি দেখি নাই; সুতরাং জানি না, উহা পূর্ব্বোক্ত অষ্টকের শোধিত সংস্করণ কি না। আমি বহু বৎসর পূর্ব্বে আমার গৃহস্থিত পুথিসমূহের মধ্যে তিনখানি প্রাচীন পাতড়া পাই। ঐ তিনখানিতেই তিনটি জগন্নাথদশক লিখিত, জগন্নাথ অষ্টক নহে। তিনখানি পাতড়ার জগন্নাথদশকের পাঠের মেলন করিয়া উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি বিবেচনা করি মহাপ্রভু পুরীতে অবস্থানকালে এই জগন্নাথদশক রচনা করিয়া, ইহা দ্বারা জগন্নাথ দেবের স্তব করিয়াছিলেন। উত্তরকালে জগন্নাথদশকের দুইটি শ্লোক নৃত্য বাবুর আদর্শ পাতড়ায় নষ্ট হওয়ায় তৎপ্রকাশিত "নিত্যকর্ম্মে" জগন্নাথদশক, জগন্নাথ অষ্টকের রূপ ধারণ করিয়াছে। আমি যে জগন্নাথদশকের উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহা এই,—

"শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসংসর্গিভুবনে
মুদাভীরীনারীবদনকমলস্বাদমধুপঃ।
রমাশম্ভুব্রহ্মাসুরপতিগণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১॥

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৮শ বার্ষিক দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

করে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং বিদধন্ ।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবিপিনলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২ ॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেণ বলিনা ।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীসেব্যস্ফুরদমলপঙ্কেরুহপদঃ ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণসুখোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

পরং ব্রহ্মাপীড়ঃ কমলবদনোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি ।
রসানন্দে রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখী
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥

রথারূঢো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈ-
স্তুতঃ প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং মুগ্ধসদয়ো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥

বরস্তুং সংসারং হততমসারং সুরপতে
বৃথাভোগাসক্তং সততমপরং দৈবতপথি ।
অহং যাচে নিত্যং পরমমচলং নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥

নচ প্রাপ্যং রাজ্যং নচ কনকমাহো ন বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং নিখিলবরকাম্যাং বরবধূং ।
সদাকালং কামং প্রমথপতিনোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥

ঘনশ্যামাকারঃ সুরমধুরধামা ভবপিতা
মহেন্দ্রাদেরাদ্যো বররমণরাধার্পিততনুঃ ।
লসৎশ্রীবৎসাঙ্কস্তরুণতুলসীমাল্যসুভগো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৯ ॥

সদানন্দাকারো জগতি জগতাং কিল্বিষহরো
জগন্নাথাধারো জলধিতনয়াসেবিতপদঃ।
জরামৃত্যুধ্বংসী জলদপটলশ্যামলরুচিঃ
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমাবিরচিতং শ্রীজগন্নাথ-দশকং সমাপ্তং॥

শ্রীশিবচন্দ্র শীল

ভারতীয় সূদবিদ্যা *

আর্য্য ঋষিগণের রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে দেখা যায়, পুরাকালে কি দর্শন, কি চিকিৎসা-শাস্ত্র, কি কৃষিশিল্প, কি সূদবিদ্যা বা সূপকারবিদ্যা, সকলেরই চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ত্তমান প্রবন্ধে সূদবিদ্যা অর্থাৎ পাকপ্রণালীর কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিব।

সূদবিদ্যা বা সূপকারবিদ্যা (পাকপ্রণালী) চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম। শাস্ত্রে দেখা যায়, উক্ত সূদবিদ্যায় পুণ্যশ্লোক নলরাজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তৎপরে কুন্তীপুত্র দ্বিতীয় পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেন। উক্ত দুই সূদবিদ্যাচার্য্যই পাকপ্রক্রিয়া সাধনার্থ বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত অতি প্রাচীন ভীমকৃত পাকশাস্ত্র কুত্রাপি আছে বলিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু তদপেক্ষায় প্রাচীনতর মহারাজ নলকৃত পাকশাস্ত্র বিশেষ অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়াছে। অদ্য সেই মহারাজ নলকৃত "পাকদর্পণ" হইতে "মাংসৌদন" (পলাউ) পাকের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছি। যাবতীয় সূপকার অপেক্ষা মহারাজ নলের এমনই পাক বিষয়ে বৈচিত্র্য ছিল যে, তাঁহার পাচিত ব্যঞ্জনের স্বাদ অন্যের পাচিত ব্যঞ্জনের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক্ হইত।

বনবাসিনী দময়ন্তীকে নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া নলরাজা নিরুদ্দেশ হইলে পর, দময়ন্তী বিদর্ভ নগরে পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বহুতর চেষ্টায়ও নলের অনুসন্ধান না পাইয়া, অনন্যোপায় হইয়া দময়ন্তীর পিতা ভীম ভূপতি, মহাপতিব্রতা দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বরের ছল করিয়া সমস্ত রাজন্যগণকে বিদর্ভ নগরে সমবেত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নলরাজা ঋতুপর্ণ রাজার সারথি-রূপে "বাহুক" নাম ধারণ ও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উপস্থিত ছিলেন। দময়ন্তী প্রচ্ছন্নভাবে সখী কেশিনী দ্বারা নলের পাচিত মাংসৌদন আনাইয়া, তাহার সদ্‌গন্ধ ঘ্রাণ করিয়া ও সুরস আস্বাদন করিয়া, এই মাংসপাচককেই নল বলিয়া নিঃসন্দেহরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নলের এমনই পাক-নৈপুণ্য ছিল। যথা,—

"পুনর্গচ্ছ প্রমত্তস্য বাহুকস্যোপসংস্কৃতং। মহানসাদ্ধ শৃতং মাংসমানয়স্বেহ ভামিনি॥
সা গত্বা বাহুকস্যাগ্রে তন্মাংসমপকৃষ্য চ। অত্যুষ্ণমেব ত্বরিতা তৎক্ষণাৎ প্রিয়কারিণী॥
দময়ন্ত্যৈ ততঃ প্রাদাৎ কেশিনী কুরুনন্দন। সোচিতা নলসিদ্ধস্য মাংসস্য বহুশঃ পুরা।
প্রাশ্য মত্বা নলং সূদং প্রাক্রোশদ্ভৃশ-দুঃখিতা॥" (মহাভারত, বন—৭৫।২০—২৩)।

অর্থ—হে কেশিনি! তুমি পুনর্ব্বার তথায় যাইয়া প্রমাদগ্রস্ত বাহুকের পাচিত মাংস সেই রন্ধনশালা হইতে আনয়ন কর। দময়ন্তীর এরূপ আগ্রহ দেখিয়া কেশিনী পুনর্ব্বার ঐ পাকশালায় যাইয়া, সেই উষ্ণ মাংস অপহরণ করিয়া, দ্রুতগতিতে আসিয়া দময়ন্তীকে প্রদান করিল। পূর্ব্বে দময়ন্তী বহুবারই নলপক্ক মাংসের আস্বাদ বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। এখন আবার সেই মাংস ভোজন করিয়া, অবিকল সেই আস্বাদ অনুভব করিয়া, ঋতুপর্ণ রাজার সারথি বাহুককেই নল স্থির করিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৯শ বার্ষিক ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এতদ্দারা ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, নল রাজার সদৃশ পাকবিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। অতএব অদ্য নল রাজার কৃত "পাকদর্পণ" গ্রন্থ হইতে প্রথমতঃ মাংস পাকের প্রণালী জ্ঞাপন করিতেছি।

মাংসৌদন (পলাউ)

"ছাগমেষশকুন্তাদি-প্রাণিনাং পললং বুধঃ।
সমাদায় পুনস্তস্য ত্বগন্ত্রাণি সমুৎসৃজেৎ॥
তেষামেকতমং মাংসং ক্ষালয়েদ্বারিণা ততঃ।
অস্থিভিঃ সহ সঞ্ছিদ্য নিক্ষিপেত্তস্য ভাজনে॥"

অর্থ—পাঠা, মেড়া অথবা অপরাপর পক্ষী প্রভৃতি যে কোন প্রাণীর চর্ম্ম এবং আঁত পরিত্যাগ করিয়া, তাহার মাংস লইয়া প্রক্ষালন করিবে। পরে অস্থির সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়া পাত্রে রাখিবে।

উৎক্রামোদকের লক্ষণ

"অনাপলং ততো ভাণ্ডে তণ্ডুলস্যোদকং শুভে।
নিধায় শুদ্ধমুদকং সমং কৃত্বাপয়েৎ সুধীঃ॥
তপ্তে পয়সি তন্মাংসং নিক্ষিপেৎ ক্ষালিতং পুনঃ।
পুনশ্চ নিক্ষিপেত্তত্র কুস্তুম্বরীং কুস্তুম্বরীং বুধঃ।
তপ্তে মাংসে পুনঃ সম্যক্‌শোধয়েৎ চিক্কনং বিনা॥
শীতলঞ্চ পুনঃ কৃত্বা-কুসুমৈরধিবাসয়েৎ।
স্রসেচ্চ মৃগনাভিঞ্চ কর্পূরং হিমবারিচ॥
মুহূর্ত্তমেকং সংস্থাপ্য প্রসূনানি পরিত্যজেৎ।"
এতদুৎক্রামমুদকমাহুঃ সূদবিশারদাঃ॥

অর্থ—উৎক্রাম-জলের লক্ষণ—পরিষ্কার পাত্রে তুষ কঙ্করাদি না থাকে, এইরূপ তণ্ডুলের (চেলেনিব) জল রাখিবে এবং যে পরিমাণ তণ্ডুলের জল, সেই পরিমাণে বিশুদ্ধ জল-ঐ তণ্ডুল-জলের সহিত মিশাইবে। তৎপরে ঐ জল উষ্ণ করিয়া পূর্ব্বের প্রক্ষালিত মাংস ঢালিয়া দিবে। পুনর্ব্বার তাহাতে কুস্তী (কটফল) ও ধ'নের চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে মাংস চিক্কন সুসিদ্ধ না হইতে (পাকস্তু ত্রিবিধো মন্দশ্চিক্কনঃ খরচিক্কনঃ, বাগ্‌ভট বলে), ঈষত্তপ্ত আভাসিত হইলে উত্তমরূপে ঐ জল ঢালিয়া লইবে। তৎপরে ঐ মাংসগালিত জল শীতল হইলে তাহাতে ফেলিয়া সুবাসিত করিবে। দণ্ড দুই কাল রাখিয়া ঐ পুষ্পগুলি উঠাইয়া ফেলিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় সাধিত জলকে উৎক্রাম জল কহে। ইহা পাকাচার্য্যদিগের পরিভাষা।

উৎক্রাম শব্দের যোগার্থ

"সর্ব্বোদকাতিক্রমণাৎ উৎকৃষ্টত্বাদিদং পয়ঃ।
রসসর্ব্বস্বরূপত্বাদুৎক্রামমিতি কথ্যতে॥"

অর্থ—নিজের উৎকর্ষগুণে এই জল সকল জলকে অতিক্রম করিয়াছে এবং রসের সর্ব্বস্ব সারভূত, এই জন্য ইহাকে উৎক্রাম জল কহে।

"ত্রিভাগপূরিতাং স্থালীং তজ্জলৈশ্চ প্রমাণবিৎ।
স্থাপয়েচ্চ তথা চুল্যাং তপ্তে পয়সি বহ্নিনা॥
চতুর্থাংশান্ ক্ষিপেৎ সম্যক্ ক্ষালিতান্ গৌরতণ্ডুলান্।
ঈষৎ পাকে তু সঞ্জাতে সুশুভে শালিতণ্ডুলে॥
আদায় পক্বপললমপক্বমথবামিষং।
জলে বিলীনে তত্তক্রমঙ্গারেষু সমাবিশেৎ॥
ক্ষীরঞ্চ নারিকেলস্য নবং সর্পিস্তথৈবচ।
ন্যসেত্তত্রৈব রম্যাণি কেতকীকুসুমানি চ॥
নিক্ষিপেৎ সকলাংস্তত্র পর্য্যটপ্রমুখোদ্ভবান্।
গন্ধৈঃ কর্পূরকস্তূরীসন্তবৈশ্চাধিবাসয়েৎ॥
তন্মুখং ছাদয়েৎ সম্যক্ বিধানেন বিচক্ষণঃ।
লিম্পেত্তদ্গন্ধরক্ষার্থং তদ্রন্ধ্রং কনিকৈস্তু বং॥
আবর্ত্তনং পুনঃ কুর্য্যাদঙ্গারেষ্বেব তান্ পুনঃ।
যাবতা মৃদুভাবং স্যাৎ তাবত্তত্র প্রযোজয়েৎ॥
এবমামিষসম্ভূতং দাপয়েদন্নমীদৃশং।
ইদং রুচিকরং বৃষ্যং পথ্যং লঘু বল-প্রদং॥
ধাতুবৃদ্ধিকরত্বাচ্চ ব্রণদোষান্ প্রশাম্যতি॥"

অর্থ—পূর্ব্বপ্রস্তুত উৎক্রাম জল দ্বারা পাকপাত্রের তিন ভাগ পূর্ণ করিবে। উননের উপরে চাপাইয়া জল উষ্ণ হইলে পরে উৎকৃষ্ট শুভ্র তণ্ডুল ধৌত করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ পূর্ণ করিবে। তৎপরে যখন দেখিবে, ঐ তণ্ডুল ঈষৎ সিদ্ধ হইয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধপক্ব মাংস অথবা কাঁচা মাংস ঐ পাকপাত্রে ঢালিয়া দিবে। সমস্ত জল যখন শুকাইয়া যাইবে, তখন ঐ অন্নপাত্র জলন্ত অঙ্গারের উপর রাখিয়া, নারিকেলের দুগ্ধ, সদ্যোঘৃত এবং উত্তম কেতকীপুষ্প তাহাতে মিশাইবে এবং পাপর ভাজা প্রভৃতি পিষ্টককে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাতে মিশাইবে এবং কর্পূর, মৃগনাভি ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্য সংযোগে সুবাসিত করিবে। এই সময়ে শরা দ্বারা পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া, ময়দা দ্বারা তাহার ফাঁক বন্ধ করিয়া দিবে। পুনর্ব্বার জলদঙ্গারের উপরে ঐ মাংসপাত্র চাপাইয়া এমন ভাবে অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিবে, যাহাতে সেই মাংসোদন অতীব কোমল হয়। এইরূপে পলাউ অতীব সুস্বাদু, বীর্য্যবর্দ্ধক, হিতকারী, লঘুপাক, বলবর্দ্ধক, সপ্ত ধাতুর পোষক এবং ব্রণ রোগনাশক জানিবে। মাংসপ্রিয় ধনিগণ একবার এইরূপ প্রণালীতে মাংস পাক করিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

বাঙ্গালা[1] ভাষায় অনুজ্ঞা

বাঙ্গালা ভাষায় সম্ভ্রমার্থে[2] অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষে দু'টি রূপ হয়,—

১। তুমি কর। ২। তুমি করিও।

প্রথমটীতে বর্ত্তমান কাল বুঝায়, দ্বিতীয়টীতে ভবিষ্যৎ সূচনা করে। দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

১। যাহা জান, সত্য করিয়া **বল** (বর্ত্তমান অনুজ্ঞা),

২। সদা সত্য কথা **বলিও** (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা)।

তুচ্ছার্থে মধ্যম পুরুষে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপ নিত্য-বর্ত্তমান (লট্) কালের রূপের সমান। কিন্তু বর্ত্তমান অনুজ্ঞার রূপ নিত্য-বর্ত্তমান কালের রূপ হইতে বিভিন্ন। যেমন—

১। তুই তাহাকে **বলিস্** যে, আমি ভাল আছি। (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা)

২। তুই তাহাকে **বল্** যে, আমি ভাল আছি। (বর্ত্তমান অনুজ্ঞা)

৩। তুই কি **বলিস্**? (নিত্য-বর্ত্তমান)

ওদিকে কিন্তু সম্ভ্রমার্থে মধ্যমপুরুষে বর্ত্তমান অনুজ্ঞা ও নিত্য-বর্ত্তমানের রূপ একই। যেমন—

১। তুমি সত্য **বল** (বর্ত্তমান অনুজ্ঞা)

২। তুমি কি **বল**? (নিত্য-বর্ত্তমান)

বুঝাইবার জন্য একটী চিত্র দিতেছি :—

	তুমি **করিও**	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
নিত্য-বর্ত্তমান	তুই **করিস্**	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
নিত্য-বর্ত্তমান	তুমি **কর**	বর্ত্তমান অনুজ্ঞা
	তুই **কর্**	বর্ত্তমান অনুজ্ঞা

'না' অর্থ বুঝাইতে কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপই ব্যবহার করি। যেমন—

যাহা জানিস্, সত্য করিয়া বল্, মিথ্যা **বলিস্** না।

যাহা জান, সত্য করিয়া বল, মিথ্যা **বলিও** না।

অনুজ্ঞার মান্যার্থে মধ্যম ও প্রথম পুরুষে—আপনি বা তিনি **করুন**। তুচ্ছার্থে প্রথম পুরুষে—সে **করুক**।

এই রূপগুলি বর্ত্তমান কালের রূপ হইতে পৃথক্। পূর্ব্ববঙ্গে 'করুন' স্থানে নিত্য-বর্ত্তমানের 'করেন' দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমপুরুষের অনুজ্ঞায় বর্ত্তমান হইতে

১। ব্যুৎপত্তি বা প্রাচীন রূপ অনুসরণে বানান হইবে বাঙ্গালা (প্রাচীন বা বঙ্গাল, ১৪ শতকের পারসীতে বঙ্গালহ্), উচ্চারণ অনুসারে বাংলা। "বাঙ্গলা" না ব্যুৎপত্তি-সম্মত, না উচ্চারণগত।

২। তুমি সম্ভ্রমার্থ, আপনি মান্যার্থ ও তুই তুচ্ছার্থ মধ্যম পুরুষ। আমি এই সংজ্ঞাগুলি হেমচন্দ্র বড়ুয়ার অসমীয়া ব্যাকরণ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

পৃথক্ কোন রূপ নাই।' এখানে একটা কথা পরিষ্কার করিয়া রাখা ভাল। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে 'তুই', 'তুমি' বাস্তবিক যথাক্রমে উত্তমপুরুষের একবচন ও বহুবচন। ইংরেজি thee, youএর কিংবা জর্ম্মান্ deu, Sieএর সঙ্গে তুই, তুমির বচন ও প্রয়োগের তুলনা করা যাইতে পারে।

তুই—<তই, (বৌদ্ধ গান)

{তইআ (সপ্তশতকে)}

<তই, তুই, তুএ (প্রাকৃত ; তৃতীয়ায়)

<তয়া, ত্বয়া (পালি ; তৃতীয়ায়)

<ত্বয়া (সংস্কৃত ; তৃতীয়ায়)

অন্য সমজাত (cognate) ভাষার সঙ্গে তুলনায় দেখি—হিন্দী মৈথিলী 'তূ', মারাঠী 'তূঁ', গুজরাটী 'তূঁ', পঞ্জাবী 'তূঁ', সিন্ধী 'তূঁ', নেপালী 'ত'—এ সমস্তই প্রথমার একবচনে। অবশ্য আসামী ভাষার 'তই' ও উড়িয়ার 'তু' বাঙ্গালা 'তুই' পদেরই মত তুচ্ছার্থ মধ্যমপুরুষ একবচন, এবং আসামী 'তুমি' ও উড়িয়া 'তুম্ভে' বাঙ্গালা 'তুমি' পদেরই মত সম্ভ্রমার্থ মধ্যমপুরুষ একবচন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে বাং তুমি <তুহ্মি (মধ্যবাঙ্গালায়) <তুম্হে (বৌদ্ধগান) <তুম্হে (অপভ্রংশ, প্রাকৃত, পালি, বহুবচনে)। নব্য-হিন্দু-আর্য্য (Neo-Indo-Aryan) ভাষার সহিত তুলনায় মারাঠী 'তুম্হাঁ', গুজরাটী 'তমে', নেপালী 'তিমি', বেদিয়া (Gypsy) 'তুমেন', পাঞ্জাবী 'তুসীঁ', সিন্ধী 'তবহীঁ'—মধ্যম পুরুষের বহুবচনে।

যদি বাঙ্গালা, অপভ্রংশ, প্রাকৃত, পালি ও সংস্কৃতে চর্-ধাতুর বর্ত্তমান কালের অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের রূপ করা যায়, তবে আমরা দেখিব—

বাং চর্ <প্রা., পা., সং., চর

বাং চর <প্রাচীন বাং., প্রা., চরহ

<পালি চরথ = সং চরত

বাঙ্গালার নিত্য-বর্ত্তমান (লট্) ও অনুজ্ঞার (লোট) সম্ভ্রমার্থ মধ্যম পুরুষের গোলযোগ পালি-যুগের। পালি চরথ, প্রাকৃত চরহ = সং চরত, চরথ উভয়ই।

নব্য-হিন্দু-আর্য্য ভাষাসমূহের সহিত তুলনা করিলে—বাঙ্গালা 'চর্', আসামী, উড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, নেপালী চর্, সিন্ধী চরি, চরু। বাং, চর, উ. চর, পূরবিয়া চরহ, —স, আস. চরাঁ (চন্দ্রবিন্দু প্রক্ষিপ্ত), নে. চরো, চরে, মা. চরা, হি. পা. গুজ. সিন্ধী চরো (<অপভ্রংশ চরহু)। মারাঠী ও আসামী ভিন্ন এই সমস্ত ভাষায় নিত্যবর্ত্তমান ও অনুজ্ঞার মধ্যমপুরুষ বহুবচনের রূপ একই।

এক্ষণে ১ম পুরুষের কথা। বাং সে <অর্দ্ধমাগধী সে (১মা ও ৩য়া) <সং তেন (৩য়া); বাং তিনি <সং তানি (যেমন দিদী <দাদী; তিসী <তসী <অতসী): তুলনায়—বাং সে, উড়িয়া, মৈথিলী সে, আসামী সি, ভোজপুরী সে ; হিন্দী, পঞ্জাবী, সিন্ধী ব্রজবুলি সো—সমস্তই একবচন। বাং 'তিনি' মৈথিলী তনি, ভোজপুরী তৈন্হ, ব্রজ. তিনি, পঞ্জাবী. তিনী, সিন্ধী

তিনি, নেপালী তিনুহ। এই সমস্তই কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কারকের বহুবচনের শব্দরূপের মূল (stem of oblique cases)।

বাং চরুক <প্রাচীন বাং চরউক <প্রা, চরউ+ক স্বার্থে <সং চরতু।

বাং চরুন <প্রাচীন বাং চরন্তু <প্রা পা. সং. চরন্তু।

অন্য ভাষার সহিত তুলনা করিলে—বাং চরুক, প্রাচীন বাঙ্গালা চরু, চরউ, চরুক, চরউক, আসামী চরক; মৈথিলী চরু, চরৌক্; উড়িয়া চরু; মারাঠী চরো, চরু; নেপালী চরোস্। স্বার্থে "ক" বাং. আ. ও মৈ. ভাষায় দেখা যাইতেছে।

বাং চরুন, প্রাচীন বাঙ্গালা চরন্তু (আসামী চরোক), মৈথিলী চরৌহ্নি, উড়িয়া চরন্তু, মারাঠী চরোৎ, চরুং, নেপালী চরুন্।

বাং, আ. উ. নে. ভিন্ন নব্য হিন্দু-আর্য্য ভাষায় প্রথম পুরুষের নিত্য-বর্ত্তমান ও অনুজ্ঞার রূপ একই। স্বার্থে "ক" মধ্য-বাঙ্গালায় নিত্য-বর্ত্তমান, বর্ত্তমান অনুজ্ঞা, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের তুচ্ছার্থ প্রথম পুরুষে বিকল্পে ব্যবহৃত হইত; যেমন সে চরে, চরেক, চরু, চরুক, চরিল, চরিলেক, চরিব, চরিবেক। আধুনিক বাঙ্গালার অনুজ্ঞা হইলে "ক" স্থায়ী হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উৎপত্তি কোথা হইতে? প্রথমে নব্য-হিন্দু-আর্য্য ভাষাসমূহের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যাউক। আসামী ও উড়িয়ায় এই ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার তুল্যরূপ কোন পদ আছে কি না, জানি না। কিন্তু পূরবিয়া হিন্দীতে (Hoernle's Eastern Hindi) বাঙ্গালার তুল্যরূপ পাওয়া যায়। যেমন—'চরিহ'।[১] বাঙ্গালার ন্যায় তাহাতেও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই অনুজ্ঞাই ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন সিন্ধী ভাষায় এবং কখন কখন নব্য-সিন্ধী ভাষায় 'চরিহে' এইরূপ অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষে বহুবচনের রূপ পাওয়া যায়। এইরূপ হিন্দী চরিয়ো, প. চরীও।

এক্ষণে ব্যুৎপত্তি হিসাবে, বাং চরিও <চরিহ (প্রাচীন বাং বৌদ্ধগান, কৃষ্ণকীর্ত্তন ইত্যাদি <* চরিহহ <চরিহিহ (অপভ্রংশ, প্রাকৃত) <চরিষ্যথ (সং)।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার তুচ্ছ মধ্যমপুরুষের রূপ নিত্য-বর্ত্তমানের তুল্য হইলেও তাহাদের উৎপত্তি বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। চরিস্ (অনুজ্ঞা) * চরিসি <চরিহসি (বৌদ্ধগান) <চরিহিসি (প্রাকৃত) <চরিষ্যসি (সং)।

চরিস্ (নিত্য-বর্ত্তমান) <চরসি—(প্রাচীন বাঙ্গালা, বৌদ্ধগান, প্রাকৃত, পালি ও সংস্কৃত)।

বৌদ্ধগানে এই ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রয়োগ পাওয়া যায়।

১। 498. The pres. imper. may optionally add the following suff. in the 2nd person; viz., sing. ইহ and plur. ইহু, e. g., পঢ়িহ *read thou*, পঢ়িহু *read you*. This is a respectful form of the imper. implying request or prayer rather than command, and may be called a *precative*. Sometimes it is used in the sense of a simple future. (Hoernle's Com. Gram. of Gaudian Languages, p. 339).

সদ্‌গুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল। (ভুসুকু) ৩১ পৃঃ।

জই তুম্হে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজনা

নলণীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা॥ (ভুসুকু) ৪০ পৃঃ।

সংস্কৃত ল্‌ট্‌ হইতে উদ্ভূত মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার পদ ছাড়া প্রাচীন বাঙ্গালার প্রথম পুরুষ ও উত্তম পুরুষের পদও দেখা যায়।

	একবচন	বহুবচন
প্রথম পুরুষ—	চরিহে, চরিএ	×
মধ্যম পুরুষ—	*চরিসি	চরিহ
উত্তম পুরুষ—	চরিমো	চরিউ, চরিউ

এইগুলির প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, প্রথম পুরুষে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে—

কেহো যবেঁ বেকত **করিহে** এহা কাজ।

আহ্মার থাঁথার তবেঁ তোহ্মে পাইবেঁ লাজ॥ ২৫১ পৃঃ

ধরী তোহ্মে আহ্মার বচনে।

নিষধ রাধাক যতনে॥

আর বার হেন না **করিহে**।

পুরুষের আখি **নিবারিহে**॥ ২৬২ পৃঃ

কান্দিআঁ জাণায়িবোঁ কাঁশে।

পাছে কাহাক্রি মোকে না **দিহে** দোষে॥ ১০১ পৃঃ

যবে কাহ্ন না **মিলিহে** করমের ফলে।

হাতে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে॥ ৩৩৬ পৃঃ

যবেঁ তোরে **মারিহে** পরাণে।

তবেঁ তোহ্মে রাখিব কোণ জনে। ৬৫ পৃঃ

সুণী কি **বুলিহে** বাপ নান্দে।

বাঁশী হারাইলোঁ মো নিন্দে॥ ৩১৪ পৃঃ

শুণীএ যবেঁ সে আইহন বীর।

করেতেঁ তোহ্মা করিব চীর॥ ৭৩ পৃঃ

সখি সব নিষধ যতনে।

কেহো তার না **কহিএ** মরণে। ২৫৭ পৃঃ

কৃত্তিবাসের রামায়ণ (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) হইতে—

আইসুক ভৃগুরাম তবেসি প্রাণ **জাইহে**।—উত্তরকাণ্ড, ১১৭ কলম

উত্তমপুরুষে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে—

কেমনে বঞ্চিঅমো মোঞে একসরী কুঞ্জে। ৩৮৭ পৃঃ
আগু হউ রাধা পাঁছে লইউ আহ্মে ভার। ১৮৩ পৃঃ
এথাঁ আপ সঙ্গে আহ্মে দেখী।
অমৃতে সিঞ্চিঅউ[1] দুই আক্ষী॥ ১৯৯ পৃঃ
যুগতী করিউ এবেঁ সুন বড়ায়ি ল
তোর মোর এক মনে। ১২০ পৃঃ
চল রাধা পথ এড়ি যাইউ বনে বন। ১২১ পৃঃ
আনহ সকল সখিজন
মেলী করিউ যুগতী। ১৪১ পৃঃ
সন্ধ্যা পার কর যাইউ মথুরার হাটে। ১৫৫ পৃঃ
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন। ৩৫৪ পৃঃ.

কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে—

বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিউ কথন। উত্তরকাণ্ড, ৫৬ কলম।

চরিএ <চরিহে <* চরিহএ <চরিহই (অপভ্রংশ) <চরিহিই (প্রাকৃত) <চরিষ্যতি (সং)। তুলনায় প্রাচীন-হি. চরিহই, চরিহহি, ব্রজভাষা চরিহৈ, পুরবিয়া-হি. চরী (<*চরিঈ <*চরিহী)[2]। চরিএ পদটী বড় গোলমেলে। মধ্য বাঙ্গালায় ইহার তিন প্রকার প্রয়োগ পাওয়া যায়। (১) বর্ত্তমানে উত্তমপুরুষের বহুবচনে। আহ্মি চরিএ=সং অস্মাভিঃ চর্য্যতে। (২) বর্ত্তমান কর্ম্মবাচ্যে চরিএ=সং চর্য্যতে। (৩) ভবিষ্যতে প্রথম পুরুষে চরিএ=চরিহে=সং চরিষ্যতি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিকল্পে হ লোপের দৃষ্টান্ত যথা,—বারহ, বার; গোহারী, গোআরী; খাহ=খাঅ। চরিমু, চরিহিমু, চরিমো <চরিহিমো, (প্রাকৃত) <চরিষ্যাম (সং)। চরিউ, চরিউ <* চরিহু <চরীসু (অপভ্রংশ) <চরিস্সং (প্রাকৃত) <চরিষ্যামি (সংস্কৃত)।

ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে, 'চরিউ' ও 'চরিমো' এই উভয়ের মধ্যে বচন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তুলনায় বাং চরিউ, চরিউ, ব্রজভাষা চরিহৌ (একবচন), মাড়োয়ারী চরহূ (একবচন)[3]; বাং চরিমু, চরিমো, আসামী চরিম (এক ও বহুবচন), উড়িয়া চরিমি (একবচন), (<প্রাকৃত চরিহিমি) উড়িয়ার চরিবি পদের বিকারে চরিমি নহে, যেমন Hoernle প্রভৃতি মনে করেন (Hoernle, ৩৬৫ পৃঃ; Hallam এর Oriya Grammar, ৪৮১ পৃঃ)। সাহিত্যের ভাষা হইতে নির্ব্বাসিত হইলেও প্রাদেশিক ভাবে 'চরিমু' ও 'চরিমো' পদের প্রয়োগ আছে। যেমন দিনাজপুরে চরিম্; মালদহে চরমু, রাজবংশী (রঙ্গপুর) চরিম, চরিমু, চরিমো; ঢাকায় চরুম; সিলহটে চরমু; চাকমায় চরিম; বরিশালে চরমু।

১। মূলে সিঞ্চউ ছাপার ভুল। টীকায় সিঞ্চিউ দেওয়া হইয়াছে।
২। Gaudian Grammar, ৩৫৬ পৃঃ। ৩। ঐ, ৩৫৮ পৃঃ।

এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সমেত সমস্ত বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যে 'চরিমু' পদের বহুল ব্যবহার ছিল ;—

দৈত্য বলে ঝাট আন মহেশের শূল।
সেনা সনে রাবণায় করিমু নির্মূল॥ (কৃত্তিবাস, উত্তরকাণ্ড, ১০৪ পৃঃ)
শাপ অগ্নি দিমু আজি কোন জনে ডরি।
শাপ অগ্নিতে পোড়াইব অযোধ্যা নগরী॥ (ঐ, ২৮১ পৃঃ)
কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।
চরণে নূপুর দিমু বলে কোহ্ন জন॥
শ্রীকৃষ্ণবিজয় (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, ১৫৬ পৃঃ)
প্রভু বলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥
(বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, চৈতন্য ভাগবত, ১১৮১ পৃঃ)
আজি তোর গলায় কেলিমু গৌড়পাট।
সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট॥
(ঐ, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল, ১১১৬ পৃঃ)
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥ (ঐ, চৈতন্য-চরিতামৃত, ১২২৫ পৃঃ)

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ভবিষ্যৎ কালেরও প্রয়োগ হয়; যেমন, সদা সত্য কথা বলিও, কিংবা সদা সত্য কথা বলিবে।

আসামীতেও এইরূপ[১]। পুরবিয়া হিন্দীতেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়[২]। এইরূপ প্রয়োগ বাস্তবিক মূলানুযায়ী। কেন না, সং 'তব্য' প্রত্যয় হইতে বা. আ. পূরবিয়া হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ভবিষ্যতের ইব, অব প্রত্যয় আসিয়াছে : বাং চলিব <চলিঅব্ব <চলিতব্য। ভবিষ্যৎ অর্থই বরং এই সব ভাষায় নূতন সৃষ্টি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

পুস্তক-বিবৃতি

১। Grammatik der Prakrit-sprachen, von R. Pischel.
২। A Comparative Grammar of the Gaudian Languages by A. F. Rudolf Hoernle.
৩। An Introduction to the Maithili Dialect of the Bihari Language, Part I, Grammar, by G. A. Grierson.
৪। Oriya Grammar by E. C. B. Hallam.
৫। A Simplified Pali Grammar by E. Müller.
৬। অসমীয়া ব্যাকরণ, হেমচন্দ্র বরুয়া-প্রণীত।
৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।
৮। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ঐ।

১। অস. ব্যাকরণ—৯১ পৃঃ।
২। Gaudian Grammar, ৩৫৫ পৃঃ, ৫০৮ প্যারা।

Scale - 4½ inches = one mile.
উত্তর
রাধাকুণ্ড জলা
তারাজুলী নদী
দলকাকুণ্ড জলা
হরিকুণ্ড জলা
গড় খাই
গড়ের মৃৎ প্রাচীর
যাত্রাসিদ্ধি ধর্মঠাকুর
এই স্থানে প্রাচীরের চিহ্ন আছে
জালন্দর বা জালালে পুকুর
বাঘের পুকুর
জালন্দর বা জালালে
বর্ত্তমান চলিত নাম
গড় সুলতানপুর
ভোবলা বা গড় ভবানীপুর মৌজা
হনুমান দরজা

জালন্দার গড়

জালন্দার গড় *

(অস্তিত্বের অনুসন্ধান)

মাণিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম প্রভৃতি কবিগণের রচিত ধর্ম্মমঙ্গলে ময়নার রাজা লাউসেনের কামদল বাঘ বধ একটী বিশিষ্ট পালা। লাউসেন, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর পুত্র; কর্ণসেন ইহার পিতা। ঢেকুরের ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে কর্ণসেনের পুত্রগুলি নিহত হয় এবং বৃদ্ধবয়সে রঞ্জাবতীর পাণি গ্রহণ করিয়া, লাউসেন গৌড়েশ্বরের নিকট "ময়নাভুবন" ইনাম পাইয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। লাউসেন ধর্ম্মের সেবক এবং ধর্ম্মের তথা অন্যান্য দেবতাগণের কৃপা তাঁহার উপর যথেষ্ট। গৌড়েশ্বরের দর্শন কামনায় ময়না হইতে যাত্রা করিয়া, তিনি জালন্দার গড়ে কামদল বাঘ বধ করেন।

কামদল বাঘ বধ পালার উপাখ্যানভাগ এইরূপ,—জল্লাদ বা জালানশিখর জালন্দার গড়ের রাজা ছিলেন। একদা মৃগয়ায় গিয়া তারাদীঘীর জঙ্গলে একটী শার্দ্দূল-শাবক প্রাপ্ত হইয়া পুত্রস্নেহে তাহাকে পালন করিতে থাকেন। রূপী বাঘিনীর বেটা কামদল বাঘ দিনে দিনে প্রচণ্ড বিক্রমশালী ও অত্যাচারী হওয়ায় রাজা তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখেন। কামদল বাঘ ইন্দ্রের নর্ত্তক ছিল; অভিশাপে ব্যাঘ্রজন্ম গ্রহণ করে। জালানশিখর শৈব ছিলেন—তাঁহার ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হরপার্ব্বতী ভিক্ষার্থ আগমন করেন। রাজা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ভিক্ষা না দিয়া, কুক্কুর "লেলাইয়া" দেন। দেবী কুপিতা হইয়া কামদলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলে, কামদল বাঘ নগর ছারখার করিয়া দেয়। রাজা প্রাণভয়ে গৌড়ে আশ্রয় লয়েন। পরে গৌড়েশ্বরও সদলে ব্যাঘ্র দমনে আসিয়া, ব্যাঘ্ররাজ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। সেই অবধি কামদল জালন্দার গড়ে রাজা হইয়া বসে ও অজেয় হইয়া উঠে। লাউসেন পরে তাহাকে মারিয়া ফেলেন।

গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপাল ও ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মপাল একই কি না, এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও দশম ও একাদশ শতাব্দীতে লাউসেনের স্থিতিকাল বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গলের বর্ণিত অনেক স্থানের ও গড়-বাড়ীর নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। জালন্দার গড়ের সংবাদ আজ পর্য্যন্ত কেহ লয়েন নাই এবং তাহার অস্তিত্ব দেখাইতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

জালন্দার গড়ের নিদর্শন এখন যেখানে পাওয়া যায়, সেই গ্রামের নাম সুলতানপুর। ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত তল্লে বরদার মধ্যে ঐ গণ্ডগ্রামখানি অবস্থিত। ঘাটাল পাকা রাস্তা হইতে বরদার নিকট উত্তর মুখে খড়ার গ্রাম হইয়া একটী রাস্তা গিয়াছে এবং ঐ রাস্তাটী সুলতানপুর গ্রামে গিয়া শেষ হইয়াছে। তৎপরে ঐ গ্রামের জলায় মধ্যে স্থানে স্থানে ঐ রাস্তার কিয়দংশ এখনও দৃষ্ট হয়। লোকে সাধারণতঃ ইহাকে "নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল" বলে। আমাদের মেদিনীপুর জেলার

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩০শ বার্ষিক ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

একাধিক ইতিহাস রচিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই ইহার উল্লেখ করেন নাই। পুরাকালে এই জাঙ্গালটী একটী বিশিষ্ট রাজবর্ত্ম ছিল, এবং ইহা পুরী যাইবার রাস্তার সহিত পাঁশকুড়ার নিকট মিশিয়াছে: মোগল পাঠানের আমলে বাদসাহী রাস্তা বা সাহী সড়ক[১] জাহানাবাদ (বর্ত্তমান আরামবাগ) হইতে গোয়ালপাড়া (বর্ত্তমান পাঁশকুড়ার সন্নিকট) অবধি বিস্তৃত ছিল। ঐ রাস্তাটী গড়মান্দারন হইতে দারুকেশ্বর নদের কূলে কূলে চিতুয়া অবধি দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে পাঁশকুড়া অবধি গিয়াছে এবং তথা হইতে মেদিনীপুর হইয়া সুবর্ণরেখার তীরে পুরীরাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তর দিক্ হইতে মেদিনীপুর, তথা পুরীধাম যাইবার এইটিই প্রশস্ত রাস্তা ছিল। মোগল পাঠান যুদ্ধের সময় বাদসাহী ফৌজ বহুবার এই রাস্তায় যাতায়াত করিয়াছে। প্রবাদ যে, নন্দকাপাসিয়া নামক একজন উত্তরাঞ্চলের বস্ত্রব্যবসায়ী এই জাঙ্গালটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঐ রাস্তাই তৎকালে দক্ষিণে যাইবার short cut ছিল। বরদারাজ শোভাসিংহও বিদ্রোহী হইয়া, এই রাস্তা দিয়াই সৈন্য লইয়া গিয়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি আক্রমণ করেন। তারাজুলী ও দামোদর নদ এই গড়খাইএর উত্তরে মিলিত হইয়া পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই স্থানটী প্রাচীন কালের দুর্গনির্ম্মাণের বেশ উপযোগী ছিল। নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল গড়ের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণ দিকে যেখানে গড়ে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে একটী বিস্তৃত দ্বার ছিল, তাহাকে এখনও 'হনুমানদরজা' বলিয়া থাকে এবং ইহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। গড়ের উত্তর পূর্ব্ব কোণে দল্‌কাকুণ্ড নামে একটী জলা বা বিল আছে। ঐখানেই তারাজুলী ও দামোদর প্রবাহিত হইত। এক্ষণে সরকারী বাঁধের কল্যাণে ঐ নদীদ্বয়ের মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় একটী জলা বা বিলে পরিণত হইয়াছে। দল্‌কাকুণ্ড পূর্ব্বকালে দল্‌কি নগর ছিল বলিয়া প্রবাদ এবং ঐ স্থানে সময়ে সময়ে ইষ্টকাদি-নির্ম্মিত গৃহাবশেষ ও ঘাট-বাঁধান পুষ্করিণী দেখা যাইত। ঐ স্থান হইতে একটি সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি উদ্ধার হইয়া, গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বুড়া শিব বলিয়া পরিচিত আছেন। দল্‌কা নামটী কামদল নামের সহিত সাদৃশ্য আছে। আরামবাগ-গোঘাটের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মঠাকুর স্বরূপনারায়ণের "কামিনী" স্বপ্নাদেশে দল্‌কার জলা হইতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গেল।

গড়ের মৃৎপ্রাচীর, যাহা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা স্থানে স্থানে ৬০।৭০ ফুট উচ্চ এবং চতুর্দ্দিকে প্রায় এক মাইল ব্যাপিয়া এই প্রাচীর দেওয়া ছিল। গড়ের বায়ুকোণে "জালানে পুকুর" নামক একটী অতি বিস্তৃত দীর্ঘিকা ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক মজিয়া গিয়াছে। উহার অতি

১। Badshahi Road—This road starting from Jehanabad where it was joined by roads from Burdwan and Satgaon went south-west to Mandaran, thence south-east along the Darkesvar River to Chitwa in Daspur Thana and thence nearly south to Goalpara near modern Panskura. From this place it apparently passed due east to Midnapur following very much the same line as the Graud Trunk Road and from Midnapur it ran a little to the west of the Orissa Trunk Road through old villages Kesiari and Gageneswar until it joined the Subarnarekha at Jaleswar.

Bengal District Gazetteer.

সন্নিকটে প্রাচীরের বাহিরে কতকটা খালি জায়গা পড়িয়া আছে এবং তদুপরি ইষ্টকাদি স্তূপাকারে রহিয়াছে। এইখানে রাজবাড়ী ও কোষাগার ছিল বলিয়া প্রবাদ। ঐ স্থানেই "যাত্রাসিদ্ধি" নামক "ধর্ম্মবিগ্রহ" বাগ্‌দি পণ্ডিতগণের দ্বারা অদ্যাপি পূজা পাইয়া আসিতেছেন। পণ্ডিতেরা বলেন, ঐ ঠাকুর রাজা লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে ঠাকুরের পাকা মন্দির ছিল, তিনি এক্ষণে কাঁচা ঘরে আছেন। ঐ পণ্ডিতের নিকট আমি দ্বিজ রূপরামকৃত ধর্ম্মমঙ্গলের হস্তলিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি। গড়ের নৈঋর্ত কোণে গড়ভবানীপুর বা ভোব্‌লা নামক মৌজায় বাসুলী দেবী গড়রক্ষাকারিণী বলিয়া পরিচিত আছেন। জাঙ্গালের অনতিদূরে "বাঘের পুকুর" নামে একটী পুষ্করিণী আছে, তথায় কামদল বাঘ লাউসেন কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। কামদল বধ করিয়া লাউসেন জালন্দার গড়ের উত্তরে তারাদীঘীতে কুম্ভীর বধ করিয়াছিলেন। গড়ের উত্তরে তারাজুলী নামক নদী এবং তদুত্তরে তারাহাট নামক একটী প্রাচীন পল্লী ও একটী প্রকাণ্ড দীঘীর অবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

প্রবাদ ও কাহিনীতে এই স্থান "জালন্দার গড়" বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলকারদিগের গৌড়ের পথের বর্ণনায় জালন্দাভূমি বর্দ্ধমানের উত্তর বলিয়া জানা যায়। পথের বর্ণনায় কবিগণ সকলেই প্রায় এক-মতাবলম্বী। ময়নাগড় মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত এবং বর্ত্তমান তমলুক হইতে ১৩।১৪ মাইল। কিন্তু কোন কবিই "জাহানাবাজ" বা বর্ত্তমান আরামবাগের দক্ষিণের পথের বর্ণনা বিশেষ ভাবে করেন নাই। ময়না হইতে তৎকালে আসিতে হইলে নিশ্চয় "নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল" দিয়া আসিতে হইত। কারণ, তখন অন্য কোন পথ ছিল না। পাঁশকূড়া হইতে বরদা হইয়া ঐ জাঙ্গাল ঘাটালের রাস্তায় মিশিয়া, আবার উত্তর মুখে বরাবর জালন্দার গড়ের ভিতর দিয়া জাহানাবাদে (জানাবাজে) পৌঁছিয়াছে। যে স্থানে ঘাটালের রাস্তায় মিলিয়াছে, সেখানে "সরণি" "তিন মুখে" গিয়াছে। ঘনরাম বলিতেছেন,—

লাউসেন ও কর্পূর সেন—

গুরুপদ ভাবি যান পরম কৌতুকে।
কতদূরে সরণি দেখেন তিনমুখে॥
লাউসেন কন ভায়া এবে চল আগে।
পথে দাঁড়াইতে নারি যাব কোন দিগে॥
এতেক কহিল যদি সরস চাতুরী।
কর্পূর কহেন দাদা নিবেদন করি॥
অগ্রগামী তোমার কখন আমি নই।
ভালমন্দ পথের বিশেষ কথা কই॥
যদি যাব মহাশয় পশ্চিম সরণি।
দেখিবে দ্বারকাপুরী অযোধ্যা অবনি॥
মথুরা গোকুল গয়া গোবর্দ্ধন গিরি।
মধুর শ্রীবৃন্দাবন কাশী বিশ্বপুরী॥

এ সকল পুণ্যস্থান করিয়া ভ্রমণ।
ছমাসের পরে যাবে গৌড়ভুবন॥
ঈশান অখিলখণ্ডে যদি যাও ভাই।
তিনমাসে তরণী সরণি সুখে যাই॥
বিরাট তনয় মুখে যদি কর ভর।
ছদিনে পাইবে রাজ্য গৌড় সহর॥

পূর্ব্বোক্ত জাঙ্গালটী যে স্থানে ঘাটালের রাস্তার সহিত মিশিয়াছে, তথায় "তেমাথানি" হইয়াছে। এই তেমাথানি হইতে একটী পথ পশ্চিম দিকে যাইয়া "পুরাতন রাণীগঞ্জ সড়কে" (old Ranigunj Road) মিশিয়াছে এবং এই পথ দিয়াই পূর্ব্বে লোকে হাঁটিয়া "পশ্চিমে" তীর্থ করিতে যাইত। ঈশান কোণ অভিমুখে পথের আর এক মুখ বরাবর বর্ত্তমান সালকিয়া[১] অবধি গিয়াছে এবং ঐ পথে গৌড় যাইতে হইলে সরস্বতী নদী বাহিয়া গঙ্গা দিয়া নৌকাযোগে যাইতে হইত। উত্তরমুখে বরাবর চলিলে জালন্দার গড় হইয়া শীঘ্র গৌড়ে যাইতে পারা যাইত। তাই লাউসেন কহিলেন,—

বিলম্বে নাহিক কার্য্য শীঘ্র চল ভাই।
ছমাস ছাড়িয়া ছদিনের পথে যাই॥
তরাসে তখন ফুটে কহেন কর্পূর।
ও পথের নামে প্রাণ করে দুর দুর॥
লাউসেন বলে কেন কিবা বল ভয়।
কর্পূর কহেন শুন দাদা মহাশয়॥
আগে ঐ অন্ধকার "জালন্দার গড়"।
গৌড়পতি প্রাণ লয়ে যায় দিল রড়॥—ইত্যাদি॥

সুতরাং এখানে পথের সহিত বর্ণনা মিলিয়াছে। কেবল "জানাবাজ" যাইবার পূর্ব্বে এই "জালন্দার গড়ের" বর্ণনা পাইলে ইহা যে নিশ্চয় সেই জালন্দার গড়, তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করা যাইত। এই সঙ্গে একখানি মানচিত্র দেওয়া গেল এবং আবশ্যকীয় স্থানগুলি চিহ্নিত করা হইয়াছে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত স্থানটী "জালন্দার গড়" বলিয়া বিশেষ প্রতীতি হয় এবং প্রবাদ ও কিম্বদন্তী তথায় লোকের মুখে মুখে আজও পূর্ব্বের ন্যায় প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। ঐ স্থানটী বাগ্দিপ্রধান। এই বাগ্দিদেরই রাজা কামদলকে বাঘ বলিয়া

১। Salkhia as a centre from which four Roads radiated + + + + The fourth connected Salkhia with Tanna Fort and turned west to Sankrail and Amta where it bifurcated—one branch going to Ghatal and Khirpai and the other south-west to Midnapur.—Bengal District Gazetteer.

পরিচিত করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। এই বাগ্দিরা এক্ষণে সামান্য কৃষিজীবী হইলেও, এখনও তাহারা আপনাদিগকে বিশেষ মর্য্যাদাবান্ মনে করে। কারণ, তাহারা সেখানের "রাজার জাতি"; তাহাদেরই কামদল বাঘ এককালে ঐ স্থানের অধিপতি ছিল। বাগ্দিদের ব্রাহ্মণ পৃথক্ এবং ঐ ব্রাহ্মণবংশ এখনও রাজপুরোহিত আখ্যায় ভূষিত ও গর্ব্বান্বিত। আমার আরও বিশ্বাস, ঐ স্থানের অনতিদূরে কবিকঙ্কণের "কালকেতুর" লীলাক্ষেত্র ছিল এবং তাহার রাজধানী গুজরাটের কিছু কিছু সন্ধান পাইতেছি এবং অন্যান্য উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়

বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ *

হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ও বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা

বাঙ্গালার আদি বৈষ্ণব কবি জয়দেব যে দিন তাঁহার "কোমল-কান্ত-পদাবলী" গাহিয়া সারস্বত কুঞ্জ মুখরিত করিয়া তুলিলেন, সেই দিন বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে প্রাণপুরুষের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই পরিচয় পাওয়া গেল। বাঙ্গালার প্রকৃতিতে যেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর লীলার ভাব-রহস্য নিহিত রহিয়াছে। জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীতে "শারদোৎফুল্লমল্লিকা" দর্শনে যদি কোন দেশের প্রাণ নাচিয়া উঠে, তবে সে আমার এই বঙ্গদেশের। এই দেশের জলে স্থলে বাতাসে যেন বৈষ্ণব-গীতিকবিতার সুর মাখান রহিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে উদ্ভূত "ভক্ত," "ভাগবত," "বৈষ্ণব," "বৈখানস" প্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদায় বা বর্ত্তমানের "শ্রী," "ব্রহ্ম," "রুদ্র" বা "সনক"-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা প্রভুভাবের অনন্তমূর্ত্তি বা নারায়ণমূর্ত্তি বা বড় জোর লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তি। শ্রীবালগোপাল উপাসনায় বাৎসল্য রসেই ভারতীয় মাধুর্য্য-রস-সাধনার চরম উৎকর্ষ প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-প্রণেতা শ্রীবিল্বমঙ্গল প্রভৃতি দুই চারিজন মহাভাগ্যবান্ সাধক শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুরলীলার রস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য আমাদের এই বঙ্গদেশেই প্রণালীবদ্ধভাবে উপলব্ধ ও প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশই মধুর-রস-ভজনের প্রকৃষ্ট স্থান দেখিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে প্রেম মূর্ত্তিমান্ হইয়া এই দেশে প্রকটিত হইয়াছিল। এই দেশের অন্যান্য সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই উদ্ভব বঙ্গবাহভূর্ত কোন প্রদেশে। কেবলমাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা উপাসনাযুক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মই এই দেশের বক্ষোভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। তাই বৈষ্ণবগীতি-কবিতা বাঙ্গালার একবারে নিজস্ব সম্পত্তি, আর এই গীতিকবিতার আলোচনায় বাঙ্গালীর প্রাণ যতটা মাতিয়া উঠে, এত আর কিছুতেই উঠে না। ইহুদি জাতির প্রাণ লুক্কায়িত যেমন ধর্ম্মের মধ্যে, প্রাচীন গ্রীসের যেমন ছিল কলা-সাহিত্যের মধ্যে ও রোমের শৃঙ্খলা ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে, তেমনি মনে হয়, বাঙ্গালার প্রাণ লুক্কায়িত আছে বৈষ্ণব গীতি-কবিতার মধ্যে। তাই কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" দ্বারা বাঙ্গালার জাতীয় জীবন-প্রতিষ্ঠা সূচিত হইল। ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী মধুর পদাবলীর মধ্যে তাহার অন্তরতম ভাবকে খুঁজিয়া পাইল।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও আবর্ত্তন এতকাল এই জাতীয় জীবনের নিজস্ব ভাবস্রোতের গতি রুদ্ধ করিয়াছিল। প্রিয়দর্শী অশোকের সময় হইতে স্কন্দগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গের ভাগ্যচক্র সমগ্র উত্তরাপথের ইতিহাসের সহিত আবর্ত্তিত হইত। গুপ্তবংশের অধঃপতনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মপালদেবের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ হয় কামরূপ, কান্যকুব্জ, গুর্জ্জর বা রাষ্ট্রকূটের অধিপতিগণ দ্বারা আক্রান্ত হইত। পালবংশের শাসনকালেই সমগ্র বঙ্গদেশ যথার্থভাবে নিজস্ব শাসনকর্ত্তা পাইল। পরাক্রম-

* ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক প্রাপ্ত।

শালী পালরাজগণ বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র, মিথিলা প্রভৃতি বঙ্গদেশের খণ্ডাংশগুলিকে স্বীয় অধিকারে আনিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই দেশকে একটী রাষ্ট্রীয় একতা প্রদান করিলেন। কিন্তু তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম পালরাজগণের কুলধর্ম্ম হওয়ায় প্রজাসাধারণকে এই ধর্ম্ম মানিয়া চলিতে হইত। সুতরাং রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য হইলেও ভাবস্বাতন্ত্র্য তখনও বাঙ্গালায় লাভ হয় নাই। সেনরাজগণ এই দেশের শৈব ও বৈষ্ণব রাজা ছিলেন। তাঁহাদের সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়াস্বরূপে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জাগরণ আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনকে আমরা Hindu Renaissance বা হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান নামে অভিহিত করিতে পারি।

পেট্রার্কের ইতালীয় ভাষায় লিখিত লরার প্রতি প্রেমের কবিতাগুলিই যেমন ইউরোপের Renaissanceএর সূচনা করিয়াছিল, আমাদের দেশেও সেইরূপ জয়দেবের কবিতা নব জাগরণের সূত্রপাত করিল। গীতগোবিন্দের পদাবলী বাঙ্গালীর হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ভাবরাজিকে যেন ভাষা প্রদান করিল—সে ইহাতে এতই মুগ্ধ হইল যে, এই মধুর ভাবকে জাতীয় জীবনের চরম সাধনারূপে স্থাপিত করিবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইল। জয়দেব বাঙ্গালী—তাঁহার কবিতা সংস্কৃত সমাস ও বিভক্তিযুক্ত হইলেও কোমলতায় ও পদসারল্যে তাহা বাঙ্গালাই। জয়দেবের সময় বঙ্গদেশ আত্মানুসন্ধানের পথে দাঁড়াইয়াছিল। জাতীয় ভাষার উন্নতি ব্যতীত জাতীয় জাগরণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। 'প্রাকৃতচন্দ্রিকায়' কৃষ্ণ পণ্ডিত (দ্বাদশ শতাব্দী) গৌড়ীয় ভাষাকে স্থান দান করিয়াছেন; তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইতালীর ন্যায় বাঙ্গালীও নবজাগরণের প্রারম্ভে নিজস্ব ভাষার উন্নতিতে মনোনিবেশ করিয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইতালীর নবজাগরণের যুগ। ঐ সময়ে ইতালী বিদেশীয় আক্রমণ ও অত্যাচারে এবং স্বদেশীয়গণের গৃহবিবাদে জর্জ্জরিত। কিন্তু এত রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যেও ইতালী একনিষ্ঠভাবে ইউরোপের মুক্তির জন্য সাধনা করিতেছিল। বঙ্গদেশও ঠিক ঐ সময়েই পাঠান আক্রমণ ও অধিকারের ফলস্বরূপ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য প্রাণপণ সাধনা করিয়াছিল।

কিন্তু এই সাধনার দুইটী প্রধান অন্তরায় ছিল। নবজাগরণের আন্দোলন এই অন্তরায়দ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া শক্তিই সঞ্চয় করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব-সাহিত্যে হিন্দুজীবনের এক নব অভ্যুদয়ের চিত্র দেখিতে পাই। বাঙ্গলার ধর্ম্মে কর্ম্মে ও জ্ঞানে জাতীয় ভাববিকাশের প্রধান অন্তরায় ছিল তথাকথিত বৌদ্ধধর্ম্ম। দ্বাদশ শতকের শেষ পাদেও বঙ্গদেশে যে বুদ্ধদেবের পবিত্র নাম পূজিত হইত, তাহার প্রমাণ জয়দেবের দশাবতারস্তোত্রের মধ্যে বুদ্ধদেবের স্তোত্র হইতে পাওয়া যায়। ভোটদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস-লেখক তারানাথ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও বঙ্গে বৌদ্ধ নিদর্শন দেখিয়াছিলেন। ১৬০৮ খৃঃ অঃ তিব্বতদেশীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুপ্তনাথ বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অল্প পরিমাণ প্রভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন। আজও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এ দেশ হইতে একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা ধর্ম্মঠাকুরের প্রকৃত তত্ত্ব বাহির করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে লোপ পাইয়াছিল। মন্ত্রযান ও বজ্রযানের সম্মিলনজাত এক অপধর্ম্ম পালরাজগণের সময়ে বঙ্গদেশকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই অপধর্ম্মের আচার ব্যবহার বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার জাতীয় জীবনের উপর এতই কলুষিত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শ্লীলতার স্বাভাবিক ব্যবধান অতি-অল্পই রক্ষিত হইত। তথাকথিত বৌদ্ধগণের আচার ব্যবহার অত্যন্ত কদর্য্য ছিল বলিয়া বোধ হয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বৌদ্ধগণ আলাপের—এমন কি, দর্শনের পর্য্যন্ত অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে। ২৮—৮।

"বাঙ্গালার ইতিহাসে" শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লেখাইয়াছেন যে, "মুসলমান-গণের বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি যত বিদ্বেষ ছিল, হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তত অধিক ছিল না।" কিন্তু বাঙ্গালার হিন্দু অভ্যুদয়ের আন্দোলন শুধু মুসলমানগণের উপরই সদ্ধর্ম্মের বিলোপনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিল না। বঙ্গ-নিকুঞ্জের মধুর পিক চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর প্রাণের গান বৈষ্ণব-পদাবলী গাহিয়া জনসাধারণের মনোহরণ করিতেছিলেন। এই অপূর্ব্ব পদাবলীর মোহন ধ্বনিতে বাঙ্গালীর প্রাণের গোপন তন্ত্রী বাজিয়া উঠায় দলে দলে লোক হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত মধুর রসের উপাসনার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া প্রাচীন হিন্দু পুরাণ ও ইতিহাসগুলির যথেষ্ট আলোচনা হইতে লাগিল। দেশের ভাষায় না বলিলে দেশবাসী জনসাধারণের প্রাণস্পর্শ করিবে না জানিয়া, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের বহুল অনুবাদ হইতে লাগিল। ইহার ফলেও নরনারী হিন্দুধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বৌদ্ধতন্ত্রের স্থলে হিন্দুতন্ত্র ব্যাখ্যাত হইতে আরম্ভ করিল। চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজার প্রচলন দ্বারাও হিন্দুধর্ম্ম সাধারণের মন আকর্ষণ করিল। এইরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া বাঙ্গালা দেশে জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠা হইল।

হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের দ্বিতীয় শত্রু হইয়াছিল মুসলমান ধর্ম্ম। মুসলমানগণ বঙ্গদেশ অধিকার করার পর শুধু যে তরবারির সাহায্যে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নহে। অবশ্য অনেকেই রাজানুগ্রহ লাভের আশায় বা রাজ উৎপীড়নের ভয়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক শ্রেণীর লোক মুসলমান পীর ও দরবেশগণের মহান্ ধর্ম্মপ্রবণতায় আকৃষ্ট হইয়াও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার হিন্দুসমাজের নিকৃষ্ট জাতিসমূহও উচ্চ সম্মান লাভের আশায় রাজধর্ম্মে যোগদান করিয়াছিলেন। এই ত্রিবিধ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুসমাজ বদ্ধপরিকর হইল। হিন্দুসমাজের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের শিথিলপ্রায় আচার ব্যবহার আবার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রের পুনরালোচনা হইতে লাগিল। প্রাচীন স্মৃতির যে সমস্ত অনুশাসন কালোপযোগী নহে, তাহা বাদ দিয়া ও যে সমস্ত আচার সমাজ রক্ষার জন্য সবিশেষ প্রয়োজন, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রের অঙ্গীভূত করিয়া এক নব্য স্মৃতি রচিত হইতে লাগিল। একদিনে

এই নব্য স্মৃতির সৃষ্টি হয় নাই; দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুসমাজকে মুসলমান প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া সুসংস্কৃত করিবার যে আন্দোলন চলিতেছিল, তাহারই ফলস্বরূপ হইতেছেন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মার্ত্তগণের স্মৃতিনিবন্ধের পুঁথি আছে। সেই পুঁথি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রঘুনন্দনের স্মৃতির অধিকাংশই তাঁহার নিজের লেখা নহে। সুতরাং নব্য স্মৃতি ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্কপ্রসূত নহে, বাঙ্গালার নব জাগরণের আন্দোলনের ফল, তাহা প্রমাণিত হইল।

হিন্দুসমাজ শুধু স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াই সমাজ রক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হন নাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতির মধ্যে বৌদ্ধ বা মুসলমান ধর্ম্মের সংস্পর্শে যে সমস্ত গলদ ঢুকিয়াছিল, তাহাও পঞ্চদশ শতাব্দীতে নব জাগরণের দিনে বিদূরিত হইল। ১৪৮০ খৃঃ অঃ দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া মেল নিয়ম প্রচলিত করিলেন। এই ঘটনার কিছু কাল পূর্ব্বে বারেন্দ্র-কুলশাস্ত্র-বিশারদ উদয়নাচার্য্য, ভাদুড়ী বারেন্দ্র কুলীন-সমাজকে আটটী পটিতে বিভক্ত করেন। এ দিকে দক্ষিণবঙ্গে দেবীবরের সমকালবর্ত্তী পরমানন্দ বসু দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সমান পর্য্যায়ে বিবাহ দিবার কুলবিধি প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপেও রাজা পরমানন্দ রায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের সামাজিক কুলাচার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করিয়া যান।

পদাবলী, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র ও স্মৃতির আলোচনা ছাড়া নব্য ন্যায়ের চর্চ্চাও বঙ্গদেশে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের, তথা বাঙ্গালীর নব জাগরণের, বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। মিথিলা এই নব্য ন্যায়ের 'আদিস্থান' ছিল। বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মকে যুক্তি দ্বারা পরাভব করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য নব জাগরণের আন্দোলনে তর্কশাস্ত্রের সাহায্যেই বৌদ্ধ ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়াছিল। যথা,—

তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥—চৈঃ চঃ।

বঙ্গদেশে কিয়ৎকাল বসবাস করিবার পর এই দেশের শাস্ত্র ও আচার ব্যবহার জানিবার জন্য মুসলমানগণের মধ্যে এক প্রকার আগ্রহ জন্মিল। মুসলমান অধিপতিগণ উৎসাহ দিয়া মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ করাইলেন। তাহাতে বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি সাধন হওয়ায় বাঙ্গালার নব জাগরণের যথেষ্ট আনুকূল্য সাধিত হইয়াছিল।

এই নব জাগরণের আন্দোলন ফলে বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত অন্তরের যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিল। ইউরোপীয় Renaissanceএ যেমন প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের আলোচনার ফলে দেশব্যাপী এক নব জীবনের সঞ্চার হইয়াছিল, এবং পরিণামে

জাতীয়ভাব প্রচারিত হইয়াছিল, আমাদের দেশেও তদ্রূপ বিদ্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের জাতীয়ভাব বিকশিত হইল। রঘুনন্দনের স্মৃতি বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোথাও প্রচলিত নাই। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সমগ্র তন্ত্রের সার উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালার শক্তি-পূজার এক অভিনব সুগম পন্থা আবিষ্কার করিয়া দিয়া গেলেন। আর কাণভট্ট শিরোমণি তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার প্রখর জ্যোতিঃসম্পাতে নব্য ন্যায়দর্শনকে বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তিরূপে পরিণত করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গের বিদ্যাপীঠ নদীয়ার উপাধি ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে তাদৃশ শ্রদ্ধা পাইত না, তিনি নদীয়ার উপাধিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ উপাধি করিলেন।

বঙ্গদেশে পীঠস্থান ছাড়া তীর্থ ছিল না—মহাপ্রভু নবদ্বীপকে বঙ্গের তীর্থ করিয়া তুলিলেন। বঙ্গদেশ যে ভারতের গতানুগতিক চিন্তাধারা বর্জ্জন করিয়া স্বাধীনভাবে নিজের জাতীয় জীবনের সমস্যার সমাধান করিতে পারে, নব্য ন্যায়, নব্য স্মৃতি, তন্ত্র ও বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মদ্বারা তাহাই প্রমাণীকৃত হইল। এই স্বাধীনভাবে চিন্তা করাই নব জাগরণের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বৈষ্ণব কবিগণ বিদ্যা-জগতের এক মহা সমৃদ্ধ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ বর্ণনার যাথার্থ্য যাহাতে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তজ্জন্য বঙ্গের নবজাগরণের ইতিহাসের সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। বাঙ্গালার পরবর্ত্তী সামাজিক ইতিহাস বুঝিবার পক্ষেও এই নবজাগরণের ইতিহাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে নবজাগরণের চিত্র

ইতালীর ফ্লরেন্সের ন্যায় নবদ্বীপ নবজাগরণের আন্দোলনের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ বিদ্যারসে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতীদৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ॥
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেহো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥—চৈঃ ভাঃ।

ইউরোপীয় Renaissance এ যেমন দেখা যায়, জ্ঞানপিপাসু ছাত্রবৃন্দ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া আল্‌স্‌ পর্ব্বত পার হইয়া ইতালীতে গমন করিতেন এবং ইতালীতে পাঠ না লইলে তাঁহাদের বিদ্যা

সমাপ্ত হইত না, সেইরূপ আমাদের জাতীয় জীবনের জাগরণের যুগে নবদ্বীপে পাঠ না লইলে কাহারও বিদ্যা সমাপ্ত হইত না। বিদ্যা-গৌরবে মণ্ডিত নবদ্বীপের উল্লিখিত চিত্রখানির পার্শ্বে পেরিক্লীসের যুগের এথেন্সের চিত্রও কি ম্লান বলিয়া বোধ হয় না? কবি কর্ণপুর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যে কিরূপ ব্যক্তিগণ দ্বারা শাস্ত্র আলোচিত হইত, তাহা লিখিয়াছেন,—

বসন্তি যত্র ক্ষিতিদেবসত্তমাঃ
সদা সদাচারপরাঃ পরায়ণাঃ।
নিরন্তরং বেদবিধানকর্ম্মসু
শ্রুতিস্মৃতীনাং বিষয়ঃ শরীরিণঃ॥

ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা যে খুব প্রবলভাবে হইত, তাহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের "বিরাগ" নবদ্বীপ দর্শন করিয়া বর্ণন করিতেছেন,—

অভ্যাসাদ্য উপাধিজাত্যনুমিতিব্যাপ্ত্যাদিশব্দাবলে-
র্জল্পারম্ভা সুদূরদূরভগবদ্বার্ত্তাপ্রসঙ্গা অমী।
যে যত্রাধিককল্পনাকুশলিনঃ তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ॥

প্রাচীন ভারতে যেমন অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞ করিবার উপলক্ষ্যে প্রবলপরাক্রান্ত কোন রাজা অপর রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইতেন বা অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকায় মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতিতে মল্লগণকে হারাইয়া মল্লশ্রেষ্ঠ "জগদ্বিজয়ী" উপাধি ধারণ করেন, সেইরূপ বিদ্যা-লোচনার যুগে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিতকে পাণ্ডিত্য ও তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিগ্বিজয়ী উপাধি লাভ করিতেন। সমসাময়িক ইউরোপীয় Renaissanceএ ও Scholastic Vogents দেখিতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর 'Frier Bacon and Frier Bungay' নামক নাটকে মহাপ্রভুর দিগ্বিজয়ী পরাভবের অনুরূপ একটী চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা অনেকগুলি দিগ্বিজয়ীর সাক্ষাৎ লাভ করি। (১) শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক কেশব কাশ্মীরীর পরাজয়কাহিনী বর্ণিত আছে। (২) ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে শ্যামদাস নামে এক দিগ্বিজয়ীর সাক্ষাৎ পাই।

এক দ্বিজ দিগ্বিজয়ী বহু দেশ জিনি।
শান্তিপুরে উপনীত হইলা আপনি॥
বেদপঞ্চানন আখ্যা প্রভুর শুনিঞা।
তাঁহার নিকটে গেলা অতি হর্ষ হৈয়া॥

(৩) প্রেমবিলাসে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট রূপচন্দ্র দিগ্বিজয়ীর পরাভবের কথা আছে,—

দিগ্বিজয় করি তেহো নানা স্থানে যায়।
যেখানে পণ্ডিত দেখে বিচার করয়॥

(৪) নরোত্তমবিলাসে দিগ্বিজয়ী মুরারির সহিত ঠাকুর মহাশয়ের, ব্রাহ্মণ বড়, কি বৈষ্ণব বড়, এই সকল লইয়া তর্কের কথা বর্ণিত আছে।

পরাভব হইয়া দিগ্বিজয়ী সবে কয়।
বৈষ্ণবমহিমা কহি মোর সাধ্য নয়॥

(৫) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সংগৃহীত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থে প্রকাশিত একখানি প্রাচীন দলিল হইতে জানা যায় যে, ১৭১৭ খৃঃ অঃ রাধামোহন ঠাকুর জয়পুরের রাজার প্রেরিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া ব্রজলীলার পরকীয়াবাদ স্থাপন করেন। দেশের ধনিগণও বিদ্যারসে মাতোয়ারা ছিলেন। তাই এই সমস্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যশোবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যও লাভ করিতেন।

পরমসমৃদ্ধ অশ্ব গজযুক্ত হই।
সভা জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী॥'—চৈঃ ভাঃ।

ধর্ম্মসংস্কার

শুধু বিদ্যার আলোচনাদ্বারা সম্যক্‌ভাবে জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে না। বিদ্যা আলোচনার ফলে বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ হয়, স্বাধীন চিন্তা বিকাশ লাভ করে। কিন্তু এই স্বাধীন চিন্তা বিকাশের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ না থাকিলে সাধারণ সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি অবহেলা-বশতঃ সমাজে দুর্নীতিই প্রকাশ পায়। ইতালীর Renaissanceএ তাহাই হইয়াছিল, Boccacioর Decameron তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের দেশের অন্তরাত্মাও শুধু বিদ্যার আলোচনায় তৃপ্ত হইতে পারে নাই।

রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহাররসে॥
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥—চৈঃ ভাঃ।

অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি অনুভবী ভক্তগণ যথার্থই উক্ত প্রকার দুঃখ বোধ করিয়াছিলেন। Martin Luther যেমন ইউরোপীয় Renaissanceএর পরিণত ফল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তেমনি জাতীয় নবজাগরণপ্রসূত স্বাধীন চিন্তার চরম বিকাশ। এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটী protest। মানবজন্ম কোন পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ বলিয়া সাধারণতঃ এতকাল বিবেচিত হইত। হিন্দুগণ ক্রিয়াকর্ম্ম বা জ্ঞানসাধনা করিয়া হয় স্বর্গলাভ, না হয় মোক্ষলাভ করিয়া মানবজন্ম পরিহার করিতে চেষ্টাপরায়ণ ছিলেন। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম জগতের অবিসম্বাদিত মধ্যস্থ (Medium between God and man) ছিল। মহাপ্রভু প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ্যে জাতি অপেক্ষা গুণের অধিকার স্থাপন করিলেন। মানবিকতার মহিমা ঘোষণা করাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। চণ্ডিদাস গাহিয়াছিলেন,—

শুন হে মানুষ ভাই।
সবার উপরে   মানুষ বড়
তাহার উপরে নাই॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবাদের প্রথম কথাই হইতেছে,—

কৃষ্ণের যতেক লীলা   সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপ-বেশ বেণুকর   নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥—চৈঃ চঃ।

প্রেমের রাজ্যে মানব ও ভগবান্ সমভূমিতে দণ্ডায়মান। ভগবান্ মানবের প্রেমলাভের জন্য ব্যাকুল—এমন কি, তিনি মানবের দ্বারে প্রেমের ভিখারী।

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সেই ভাবে আমি হই তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
"তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম"॥—চৈঃ চঃ।

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস বুঝার পক্ষে মহাপ্রভু মানবকে কি গৌরবময় স্থান দান করিয়া মানবের মনকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা বুঝা বিশেষ প্রয়োজন। লীলাবাদেই বঙ্গদেশের জাতীয় নবজাগরণের ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করিল। এক্ষণে বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই নবভাবে অনুপ্রাণিত জাতির সামাজিক ইতিহাস কি ভাবে লিখিত হইয়াছে, দেখা যাউক।

কোন দেশেই দুই এক শতাব্দীর মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হয় না; ভারতবর্ষের ন্যায় সংরক্ষণশীল দেশের পক্ষে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। বাঙ্গালাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে বৈষ্ণব-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা মুসলমানগণের শাসনের সময়। সুতরাং কালানুসারে (chronologically) (১২০০—১৮০০) এই সময়ে সামাজিক ইতিহাস রচনা করার বিশেষ প্রয়োজনও নাই, আর আয়াসসাধ্যও বটে। প্রাক্‌চৈতন্য, চৈতন্য ও চৈতন্যের পরবর্ত্তী যুগের মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিয়া যাইব।

বাঙ্গালার ধর্ম্ম

ধর্ম্মকেই মধ্যমণির ন্যায় স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সমগ্র জীবন বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

ধর্ম্ম আন্দোলন হইতেই বাঙ্গালাদেশে সাহিত্যের উৎপত্তি। অতএব সর্ব্বপ্রথমে বৈষ্ণবসাহিত্যে বঙ্গদেশের ধর্ম্ম ইতিহাসের কি উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই দেখা যাউক।

বৌদ্ধধর্ম্ম

মহাপ্রভুর সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যে ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থপর্য্যটনের মধ্যে বৌদ্ধগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কথা লিখিত আছে।

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমণকালে বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহিত বিচার বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণকে হিন্দুগণ এ সময়ে "পাষণ্ডী" নামে অভিহিত করিতেন।

পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞা।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ মতে।
প্রভু আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিল কহিতে॥—চৈঃ চঃ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় "বেণের মেয়ে" নামক উপন্যাসে বৈশ্যগণের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্মের অধিক প্রচার ছিল লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও সেই কথা পাওয়া যায়।

সংজ্ঞামাত্রবিশেষতো ভুজভুবো বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধা ইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৌদ্ধগণ এ সময়ে সমাজে অত্যন্ত হেয় হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং বৌদ্ধগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তর্কে পরাজিত হইয়া বৌদ্ধগণ মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে যাইয়া নিজেদের আচার্য্যকেই বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন। তখন,—

হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি প্রভুপদে লইল শরণ॥
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ॥
প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি॥
তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন॥

গুরুকর্ণে কহে কহ কৃষ্ণ রাম হরি।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে হরি বলি ॥
কৃষ্ণ কহি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময় ॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীচৈতন্য তর্কদ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া ও কৃপাদ্বারা বৌদ্ধগণকে বৈষ্ণব করিয়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধপ্রভাব বহুল পরিমাণে খর্ব্ব করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রে কিন্তু বৌদ্ধগণকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষার অযোগ্য বলিয়া উল্লেখ আছে।

"জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ ॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তন্ত্রং ন জাপয়েৎ ॥"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

নিত্যানন্দবংশবিস্তার নামক নাতিপ্রামাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বীরভদ্র গোস্বামী নাড়ানাড়ী নামধারী বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত বহুসংখ্যক নরনারীকে খড়দহে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

তান্ত্রিক বামাচার

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বামাচারের প্রাবল্যের নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যায়। শান্তিপুর গমনকালে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ এক বামাপন্থী সন্ন্যাসীর আশ্রমে উঠিয়াছিলেন।

বামাপন্থী সন্ন্যাসী মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠোরে ॥
শুনহ শ্রীপাদ কিছু "আনন্দ" আনিব।
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব ॥
নগরী হইয়া মদ্য পিয়ে স্ত্রীসঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেল তাহার মন্দিরে ॥—চৈঃ ভাঃ।

কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক অনূদিত ভক্তমাল গ্রন্থে দেখা যায়,—

কাটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে।
শক্তি উপাসক হয় ভজে বামাচারে ॥
কাঁটাছেঁড়া মদ্যমাংস সদা ব্যবহার।
যোগিনীচক্রেতে বসি করয়ে আহার ॥

দেশে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব

বামাচার-ধর্ম্মের স্রোত দেশের মধ্যে প্রবল ভাবে বহিতে থাকায় দেশের জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত দুর্নীতি প্রকাশ পাইয়াছিল। পানদোষ সমাজে অত্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহো নাচে।
উল্লাসে মদ্যপগণ যায় তা ন পিছে ॥—চৈঃ ভাঃ।

মদ্যপগণের বর্ণনা বৈষ্ণব-সাহিত্যে বহু স্থানে দেখা যায়। দুর্নীতির প্রাবল্যের উদাহরণস্বরূপ গোবিন্দ দাসের কড়চার একটী বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

স্বার্থপর দুরাচার মদ্য মাংস খায়।
কলির জীবের বল কি হবে উপায় ॥
শিশ্নোদরপরায়ণ নিষ্ঠা-বিবর্জ্জিত।
অর্থের লাগিয়া মিথ্যা কহে অবিরত ॥
যোনিকীট রমণীর মুখ লালা খায়।
ভক্তি অমৃতের ধারা নিছিয়া ফেলায় ॥
বেশ্যার অন্নেতে রুচি বেশ্যা অন্নগত।
কনক কামিনী বালা কামকেলিরত ॥
এ কারণ মুহি শিখা সূত্র তেয়াগিয়া।
বেড়াইব দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়া ॥

নরোত্তম-বিলাসে প্রাপ্ত খেতুরীর মহোৎসবের পূর্ব্বে তদ্দেশবাসিগণের ব্যবহারও গোবিন্দদাসের প্রদত্ত চিত্রের অনুরূপ,—

এ দেশের লোক দস্যুকর্ম্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিম্বা কর্ম্ম বা কেমন ॥
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে ॥
কেহ রহে মনুষ্যের কাটা মুণ্ড লৈয়া।
খড়্গ করে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া ॥
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাত না এড়ায় ॥
সবে স্ত্রী-লম্পট জাতি বিচার রহিত।
মদ্য মাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত ॥

সাধারণের দুর্নীতির এই চিত্রের ঐতিহাসিকতার বিরুদ্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, নিজ ধর্ম্মের মহিমা ও প্রাধান্য স্থাপনের জন্য চিরকালই ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহাদের পূর্ব্বতন অবস্থাকে মসিলিপ্ত করিয়া অঙ্কন করিয়া থাকেন। তবে বহু গ্রন্থে একই অবস্থার বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে, এ বর্ণনার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু সত্যাভাস আছে।

শাক্তধর্ম্ম

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শাক্ত ধর্ম্মই জনসাধারণের ধর্ম্ম ছিল বলিয়া বোধ হয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে যে, যবন রাজা কালীর স্বপ্নাদেশে নবদ্বীপে অত্যাচার করিতে নিবৃত্ত হইলেন। ইহা হইতে তৎকালীন শাক্তধর্ম্মের প্রভাব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় অনুমান করিয়াছেন। দুর্গোৎসবে খুব আনন্দ হইত বলিয়া নবদ্বীপে ভক্তগণ যখন কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইতেন, তখন—

নাগরিয়াগুলা বোলে মাগি খাই মরে।
অকালেই দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে॥—চৈঃ ভাঃ।

মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি শক্তির লৌকিক প্রকাশগুলিও যথোপচারে পূজিত হইতেন।

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥
বাসুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥—চৈঃ ভাঃ।

বাসুলী দেবীকে বৌদ্ধধর্ম্মের বজ্রযানের বজ্রধাত্বীশ্বরী বলিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব অনুমান করেন।

শৈবধর্ম্ম

তৎকালে শৈবধর্ম্মের প্রভাবও নিতান্ত কম ছিল না।

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥—চৈঃ ভাঃ।

ধর্ম্মে প্রাণহীনতা ও বৈষ্ণবতার অভাব

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে বঙ্গে যে ধর্ম্মই প্রচলিত থাকুক না কেন, তাহা কেবল বাহ্য আচারেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের সহিত জাতীয় জীবনের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারা কেহ না জানয় গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে বান্ধি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥

যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥

দেশের চিন্তাশীল ভাবুকসম্প্রদায় এইরূপ ধর্ম্মের জন্য আকুতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই বৈষ্ণবধর্ম্ম দেশে এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল।

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার :

দেশের লোক প্রথমে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিয়াছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ জ্ঞানমার্গের কথা বুঝিতেন—বৈষ্ণবধর্ম্মের অপূর্ব্ব ভাব উন্মাদনা তাঁহাদের নিকট অদ্ভুত ও অভিনব বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। সেই জন্যই মহাপ্রভু যখন ভক্তগণকে লইয়া প্রথমে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা—

শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহো বলে সব পেট পুষিবার আশ॥
কেহো বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
উন্মত্তের প্রায় নৃত্য এ কোন ব্যাভার॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বঙ্গ, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি অল্পকালমধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এক মহাভাবের প্রবল বন্যায় বঙ্গ ও উড়িষ্যা ডুবিয়া গিয়াছিল। এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সভা করিয়া বক্তৃতা দিতে হয় নাই, মঠ বা বিহার স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে উপদেশ দিতে হয় নাই—তরবারি ত ধরিতে হয়ই নাই। ভাব যেন সংক্রামক হইয়া দেশের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমণ-কাহিনী হইতে গৌড়ীয় ধর্ম্মের প্রচার-পদ্ধতি বুঝা যাইবে।

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরিকৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কথো দূরে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥

সেই জন নিজগ্রামে করিলা গমন।
কৃষ্ণ বলি হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম ॥
গ্রামান্তর হৈতে আইসে দেখে যত জন।
তাহার দর্শন-কৃপায় হয় তার সম ॥
সেই যাই নিজগ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয় ॥
সেই যাই আর গ্রাম করে উপদেশ।
এই মত বৈষ্ণব হইল সব দক্ষিণ দেশ ॥—চৈঃ চঃ।

নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসারে অন্যান্য দেশে প্রেমধর্ম্ম যাজন করিলেন,—

মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই গোসাঞি কৈল ভক্তি প্রচারণ।
নিত্যানন্দ গোসাঞি পাঠাইলা গৌড়দেশ।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষ ॥—চৈঃ চঃ।

পরবর্ত্তী আচার্য্য নরত্তোম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ, বীরভদ্র গোস্বামীও বঙ্গ উড়িষ্যায় প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন। নিত্যানন্দপত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী ও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবজগতের পূজা পাইয়া থাকেন। মহাপ্রভু সাধারণকে সন্ন্যাস উপদেশ না দিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমেই থাকিতে বলিয়াছেন; এইরূপে সমাজসংস্কার হইয়াছিল। মহাপ্রভু স্বয়ং, ছয় গোস্বামী ও কতিপয় প্রচণ্ড বৈরাগ্যশালী মহাজন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও মহাপ্রভু তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকালে জনসাধারণের প্রতি সন্ন্যাস উপদেশ করেন নাই; গৃহে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেই উপদেশ দিয়াছিলেন। কূর্ম্ম নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলে,—

প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা ॥—চৈঃ চঃ।

সৌজাত্য-বিদ্যায় ভারতবাসী চিরদিনই বিশ্বাসবান্। তাই জাতীয় উন্নতির জন্য গুণকর্ম্ম-বিভাগযুক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এ দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবের সন্তান বৈষ্ণব হইবারই সম্ভাবনা অধিক। মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিলোপ না পায়, তজ্জন্য সাধনপথে অগ্রসর ভক্ত মহাপুরুষগণকে মহাপ্রভু বিবাহ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য্য, গৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ শেষ বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঈশাননাগরকৃত অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে,—

একদিন শ্রীঅদ্বৈত ডাকি পুত্রগণে।
নির্জ্জনে কহয়ে অতি মধুর বচনে ॥
অহে বৎসগণ সভে স্থির কর মন।
গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সার করহ শ্রবণ ॥
সন্ধ্যাবন্দনাদি আর মধ্য মহাযজ্ঞ।
যেই জন করে নিত্য সেই মহাবিজ্ঞ ॥

অদ্বৈত প্রভুর পুত্র অচ্যুত বাল্যকাল হইতেই পরম বৈষ্ণব। তিনি বিবাহ করেন নাই বলিয়া অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে বিগ্রহসেবার পর্য্যন্ত ভার দিলেন না।

অতএব শ্রীবিগ্রহের সেবাদিক ক্রিয়া।
তোমা হৈতে না চলিবে দেখিনু বুঝিয়া ॥—অঃ প্রঃ।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মহাপ্রভু বাঙ্গালার সামাজিক জীবনকে ভাঙ্গিয়া সব সন্ন্যাসী করিয়া দিতে চাহেন নাই। বরং তিনি সেই সামাজিক জীবনে প্রেমভক্তির ভাব প্রবেশ করাইয়া সমাজকে সুসংস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পর বঙ্গদেশের নৈতিক অবস্থার যে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র "জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবসেবন," যে ধর্ম্মে সাধন করিবার প্রণালী হইতেছে,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

সে ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সঙ্গে যে দেশের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? জগাই মাধাইয়ের ন্যায় মদ্যপ, চান্দরায় ও তাহার অনুচরগণের ন্যায় দস্যুগণকে যে ধর্ম্ম পরম বৈষ্ণব করিতে পারিয়াছে, যে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও জনসাধারণের চরিত্রকে মহৎ করিয়া তুলিয়াছিল। বৈষ্ণব কবি ও গ্রন্থকারগণ যেন দৈন্য ও বিনয়ের এক একজন অবতার। বৃদ্ধ জরাতুর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ "ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দো সভার শ্রীচরণ, সভে মোরে করহ সন্তোষ।" বলিয়া সমস্ত পাঠকবৃন্দের কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে পাঠকের নিকট গ্রন্থকারের ঈদৃশ বিনয় প্রকাশ নিতান্তই দুর্লভ। তন্ত্রাচার প্রচারের ফলে সমাজে ব্যভিচার দেখা দিয়াছিল। মহাপ্রভু বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে স্ত্রীমুখ দর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিলেন।

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥—চৈঃ চঃ।

ছোট হরিদাসকে দণ্ডপ্রদান করিয়া বৈষ্ণবসমাজে মহাপ্রভু এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিলেন। এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশবাসিগণ কিছুকালের জন্য ব্যভিচারাদি দোষ ত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

ধর্ম্মসংঘর্ষে শোণিতপাত ভারতের ইতিহাসে বিরল। তবে মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান—তাই বিভিন্ন দেবতার উপাসকগণের মধ্যে প্রায়ই কলহ উপস্থিত হইত, যদিও সে কলহ বাক্যেই পর্য্যবসিত হইত। বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ উচ্চ নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্য দেবদেবীর নিন্দা বা অবজ্ঞা করা নিষেধ করিয়া দিলেন।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের শ্লোক।)

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যের সহিত গণপতি, হরগৌরী, সরস্বতী ও দেবগণের বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মবিরোধে বা ধর্ম্মকলহে যোগদান করিতেন না। শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতির যুগ গত হইবার পর। পরবর্ত্তী কালে রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের বিস্তর আভাস "গোবিন্দ কবিরাজ", "রবীন্দ্রনারায়ণ রায়" প্রভৃতির চরিত্রে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম বঙ্গদেশে বিস্তৃতি লাভ করিলেও শাক্তধর্ম্মকে দেশ হইতে বিদূরিত করিতে পারে নাই। তবে, পরবর্ত্তী চণ্ডী বা অপর কোন লৌকিক দেবতার মঙ্গলসাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বন্দনা করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত মঙ্গলকাব্য জনসমাজে গীত হইত; সুতরাং গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে মহাপ্রভুর বন্দনা থাকায় দেশের উপর বৈষ্ণবপ্রভাব উপলব্ধি করা যায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর "চণ্ডী"তে, ভবানীপ্রসাদ রায়ের "দুর্গামঙ্গলে", রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের "শিবায়নে" ও ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গলে" অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীর সহিত একসঙ্গে মহাপ্রভুর বন্দনা আছে। মহাপ্রভুর জীবনকালেই তাঁহার অবতারত্ব ঘোষিত হইয়াছিল। উক্ত মঙ্গলাচরণ পাঠে জানা যায় যে, সাধারণ হিন্দুসমাজ এ মত মানিয়া লইয়াছিল। বৈষ্ণব-সমাজে ত শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি-উপাসনাই আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রভুর মন্দিরে শীঘ্র লইয়া চলিলা।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দর্শন করাইলা॥

শাক্ত সাহিত্যে মহাপ্রভু শুধু পূজিত হয়েন নাই—শাক্ত ধর্ম্মের উপর তাঁহার ধর্ম্মের প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল। শাক্ত সাহিত্যের "আগমনী গীতির" বাৎসল্যরস বৈষ্ণবপদাবলীর নিকট ঋণী। বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালার শাক্ত ধর্ম্মের সাধ্য বস্তু পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

রামপ্রসাদ সেন এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া গাহিয়াছেন,—

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি॥

বৈষ্ণবধর্ম্মের অবনতি

বৈষ্ণবধর্ম্ম রস সাধনার ধর্ম্ম। অতি উচ্চাদের সাধক না হইলে এই ধর্ম্ম সাধন করিতে যাইয়া রসের বিকারদ্বারা অভিভূত হইবার আশঙ্কা আছে। তাই মহাপ্রভু সাধারণকে শুধু নামকীর্ত্তনে অধিকারী বলিয়াছেন। কিন্তু এত করিয়া উপদেশ দিয়াও তিনি রসের বিকার হইতে এক শ্রেণীর লোককে বাঁচাইতে পারেন নাই। ইহারা সহজিয়া বা বাউল নামে এ দেশে পরিচিত। সহজধর্ম্ম অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে মন্ত্রযান ও বজ্রযান সম্প্রদায়ের সহিত এই সহজধর্ম্ম মিশ্রিত হইয়া কলুষিত আকার ধারণ করে। পরকীয়া স্ত্রী এই ধর্ম্মের সাধনের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। চণ্ডীদাস একজন, কি বহু, সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সহজধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হয়েছে পার
সহজ জেনেছে সে ॥
পরকীয়া ধন সকল প্রধান
যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে
পদ্ধতি সাধক হই।

সহজধর্ম্মের পরকীয়াবাদকে মহাপ্রভু সুসংস্কৃত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে গ্রহণ করেন। লীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণর পরকীয়াভাব হইলে রসের পরিপুষ্টি হয়। এই জন্য ভক্তগণ সখী ও মঞ্জরীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা পরকীয়াভাবে স্মরণ মনন করিবেন। কিন্তু এই সাধনায় কোন নারীর প্রয়োজন নাই, তাহা বারংবার ঘোষণা করা হইল।

গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয় ॥—চৈঃ চঃ।
পরকীয়াভাবে অতি রসের নির্য্যাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নহে বাস ॥—কর্ণানন্দ।

সুতরাং রক্ত মাংসের দৈহিক ব্যাপারকে বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া উচ্চাদের ভজনপ্রণালী স্থাপন করিলেন। এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ফলে পরকীয়াবাদ ভাবরাজ্যের কি এক অপূর্ব্ব সুষমা লাভ করিয়াছে, তাহা উজ্জ্বলনীলমণি নামক বৈষ্ণব রসশাস্ত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়। কিন্তু দুই শতাব্দীর মধ্যেই এক শ্রেণীর লোকে এই উচ্চভাবের কথা বিস্মৃত হইয়া গেল। তাহারা মহাপ্রভু ও তদনুগত শ্রীরূপ গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের নাম দিয়া এক ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া চালাইতে লাগিল। ইহারা কি ভাবে বৈষ্ণবগণের পূজনীয়

আচার্য্যবৃন্দকে স্বদলে টানিয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রেমদাস-রচিত "আনন্দ-ভৈরবে" লিখিত আছে,—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহার চরিত্র গোসাঞি করিয়াছে বর্ণন॥
সেই অনুসারে বিদ্যাপতির করণ।
চণ্ডীদাস সেই ধর্ম্ম করেছে যাজন॥
জয়দেব গোসাঞির সেই মত হয়।
গৌণরূপে ভজন কৈল ছয় মহাশয়॥
মহাপ্রভুর মনের করণ না যায় বর্ণনে।
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র দেখহ নয়নে॥
বীরভদ্র গোসাঞির কি কহিব গুণে।
বৈরগীকে শিখাইল আপন কারণে॥
যদি এহেন বাক্যে কেহ প্রতীত না হয় মনে।
বার শত নাড়াকে তের শত নাড়ী দিবেন কেনে॥
যে সব বৈরাগী প্রকৃতির মুখ নাহি দেখে।
এখন প্রকৃতি বিনে তিলার্দ্ধ না থাকে॥

উদ্ধৃত অংশের শেষ দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের পতনের ইতিহাস নিহিত আছে। সহজিয়াগণ প্রচার করিয়াছিল যে,—

মানুষের দেহ হয় নিত্যবৃন্দাবন।
পুরুষ প্রকৃতি ইথে জানিহ কারণ॥

—গৌরীদাসের নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

চিত্তসংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও ভগবানে আত্মসমর্পণযুক্ত যে সাধনা বৈষ্ণবধর্ম্মের অঙ্গীভূত, সেই সাধনাকে সহজিয়াগণ বলিল,—

হাস্তরস কৌতুকে সদা কাল গোঙাইবে।
ইহা নহিলে ব্রজপ্রাপ্তি করিতে নারিবে॥

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে সহজিয়াধর্ম্ম বহুলভাবে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থের সংখ্যা দেখিয়াই বঙ্গদেশে ইহার প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ সমাজে অত্যন্ত হেয়। কিন্তু প্রায় দুই শত বৎসর কাল ইহারাই বৈষ্ণব, বৈরাগী আখ্যায় অভিহিত হওয়ায় অধুনা ভজননিষ্ঠ কোন ভক্তকে ভদ্রসমাজে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে আবার বৈষ্ণব শব্দের সদ্‌ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এই উপধর্ম্ম মূল বৈষ্ণবধর্ম্মের কণ্ঠ একেবারে রোধ করিতে পারে নাই।

ক্ষীণভাবে চলিলেও বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন দিনই বঙ্গদেশে বিলুপ্ত হয় নাই—হইলে আজ আর বৈষ্ণবগ্রন্থরাজি আমাদের নয়নগোচর হইত না।

বর্ণাশ্রম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম

বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনের সময় ইহার প্রভাব মন্দীভূত হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর দিয়া বহু ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও সে ধর্ম্ম হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল হিন্দুর জাতীয় জীবনের অন্তস্তলে প্রোথিত।

কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে পরমার্থের চরম অবস্থা বা সাধ্য বস্তু বলিয়া ভারতবর্ষ কখনই ঘোষণা করে নাই। মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছা আসিলে যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও নিজদিগকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপরিতন অবস্থায় স্থিত কল্পনা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও ভারতের এই সনাতন পন্থা অবলম্বন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সাধারণ গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের উপযোগী হইলেও ইহা মানবের উচ্চতর জাগ্রত ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ নহে। ভাবভক্তির রাজ্যের উচ্চ গ্রামে আসীন ভক্তের পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করার কোনই প্রয়োজন নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপরিতন অনেকগুলি সাধনরাজ্যের অবস্থা চরিতামৃতের মধ্যলীলায় রায় রামানন্দ-সংবাদে লিখিত হইয়াছে। তথায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে মহাপ্রভু বাহ্য ধর্ম্ম বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর॥—চৈঃ চঃ।

প্রেমরাজ্যের জাতিভেদ অন্যপ্রকার,—

কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥—চৈঃ চঃ।
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥—চৈঃ চঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচারের সহিত ভক্তিধর্ম্মের সম্বন্ধ সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে।

সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাং।

অর্থাৎ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মপরম্পরা ভক্তির অঙ্গ, কিন্তু তাহা ভক্তিতত্ত্ববেত্তাদের মত নহে। শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—

"বর্ণাশ্রমাচারেত্যাদিকং অজাতদৃঢ়শ্রদ্ধং শুদ্ধভক্ত্যনধিকারিনং প্রত্যেবোক্তমিতি ভাবঃ।"

এই নীতি অনুসরণ করিয়া বহু শুদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ভজন সম্বন্ধে জাতিধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৈষ্ণবতাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, যাঁহার সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে লিখিত আছে,—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তিঁহো পণ্ডিত প্রধান।
পাঁচ শত পড়ুয়ায় নিত্য অন্ন কৈল দান॥

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ তর্কভূষণ, হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকুলোদ্ভব নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ, শূদ্র শ্যামানন্দের নিকট ও কাটোয়ার যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীগদাধর দাস মহাশয়ের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণের গুরু হওয়ায় সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। নরোত্তম-বিলাসে লিখিত আছে,—

নরোত্তম শিষ্য কৈলা অনেক ব্রাহ্মণ।
পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ সব হৈল অগ্নি সম॥

রাজা নরসিংহ পণ্ডিত সহ নরোত্তমের সহিত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। অবশ্য বিচারে দিগ্বিজয়ী মুরারির পরাভব হয়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল। মেলবন্ধন ও নব্যস্মৃতি প্রচার প্রভৃতি দ্বারা হিন্দুসমাজ পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধপ্লাবন ও মুসলমান অত্যাচারজাত ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া লইতেছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত সুবুদ্ধি খাঁর উপাখ্যান হইতে আমরা তদানীন্তন সমাজের উপর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব বুঝিতে পারি। সুবুদ্ধি খাঁ হুসেন সাহার প্রভু ছিলেন। হুসেন বাদশা হইয়া স্ত্রীর প্ররোচনায় সুবুদ্ধি খাঁর মুখে জোর করিয়া জল দেন। সুবুদ্ধি খাঁ নিজের দোষ নাই জানিয়াও, জাতিপাত হইয়াছে, এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ। ষোড়শ শতাব্দী বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের যুগ বলিয়াই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত এই আচার হিন্দুসমাজের বুকে এতটা বাজিয়াছিল। জন্মগত অধিকারই যে সময়ে সমস্ত বিষয় নিরূপিত করিতেছিল, সে সময় সাধনরাজ্যেও গুণগত অধিকারকে স্থান দিতে হিন্দুসমাজ পরাঙ্মুখ হইয়াছিল।

লৌকিক ব্যবহারে কিন্তু মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবহেলা করেন নাই। প্রেম সাধনার রাজ্যে জাতিধর্ম্ম উপেক্ষিত হইলেও সাধক ভক্ত লৌকিক চেষ্টা ও ব্যবহারের সময় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিয়া চলিবেন, ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রের উপদেশ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব তখন এতটা প্রবল যে, মহাপ্রভু চেষ্টা করিলেও ইহাকে উঠাইয়া দিতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মহাপ্রভু স্বয়ং ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ কথা কোন লীলাগ্রন্থে লিখিত নাই। বরং "নিমন্ত্রণ লইল জানি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি কথাই আছে। জগন্নাথক্ষেত্রে কোন কোন সময়ে এক সঙ্গে বসিয়া সকল জাতীয় ভক্তই আহার করিয়াছেন—কিন্তু তাহা শ্রীধামের ও প্রসাদের সম্মান প্রদর্শন জন্য। কোন সামাজিক ভোজে সকল জাতি এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিয়াছেন, এরূপ কথা কুত্রাপি লিখিত হয় নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামী যবন-সংসর্গ হেতু নিজকে পতিত মনে করিতেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি সম্মানবশতঃ তিনি মন্দিরের পথে না যাইয়া উত্তপ্ত বালুকাময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী পথে যাতায়াত করিতেন। স্বয়ং মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে আহ্বান করিলেও তিনি কাতরভাবে দূরে পড়িয়া থাকিতেন, কদাচ নিকটে যান নাই।

অদ্বৈত-প্রকাশ-রচয়িতা ব্রাহ্মণ ঈশান নাগর মহাপ্রভুর পদধৌত করিতে যান—কিন্তু ব্রাহ্মণ-তনু বিষ্ণুতনু বলিয়া মহাপ্রভু ইহাতে সম্মত হয়েন নাই। ঈশান তখন উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

তাহা দেখি মোর প্রভু হাসিয়া কহিলা।
কি লাগি ঈশান বিপ্রধর্ম্ম বিনাশিলা।
দ্বিজাতির যজ্ঞসূত্র চিত্তশুদ্ধিদাতা॥
নিরন্তর পরব্রহ্মে হৃদয় নিযোক্তা॥
এত কহি প্রভু পুনঃ পৈতা দিল মোরে।—অঃ প্রঃ।

লৌকিক ব্যবহারে ভোজন ও বিবাহেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব বংশধর উৎপন্ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে স্থায়িত্ব প্রদান করিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীনিবাস প্রভৃতি অনেক মহাজন পরজীবনে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা কিংবা অন্য কোন মহাপ্রভুর ভক্ত স্বজাতীয় ছাড়া অন্য জাতি হইতে কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা দেখিতে পাই না। নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় প্রচণ্ড অবধূতও স্বজাতি, এমন কি, স্বশ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোজনবিচার না থাকিলেও এই জন্য তাঁহার বংশধরগণও ব্রাহ্মণসমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। "কুলকল্পতরু" নামক কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

নিত্যাইতনয় বীরভদ্র নাম তাঁর।
স্বনামে হইল তাঁর ভাবের সঞ্চার॥
সিন্দুরমল্ল গাঁই আছিল নিতাই।
অবধোত কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাঁই॥

বংশগাঁই হইল করি কুল অপচয়।
উদাসীন হইলে কভু জাতি নাহি রয়॥
উভয় বর্জ্জনে "বীর" সঙ্কেত হইল।
কুলাচার্য্য বটব্যাল রচনা করিল॥

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া প্রীতি আরও বর্দ্ধিত হয়, ইহা উভয়েরই ইচ্ছা হইল। কিন্তু এই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া তাঁহাদের যে বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহাতেই তৎকালীন হিন্দুসমাজের উপর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব ও তাহার নিকট বৈষ্ণবগণের মস্তক অবনত করার কথা পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার কন্যা গঙ্গাদেবীকে অদ্বৈত প্রভুর ভাগিনেয় ঘনশ্যামের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল না; সুতরাং তৎকালীন বঙ্গসমাজের এই দুই মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিকে সভা আহ্বান করিয়া পণ্ডিতসমাজের মত লইতে হইয়াছিল। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যে আদানপ্রদানের এই প্রথম উদাহরণ। প্রেম-বিলাস যে বলিয়াছেন,—

রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের বিয়ে হয়েছে অনেক।
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক॥

ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, রাঢ় ও বরেন্দ্র এই দুই ভূমিতে বাস করা হেতু যখন শ্রেণীভেদ হইয়াছিল, তখন অধুনা রাঢ়দেশবাসীর সহিত বরেন্দ্রদেশবাসীর বিবাহ ত অনেকই হইয়াছে। কেবল তাহাকে রাঢ়ী শ্রেণীর সহিত বরেন্দ্র শ্রেণীর বিবাহ বলে না, এই মাত্র। উদ্ধৃত পয়ার উপরিউক্ত বিবাহের সমর্থন করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যে কোন বিবাহ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস"-প্রণেতা দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যালও এই মত পোষণ করেন।

বৈষ্ণবগণ যে লৌকিক ব্যবহারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে অবহেলা করেন না, তাহা বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস পাঠ করিলেও বুঝা যায়। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবের ভক্তিসাধনের ও সদাচারের যাবতীয় কথা লিখিত হইয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তৎকৃত একাদশীতত্ত্ব, বিষ্ণুপূজাপদ্ধতি ও আহ্নিকতত্ত্বে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই গৃহস্থ—সুতরাং তাঁহাদের পুত্রকন্যার উপনয়ন বিবাহাদি প্রয়োজন। বৈষ্ণবধর্ম্মে যদি বর্ণাশ্রম অস্বীকৃত হইত, তবে বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসে উপনয়ন বিবাহাদির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু স্মার্ত্ত বিধান অনুসারে ঐ সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম সম্পাদিত হওয়াই বৈষ্ণব-শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত বলিয়া তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করেন নাই। বলা বাহুল্য, বাউলসম্প্রদায়ের অংশবিশেষের হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভের ব্যর্থ চেষ্টাজাত সংযোগী বৈরাগিগণের মধ্যে বিবাহে যে মালা চন্দন বদল প্রথা আছে, তাহা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত

অনুমোদিত নহে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দশবিধ সংস্কারের মধ্যে কেবল শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয়।

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥

স্মার্ত্ত বিধান অনুসারেও যখন শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে যজ্ঞেশ্বরকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের অগ্রভাগ নিবেদন করা হইয়া থাকে, তখন উদ্ধৃত বিধি বর্ণাশ্রমাচারের প্রতিকূল নহে, পরন্তু অনুকূল। স্মার্ত্ত বিধানে যাহা সামান্য বিধি, বৈষ্ণব স্মৃতিতে তাহাই বিশেষ বিধি করা হইয়াছে।

প্রেমবিলাসের চতুর্ব্বিংশতি বিলাসে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিবৃত্ত ও কুলমর্য্যাদা সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা আছে। খুব সম্ভব, প্রেমবিলাসের এই অংশ অত্যন্ত আধুনিক। কিন্তু তাহা হইলেও বৈষ্ণবগ্রন্থের পরিশিষ্টে যে কুলাচার বর্ণিত আছে, তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, মহাপ্রভুর উপাসকগণের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব শিথিল হয় নাই।

এই সমস্ত তত্ত্ব ও প্রমাণ ভালভাবে আলোচনা না করিয়াই আধুনিক লেখকগণ এই ভ্রান্ত মত প্রচার করেন যে, মহাপ্রভু জাতিধর্ম্ম উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন ও জাতিধর্ম্মের প্রভাব সমাজে তখন শ্লথ হইয়া গিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

জৈনদিগের দৈনিক ষট্‌কর্ম্ম*

হিন্দু দ্বিজাতির পক্ষে প্রতিদিন পাঁচটী মহাযজ্ঞের † অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এই যজ্ঞগুলির মধ্যে সকলগুলিতেই দেবতোদ্দেশে অগ্নিতে আজ্যাদি আহুতি দিতে হয় না। এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান একটু অন্যরূপ। বেদাদির অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃলোকের তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, বৈশ্বদেব হোম দেবযজ্ঞ, পশু পক্ষীদিগকে অন্নদান ভূতযজ্ঞ আর অতিথিপূজন নৃযজ্ঞ ‡। প্রাচীন কালে প্রত্যেক দ্বিজ নিত্য নিয়মিতভাবে এই পাঁচ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এগুলি তাঁহাদের নিত্যকর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুগণের এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুরূপ জৈনগণের পক্ষে প্রতিদিন অনুষ্ঠেয় ষট্‌কর্ম্ম বা ছয়টী কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিবার নিয়ম আছে। সেইগুলির বিষয় সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অভিপ্রায়েই এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। জৈন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

দেবপূজা গুরূপাস্তিঃ স্বাধ্যায়ঃ সংযমস্তপঃ।
দানং চেতি গৃহস্থানাং ষট্‌ কর্ম্মাণি দিনে দিনে॥

দেবপূজা, গুরুর উপাসনা, স্বাধ্যায় (শাস্ত্রাধ্যয়ন), সংযম, তপস্যা এবং দান, এই ছয়টী কর্ম্ম প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রতিদিন অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাই জৈন শাস্ত্রের বিধান। এই ষট্‌-কর্ম্মই জৈনদিগের নিত্যকৃত্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। জৈন শ্রাবক প্রতিদিন তাঁহার ধর্ম্মের অন্য শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে অন্য কোনও কার্য্য করুন আর নাই করুন, এই ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে কোন বিধিই সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যিনি সম্যগ্‌জ্ঞানী, যিনি বিদ্বান্, যিনি সমর্থ, তিনি সম্যক্‌রূপে এই ষট্‌কর্ম্মের সমস্ত বিধান পালন করিয়া চলিবেন। আর যিনি অল্পজ্ঞ—যিনি অসমর্থ, তিনি যথাসাধ্য প্রতিদিন ষট্‌কর্ম্মের প্রত্যেক কর্ম্মের অন্ততঃ আংশিক অনুষ্ঠান করিবেন। কার্য্যতঃও দেখিতে পাওয়া যায়, জৈনদিগের মধ্যে সকলেই যথাশক্তি ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ফলতঃ, হিন্দু ব্রাহ্মণাদির সন্ধ্যাবন্দনাদির মত এই ষট্‌কর্ম্ম জৈনদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের যে সকল বিধান জৈনশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদেরই সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা এইবার করিব।

দেবপূজা

দেব (চতুর্ব্বিংশতি অতীত জিন বা তীর্থঙ্কর, চতুর্ব্বিংশতি বর্ত্তমান তীর্থঙ্কর এবং চতুর্ব্বিংশতি ভবিষ্যৎ তীর্থঙ্কর), গুরু (আচার্য্য, উপাধ্যায়, সাধু, মুনি প্রভৃতি) ও শাস্ত্র—এই সকলকেই জৈনগণ

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ।

‡ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥—মনুসংহিতা ৩৭০।

দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। নিত্যপূজায় সাধারণতঃ তাঁহারা তীর্থঙ্করগণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিসহকারে জল প্রভৃতি অষ্ট দ্রব্যের দ্বারা সেই মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও নিজ গৃহেই এইরূপ জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। যাঁহাদের বাড়ীতে এইরূপ জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহারা গৃহেই নিত্যপূজা সম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের গৃহে এরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই, তাঁহারা নিকটবর্ত্তী জিনমন্দিরে যাইয়া পূজাকার্য্য সমাধা করেন। একটা কথা এ স্থানে বলা দরকার। জৈনেরা যে সকল দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করেন, তাহা হয় ধাতুময়ী, না হয় পাষাণময়ী। মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করা তাঁহাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

নিত্যপূজার সময় যে মন্দিরে যে তীর্থঙ্কর প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহার পূজা করা বিধেয়। একসঙ্গে চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের পূজাও করা যাইতে পারে। এইরূপ একত্র চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের পূজা করার নাম "সমুচ্চয়চতুর্ব্বিংশতিজিনপূজা।"

জৈনদিগের পূজা এই যে জিন বা তীর্থঙ্কর, ইঁহারা মানবরূপেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তবে তাঁহারা তপশ্চর্য্যাদির প্রভাবে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন এবং সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণলাভ করিয়া সাধারণকে মোক্ষলাভের উপায়সমূহ (বা মোক্ষমার্গ) নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ মুক্ত পরমাত্মার পূজাকে জৈনাচার্য্যগণ শ্রাবকের দৈনন্দিন কৃত্যের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়া বোধ হয় ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই তীর্থঙ্করগণই প্রত্যেক শ্রাবকের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক শ্রাবকেরই তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থা অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহাদের আচরণের সর্ব্বথা অনুকরণ করিয়া, তাঁহাদেরই মত মোক্ষলাভের জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত। জৈন শাস্ত্রের যে ইহাই একমাত্র অভিপ্রায়, তাহা জিনপূজার মন্ত্রগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। মোক্ষ ভিন্ন জৈনদিগের জীবনের অপর কোন লক্ষ্য নাই—মোক্ষলাভই এই নিত্য জিনপূজার মুখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য—পূজার প্রতিমন্ত্রে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

পূজাকালে তীর্থঙ্করের উদ্দেশে জলচন্দনাদি উৎসর্গ করিবার সময় প্রত্যেক স্থলেই এক একটী কামনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের পূজার মধ্যে এ জিনিষটী নাই। তাঁহারা পূজার প্রারম্ভে কামনার উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিয়া থাকেন বটে; তবে পাদ্যাদি উৎসর্গ করিবার সময় কোন কামনা করেন না। কিন্তু জৈনগণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দ্বারা পূজা করিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মুক্তির কামনা করেন। উদাহরণ দিলেই কথাটী স্পষ্ট হইবে।

"ওঁ হ্রীং বৃষভাদিবীরান্তেভ্যো জন্মমৃত্যুবিনাশনায় জলং নির্ব্বপামি,......ভবতাপবিনাশায় চন্দনং নির্বপামি,......অক্ষয়পদপ্রাপ্তয়ে অক্ষতান্ নির্বপামি, ...কামবাণবিধ্বংসনায় পুষ্পং নির্বপামি,........ ক্ষুধারোগবিনাশনায় নৈবেদ্যং নির্বপামি,... ... মোহান্ধকারবিনাশনায় দীপং নির্বপামি,......অষ্টকর্ম্মদহনায় ধূপং নির্বপামি,......মোক্ষফলপ্রাপ্তয়ে ফলং নির্বপামি,......অনর্ঘ্যপদপ্রাপ্তয়ে অর্ঘ্যং নির্বপামি।"

জৈনদিগের এই কামনা সম্বন্ধে আর একটী বিষয়ও লক্ষ্য করিতে হইবে। পূজার্চ্চনাদির সময়

হিন্দুদিগের কামনার বিষয় পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, অক্ষয় স্বর্গলাভ প্রভৃতি। কিন্তু জৈনগণ দৈনন্দিন দেবপূজার সময়ও এই সকল বিনশ্বর বস্তু কামনা করেন না। প্রত্যেক জৈনেরই জীবনে একমাত্র লক্ষ্য মোক্ষপ্রাপ্তি। সুতরাং তাঁহারা সেই মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল বিষয় ব্যতীত অপর বিষয়ের কামনা কদাপি করেন না। অবশ্য হিন্দুরও যে চরম লক্ষ্য মোক্ষ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে হিন্দু দার্শনিকের মতে প্রারম্ভ হইতেই মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রয়াস করিলে অনেক সময় সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়। সংসারের প্রতি যত দিন মনের বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়, ততদিন মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করা পণ্ডশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জন্য স্বর্গভোগাদি নশ্বর বস্তু প্রাপ্তির জন্য মানুষ প্রথমে পূজার্চ্চনাদির অনুষ্ঠান করুক—এইরূপে চিত্ত শুদ্ধ হইলে এবং বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তখন মোক্ষ-লাভের জন্য যত্ন করিলে তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই ফলপ্রসূ হইবে। জৈনগণ তাহার উত্তরে বলিবেন—চিত্তশুদ্ধিই যদি পূজাদির উদ্দেশ্য হয় এবং কামনার দ্বারা লোকের চিত্ত পূজাদির দিকে আকৃষ্ট করাও যদি প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে এ উভয় কার্য্যই ত পূজার সময় মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল ইন্দ্রিয়-জয়াদি ও মোক্ষলাভের কামনাদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যাহা হউক, পূজাদি ব্যাপারে এইরূপ মোক্ষলাভের যে কামনা এবং প্রারম্ভ হইতেই সকলের চিত্ত জীবনের এই চরম লক্ষ্যের দিকে উন্মুখ করিবার জন্য এই যে চেষ্টা, তাহা যে বিশেষ প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। জৈনদিগের প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেই এই চরম লক্ষ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া জৈন শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেকের সম্মুখেই যে সকল সময়ের জন্য এক উচ্চ আদর্শ উপস্থিত রাখিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবনের যেটি লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেটীর কথা এইরূপ সকল সময়ে সকলের হৃদয়ের মধ্যে জাগরূক করিয়া রাখার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা পণ্ডিত মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

আমরা প্রকৃত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। পূজা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে জিন বা তীর্থঙ্করের পূজা করা হইবে, তাঁহার আবাহন, স্থাপন ও সন্নিধীকরণ * করিতে হয়। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের দ্বারা জল, চন্দন, অক্ষত, পুষ্প, নৈবেদ্য, দীপ, ধূপ ও ফল, এই অষ্ট দ্রব্যের সাহায্যে পূজা করিতে হয়। ইহারই নাম অষ্টক বা অষ্টদ্রব্যপূজা। ইহার পর পঞ্চকল্যাণকের অনুষ্ঠান করা হয় অর্থাৎ অর্চ্চনীয় তীর্থঙ্করের গর্ভ, জন্ম, তপস্যা, জ্ঞানলাভ ও মোক্ষের কথা স্মরণ করিয়া এক একটী অর্ঘ্য দেওয়া হয়। ইহার পর স্তোত্রাদি বা জয়মালা পঠিত হয়। এইরূপ স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে জিনমূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ করা হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের যেমন এক দেবতার পূজা করিবার সময় মূল পূজার পূর্ব্বে ও পরে গণেশাদি নানা দেবতার পূজা করিয়া লইতে হয়, জৈনদিগের সেইরূপ কোনও বিধান দেখা যায় না। তারপর হিন্দুদিগের মধ্যে পূজার দ্রব্যাদির বাহুল্যানুসারে ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার, এই কয়টী

---

* আবাহন করিবার সময় 'অত্র অবতর অবতর সংবৌষট্', স্থাপন করিবার সময় "অত্র তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঠঃ ঠঃ" এবং সন্নিধীকরণের সময় 'অত্র মম সন্নিহিতো ভব ভব বষট্।' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

ত্তেদ দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনদিগের মধ্যে কিন্তু মাত্র ঐ অষ্টকের ব্যবস্থা। তবে প্রতিদিনই যে সকলে ঐ আটটী দ্রব্যের দ্বারা পূজা করেন, এমন নহে। সংক্ষেপের জন্য বেশীর ভাগ লোকেই জিনমন্দিরে যাইয়া জিনদেবের দর্শন ও তাঁহার উদ্দেশে অক্ষত অথবা পুষ্প ও যে কোন একটী ফলমাত্র উৎসর্গ করিয়া থাকেন। তবে এইটুকু অনুষ্ঠান করিতে পারত পক্ষে প্রায় কোন স্ত্রীপুরুষই বাধা করেন না।

গুরূপাস্তি

যাঁহারা সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন—বিষয়ের প্রলোভন যাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না—কামক্রোধাদি যাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, এরূপ মুনিদিগের সেবা বা উপাসনা করাও প্রত্যেক শ্রাবকের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা প্রতিনিয়তই ইঁহাদিগের সেবা করা উচিত, ইহা জৈনশাস্ত্রের বিধি *। এইরূপ মুনির পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করাও এই গুরূপাসনারই অন্তর্গত। তারপর এইরূপ গুরুকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট নিজের আচরিত পাপের কথাও প্রকাশ করা উচিত। † এইরূপে গুরুর নিকট স্বকৃত পাপের বিষয় উল্লেখ করিলে এক দিকে যেমন গুরু সমস্ত বিষয় বুঝিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন, অন্য দিকে আবার শ্রাবকের ইহা বলিতে বলিতে পাপের প্রতি ঘৃণা স্বতঃই উৎপন্ন হয় এবং সে পাপ পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। ফলতঃ অপরের নিকটই হউক বা নিজ মনে মনেই হউক, স্বকৃত পাপের একবার আলোচনা করিলে তাহাতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

তবে আজকাল আর সাধারণতঃ সেই নির্গ্রন্থ দিগম্বর মুনি বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় না। এই জন্য সেইরূপ মহাপুরুষদিগের কথা স্মরণ করা এবং সম্যগ্‌দৃষ্টি ও সম্যগ্‌জ্ঞান যাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এরূপ ঐলক, ক্ষুল্লক ‡ ও ব্রহ্মচারীকেই সেবা করা এবং তাঁহাদের নিকট বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করা গুরূপাস্তির অনুকল্পরূপে বিহিত হইয়াছে।

---

* সাগারধর্ম্মামৃত—২।৪৬। † সাগারধর্ম্মামৃত—৬।১১।

‡ উৎকৃষ্ট জৈন শ্রাবকদিগের মধ্যে দুই ভেদ—(১) ঐলক, (২) ক্ষুল্লক। ক্ষুল্লক অপেক্ষা ঐলকের স্তর উচ্চে। ক্ষুল্লক একখানি কৌপীন ও একখণ্ড ক্ষুদ্র উত্তরীয় মাত্র ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট জলপানের জন্য একটী কমণ্ডলু, ভোজনের জন্য একটী পাত্র এবং মাটি হইতে কীটপতঙ্গাদি অপসারিত করিবার জন্য ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত পিচ্ছিকা থাকে। ক্ষুল্লককে বিশেষ যত্নের সহিত সামায়িক, প্রোষধোপবাস, স্বাধ্যায় ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

ঐলককেও মুনিদিগের ন্যায় শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। রাত্রিতে তাঁহার পক্ষে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইবার বিধান আছে। একখানি কৌপীন, পিচ্ছিকা ও একটী কমণ্ডলু ভিন্ন ঐলকের অন্য কোনও দ্রব্য রাখিবার নিয়ম নাই।

খাদ্য সম্বন্ধে উভয়কেই শ্রাবকের দানের উপর নির্ভর করিতে হয়। তবে শ্রাবক স্বয়ং অভ্যর্থনা না করিলে যাচিয়া শ্রাবকের বাড়ীতে ইঁহারা ভোজন করেন না।

স্বাধ্যায়

প্রত্যেক জৈনের পক্ষেই প্রতিদিন যথাসাধ্য কিছু সময় জৈনশাস্ত্র আলোচনা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জৈনগণ শাস্ত্রগ্রন্থকে দেবতার মত ভক্তি ও পূজা করেন। সুতরাং শাস্ত্রালোচনও যে তাঁহাদের পক্ষে দৃঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যিনি গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহাকে পবিত্রভাবে ভক্তির সহিত ঐ কার্য্য করিতে হইবে, ইহা জৈনশাস্ত্রের বিধি। অপবিত্র বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, অস্নাত অপবিত্র দেহে, অপরিস্কৃত ও অপবিত্র স্থানে বসিয়া অশ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন বা আলোচনা করিলে উহাতে শাস্ত্রের অবমাননা করা হয় এবং সেরূপ অধ্যয়ন বা আলোচনায় কোনরূপ সুকৃতি লাভ হয় না বলিয়া জৈনশাস্ত্রকারগণ উহা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

জৈনদিগের এই স্বাধ্যায় শব্দে শাস্ত্রের অধ্যয়নমাত্রই বুঝিতে হইবে না। ফলতঃ, শাস্ত্রের অধ্যয়ন ব্যতীতও স্বাধ্যায়ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। কথাটী একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। জৈনশাস্ত্রকারগণ স্বাধ্যায়ের কয়েকটী প্রকারভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্বাধ্যায় পাঁচ প্রকার—বাচনা স্বাধ্যায়, পৃচ্ছনা স্বাধ্যায়, অনুপ্রেক্ষা স্বাধ্যায়, আম্নায় স্বাধ্যায় ও ধর্ম্মোপদেশ স্বাধ্যায় *। বিশুদ্ধভাবে শাস্ত্রগ্রন্থের পঠন ও পাঠনের নাম বাচনা স্বাধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ইহাই যথার্থ স্বাধ্যায়। শাস্ত্রগ্রন্থের কোন অংশ বুঝিতে না পারিলে জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট বিনীতভাবে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিবার নাম পৃচ্ছনাস্বাধ্যায়। গুরুর নিকট হইতে শ্রুত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও অভ্যাস করার নাম অনুপ্রেক্ষাস্বাধ্যায়। শুদ্ধভাবে স্পষ্টরূপে (আর্ষ আম্নায়ানুসারে অর্থ বুঝিয়া) শাস্ত্রগ্রন্থ আবৃত্তি করার নাম আম্নায়স্বাধ্যায়। জনসাধারণকে উন্মার্গ হইতে সৎপথে আনিবার জন্য এবং তাহাদিগকে পদার্থের যথার্থ স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দেওয়ার নাম ধর্ম্মোপদেশস্বাধ্যায়।

এই পঞ্চবিধ স্বাধ্যায়ের মধ্যে যে কোন স্বাধ্যায়ের অনুষ্ঠান করা প্রত্যেক শ্রাবকের পক্ষে প্রতিদিনই কর্ত্তব্য। স্বাধ্যায়ের এই কয়টী ভেদ থাকায় জৈনদিগের মধ্যে দুইটী সুন্দর জিনিষ লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, ইহাতে কি পণ্ডিত, কি মূর্খ—কি অক্ষরজ্ঞ, কি নিরক্ষর—কি উচ্চজাতি, কি অস্পৃশ্য নীচ জাতি, সকলের পক্ষেই একপ্রকার না একপ্রকার স্বাধ্যায় পালন করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে সমাজের প্রত্যেকেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারে। বাঙ্গালাদেশে যখন কথকতার প্রচলন খুব বেশী ছিল, তখন যেমন বঙ্গপল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই হিন্দুপুরাণ ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিত, স্বাধ্যায়ের এইরূপ নানা ভেদ জৈনশাস্ত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুণ এবং এই স্বাধ্যায় প্রত্যেক জৈনের অবশ্যকর্ত্তব্য দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় জৈনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বহু জটিল ও গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধেও জৈন সাধারণ লোকের তেমনই যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। নিরক্ষরেরাও দর্শনের প্রতিপাদ্য কঠিন কঠিন বিষয় সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ—এরূপ লোক

* তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে—৯।২৫।

বোধ হয়, জৈনদিগের মধ্যে ভিন্ন অপর কোনও ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। মুক্তি কি—মুক্তি লাভের উপায় কি, তত্ত্ব কয় প্রকার, প্রমাণ কাহাকে বলে, জ্ঞান কয় প্রকার, জীব কয় প্রকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করিলে প্রত্যেক জৈন শ্রাবকই তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, এই বিষয়টী লক্ষ্য করিয়া আমি প্রকৃতপক্ষেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। আমার মনে হয়, প্রত্যেক ধর্ম্মেই এইরূপ ধর্ম্মগ্রন্থের স্বাধ্যায়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সংযম

জৈনশাস্ত্রকারদিগের মতে সংযম দুই প্রকার—(১) ইন্দ্রিয়সংযম, (২) প্রাণিসংযম। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে তাহাদের বিষয় হইতে নিবৃত্ত করার নাম ইন্দ্রিয়সংযম। আর প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হওয়ার নাম প্রাণিসংযম। এই দুই সংযম অভ্যাস করিবার জন্য প্রত্যেক শ্রাবককেই প্রতিদিন যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হইবে। 'আজ আমি এই জিনিসটী দেখিব না', 'আজ আমি এই জিনিসটী খাইব না' প্রতিদিন শ্রাবককে এইরূপ একটী একটী (শক্ত্যনুসারে একাধিক) প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাই তাহার পক্ষে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সংযম। এইরূপে অভ্যাস করিলে কালক্রমে তাহার দুই প্রকার সংযমই অভ্যস্ত হইবে এবং ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়া সে সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ মুনিধর্ম্ম ধারণ করিতে সক্ষম হইতে পারিবে।

তপঃ

ধর্ম্মে প্রবৃত্তি বাড়াইবার জন্য প্রতিদিনই যথাশক্তি কিছু না কিছু তপশ্চর্য্যা বা আত্মধ্যানাদির অনুষ্ঠান করাও কর্ত্তব্য। এইরূপ ক্রিয়ার আর এক নাম সামায়িক। ইহার অনুষ্ঠান আদৌ কঠিন নহে। "ওঁ নম সিদ্ধেভ্যঃ," "শ্রীবীতরাগায় নমঃ," "ণমো অরহন্তাণং" "ণমো সিদ্ধাণং" ইত্যাদি মন্ত্রের যে কোন একটী যথাশক্তি স্থিরচিত্তে সংযত ও পবিত্রভাবে জপ করাই এই অনুষ্ঠানের মুখ্য কর্ত্তব্য। এরূপ জপের দ্বারা চিত্তের পবিত্রতা ও একাগ্রতা সাধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই তপশ্চর্য্যার মধ্যে আর একটী কার্য্য করিবারও বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রাবক যে যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, মনে মনে তাহার আলোচনা, তাহার জন্য অনুতাপ এবং সেইরূপ কার্য্য ভবিষ্যতে যাহাতে সংঘটিত না হয়, সে বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করাও তপশ্চর্য্যার অন্তর্ভুক্ত। এরূপ চিন্তা ও আলোচনার দ্বারা যে অনেক উপকার হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। জৈনাচার্য্যগণ তপস্যার দ্বাদশ প্রকার ভেদের বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ছয় প্রকার বাহ্য তপঃ ও ছয় প্রকার আভ্যন্তর তপঃ। অনশন, অবমোদর্য্য, বৃত্তিপরিসংখ্যান, রস-পরিত্যাগ, বিবিক্তশয্যাসন ও কায়ক্লেশ, এই ছয়টী হইল বাহ্য তপঃ। খাদ্যদ্রব্যাদি বাহ্য বস্তু বিষয়েই এই তপের বিধান; তাই ইহার নাম বাহ্য তপঃ। প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্ত্য, স্বাধ্যায়, ব্যুৎসর্গ ও ধ্যান, এই ছয়টী আভ্যন্তর তপঃ। এই দ্বাদশবিধ তপস্যা মুনিগণেরই মুখ্য কর্ত্তব্য। তবে শ্রাবকগণ যথাশক্তি ইহাদের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই জৈনশাস্ত্রের নির্দ্দেশ।

একণে সংক্ষেপে এই তপস্যাগুলির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিব। সংযম অভ্যাস করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য খাদ্য, স্বাদ্য, লেহ্য, পেয়, এই চারি প্রকার ভোজন ত্যাগ করার নাম অনশন তপঃ। বিবিধ উৎসবাদি উপলক্ষে হিন্দুদিগের যে উপবাসের বিধান আছে, জৈনদিগের অনশন তপঃ অনেকটা সেইরূপ। উপোষিত অবস্থায় পূজা ধ্যানাদির অনুষ্ঠানে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সংযমাভ্যাস, ইন্দ্রিয়দমন, এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধনের উদ্দেশ্যে অল্প পরিমাণে (আকণ্ঠ পূর্ণ না করিয়া) ভোজন করার নাম অবমৌদর্য্য। অধিক পরিমাণে ভোজন যেমন স্বাস্থ্যের অনিষ্ট জন্মায়, তেমনই ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। "আজ মাত্র দুই বাড়ীতে যইব। আহার মিলে ত ভাল; নহিলে উপবাসী থাকিব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করার নাম বৃত্তিপরিসংখ্যান। সংযমাভ্যাসার্থ ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, গুড়, লবণ, তৈল প্রভৃতির মধ্যে প্রতিদিন এক বা একাধিক রসত্যাগ করার নাম রসপরিত্যাগ *। চিত্তের একাগ্রতাসাধনের জন্য নির্জ্জন স্থানে শয়ন ও উপবেশন করিবার নাম বিবিক্তশয্যাসন। শরীরের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করিয়া নানারূপ কষ্ট সহ্য করার নাম কায়ক্লেশ। এই সকল তপগুলি সংযমাভ্যাস, ইন্দ্রিয়দমন, চিত্তের একাগ্রতাসাধন প্রভৃতি বিষয়ে যে একান্ত উপযোগী, তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। অবশ্য নব্যসম্প্রদায়ের অনেকে হয় ত ইহাকে প্রশংসার চক্ষে দেখিবেন না। কিন্তু সংযম অভ্যাস করাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে তাহা ত্যাগের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভোগের মধ্য দিয়া হয় না, এ কথা স্থির নিশ্চিত।

আভ্যন্তর তপের সকলগুলির লক্ষণ বলা প্রয়োজনীয় মনে করি না। প্রায়শ্চিত্ত, বিনয় ও ধ্যান, ইহাদের অর্থ সকলেই জানেন। স্বাধ্যায়ের কথা ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মুনি প্রভৃতির সেবা করার নাম বৈয়াবৃত্ত্য। পরিগ্রহপরিত্যাগের নাম ব্যুৎসর্গ।

দান

প্রতিদিন যথানিয়মে যে শ্রাবক কিছু দান করে এবং যথাশক্তি তপশ্চর্য্যা করে, সে জন্মান্তরে শ্রেষ্ঠ লোকে গমন করিয়া থাকে। † এই জন্যই সাগারধর্ম্মামৃতকার শ্রাবকের দৈনন্দিন আচারের বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"তাহার পর ভক্তির সহিত যথাশক্তি সৎপাত্রকে (দানাদির দ্বারা) সন্তুষ্ট করিয়া এবং আশ্রিত সকল লোকেরই সন্তোষ বিধান করিয়া যথাকালে পরিমিত আহার করিবে। ‡

দান করিবার সময়ে সৎপাত্রকেই দান করা উচিত। জৈনাচার্য্যগণের মতে সৎপাত্রের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও জঘন্য, এই তিন শ্রেণী আছে। সংসারত্যাগী মুনিই উত্তম পাত্র। সম্যগ্‌দৃষ্টি-সম্পন্ন শ্রাবক মধ্যম পাত্র আর যাহাদের সম্যগ্‌দর্শন নাই, এরূপ সাধারণ ক্ষুধাতুরাদি দুঃখী মাত্রেই জঘন্য পাত্র। উত্তম পাত্রে দান করিতে পারিলে তাহাতেই সমধিক ফল লাভ হয়; তবে

* হিন্দুদিগের মধ্যেও এইরূপ সংযমাভ্যাসের জন্যই প্রতিদিন কোনও না কোনও দ্রব্য পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে।

† সাগারধর্ম্মামৃত—২।৮২।

‡ সাগারধর্ম্মামৃত—৬।২৪।

উত্তম পাত্র পাওয়া না গেলে অগত্যা মধ্যম বা অধম পাত্রকেই দান করিতে হইবে, ইহা জৈন শাস্ত্রের মত ও গৃহস্থগণের প্রাত্যহিক কর্ম্ম।

ইঁহাদের মতে দান চারি প্রকার—অভয়দান, আহারদান, বিদ্যাদান ও ঔষধদান। এই চারি প্রকার দানের মধ্যে সকলগুলি না হউক, অন্ততঃ একটী প্রত্যহ প্রত্যেক শ্রাবকের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সকল লোকের বাঞ্ছিত ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ—উৎকৃষ্ট সুখ প্রভৃতি লাভ করা প্রাণ না থাকিলে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং প্রাণই ইঁহাদের সকলের মূল। সেই মূলীভূত প্রাণ-রক্ষার জন্য যিনি অভয়দান করেন, তিনি কি ই বা দান না করেন অর্থাৎ তাঁহার দানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।* অভয়দানের এই প্রশংসাসূচক বাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে যে, জীব রক্ষা করার জন্য যে অহিংসা-ব্রতের অনুষ্ঠান, তাহা এই অভয়দানেরই অন্তর্ভুক্ত।

শাস্ত্রপাঠেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় জ্ঞান জন্মে—শাস্ত্রপাঠেই ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মায়, পাপরাশি দূর করে এবং চিত্তকে পবিত্র করে; সুতরাং সেই শাস্ত্র দান করা একান্ত কর্ত্তব্য†। এই শাস্ত্রদানই বিদ্যাদান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যাহার জন্য লোকে ভার্য্যা, ভ্রাতা এবং পুত্রকেও ত্যাগ করে, যাহা বিনা ব্রতাদি সকলই নষ্ট হয়, যাহার অভাবে পীড়িত হইয়া লোকে ক্ষুধার প্রকোপে অখাদ্য পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সংযত সাধু ব্যক্তিকে সেই আহার দান করা কর্ত্তব্য।‡

শরীর সুস্থ থাকিলেই তপঃ ধ্যান প্রভৃতি সম্ভব, এই নিমিত্ত রোগ শান্তির জন্য সাধু ব্যক্তি-দিগকে ঔষধ দান করা উচিত। ** এইরূপে এই চারি প্রকার দানের মাহাত্ম্যই জৈন শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রাবকগণ যথাশক্তি এই সকল দানকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে সমাজে কাহারও কোন কষ্ট থাকিতে পারে না—মুনিগণ নিশ্চিন্ত মনে তপশ্চর্য্যাদি কার্য্য করিতে পারেন; তাঁহাদের যদি কোনও অভাব অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর কিছুর জন্য না হউক, অন্ততঃ পুণ্যার্জ্জনের জন্যও শ্রাবক তাহা দূর করিতে পারে। বস্তুতঃ জৈনদিগের এই ষট্‌কর্ম্ম একদিকে যেমন অনুষ্ঠাতার ধর্ম্মোন্নতির কারণ হইয়া থাকে, অন্য দিকে সেইরূপ যাঁহারা ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য প্রাণ পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যাহাতে কোন বিঘ্ন না হয়, বরং তাঁহারা যাহাতে সুখে ও নিশ্চিন্তভাবে ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া নিজের এবং অপরের উন্নতির বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন, সে কার্য্যে শ্রাবককে প্রবৃত্ত করাইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

---

* সুভাষিতরত্নসন্দোহ—৪৭৬।
† ঐ— ঐ। —৪৭৭।
‡ ঐ — ঐ। —৪৭৮।
** ঐ — ঐ —৪৭৯।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ

[৩১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

দীক্ষা গ্রহণ

আজকাল কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকলেরই মধ্যে বংশগত গুরুকরণ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুকরণে যোগ্যগুরুর অনুসন্ধান শিষ্য করেন না। গুরু, শিষ্য দীক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত কি না, দেখেন না। গুরুর পুত্রই গুরু হইবেন এবং প্রত্যেক হিন্দুকেই দীক্ষা লইতে হইবে, এই মতের সৃষ্টি কি করিয়া হইল, বলা যায় না। তন্ত্রে যোগ্য গুরুর ও যোগ্য শিষ্য অনুসন্ধানের ব্যবস্থা আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—

"পরিচর্য্যা-যশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্‌গুরুর্নহি।"

শ্রীজীব টীকায় "লাভো ধনাদিঃ শিষ্যাৎ" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গুরু ও দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুর সহিত এক বৎসর এক সঙ্গে বাস করিয়া, তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিলে তবে দীক্ষা দিবেন, এই বিধি আছে।

"তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাত্বাহন্যোন্যস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥"

এই সমস্ত উৎকৃষ্ট বিধি থাকা সত্ত্বেও যে বংশানুক্রমিক গুরুকরণ প্রথার কি করিয়া সৃষ্টি হইল, তাহা অনুসন্ধেয়।

হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধ

বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রায় প্রারম্ভ হইতেই অর্থাৎ জয়দেবের কিছু কাল পরেই মুসলমানগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ পাঠানগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ঐ সময়ের মধ্যেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি রচিত হয়। তৎকালীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে দেশে সুশাসনের পরিচয় পাওয়া যায় না। মোগল অধিকারের সময়ে রচিত কর্ণানন্দ, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, কৃষ্ণদাস-(লালদাস নামান্তর) কৃত ভক্তমালের অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থে অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ অপেক্ষা মুসলমান-গণের পরিচয় অধিক পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থে অনেক স্থলেই হিন্দুমুসলমানের প্রীতি-বন্ধনের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মোগল বাদশাহগণ ও মুর্শীদ কুলি খাঁ প্রভৃতি বঙ্গীয় নবাবগণ হিন্দুগণের উপর অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচার করিতেন। বহুকাল এক সঙ্গে বসবাস করিবার ফলে উভয় জাতির মধ্যে বহু ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল ও তাহারা পরস্পরকে সহ্য করিতে শিখিয়াছিল। আকবরের উদার শাসননীতির ফলেও হিন্দুমুসলমানের

সদ্ভাব বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। এ সব কথার সাক্ষ্য ইতিহাসও দিয়া থাকে। আমার কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব বৃদ্ধির অপর একটি কারণ মনে হইয়াছে। পরে দেখাইব যে, মহাপ্রভু বহু মুসলমানকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। আকবর বাদশাহের শ্রীরূপ-সনাতনকে দর্শন করিতে আসিবার প্রবাদও প্রচলিত আছে। তাঁহার রচিত একটি পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু শতাব্দীর শত অত্যাচারের পরিবর্ত্তে যে জাতির মহাপুরুষ অত্যাচারিগণকে সাদর আলিঙ্গন দিয়া প্রেমদান করিলেন, সে জাতির মহত্ত্ব দেখিয়া মুসলমানগণের পক্ষে অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস করা বিস্ময়ের বিষয় নহে। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারের ফলে হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাই আমার বিশ্বাস।

পাঠান শাসনকালে রাজনৈতিক অবস্থা

পাঠান শাসনকালে বঙ্গদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি খণ্ডই বিভিন্ন নীতিতে শাসিত হইত। বঙ্গের সুলতান প্রবলপরাক্রান্ত হইলে ঐ সমস্ত খণ্ড হইতে কর গ্রহণ করিতে পারিতেন। সুলতান প্রবলই হউন, দুর্ব্বলই হউন, দেশে যে সামন্ত-শাসনপ্রণালী ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুর ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যায় যে, প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের পরই এক মুসলমানের অধিকার ছিল।

মদ্যপ যবনরাজের আগে অধিকার।
তার ভয়ে কেহ পথে নারে চলিবার॥
পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥ চৈঃ চঃ।

ফেরিস্তাবর্ণিত বিবরণ পাঠে আমাদের অনুমান সত্য বলিয়াই বোধ হয়। ফেরিস্তা লিখিয়াছে যে, শের শাহ্ বঙ্গরাজ্যকে কতকগুলি সমক্ষমতাপন্ন সামন্তের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া কাফি ফজিলেতকে সমগ্র রাজ্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭—১৫৪০) এ সময়ে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। "He subjected to his dominion the whole country as far as Setubandha Rameswar" (Andrew Sterling, T. R. A. A., 1831)

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে তাঁহার বঙ্গ আক্রমণের অভিসন্ধির বিবরণ লিখিত আছে, তাহা পাঠে তৎকালীন বঙ্গাধিপের (হুসেন সাহ্ অথবা নসরৎ সাহ্) পরাক্রমেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

এই মত আছেন বৎসর দুই চারি।
গৌড়ে উৎকলে তবে পড়িল যে ধাড়ী॥
প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশ।
শুনিয়া গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাস॥

চৈতন্যদেবে রাজা আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্র কুবুদ্ধি লাগিল॥
কালযবন রাজা পঞ্চ গৌড়েশ্বর।
সিংহ শার্দ্দূল দেখে কতক অস্তর॥
ওড্র দেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িবে এত দিনে॥
লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর।
গৌড়মুখে শয়ন ভজন পাছে কর॥
কাঞ্চীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য।
গৌড় জিনিবে হেন না দেখি সে কার্য্য॥
গৌড়েশ্বর অবশ্য আসিব নীলাচলে।
তুমি ছাড়িবে প্রলয় হইব উৎকলে॥
প্রভু নিবারিল সে শুনিয়া প্রতাপরুদ্র।
বিজয়ানগরে গেল করিবারে যুদ্ধ॥—জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল।

রামানন্দ রায়কৃত শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রভাবের পরিচয় আছে,—

যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্দরঃ কন্দরং
স্বং বর্গং কলবুর্গভূমিতিলকঃ সাস্রং সমুদ্বীক্ষতে।
মেনে গুর্জ্জরভূপাতির্জ্জরদিবারণ্যাং নিজং পত্তনং
বাতব্যগ্রপয়োধিপোতগমিব স্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ॥—১ম অঃ ১০

হুসেন সাহ কিন্তু উৎকল আক্রমণ করিয়াছিলেন,—

যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশ।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষ॥—চৈঃ চঃ।

বনবিষ্ণুপুর, মল্লবংশীয় রাজগুত্তগণের অধীনে মুসলমানগণের নিকট হইতে স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল। জনৈক ফরাসী পরিব্রাজক বলিয়াছেন, এরূপ সুশাসিত দেশ ভূমণ্ডলে নাই। রাজাদিগের বড় বড় কামান ছিল এবং এরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, শত্রু আসিলে তাঁহারা দেশ জলে প্লাবিত করিতে পারিতেন। এই বংশীয় বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ও হিন্দু শাসনকর্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তগ্রাম মুলুকের সেই ত চৌধুরী॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোক্তা করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া॥

বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥

রঘুনাথদাসের প্রতি তাঁহার উক্তি—

তোমার জ্যাঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্ট লক্ষ খায়।
আমি ভাগী আমারে কিছু দিবারে যুয়ায়॥—চৈঃ চঃ।

গোপীনাথ পট্টনায়ক হিরণ্যদাসের ন্যায় আর একজন হিন্দু শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া চরিতামৃতে উল্লেখ আছে। নরোত্তমবিলাস হইতে জানা যায় যে, ঠাকুর মহাশয়ের পিতা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত খেতুরীর রাজা ছিলেন। বেনাপোলের রামচন্দ্র খানও যশোহর বিভাগের কিয়দংশের শাসনাধিকারী ছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়। "অদ্বৈতপ্রকাশে" লিখিত আছে, শ্রীহট্ট জেলার—

লাউড়েতে নবগ্রামে ছিল তাঁর বাস।
দিব্যসিংহ রাজার তাঁহা রাজত্ববিলাস॥

এই সমস্ত রাজা মুসলমান অধিপতিকে কর দিতেন। কর যথাসময়ে না দিতে পারিলে তাহাদের কিরূপ শাস্তি হইত, তাহা চরিতামৃতে বর্ণিত গোপীনাথ পট্টনায়কের দুর্দ্দশা হইতে বুঝা যায়।

এক দিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল॥
তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে॥—চৈঃ চঃ।
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঁই বাকী হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল॥—চৈঃ চঃ।

অবশ্য পট্টনায়ক প্রতাপরুদ্রের দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নির্য্যাতনপ্রথা মুসলমানগণের প্রথা হইতে ভিন্ন ছিল না। প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে যে, নবাব বিদ্রোহী চান্দ রায়কে ধরিয়া হাতী দিয়া মারিতে গিয়াছিলেন।

মাতোয়াল করি হাতী আনহ সাক্ষাতে।
বসিলা অনেক লোক মরণ দেখিতে॥—প্রেঃ বিঃ।

করপ্রদানকারী এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার শাসন দেখিয়া মনে হয় যে, পাঠান রাজগণ দেশের আভ্যন্তরীন রাজকার্য্য নিজেরা না করিয়া হিন্দুগণের উপর ভার দিতেন। বাঙ্গালার ইতিহাস-প্রণেতা Stewart সাহেব বলিয়াছেন,—"The Government of the Afghans in Bengal cannot be said to have been monarchical, but nearly resembled the feudal system introduced by the Goths and Vandals into Europe. It is possible that many of the Afghan officers, averse to business, or frequently called away from their homes to attend their chiefs, farmed

out their estates to the opulent Hindus, who were also permitted to retain the advantages of manufacture and commerce." জন-প্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসেও (দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল) এইরূপ কথা আছে। "বাঙ্গালাদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইলেও দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুরাজত্ব চলিতেছিল।"

রাজদ্রোহ ও দস্যুভয়

এইরূপ করপ্রদানকারী রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার কর প্রদান না করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। প্রেমবিলাসে রাজমহলের জমীদার চান্দ রায়ের কাহিনী নিম্নলিখিত ভাবে আছে,—

মহাবীর শক্তি ধরে যুদ্ধ পরাক্রমে।
শুনিয়া তাহার নাম কাঁপয়ে জীবনে॥
চৌরাশি হাজার মুদ্রার ছিল জমীদার।
তার কথো দিনে হৈল এমন প্রকার॥
গড়িদ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয়।
রাজমহল থানা করি আমল করয়॥
বলবান্ দেখি সেই বিচারিল মনে।
না দেয় পাতসার কর থানা দেয় গ্রামে॥
পাঁচ সহস্র অশ্ব রাখে থানা দেয় গ্রামে।
কত দেশ মারি নিল করি অস্ত্রবল॥

চাঁদরায় স্বাধীন হইয়া রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই,—দস্যুবৃত্তি করিয়া দেশের উৎপীড়ন করিয়াছিলেন মাত্র। তৎকালে দস্যুদলে ভদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানগণও যোগদান করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ বাড়ুয্যা আর নরসিংহ ঘোষাল।
কালিদাস ভট্ট দস্যু অতি দুরাচার॥
নীলমণি মুখটি আর রামজয় চক্রবর্ত্তী।
হরিনাথ গাঙ্গুলী আর শিব চক্রবর্ত্তী॥
পূর্ব্বে তারা চান্দ রায়ের সৈন্য যে আছিল।
চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল॥—প্রেঃ বিঃ।

পাঠান অধিকারকালে দেশমধ্যে যে শান্তি ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ উল্লিখিত ঘটনাগুলি হইতে পাওয়া যায়। জগাই মাধাই—

মাধাই করিয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকাচুরি পরগৃহ দহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে নাহিক দেখা বোলায় কোটাল।
মদ্যপান বিনা আর নাহি যায় কাল॥—চৈঃ ভাঃ।

জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়।
রাজদ্রোহী দস্যুবৃত্তি করেন সদায়॥—প্রেমবিলাস।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহু স্থলেই দস্যুর উৎপাতের কথা লিখিত আছে। অনেক দস্যু তান্ত্রিক আচারী ছিল।

ভাল করি আজি সভে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া॥—চৈঃ ভাঃ।

বহু দূরে গমন করিতে হইলে তখন লোকে জলপথে যাইত। জলদস্যুরও অভাব ছিল না—

জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে লৈল॥—চৈঃ চঃ।

দেশের যখন এরূপ অবস্থা, তখন যে পথঘাট ভীতিসঙ্কুল হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে "জাও" বলি লয় প্রাণে॥—চৈঃ চঃ।

মুসলমানগণের হিন্দুসমাজের উপর অত্যাচার

মুসলমানগণ হিন্দুধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিয়া লোককে জোর করিয়া মুসলমান করিতে চাহিয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে,—

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে জার ঘরে।
ধন প্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে,—

একদিন হরিদাস কহে প্রভু স্থানে।
নিত্য ধর্ম্ম নষ্ট করে দুষ্ট ম্লেচ্ছগণে॥

দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গি করে খণ্ড খণ্ড।
দেবপূজার দ্রব্য সর্ব করে লণ্ডভণ্ড॥
শ্রীমদ্ভাগবত আদি ধর্ম্মশাস্ত্রগণে।
নল করি পোড়াইয়া ফেলয়ে আগুনে॥
ব্রাহ্মণের শঙ্খঘণ্টা কাড়ি লঞা যায়।
অঙ্গের তিলক মুদ্রা বলে চাটি খায়॥
শ্রীতুলসী বৃক্ষে মুতে কুকুরের সনে।
দেবগৃহে মলত্যাগ করে দুষ্ট মনে॥
পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল।
সাধুরে তাড়ন করে বলিয়া পাগল॥
হেন মতে কত শত দুষ্ট ব্যবহারে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম তাঁরা সব নষ্ট করে॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে মুসলমানেগণ যে প্রবল বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে পাই। কিন্তু নবোদিত ধর্ম্মকে বাধা দিতে যাওয়া সকল সময়ে নিরাপদ্ নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে কাজীদলনের বৃত্তান্ত পড়িয়া মনে হয় যে, মহাপ্রভু মুসলমান অত্যাচারে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া, দলবল সহ মশাল হাতে করিয়া কাজীকে শাস্তি দিতে গমন করিয়াছিলেন।

কেহো ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহো লাথি মারে কেহো করয়ে হুঙ্কার॥
ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর।
প্রভু বোলে "অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর॥"

মহাপ্রভুকে দেখিয়া কাজি যে ভক্তিগদগদচিত্তে আসিয়া স্তুতিমিনতি করেন, এ কথা পরবর্ত্তী ইতিহাস-লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুকে হিন্দু বিদ্রোহিগণের নেতৃরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

মুসলমান ভক্ত

যাহা হউক, সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু জাতিনির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমানকে প্রেম দান করিয়াছিলেন। বহু মুসলমান তাঁহার কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বাদশাহ্ হুসেন শাহ্ পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে অনেকগুলি মুসলমান উদ্ধারের কথা লিখিত আছে।

তা সভারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥—চৈঃ চঃ।

পরবর্ত্তী কালে অনেক মুসলমান মহাত্মা মহাপ্রভুপ্রচারিত প্রেমধর্ম্মের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম আলোচনা করেন। পদ্মাবৎকাব্যের রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ আলওয়াল, করম আলি, সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রভৃতি বহু মুসলমান কবি বৈষ্ণবপদাবলী লিখিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পর হিন্দুমুসলমানের মধ্যে অনেকটা প্রীতির ভাব স্থাপিত হইয়াছিল।

হিন্দুমুসলমানের প্রীতি সম্বন্ধ

রাজ্যশাসন-ব্যাপারে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিতেন। রূপ-সনাতন হুসেন শাহের মন্ত্রী ও কেশব ছত্রী একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। সনাতনের উপর পাতশাহের কতটা নির্ভর ছিল, তাহা চরিতামৃত হইতে জানা যায়।—

আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি ঘরে তুমি রহিলা বসিঞা॥

মুসলমানগণ হিসাবনিকাশে পটু ছিলেন না বলিয়া হিন্দুগণের সাহায্য লইতেন। যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দে মজুমদার, শিকদার প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত উপাধি হিন্দুগণের মুসলমান রাজসরকারের কর্ম্মসূচক। এক একটি বিভাগে মুসলমান আমিন সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তাঁহার অধীনে একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত হিন্দু মজুমদার ও একটি মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হিন্দু শিকদার থাকিতেন। অনেক ব্রাহ্মণের খাঁ উপাধি ছিল—যথা সুবুদ্ধি খাঁ, সত্যরাজ খাঁ প্রভৃতি। মুসলমানগণ কবিরাজী মতেও চিকিৎসিত হইতেন। মুকুন্দ গুপ্ত রাজ-কবিরাজ ছিলেন।

একদিন ম্লেচ্ছ রাজার উচ্চ টুঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে॥—চৈঃ চঃ।

আজকাল যেমন আমরা ইংরাজী বেশ পরিধান করিতেছি, সেইরূপ মুসলমান আমলে অনেকে মুসলমান বেশ পরিতেন।

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা পায়ে পড়ি হাতে কামান ধরিবে॥—জয়ানন্দ।

মহাপ্রভুর পরে যে হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার আর একটি প্রমাণ আমরা একখানি প্রাচীন বৈষ্ণব দলিল হইতে পাই। মুর্শীদ কুলি খাঁর সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বকীয়া ও পরকীয়া-তত্ত্ব লইয়া বড় তর্ক হয়। এই তর্কের নিরাকরণ উদ্দেশ্যে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণবগণ বিচার করা স্থির করিলেন। "বিচার মানিলাম, তাহা পাতশাহি শুভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল। তিঁহো কহিলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিন তজবিজে হয় না, অতএব বিচার কবুল করিলেন।" জয়পত্রে মুর্শীদ কুলি খাঁর সহি ও মোহর আছে।

কোন বৈষ্ণব সাহিত্যিক মুসলমানগণের নিকট সাহায্য বা উৎসাহ না পাইলেও সাধারণতঃ বিদ্যোৎসাহী মুসলমান সম্রাটেরা বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যিকগণকে অর্থ-সাহায্যে উৎসাহিত করিতেন।

কবি বিদ্যাপতি নাশির শাহার কাছে কোন সাহায্য পাইয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। তবে তাঁহার একটি পদের ভণিতায় আছে,—

সে যে নাসিরা সাহ জানে
যারে হানিল মদন-বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

অর্থনৈতিক অবস্থা

বৈষ্ণব-সাহিত্যে মহোৎসবের ভূরি বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে, সে সময়ে দেশের লোকের বিশেষ অর্থকষ্ট ছিল না। মুদ্রার প্রচলন থাকিলেও কড়ি দ্বারা কর প্রদান ও ক্রয়বিক্রয় হইত। সনাতন গোস্বামী বহু স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়া বাদশাহের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিন মুদ্রায় ভোট-কম্বল পাওয়া যাইত। মহাপ্রভুকে খুব পরিপাটী করিয়া খাওয়াইবার জন্য চারি আনার অধিক লাগিত না। আট কড়িতেই খাজা ও সন্দেশ পাওয়া যাইত।

রঘুনাথদাস—মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
দুই নিমন্ত্রণ লাগি কৌড়ি অষ্টপণ॥—চৈঃ চঃ।

ভক্তমালের শ্রীনরসীভক্ত-চরিত্রের নিম্নলিখিত বর্ণনা পড়িলে বুঝা যায় যে, তৎকালে দেশে এক প্রকার banking system ছিল।

এক যে বৈষ্ণব যান দ্বারকা দর্শনে।
হুণ্ডি করিবারে গেলা মহাজন স্থানে॥
হুণ্ডি নাহি দিল কহে বিদ্রূপ করিয়া।
নরসী ভকত স্থানে হুণ্ডি লহ গিয়া॥
উদার বৈষ্ণব তাহা সত্য করি মানে।
ছুটিতে ছুটিতে গেলা বৈষ্ণবের স্থানে॥
তাহারে কহেন 'এক শত টাকা লহ।
দ্বারকা মোকামে মোরে হুণ্ডি লিখি দেহ॥
তেঁহো কহে ভাল ভাল শত টাকা দেহ'।
হাজার টাকার হুণ্ডি লিখি দেহ লহ॥
হুণ্ডি লিখি দিলেন শ্যামল সাহার নামে।
কহে সে তুথর বড় দ্বারকার ধামে॥
যার হুণ্ডি চলে সর্ব্বদেশ ব্যেয়াপিয়া।
যাবামাত্র টাকা পাবে হুণ্ডি সমর্পিয়া॥

দেশে দুর্ভিক্ষ মাঝে মাঝে হইত। রেল ষ্টীমার না থাকায় লোক দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশ ত্যাগ করিত। 'জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল' পাঠে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীহট্টে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং বহু ব্যক্তি শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

শিক্ষা-প্রণালী

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ প্রকৃতই সারস্বত-কুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। উচ্চ শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার এই যুগে সাধিত হইয়াছিল। নবদ্বীপ সেই উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। ছাত্রগণ গুরুগৃহে আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তিঁহো পণ্ডিত প্রধান।
পাঁচ শত পড়ুয়ায় নিত্য অন্ন কৈল দান॥

নবদ্বীপে বহুতর ছাত্রের সমাগম হওয়ায় প্রত্যেক পণ্ডিতেরই অনেকগুলি করিয়া ছাত্র হইয়াছিল—সুতরাং নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের পক্ষে সকল ছাত্রকে অন্নদান করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।

ছাত্রগণ ব্যাকরণ পড়িয়া পাঠ আরম্ভ করিত। কলাপ ব্যাকরণই সমধিক আদৃত ছিল। নিম্নে তৎকালের দুইটি পাঠ্য-তালিকা প্রদত্ত হইল।

সুবন্ত দশনাকার পড়িল ষট্‌কারক।
সটীক কলাপ পড়ে সভাব ব্যাপক॥
নবদ্বীপের ভিতর পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
তাহার মন্দিরে কৈল বিদ্যার প্রকাশ॥
চন্দ্র সারস্বত নব কাব্য নাটকে।
স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পঢ়িল একে একে॥—জয়ানন্দ।
শ্রুতিধর প্রভু পড়ে কলাপ ব্যাকরণ।
দৃষ্টিমাত্র শিখে সূত্র অর্থ বিবরণ॥
শ্রীঅদ্বৈত পড়ে তবে সাহিত্যাভিধান
অলঙ্কার জ্যোতিষাদি কৈল সমাধান॥—অঃ প্রঃ।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাও তৎকালে যথেষ্ট হইত—

ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন।
বৈশেষিক বেদান্তে নিপুণ যত জন॥—চৈঃ ভাঃ।

ছাত্র-জীবন

সে সময়ে ছাত্রগণ স্নান করিতে যাইয়াও পাঠ্য বিষয়ের তর্ক ও আলোচনা করিত। বিদ্যার্থী ছাত্রগণের এই বিদ্যাকৌতুকলীলা শ্রীবৃন্দাবনদাস অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অধীত বিদ্যার তর্ক হইতে পরস্পরের অধ্যাপকের বিদ্যা লইয়াও কলহ হইত।

কেহো বোলে "তোর গুরু, কোন্ বুদ্ধি তার।"
কেহো বোলে "বোল এই আমি শিষ্য যাঁর॥"—চৈঃ ভাঃ।

বিদ্যা-প্রচার

Renaissance যুগের Florence-এর ন্যায় নবদ্বীপ বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হইলেও, নবদ্বীপ একা এই সুবিধা ভোগ করে নাই। সমস্ত বঙ্গদেশে নবদ্বীপ বিদ্যা পরিবেষণ করিয়া দিয়াছিল। নদীয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ গ্রীসের Sophistগণের ন্যায় বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে গমন করিয়া শিক্ষা দিতেন। মহাপ্রভু এইরূপে পদ্মানদীতীরে যাইয়া বিদ্যাদান করিয়া আসিয়াছিলেন,—

মহাবিদ্যাগোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি, কে পড়য়ে কার ঠাই॥—চৈঃ ভাঃ।

সংস্কৃতবিদ্যা শুধু ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। কায়স্থ রঘুনাথদাস গোস্বামী স্তবমালা, মুক্তাচরিত ও দানচরিত, নামক অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কায়স্থ নরোত্তমদাস ঠাকুর ও রামানন্দ রায় সংস্কৃতবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। বৈদ্য শিবানন্দের পুত্র পরমানন্দ কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্য মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, অলঙ্কারকৌস্তুভ, কৃষ্ণ ও গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা ও চৈতন্যশতক সংস্কৃতে রচনা করিয়াছেন। মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চা সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর সংস্কৃতে গৌরগণার্চ্চন-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

উচ্চশিক্ষা সকলে লাভ করিতে না পারিলেও, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব ছিল না। বড় বড় পণ্ডিতে সাধারণের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন, উপাস্য দেবদেবীগণের লীলা ও স্তুতিবর্ণন-মূলক গান হইত, তাহাতে সকলে শিক্ষালাভ করিত।

এক স্থলে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হয়।
অন্য স্থলে চৈতন্যভাগবত চরিতামৃত কয়॥
প্রথমে করয়ে গান চৈতন্যমঙ্গল।
তার পরে হয় গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

পরে হয় গোবিন্দের গৌরকৃষ্ণলীলাগান।
নরোত্তমের গানে সবার জুড়ায় মন প্রাণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলাগানে।
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে॥

ভাষা ও সাহিত্য

সাধারণের মধ্যে প্রেমধর্ম্মের ব্যাখ্যা প্রচার করিবার জন্য অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ না লিখিয়া বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় দার্শনিক গ্রন্থ যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাঙ্গালায় লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মহত্ত্বেরই অন্যতম নিদর্শন। বৈষ্ণবসাহিত্যিকগণই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্যতা প্রদান করেন। জীবনী, দর্শন, গান, ভ্রমণবৃত্তান্ত, মনোবিজ্ঞান, স্মৃতি প্রভৃতি নানা বিভাগে গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবগণ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিসম্পন্না করিয়া তুলিলেন।

বৃন্দাবনে বৈষ্ণবগণের একটি উপনিবেশ বসিয়াছিল। তাই বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে "ব্রজবুলির" যথেষ্ট মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বঙ্গে তখনও ভাষার যথেষ্ট প্রভেদ ছিল ঈশানের অদ্বৈত-প্রকাশের ভাষার সহিত চৈতন্যভাগবতের ভাষা মিলাইলেই এ কথা বুঝিতে পারা যাইবে।

সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান

মহাপ্রভু তাঁহার উদার প্রেমধর্ম্মে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচারা" নীতি অবলম্বন করেন নাই। পুরুষের সহিত ধর্ম্মরাজ্যে স্ত্রীজাতির সমান অধিকার, ইহাই বৈষ্ণবগণ প্রচার করেন। "কর্ণানন্দে" শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বহু স্ত্রীশিষ্যের পরিচয় আছে। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর নিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবীর বৈষ্ণব-সমাজে যে প্রভাব দেখা যায়, তাহা হইতে তৎকালীন বঙ্গসমাজে মহিলার স্থান নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইবে না। এই জাহ্নবাদেবী বঙ্গরমণীকুলের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার উপযুক্ত। বহু বৎসর ধরিয়া তিনিই বৈষ্ণবসমাজের নেত্রী ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস ও নরোত্তমবিলাস পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার আজ্ঞাতেই খেতুরীর মহোৎসবে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। এই বঙ্গরমণী বৃন্দাবন হইতে বঙ্গের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি শুধু যে উপদেশিকা হইয়া সেবা ও শ্রদ্ধাঞ্জলিই গ্রহণ করিতেন, তাহা নহে, বঙ্গরমণীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত মাতৃভাবপ্রণোদিত সেবাও তাঁহার মধ্যে দেখা যায়,—

সে দিবসে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আপনে।
মনের আনন্দে শীঘ্র চলিলা রন্ধনে॥

রন্ধন-পরিবেষণ করিয়া বহু বার তিনি ভক্তবৃন্দকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়াছেন

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিত, তাহা আমরা যদুনন্দনদাসের প্রত্যেক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পয়ার হইতে বুঝিতে পারি।

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দরস কহে যদুনন্দন দাস॥

হিন্দুরমণীগণ সাধারণতঃ গৃহকোণে তাঁহাদের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতেন না, মুসলমান মহিলাগণের ন্যায় তাঁহারা পর্দ্দার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতেন না। তাঁহারা সুবিধামত স্বামী বা আত্মীয়ের সহিত তীর্থযাত্রাও করিতেন।

সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা অদ্বৈত সঙ্গে অচ্যুত-জননী॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ দাস সঙ্গে তাহার গৃহিণী॥
আচার্য্যরত্ন সঙ্গে চলে তাহার গৃহিণী॥
তাহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥ --চৈঃ চঃ।

মহিলাগণের মধ্যেও যে শিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা আমরা শিখি মাইতির ভগিনী শ্রীমাধবী দেবীর রচিত পদাবলী হইতে জানিতে পারি। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৪, ২৩৯২ ও ২১৯৩ সংখ্যক পদ তাঁহার লিখিত।

পর্য্যটন

রেলগাড়ী না থাকিলেও লোকে দূরদেশে ভ্রমণ করিত। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর, অদ্বৈতপ্রকাশে অদ্বৈতপ্রভুর, চরিতামৃতে মহাপ্রভুর এবং ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের বহুদূরব্যাপী পর্য্যটনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সিংহলেও ভ্রমণকারিগণ গমন করিতেন।

আমি করিলাঙ যে পৃথিবী পর্য্যটন।
অযোধ্যা মথুরা মায়া বদরিকাশ্রম॥
গুজরাট কাশী গয়া বিজয়ানগরী।
সিংহল গেলাঙ আমি যত আছে পুরী॥—চৈঃ ভাঃ।

পথে দস্যু-ভয় হেতু পর্য্যটনকারিগণ দলবদ্ধ হইয়া গমনাগমন করিতেন। এইরূপ একটি দল দেখিয়া ভীত হইয়া রাজদূত প্রতাপরুদ্রকে বলিতেছে,—

পরঃ সহস্রাঃ সহসৈব পারে
চিত্রোৎপলাং যোমনুজাঃ সমূঢ়াঃ।

কিং তৈর্থিকাস্তে পরচক্রজাঃ কিং
শ্রুতৈব কোলাহলম গতোঽস্মি।—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৮অঃ।

সঙ্কীর্ত্তন ও আমোদ-প্রমোদ

সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই মহাপ্রভু ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন এ দেশে নূতন নহে—শ্রীমদ্ভাগবতে "কলৌ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" বাক্য আছে। বৌদ্ধগণের দোঁহাও সঙ্কীর্ত্তনরূপে গীত হইত। কিন্তু মহাপ্রভু সেই সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে নব ভাবের উন্মাদনা দিয়া তাহার নব-প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গড়েরহাটী কীর্ত্তনের রাগ-রাগিণী সৃষ্টি করিয়া খেতুরীর মহোৎসবে ঐ সুরে কীর্ত্তন করেন।

কেহো কহে ঐছে গীতবাদ্যাদি না হয়।
না জানিয়ে নরোত্তম কৈছে প্রকাশয়॥
কেহ কহে মহাপ্রভু স্বরূপের মুখে।
শুনিতেন উচ্চ গীত মহাহর্ষ মনে॥
গীত প্রথারক্ষা, ক্ষোভ নিবৃত্তি নিমিত্তে।
প্রচারিতে সম্যক্ বিচার কৈল' চিত্তে॥
সে সময় তাহা প্রেমসম্পুটে রাখিল।
নরোত্তমদ্বারে প্রভু এবে উঘারিল॥—ভক্তি-রত্নাকর।

বঙ্গের জনসাধারণ যে কীর্ত্তনরসে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। পরবর্ত্তী কালে উৎপত্তিস্থানানুসারে মনোহরসাহী, রেণেটী ও মন্দারণ নামে আরও তিনটী কীর্ত্তনশাখা প্রসিদ্ধি লাভ করে। উক্ত প্রকার নামকরণ হইতে বঙ্গদেশে কীর্ত্তনের প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য কীর্ত্তনারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা গীত হইয়া থাকে। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরই বোধ হয় গৌরচন্দ্রিকার সৃষ্টিকর্ত্তা। পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, সরকার ঠাকুরের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,—

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা হৈল মনে॥

বৃন্দাবনদাসও অধিবাসের একটি পদে গাহিয়াছেন,—

সংকীর্ত্তনের অধিকারী হইলেন নরহরি
বিলসই শ্রীরঘুনন্দন।—গীতরত্নাবলী।

অনেকের ধারণা, মহাপ্রভু মৃদঙ্গের প্রবর্ত্তক। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে মৃদঙ্গের উল্লেখ আছে।

লোকে চিত্তবিনোদনের জন্য নাটক অভিনয় করিত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুকর্তৃক "রুক্মিণী" নাটক অভিনয়ের কথা আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্যচন্দ্রোদয়, দানকেলীকৌমুদী, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব প্রভৃতি নাটক আছে।

লোকে পরম আগ্রহের সহিত মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, যোগিপাল, মহীপালের গীত গান করিত। উজ্জ্বলনীলমণিতে ধৈর্য্যশালিনী নায়িকার লক্ষণে বানর পোষার কথা দেখা যায়, "হারং হারয়তে হরিপ্রণিহিতং"। পাশাখেলা এ দেশে প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহার বর্ণনা আছে।

রাই যব ধরি জিতই লাগল
দশ বা পঞ্চ বলি ডাকই রে।—গোবিন্দদাস।

ফাগুখেলায় খুব আনন্দ হইত,—

কেহ ডম্ফ বাজাইয়া ফিরে কেহ নাচে।
কেহ হস্তে লৈয়া ফাগু ধায় কার পিছে॥—নরোত্তমবিলাস।

চিত্র-শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য

চিত্রবিদ্যা দেশে সুপ্রচারিত ছিল এবং উচ্চশ্রেণীর নরনারী অঙ্কবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন—

তুয়া অনুরূপ এক পটে লিখিয়া
দেয়ল তাকর আগে।
সো রূপ হেরি মুরছি পড়, ভূতলে
মানয়ে করম অভাগে॥ যদুনন্দন।

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির ও তৎকালীন বাঙ্গালার বহু মন্দির দেশের স্থাপত্য-বিদ্যার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মন্দির ও মূর্ত্তি-শিল্পী সমাজে যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে আছে,—

ততঃ সপরিবারাংশ্চ শ্রীমূর্ত্ত্যাদিবিধায়িনঃ।
শিল্পিনোঽভ্যর্চ্য বিবিধৈঃ দ্রব্যৈর্বাক্যৈশ্চ তোষয়েৎ॥

পারিবারিক জীবন

সমাজে দশকর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। ছয় মাসের সময় অন্নপ্রাশন ও নামকরণ হইত,—

এক দুই তিন, কুরি পাঁচ ছয় মাসে।
নামকরণ হইল অন্নপ্রাশন দিবসে॥
পুত্রমহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর।
অলঙ্কার ভূষিত সোনার কলেবর॥—চৈঃ মঃ।

পাঁচ বৎসরের সময় হাতেখড়ি ও চূড়াকরণ হইত।

পাঁচ বৎসর প্রভুর হইল বয়স।
দিনে দিনে বাড়ে প্রভুর প্রেমানন্দ বেশ॥
মিশ্র পুরন্দর দেখি আপন তনয়।
হস্তে খড়ি চূড়াকর্ণের এই ত সময়॥
আগে দিলা হাতে খড়ি পড়িবার তরে।
যাহে চৌষট্টি বিদ্যা জিহ্বা অগ্রে স্ফুরে॥
তবে করি চূড়াকর্ণ সংযোগ আপার।
নানা বিদ্যাস্তীয় আনি করিতে বিচার॥—চৈঃ মঃ।

চূড়াকরণের সময় বেদপাঠ ও যজ্ঞ হইত,—

ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে গায়নে গায় গীত।
করিল সে যজ্ঞবিধি যে ছিল উচিত॥—চৈঃ মঃ॥

উপবীতকালেও যথেষ্ট ধূমধাম হইত,—

যজ্ঞকর্ম্ম জানে যে জানএ বেদরীত॥
গুবাক চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
শত শত কুলবধূ সিন্দূর পড়িল॥—চৈঃ মঃ।

সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। নরোত্তমের—

বয়ঃক্রম হইল আসি দ্বাদশ বৎসর।
রূপ দেখি পিতামাতার আনন্দ অন্তর॥
বিবাহ লাগি দৈবজ্ঞ বসাইল বিরলে।
বিলম্ব না সহে বিবাহ করাহ সত্বরে॥—প্রেঃ বিঃ।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহাপ্রভুর সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ প্রভুর বার বৎসর কালে হাড়াই পণ্ডিত তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু-বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় ছিল না। নিত্যানন্দ বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য—

বৈষ্ণবের অনুরোধে বিবাহ করিল।
কত দিন পরে পুন আর বিভা কৈল॥—কর্ণানন্দ।

বিবাহে সামাজিক ভোজনের কথা বৈষ্ণব-সাহিত্যে উল্লেখ নাই।

"অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে।"

বলিয়া নিমন্ত্রণ হইত এবং নিমন্ত্রিতগণ আগমন করিলে,—

তবে গন্ধ চন্দন তাম্বুল দিব্যমালা।
ব্রাহ্মণগণেরে সবে দিবারে লাগিলা॥

শিরে মালা সর্ব্ব অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে।
এক বাটা তাম্বূল দেন একো জনে॥ —চৈঃ ভাঃ।

আধুনিক কালের ন্যায় তখনও বিবাহের মিছিল বাহির হইত,—

সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে॥
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর।
চলেন হইয়া দুই সারি পাটোয়ার॥

বর কন্যার বাটী আসিলে পর নিম্নলিখিত উপায়ে তাঁহাকে বরণ করা হইত,—

হাথেতে উজ্জ্বল দীপ অন্তর উল্লাস॥
আইহগণ আগে পাছে কন্যার জননী।
বর উরখিতে ধনী চলিলা আপুনি॥
সাত প্রদক্ষিণ করি সাত দীপ হাতে।
চরণে ঢালিল দধি হরষিত চিতে॥—চৈঃ মঃ।

শুভদৃষ্টির সময়,—

তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে॥—চৈঃ ভাঃ।

ভাটগণ আসিয়া বর ও কন্যাকুলের গুণকীর্ত্তন করিত। যথা,—

ভাটগণে পড়িতে লাগিল রায়বার।—চৈঃ ভাঃ।

বরপণপ্রথা ছিল বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। মহাপ্রভুর বিবাহের সময় আজিকালিকার ন্যায় বরের দর-কষাকষি হয় নাই। বরপক্ষ হইতেই কন্যাপক্ষের নিকট প্রস্তাব গিয়াছিল। তবে কন্যাকর্ত্তা যথেষ্ট যৌতুক বরকে প্রদান করিতেন। যথা,—

তবে দিয়া ধন ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস॥—চৈঃ ভাঃ।

বাসরে যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদ হইত, তাহার বর্ণনা চৈতন্যমঙ্গলে আছে। অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহের কোন উদাহরণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীশচীমাতাকে যথোচিত সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। তৎকালে বধূ ও শাশুড়ীর মধ্যে যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগের পর এই সেবাপরায়ণা মহিলার কাহিনী হইতে বুঝিতে পারি। অন্যান্য পারিবারিক সম্বন্ধের চিত্র বৈষ্ণব-সাহিত্যে সবিশেষ অঙ্কিত হয় নাই। অতিথিসেবা গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে জনৈক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়াছিলেন। বালক নিমাই তাঁহার আহার্য্য তিন বার নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। মিশ্রের আক্ষেপ হইতে আমরা অতিথির প্রতি গৃহস্থের যত্নের পরিমাণ অনুমান করিতে পারি।

দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন না স্ফুরে॥—চৈঃ ভাঃ।

গ্রাম্য-নিবেশ

প্রত্যেক গ্রামই স্বসম্পূর্ণ ছিল। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম মাত্রেই যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ব্যতীত তন্তুবায়, গোপ, গন্ধবণিক্, মালাকার, তাম্বূলী, শঙ্খবণিক ও সর্ব্বজ্ঞ বাস করিত, তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত মহাপ্রভুর নগরভ্রমণ-কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায়। প্রত্যেক জাতির জন্য এক একটি পাড়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষী থাকা আমাদের নিকট বিচিত্র বোধ হইতেও পারে, কিন্তু তদানীন্তন হিন্দুসমাজ জ্যোতিষীর মত না লইয়া কোন শুভ-কার্য্যে হাত দিতেন না। চণ্ডীদাসেও আছে, শ্রীকৃষ্ণ—

গ্রহবিপ্রের বেশে যান ভানুর ভবন॥
পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরি দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাই পাশে ভানুরাজপুরে॥

বিলাতী এসেন্স ব্যবহৃত না হইলেও আমাদের দেশে সুগন্ধি দ্রব্যের বা সৌখীনতার অভাব ছিল না। মহাপ্রভুকে গন্ধবণিক্ বলিতেছে,—

আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহত ঠাকুর।
কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর॥
ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিত্তে পড়ে॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে হিন্দুপল্লীর স্নানের ঘাটের যে মনোহর বর্ণনা আছে, নিজে না পড়িলে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। নবদ্বীপের ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ জলে আবক্ষ ডুবিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, কেহ বা তীরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। হিন্দু কুমারীরা নানাবিধ পুষ্পসম্ভারে শিবপূজা করিতেছে—মহিলাগণের শাড়ীতে শাড়ীতে ঘাট আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক সহরবাসী বাঙ্গালীর নিকট এ মধুর হিন্দুচিত্র কোন স্বপ্ন-রাজ্যের বলিয়া প্রতীত হয়।

বিবিধ

সের শাহ কর্ত্তৃক ডাক-প্রথা স্থাপিত হইলেও সাধারণে তাহা ব্যবহার করিতে পাইত না বা করিত না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে লোক-মারফৎ পত্রাদি প্রেরণের কথাই পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ যে সংস্কৃতেও পত্রাদি লিখিতেন, তাহা কর্ণানন্দে উদ্ধৃত শ্রীজীব গোস্বামীর একখানি পত্র হইতে জানা যায়। তৎকালে দেশে মটর-গাড়ী না থাকিলেও ধনিগণের বিলাসবৈভবের কিছু ত্রুটি হইত না।

বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে।
নাম্বিয়া করেন নমস্কার বহু মতে॥—চৈঃ ভাঃ।

সুসজ্জিত হইবার জন্য পুরুষেও অলঙ্কার পরিত। অলঙ্কারের মধ্যে চৈতন্যভাগবত ও পদাবলী হইতে নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলির নাম পাওয়া যায়—সুবর্ণের অঙ্গদ, বলয়, অঙ্গুরীয়ক, হার, কুণ্ডল, নূপুর, মল্ল প্রভৃতি। জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলের নদীয়াখণ্ডে নবদ্বীপ-বর্ণনায় তৎকালে ব্যবহৃত তৈজসপত্র ও দ্রব্যের একটি তালিকা দিয়াছেন। সৌখীন দ্রব্যসমূহ ঘরে ঘরে ফিরি করিয়া স্ত্রীগণও বিক্রয় করিত। চণ্ডীদাসে আছে,—

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন অমলা বণ্টন
যতন করিয়া আনে॥
কেশর যাবক কস্তূরী দ্রাবক
আনিল বেণার জড়।

পূর্ব্বকালেও দেশী কনসার্ট বাদ্য বাজিত। চৈতন্যমঙ্গলে আছে,—

বীণা কেশুক বিলাস বংশীর নিসান।
রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ একতান॥

নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল,—

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর (ভেরী) কাহাল (ঝাঁঝ)।
মৃদঙ্গ গড়াহ বাজে কাংস্য করতাল॥
ঢাকের ডুড়ডুড়ু শুনি যোজনের পথে।
শুনিঞা জুড়ায় হিয়া শাহানি শবদে॥ - চৈঃ মঃ।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহু স্থলে তদানীন্তন খাদ্যসামগ্রীর এমন সকল বর্ণনা আছে যে, পড়িতে পড়িতে প্রসাদ পাইবার দুরন্ত লালসা মনে উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের এমন একটি বর্ণনা উদ্ধার করিয়া আমরা "মধুরেণ সমাপয়েৎ" নীতি পালন করিব।

পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারি দিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল॥
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারি দিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি॥
দশ প্রকারের শাক নিম্ব সুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া বড়া ঘোল॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড বেসারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার॥

নব নিম্বপত্র সহ ভৃষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥
ভৃষ্ট মাষ, মুদ্গসূপ অমৃতে নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেলপুলী আর কত পিষ্ট ॥
কাঞ্জিবড়া দুগ্ধ চিড়া দুগ্ধ লকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ॥

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

৺প্যারীচাঁদ মিত্র

ইংরাজী ১৮৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ৺রাধানাথ শিকদারের সহায়তায় একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। উহার প্রত্যেক সংখ্যার গোড়ায় লেখা থাকিত, "ইহা চলিত ভাষায় লেখা, স্ত্রীলোকদের জন্যই লেখা, পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন—পড়িতে পারেন, তবে ইহা তাঁহাদের জন্য লেখা নহে।" এইরূপে চলিত ভাষায় লিখিব বলিয়া পণ করিয়া বাঙ্গালা লেখা এই প্রথম। স্ত্রীলোকদিগের জন্য লিখিব বলিয়া পণ করিয়া লেখাও, বোধ হয়, এই প্রথম। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ছিল, বাঙ্গালা গদ্য ছিল—কিন্তু সেগুলি সাধুভাষা বা পণ্ডিতি ভাষায় লেখা। চলিত ভাষা থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাষার গৌরব হইবে, পণ্ডিত মহাশয়দের এই ধারণাই ছিল। সে ভাষা স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক পুরুষের পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল। আমি বাল্যকালে এক বৃদ্ধকে তারাশঙ্করের কাদম্বরীর তর্জ্জমা পড়িয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম, —আহা! তারাশঙ্কর কি চমৎকার ভাষাই লিখিয়াছে! অভিধান ভিন্ন এক বর্ণও বোঝা যায় না। এই ত লেখার গাম্ভীর্য্য।

যখন ভাষার প্রতি লোকের এইরূপ ভাব, তখন চলিত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করা খুব সাহসের কাজ, খুব দূরদৃষ্টিরও কাজ। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সাধুভাষা লোকে পড়িতে পারে না, বুঝিতে পারে না, সুতরাং সে ভাষায় লেখা আর না লেখা, দুই সমান। তাই তিনি চলিত বাঙ্গালা ধরেন: এ ধরায় বিশেষ উপকার হইয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা একটা ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্ত্রীলোকদের জন্য লেখা, ইহারও বিশেষত্ব আছে। আগে বাঙ্গালা গদ্যে বই লেখা হইত—তার বিষয় হয় সংস্কৃত হইতে নেওয়া, নয় বিচার, না হয় নাটক ও নভেল—রুচি এমন কদাকার যে, স্ত্রীলোকের হাতে কোনও মতেই দেওয়া যায় না। তাই শুধু মেয়েদের পড়িবার জন্য, তাহাদের আমোদের জন্য, যাহাতে তাহাদের শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার জন্য ভাল ভাল উপদেশ দিয়া এই পত্রিকা বাহির করা হয়। বঙ্কিমবাবু ঠিক বলিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজীর গণ্ডীর মধ্যে থাকিত, তাহার নিজের গণ্ডী ছিল না। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশেও ঘরের কথা লইয়া বই লেখা যায়, আর সে বই পড়িবার মতনও হয়। আর এই ৭০ বৎসর পরে এখনকার লোকের ধারণা, বাঙ্গালায় ঘরের কথা লইয়াই বই লেখা উচিত এবং তাহা পড়িলেই বেশী উপকার হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের মাসিক পত্রিকাতেই "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম বাহির হয়। ঐ গল্প পঁচিশ সংখ্যাতে বই হইয়া বাহির হয়। ঐ বইয়ে কিন্তু বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম ছিল না। মলাটে লেখা ছিল, "শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত।" টেকচাঁদ ঠাকুর কে, ইহা কেহই বুঝিতে পারিত না। বাবু প্যারীচাঁদ যখন মেটকাফ হলের সেক্রেটারী ও পবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান,

সেই সময় আসাম দেশ হইতে একজন বড়লোক কলিকাতায় বেড়াইতে আসেন—তাঁহার নাম ছিল ঢেঁকচন্দ্র ফুকন্। তিনি কলিকাতার বড় বড় বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে খুব মিশিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই বোধ হয়, টেকচাঁদ ঠাকুরের উৎপত্তি। সে কালের অনেক লোকেই তাঁহার নাম জানিত, এখনকার লোকে ভুলিয়া গিয়াছে।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র যদি দুই একখানি "আলালের ঘরের দুলালে"র মতন গল্পের বই লিখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে গল্পের প্রথম লেখক বলিয়া মান্য করিতে হইত। কিন্তু গল্প লেখার চেয়ে তিনি ঢের বেশী কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালায় সব জিনিষই লেখা যায়, সব ভাবই প্রকাশ করা যায়। বাঙ্গালায় দর্শনবিজ্ঞানেরও বই লেখা যায়। তিনি চাষ ও বাগান করা সম্বন্ধে বাঙ্গালায় অনেক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটীর মেম্বর ছিলেন। এই উপলক্ষে চাষ ও বাগানের বিষয়ে তিনি অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি চলিত ভাষায় লেখা, সহজ করিয়া লেখা, তাহা পড়িলে এখনও লোকের উপকার হইতে পারে। তাঁহার "আধ্যাত্মিকায়" অতি সহজ করিয়া যোগ ও বেদান্তদর্শনের অনেক গভীর কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহার "অভেদী"তেও এই রকম দর্শনশাস্ত্রের কথা আছে। মাসিকপত্রিকায় তিনি যে সকল ইতিহাসের গল্প লিখিয়াছেন, সেগুলিও বড় মিষ্ট। গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কোন্ বারে কি করিয়াছিলেন, তাঁহার মাসিক পত্রিকায় অতি সুন্দর করিয়া তাহা লেখা আছে। ভণ্ড পাষণ্ডদের কি করিয়া বিদ্রূপ করিতে হয়, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। ভবশঙ্করবাবু, বাচস্পতি মহাশয়, গোঁসাইজি প্রভৃতির চরিত্রে ভণ্ডামি কেমন করিয়া ধরাইয়া দিতে হয়, তাহা তিনি বেশ দেখাইয়াছেন। তিনি চৌচাপাট দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় সব রকম ভাবই প্রকাশ করা যায়, আর সব রকম সাহিত্যই লেখা যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি খুব খাটিতে পারিতেন। খাটিয়া তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। ছেলে বেলা হইতেই তাঁহার খাটুনির আরম্ভ। হিন্দুকলেজে পড়িতে পড়িতেই তিনি বাড়ীতে এক স্কুল বসাইয়াছিলেন। তিনিই বেশী করিয়া পড়াইতেন। তাহার পর যত বয়স বাড়িতে লাগিল, তাঁহার খাটুনিও বাড়িতে লাগিল। তাঁহার বাপ-পিতামহ কারবারী লোক ছিলেন। কারবারেই তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি। তিনিও কারবারই করিতেন। লর্ড মেটকাফ কলিকাতা ত্যাগ করিলে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, প্যারীবাবু তাহাতে খুব একহাত ছিলেন। তাই সেই স্মৃতির জন্য যখন মেটকাফ হল হইল, তখন লোকে তাঁহাকেই সেক্রেটারী ও সেখানে যে পুবলিক লাইব্রেরি হইল, তাহার লাইব্রেরিয়ান করিল। তিনি এত মিশুক ছিলেন ও তাঁহার পড়াশুনা এত বেশী ছিল যে, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, যাঁহার যখন কিছু জানিবার দরকার হইত, মেটকাফ হলে লাইব্রেরিতে গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তিনি তাঁহার সাধ্যমত তাঁহাদের উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। মেটকাফ হল তখন বড় রকম একটী পণ্ডিতের আড্ডা হইয়াছিল। এখানে পণ্ডিত শব্দে শুধু সংস্কৃতওয়ালাই নয়, বরং ইংরাজীওয়ালাই বেশী। বাঙ্গালী-সমাজের কোনও বিপদ্ সম্পদ্ উপস্থিত হইলে, একটা বড়

রকম আন্দোলন উপস্থিত হইলে, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাহাতে একহাত আছেনই আছেন। কিন্তু কোথাও প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় প্রধান (অগ্রণী, নেতা) হইবার চেষ্টা করিতেন না। ইংরাজীতে তাঁহার কলম খুব চলিত। সভাসমিতির কাজকর্ম্ম ইংরাজীতেই হইত; সুতরাং প্যারীচাঁদ ভিন্ন চলিত না। তিনিও ইচ্ছা করিয়া ধরা দিতেন এবং খুব খাটিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া দিতেন। হেয়ার সাহেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অগাধ ছিল। সুতরাং হেয়ার সাহেবের নামে যে কোনও কার্য্য আরম্ভ হইত, তিনি প্রাণপণে সেই কার্য্যটীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে তিনি হেয়ার মেমোরিয়াল, হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড, হেয়ার এ্যানিভারসারি প্রভৃতি হেয়ার সাহেবের নামের সহিত জড়িত যত কার্য্য ছিল, সেই সব কার্য্যেই জড়িত থাকিতেন।

তিনি ইংরাজীতে হেয়ার সাহেবের একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেই বইখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ কলিকাতাবাসীর পড়া অবশ্য কর্ত্তব্য। হেয়ার সাহেব যে কয় বছর বিলাতে ছিলেন, এ বইয়ে তাহার কোনও কথা নাই। তিনি ষোল বছর কলিকাতায় ঘড়ির কারবার করিয়াছিলেন, এ বইয়ে সে ষোল বছরের কোনও কথা নাই। ১৮১৬ সালে হেয়ার সাহেব কারবার উঠাইয়া দিয়া কলিকাতার হিন্দুরা যাহাতে ইংরাজী শেখে, ইংরাজী শিখিয়া মানুষ হয়, সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। ১৮৪২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ২৬ বৎসর তিনি অকাতরে টাকা খরচ করিয়াছেন এবং প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি সকালেই পাল্কী করিয়া বাহির হইতেন। পাল্কীতে বই থাকিত, ওষুধ থাকিত; তিনি স্কুল দেখিতেন, পাঠশালা দেখিতেন। পাল্কী করিয়া সারা কলিকাতা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বড় বড় ভদ্রলোকের বাড়ী যাইতেন, তাহাদের সঙ্গে মিলিতেন মিশিতেন, তাহাদের রোগে শোকে, উৎসবে ব্যসনে তাহাদের সহিত দেখা করিয়া যাইতেন। ছোট ছোট ছেলেদের খেলানা দিতেন। তাহাদের তালপাতে, কলাপাতে ও কাগজে লেখা দেখিতেন; বই দিতেন, কাগজ দিতেন। প্যারীচাঁদ যে এমন একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের ভক্ত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই যে ২৬ বৎসর, ইহাতেই কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ। এই সময় হিন্দুকলেজ, সংস্কৃত-কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি অনেকগুলি কলেজ খোলা হয়, ইংরাজীতে সভাসমিতি হইতে থাকে, ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় অনবরত কাগজ বাহির হইতে থাকে। এই সময় ইংরাজী শিখিবার জন্য একটা ভয়ানক ঝোঁক ও একটা বিশেষ নেশা আসিয়া উপস্থিত হয়। হেয়ার সাহেবই ঐ নেশার গুরুমশায়। সুতরাং কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাস প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের এই বইখানায় বিশেষ করিয়া লেখা আছে। তাই আমি বলিয়াছি, কলিকাতার বাঙ্গালী মাত্রেরই এই বইখানা পড়া উচিত।

তিনি ইংরাজীতে আরো একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেখানি স্বনামধন্য রামকমল সেন মহাশয়ের। ইঁহার নিবাস গরিফা; কিন্তু কলিকাতায় ইনি খুব প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন এবং ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি একজন আস্তিক হিন্দু; সুতরাং রামমোহন রায়ের

ব্রাহ্মসমাজের—সতীদাহ নিবারণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ-মহলে ইহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। ইংরাজেরা ইহাকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন এবং একটু ভয়ও করিতেন। ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রথম কেরাণী, পরে ধনাধ্যক্ষ ও পরে মেম্বর হইয়াছিলেন। সেখানকার সভায় কাগজ পড়িতেন ও পুরাণ তর্জ্জমা করিতেন। কলিকাতার হিন্দু বাসেন্দাগণ তাঁহাকে খুব বড় লোক বলিয়া মনে করিতেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বলিতেন যে, রামকমলের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যে, সে না এলে সভা-সমিতি জমে না। সংস্কৃতকলেজ যখন খোলা হয়, সেন মহাশয় তাহাতে একজন প্রধান উদ্‌যোগী। সে সভায় রামমোহন রায়কে আসিতে দেওয়া হয় নাই। হেয়ার সাহেব রায় মহাশয়কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তুমি গেলে হিন্দুরা আসিবেন না। গবর্ণমেণ্টের একটা কাজ মাঠে মারা যাইবে। সেন মহাশয় সংস্কৃতকলেজের কমিটীর সেক্রেটারী হইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ ইংরাজীতে আরো একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেখানি "কোলস্‌ওয়ার্দ্দি গ্র্যাণ্ট" সাহেবের জীবনচরিত। এই মহাত্মা আপনার সকল কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে পশুদিগের উপর অত্যাচার নিবারণ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন এবং "প্রিভেন্‌সন্ অব ক্রুয়েল্টি টু আনিম্যালস্" নামক আইন পাশ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং অনেক দিন ধরিয়া সেই আইনমত যাতে কার্য্য হয়, তাহা দেখিবার ভার লইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ইংরাজীতে "স্পিরিচুয়ালিজমের" উপর অনেক বই লিখিয়াছিলেন। তিনি স্পিরিচুয়ালিজম বিশ্বাস করিতেন, প্ল্যানচেট বিশ্বাস করিতেন, মিডিয়াম্ বিশ্বাস করিতেন এবং এই শাস্ত্রের তিনি খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের বড় বড় লোকের সহিত তাঁহার চিঠি লেখালিখি চলিত। এই উপলক্ষেই তিনি যোগ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আধ্যাত্মিকায় প্রকাশ। নতুবা তিনি হিন্দু ধর্ম্মের কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মাসিক পত্রিকায় প্রথম রচনা "শ্রাদ্ধে কোনও ফল নাই।" সেটী চলিত ভাষায় লেখা এবং বেশ জোরের লেখা। তিনি বলেন, শ্রাদ্ধ করিলে যদি লোকে স্বর্গে যায়, তাহা হইলে বড় লোকেই স্বর্গে যাইবে, গরীব মানুষের আর কোন উপায় নাই। ধনী লোকেরা প্রায় জীবনে মদখোর ও বেশ্যাবাজ হয়, তাহারা যদি শ্রাদ্ধের চোটে স্বর্গে যায়, তাহা হইলে স্বর্গ যে বিশেষ কামনার বস্তু হইবে, বোধ হয় না। প্যারীবাবু লিখিবার সময় এরূপ জোর কলমে লিখিলেন। কিন্তু তিনি প্রতি বৎসর যথাসময়ে যথারীতি পিতাপিতামহের শ্রাদ্ধ করিতেন। শেষ বয়সে ইংরাজ গুরুর উপদেশে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয়। তিনি লিখিয়াছেন,—

The three births, above alluded to, are the natural birth, the regenerated birth and the spiritual birth. The conviction as to the immortality of the soul was so [illegible]ong that it gave rise to *shraddhas* or offering funeral cakes to the souls of the deceased, which is considered not only

a sacred duty on the part of every Hindu, but a condition of inheritance In the offer of funeral cakes, there is a spirit of charity for the souls of the unfortunate :—"May those who have no father or mother or kinsman, no food or supply of nourishment, be contented with this food offered on the ground and attain like it a happy abode."

Page 7 of the Spiritual Stray Leaves by Peary Chand Mittra.

যাহা হউক, প্যারীবাবু কিরূপ লোক ছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। তিনি চলিত ভাষায় বই লেখার একরকম আদিগুরু। সুতরাং তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে; আমাদের নিজের উপকারের জন্য—তাঁহার নহে। তিনি এখন স্তুতি-নিন্দার অতীত। স্পিরিচুয়ালিজমের মতে তিনি এখন সপ্তম বা অষ্টম স্বর্গে। কিন্তু তিনি যে ভাষা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ত সে কালের ভাষা। সে কালের ভাষার সহিত এ কালের ভাষার তুলনা করিলে আমরা অনেক জিনিস শিখিতে পারিব।

প্যারীবাবুর ভাষার খুব জোর, খুব দৌড়। যে ভাষায় লিখিলে "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল হায়," ইহা সেই ভাষা—যে হেতু ইহা চলিত ভাষা। এই ভাষায় যে লেখে ও যে পড়ে, তাহাদের মধ্যে ভাষা বলিয়া একটা পর্দ্দাই থাকে না। এই জন্যই এ ভাষায় লিখিলে হাসিবার সময় লোকে হাসে ও কাঁদিবার সময় লোকে কাঁদে। সেই জন্যই মাতাল ভবশঙ্কর কৃষ্ণ সাজিয়া যখন "নবনারীকুঞ্জ" হইতে ধপাত করিয়া পড়িয়া গেলেন, তখন লোকে হাসিয়া অস্থির হইল। আর যখন ঠকচাচা আর বাহুল্য, দুজনে জাল করার জন্য জেলে গেলেন, তখন লোকের আনন্দের আর সীমা রহিল না। আবার যখন আধ্যাত্মিকার পৈতৃক সম্পত্তি সব গেল—বাবাও মাঁরা গেলেন, দেনার দায়ে বাড়ীখানিও বিক্রী হইয়া গেল, অথচ আধ্যাত্মিকার ভ্রূক্ষেপ নাই, শান্তভাবে নির্ব্বিকার চিত্তে যোগ-সাধনায় চলিয়া গেল, তখন লোকে তাহার দুঃখে দুঃখী হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাঙ্গালা পদ্যে এ ভাবটা চিরকালই আছে, বাঙ্গালা পদ্য কোনও কালেই পণ্ডিতের জন্য লেখা নয়। বৌদ্ধেরা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য লিখিত, হিন্দু কবিরাও ধর্ম্ম প্রচারের জন্য লিখিত, সুতরাং যাদের কাছে প্রচার করিবেন, তাদের ভাষায় লিখতে হত। নিজের বিদ্যে তাতে ফলাবার জো ছিল না। বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। উহার উৎপত্তি ইউরোপীয় মিশনারীদের হাতে—উঁচু নীচু, এবড়োখেবড়ো এক রকম ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা বুললেও হয়। তারপর সে বাঙ্গালা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে পড়ে। সেটা হল সংস্কৃতের গণ্ডী। তার ভাবও সংস্কৃত, ভাষাও সংস্কৃত। ইহার পরের বিকাশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে। সেখানে এই সাধু ভাষা, মাজা ঘষা, শুনতে মিষ্টি হয়। কিন্তু সে ভাষা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে" না। তাই প্যারীচাঁদের ভাষার এত আদর।

কিন্তু সাহস করিয়া চলিত ভাষায় লিখিতে গিয়া প্যারীবাবু বেশ বিপদে পড়িয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহার ভাব আসিত ইংরাজীতে, সেগুলিকে বাঙ্গালা করিতে তাঁহার বিশেষ বেগ

পাইতে হইত। আবার সেগুলি সহজ হইলেও চলিত বাঙ্গালা হইত না। যে ইংরাজী-বাঙ্গালা হইত। এই ইংরাজী-বাঙ্গালাটাই শেষ ইংরাজী-শিক্ষিত মহলে বড়ই চলিয়া গিয়াছে। সেটা কিন্তু সংস্কৃত চলার চেয়ে খারাপ হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের ভাষায় এই দোষ অত্যন্ত বেশী। ইংরাজীনবিশ বাঙ্গালা লিখিতে গেলেই এই দোষ করিবেন এবং তাহাতে এই ভাষা বাঙ্গালীদের পক্ষে দুর্ব্বোধও হইবে। যাঁহারা রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি লেখেন, এই কারণে তাঁহাদের ভাষা লোকের কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয়, এবং তাঁহাদের বইও চলে না। এই জন্য আমি একবার রাগ করিয়া বলিয়াছিলাম, "বাবু হে! বাঙ্গালায় ভাবিতে শেখ। যদি তা না পার, তাহা হইলে বাঙ্গালায় কলম ধরিও না।"

প্যারীবাবু স্ত্রীলোকদের জন্য বই লিখিয়াছেন; সুতরাং কোন্‌টা সুরুচি, কোন্‌টা কুরুচি, তাহা তিনি বেশ বুঝেন। তাঁহার রচনার বিষয়ে কুরুচি নাই, থাকিতেও পারে না। কিন্তু কোন্ শব্দটা সুরুচি, কোন্ শব্দটা কুরুচি, ইহা তখনও ঠিক জানা যায় নাই। কারণ, সে সকল কথা বইএ লেখা হয় নাই। সজ্জনে সে সকল কথা আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব।—প্যারী বাবু লিখিয়াছেন, মদখোর ও বেশ্যাবাজ। মদখোর কথাটা তখনও চলিত ছিল না, এখনও নাই। গাঁজাখোর, গুলিখোর, সুদখোর, ঘুস্‌খোর চলিত, কিন্তু মদখোর চলিত নহে। বেশ্যাবাজ চলিত নহে। যে শব্দটা চলিত, সেটা বড় শ্রুতিকটু—বেশ্যাসক্ত বলে বটে, কিন্তু পাণ্ডিত মহলে। লম্পট শব্দটা এই অর্থে অনেক সময় ব্যবহার হয়।

অধিক দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা আর সময় নষ্ট করিব না। অলঙ্কারে যাহাকে দোষ বলে, পদাংশ-দোষ, পদদোষ, শব্দদোষ, অর্থদোষ, বাক্যদোষ—প্যারীচাঁদবাবুর বইয়ে সবই আছে। তিনি নূতন ভাষায় লিখ্‌চেন—হইবারই কথা। কিন্তু তাঁহার বর্ণনার শক্তি অতি অদ্ভুত। পড়িবার সময় মনে হয়, জিনিষটা চোখে দেখিতেছি। ছবিখানি যেন চোখের উপর ভাসছে। বইগুলি যেন একখানি এলবাম্—তাতে কত কত পুরাণ ছবি রয়েছে। "আলালের ঘরের দুলালে" ব্ল্যাকিয়ার সাহেবের চেহারা, ব্ল্যাকিয়ার সাহেবের আদালত, সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যাণ্ডজুরী, পেটীজুরী প্রভৃতির ছবিগুলি যেন পর পর সাজান আছে। রচনা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। শব্দ অনেক জায়গায়ই সেকেলে, পুরাণ ও একটু কটমট হইলেও ভাব ঠিক আছে। প্যারীবাবুর রচনার একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইংরাজীতে যাহাকে হিউমার (Humour) বলে, তাহাতে উহা পরিপূর্ণ। সোজা কথাও প্যারীবাবু একটু বাঁকাইয়া বলেন। এই বাঁকাইয়া বলার নাম বক্রোক্তি। অনেক অনেক আলঙ্কারিকেরা বক্রোক্তিকেই কাব্যের জীবন বলিয়াছেন। ইংরাজেরাও এখন হিউমার বড় ভালবাসেন। প্যারীবাবু ইংরাজের শিষ্য। সুতরাং তিনিও বক্রোক্তি বা হিউমারের ভক্ত। কিন্তু বই লিখিতে গেলে, বিশেষ উপদেশ দিতে গেলে সব জায়গায় বক্রোক্তি চলে না। তখন সোজাভাষায় সোজা কথা বলিতে হয়। সেই সব জায়গায় প্যারীবাবু যেন মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন এবং মধ্যে মধ্যে বক্তৃতার ছটা বাহির করেন। তিনি যে সকল মনুষ্যের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, সেগুলি বেশ টিকল হইয়াছে। তাঁহার ঠক্‌চাচা, বাহুল্য, বাবুরামবাবু, বেণীবাবু, বেচারামবাবু, বরদাবাবু, মতিলালবাবু, বাঞ্ছারামবাবু

মণিরামপুরের মাধববাবু, বটলার সাহেব, জান্ সাহেব, ভবশঙ্করবাবু, ঋচস্পতি মহাশয়, গোস্বামী মহাশয়, বক্রেশ্বরবাবু, অন্বেষণবাবু, পতিভাবিনী, ঠেঁকোবাবু, বাকুলাহেব, লালবুঝকড়, হরদেব তর্কালঙ্কার, আধ্যাত্মিকা, ভজহরিবাবু ও চম্পকলতা—সবগুলিই অতি মনোহর হয়েছে।

প্যারীবাবু শুধু গল্প লিখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, চাষ ও বাগান করার কথা অনেক আছে। স্ত্রীলোকদিগকে উপদেশ দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার মাসিক পত্রখানিও স্ত্রীলোকদিগের জন্যই বাহির হইয়াছিল। তাঁহার মার্ম্মরঞ্জিকা ও বামাতোষিণীও সেই উদ্দেশ্যেই লেখা। প্রথম প্রথম তিনি যেন সাহেবীয়ানার দিকেই বেশী চলিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার মাসিক পত্রিকার প্রথম রচনার নাম "শ্রাদ্ধে কোনও ফল নাই"। ক্রমে যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তিনি হিঁদুয়ানীর দিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার "অভেদী," তাঁহার "আধ্যাত্মিকা" উচ্চ অঙ্গের হিঁদুয়ানী শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু তিনি হিন্দুয়ানী সংস্কার করিয়া লইতে চাহিতেন।

তিনি ভণ্ডামীর বড় বিরোধী ছিলেন। "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" বইখানি ভণ্ড তপস্বীদের ভণ্ডামী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। প্যারীবাবুর কোনও ধর্ম্মেই দ্বেষ ছিল না। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, নূতন ব্রাহ্মসমাজ, মুসলমানসমাজ, ক্রীষ্টানসমাজ—সকল সমাজের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেষটা তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতিই আস্থা হইয়াছিল। যোগ ও স্পিরিচুয়ালিজমের উপর তাঁহার খুব ঝোঁক হইয়াছিল। সাহেবরাই তাঁহার বাল্যকালের গুরু, সাহেবদের উপর তাঁহার ভক্তিও অগাধ। তাঁহার আধ্যাত্মিকাতেও এক বিবিসাহেব আসিয়া উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার বইগুলি বাঙ্গালায় লেখা হইলেও তিনি ইংরাজীতেই প্রায় ভূমিকা লিখিতেন। এ সব হইলেও তিনি কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। বাঙ্গালার মেয়ে ও পুরুষ যাতে ভাল হয়, তিনি তার চেষ্টা করিতেন। ইতর জন্তুর প্রতিও তাঁহার দয়া কম ছিল না। পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য কোলস্ওয়ার্দ্দি গ্র্যাণ্ট সাহেব যখন কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন; প্যারীবাবুই তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইলেন। তিনি যখন বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর, সেই সময়ে তাঁহারই উদ্‌যোগে পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণের আইন প্রথম পাশ হয়।

প্যারীচাঁদবাবুর ন্যায় লোকের একখানি ভাল জীবনচরিত হওয়া উচিত। মালমসলা যথেষ্ট সংগ্রহ আছে। একজন সুলেখকের এই কার্য্যের ভার লওয়া উচিত।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পুরুলিয়ার পাখী

পুরুলিয়াতে লোকে পাখীর খোঁজে আসে না, ভাঙ্গা স্বাস্থ্য জোড়া দিবার জন্তই আসে; অবশ্য যাঁহারা কার্য্যব্যপদেশে এখানে থাকিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। মানভূম জেলার অধিবাসী-দিগের কথাও স্বতন্ত্র। আগন্তক বাঙ্গালী যদি আমাদের মত শীতের প্রারম্ভে অবসরকালে চিত্ত-বিনোদনের জন্ত নিজের স্বাস্থ্যের বা অস্বাস্থ্যের কথা ভুলিয়া গিয়া, কিছুক্ষণ আযোধ্যার পাহাড়ে, কাঁসাই নদী-তীরে, রাণীবাঁধে অথবা সাহেববাঁধের বুকের উপরে কুঞ্জবনে পাখীর বিচিত্র জীবনলীলা দেখিয়া আনন্দ পান, তাহা হইলে সেই আনন্দ তাঁহার ভাঙ্গা স্বাস্থ্য জোড়া দিবার পক্ষে কতকটা অনুকূল হইতে পারে। লালসার বশবর্ত্তী হইয়া ব্যাধ বা শিকারীর চক্ষে এই সমস্ত বন্ত বিহঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি না, পাখীকে আমাদের ভোজ্য সামগ্রীতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলে আর যে ফল পাওয়াই যাক, অনাবিল আনন্দরসটুকু পাওয়া যাইবে না।

মানভূম জেলার প্রায় মাঝখানে এই পুরুলিয়া নগর; ইহার বুকের উপর দিয়া বড় বড় রাজপথ বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত; কোনওটা রাঁচি পর্য্যন্ত পশ্চিমাভিমুখে সংসর্পিত, কোনওটা দক্ষিণে পার্ব্বত্য ভূমির ভিতর দিয়া চৈবাসার দিকে চলিয়া গিয়াছে; একটা প্রশস্ত রাজপথ উত্তরে বরাকরাভিমুখে প্রসারিত; কোনওটা বাঁকুড়ার দিকে, কোনওটা মানবাজার অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। প্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে বড় বড় অশ্বত্থ, শাল, পলাশ, কুসুম, মহুয়া, জাম, আম, তেঁতুল প্রভৃতি গাছের শ্রেণী। দক্ষিণে দূরে বাঘমণ্ডী গিরিশ্রেণী পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রান্তর অত্যন্ত বন্ধুর; মাঝে মাঝে শুষ্কগর্ভ নদীর মত নাতিগভীর দীর্ঘবিসর্পিত 'খাত'; সহরের মধ্যে ও চারিধারে ছোটবড় অনেক-গুলি "বাঁধ",—সাহেব বাঁধ, নাজির বাঁধ, তুলসি বাঁধ, বুড়িবাঁধ, ভাটবাঁধ, আরও কত কি বাঁধ-নামধেয় ছোট বড় জলাশয়। সহরের দক্ষিণে ক্ষীণতোয়া কাঁসাই নদী; আরও দক্ষিণে বাঘমণ্ডী পাহাড় হইতে নিঃসৃত হইয়া মানভূম জেলার দক্ষিণ সীমান্তরেখায় প্রবহমানা সুবর্ণরেখা; দূরে উত্তরে দামোদর; আরও উত্তরে মানভূমের প্রান্তসীমায় বরাকর নদী প্রবহমানা। ভূতত্ত্ববিৎ এখানকার মাটির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে হয় ত যুগযুগান্তরবিন্যস্ত যে সকল পাথরের কথা তুলিবেন, মানভূম জেলার মৃত্তিকা এবং মৃদ্‌ভেদী পাষাণ ও খনিজপদার্থসংশ্লিষ্ট বিবিধ ভূস্তর-প্রসঙ্গের অবতারণা করিবেন, তাহা পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরও আলোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে, এ কথা বোধ হয়, কেহ কেহ একেবারে স্বীকার করিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিবেন; কিন্তু পাষাণের সঙ্গে পাখীর সম্পর্ক যে নিগূঢ় নৈসর্গিক সূত্রে গ্রথিত, একটু প্রণিধান করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভূস্তরবৈশিষ্ট্য বিশেষ বিশেষ লতাগুল্ম বৃক্ষাদির উদ্ভবের পক্ষে অনুকূল; ঐ সকল লতা গুল্ম বৃক্ষ আবার বিশেষ বিশেষ বিহঙ্গের স্বভাবতঃ প্রিয় আশ্রয়স্থল। কাঁসাই-দামোদর-বরাকরধৌত মানভূমের বুকের উপরে, বাঘমণ্ডী-পঞ্চকোট ঝালদে-গিরিশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; নগরের ভিতরে ও বাহিরে অসংখ্য ছোট বড় বাঁধ; সর্ব্বত্র বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও মাঠের উপর অসংখ্য ছোট ছোট ঘন ঝোঁপ; কোথাও ঘন মহুয়া-কেঁদ-

কুসুম-পিয়াল-শিমুল-শিরীষ-হরিতকী-অর্জ্জুন-করঞ্জ-আমলকি-পলাশ-লিপ্সি-নিমের নিবিড় কানন প্রান্তরভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। মানভূমের আদিম অধিবাসী যেমন একান্ত মানভূমেরই সামগ্রী, তেমনই তাহার ভূস্তরের উপরে এই সকল বাঁধের ধারে, নদীতীরে, বৃক্ষশ্রেণীর উপরে, ঝোপে ঝাপে; কাননাভ্যন্তরে যে সকল পাখী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মানভূমী আখ্যায় পরিচয় লাভ করিবার সময় মনে হয় যে, এই সকল কাওয়া-ঢেব্‌চু-হোড়াল-পাড়কি-ক্যারক্যাটা-সাম্‌কাহাল-রূপো-কাঁড়োর-বনকুঁকড়ির পক্ষে এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনই বিশেষ ভাবে অনুকূল; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত মানভূমেই থাকিবে, পার্শ্ববর্ত্তী সিংভূমে বা ছোটনাগপুরে থাকিতে চাহে না। অনুসন্ধিৎসু, বৃক্ষাদির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এই পক্ষিসংস্থানের ভিতরের কথা কতকটা বুঝিতে পারিবেন। ভূবিদ্যার সহিত উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের ও বিহঙ্গ-বিদ্যার এতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই স্থানবিশেষে প্রাণিবিশেষের পর্য্যালোচনা করিতে বসিয়া এই সকল কথার অবতারণা বিজ্ঞান হিসাবে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নহে; যিনি যে কোনও জেলার যে কোনও জীবের বিষয় বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন; এই জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে আমরা বহুল পরিমাণে ঋণী। পাখীর কথাই ধরা যাক্। মানভূমে যে সকল পাখী দেখা যায়, তাহাদের চলাফেরা, উড়াবসা কোনও নিয়মে শৃঙ্খলিত কি না; কোনও কোনও পাখী দিবাভাগে কোনও বিশেষ দিক্ হইতে উড়িয়া আসিয়া প্রত্যহ দিগন্তরে চলিয়া যায় কি না; এই নদী, বাঁধ, গাছ পাথর পরিবেষ্টনীর মধ্যে কোনও বিশিষ্ট পক্ষিজাতির অবস্থান তাহার জীবন-সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল কি না এবং সিংভূম ছোটনাগপুরে ভূস্তরের পার্থক্য বশতঃ তাহাদের জীবনযাপনের উপযোগী বৃক্ষাদি বা জলাশয়ের অভাব আছে কি না, এই সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া পক্ষিবিশেষজ্ঞ করিয়া থাকেন। এ কার্য্যে ব্রতী হইলে কোনও পাখীকেই বাদ দেওয়া চলিবে না। এমন অনেক পাখী আছে, যাহারা অন্যত্র অন্য আবেষ্টনের মধ্যে জীবন যাপন করে; কিন্তু তাই বলিয়া যদি মানভূমে তাহাদের কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহা বিজ্ঞান হিসাবে উপেক্ষণীয় নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত অন্ততঃ তাঁহার Distribution কোঠায় দৃষ্ট বিহঙ্গকে আবদ্ধ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন; উপরন্তু যদি তিনি লক্ষ্য করেন যে, যে পাখীকে অন্যত্র তিনি যাযাবর দেখিয়াছিলেন, এখানে সে স্থায়ী অধিবাসী, তাঁহার এই নূতন আবিষ্কৃত তথ্য তাঁহাকে যে আনন্দ দান করিবে, তাহার কথা না তুলিলেও ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, তিনি পক্ষিবিজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন।

মানভূম জেলার ভৌগোলিক অধিষ্ঠান মানচিত্রের ২২°৪৩' ও ২৩°৫' উত্তর লম্বিমান্তর বা latitudeএর মধ্যে এবং ৮৫°৪৯' ও ৮৬°৫৪' পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর বা longitudeএর মধ্যে। এই সামান্য ভৌগোলিক বৃত্তান্তটি পক্ষিতত্ত্ব হিসাবে নিতান্ত তুচ্ছ নহে। ঋতুবিশেষে এই লম্বিমান্তর ও দ্রাঘিমান্তরের মধ্যে কোন্ কোন্ পাখী আনাগোনা করে, তাহাই প্রথমে অনুসন্ধানের এবং লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই জেলার মধ্যে সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, দামোদর, বরাকর প্রভৃতি বড় বড় নদীর গতিরেখা, ছোট ছোট হ্রদ এবং ছোট বড় পাহাড়, জলাভূমি, বন জঙ্গল, এই সমস্তই পক্ষি-

তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর বিষয়ীভূত। তা ছাড়া ইহার চারি পার্শ্বে, এই লঘিমান্তর দ্রাঘিমান্তরের বাহিরে উত্তরে সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ, দক্ষিণে সিংভূম, পূর্ব্বে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং পশ্চিমে রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলাগুলিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলিবে না। মানভূম জেলার পাখীর আনাগোনা আলোচনা করিতে বসিলে আশপাশের জেলাগুলি মানভূমের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই মানভূম জেলার মাঝখানে পুরুলিয়া ২৩°২০′ উত্তর লঘিমান্তরের ও ৮৬°২২′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তরের মধ্যে অবস্থিত। কাজেই পুরুলিয়ার পাখীগুলির সহিত মানভূমের অন্তর্গত আশপাশের চারিদিকে গ্রাম নদী পাহাড় জঙ্গলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সুতরাং বিস্মিত হইলে চলিবে না, যদি মানভূম জেলার কাছাকাছি বাঙ্গালার অথবা ছোটনাগপুরের কোনও পাখীকে মানভূমের মধ্যে, তথা পুরুলিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার পাখী বলিলে কেহ যেন মনে না করেন যে, পাখীটি কেবল পুরুলিয়াতেই দেখিতে পাওয়া যায়, মানভূমের অন্যত্র বা বাহিরে পাওয়া যায় না।

বায়স,
Corvus splendens

পাখীর তালিকায় প্রথমেই বায়সের নাম করিতে হয়। কাক ঘরে বাহিরে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অসতর্ক গৃহস্থের সযত্নরক্ষিত আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি এবং নিঃশঙ্ক চৌর্য্যবৃত্তি সকলকে কিছু সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। ডুমরাকুড়ির মত অতি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। কিন্তু সেখানে কাকের অনুপাতে দাঁড়কাক বেশী বলিয়া বোধ হইল। তবে কাকের মত তাহাকে নির্ভীক বলিয়া মনে হইল না। লোকালয়ের কাছে আবর্জনার প্রতি তাহার লোভ বেশী।

C. macrorhynchus,
দাঁড়কাক

সালিক,
Acridotheres tristis

আশ্বিনের মাঝামাঝি দেখা গেল যে, সালিকের গৃহস্থালী এবারকার মত শেষ হইয়া গিয়াছে, যদিও অনেক স্থলে শাবকগণ এখনও তাহাদের জনক জননীর সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই; মাঠের উপরে খাদ্যের জন্য তাহাদের জননীর অনুসরণ করিতেছে। ধাড়িগুলার পুরাতন পালক খসিয়া গিয়া এখনও নূতন পালক গজায় নাই; বুড়া সালিকের ঘাড়ে রোঁ চাক্ষুষ দেখা গেল, তবে এই রোঁ ঠিক রোম বা লোম নহে, মাথার ও ঘাড়ের অনাবৃত ত্বকে যে কালো কালো খোঁচার মত দেখা যায়, উহা নবীন পত্রোদগমের পূর্ব্বাভাস। বটফল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী এ সময়ে প্রচুর; ইহারাও সংখ্যায় খুব বেশী। স্নিগ্ধ প্রভাতে ও প্রখর মধ্যাহ্নে নানা জাতি-পরিজন-পরিবৃত হইয়া কল-কোলাহলে রাজপথ ও সাহেববাঁধ মুখরিত করিয়া তোলে। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি দেখিতেছি, বুড়া সালিকের ঘাড়ে মন পত্রোদগম হইয়াছে, মাথার রং বেশ কাল দাঁড়াইয়াছে; পুচ্ছ এখনও সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই, পুচ্ছের পালক এখনও ছোট বড়, পুচ্ছপ্রান্তে কোথাও কোথাও শ্বেতবর্ণ প্রকট।

গো-সালিক,
Sturnopastor contra

গো-সালিকের বাসা আশ্বিন মাসে অনেক গাছে দেখিতে পাওয়া গেল; সে সকল বাসা কিন্তু তখন পরিত্যক্ত। শাবকগুলির পালক বাহির হইয়াছে; তাহারা খুঁজিয়া খাইতে শিখিয়াছে; ভোজ্য কীটের অন্বেষণে গোময়পুরীষাদি ঘাঁটিতেছে। ইহাদের দেহের বর্ণ দেখিলেই ইহাদিগকে সহজে গো-

সালিকের শাবক বলিয়া চিনিতে পারা যাইতেছে,—রংটা মোটের উপর মেটে মেটে, অর্থাৎ ধাড়িগুলার মত সাদা রংটা পরিষ্কার সাদা নহে, কালোটাও খুব উজ্জ্বল নহে; ঠোঁট লাল্‌চে না হইয়া ঈষৎ কৃষ্ণাভ; আয়তনে ছোট। প্রধানতঃ কীটভুক্ হইলেও ফলভারাবনত অশ্বত্থ-বট-শাখায় দল বাঁধিয়া অন্যান্য জ্ঞাতি পরিজনের সহিত ফল ভক্ষণ করিতে ইহাদিগকে দেখা যাইতেছে। সংখ্যায় ইহারা এত বেশী যে, অতি প্রত্যূষেও ইহাদিগকে দলে দলে গাছের উপরে, মাঠে, সাহেব-বাঁধে বিচরণ করিতে দেখা যায়। এখানে বাঁধের সংখ্যা যেমন বেশী, তেমনই সেই সকল বাঁধের কাছাকাছি এই পাখীর সংখ্যাও খুব বেশী; তাহা ছাড়া অনেক নীচু জমি এখন জলাশয়ে পরিণত, সেগুলায় জলচর পাখী যেমন মাঝে মাঝে দেখা যায়, তার চেয়েও বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আশে পাশে বিচরণশীল গো-সালিক। অনেকে একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকাই ইহাদের স্বভাব; এত অধিক গো-সালিকের ঝাঁক পশ্চিম-বাঙ্গালায় এ সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যায় প্রাক্‌কালে ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া গিয়া যেখানে রাত্রি যাপন করে, সেই নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের শাখায় অবতরণ করে। মধ্যাহ্নে বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝখান হইতে সহসা এক ঝাঁক গো-সালিক শূন্যে উড়িয়া কিয়দ্দূরে নামিয়া পড়ে, এরূপ দৃশ্য পথিকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঝাল্‌দের ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিন্তু ইহাকে দেখিতে পাইলাম না।

পাউই সালিকেরই জ্ঞাতি, Sturnidæ পরিবারভুক্ত। ইহাদের মাথা ও ঘাড়ের রং সাদাটে, বুক ও পেট লাল্‌চে; পিঠের রং ধূসর। ইহারাও দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদিগের উড্ডীন গতির বেগ অপেক্ষাকৃত অধিক। কীটভুক্ হইলেও ইহারা বন্য ফল খাইতে বড় ভালবাসে; তাই ইহারা বড় বড় বট অশ্বত্থ বৃক্ষের পত্রান্তরালে অন্যান্য সালিকের সহিত অধিকক্ষণ যাপন করে। লোকালয়ে আসিতে ইহারা সঙ্কোচ বোধ করে; সেই জন্য ইহাদের অপরাপর জ্ঞাতিবর্গের ন্যায় ইহাদিগকে সর্ব্বত্র মাঠে ঘাটে সব সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পাউই, Sturnia malabarica

পুরুলিয়ায় কৃষ্ণশির পাউইকে অতি অল্পই দেখা যায়। লোকালয়ের মধ্যে, বাড়ীর প্রাঙ্গণে, বাগানের ঘাসের উপরে এই পাখীকে মাত্র দুই এক বার দেখিতে পাইলাম।

Temenuchus pagodarum

গোলাপি সালিক ও গাংসালিক আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কোথাও আমাদের চোখে পড়িল না, অথচ ঋতুবিশেষে গোলাপি পাখীটাকে সাহেববাঁধের দ্বীপে বহুল সংখ্যায় দেখা যায়; আর গাংসালিক বোধ করি এখানকার পাখী নহে।

Pastor roseus; A. ginginianus

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যে কয়টা বুলবুল দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে তাহাদের কোনওটাকেই দেখা গেল না। যে কালো বুলবুল পুরুলিয়ার পথের পার্শ্বে বাগানে ঝোঁপের ধারে বিচরণ করিতেছে, তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই একটা বর্ণবৈষম্য ও দেহায়তনের তারতম্য ধরা পড়ে।

কালো বুলবুল, Molpastes hæmorrhous

কালো রংটা মাথার উপর দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত না হইয়া স্কন্ধদেশেই থামিয়া গিয়াছে; মোটের উপর পাখীটি তাহার বঙ্গীয় জাতির (M. bengalensis) চেয়ে কিছু কম কালো, আয়তনেও সে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

কাংড়া বুলবুলের (Otocompsa emeria) কথা মানভূমের প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে কেহ কেহ [illegible] করিয়াছেন, কিন্তু নগরে বা নগরোপান্তে অথবা ঝালদের পার্ব্বত্য প্রদেশে একটি কাংড়াও আমার নয়নগোচর হইল না। বুলবুল যাযাবর নহে; স্থায়িভাবে স্থানবিশেষে ভারতবর্ষে অবস্থান করে। মানভূমের অধিবাসী হইলে তাহাকে নিশ্চিতই দেখিতে পাইবার কথা।

বাঙ্গালার পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে জরদ্ বুলবুল (Otocompsa flaviventris) আমাদের চোখে পড়ে, মানভূমের পাহাড়তলী জায়গায় তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া গেল না; যদিচ একজন মাত্র বিদেশীয় পক্ষিতত্ত্বজ্ঞের রচিত তালিকায় সে ঢোলভূমের পক্ষিগণভুক্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশে প্রধানতঃ দুই প্রকার হলদে পাখী আমাদের নিকটে পরিচিত,—(১) কৃষ্ণগোকুল (Oriolus melanocephalus), ইহার মাথা, ঘাড় ও গলা কৃষ্ণবর্ণ; (২) কাজলগৌরী (Oriolus indicus), ইহার মাথার পিছনে অর্দ্ধবৃত্তাকার কৃষ্ণরেখা। প্রথমটি বাঙ্গালার স্থায়ী অধিবাসী; দ্বিতীয়টি কিন্তু যাযাবর। শীত ঋতুতে তাহাকে কলিকাতার কাছাকাছি পল্লীমধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। মানভূমে এই দুটিকে ত দেখিতে পাওয়া গেল; তাহা ছাড়া আর একটি হলদে পাখী দৃষ্ট হইল, উহার চোখের কোণে কালো রেখা, কিন্তু মাথাটা সম্পূর্ণ হলদে। এই শেষোক্ত পক্ষীর বৈজ্ঞানিক অভিধা Oriolus kundoo; সংখ্যায় ইহারা অপেক্ষাকৃত অধিক; সমস্ত দিন বৃক্ষের পত্রান্তরালে ইহাদের কল কূজন শ্রুত হয়; কণ্ঠস্বর যখন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে, তখন লক্ষ্য করা যায় যে, পুংপক্ষীটা হয় ত স্ত্রীপক্ষীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, অথবা নিকটবর্ত্তী কোনও শাখায় বসিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতেছে।

হলদে পাখী

পুরুলিয়ায় কৃষ্ণগোকুলের সংখ্যা কম বলিয়া মনে হইল, যদিচ ছোটনাগপুর অঞ্চলে তাহার প্রাচুর্য্যের কথা কোনও কোনও বিদেশীয় পক্ষিবিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাজল-গৌরী পুরুলিয়ায় নেহাৎ কম নহে; অথচ একজন ইংরাজ মানভূমের কোথাও ইহার দেখা পান নাই, রাজমহল পাহাড়ে দুই একটা দেখিয়াছেন মাত্র। এমন কি, তদানীন্তন ছোটনাগপুরের কোথাও ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মানভূম তখন ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ছিল।

মানভূম অঞ্চলে মাছরাঙার চালচলনে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই, ঠিক বঙ্গদেশের মত জলাশয়ের ধারে ভক্ষ্য জীবের অপেক্ষায় গাছের উপর বসিয়া থাকিতে অথবা মৎস্য ধরিবার চেষ্টায় জলে ঝাঁপ দিতে দেখা যায়; কখনও বা ভূমির উপরে সঞ্চরমান কৃমিকীট দেখিয়া হয় ত সে গাছ হইতে সহসা অবতরণ করে, অথবা কণ্ঠস্বরে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া বন্ধুর প্রান্তরের উপর দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

মাছরাঙা, Halcyon smyrnensis

'সাহেববাঁধ' এবং অন্যান্য জলাশয়ের ধারে মাছরাঙার একটা ক্ষুদ্রকায় জাতিকে মৎস্য শিকার করিতে দেখা যায়। বড় মাছরাঙার মত কৃমিকীট ভক্ষণ করা ইহার অভ্যাস নহে, কেবলমাত্র মৎস্যই ইহার ভক্ষ্য; এই জন্যই বোধ করি, ইহাকে বাঁধের ধারে ভূমির উপর অথবা অনতিউচ্চ গাছের ডাল হইতে অব্যর্থ সন্ধানে জলমধ্যে ছোট ছোট মাছ ধরিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়।

মাছরাঙা, ছোট
Alcedo ispida

বড় মাছরাঙার মৎস্যশিকার চেষ্টা হাস্যকর; গাছের উচ্চ ডাল হইতে সবেগে বার বার জলমধ্যে পতিত হইয়াও সে প্রায় একটিও মাছ চঞ্চুপুটে ধরিতে সমর্থ হয় না; তাহার এই ছোট জাতিটি কিন্তু প্রতিবারই কিছু না কিছু ধরিয়া আনে। কৃমিভুক্ না হইলে বড়টির জীবন ধারণ করা কঠিন হইত; আর এমন অব্যর্থ সন্ধান না থাকিলে ছোটটিও জীবন-সমরে পরাজিত হইত। বর্ণে ও কণ্ঠস্বরে উভয়েই আমাদিগকে আকৃষ্ট করে, তবে ছোটটির কণ্ঠস্বর বড়টির মত তীব্র নহে। এই ছোট মাছরাঙার একটি অত্যন্ত নিকট জাতিকে মানভূমের জঙ্গলে জলাশয়ের ধারে কখনও কখনও মৎস্য শিকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। এই দুটির মধ্যে আকৃতি ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য বড় বেশী নাই।

Alcedo beavani

ক্রমশঃ

শ্রীসত্যচরণ লাহা

কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী *

সৈয়দ আলাওল প্রাচীন বাঙ্গালা মুসলমান-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলিলে যথেষ্ট হইবে না। বাস্তবিক তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্যে হিন্দু-কবিদের সহিত তুলনায়ও একজন উচ্চপদস্থ কবি ছিলেন বলিতে হইবে। তাঁহার স্থান ভারতচন্দ্র অপেক্ষা কিছুতেই হীন নহে। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু তাঁহাকে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সুপরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার পদ্মাবতী-সাদরে চট্টগ্রামে আজও পঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার একমাত্র বাজার-সংস্করণ এত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ যে, তাহা হইতে বহু স্থানে পুস্তকের অর্থবোধ করা যায় না। পণ্ডিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেব অনেক প্রাচীন হিন্দু কবির কাব্যের উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের এবং ক্ষোভের বিষয় যে, তিনি তাঁহার স্বদেশীয় ও স্বধর্ম্মী এই কবির প্রতি আজও বিমুখ রহিয়াছেন।

বাজার-সংস্করণে পদ্মাবতীর কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার কয়েকটী নমুনা দিতেছি। প্রথম পৃষ্ঠায়ই দেখিতেছি,—

প্রথমে প্রনাম করি এক করতার।
জেই প্রভু জিবদানে স্থাপিল সংসার *
করিল পর্ব্বত আদি যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকটিল সেই কবিলাস *

দীনেশবাবু বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে (১৩১৭ পৃষ্ঠা হইতে ১৩২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) আলাওলের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে আছে,—

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার ‖
করিল পর্ব্বত আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকটিল সেই কবি-লাস ‖

উদ্ধৃত অংশে দীনেশবাবু বাজারের পুথির কেবল বানান সংশোধন করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। "পর্ব্বত আদি জ্যোতির" কোন অর্থ হয় না। পাদটীকায় কবি-লাস শব্দের অর্থে তিনি বলিতেছেন, —"কবির লাস অর্থাৎ আদিকবির (ব্রহ্মার) ইচ্ছা।" এই অর্থ সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বাজার-সংস্করণ হিন্দী পদ্মাবতীতে আছে,—

কীন্হেসি প্রথম জ্যোতি পরকাশূ।
কীন্হেসি তিনহি প্রীতি কৈলাশূ ‖ †

---

* ১৩৩১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত

† Asiatic Society of Bengal এর সংস্করণ পদুমাবতির পাঠ,—

কীন্হেসি প্রথম জোতি পরগাসু।
কীন্হেসি তেহি পরবত কবিলাসু।

অর্থাৎ তিনি প্রথম জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। (পরে) তাঁহার প্রীতিতে কৈলাশ করিলেন। এখানে কৈলাশ শব্দের অর্থ স্বর্গলোক। এখানে দরবেশ মলিক মুহম্মদ জায়সী ইস্‌লাম শাস্ত্র অনুযায়ী সৃষ্টি বর্ণনা করিতেছেন। এই মতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম আদি জ্যোতিঃ (নূরে মুহম্মদী) সৃষ্টি করেন। পরে তাঁহার প্রীতির জন্য বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেন। অন্য স্থানে হযরতের গুণ বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন,—

কীন্হেসি পুরুখ এক নিরমরা
নাউঁ মুহম্মদ পুনিউঁ করা॥
প্রথম জোতি বিধি তেহি কই সাজী।
অউ তেহি প্রীতি সিসিটি উপরাজী॥

A. S. B. সংস্করণ, ১৪ পৃঃ।

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া মনে হয়, বিশুদ্ধ পাঠ নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

করিল প্রথমে আদি-জ্যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকটিল যেই কবিলাশ॥

ইহার অর্থে বলা হইয়াছে—জিস নে পহিলে জ্যোতিস্বরূপ (মহাদেব)কো প্রকাশ কিয়া ঔর তিসকে লিয়ে কৈলাস পর্ব্বতকো কিয়া। (মসলমানোঁ মেঁ কহাবত হৈ কি হিংদুওঁ কা মহাদেব হমারে লোগোঁকা আদম হৈ)॥ এখানে কবিলাস = কৈলাশকে মহাদেবের কৈলাশ মনে করায় ভ্রম হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু স্থানে কবিলাস স্বর্গ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ; যথা,—

সাত সহস হসতী সিংঘলী।
জনু কবিলাস ইরাবতী বলী॥ A. S. B. সংস্করণ, ৩৯ পৃঃ।

অর্থাৎ সিংহল দেশে সাত সহস্র হস্তী, যেন স্বর্গে (=কবিলাস) বলী ঐরাবত।

উঁচী পৱঁরী উঁচ অবাসা।
জনু কবিলাস ইন্দর কর বাসা॥ ঐ সংস্করণ, ৫৫ পৃঃ।

অর্থাৎ উঁচু দেউড়ী, উঁচু আবাস, যেন ইন্দ্রের বাসস্থান স্বর্গ (=কবিলাস)।

কংচন বিরিখ এক তেহি পাসা।
জস কলপতরু ইঁদর কবিলাসা॥ ঐ সংস্করণ, ৬৬ পৃঃ।

অর্থাৎ তার পাশে এক কাঞ্চন বৃক্ষ, যেমন ইন্দ্রের স্বর্গে (=কবিলাস) কল্পতরু।

বরনউঁ রাজ মঁদির রনিবাসূ।
অছরিন ভরা জানু কবিলাসূ॥ ঐ সংস্করণ, ৭৫ পৃঃ।

অর্থাৎ রাজমন্দির রাণী-নিবাস বর্ণন করি। যেগুলি যেন অপ্সরা-ভরা স্বর্গ (=কবিলাস)। ইত্যাদি বহু স্থানে। A. S. B. সংস্করণের অবলম্বিত দুইখানি পুথিতে 'পরবত' স্থানে 'প্রীতি' আছে। তাহাই শুদ্ধ পাঠ। প্রথম জ্যোতি হযরত মুহম্মদ, মহাদেব নহেন। মহাদেব যে আদম, এ কথা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত নাই। আমি যে অর্থ দিয়াছি, তাহা গ্রন্থকারের অন্য শ্লোক দ্বারা সমর্থিত।—লেখক।

পুথির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে,—

কাকে কল্য নির্ব্বলি কাহাকে বলি আর ॥
হাড় হন্তে নিম্মিয়া করায় পুনি হাড় *

দীনেশ বাবুর সংশোধিত পাঠ,—

কাকে কল্য নির্ব্বলী কাহাকে বলী আর।
হাড় হন্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি হাড় ॥

তিনি পাদটীকায় লিখিতেছেন,—অস্থি হইতে নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় অস্থিতে পরিণত করেন। এখানে অর্থের সঙ্গতি হইতেছে না। হিন্দী পুস্তকে আছে,—

কীন্হেসি কোই নিভরোসী, কীন্হেসি কোই বরিআর।
ছারহি তই সব কীন্হেসি, পুনি কীন্হেসি সব ছার ॥

—A. S. B. সংস্করণ, ৫ পৃঃ।

অর্থাৎ কাহাকে দুর্ব্বল (নিভরোসী) করিলেন, কাহাকে বলবান্ করিলেন। ধূলি (ছার) হইতে সব তিনি করেন, পুনরায় সকলকে তিনি ধূলি করেন। বিশুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে,—

কাকে কৈল নির্ব্বলী, কাহাকে বলী আর।
ছার হন্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি ছার ॥

পুথির চতুর্থ পৃষ্ঠায় আছে,—

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ ॥
কহিতে অপূর্ব্ব কথা না যায় বর্ণন *
সপ্ত মহি সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপাত মত ॥
সপ্ত সুন্ত ভরী যদি স্বজয় বেকত *
এ সপ্ত সাগর আদি জতো নদা নদী ॥
দিঘী পুস্কর্ণি কুপ অহি হয় যদি *
জতো বিধী নবগৃহ আর বৃক্ষ সাখা ॥
যত লোমা বলি আর জতো পক্ষি পাখা *
পৃথিবীর জতো রেনু স্বর্গে জতো তারা ॥
জিব বস্ত স্বাস আর বরীখের ধারা *
জোগে জোগে বসী জদী অন্তত লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহী হয় *

দীনেশবাবু ইহার কিছু অংশ (সম্ভবতঃ অবোধ্য বিবেচনায়) বর্জ্জন করিয়া নিম্নলিখিতরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।
কহিতে অকথ্য কথা না যায় বর্ণন॥
সপ্ত মহী সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপত্র যত।
সপ্ত শূন্য ভরি যদি সৃজয় জগত॥
যতবিধ নবগৃহ আর বৃক্ষ-শাখা।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী-পাখা॥
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব জন্তু শ্বাস আর বরিষার ধারা॥
যুগে যুগে বসি যদি স্তুতিএ লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয়॥

মূল হিন্দীতে আছে,—

অতি অপার করতাকর করনা।
বরনি ন পারই কাহু বরনা॥
সাত সরগ জউঁ কাগদ করঈ।
ধরতী সাত সমুদ মসি ভরঈ॥
জাবঁত জগত সাখ বন ঢাঁখা।
জাবঁত কেস রোবঁ পংখি পাখা॥
জাবঁত খেহ রেহ জহঁ তাহঁ।*
মেঘ বূঁদ অউ গগন তরাঈঁ॥
সব লিখনী কই লিখু সংসারূ।
লিখি ন জাই গতি সমুদ অপারূ॥ A. S. B. সংস্করণ, ১৩ পৃঃ।

অর্থাৎ কর্ত্তার কার্য্য অতি অপার। কে তাহা বর্ণন করিতে পারে? যদি সাত স্বর্গ কাগজ হয় (এবং) ধরিত্রীর সাত সমুদ্র মসী ভরা হয়, (আর) যত জগতের শাখা, বন জঙ্গল, যত কেশ, লোম, পক্ষি-পাখা, যত মাটি বালি, বৃষ্টি-বিন্দু আর গগনের তারা, সব লেখনী করিয়া সংসার লিখিতে থাকে, (তবুও) অপার সমুদ্রের ন্যায় (তাঁহার) গতি লিখা যায় না।

পুথির বিশুদ্ধ পাঠ সম্ভবতঃ এইরূপ ছিল,—

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।
কহিতে অপূর্ব্ব কথা না যায় বর্ণন॥
সপ্ত মহী সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপত্র যত।
সপ্তশূন্য ভরি যদি সৃজয় কাগজ॥

* বাজার সংস্করণে 'জহঁ তাহঁ' স্থানে 'ছুনরাঈ'। A. S. B. সংস্করণের কয়েকটী মূল পুথিতে 'ছুনিরাঈ' পাঠ আছে। তাহাই মূলের শুদ্ধ পাঠ বলিয়া মনে হয়।—লেখক।

এ সপ্ত সাগর আদি যত নদ নদী।
দীঘি পুষ্করিণী কূপ মসী হয় যদি ॥
যতবিধ বন গৃহ আর বৃক্ষ-শাখা।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী-পাখা ॥
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব জন্তু শ্বাস আর বরিষার ধারা ॥
যুগে যুগে বসি যদি অস্তুতি লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয় ॥

স্তুতি স্থানে হিন্দী অস্তুতি। এই বর্ণনা কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়ত দুইটীর প্রতিধ্বনি,—"এবং পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে, যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর তাহার মসী হয়, তাহার পরে (অন্য) সপ্ত সাগর হয়, তথাপি আল্লার কথা সমাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় আল্লাহ বিজেতা ও বিজ্ঞানময়।" (সূরাহ লুকমান)। "তুমি বল যে আমার প্রতিপালকের বচনাবলী (লিপির) জন্য যদি সাগর মসী হয়, এবং যদিচ আমরা তৎসদৃশ সাহায্য আনয়ন করি, আমার প্রতিপালকের বচনাবলী সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে অবশ্য সমুদ্র সমাপ্ত হইবে।" (সূরাহ কহফ)।

পুথির অষ্টম পৃষ্ঠায় আছে,—

ললাট উজ্জ্বল শশি পিউ সবরিসে হাঁসি,
কটাক্ষে মুহিত জবাকুল।

বিশুদ্ধ পাঠ হইবে,—

ললাট উজ্জ্বল শশী, পীযূষ বরিষে হাসি,
কটাক্ষে মোহিত যুবাকুল।

হায় রে! কোথায় যুবাকুল, আর কোথায় জবাকুল! পরবর্ত্তী সংস্কারক হয় ত জবাফুল করিয়া ফেলিবেন।

পুথির ১৯ পৃষ্ঠায় আছে,—

হিন্দুস্থানি ভাবে দীপ নাম এহি বলি ॥
জম্বো দিপ পক্ষ আর সক্রেশ শুস্থলি *
কুর্স দিপ এক্ষু দিপ সষ্টম কহিল ॥
পুস্পের দরিয়া দিপ সপ্তমে পুরিল *

এখানে কবি সপ্ত দ্বীপের বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের নামগুলি কি চমৎকার মৌলিক! বিশুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে,—

হিন্দুস্থানী ভাবে দ্বীপ-নাম এহি বলি।
জম্বুদ্বীপ প্লক্ষ আর শাক ও শাল্মলি ॥

কুশদ্বীপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ ষষ্টম কহিল।
পুষ্কর বলিয়া দ্বীপ সপ্তমে পুরিল ॥

অজ্ঞ লিপিকরের হাতে আজ সৈয়দ আলাওলের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! মূল হিন্দীর সহিত মিলাইয়া এবং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেক স্থলে বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করা যায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক স্থল এরূপ আছে, যেখানে প্রাচীন পুথি ব্যতীত প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব। দু-একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাজারের পুথির ১০ম পৃষ্ঠায় আছে,—

নানা দেসে নানা লোগ, সুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ;
আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল। আরবি মিসীর স্থামি,
তুরুকী হাবেসী রুমি, খোরাসানি উজেগ সকল *
লাহুরী মুলতানী সিন্ধি, কাসমিরী দক্ষিনী হিন্দী,
কামরোপি আর বঙ্গদেশি॥ **অহুপিহ**
খুতথ্থারি; **কাম্নাই** ময়লা বারি, **আছুন্দরী**
কর্ণাঠ **কবাসি** * বহু সেখ সৈএদজাদা,
মোগল পাঠান জুদ্ধা, রাজপুত্র হিন্দু নানাজাতি॥
অভাসি করমা স্তাম, ত্রিপুরা কুকির নাম,
কর্তেক কহিব ভাতি ২ * আরমানি অলওাজ,
ডিনমার ইংরাজ, **কান্টিমান** আর ফ্রান্সিস॥
কার্ম্মরিভ ফাসমানি, **চোলদার** নসরানী, নানা
জাতি আর **প্রুতংকেচ** *

এই উদ্ধৃত অংশের চিহ্নিত শব্দগুলির প্রকৃত পাঠ স্থির করা দুরূহ। পুথির ৯ পৃষ্ঠায় রোসাঙ্গ-রাজের নৌকার বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,—

নানাবর্ণ নৌকা সাজে, নাহি শম ক্ষেতি মাজে,
গল্লিয়া অগন ডিঙ্গা রঙ্গে॥ সমুপা নানান
ভাতি, মচুয়া গোরাপ পাতি, জালিয়া নায়রি
নানা রঙ্গে * কোসদা আহুতি ভাল, ফেরাঙ্গির
বজ্রসাল, সাতাইস দাবলা সিংসার। গুন্দর
খেলন রঙ্গি; পিক সব সরি ভঙ্গি, মৃগন্দর,
নানা বর্ণ আর *

এখানেও সব কথার অর্থবোধ হয় না। কিন্তু প্রাচীন বিশুদ্ধ পুথি ব্যতীত ভ্রান্ত পাঠ সংশোধনের উপায় কি? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় আলাওলের কোন হস্তলিখিত পুথি নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একখানি আধুনিক হস্তলিখিত পুথি আছে। কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ নহে। পণ্ডিত আবদুল করিম সাহেবের নিকট কয়েকখানি প্রাচীন পুথি আছে এবং তিনি

একটী আদর্শ সংস্করণ প্রস্তুত করিতে বহু দিন হইতে ইচ্ছুক আছেন জানি। কিন্তু তাঁহার কার্য্য-বাহুল্য। কয়েকখানি প্রাচীন বিশুদ্ধ পুথি পাইলে আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি। আশা করি, চট্টগ্রামের বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ বিশেষতঃ বন্ধুবর আবদুল করিম সাহেব এ বিষয়ে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কবে বাঙ্গালী মুসলমানের গৌরব এই কবিরত্নের কাব্যের উদ্ধার হইবে, তাহার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

"বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য *

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় বাঙ্গলা[1] ভাষায় অনুজ্ঞার রূপের যে উৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না।

সাধারণ অনুজ্ঞা (বা বর্ত্তমান কালের অনুজ্ঞা) মধ্যম পুরুষের রূপের যে উৎপত্তি নির্ণয় তিনি করিয়াছেন (যেমন 'চর্, চর'<'চর, চরহ' < 'চর, চরথ+চরত'), সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য নাই। প্রথম পুরুষের সম্বন্ধে খালি এইটুকু বলা আবশ্যক মনে করি যে, প্রথম পুরুষের বহুবচনে (=আধুনিক সম্ভ্রমসূচক প্রথম ও মধ্যম পুরুষে) যে 'উন্' প্রত্যয় বাঙ্গলায় আমরা পাই ('চরুন' ='চর্+উন'), তাহা মূলে আদি-আর্য্যভাষার (সংস্কৃতের) '-অন্ত' প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহার বিকাশ স্বাভাবিক ভাবে হয় নাই; সংস্কৃত 'ন্ত' বাঙ্গলায় হয় 'ত'-তে, নয় কেবল 'ন্ত'য়ে পরিণত হইয়া থাকে (যেমন 'দন্ত > দাঁত', 'ত্বরন্ত-> তুরিৎ', 'চলন্ত-> চলিত', 'গৃহ+অন্ত < ঘরত' [=ঘরে], 'অন্তরে > তরে' [৪র্থীতে], ইত্যাদি), 'ন'-য়ে নহে। 'চলন্তি > চলেন, চলন্তু > চলুন'—এখানে 'ন্ত'র 'ন'য়ে পরিণতি হইল কিরূপে? এই 'ন' হইতেছে বিশেষ্য পদের বহুবচন-দ্যোতক প্রত্যয়ের প্রভাবে; সংস্কৃতের ষষ্ঠীর বহুবচনে যে '-আনাম্' প্রত্যয় পাওয়া যায়, প্রাকৃতে তাহা '-আনং, -আন, -আণং, -আণ, -ন, -ণ' রূপে মেলে; এবং এই '-ন, -ণ' আধুনিক আর্য্যভাষায় বহু স্থলে প্রথমা ও অন্যান্য বিভক্তিরও বহুবচনের প্রত্যয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে (যেমন ব্রজভাষায় 'ঘোরন, ঘোড়ন', পূর্ব্বী হিন্দীতে 'ঘোড়ন', মৈথিলীতে 'ঘোড়নি' ইত্যাদি)। বাঙ্গলায়ও এই বহুবচনের '-ন' বিদ্যমান ছিল, এবং '-গুলা-ন্', প্রাদেশিক 'গুলাইং লোকাইঁ,

---

* ১৩৩১ সালে ১লা চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একত্রিংশ বর্ষের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ 'বাঙ্গলা' এইরূপ বানান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা না ব্যুৎপত্তিসঙ্গত, না উচ্চারণসঙ্গত; তিনি 'বাংলা' এইরূপ বানানের পক্ষপাতী। 'বঙ্গাল' > 'বাঙ্গাল, বাঙাল'; 'বঙ্গাল + আ' > 'বাঙ্গালা' > আধুনিক 'বাঙ্গ্লা, বাঙ্লা'; 'ঙ্গ' হইতে 'গ' এর লোপে 'ঙ্' উচ্চারণ, এবং আদ্য অক্ষরে স্বরাঘাত বলিষ্ঠ হওয়ায় মধ্যস্থিত অক্ষরের 'আ'-কারের লোপ। 'ঙ্গ'এর দুই প্রকার উচ্চারণ বঙ্গভাষায় বিদ্যমান; [১] 'ঙ্গ্', [২] 'ঙ'; 'বাঙ্গালা' > 'বাঙ্গ্লা' এই বানান ব্যুৎপত্তি ও আধুনিক উচ্চারণ, উভয়েরই অনুগামী। সংস্কৃতে অনুস্বারের উচ্চারণ ছিল, যে স্বরের পরে অনুস্বারের প্রয়োগ হইত, সেই স্বরের অনুনাসিক প্রলম্বীকরণরূপে; 'অং' = 'অঅঁ', 'ইং' = 'ইইঁ', 'উং' = 'উউঁ' ইত্যাদি। এইরূপ উচ্চারণ প্রাকৃতেও ছিল; এবং আধুনিক ভারতীয় আর্য্য-ভাষায় তদ্ভব শব্দাবলীতে অনুস্বার অনুনাসিকরূপেই পর্য্যবসিত হইয়াছে; যেমন 'করণকম্, করণকং' > 'করণঅঁ' > মারহাট্টী 'করণেঁ'; 'চলিতব্যকং' > 'চলিঅব্বউঁং' < গুজরাটী 'চলবুঁ'। আধুনিক যুগের সংস্কৃত উচ্চারণে ও তৎসম শব্দের উচ্চারণে ভারতের নানা প্রদেশে অনুস্বারের প্রাচীন উচ্চারণ আর রক্ষিত নাই, নানা বিশিষ্ট নাসিক্য ধ্বনিতে ইহার বিকার ঘটিয়া গিয়াছে। যেমন দক্ষিণ-ভারতে 'ং' = 'ম্', 'হংসঃ' = 'হম্সঃ'; বঙ্গদেশে 'ং' = 'ঙ্', 'হংসঃ' = 'হঙ্শঃ', 'সংস্কৃতম্' = 'শঙ্শ্ক্রিতম্'; উত্তর-ভারতে 'ং' = 'ন্', 'হংসঃ, বংশঃ' = 'হন্স্, বন্স্', ইত্যাদি। সুতরাং 'বাঙ্গলা, বাঙ্লা' কে 'বাংলা' (অর্থাৎ কিনা 'বাঅঁলা') লিখিলে, অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ ধরিলে এই বানানকেই অশুদ্ধ বলিতে হয়।

লোকাইন্' প্রভৃতিরূপে এই 'ন'কারের অস্তিত্ব আছে'। '-ন্তু, -ন্তু'র 'ন'য়ে পরিবর্ত্তনে 'এই বিশেষ্য পদের '-ন'-কারের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। মারহাট্টী 'চরোৎ, চরূৎ-তে' দেখা যাইতেছে যে, '-ন্তু'র 'ওৎ, উৎ' -তে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উৎপত্তি শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

	উত্তম পুরুষ		মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ	
	একবচনে	বহুবচনে	একবচনে	বহুবচনে	একবচনে	বহুবচনে
সংস্কৃত	চরিষ্যামি	চরিষ্যামঃ	চরিষ্যসি	চরিষ্যথ	চরিষ্যতি	চরিষ্যন্তি
বাঙ্গলা	চরিউ, চরিউ	চরিমো	*চরিসি	চরিহ	চরিহে, চরিএ	×

ইহার মধ্যে মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের রূপের উৎপত্তি লইয়া আমার ঐকমত্য আছে। যদিও 'চরিএ'র মত 'হ'-কার-বিহীন '-ইএ' যুক্ত পদকে আমার মূলে কর্ম্ম-বাচ্যের পদ বলিয়াই মনে হয়—এক 'হ'কারযুক্ত রূপকেই ভবিষ্যতের রূপ বলিয়া আমি নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি। (এ সম্বন্ধে বিচার ১৩৩০ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মৎপ্রণীত 'বাঙ্গলাভাষায় কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৫৭ প্রভৃতি)।

কিন্তু উত্তম পুরুষের 'চরিমো, চরিউ, চরিউ' এই পদগুলি যে সংস্কৃত 'চরিষ্যামি', চরিষ্যামঃ' হইতে হইয়াছে, তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না। 'চরিমো, চরিউ' এইরূপ 'মো' ও 'ইউ' প্রত্যয় দুইটীর, একটির সহিত আর একটীর একবচন-বহুবচন সম্পর্ক বা অর্থগত সাদৃশ্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা ভাষায় চর্য্যাপদের যুগ হইতেই ক্রিয়ার একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং কেবল এ ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিদ্যমান থাকা একটু অস্বাভাবিক। অপর, 'মো' বা 'ইমো' প্রত্যয়ান্ত রূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দুষ্প্রাপ্য—শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহের উদ্ধৃত এক 'বঞ্চিমো' (শ্রীকৃ-কীঃ, পৃঃ ৩৮৭) ছাড়া অন্যত্র অপ্রাপ্য বলিলেই হয়। অন্যান্য ক্রিয়ার উত্তম পুরুষে 'ইবোঁ' প্রত্যয়ই পাওয়া যাইতেছে—'করিবোঁ, জাগিবোঁ, খাইবোঁ', ইত্যাদি। (এই 'ইবোঁ'র উৎপত্তি এইরূপ : '-ইতব্য' < 'ইঅব্ব্' < 'ইব্ব' < 'ইব', + 'হোঁ' < 'হউ', হাঁউ' < 'হর্ং' < 'হউং' < হকং < 'অহকং' < 'অহং' : 'চলিতব্য , ক) + অহ(ক)ম্' < 'চলিব(া) + হোঁ' > 'চলিবাহোঁ, চলিবহোঁ, চলিবোঁ'।) 'বঞ্চিমো' পদ 'বঞ্চিবোঁ'র বিকারেই উদ্ভূত। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ 'ইষ্যামঃ—ইষ্যামি'

১। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ আধুনিক বাঙ্গলার 'তিনি' পদকে সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ বহুবচন 'তানি' হইতে আগত বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু 'তানি' কিছুতেই 'তিনি'র মূল হইতে পারে না; 'তিনি' প্রাচীন বাঙ্গলাতে 'তিহঁ, তেহঁ' রূপে মেলে; 'তেহঁ, তিহঁ' = 'তেনহ, তিনহ' = '*তেন, তেনঁ', = 'তাণং' (> প্রাদেশিক বাঙ্গলা 'তান' = তাঁহার) = '*তানাম্,' 'তেষাম্' স্থলে; 'তেহঁ, তিনহ, তেন, তান' প্রভৃতি মূলে এই 'ন'কারযুক্ত ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ; 'তেহঁ, তেন' পদে 'হি' প্রত্যয়, (যাহার মূল হইতেছে তৃতীয়ার '-এভিঃ > -এহি > -হি' প্রত্যয়) যোগ করিয়া '*তেঁহি, তেনি > তিনি'র উৎপত্তি। সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য স্বর বাঙ্গলায় প্রায় সর্ব্বত্রই লুপ্ত; যেখানে লোপ হয় নাই, সেখানে বিশেষ কারণ আছে, এবং সে কারণগুলির একটিও 'তানি'র মতো পদকে বাঙ্গালায় ই-কারান্ত করিয়া রাখিবার পক্ষে সমর্থক নহে।

হইতে যথাক্রমে 'ইমো—ইউ' প্রত্যয়দ্বয়ের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া একটু সন্দেহের সঙ্গে বলিয়াছেন, "ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে, 'চরিউ' ও 'চরিমো' এই উভয়ের মধ্যে বচন পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" ইহা অতীব অদ্ভুত ব্যাপার। যাহা সংস্কৃতে ছিল বহুবচন, তাহা বাঙ্গলায় হইল একবচন; এবং সংস্কৃতের একবচনের প্রত্যয় বাঙ্গলায় দাঁড়াইল বহুবচন। 'ইমো' প্রত্যয় 'ইবোঁ'র বিকারেই উদ্ভূত, এবং এই 'ইমো' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অতি বিরল; ইহার সহিত 'ইউ'এর কোনও সম্বন্ধ নাই। 'ইউ'র উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার মত আমি 'বাঙ্গলাভাষায় কর্ম্ম ও ভাববাচ্যের ক্রিয়া" প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩০, পৃঃ ৬৯)। 'ইউ' যদি 'ইষ্যামি' (বা 'ইষ্যামঃ') হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা সানুনাসিক রূপ ('ইউঁ') পাইতাম। অবশ্য, কৃত্তিবাস হইতে উদ্ধৃত উদাহরণে 'ইউঁ' পাইতেছি; কিন্তু কৃত্তিবাস ঢের পরের লেখক, এবং যে পুথি দুইখানি হইতে পরিষদের অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের বয়স ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দ; তখন 'ইউ' এই কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়ার প্রয়োগ লুপ্তপ্রায়, সে সময়ে অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু একটা লিপিকর-প্রমাদ হেতু আসিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। 'ইষ্যামঃ' হইতে 'ইমো'র উৎপত্তি বিষয়ে দুইটী অন্তরায় আছে—[১] সংস্কৃতের অন্ত্য স্বর আধুনিক বাঙ্গলার তদ্ভব পদে বর্ত্তমান থাকে না, [২] সংস্কৃতের দুই স্বরধ্বনির মধ্যে একক অবস্থিত 'ম' বাঙ্গলায় ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় 'ব়ঁ' ও পরে কেবলমাত্র 'ঁ' তে পরিণত হয়, যেমন 'ভূমি—ভুঁই, স্বামী—সাঁই, সংক্রম—সাঁকোঁ > সাঁকো, গ্রাম—গাঁ, নাম—নাঁ, না' ('কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি, সে না কোন জনা' = কঃ নাম বংশীং বাদয়তে স নাম কঃ পুনঃ জনঃ)। (যেখানে তৎসম শব্দের বিশেষ প্রভাব আছে, সেখানে কচিৎ 'ম'কারের পুনরধিষ্ঠান ঘটিয়াছে, যেমন 'নাম—না', মারহাট্টি 'নাঁব', কিন্তু বাঙ্গলায় সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয় 'ম'যুক্ত রূপ, 'নাম')।

সংস্কৃতের ভবিষ্যৎ বা লৃট্-এর পদের মধ্যে একমাত্র মধ্যম পুরুষের পদ আজকাল বিদ্যমান, '-ইহ > -ইও' প্রত্যয়াশ্রয় হইয়া। পশ্চিমভারতীয় পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মধ্যদেশের ব্রজভাষা কনৌজিয়া বুন্দেলী, এবং কতকটা পূর্ব্বী-হিন্দী ও ভোজপুরিয়া ছাড়া অন্যান্য আর্য্যভাষায় ইহার ব্যবহার লুপ্তপ্রায়। যেখানে লুপ্ত, সেখানে নূতন প্রত্যয়ের প্রয়োগ আসিয়া গিয়াছে; যেমন 'ইতব্য > -ইব, অব'; শতৃর 'অন্ত' > অন্দ, 'অং'।

প্রাদেশিক বাঙ্গলায় ও প্রাচীন বাঙ্গলায় যে '-ইম্, ইমু, মু, মোঁ' প্রত্যয় পাওয়া যায়, উত্তম পুরুষের ভবিষ্যতে, তাহা প্রাচীন বাঙ্গলায় 'ইবাহোঁ > 'ইবোঁ' হইতেই জাত; চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত 'ব'র 'ম'য়ে পরিণতি খুবই স্বাভাবিক; 'বোঁ > ব়োঁ > ঙো, ঙ, মো, মু' ইত্যাদি। (প্রাচীন বাঙ্গলায় 'ঙ' = 'ব়ঁ'।) চন্দ্রবিন্দু না থাকিলেও দুই স্বরের মধ্যস্থ কেবল 'ব'এর 'ম'এ পরিণতি অন্যত্র সুলভ; তুলনীয়, উড়িয়া 'দেখিবি < দেখিমি' (উত্তম পুরুষে), মগহী 'লেমা, করমা, চলমা < লেবা, করবা, চলবা' (মধ্যম পুরুষে)।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—

মাননীয় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পঠিত প্রবন্ধের সম্বন্ধে আমাকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের "বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা" শীর্ষক প্রবন্ধটী আমি ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত সুনীতি-বাবু ঐ প্রবন্ধটীর সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমার মনে দুই একটী বিষয়ে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সে সম্বন্ধেই এখন দুই চারিটী কথা বলিব। আজকাল বাঙ্গালা-সাহিত্যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা বড় একটা দেখা যায় না। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, ভাষা-তত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু, পণ্ডিত শহীদুল্লাহ্ সাহেব, আর তাঁদের মতই আরও দুই এক জন ভাষা-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। সুনীতিবাবু এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা শতগুণে বেশী অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছেন; তিনি এজন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার এই প্রবন্ধটী সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে—আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা করার সুবিধা হইবে। যাহা হউক, সুনীতি বাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে আমার মনে যে সন্দেহ উদিত হইয়াছে, তাহা এই,—

[১] সংস্কৃতের 'তব্য' প্রত্যয়ের অর্থের সহিত ভবিষ্যৎ-কালের ক্রিয়া-বিভক্তির একটু সাদৃশ্য আছে—সন্দেহ নাই; এবং বিভক্তিগুলির বাহুল্য ও জটিলতার বর্জ্জন দ্বারা উহাদের সরলতা-পাদনের দিকেই সকল অপভ্রংশের গতি—ইহাও সত্য বটে; কিন্তু সংস্কৃত 'তব্য' প্রত্যয় হইতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তির 'ব' (করিব, যাইব, খাইব ইত্যাদির) উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে দেখা যাইবে যে, এ স্থলে সহজ ও স্বাভাবিক 'সে যাইব' (প্রাচীন বাঙ্গালা); 'তুমি যাইবা', 'মুঞি যাইমু' (প্রাচীন বাঙ্গালা) ইত্যাদির direct বা সরল উক্তির পরিবর্ত্তে 'তাহা কর্ত্তৃক যাওয়া হউক' ('তেন গন্তব্যং'), 'আমা কর্ত্তৃক যাওয়া হউক ('ময়া গন্তব্যং'), ইত্যাদি indirect ও round-about অর্থাৎ ঘুরাইয়া বাক্যরীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন বা আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যতের 'সে যাইব,' 'মুঞি যাইমু' ইত্যাদি প্রয়োগের মধ্যে কর্ত্তৃ-পদে, প্রথমা বিভক্তি ছাড়া 'তব্য' প্রত্যয়ের জন্য অপরিহার্য্য তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার দেখিতে পাই না; এরূপ অবস্থায় সংস্কৃত 'তব্য' প্রত্যয় হইতেই ভবিষ্যতের ক্রিয়া-বিভক্তির 'ব'কার উদ্ভূত হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে মনে খুবই সন্দেহ জন্মে।

[২] সংস্কৃত 'তব্য' প্রত্যয় হইতেই বাঙ্গালা ভবিষ্যতের ক্রিয়া-বিভক্তি 'ব'-কারের উৎপত্তি হইয়াছে, স্বীকার করিলেও, 'তব্য' প্রত্যয়ের রূপ প্রথম পুরুষ মধ্যম-পুরুষ ও উত্তম-পুরুষ—তিন পুরুষেই এক প্রকার বলিয়া, বাঙ্গালার ভবিষ্যতের উত্তম-পুরুষেও 'মুঞি করিমু' স্থলে 'মুঞি করিব' প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়াই সম্ভবপর ছিল, কিন্তু সেরূপ না হইয়া 'মুঞি করিমু', 'মুঞি যাইমু' ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়ায় সংস্কৃতের বর্ত্তমানের 'করোমি' 'যামি' ইত্যাদি অপভ্রংশে প্রাচীন বাঙ্গালার 'করোঁ' 'যাঁও' 'যাউঁ', 'যাঙ' ইত্যাদির ন্যায় সংস্কৃত ভবিষ্যতের 'ষ্যামি' বিভক্তি হইতেই 'করিমু' 'যামু' ইত্যাদির 'মু' উদ্ভূত হইয়াছে—এরূপ অনুমানই সমীচীন মনে হয়।

[৩] শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু যে ভাবে 'করব+হুঁ=করবহুঁ, করবুঁ, করমু' ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন, তাহাও সন্তোষজনক মনে হয় না। উত্তম-পুরুষ নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলেন বলিয়া 'করোঁ' 'করলুঁ' 'করমু' ইত্যাদির প্রয়োগের স্থলে কর্ত্তৃ-পদ 'মুঞি' উহ্য রাখিলেও অর্থ-প্রতীতির কোনও ব্যাঘাত হয় না; কিন্তু প্রথম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের স্থলে কর্ত্তৃ-পদ উহ্য রাখিলে—কে কর্ত্তা, সে বিষয়ে অনিবার্য্য সন্দেহ থাকিয়া যায়; এ জন্য 'করব' ইত্যাদি ক্রিয়া-পদের সহিত কর্ত্তৃ-পদ 'হুঁ' (সংস্কৃত 'অহং' শব্দের অপভ্রংশ) যোগ করার কোনও প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও উহা যোগ করায় এবং প্রথম ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া-পদের স্থলে অনিবার্য্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও প্রথম ও মধ্যম পুরুষের কর্ত্তৃ-পদ-সূচক কোনও চিহ্নের প্রয়োগ না করিয়া শুধু 'করব'—যাহার অর্থ প্রাচীন বাঙ্গালায় 'সে করিবে' বা 'তুমি করিবা' দুই-ই হইতে পারে—এরূপ সন্দিগ্ধার্থ ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ করা একান্তই অসম্ভব মনে হয়।

[৪] বাঙ্গালা অতীতের বিভক্তি 'ল' যে সংস্কৃতের 'ক্ত' (অতীতের অর্থে কৃদন্ত 'ক্ত' প্রত্যয়) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বোধ হয়, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কোনও মত-ভেদ নাই। বাঙ্গালা অতীতের উত্তম পুরুষের ক্রিয়া-বিভক্তিতেও আমরা 'লোঁ' 'লুঁ' (পরবর্ত্তী সময়ে 'মু') দেখিতে পাই। 'ক্ত' প্রত্যয়ের অপভ্রংশে 'ল' ব্যতীত 'লোঁ' বা 'লুঁ' আসিতে পারে না; সুতরাং এ স্থলে ল-কারে অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু-সংযোগ সংস্কৃত উত্তম পুরুষের 'অম্' বিভক্তির প্রভাব-সম্ভূত না বলিয়া গত্যন্তর দেখা যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালার উত্তম-পুরুষের 'করোঁ' 'মরোঁ' ইত্যাদি স্থলেও 'ওঁ'-কে সংস্কৃত 'মি' বিভক্তি হইতে উদ্ধৃত না বলিয়া উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালা বর্ত্তমান ও অতীতের উত্তম-পুরুষের বিভক্তির analogy বা সাদৃশ্য হেতু, বাঙ্গালা ভবিষ্যতের 'মু' বিভক্তিও সেইরূপ সংস্কৃত 'স্যামি' ভবিষ্যতের 'স্যামি' বিভক্তি হইতে উৎপন্ন কিংবা উহারই প্রভাবসম্ভূত, এরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন মনে হয়।

[৫] শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু সংস্কৃত (ং) অনুস্বারের যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, এ স্থলে উহার কোনও উপযোগিতা বুঝিতে পারিলাম না। বাংলার 'বাঙ্গালা' শব্দটাকে কেহই সংস্কৃত অনুস্বারের বিশুদ্ধ উচ্চারণ অনুসারে 'বা-আঁ-লা' বলিয়া উচ্চারিত করিবেন না; 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গলা' লিখিলেও নিশ্চিতই উহা 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্‌লা'ই উচ্চারিত হইবে; এ অবস্থায় 'বাংলা' না লিখিয়া 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গলা' লিখার বিশেষ কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু এই উত্তর দিলেন,—

রাত্রি অধিক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমার বক্তব্যের সমালোচনা করিলেন, তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার এখন সম্ভবপর হইবে না। তবে মোটামুটি এই কয়টী কথা বলিতে চাহি।

[১] সংস্কৃতের অতীতের ক্রিয়াপদগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া যায়। প্রাকৃতে ক্বচিৎ একটা আধটা লঙ্, লুঙ্, লিট্-এর পদ দেখা যায়, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র 'ত' প্রত্যয়ান্ত পদের সাহায্যেই অতীত ক্রিয়ার দ্যোতনা হইয়া থাকে। অকর্ম্মক ক্রিয়া হইলে এই 'ত' প্রত্যয়ান্ত পদ কর্ত্তার

বিশেষণ হয়। সকর্ম্মক হইলে কর্ম্মের বিশেষণ হয় ও কর্ত্তাকে তৃতীয়ায় আনা হয়; যেমন, প্রাচীন সংস্কৃতের রীতি অনুসারে—'অহং জগাম, অহং রাজানম্ অপশ্যম্', কিন্তু প্রাকৃতে 'অহং (অহঅং, হকং, হগং, হগে ইত্যাদি) গদো (গও, গদে)', ও 'মএ (= ময়া) রাজা (রাঅ, লাযা, লাআ) দেক্‌খিও (বা দিট্‌ঠো, দিশ্‌টে)।' এই 'ত' প্রত্যয়ান্তরূপে স্বার্থে 'ইল্ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া বাঙ্গলায় অতীত কালের 'ইল' প্রত্যয় দাঁড়াইল; 'অহঅং গঅ-ইল্ল'<প্রা-বাং 'হউ' গেল', 'মএ রাজা দেক্‌খিঅইল্ল', প্রা-বাং 'মই রাজা দেখিল'। অর্থাৎ অতীতে অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ, সকর্ম্মক ক্রিয়ায় সকর্ম্মক কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ। হিন্দীতে এই রূপ এখনও বিদ্যমান আছে; যেমন ব্রজভাষায়—'হৌঁ গয়ৌ' (হৌঁ = অহং, গয়ৌ = গঅউ = গঅও = গতকঃ), কিন্তু 'মৈঁ রাজা দেখ্যৌ, (মৈঁ = ময়া, দেখ্যৌ = দেক্‌খিঅউ = দেক্‌খি-অও = * দৃক্ষিতকঃ, দৃষ্ট-অর্থে)। তুলনীয় প্রাচীন বাঙ্গলা (চর্য্যাপদ ৫) – 'এত কলে হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ। এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ।' এখানে 'হাঁউ অচ্ছিলেঁ' = স্থিতোঽহং—হাঁউ বা হউ = অহং; 'মই বুঝিল' = ময়া জ্ঞাতং); একই পদে পাশাপাশি প্রথমার হাঁউ = অহং যোগে অকর্ম্মক অচ্ছ বা আছ ধাতুর সঙ্গে কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ ও সকর্ম্মক বুঝ ধাতুর সঙ্গে তৃতীয়ার মই = ময়া যোগে কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ আমরা পাইতেছি। দেখা যাইতেছে, অতীতে তিঙন্ত পদগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় এইরূপ ঘুরাইয়া বলিবার—সকর্ম্মক ক্রিয়াকে কর্ম্মবাচ্যে আনিয়া বলিবার রেওয়াজ আসিয়া গিয়াছে।

অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও দেখিতে পাইতেছি যে, 'তব্য'>'ইব' প্রত্যয়ান্তরূপ ভবিষ্যতের লৃট্ বা তিঙন্ত রূপগুলির স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এখানে সকর্ম্মক অকর্ম্মক ক্রিয়ার ভেদ নাই;—উভয় স্থলেই কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ হয়, যেমন 'যুষ্মাভিঃ ভবিতব্যং', 'ময়া দাতব্যা পৃচ্ছা' = প্রাচীন বাঙ্গলায় 'তুমহে হোইব' (চর্য্যা ৫), 'মই দিবি পিরিচ্ছা' (চর্য্যা ২৯)। প্রাচীন বাঙ্গলায় এই অনুসারে আমরা দেখি—

উত্তম পুরুষ—মই (মুঞি, ইত্যাদি = ময়া), আমি (= অম্হে, অম্হহি = অস্মাভিঃ) জাইব, খাইব (= যাতব্যং, খাদিতব্যং)।

মধ্যম পুরুষ—তই (তুঞি ইত্যাদি = ত্বয়া), তুমি (= তুম্হে, তুম্হহি = যুষ্মাভিঃ) জাইব, খাইব।

প্রথম পুরুষ—সে জাইব, সে খাইব। এখানে প্রথম পুরুষে তৃতীয়ার 'তেঁ' (= তেন) স্থলে অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখা যাইতেছে যে, প্রথমায় 'সে' ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথমা ও তৃতীয়ার পদের অদলবদল প্রা-বাংতে বিরল নহে। প্রা-বাং-র প্রথমার 'হাঁউ' (= অহং)-কে তৃতীয়ার 'মইঁ, মই' (= ময়া) বিতাড়িত করিয়াছে। তদ্রূপ প্রা-বাং-র প্রথমা 'তো', 'তু' (<ত্বং)কে তৃতীয়ার 'তুই' (<ত্বয়া) দূরীভূত করিয়াছে। কেবল ইহার ব্যতিক্রম আমরা এই প্রথম পুরুষেই দেখিতে পাইতেছি। প্রা-বাংতে 'তেঁ জাইব, তেঁ খাইব' রূপই হওয়া স্বাভাবিক, ও প্রাকৃত ব্যাকরণের রীতি ধরিয়া দেখিলে এই রূপই অপেক্ষিত; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলায় কিরূপ প্রয়োগ ছিল,

আমরা তাহা জানি না। কিন্তু প্রথমা ও তৃতীয়ার গোলমাল অতীতের ক্রিয়ায় যে প্রাচীন বাঙ্গলায় হইয়াছিল, তাহা সহজেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি—যেমন 'হাঁউ সুতেলি' = আমি শুইলাম (চর্য্যা ১৮—এখানে প্রথমার প্রয়োগ), 'হাঁউ অচ্ছিলেঁ = আমি ছিলাম (চর্য্যা ৩৫—প্রথমার প্রয়োগ); কিন্তু 'মই ঘলিলি. হাড়েরি মালী' = আমি হাড়ের মালা ফেলিয়া দিলাম (চর্য্যা ১০—তৃতীয়ার প্রয়োগ), 'মই বুঝিল' = আমি বুঝিলাম (চর্য্যা ৩৫—তৃতীয়ার প্রয়োগ); এরূপ স্থলে হাঁউ' 'মই' দুই বিভিন্ন সুবন্ত রূপের মধ্যে গোলমাল ঘটা স্বাভাবিক, স্বীকার করিতেই হইবে। তদ্রূপ প্রথম পুরুষেও 'সে, তেঁ (= সঃ, তেন)র অদল বদলও অপেক্ষিত, ও ক্রমে যে বহুলতররূপে প্রযুক্ত প্রথমার 'সে' যে তৃতীয়ার 'তেঁ'কে দূরীভূত করিতে পারে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

[২, ৩, ৪ ; 'মুঞি করিব, আমি করিব' এইরূপ প্রয়োগ প্রা-বাং-তে খুবই দৃষ্ট হয়। যথা—চর্য্যা ৩৬—'শাখি করিব জালন্ধরিপাএ' = (আমি) জালন্ধরি-পাদকে সাক্ষী করিব। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও এইরূপ প্রয়োগ যথেষ্ট আছে; পৃষ্ঠা ১১৪—'তোহ্মার করিব অহ্মে উচিত সমান' (= সম্মান), পৃষ্ঠা ১৮৫ —'আহ্মে বহিব তোর ভার', 'আহ্মে সত্য করিব', ইত্যাদি।

কেবল-মাত্র '-ইল' '-ইব' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ তিন পুরুষেই ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনতম বাঙ্গলায় এই ব্যবস্থা ছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়। এখনও বাঙ্গলার কোনও কোনও প্রাদেশিক ভাষায় এই রীতি বিদ্যমান; তুলনা—ঢাকা অঞ্চলে 'সে ক'রব' = সে করিবে। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় (চণ্ডীদাসের পূর্ব্ব হইতেই) খালি '-ইল' '-ইব' উত্তম, মধ্যম বা প্রথম পুরুষ বুঝাইবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। '-ইল, -ইব'র সঙ্গে পুরুষদ্যোতক কিছু জুড়িয়া দেওয়া হইতে লাগিল। যে অংশ জুড়িয়া দেওয়া হইল, তাহা হয় কোনও সর্ব্বনাম-পদ, নয় বর্ত্তমানের ক্রিয়াপদের অনুকরণে আনীত কোনও বিভক্তি। এইরূপ ব্যবস্থা আমরা স্পষ্টই পুরাতন বাঙ্গলায় দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনও জল্পনা বা অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—

উত্তম পুরুষ অতীতকালে 'কৈল' (= প্রাকৃত কয়-ইল্ল = কৃত + ইল); 'কৈলা + হোঁ' = 'কৈলাহোঁ' (এই 'হোঁ', প্রাচীন বাঙ্গলার 'হাঁউ' হইতে; তুলনীয়—'হৈলাহোঁ'; প্রা. অসমীয়াতে = 'আহোঁ' প্রত্যয় মেলে, মৈথিলীতেও 'অহুঁ'); তাহা হইতে 'কৈলাওঁ', কৈলাঙ, কৈলোঁ, কৈলোঁ, কৈলুঁ; কৈলুম্ ইত্যাদি; ও এই প্রকার রূপের প্রসারে—'করিলাহোঁ, করিলাওঁ, করিলোঁ করিলুম্, ক'রলুম, করনু'; 'করিল + আমি' = 'করিলাম্'।

মধ্যম পুরুষ—'কৈল'; 'কৈলাহেঁ, কৈলাহা' অসমীয়াতে এই প্রকার রূপ পাওয়া যায়; মৈথিলীতে—'কৈলহ, কৈলেঁ, কৈলহি < কৈলেহেঁ'; এখানে 'আহা' < 'অহ' প্রত্যয়, বর্ত্তমানের ক্রিয়ার মধ্যম পুরুষের অনুসরণে; যথা 'চলহ, চলাহা' = 'চলথ'; এবং 'এহেঁ' = 'আহা, অহ' প্রত্যয়ে বহুবচনদ্যোতক চন্দ্রবিন্দু যোগে। [বহুবচন জানাইবার জন্য চন্দ্রবিন্দু বা '-ন-' বা 'ন্হ-' আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিতে খুবই সাধারণ—ও এই চন্দ্রবিন্দু বা 'ন' বা 'ন্হ', বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম পদের ষষ্ঠীর বহুবচনের '-আনাম্' বিভক্তির 'ন' হইতে জাত, এ কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

তাহা হইতে 'কৈলা, কৈলে, কৈলেঁ (=করিলা, করিলে, করিলেন) ইত্যাদি। অনাদরে 'কৈলি' (='কৈল+ই'; 'ই<হি', সাধারণ অনুজ্ঞার রূপ হইতে অনুমিত হয়), >'করিলি'।

প্রথম পুরুষ—'কৈল'; 'কৈলে' (—'এ' প্রত্যয় এখানে বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রথম পুরুষের এ-কার হইতে অনুমিত হয়); 'কৈলান্তি, কৈলান্ত, কৈলেন্ত, কৈলেন' (বর্ত্তমানের প্রথম পুরুষের বহুবচন হইতে গৃহীত); 'করিল, করিলে>ক'রলে; করিলেন্ত, করিলেন' ইত্যাদি।

তদ্রূপ ভবিষ্যতেও উত্তম পুরুষে—'মুই, আমি, করিব'; 'করিবাহোঁ>করিবোঁ, করিবুঁ, করিমু, করিম্, ক'রমু'। 'করিব+আমি>করিবাম' (ময়মনসিংহের ভাষায়)।

মধ্যম পুরুষে—'তুই, তুমি, করিব'; 'তুমি করিবাহা, করিবাহেঁ, করিবেহেঁ>করিবা, করিবে, করিবেন'। অনাদরে 'তুই করিবি'।

প্রথম পুরুষ—'সে, তাহারা করিব'; 'করিবে'; 'করিবান্ত, করিবেন্ত, করিবেন'।

'করিবোঁ' পদে 'ব' স্পষ্ট বিদ্যমান। 'করিবোঁ' পদের 'ব' সানুনাসিক ওষ্ঠ্য স্বর 'ওঁ' কারের সহিত যুক্ত হওয়ায় সহজেই 'মো', 'মু' হইয়া যায়; 'করিমো>করিমু, ক'রমু'। কিন্তু 'করিব+আমি'—এখানে স্বরবর্ণটী কণ্ঠ্য অ-কার হওয়ার দরুন, 'ব'এর 'ম'য়েতে পরিবর্ত্তনের দিকে প্রবণতা রুদ্ধ হইয়াছে; তদ্রূপ মধ্যম ও প্রথম পুরুষের রূপে 'ওঁ' না থাকায় 'ব'-ই বাহাল আছে।

'কৈলোঁ, করিলোঁ, করিবোঁ'—ইহাদের অনুনাসিক বর্ত্তমানের ক্রিয়ার 'করোঁ, খাওঁ, চলোঁ' প্রভৃতি রূপে যে অনুনাসিক বিদ্যমান, তাহা হইতে হইতে পারে। এই অনুনাসিক সংস্কৃতের '-মি, -মঃ' প্রত্যয়ের বিকারে উৎপন্ন। 'করোমি>* করমি>* করিমি>* করিবিঁ>*করীঁ >করি; কুর্ম্মঃ>* করোমো>* করমো>* করওঁ, করও >করোঁ'। ইহা অসম্ভব নহে যে, মধ্যম পুরুষের ও প্রথম পুরুষের রূপের মত অতীতে ও ভবিষ্যতে '-ইল' '-ইব' প্রত্যয়ের সঙ্গে বর্ত্তমানেরই বিভক্তি 'ওঁ' জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে একটী বড় কথা বলা চলে; 'হোঁ' রূপটী পুরাতন বাঙ্গলায় ও অসমীয়াতে, তথা 'অহুঁ' রূপে মৈথিলীতে আমরা পাইতেছি। আর তদ্ভিন্ন চলিলাম, করিবাম,' > প্রভৃতি পদে স্পষ্টই 'ইল', '-ইব'+'আমি' পাইতেছি। "চলিবাহোঁ'>'চলিবোঁ, চলিলাহোঁ>চলিলোঁ' পদে কেবল আধুনিক 'আমি' স্থলে প্রাচীন 'হোঁ, হাউঁ, হউঁ'। তবে এ ক্ষেত্রে এরূপ মনে করিলে বাধা। চলে যে, 'চলিবোঁ, চলিবাহোঁ; চলিলোঁ, চলিলাহোঁ' এই প্রকার রূপে লুপ্ত উত্তম পুরুষের সর্ব্বনাম 'হোঁ' ও বর্ত্তমানের ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের রূপের 'ওঁ', এই দুইয়ের-ই অস্তিত্ব আছে।

[৫] 'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙলা, 'বাংলা' বানান লইয়া আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা আলোচ্য প্রসঙ্গের বহির্ভূত বলিয়াই পাদটীকায় তাহাকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'বাঙ্গলা'—এই বানানকে 'না ব্যুৎপত্তি-সঙ্গত, না উচ্চারণ-সঙ্গত' বলিয়াছিলেন। আমি 'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা' ও 'বাঙলা' এই তিন প্রকার বানানই লিখিয়া থাকি, অনুস্বার দিয়া লেখার পক্ষপাতী নই। 'বাঙ্গলা'—এইরূপ বানানকে যে ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ, দুই দিক্ ধরিয়া

বিচার করিলে বিশেষ ভাবে সমর্থিত করা যায়, তাহা আমার বিশ্বাস; এবং সেই জন্য আমার মন্তব্যে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছি।

আজকার প্রবন্ধের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সতীশবাবু তাঁহার সন্দেহ কয়টী উল্লেখ করিয়া আমায় ব্যাখ্যা করিবার অবসর দিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত কিরণবাবু 'আমি, হম্' প্রভৃতি সর্ব্বনাম পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্ন আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হইলেও যথাসাধ্য সংক্ষেপে সমাধানের চেষ্টা করিব। 'আমি, হম্' সংস্কৃত 'অহম্' শব্দ হইতে উদ্ভূত নহে। বাঙ্গলায় ও আধুনিক আর্য্যভাষায় সর্ব্বনাম উত্তম পুরুষের উৎপত্তি এই,—

প্রথমা একবচনে—বৈদিক বা সংস্কৃতে 'অহম্'। প্রাকৃতে এই 'অহম্' শব্দে একটা স্বার্থে 'ক' জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে হইল 'অহকং'। 'অহকং' অশোক অনুশাসনে 'হকং'রূপে পাওয়া যায়, সাহিত্যের (সংস্কৃত নাটকের) মাগধী প্রাকৃতে 'হকং'এর পরিবর্ত্তন হয় 'হকে, হগে, হগ্গে'। চলিত ভাষায় সমগ্র উত্তরভারতে 'হকং' পদটী, 'হগং, হঅং, হবং, হউঁ' এইরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। এই 'হউঁ' পদটী গুজরাটীতে 'হুঁ', পশ্চিমা-হিন্দী (ব্রজভাষা)তে 'হোঁ', ও প্রাচীন বাঙ্গলাতে (চর্য্যাপদের ভাষায়) 'হাঁউ' রূপে মেলে (যেমন 'হাঁউ নিরাসী খমন ভতারে'=চর্য্যা ২০; 'তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী'=চর্য্যা ১০; 'এত কাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ'=চর্য্যা ৩৫)। গুজরাটী ও ব্রজভাষাতে 'অহম্—অহকং'-পদ-জাত কর্ত্তৃকারকের একবচনের রূপ 'হুঁ, হোঁ' এখনও বিদ্যমান। কিন্তু ইহা প্রাচীন বাঙ্গলার যুগের পর হইতেই বাঙ্গলা-ভাষায় লোপ পাইয়াছে।

তৃতীয়া একবচনে—সংস্কৃতে 'ময়া'। প্রাকৃতে ইহা 'মএ' রূপ গ্রহণ করে, তৎপরে অপভ্রংশে 'মই'। বিশেষ্য পদে তৃতীয়ায় সংস্কৃতের '-এন' প্রত্যয় অন্ত্য যুগের প্রাকৃতে 'এং' বা 'এঁ'তে পরিণত হয়; যেমন 'হস্তেন > হত্থেণং, হত্থেণ > হত্থেং, হত্থেঁ > হাথেঁ, হাথে, হাতে'; এই বিশেষ্য পদের রূপ হইতে 'এন'-বিভক্তি-জাত চন্দ্রবিন্দু, 'মই' পদের উপর প্রভাব করে, তাই 'মইঁ' রূপটি আমরা পাই। এই 'মইঁ' হইতেছে, আমাদের বাঙ্গলায় 'মুই, মুঞি, মুয়িঁ, মুহি' ইত্যাদি। হিন্দীর 'মৈঁ'ও এই একই শব্দ।

চতুর্থী একবচনে—'মহ্যম্'। প্রাকৃতে 'মজ্ঝ, মজ্ঝু'। ইহা হইতে হিন্দীর 'মুঝ' (যেমন 'মুঝকো'=আমাকে, 'মুঝে'=আমায়)। হিন্দীর প্রভাবে বাঙ্গলার ব্রজবুলী সাহিত্যে 'মঝু' =আমার।

ষষ্ঠী একবচনে—'মম'। 'মম' ক্রমে 'মৱঁ' ও পরে 'মো' হইয়া দাঁড়ায়। ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'মো' প্রাচীন বাঙ্গলায় মেলে। 'মো'-তে আবার নূতন করিয়া ষষ্ঠীর '-র' বিভক্তি যোগ করিয়া 'মোর'।

প্রথমা বহুবচন—সংস্কৃতে 'বয়ম্'। কিন্তু প্রথমা ছাড়া অন্য বিভক্তিতে বহুবচনে সংস্কৃতে যে 'অস্ম'-রূপ আসে, প্রাকৃতে তাহাই অবলম্বন করিয়া বহুবচনে 'অম্হে' পদের সৃষ্টি হয়। এই 'অম্হে'

হইতে প্রাচীন বাঙ্গলা 'আম্হি' (আহ্মি), ও পরে 'আমি'। হিন্দীর 'হম্'ও 'অম্হে' এই পদ হইতে, এবং সাধু হিন্দীতে 'হম্' সদাই বহুবচন।

তৃতীয়া বহুবচন—'অস্মাভিঃ' হইতে প্রাকৃতে 'অম্হেহিঁ' ও 'অম্হহিঁ'। ইহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গলায় 'আম্হে' (আহ্মে), উড়িয়ায় 'আম্ভে'। প্রথমার 'আহ্মি' ও তৃতীয়ার 'আহ্মে' এই দুই রূপ কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলার যুগ হইতে আর তাহাদের পার্থক্য বজায় রাখে নাই—উভয়েই আধুনিক বাঙ্গলা 'আমি'তে মিলিয়া গিয়াছে।

বহুবচনের অন্য বিভক্তির রূপ বাঙ্গলায় আসে নাই। দেখা যাইতেছে, উৎপত্তি-হিসাবে বাঙ্গলার উত্তমপুরুষের সর্ব্বনামের কতকগুলি পদ হইতেছে একবচনের, আর একটী পদ বহু-বচনের। যথা,—

একবচন	বহুবচন
প্রথমা—(অহম্ > অহকং >) হাঁউ [লুপ্ত]	(অস্মে > অম্হে > আহ্মি) > আমি
তৃতীয়া—(ময়া > মএ >) মই, মইঁ, মুই	(অস্মাভিঃ > অম্হেহি >) আহ্মে > আমি
চতুর্থী—(মহ্যম্ > মজ্ঝ >) মজ্‌ঝু [ব্রজবুলী]	
ষষ্ঠী –(মম >) মো, মো + র = মোর	

অসমীয়া ভাষায় এখনও 'মই' = একবচনে = আমি, ও 'আমি' = বহুবচনে, আমরা অর্থে। প্রাচীন বাঙ্গলায় 'আমি' পদটী একবচনে ব্যবহৃত হইতে থাকে ; 'মই, মুই' ও 'আমি'র মধ্যে বচন-ঘটিত পার্থক্য চলিয়া যায়। সুতরাং পরবর্ত্তী কালে নূতন বহুবচনের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ায়, 'আমি-সব, আমা-সব, মো-সব, মুই-সব,' ও 'মোরা, আমরা'—এই প্রকার বহুবচনের নবীন রূপগুলি সৃষ্ট হয়। হিন্দীতেও সেইরূপ 'হম্' শব্দ একবচনে প্রযুক্ত হইতে থাকিলে নূতন বহুবচনের রূপ 'হম-লোগ'এর উদ্ভব।

'অর্থশাস্ত্রে' দুর্ব্বল রাজার আত্মরক্ষা*

প্রবলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাকল্পে দুর্ব্বল রাজার জন্য কৌটিল্য যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

'অর্থশাস্ত্র' প্রবল বা দুর্ব্বল সকল রাজার পক্ষেই সমান উপযোগী; ইহাতে যেমন পরাক্রান্ত জয়াভিলাষী রাজার পক্ষে শত্রুজয়ের উপায় বর্ণিত দেখা যায়, তেমনই আবার অসহায় ও অসমর্থ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাঁহার তদানীন্তন কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশও লক্ষিত হয়। বরং আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই এই গ্রন্থে অধিক বিস্তৃতভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রে' (১২, ১) 'ধর্ম্মবিজয়ী', 'লোভবিজয়ী' ও 'অসুরবিজয়ী' এই তিন প্রকার 'অভিযোক্তা' বা আক্রমণকারীর উল্লেখ আছে। শত্রু নত হইবা মাত্রই 'ধর্ম্মবিজয়ী' রাজা তাঁহার অপকারের চেষ্টা হইতে বিরত হন, অধিকন্তু তাঁহার বিপদে সহায়তাও করিয়া থাকেন। 'ভূমি' ও 'অর্থে' 'লোভবিজয়ী'র লোভ; অভিলষিত বস্তু পাইলে তিনি আর আক্রমণ করেন না। কিন্তু ভূমি, অর্থ, স্ত্রী, পুত্র এবং সর্ব্বশেষে প্রাণ হরণ করা 'অসুরবিজয়ী'র উদ্দেশ্য; সুতরাং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা দুঃসাধ্য। ধনাদি উপহার দ্বারা এইরূপ 'অভিযোক্তা'কে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি গোপনে প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। এইরূপ স্থলে কৌটিল্য অসাধু উপায়ের আশ্রয় লওয়াও নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন না; নিষ্ঠুর প্রতিপক্ষের সর্ব্বধ্বংসী আক্রমণের কবল হইতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য তিনি শক্তিহীন রাজার পক্ষে অগত্যা ছল-চাতুরী ও ক্রূর উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থাও দিয়াছেন। সকল উপায় ব্যর্থ হইলে, মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া 'অগ্নিপতঙ্গে'র ন্যায় সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশও 'অর্থশাস্ত্রে' (৭, ১৫) পাওয়া যায়। কিন্তু, শত্রুর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া, উপযুক্ত সমাদর পাইলে বিশ্বাসঘাতকতা করা কৌটিল্যের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। তিনি দণ্ডোপনতের কর্ত্তব্য-বর্ণন কালে (৭, ১৫) বলিয়াছেন,—দুর্ব্বল রাজা ধনাদি উপহার সহ দূত পাঠাইয়া প্রবল শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করিবে এবং অভয় পাইলে তাঁহার আজ্ঞাবহরূপে সকল বিষয়ে য[illegible] ক্ত[illegible] পকা[illegible] করিবে; আবার 'দণ্ডোপনায়িবৃত্ত' নামক প্রকরণে (৭, ১৬) প্রবল রাজার প্রতি উপদেশ আছে যে, ভীত আশ্রয়প্রার্থীকে অভয় দিয়া পিতার ন্যায় পালন করিতে হইবে। 'মণ্ডল'স্থ অপর রাজগণের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়েও 'অর্থশাস্ত্রে' 'উপনত'কে উৎপীড়ন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে; কারণ, ঐরূপ করিলে উদ্বিগ্ন রাজমণ্ডল উৎপীড়নকারীর বিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে পারে।

শক্তিহীন রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য 'অর্থশাস্ত্রে' বহু উপায়ের নির্দ্দেশ আছে। 'যাতব্যবৃত্তি' নামক প্রকরণে (৭, ৪) প্রবলের দ্বারা আক্রান্ত অশক্ত রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়। 'হীনশক্তিপূরণ' নামক অপর প্রকরণে (৭, ১৪) ক্ষীণশক্তি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাই। আর এক প্রকরণে (৭, ১৫) শক্তিশালীর অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য

---

* মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৩শ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

দুর্ব্বল রাজাকে দুর্গ আশ্রয় করিয়া যথাসাধ্য প্রতিকার করিতে বলা হইয়াছে। 'আবলীয়সম্' নামক সমগ্র অধিকরণটি কেবল 'অবলীয়ান্' অর্থাৎ দুর্ব্বলের কর্ত্তব্য-কথায় পূর্ণ। এই অধিকরণের অন্তর্গত 'দূতকর্ম্ম', 'মন্ত্রযুদ্ধ', 'সেনামুখ্যবধ' প্রভৃতি নয়টি প্রকরণে নানারূপে শত্রুবঞ্চনার কৌশল বর্ণিত আছে।

উপরিউক্ত প্রকরণগুলির সার মর্ম্ম এই যে, প্রথমতঃ ভেদনীতি অবলম্বনে দুর্ব্বল রাজা আক্রমণকারী ও তাঁহার সুহৃদ্‌বর্গের মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে চেষ্টা করিবেন এবং শত্রু অপেক্ষা অধিক বলশালী রাজার সহায়তা লইয়া কিংবা তাদৃশ সাহায্যের অভাবে আক্রমণকারীর তুল্যবলসম্পন্ন এক বা বহু রাজার সহিত সম্মিলিত হইয়া, অথবা তাহারও অভাব হইলে তদপেক্ষা হীনবল সহায়ই বহুসংখ্যক সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবেন ইহার কোনটিই সুলভ না হইলে দুর্ভেদ্য দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া নানা উপায়ে প্রবল শত্রুর বলক্ষয় করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তথায় অবস্থানকালে নিজের বন্ধুবর্গ এবং 'মধ্যম' ও 'উদাসীন'কে উক্ত 'অভিযোক্তা'র বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক।

ভেদনীতির সাহায্যে শত্রুর আত্মীয় ও প্রতিবেশী রাজাদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, পরপক্ষের রাষ্ট্র, দুর্গ ও স্কন্ধাবারের মধ্যে নানা উপায়ে অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবে। এইরূপে বিবিধ কৌশলে অনিষ্ট সাধন দ্বারা শত্রুকে বিব্রত করিয়া অবশেষে চর দ্বারা তাহাকে গোপনে হত্যা করাও কৌটিল্য অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য কেবল নিজ প্রভুর সাম্রাজ্য-নীতির অনুকূলেই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই; তিনি প্রবল ও দুর্ব্বল, উভয় প্রকার রাজার পক্ষেই সমান উপযোগী করিয়া এই রাজনীতিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার একত্রিংশ খণ্ডের

নির্ঘণ্ট

ফ

ব

হ

ক্ষ